উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৫৮-তম বর্ষ

(১৩৬২ মাঘ হইতে ১৩৬৩ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত”

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা   প্রতি সংখ্যা আট আনা

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(বর্ণানুক্রমিক)

মাঘ, ১৩৬২ হইতে পৌষ, ১৩৬৩

বিষয়	লেখক—লেখিকা	পৃষ্ঠা
আহ্বান	...	৫৭
ইচ্ছাশক্তির প্রভাব	শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা	৩১৬
ইতিহাসাশ্রিত আতঙ্ক	শ্রীজয়দেব রায়	২৩৮
ঈশ্বর কেমন?	স্বামী নিখিলানন্দ	৬২৫
উৎ-শিষ্ট	...	১৬৯
উৎসব-তীর্থে (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৭০২
উদ্বোধন (কবিতা)	ওমর আলী	৪৯
উপাসক ও উপাস্য	স্বামী বিবেকানন্দ	১২১
উমার পরীক্ষা	স্বামী মৈথিল্যানন্দ	৪৭৮
ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসভূমি	শ্রীপ্রণব ঘোষ	৬৬৯,৭০৬
একটি সন্ধ্যার স্মৃতি	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১৫৭
একতাই বল	শ্রীমতী শোভা দুই	৩২১
একের প্রকাশ (কবিতা)	শ্রীশক্তিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৭
এখানে—ওখানে (কবিতা)	আবদুল গণি খান	৪২৯
এমন কাজল রাতে কে দিলরে মায়ার বন্ধন (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৫৮৷৹
এস পুনঃ দয়াল ঠাকুর (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বসু	৮৫
এসো (কীর্তন)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩৬
কথাপ্রসঙ্গে		২,৫৮, ১১৪, ১৭০, ২২৭, ২৮২, ৩৩৮, ৩৯৪, ৪৫১, ৫৬২, ৬১৮, ৬৭৫
কথামৃতে কৃপা ও পুরুষকার	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৭৬
কবীর (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৫৭৬
কবীর-বাণী (কবিতা)	শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার	৪৩
করো বিশুদ্ধ মন (কবিতা)	শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস	৬৫৩
কর্মময় উপাসনা (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৩৪৯
'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	২১
কাব্যে অলংকার প্রয়োগের তাৎপর্য	ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	৪৯০
কামাখ্যা-তীর্থপথে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫৬৭
কৃষ্ণ	স্বামী বিবেকানন্দ	৪০২
কোথায় সুখ, শান্তি কিসে (কবিতা)	নরেন্দ্র দেব	২৪৩
"কৈলাস-শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্"	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী	২৯৬
কৈলাসের দীক্ষা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩১৩
খেলাঘর (কবিতা)	অনিরুদ্ধ	৬৭৬৶
গঙ্গা (কবিতা)	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২৩২

আলোকের উদ্বোধন

উদীরতাং সূনৃতা উৎপুরংধীরুদগ্নয়ঃ শুশুচানাসো অস্থুঃ।
স্পার্হা বসূনি তমসাপগূড়হাবিষ্কৃণ্বংত্যুষসো বিভাতীঃ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা—১ম মণ্ডল, ১২৩ সূক্ত, ৬ষ্ঠ মন্ত্র

শোভন এবং সত্য বাক্য উচ্চারিত হউক। দেহকে যাহা ধরিয়া রাখিয়াছে সেই প্রাণশক্তি এবং প্রাণশক্তিরই রূপান্তর বোধশক্তি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক। তবেই তো মানুষ শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবে। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠুক, সমগ্র জীবন যাহাতে অতন্দ্রিত কল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারে।

ঐ দেখ, মঙ্গলময়ী উষা তাঁহার বহুদীপ্যমানা আলোকচ্ছটা লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। অন্ধকারের বুক চিরিয়া তিনি মানুষের যাহা স্পৃহনীয়, যাহা বরণীয় সেই সকল কল্যাণ-সম্পদকে প্রকট করিতেছেন। [আলস্য দূর হউক, সংশয়ের নিবৃত্তি হউক, হতাশা-মোহ-ভয় পরিহার করিয়া উন্নতির পথে, আলোকের পথে অগ্রসর হও।]

কথাপ্রসঙ্গে

আমাদের নববর্ষ

এই মাঘে উদ্বোধনের ৫৮তম বর্ষ আরম্ভ হইল। পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং হিতৈষী বন্ধুমণ্ডলীর সহিত একযোগে শ্রীভগবানের আশীর্বাদ চাহিয়া আমরা নূতন বৎসরের কর্মোদ্যম গ্রহণ করিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৩০৫ সালের ১লা মাঘে প্রকাশিত ইহার প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনা লিখিয়া দেন। উহাতে তিনি আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ ও দায়িত্ব তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা নূতন করিয়া আজ স্মরণ করি। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি ঐ প্রস্তাবনা হইতে।

উক্ত প্রবন্ধটির প্রারম্ভে তিনি প্রাচীন ভারতের "জয় পতাকা"র উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই পতাকা রাজ্যজয়ের পতাকা নয়—"প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে" ভারতাত্মা যে চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবসম্পদ আহরণ করিয়াছেন উহাদেরই বিজয়-কেতন। "জীর্ণ ও বাত্যাহত" হইয়াও ভারতের 'জয় পতাকা' যে আজিও উড়িতেছে ভারতবাসীর এই আত্মচেতনা যেন সর্বাগ্রে জাগ্রত হয়। "নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।"

কিন্তু শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই পৃথিবী নয়, ভারতের কীর্তিই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কীর্তি নয়। তাই আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের জয়পতাকার সহিত অপর দেশের বিজয়-নিশানের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। "ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যবিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক…অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশী সমন্বিত…অটলঅধ্যবসায়সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।" স্বামীজী প্রাচীন গ্রীকদের কথা বলিতেছিলেন। "মনুষ্য ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া (স্বামীজী ইহা ১৮৯৮ সালে লিখিয়াছিলেন) ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।"

প্রাচীন ভারতীয় জাতি আজ নাই, প্রাচীন গ্রীক জাতিও আজ অন্তর্হিত, কিন্তু "তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান।" দুই বিভিন্ন জীবন-রীতির সমন্বয় আজ নূতন করিয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের সাক্ষ্য আছে পূর্বে যখন ভারতবর্ষের সহিত গ্রীস বা গ্রীক জীবনাদর্শে গঠিত অপর পাশ্চাত্ত্যদেশসমূহের সম্মিলন ঘটিয়াছে তখন উহাতে উভয়েরই কল্যাণ হইয়াছে। স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন সত্ত্বগুণের নামে ঘোর তামসিকতা, পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিন্দিত মূর্খতা, বৈরাগ্যের নামে অকর্মণ্যতার এবং তপস্যার নামে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয়দান নূতন ভারতের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়; তাই তিনি ভারতবাসীকে অকুণ্ঠিতচিত্তে পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শ হইতে "উদ্যম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভর, অটল ধৈর্য, কার্যকারিতা, একতাবন্ধন, উন্নতিতৃষ্ণা…… শিক্ষায়

শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ" গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল—"ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে।" ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য—"এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য" বলিয়া স্বামীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন। পত্রিকাপ্রতিষ্ঠাতার এই নির্দেশ বহন করিয়া আমরা বিগত সাতায় বৎসর চলিয়া আসিয়াছি। নূতন বৎসরেও তাঁহার নির্ণীত ব্রতই থাকিবে আমাদের জীবনব্রত।

প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় নিশ্চিতই সহজ কথা নয়। ইহা কর্মে রূপায়িত করিবার কোন সহজ 'ফরমুলা'ও নাই। তবে এই সমন্বয়ের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রখর পর্যবেক্ষণ এবং উন্মুক্ত দৃষ্টি। সমন্বিত জীবন পাইতে গেলে আমাদিগকে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, বহু মোহ বর্জন করিতে হইবে, অনেক কষ্টকে আলিঙ্গন করিয়া বহু নূতন অভ্যাস গড়িতে হইবে। পদে পদে আসিবে অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি। সেগুলিকে ধৈর্য সহকারে জয় করিতে হইবে। প্রাচীনের মধ্যে যাহা শাশ্বত, শক্তিপ্রদ, মঙ্গল, অতি-নূতনপন্থীদের সহস্র ভ্রূকুটি, সমালোচনা সত্ত্বেও সেগুলিকে আমরা নিশ্চিতই সযত্নে রক্ষা করিব। আবার নবীনের ভিতর যাহা তেজস্বী, সর্বজনহিতকর সেগুলিকে আমরা সোৎসাহে অনুশীলন করিব অতি-প্রাচীননিষ্ঠেরা যতই কেন কুণ্ঠা ও প্রতিবাদ প্রকাশ করুন। বহুযুগের ঘাত-প্রতিঘাতে জাতীয় জীবনে যে দুর্বলতা, যে কুসংস্কার, সঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের উপর আমাদের যেমন অন্ধমোহ থাকিবে না, তেমনই আমরা প্রশ্রয় দিব না পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার সেই বিষয়গুলিকে যেগুলি শুধুই চাকচিক্য ও আড়ম্বর বহন করে।

একটি বিষয়ে আমরা বিশেষ সতর্ক থাকিব—নেতা বিবেকানন্দেরই উপদেশ। উহা এই যে, বর্জনে বা গ্রহণে আমাদের দৃষ্টিকে রাখিতে হইবে "দ্বেষ-বুদ্ধিবিরহিত" আর "ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই" যেন আমরা উন্মুখ থাকি।

"তোমাদের চৈতন্য হোক্"

গত ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৬ দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু উৎসবে' সহস্র সহস্র নরনারী সোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার কাঁকুড়গাছি উদ্যানে (যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবিতকালে গিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহভস্মের কিয়দংশ বর্তমান মন্দিরের বেদিতলে প্রোথিত হইয়াছিল) প্রথম এই উৎসবের প্রবর্তন করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে ঐ 'যোগোদ্যান' বেলুড়মঠের অন্তর্গত হইবার পরও তথায় কল্পতরু উৎসব প্রতিবৎসর যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, এবারও হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতির সহিত জড়িত এই তিনটি বিশেষ স্থান ব্যতীত অপর নানা জায়গাতেও ১লা জানুয়ারী কল্পতরু উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে।

কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া আনুমানিক ত্রিশ জন ভক্তকে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং "তোমাদের চৈতন্য হোক্" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এই আশীর্বাদ ছিল সম্পূর্ণ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত এবং উহা একটি প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে সংক্রামিত হইয়া কৃপাপ্রাপ্ত ঐ ভক্তগণের প্রত্যেককে সেই দিন অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক আলোক ও শান্তি দান করিয়াছিল। ইহাই কল্পতরু উৎসবের ঐতিহাসিক ভিত্তি। 'কল্পতরু' কথাটি মহাত্মা রামচন্দ্র এবং তাঁহার কতিপয় ভক্ত-বন্ধুদের উদ্ভাবিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত প্রামাণিক জীবনী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের লেখক পূজ্যপাদ স্বামী

সারদানন্দজী ১লা জানুয়ারীর ঘটনাকে 'আত্ম-প্রকাশে অভয়-প্রদান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্বর্গলোকের কল্পতরু তাহাকে সেই অভীষ্ট ফল দিয়া থাকে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেইদিনকার দান ছিল কল্যাণকর সত্যোপলব্ধির দান, তাই তাঁহাকে 'কল্পতরু'র সহিত উপমিত করা লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে যুক্তিযুক্ত নহে।

যাহা হউক, কল্পতরু উৎসবের জনপ্রিয়তা যে ভাবে প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে ঐ বহু বৎসরের প্রচলিত নামটির পরিবর্তন আর সম্ভবপর নয়, কিন্তু ঐ উৎসবের অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক অনুধ্যান প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'আত্মপ্রকাশে অভয়দান' নিশ্চিতই শুধু সত্তর বৎসর আগেকার ১লা জানুয়ারীর সেই ত্রিশজন সৌভাগ্যবান্‌দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উত্তরকালীন গ্রহণোন্মুখদের জন্যও যুগাবতারের সেই প্রকাশ ও অভয় সঞ্চিত হইয়া আছে। তাঁহার আশীর্বাদের ভাষা "তোমাদের চৈতন্য হোক্" বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। মানুষের যত সঙ্কট, সঙ্কীর্ণতা, মোহ, ভয়, দৈন্য—ইহাদের প্রধান কারণ হইল মানুষের না-জানার, না-বুঝার সংগ্রহ। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই সার্থকতা। শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, লৌকিক জীবনেও মানুষ যত জ্ঞানদীপ্ত হইতে পারিবে ততই তাহার সমস্যাসমূহ কমিয়া আসিবে। মানুষের পরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য যে চৈতন্যরূপে তাহার নিজের ভিতরেই রহিয়াছেন, আর ধর্মসাধনা অর্থে যে সেই চৈতন্যেরই উপলব্ধি—এই সর্বজনীন সত্যটিই ঠাকুরের আশীর্বাদের ভাষায় অভিব্যক্ত। মানুষের সত্য, মানুষের উপাস্য ভগবানেরও সত্য চৈতন্যাত্মকতাতে। ধর্মে ধর্মে সাম্য ভগবানের এই চৈতন্যস্বরূপতার উপলব্ধিতে। মানুষে মানুষে মিলন সম্ভবপর মানুষের এই বিশ্বাত্মক চৈতন্য-সত্তার দিকে তাকাইয়াই। ত্রিশ জনকে সেদিন স্পর্শ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উর্ধ্বলোক হইতে কোন আলোক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই, তাঁহাদেরই রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে যে নির্মল আত্মসত্য জল্‌জ্বল্ করিতেছে সেই সত্যকেই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সেই সত্যকেই নানা লোকে নানা নাম দিয়া মহিমান্বিত করে, উপাসনা করে। ভগবানের বহুবিধ কল্পনা থাকিতে বাধা নাই, কিন্তু সকল কল্পনার আশ্রয় সেই এক বস্তু—আত্ম-চৈতন্য। ইহা উপনিষদের শাশ্বত বাণী—শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বাণীতেই নূতন করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া গেলেন—"তোমাদের চৈতন্য হউক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিলেন আমাদের চৈতন্য হউক। আমরা যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছি সেখান হইতেই আমাদের সংস্কার, শক্তি ও প্রবণতানুযায়ী যেন অন্তরের চৈতন্যকে ধরিতে পারি, বুঝিতে পারি। কাহারও পথ ভক্তির, কাহারও কর্মের বা তত্ত্ব-বিচারের, কাহারও যোগের—কিন্তু সকল পথের সিদ্ধিই এক দ্বার দিয়া আসিবে—চৈতন্যের দীপ্তি। যে যত চৈতন্যালোকে নিজকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিবে, সে তত ঐহিকতা, সঙ্কীর্ণতা, ভোগলোলুপতা হইতে মুক্ত হইবে—সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ততই তাহার চরিত্রকে করিবে উজ্জ্বল। নরদেহে সে হইবে দেবতা। ইহাই মানুষের ঈপ্সিততম সম্ভাবনা। শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন আমরা যেন দেবতা হই, আমাদের সুপ্ত সম্ভাবনা যেন পরিপূর্ণরূপে বাস্তব হইয়া উঠে।

আমাদের চৈতন্য হউক। বর্ণ, জাতি, চরিত্র, অবস্থা, সংস্কার, ধর্ম—এ সকল বিভেদ সত্ত্বেও সকল মানুষ যেখানে এক—যাহা লইয়া এক—সেই মান-বাত্মার সত্য যেন আমরা আবিষ্কার করিতে পারি। এই আবিষ্কারের দ্বারাই আসিবে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে মিলন, পারস্পরিক শান্তি ও সামঞ্জস্য। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ সারা বিশ্বকে এক করিতে চাহিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব স্মরণে

আগামী ২০শে মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৪তম জন্মতিথি। প্রতিবৎসর এই সময়ে নানা প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় জীবনে এই অন্যতম শক্তিসঞ্চারক মহাপুরুষের স্মৃতিপূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার বাণী স্মরণ করিলে প্রাণে নূতন বল ও আশা জাগ্রত হয়। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের সনাতন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের যাহা চিরন্তন আদর্শ—পারমার্থিক সত্য-লাভ—সেই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে তাঁহাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবী-বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ বিকাশ ও সার্থকতা সম্বন্ধে বহু ইঙ্গিতও দিয়া গিয়াছিলেন। সে সকল উক্তি উত্তরকালে অক্ষরে অক্ষরে স্বামীজীর জীবনে সত্য হইয়াছিল।

মানব-চরিত্রের আধ্যাত্মিকতা সকলের নিকট সমাদর পায় না, সমাদর করা কঠিনও বটে—তাই স্বামী বিবেকানন্দের উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন বহু ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অনুরাগী তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতা সন্ন্যাসী বলিয়া নয়, স্বামীজীর অনন্যসাধারণ দেশপ্রেম এবং দুর্গত জনগণের প্রতি তাঁহার অভিনব জ্বলন্ত সহানুভূতির জন্য। এই শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আংশিক হইলেও কল্যাণকর এবং প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। বিবেকানন্দের ভগবৎ-সাধনাকে না মানিয়াও তাঁহার দেশসেবার আদর্শ যদি আন্তরিকভাবে কেহ শুধু ঔপপত্তিক অনুমোদন দ্বারা নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই স্বামীজীর (যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন) অপ্রীতিভাজন হইতেন না। কেননা, স্বামী বিবেকানন্দের নিকট 'দেশ ও জনগণ' তাঁহার 'ভগবান' হইতে বিযুক্ত ছিল না। কেহ যদি নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ এবং মানযশের আশা ত্যাগ করিয়া মানুষের সেবায় নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সে যে 'আধ্যাত্মিক' উন্নতির পথেই অগ্রসর হয় ইহা স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর নানাস্থানে সুস্পষ্ট উল্লিখিত দেখিতে পাই। স্বামীজী পুরাপুরি 'আধ্যাত্মিক' ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট 'লৌকিক' বলিয়া কিছু ছিল না। বিশ্বজগৎ তাঁহার নিকট ভগবৎ-সত্তায় দেদীপ্যমান ছিল এবং সেইজন্য জগতের সেবাকে তিনি নারায়ণেরই সেবা বলিতে পারিয়াছিলেন। ইহা স্বামীজীর নিজস্ব কথা নয়—ভারতবর্ষের সনাতন উপনিষদেরই সিদ্ধান্ত আর উপনিষদ্ বা বেদান্তকে যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন ভারতের সেই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়েরও বহু-প্রচলিত নীতি। মোক্ষের জন্য প্রযত্ন এবং জগদ্ধিত—ইহা ভিক্ষুগণের প্রতি তথাগত বুদ্ধেরও উপদেশ। আচার্য শঙ্করের জীবনও ছিল এই যুগ্ম-সাধনার উদাহরণ। শঙ্কর শুধু জ্ঞান-ভক্তির পঠন-পাঠনই করেন নাই, বিশাল ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নয়নের বহু প্রচেষ্টাও যে করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশসেবার আদর্শ আজ নানাভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু যত ব্যাপকভাবে উহা বর্তমান স্বাধীন ভারতের যুবক-সমাজের জীবনে বাস্তব রূপ লওয়া উচিত তাহা নিশ্চিতই হইতেছে না। দেশবাসীর নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয় না। দেশের গঠনমূলক বিবিধ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিবার জন্য আগে চাই মানব-দরদী চরিত্রবান খাঁটি মানুষ। রাজনৈতিক উত্তেজনা এক জিনিস, আর লোকমান্য, বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিয়া নীরবে, বিনা আড়ম্বরে, ধীরভাবে সমাজের নিষ্কাম সেবা করিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। এই দ্বিতীয় প্রকার কাজের

জন্য চাই বিপুল চরিত্রবল, উদার সহানুভূতি, ত্যাগ, সাহস। স্বাধীন ভারতে যুবকগণের মধ্যে রাজনীতি চর্চার অপেক্ষা এই দ্বিতীয় প্রকার কাজে আত্ম-নিয়োগই অধিকতর প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আলোচনা ও অনুসরণে এই দিকে যুবকগণ প্রচুর প্রেরণা পাইবেন। এই কাজের জন্য কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তির অপেক্ষা নাই। সেবার কত না ক্ষেত্র দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। জাতীয় সরকারও বহুতর সহায়তা দিতে প্রস্তুত। চাই এখন দলে দলে উৎসাহী কর্মিগণ যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত স্বার্থত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নর-নারায়ণের পূজার জন্য শরীর-মন নিয়োজিত করিবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁহার আর একটি কথাও দেশবাসীর বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন—

"মানব-জাতিকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রবুদ্ধ করাই ভারতের মূল জীবনব্রত, তাহার অস্তিত্বের পরম প্রতিষ্ঠা, চরম সার্থকতা। তাতার, তুর্কী, মোগল বা ইংরেজের শাসন সত্ত্বেও এই জীবনধারা অব্যাহত রহিয়াছে। * * * ভারত যে অমূল্য আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী এবং যে রত্নরাজি সে শত শত শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্যেও সযত্নে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, তাহারই দিকে সারা পৃথিবী আজ সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ পরিণতির জন্য চাহিয়া আছে।"

ইহা যে স্বামীজীর অলস স্বপ্ন নয় তাহা দিন দিনই সমসাময়িক ইতিহাস হইতে ক্রমশঃ প্রমাণিত হইতেছে। দেশের নেতৃবর্গের এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর এই বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা বাঞ্ছনীয়।

তমলুকের শিক্ষা

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন বর্তমান তমলুক হইতে একটি মহৎশিক্ষা লইতে পারে। সুযোগ ও পরিবেশ পাইলে বাঙ্গালীর ছেলে যে সর্ববিধ শ্রমের কাজ দ্বারা জীবিকার্জনে সক্ষম তাহার একটি বাস্তব নিদর্শন তমলুক শহরে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রিক্সা টানে বাঙ্গালী, মোট বয়, নৌকা চালায়, লরী বোঝাই করে, মজুর খাটে বাঙ্গালী, ছোট বড় দু চারটি ছাড়া সব দোকানই বাঙ্গালীর, ধোপা নাপিত মুচি প্রভৃতিও অধিকাংশই বাঙ্গালী। বাঙ্গালী মুটে এখানে ২ মণ পর্যন্তও বোঝা বহিতে পারে। দেশবিভাগে বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবন শুধু চাকুরির দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার নয়। তমলুকের দৃষ্টান্ত যদি রাজধানী কলিকাতাতেও বাস্তব হইয়া উঠিত তো হাজার হাজার বেকার লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারিত। সুখের বিষয় কায়িক পরিশ্রমকে ছোটকাজ বলিয়া মনে করিবার অভ্যাস ক্রমশই আজ শিথিল হইয়া আসিতেছে। সেদিন আমরা কলিকাতার পথে পূর্ববঙ্গের একটি উদ্বাস্তু যুবককে হাতে টানা রিক্সা চালাইতে দেখিয়াছিলাম। নাম জিজ্ঞাসা করিতে সে যখন ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিল সে অমুক বসু—কায়স্থের ছেলে তখন আমরা বড়ই আনন্দ বোধ করিয়াছিলাম। এই বাঙ্গালী যুবকের উদাহরণ রাজধানী এবং বাঙ্গলার প্রত্যেকটি শহরে ব্যাপক-ভাবে ছড়াইয়া পড়ুক। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের যাবতীয় কাজ বাঙ্গালী তাহার নিজের শ্রমে সম্পাদন করুক। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে ইহাই দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশ কেন ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে ?

তবে তমলুকের আর একটি শিক্ষা আছে। উহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। চার পাঁচ বৎসর হইল কয়েকজন অবাঙালী ঠিকাদার তমলুকে পান চালানের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। আশেপাশের গ্রাম হইতে পান সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা আমেদাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে চালান দেন। এই ব্যবসায়সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে (যেমন পানবাছাই, বোঁটা কাটা, গাঁট তৈরী করা, লরী বোঝাই প্রভৃতি) ঠিকাদাররা বাঙ্গালী শ্রমিক নিযুক্ত করেন না। নিজদের দেশ হইতে

শ্রমিক লইয়া আসেন। (ইহা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিকই)। বর্ত্তমানে এইকাজে প্রায় দুইশত অবাঙালী শ্রমিক রহিয়াছে এবং উত্তরোত্তর এই সংখ্যা বাড়িবার মুখে। প্রাদেশিকতার কলঙ্ক গায়ে না মাখিয়া জাতীয় জীবনে স্বাবলম্বনের সর্ববিধ প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী জনসাধারণ উদ্‌বুদ্ধ হউন।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সে দিন অসীম ব্যোম করিছে আলোক-হোম
প্রভাত বেলায়;
আনন্দ-কল্লোল তুলি গাহিছে বিহগগুলি
বৃক্ষের শাখায়;
বিকচ কুসুমবালা মকরন্দ-গন্ধ-ডালা
করেছে ধারণ;
শমনে শাসন ক'রে জীবের পোষণ তরে,
ফিরে সমীরণ।

হে বিবেক, সেই ক্ষণে মেলি' আঁখি, স্নিগ্ধ মনে.
নেহারিলে তুমি,
স্বর্গে আর তুমি নাই, হয়েছে তোমার ঠাঁই
এই মর্ত্যভূমি।
স্বর্গের সৌরভযুত, কেশবের করচ্যুত
তুমি সে কমল,
সংসারের সরোবরে মায়ার তরঙ্গে প'ড়ে
হইলে চঞ্চল।

সেই হতে, তব প্রাণ জ্বেলে দীপ অনির্বাণ
করে অন্বেষণ,
কোথা সেই অণীয়ান্, কোথা সেই মহীয়ান্,
বিশ্বের শরণ।
বিদ্রূপের কোলাহল তোলে নর-নারীদল,
হাসে বারবার;
পরিজন অন্নহারা, ধূলায় লুটায় তারা,
করে হাহাকার;
তথাপি, তোমার হিয়া সেই মহাতৃষা নিয়া
ভ্রমে যথা-তথা;
জিজ্ঞাসে জঙ্গম-জড়ে, জিজ্ঞাসে নারী ও নরে
সে পরম কথা।

এক দিন, তার পরে, শ্রীধাম দক্ষিণেশ্বরে
হয়ে উপনীত,
কর তুমি দরশন, কর তুমি পরশন
সে আলো সচ্চিৎ।
তার পরে, সে আলোকে হের তুমি মর্ত্যলোকে
মায়া মেঘে ঢাকা;
সে বিহগ মহাকাশে নাহি উড়ে—স্বার্থপাশে
বদ্ধ তার পাখা।

তখন তোমার বুকে, তখন তোমার মুখে
বাজে তূর্য-রব—
"পাঁকে প'ড়ে, একেবারে ভুলেছ কি আপনারে,
হে মুগ্ধ মানব!
এই পাঁকে পদ্ম হয়ে সুবাস-সুষমা লয়ে
ওঠ তুমি ফুটি';
ধ্বান্তারির আলোরাশি উল্লাসে পড়ুক আসি'
বক্ষে তব লুটি'।
যেথা দুখ, যেথা তাপ, যেথা মহা অভিশাপ,
যেথা ধূলি-মল,
যাও তুমি সেইখানে, কর আত্ম-অশ্রুদানে
শীতল, নির্মল।
স্বর্গ-সুখ দূরে নয়,— সে তব নিকটে রয়
—রহে অন্তরালে;
খোঁজ ত্যাগ-দীপ লয়ে, একদা, প্রকট হয়ে,
লাগিবে সে ভালে।"

ধর্মের রূপায়ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্বে অপ্রকাশিত)

[স্বামীজী এই বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলামেডা (Alamada) শহরের (কালিফর্নিয়া) একটি হলে (Tuckör Hall)। আইডা আনসেল নাম্নী জনৈকা শ্রোত্রী তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত অনুধ্যানের জন্য ভাষণটির সাঙ্কেতিক লিপি লইয়াছিলেন। মৃত্যুর (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫৫) কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁহার সাঙ্কেতিক লিপি হইতে স্বামীজীর ১৩টি বক্তৃতা উদ্ধার করিয়া লিখিয়া যান। মূল ইংরেজী বক্তৃতাগুলি হলিউড বেদান্ত সোসাইটির মুখপত্র Vedanta and tho West পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। বর্তমান ভাষণটি 'Tho Practice of Roligion' সংজ্ঞায় ঐ পত্রিকার May-Juno, 1955 সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর কতকগুলি কথা ধরিতে পারেন নাই সেখানে চিহ্ন দেওয়া আছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যেকার অংশ স্বামীজীর ভাব পরিস্ফুটনের জন্য লিপিকার কর্তৃক সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। —উঃ সঃ]

আমরা অনেক বই, অনেক শাস্ত্র পড়িয়া যাই। শিশুকাল হইতে আমাদের মাথায় নানা ভাব জমিতে থাকে, সেগুলি আবার মাঝে মাঝে বদলাইয়াও যায়। এইরূপে পুঁথিগত ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা বোধ জন্মে এবং আমরা মনে করি যে, কার্যকরী ধর্ম জিনিসটাও আমরা বুঝিয়া ফেলিয়াছি। কার্যকরী ধর্ম (Practical religion) বলিতে আমার কি ধারণা তাহা এখন তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

কর্মে ধর্মের রূপায়ণ লইয়া সর্বত্রই আমরা কত আলোচনাই শুনিতে পাইতেছি। সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখি যে, উহারা এই একটি মূল ভাবে দাঁড়ায়—মানুষের প্রতি দাক্ষিণ্য। কিন্তু ইহাই কি ধর্মের সব? এই দেশে (আমেরিকায়) প্রতিদিনই যে আমরা 'কর্মে পরিণত খ্রীষ্টধর্মের' (Practical Christianity) কথা শুনিয়া থাকি—অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তাঁর মানুষ-ভাইদের জন্য অমুক সৎকাজ করিয়াছেন ইত্যাদি—ইহাই কি সব?

জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই সংসারই কি জীবনের লক্ষ্য? ইহার বেশী আর কিছু নয়? আমরা যাহা আছি তাহাই মাত্র রহিয়া যাইব, তদতিরিক্ত কিছু নয়? মানুষকে কেবল, কোথাও বাধা না পাইয়া মসৃণভাবে-চলিতে-থাকা একটি যন্ত্রে পরিণত হইতে হইবে? আজ সে যে-সকল দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে এইগুলি ছাড়া তাহার আর কিছুর প্রয়োজন নাই? ···

অনেকগুলি ধর্মেরই সর্বোচ্চ কল্পনা হইল সংসার ·। মানুষের এক বিপুল অংশ স্বপ্ন দেখিতেছে কবে সেই দিন আসিবে যখন রোগ থাকিবে না, অসুস্থতা থাকিবে না, দারিদ্র্য বা কোনও প্রকার দুঃখকষ্ট থাকিবে না—সব দিক দিয়া তাহাদের সময়টি যাইবে চমৎকার। অতএব 'কার্যকরী ধর্মের' সহজ অর্থ দাঁড়ায় এই—"রাস্তা পরিষ্কার কর। উহাকে বেশ ঝকঝকে বানাও।" আর এইরূপ অর্থ শুনিলে সকলে যে কত খুশী হয় তাহা তো আমরা দেখিতেই পাইতেছি!

জীবনের উদ্দেশ্য কি ভোগ-সুখ? তাহাই যদি হইত তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করাটাই তো মস্ত ভুল। একটি কুকুর বা বিড়াল যেরূপ লালসার সহিত খাদ্যদ্রব্য উপভোগ করে কোন মানুষ সেরূপ পারে কি? চিড়িয়াখানায় গিয়া দেখ—(বন্যপশুরা) কি ভাবে হাড় হইতে মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। যাও, তবে ফিরিয়া যাও—পক্ষীরূপে জন্মাও। ···মানুষ হইয়া আসা তবে কী ভুলই হইয়াছে! আমার এত বৎসরের—শত শত বৎসরের সংগ্রাম যদি শুধু একটি ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সু মানুষ হইবার জন্যই হয় তাহা হইলে সবই ব্যর্থ।

অতএব লক্ষ্য কর, 'কার্যকরী ধর্মের' যে সাধারণ মতবাদ—উহা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়। দান খুব ভাল, কিন্তু যে মুহূর্তে বল যে ইহাই সব তখনই জড়বাদে গিয়া হাজির হইবার বিপদ থাকিয়া যায়। উহা ধর্ম নয়। উহা প্রায় নাস্তিকতারই সামিল। ···তোমরা—খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা বাইবেলে কি সমাজের জন্য কাজ করা, হাসপাতাল···নির্মাণ—ইহা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাইলে না? ··· এই এখানে একজন দোকানদার দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, যীশু কি ভাবে দোকানটি সাজাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আমি বলিতে পারি, যীশুর কখনও সেলুন রাখিবার বা দোকান সাজাইবার কিংবা কোন সংবাদপত্র সম্পাদনা করিবার প্রবৃত্তি হইত না। ঐ ধরনের 'কার্যকরী ধর্ম' কিছু খারাপ নয়, তবে উহা ধর্মের প্রথম পাঠ মাত্র। উহা কোন স্থির লক্ষ্যে লইয়া যায় না · । তোমরা যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও যথার্থ খ্রীষ্টধর্মানুসরী হও এবং প্রত্যহ এই প্রার্থনা কর—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—তবে একটু ভাবিয়া দেখ তো, উহার অর্থ কি। প্রতি মুহূর্তে তোমরা বলিতেছ, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" কিন্তু তোমাদের মনোগত ভাব হইল,—"হে ভগবান, আমার ইচ্ছা তোমার দ্বারা পরিপূর্ণ হউক।" যিনি অনন্ত তাঁহাকে যেন বসিয়া বসিয়া স্বকীয় পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করিতে হইবে! এমনকি, তিনি যেন ভুলভ্রান্তিও করিয়াছেন আর তুমি ও আমি সেগুলি সংশোধন করিতে বসিয়াছি! যিনি বিশ্বজগতের নির্মাতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবে কতকগুলি সামান্য ছুতার। ভগবান যেন সংসারকে একটি আবর্জনাপূর্ণ গর্ত করিয়া রাখিয়াছেন আর তুমি ও আমি চলিতেছি উহাকে একটি সুরম্য স্থানে পরিণত করিতে!

এই সবের শেষ কোথায়? ইন্দ্রিয়বেদ্য সুখ-সম্ভোগ কি কখনও চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে? এই জীবনকেই কি আত্মার পরম গতি মনে করিতে পারি? যদি তাহাই হয় তবে এই ক্ষণেই মরণকে বরণ কর, এই জীবন চাহিও না। শুধু একটি নিখুঁত যন্ত্র হওয়াই যদি মানুষের বিধিলিপি হয় তবে, তাহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমাদের প্রগতি চলিয়াছে গাছ পাথর প্রভৃতির অভিমুখে। একটি গরুকে কখনও মিথ্যা বলিতে শুনিয়াছ কি? অথবা কখনও দেখিয়াছ কি একটি গাছ চুরি করিতেছে? ইহারা যেন যন্ত্র-বিশেষ, কখনও ভুল করে না। ইহাদের জগতে সব কিছু স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে······।

'কার্যকরী ধর্ম' নিশ্চিতই ইহা হইতে পারে না। উহার আদর্শ তবে কি? কেন আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি? উত্তর - স্বাধীনতার জন্য, জ্ঞানের জন্য। আমরা যে জ্ঞানার্জন করিতে চাই উহা শুধু নিজদিগকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই। আমাদের জীবন মানে ইহাই—স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য একটি বিশ্বতোব্যাপ্ত আকৃতি। কি ইহার কারণ··· বীজ ফাটিয়া অঙ্কুর বাহির হয়, অঙ্কুর মাটি ভেদ করিয়া গাছরূপে দাঁড়ায়, গাছ উর্ধ্ব আকাশে মাথা তুলিতে চায়? সূর্য পৃথিবীকে কোন্ অর্ঘ্য দিয়া যায়? মানুষের জীবনটি কি? মুক্তির জন্য ঐ এক সংগ্রাম। প্রকৃতি চাহিতেছেন সব দিক দিয়া আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে আর আত্মা চাহিতেছেন আপনাকে প্রকাশ করিতে। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। এই স্বাভিব্যক্তির প্রচেষ্টায় অনেক কিছু নিষ্পেষিত হইবে, ভাঙিয়া চুরিয়া পড়িবে। আর যাহাকে আমরা দুঃখ বলি তাহা তো ইহাই। সংগ্রামক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ধূলাবালি না উড়িলে চলিবে কেন? প্রকৃতি বলিতেছেন,—"আমি জয় করিব।" আত্মা উত্তর দেন,—"না আমাকেই বিজেতার আসন লইতে হইবে।" প্রকৃতি বলেন,—"থামো, তোমাকে একটুখানি সুখের আস্বাদ দিয়া ঠাণ্ডা রাখি।" আত্মা একটু ভোগ করেন, ক্ষণিকের জন্য তাঁহার ভ্রান্তি আসে, কিন্তু পর-

মুহূর্তে তিনি (মুক্তির জন্য কাঁদিয়া উঠেন।) যুগ যুগ ধরিয়া প্রতি বক্ষে যে অনন্ত ক্রন্দন গুমরাইয়া উঠিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? দারিদ্র্য দ্বারা আমরা লাঞ্ছিত হই। আসে ধন। ধনও আবার আমাদের বঞ্চনা করে। অজ্ঞান দ্বারা আমরা দিশাহারা হই। পড়াশুনা করি, বিদ্বান হই। সেই বিদ্যাই আবার আমাদিগকে করে প্রতারিত। কোন ব্যক্তিই কখনও সন্তুষ্ট নয়। ইহা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি, কিন্তু ইহা আবার সকল প্রকার সুখেরও কারণ। ইহাতেই তো নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, এই সংসার লইয়া মানুষ কখনও মাতিয়া থাকিতে পারে না। কাল যদি এই পৃথিবী স্বর্গ হইয়া যায় আমরা বলিব,—"ইহা ফিরাইয়া লও। আমাদিগকে অন্য কিছু দাও।"

অনন্ত মানবাত্মা কেবল অনন্তেরই দ্বারা তৃপ্তি-লাভ করিতে পারে, অন্য কোন প্রকারেই নহে। অনন্ত বাসনা শান্ত হইবে শুধু অনন্ত জ্ঞান আনিয়া—একটুও ঘাটতি পড়িলে চলিবে না। কত পৃথিবী আসিবে যাইবে। তাহাতে কি? আত্মা থাকিয়া যান, চিরদিন বিস্তারলাভ করেন। বিশ্ব জগৎকেই তো আত্মার নিকটে আসিতে হইবে। মহাসমুদ্রে বারিবিন্দুর মতো কত জগৎ আত্মাতে লয় পাইবে। আর ক্ষুদ্র এই সংসার—ইহা হইবে আত্মার লক্ষ্য! আমাদের যদি সাধারণ বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে আমরা কখনও সংসারে তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারি না, যদিও সকল যুগে কবিরা আত্মসন্তুষ্টির কথা বলিতে চাহিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ তো বলিয়া গেলেন—"তোমার ভাগ্য লইয়া খুশী থাকো।" —কিন্তু কই, এ পর্যন্ত কেহ তো সন্তুষ্ট রহিল না। আমরা নিজেরাও নিজদিগকে কত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি শান্ত ও তৃপ্ত থাকা যাক্, কিন্তু তবুও তো আমরা ঐরূপ থাকিতে পারি না। যিনি অনন্ত তাঁহার বুঝি ইহাই বিধান যে, এই পৃথিবীতে, ইহার উপরে বা নীচে কোথাও কোন কিছুই মানবাত্মাকে চিরতৃপ্ত রাখিতে পারিবে না। আত্মার বিশাল আকাঙ্ক্ষার নিকট অগণিত তারাদল, স্বর্গাদি লোকসমূহ, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি নিন্দিত ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের অতৃপ্তির ইহাই তাৎপর্য। বাসনামাত্রই অশুভ যদি না উহার যথার্থ মর্ম, উহার লক্ষ্য ধরিতে পার। সারা প্রকৃতি তাহার প্রতি অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া শুধু একটি জিনিসের জন্য ক্রন্দনরোল তুলিতেছে—পূর্ণ স্বাধীনতা।

ধর্মের রূপায়ণ অর্থে এই নির্বাধ স্বাধীনতা-প্রাপ্তি। এই সংসার যদি ঐ লক্ষ্যপথে আমাদিগের সহায় হয় ভাল কথা, নতুবা যদি উহা আমাদিগের সহস্র বন্ধনের উপর আর একটি নূতন ফাঁস পরাইতে শুরু করে তাহা হইলে উহাকে বলিব অশুভ। সম্পত্তি, বিদ্যা, রূপ বা অন্য যাহা কিছু—যতক্ষণ ইহারা উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার সহায়ক ততক্ষণই তাহাদের কার্যকরী মূল্য। আর যেই ইহাদের নিকট হইতে ঐ মুক্তির লক্ষ্যে সহায়তা বন্ধ হইয়া যায় অমনি উহারা হইয়া দাঁড়ায় মূর্তিমান বিপদস্বরূপ। অতএব কার্যকরী ধর্ম কাহাকে বলি? ইহলোক বা পরলোকের বিষয়সমূহকে কাজে লাগাও, কিন্তু মাত্র এক উদ্দেশ্যে—স্বাধীনতায় পৌঁছিবার জন্য। প্রত্যেকটি ভোগ, প্রতিটি তিল সুখ পাইতে হইবে অনন্ত হৃদয়-মনের সম্মিলিত শক্তি ব্যয় করিয়া।

এই পৃথিবীতে ভাল ও মন্দের মোট পরিমাণের দিকে তাকাইয়া দেখ। উহার কি অদলবদল হইয়াছে? কত যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং কত বৎসর ধরিয়া মানুষ ধর্মকে কর্মে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকবার সে মনে করিয়াছে এবার বুঝি সমস্যার সমাধান হইল। কিন্তু সমস্যা একই রহিয়া গিয়াছে। বড় জোর উহার আকৃতিটি বদলাইয়াছে মাত্র ....। বিশ হাজার দোকানে যক্ষ্মা ও স্নায়বিক ব্যাধি লইয়া ব্যবসা চলিতেছে ... .। ইহা যেন পুরাতন ব্যাতব্যাধির মতো।

এক অঙ্গ হইতে যদি সরিল তো শরীরের অন্য স্থানে গিয়া দেখা দিবে। একশত বৎসর পূর্বে মানুষ পায়ে হাঁটিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া চলাফেরা করিত। এখন সে রেলগাড়িতে চড়িয়া সুখী, কিন্তু তাহার দুঃখও বাড়িয়াছে, কেননা তাহাকে এখন বেশী রোজগারের জন্য অনেক খাটিতে হয়। প্রত্যেকটি যন্ত্র শ্রম বাঁচায় বটে কিন্তু শ্রমিকের উপর আনে অধিকতর চাপ।

এই বিশ্বজগৎ বা প্রকৃতি বা অন্য যে কোন নাম দাও—ইহা সসীম হইতে বাধ্য, ইহার পক্ষে কখনও অসীম হওয়া সম্ভবপর নয়। অনন্ত যদি প্রকৃতি-রূপে অভিব্যক্ত হন তবে তাঁহাকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেই হইবে। শক্তির (আমাদের হাতে যাহা) মাত্রা তো নির্দিষ্ট। এক জায়গায় যদি উহা খরচ কর তো অন্য জায়গায় কম পড়িবে। মোট পরিমাণ একই থাকিবে। এক স্থানে যদি ঢেউ উঠে তো অন্য স্থানে গর্ত দেখা যায়। একটি জাতি যদি সমৃদ্ধি লাভ করে তো অপর জাতিগুলিকে হইতে হয় দারিদ্র্য-পীড়িত। শুভ অশুভের সহিত পাল্লা দেয়। ঢেউএর মাথায় কোন এক মুহূর্তে যে দাঁড়াইয়া, সে মনে করে সব কিছুই ভাল; যে ব্যক্তি গর্তের মধ্যে, সে বলে 'দুনিয়ায় (সবই মন্দ)। কিন্তু যে নির্লিপ্তভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে সে দেখে কেমন দিব্যলীলা চলিতেছে। কাহারাও কাঁদিতেছে, অপরে বা হাসিতেছে। উহাদের আবার কাঁদিবার পালা আসিবে, তখন অন্যেরা হাসিবে। মানুষ কি করিতে পারে বল? আমরা জানি, কিছুই করিবার সাধ্য আমাদের নাই।······

কল্যাণ করিব বলিয়া কাজ করে আমাদের মধ্যে কয়জন? তাহাদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। বাকী আমরা যাহারা ভাল কাজ করি, বাধ্য হইয়া উহা করি।······ থামিবার সাধ্য আমাদের নাই। এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ধাক্কা খাইতে খাইতে আমরা অগ্রসর হই। কি করিব? সে-ই এই পুরাতন পৃথিবী। ইহার শুধু রং বদলায়, নীল হইতে বাদামী, আবার বাদামী হইতে নীল। এক ভাষা অন্য ভাষায় পরিবর্তিত হয়, এক জাতীয় অশুভ অন্য এক শ্রেণীর অশুভের আকার ধারণ করে—ইহাই চলিতেছে　। কোনক্ষেত্রে আমরা বলিতেছি ছয়, কোনক্ষেত্রে অর্ধ ডজন। অরণ্যবাসী আমেরিকান ইণ্ডিয়ান্ তোমাদের মতো দর্শনের পাঠ লইতে পারে না, কিন্তু সে তাহার খাবার আশ্চর্য রকম হজম করিতে পারে। তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দাও, অল্পক্ষণেই সে চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। তুমি আমি একটি সামান্য আঁচড় লাগিলে ছয়মাস হাসপাতালে গিয়া পড়িয়া থাকিব।··

প্রাণী যত অবনত স্তরের, উহার ইন্দ্রিয়জ সুখ তত বেশী। নিম্নতম থাকের জীবগুলির স্পর্শশক্তির কথা ভাব দেখি। উহাদের সমস্ত সংবেদন স্পর্শের মধ্য দিয়া।·· মানুষের ক্ষেত্রে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে মানুষের সভ্যতা যত নিম্নস্তরের তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তত প্রখর।···যে জীব যত উন্নত ইন্দ্রিয়বিষয়ে উল্লাস তাহার তত কম। ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির আনন্দ উৎকৃষ্টতর। প্যারিস শহরে একান্ন দফা খাদ্যের ভোজে যখন কেহ যোগ দেয় তখন উহা একটা বিপুল আনন্দের ব্যাপার বই কি। কিন্তু কেহ যখন মানমন্দিরে তারকারাজির পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত · কত নক্ষত্রজগৎ আসিতেছে, বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে—তখনকার আনন্দ নিশ্চিতই গভীরতর। সে সময়ে খাওয়া-দাওয়ার কথা একেবারেই ভুল হইয়া যায়, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী—কাহারও কথা মনে থাকে না। ইহাই হইল বুদ্ধিবৃত্তির আনন্দ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়, উহা ইন্দ্রিয়জ সুখ হইতে মহত্তর। বড় আনন্দের জন্য আমরা ছোট আনন্দকে ত্যাগ করি। ইহাই কার্যকরী ধর্ম—মুক্তিলাভ, ত্যাগকে আশ্রয়।

উচ্চতরকে পাইবার জন্য নিম্নতরকে ছাড়িতে হইবে। সমাজের ভিত্তি কি? শীল, সুনীতি, নিয়ম। অতএব ত্যাগ চাই। প্রতিবেশীর সম্পত্তি হরণের এবং তাহাকে উৎপীড়িত করিবার প্রলোভন ত্যাগ কর; দুর্বলের উপর অত্যাচারের এবং মিথ্যা বলিয়া অপরকে বঞ্চনার যত প্রকার উল্লাস সব বিসর্জন দাও। ত্যাগের নীতি ব্যতীত সমাজ দাঁড়াইতে পারে না। বিবাহ ব্যাভিচার-ত্যাগ ছাড়া আর কি? অসভ্য জীব তো বিবাহ করে না। মানুষের মধ্যে বিবাহবন্ধন প্রচলিত, কেননা মানুষ ত্যাগ করিতে পারে। এইরূপ প্রত্যেকটি সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রেই ত্যাগ—ত্যাগ -স্বার্থ-বিসর্জন ইহাই মূল কথা। কেন ত্যাগ করিব? পুণ্যের জন্য নয়, নিষ্ফলতার জন্যও নয়। উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য। কিন্তু কে ইহা করিতে পারে? অনেক বচন তুমি দিতে পার, অনেক দাপাদাপি, অনেক কিছু করিবার চেষ্টাও করিতে পার কিন্তু তাহাতে ত্যাগ আসিবার নয়। যখন উচ্চতর বস্তুর সন্ধান পাইবে তখনই ত্যাগ আসিবে—আপনা হইতেই আসিবে। তখন নিম্নতর আকর্ষণ আপনা হইতেই শিথিল হইয়া পড়িবে।

ইহারই নাম ধর্মের রূপায়ণ। আর অপর যাহা কিছু? রাস্তা পরিষ্কার করা, হাসপাতাল নির্মাণ? উহাদের মূল্য এই ত্যাগেই নিহিত। আর ত্যাগের তো কোন সীমা নাই। মুস্কিল এই যে, আমরা ত্যাগের গণ্ডী দিতে যাই—এই পর্যন্ত, এর বেশী নয়। কিন্তু ত্যাগকে এইরূপ বেড়া দিয়া রাখা যায় না।

যেখানে ভগবান, সেখানে অপর কিছু নাই। যেখানে সাংসারিকতা, সেখানে ভগবান নাই। এই দুই কখনও একত্র হইতে পারে না। আলোক ও অন্ধকারের (মতো)। খ্রীষ্টধর্ম এবং যীশুখৃষ্টের জীবন হইতে আমি তো ইহাই বুঝিয়াছি। বৌদ্ধ ধর্মেরও মর্ম কি এই নয়? হিন্দুধর্ম কি এই কথা বলে না? মহম্মদীয় ধর্ম কি এই বাণীই দেয় নাই? যাবতীয় মহাপুরুষ এবং লোকশিক্ষকগণের শিক্ষা ইহাই। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সত্যের সন্ধানে

শ্রীমতী লীলা মজুমদার, এম্-এ

সাধারণতঃ সত্য বলতে আমরা যাকে বুঝি, সে হ'ল পার্থিব সত্য। অন্যান্য পার্থিব জিনিসের মত কেবলমাত্র তিন দিকে প্রসার, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও স্থূলতায়। এর বেশী তার অস্তিত্ব থাকে না, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। এই পার্থিব সত্যের মধ্যে আবদ্ধ থেকে থেকে বহু সন্ধানী মানুষেরও অন্তর্দৃষ্টি লোপ পায়। পার্থিব ঘটনার যথার্থ অনুগমন প্রকৃত সত্য নয়, তার তিলপরিমাণ অংশমাত্র। এরূপ সত্য নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দরও নয়, কারণ সে ভ্রান্তিময় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর সর্বদা নির্ভর করে থাকে। চক্ষু হয়ত বা নির্ভুল দেখে নি, শ্রুতি হয়ত বা নির্ভুল শোনে নি, বুদ্ধি হয়ত বা নির্ভুল উপলব্ধি করে নি। এইরূপ অনিশ্চয়তার উপর যে সত্যের ভিত্তি সে কি করে অনন্ত পথের পাথেয় হবে?

সম্প্রতি একজন নাতিপ্রবীণা মহিলাকবিকে একটা বড় ভালো কথা বলতে শুনেছিলাম। আধুনিক কাব্যের অন্তঃসারশূন্যতার ও কৃত্রিমতার অপবাদের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করবার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, প্রকৃত কাব্য যে সত্যসন্ধানী হবে এ কথা যথার্থ, কিন্তু অতীতের মানুষ যাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, বর্তমান যুগের মানুষের কাছে সে হয়ত তেমন ক'রে সত্য নয়। অর্থাৎ সত্যকে শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করলেই হ'ল

না, অন্তঃকরণ দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে না পারলে সে আর যাই হোক্ না কেন, আমার কাছে সে কদাচ সত্য নয়।

সত্যের মধ্যে একটা সক্রিয় ও সৃজনশীল শক্তি আছে এবং সেই হ'ল সত্যের প্রাণশক্তি। তারই সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ। যে সত্য মানুষের জীবনের উপর কোনরূপ ছায়াপাত করে না সে চাঁদের পাহাড়ের মত সুদূর ও সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে চাঁদের পাহাড়েরই মত আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান যুগের ভোগবিলাসী মানবসমাজের উপর সে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বিশালায়তন কিন্তু অচল চন্দ্রের মত সে কেবলমাত্র জীবনের ভার বৃদ্ধিই করবে। পার্থিব অবলম্বনগুলি যেখানে এসে স্খলিত হ'য়ে পড়বে, সেখানে সেও শক্তি ও সান্ত্বনা সঞ্চার করতে পারবে না।

সত্যর ধর্মই হ'ল মানুষকে নিয়ত নব নব প্রচেষ্টায় উদ্‌বুদ্ধ করে তোলা। আমাদের পিতৃ-পুরুষরা যে সত্যকে বক্ষে ধারণ ক'রে আপনাদের ধন্য মনে করেছিলেন, আমাদের নূতনতর দিনের নব নব পরীক্ষায় তাঁকে দিয়ে যদি আমাদের নাই চলে, তার মধ্যে যথার্থ সত্য যদি কিছু থাকে, সেই আমাদের নূতনতর সত্যের সন্ধান বলে দেবে।

সত্য একটা এমন সামগ্রী নয় যা'কে চিরকালের জন্য করতলগত করা যায়, পৈতৃক সম্পত্তির মত পুরুষানুক্রমে ভোগ করা যায়। কুলদেবতাদের উপর প্রকৃত বিশ্বাস না থাকলে, শুধু অভ্যাসবশতঃ তাঁদের পূজা করলে মিথ্যা আচরণ করা হয়, তার চেয়ে আপনাকে অবিশ্বাসী ব'লে প্রকাশ করলে, সত্যকে অস্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং তাকে যথার্থ সম্মান দেখান হয়। ভগবানের উপর আস্থা না থাকলে তাঁর নাম মুখে আনাতেও মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তার চেয়ে বরং নাস্তিকতা প্রকাশ করলে সত্যকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

এক কথায় বলতে গেলে সত্যের কোন একটা স্থিরনিবদ্ধ রূপ নেই। এইখান থেকে এতদূর পর্যন্ত সত্যের প্রসার একথাও কেহ বলতে পারে না, কারণ সত্য একটা সম্বন্ধ বই ত' নয়, আপনার আত্মার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের একটা সম্পর্ক-মাত্র। তার মধ্যে বস্তু-জগতেরও স্থান আছে। যে সত্যসন্ধানী সে আপনার লাভ অথবা সুবিধার জন্য যা' ঘটেনি তাকে ঘটেছে বলে প্রকাশ করে না, যা' ঘটেছে তাকেও অস্বীকার করে না। তবে কিনা ঘটনার সত্যর চেয়েও একটা বড় সত্য আছে, কবিরা সাহিত্যিকরা শিল্পীরা মাঝে মাঝে তাকে উপলব্ধি করে থাকেন। জীবনের ঘটনাগুলির তলায় তলায় যে প্রাণের স্রোত প্রবাহিত হয়, তার সত্য উপলব্ধি ক'রে, তবে তাঁদের অলীক কাহিনীর অনুপ্রেরণা জোগায়, সেইজন্য তাঁদের কল্পিত কাহিনীগুলি অনেক ঘটনার ছোট সত্যকে অতিক্রম করে, তার নীচেকার প্রাণস্রোতের বৃহৎ সত্যকে অবলম্বন করে।

আমরা, মেয়েরা, সংসারের ছোট ছোট দাবি নিয়ত মিটিয়ে থাকি বলে, অনেক সময় অসীম দিগন্ত থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে এনে, ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ খুঁটিনাটির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। সাংসারিক শান্তির জন্য ক্রমাগত আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। বড় ভয় হয় কবে বুঝি বা সত্য থেকে এমনভাবে স্খলিত হয়ে পড়ব আর তাকে লাভ করতে পারব না। আমাদের নিয়ত সত্যের ঐ ফল্গুধারার কথা স্মরণ করার প্রয়োজন হয়। হাত দু'খানি পদে পদে মলিন হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, সংসারের সেবা করতে হলে সকল সময় বাছ-বিচার করা চলে না, কিন্তু আমাদের মনের কানে কানে সদাই যেন অন্তঃসলিলা সত্যধারার কলধ্বনি বাজে।

নিষ্কাম সেবাই সর্বোত্তম ভক্তি*

আচার্য বিনোবা ভাবে

এ তো প্রেম-সমাজ। প্রেমে বেশি বলতে হয় না। প্রেমের প্রকাশ কাজে। মা সন্তানকে বলে না, তোকে আমি খুব ভালবাসি, বড় ভালবাসি। প্রেমের কাজ সে করে। অতএব এখানে দীর্ঘ বক্তৃতা করব এরূপ প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না।

আপনারা যে কাজ করছেন তাতে ভগবান অত্যন্ত তুষ্ট হচ্ছেন। দুঃখীর সেবা অপেক্ষা ভগবানকে তুষ্ট করার অপর কোন শ্রেষ্ঠতর কাজ নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস-মিশনের তরফ থেকে স্থানে স্থানে এরূপ সেবাকার্য চলছে। ক্রিশ্চিয়ান মিশন তো জগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণ-মিশন সর্বপ্রথম ব্যাপক সেবাকার্য করছেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা যীশু খ্রীষ্ট হতে মিশনারি কার্যের প্রেরণা পেয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট ব্রহ্মচারী ছিলেন, পরম প্রেমী ছিলেন। কঠিন রোগীদের সঙ্গে মিশতেন, গরীবদের কাছে যেতেন। তাদের স্পর্শ করতেন, শান্তি দিতেন। এই পবিত্র স্মৃতি থেকে প্রেরণা লাভ করে যীশুর অনুগামিগণ সেবার নিমিত্ত জগতের সর্বত্র গিয়েছেন। তাঁদের কার্যে এক সকাম প্রেরণাও আছে। তা যদি না থাকত তো তাঁদের কাজ অধিকতর সুন্দর হত। অপরকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করব, তা হলে আমাদের প্রেমকার্য পূর্ণ হবে এমনতর কিছু একটা তাঁদের মনে আছে। তার জন্যে আমি তাঁদের দোষ দিচ্ছি না। এ যে সকাম বাসনা একথাই বলছি। অন্যথায় এ কার্য সমধিক উজ্জ্বল হত। তা বলে তাঁরা যা করছেন তা কম উজ্জ্বল নয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা স্ফূর্তি ও প্রেরণা পেয়েছেন অদ্বৈত সিদ্ধান্ত থেকে। প্রেরণার দিব্য উৎস তাঁদের মিলেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে অদ্বৈত একেবারে বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। অদ্বৈতী একান্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। তাই অদ্বৈতে প্রেমের যে প্রকর্ষ হবার কথা ভারতে তা দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষে প্রেমের প্রকর্ষ ভক্তিমার্গে দেখা যায়। কিন্তু ত্রুটি তাতে ছিল—সেবায় তা পরিণত হয় নি। সবার প্রতি তাদের আদর ও প্রেম ছিল। কিন্তু তাঁদের ধর্মের পরিসমাপ্তি হয়েছিল ধ্যানে, ধ্যানের পরিণতি হয়েছিল মূর্তি-পূজায়। মূর্তির ধ্যানে তা সীমাবদ্ধ হয়েছিল। সকালে মূর্তিকে জাগাতে হয় তো জাগাতেন। পরে তার স্নানের নাটক করতেন। তাকে খাওয়ানোর নাটক করতেন। রাতে ভগবান শয়ন করেন তো শোয়ানোর এক নাটক হত। এ তো এক কিণ্ডারগারটেন। অর্থাৎ গোটা গাঁয়ের সেবা কিরূপ হওয়া চাই তার এক নমুনা মন্দিরে খাড়া করা হত। গাঁয়ের সব লোকে চারটার সময়ে উঠুক এ যদি তাঁদের কার্য হত তবে ভগবানকেও চারটায় ওঠাতেন। গাঁয়ের সকলে সূর্যোদয়কালে ছয়টায় স্নান করুক এ যদি অভিপ্রেত হত তবে ভগবানও ছয়টায় স্নান করতেন। লোকে বারটায় ঘরে ঘরে নিয়মিতরূপ আহার করুক এ যদি তাদের অভীষ্ট হত তবে ভগবানও বারটায় ভোজন করতেন। গাঁয়ের লোকে সিনেমা দেখে চোখ নষ্ট না করে, রাত ন'টায় ঘুমাক এ যদি তাঁরা চাইতেন তবে ভগবানও রাত ন'টায় ঘুমাতেন। এভাবে গোটা গাঁয়ের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার উপায় তাঁরা বার করতেন। উদ্দেশ্য তাঁদের খুব ভাল ছিল। যত দক্ষিণে যাবেন তত অধিক নিদর্শন তার আপনি পাবেন। দাক্ষিণাত্যের ছোট ছোট গাঁয়েরও মধ্যভাগে খুব বড় মন্দির। সমস্ত গ্রামের লোকের জীবন ঐ মন্দির নিয়ন্ত্রণ করত। এই

* গত ২৭।১০।৫৫ তারিখে বিশাখপট্টনম্ 'প্রেমসমাজে' প্রদত্ত হিন্দী ভাষণের অনুবাদ। অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

সবই ছিল ভাল। তা হলেও ভক্তিমার্গ ঐ মূর্তির ধ্যানে পরিসমাপ্ত হয়েছিল। দুঃখীজনের সেবায় তা প্রকট হয় নি। ঘরের লোকের সেবা তাঁরা করতেন। ঘরে ঘরে যে সেবা হত তাকে পর্যাপ্ত মনে করতেন। কিন্তু আগে ঘরে ঘরে ঐ যে সেবা হত আজিকার সামাজিক অবস্থায় তাও পুরোপুরি হবার সুযোগ নেই। ঘরেই বা সেবা কোথা করবেন? ঘরে কারো অসুখ হয়েছে তো শোয়ার একটু ভাল জায়গা নেই। ছোট একটা ঘর। তাতেই উনান। গোটা ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার। এ অবস্থায় রোগীর সেবা হয় কি? অতএব ঘরে ঘরে সেবা করে সেবাকার্য শেষ হয়েছে তা তো নয়। ভক্তি মার্গের পরিণতি প্রত্যক্ষ সেবায় হওয়া চাই। তা হয় নি। তাই ভক্তিমার্গের ত্রুটি থেকে গেছে। আর অদ্বৈত এমনি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল যে অদ্বৈতীরা কোন কাজই করতেন না। খেতে হয়, অগত্যা খেতেন। ভিক্ষা চাইতে হয়, চাইতেন। কিন্তু এ সবই তাঁদের লক্ষ্যের অন্তরায় এরূপ তারা মনে করতেন। কর্মমাত্রকে বন্ধন মনে করার বেদান্তের প্রসার হল আর সে বেদান্তে শুষ্কতা দেখা দিল। অন্তরে প্রেমের সাতিশয় প্রকর্ষ হলে আর অদ্বৈত পূর্ণ হলে বাহ্য ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়, একথা আমি মানি। এরূপ কোন অদ্বৈতময় পুরুষ থাকেন তো তাঁর দর্শনেই দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ মহাত্মা লাখে-কোটিতে একজন।

অদ্বৈতের প্রেরণায় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পূর্ণ প্রেমের সেবা শুরু হয়—অদ্বৈতের এবংবিধ প্রকাশ ভারতে ঐ প্রথম। ভক্তিমার্গের দিক থেকে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সমাজসেবা আরম্ভ হয়—ভক্তি-মার্গের এবংবিধ প্রকাশ ভারতে এই প্রথম। রামকৃষ্ণের শিষ্যগণ সেবা দ্বারা অদ্বৈতকার্যে প্রেমের প্রকর্ষ করেছেন। পরমেশ্বরের ভক্তির সারসর্বস্ব মানবসেবায় মাহাত্মা গান্ধী এ শিক্ষা দিয়েছেন। এরূপে আধুনিক সমাজে ভক্তি-মার্গ ও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের খুব সংস্কার হয়েছে। এ পরম্পরা থেকেই প্রেম-সমাজের উদ্ভব।

এভাবে বিবিধ সেবাকার্য লোকে যদি হাতে নেয়, এ সব সংস্থা হাতে নেয় তো সরকারের কার্য ক্ষীণ হবে। এরূপ কাজে সহায়তা করতে চায় তো সরকার অবশ্যই সহায়তা করতে পারে আর করাও উচিত। কিন্তু হওয়া চাই এই যে, ভারতের যত কিছু সেবাকার্যের ভার সামাজিক সংস্থাসমূহ আপনি হাতে নেবে। তা হলে সমবেত সংকল্পের অভ্যুদয় হবে। সে কথার আলোচনা এখানে করব না।

কিন্তু একথা বলতে চাই যে, সরকারের কার্য এক এক করে লোকের হাতে আসা চাই, সরকার ক্ষীণ হওয়া চাই। আর সরকার ক্ষীণ হতে পারে। এ সেবাকার্য এরূপ যে ভারতের জনসাধারণ অনায়াসে তা করতে পারে। সেবায় তাদের প্রকৃষ্ট ভক্তি প্রকট হতে পারে। কিন্তু তার একটি শর্ত আছে। সে শর্ত পূর্ণ না হলে ঐ সেবা ভক্তি হবে না। সেবাতে যদি অহংকারের লেশ না থাকে তো সে সেবা ভক্তি হয়ে যায়। মা সন্তানের আর সন্তান মায়ের সেবা করে। তাতে যদি অহংকারের অংশ না থাকে তো তা ভগবানের পূজা হতে পারে। কিন্তু এ আমার সন্তান এভাব যদি মায়ের মনে থাকে তো তা সাধারণ সেবা হবে, ভক্তি হবে না। সেবাতে ভক্তির রূপ, সর্বোত্তম ভক্তির রূপ ফুটবে যদি তাতে অহংকার না থাকে। এখানে যে সব দীন লোক আসবে তাদের যেন মনে না হয় যে আমাদের এঁরা উপকার করছেন। এঁরা আমাদের উপকারক একথা যদি তাদের মনে হয় তো বলব এ সব উপকারক অহংকারী হয়ে গেছেন। আমাদের মনে এ ভাব, এ উপলব্ধি আসা চাই যে, যাদের অনাথ বলা হয়, তারা আমাদের নাথ। এঁরা অনাথ নহেন, আমাদের নাথ। ভগবান এঁদের

রূপ ধারণ করেছেন। আর ঐ যে সেবাগ্রহণকারী রোগী তাদেরও যেন মনে না হয় যে, অমুকে অমুকে আমাদের সেবা করছে। তাদের মনে এই হওয়া চাই যে, এঁদের রূপে ভগবান আমার সেবা করছেন। এ ভাব যদি সেবায় আসে তো সেবা সর্বোত্তম ভক্তি হয়ে যাবে।

গৃহং তপোবনম্

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অজ্ঞাতে তুমি তপস্যা কর—
জীবনের প্রতিদিন,
জাননাক—শোধ করিতে হইবে
তোমারে ত্রিবিধ ঋণ।
তব হোমানল হয় না নির্বাপিত,
হবিঃ ও সমিধ হতেছে সমর্পিত,
না জানি. নিত্য দেবতাকে তুমি
করিছ প্রদক্ষিণ।

প্রথম মানব মানবী হইতে—
দুশ্চিন্তার ভার,
তোমারো উপর এসেছে জানতো—
কত যে বেদনা তার।
কুপিত বিরূপ গ্রহ-তারাদের প্রীতি
সাধন করিতে, তোমারে হবে যে নিতি,
বিনা তপস্যা হরির করুণা—
উপায় নাহি যে আর।

যাহারা পেয়েছে রূপ ও বিত্ত
প্রতিষ্ঠা ভূমণ্ডলে,
সহজে পায়নি, অর্জিত তাহা—
অশেষ পুণ্য ফলে।
অনায়াসে কিছু আসেনি তাদের কাছে,
পুণ্যেতে তাহা এসেছে এবং আছে,
গোপনে তাদের সাধনার কথা
জানেনা সঙ্গীদলে।

তুমি যে পেয়েছ গৃহ পরিজন
নয়নাভিরাম সব,
তোমার জীবনে যখন এসেছে
যে সব মহোৎসব,
করিবারে ভোগ কাঙ্ক্ষিত সব দান,
তব সংসারে রাখিবারে অম্লান,
চাহি যে পুণ্য—জীবন তোমার
অবিচ্ছিন্ন তপ।

শ্যামল শোভন সরস রাখিতে
তোমার গৃহস্থালী,
চির-সুধারস নিস্যন্দীর
সাথে যোগ চাই খালি।
লভিতে রাখিতে আরোগ্য জয় যশ,
প্রীতি ধন জন শুচিতা শান্ত রস
টানি হরিকৃপা অজস্রধারে
দিতে যে হইবে ঢালি।

কতই চিন্তা কত শ্রমে কর
জীবিকার অর্জন,
তবু মনে রেখো সামান্য নয়
গৃহ তব তপোবন।
ক্ষণিক তোমার শ্রীহরিস্মরণই জপ।
পর উপকারে যাহা কর তাই তপ
যাহা দান কর তাহাই আহুতি
আত্মসমর্পণ।

অভয়দান

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কোথায় যেন পড়েছিলাম সবচেয়ে বড় দান, অভয়দান। শাস্ত্রবাক্য মহাজনবাক্যই হবে। নইলে একথা আর কে বলবেন।

তাঁরা বলেছেন, জীবজন্তু, পশুপ্রাণী সকলকেই অভয় দেওয়ার চেয়ে আর বড় কিছু দেবার নেই। যা দিতে খরচ নেই, দেওয়া সাধ্যাতীত নয়,—সকল মানুষই সবাইকে দিতে পারে। স্মিত শান্ত মুখে বলতে পারে, ভয় কি? কিসের ভাবনা? কোনো ভয় নেই! মাত্র এইটুকু শুনেই অনাথ, আতুর, ক্লিষ্ট, ত্রস্ত, রোগী, দীন সকলেই আশ্বস্ত হয়। শিশু পরম নির্ভর করে, রোগী প্রফুল্ল হয়, আর্ত শান্ত হয়, পশুপ্রাণী পরম বিশ্বাসে পাশে দাঁড়ায় এসে।

এই হ'ল সেই অভয় দান।

আশ্রয়দান, অন্নদান, (বিদ্যাদান), ধনদান, বস্তুমূলক সকল রকম দানের স্থান অভয়দানের পরে। যাঁরা বস্তুজগৎ থেকে কিছুই দেন না, সেই ত্যাগী মুনি ঋষি সাধুসন্তদের কাছে ধনবান ঐশ্বর্যবান মানুষ এসে দীনভাবে দাঁড়ায়' ঐ অপূর্ব বস্তুটির আশায়,—যাতে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। শুধু একবার কানে শুনবে, ভয় নেই। কিসের ভয় তাদের, কি ভাবনা তাদের- কি বা চাই তাদের তা তারাও হয়ত জানে না। কিন্তু চাই তাদের কিছু, সে চাওয়া—অভয়, আনন্দ। হয়ত তাদের ধনবল জনবল নানা সম্পদ আছে কিন্তু তবু কিএক অভাব আছে কোন্‌খানে, তাকি অভয়ের?

মহাভারতে দেখি, পাঁচজন বীর স্বামী, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ত্যাগীসত্তম ধার্মিক মহাবীর দাদাশ্বশুর ভীষ্ম, কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, যবনিকা-অন্তরালে শাশুড়ীবৃন্দ ও কুলমহিলাগণ, রাজসভা-পূর্ণ অন্য জ্ঞাতি ও প্রজাবৃন্দ—সকলে বসে থেকে লজ্জাভীত ত্রস্ত আতুর দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন নি। আশ্বাস দিতে পারেন নি, উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পাশে এসে বলেন নি 'ভয় কি বৎসে, আমি আছি বা আমরা আছি।' কিন্তু পিতা নয়, ভাই নয়, স্বামী পুত্র নয়, রক্ষণাবেক্ষণের দায় যাঁদের নিকট আত্মীয় কেউ নন, শুধু বন্ধু, পাণ্ডবসখা, শ্রীকৃষ্ণই নারীর ঐ পরম অপমান ও লজ্জা থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

মনে করে নিতে পারি শ্রীকৃষ্ণ এসে পড়েছিলেন!

অন্তহীন কাপড়কে রূপক বলে ছেড়ে দিলে মনে ভেবে নেওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের কোনো শৌর্য বীর্য বা অলৌকিকত্তা দেখাবার প্রয়োজন হয় নি—তাঁর ঐ নীরব ধিক্কার ও ঘৃণায় সভায় কেউ আর মুখ তুলতে সাহস করেন নি।

এই হ'ল অভয় পাওয়া—অভয় দান।

* * *

আতুর রোগীর কাছে যখন সৌম্যমূর্তি চিকিৎসক এসে বলেন, ভয় কি, ভয় নেই—রোগী ও তার পরিজন যেন পরম আশ্বাস পায়। অনেক সময় ঐ আশ্বাস আর অভয়বাণীই তাকে আরোগ্যের পথেও নিয়ে যায়। সেরে ওঠে, বেঁচে ওঠে।

ধন নয়—অর্থ নয়—বাস্তব কিছুই নয়-'ভয় নেই' এই কথাটি! অনেক দাম তার। দরিদ্র জননীর কাছেই বা তার শিশু কি পায়? ঐ অভয় ছাড়া? অপরের কোলে সন্তান যতই আদরে যত্নে থাকুক, খেতে পাক, ভাল খাদ্য পাক, খেলার জিনিস পাক, জননীর ছেঁড়া কাঁথা, ছিন্ন অঞ্চলটির মাঝে সে সবচেয়ে বড় জিনিস পায়—পরম আশ্রয়—পরম নির্ভরের জায়গা

পায়—যার মাঝে লুকোনো আছে 'ভয় নেই, ওরে ভয় নেই।'

* * *

তেমনি সংসারে সংসারী মানুষের জীবনে যেদিন বিপর্যয় আসে, প্রায় সব মানুষেরই জীবনে সে দুর্দিন আসে—কোনো না কোনো আকারে, সুখে বিলাসে ঐশ্বর্যে লালিত জীবনেও আসে, দারিদ্র্যদুঃখময় জীবনেও আসে, রোগের আকারে, শোকের রূপ ধরে, অর্থাভাবের বা অপমানের দুর্দিন নিয়ে—বঞ্চনা লাঞ্ছনার পথে অথবা কি 'এক অজানা মানসিক অভাবের অশান্তির পথে, সেদিনও মানুষ খুঁজে বেড়ায় তাঁকে বা তাঁদের—যিনি বা যাঁরা বলতে পারেন 'ভয় নেই, কিসের ভাবনা ?'

আর আশ্চর্য এই যে, অহঙ্কারী ঐশ্বর্যশালী অর্থবান্ মানুষ অথবা দীন মানব সকলেই খোঁজে সেই একধরনের মানুষকেই, যাঁদের ঐশ্বর্য নেই, ধন নেই, প্রভাব নেই, প্রতিপত্তি নেই, নেতা নন, ক্ষমতাশালী নন; যাঁরা শুধু সাধুসন্ত মহাত্মা মাত্র, প্রায় সকলেরই 'করতলভিক্ষা, তরুতল-বাস,' নির্লিপ্ত যোগী, যাঁরা লোকচক্ষুর আড়ালে আপনাদের লুকিয়ে রাখেন, আত্মপ্রচার করতে চান না; কিন্তু কিসের ভয়ে ভীত অভয়কামী মানুষের দল তাঁদেরই খুঁজে বার ক'রে তাঁদের মুখে শুনতে চায় ঐ একটি কথা, 'ভয় নেই, কিসের ভয়!'

এই প্রসঙ্গে মনে হয় একটি কথা। আমাদের দেশে সাধু মহাত্মাদের 'মহারাজ' বলার একটা প্রথা আছে। এ প্রথা কতকালের কেউ জানেন কি না জানি না। কিন্তু ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই সকল সাধুসন্তকেই এই 'মহারাজ' বলা হয়। তা' তাঁরা যে সম্প্রদায়েরই হোন, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, উদাসী, নাগা, দণ্ডকমণ্ডলুধারী বা মালাতিলকধারী, গৈরিক বাস বা শুভ্রবেশধারী—যাই হোন,—ভারতবর্ষের জনসাধারণ উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি সব অধিবাসী যেই হোন, তাঁদের 'মহারাজ' বলেই অভিহিত করবেন।

এই 'মহারাজ' বলাতে একটা অপূর্ব ভাব মনে আসে। যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে ডোর কৌপীন সম্বল করে কিংবা নিঃসম্বল বেরিয়ে এলেন পথে, তাঁদের 'মহারাজ' বলে চিনল কেমন করে কে বা কারা? কে প্রথমে বলেছিল মুখে ঐ অপূর্ব ডাকটি মনে করলে তার উপর শ্রদ্ধা হয়, আশ্চর্য লাগে। নিশ্চয় কোনো গর্বিত ধনীপুত্র এ আহ্বান করেনি। করেছে জনসাধারণের কেউ, ভক্ত শ্রদ্ধাবান কেউ।

একটু ভাবলে মনে হয়, কত গভীর নিগূঢ় অর্থ আছে—ঐ মহারাজ সংজ্ঞাটির। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজের যাঁরা উত্তরাধিকারী, যাঁরা মানুষের বস্তুজগতের উত্তরাধিকার ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন, তাঁদের আর কি বলে ডাকা যেতে পারে! কি বলেই সম্মান জানানো যেতে পারে! সাধারণ মানুষের কাছে 'রাজা' 'মহারাজ' বলাই সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া!

যাঁদের কাছে আমাদের এই সাধারণ মানুষেরা দলে দলে এসে দাঁড়ায়। কখনো শোকে সান্ত্বনা খুঁজে, কখনো কোনো পরম দুঃখের দিনে 'নিখিল ধরা যখন করে বঞ্চনা' নির্ভর খুঁজে পায়। কখনো শিক্ষা নিতে আসে, কখনো বা দীক্ষা নেয়। যুগে যুগে যাঁরা সকল দেশে সকল কালে ঐ একই পরম কথা—ঐ অভয় বাণী বহন করে আনেন। যে বাণী গীতা উপনিষদের, যে বাণী বাইবেল কোরানের—যে বাণী মহাত্মা সন্তদের অন্তরের বাণী।

এখন আমাদের এই সাধারণ মানুষের কথাই বলি। শাস্ত্রকার বলেন, মানুষের জীবনেই চার যুগ আসে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। তাঁরা বলেছেন, সত্যযুগ হ'ল গতির, ত্রেতা দ্বাপর কিছু নিশ্চেষ্ট, কলি একেবারে তামস জড় যুগ।

আমরা দেখি ধন-মান-মদে ঐশ্বর্যে-বিলাসে

আচ্ছন্ন নরনারী—সহসা এক বিপর্যয়ের মাঝে পড়লেন। প্রচণ্ড দুঃখ-শোকের আঘাতে সুখের সমস্ত উপকরণ বিস্বাদ হয়ে গেল! সংসারযাত্রার সমস্ত প্রমোদ ম্লান হয়ে গেল। সেদিন দেখি, তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁদেরই—যাঁরা উপকরণ-হীন অভাববোধহীন মুক্তিময় আনন্দের পথের পথিক সেই সাধু মহাত্মাদের।

আমাদের দেশের জীবনের পুরাতন ধারা ঐশ্বর্যবান ধনী মানুষের জীবনে আর আগের মত নেই, বিশেষ করে যাঁরা সমাজ ও দেশ ছাড়া হয়ে জীবন যাপন করেন।

তেমনি ঘরে একদিন দেখা হ'ল এক শোকার্ত আত্মীয়ার সঙ্গে। জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় ঘটেছে। স্বামীহীন জীবনে আগেকার মত সুখের উপকরণ আর নেওয়া যাচ্ছে না। পারিবারিক ধারা অতি আধুনিক।

জীবন যেন শূন্য, অত্যন্ত কাতর। কি সান্ত্বনা দোব তাঁকে। বিদেশী মেয়েরা (য়ুরোপীয় মেয়েরা) একটু শান্ত হলে সে সব ক্ষেত্রে হয়ত সামাজিক কিছু কাজ খুঁজে নেন। পরিবারভ্রষ্ট হলেও অন্যভাবে কাজকর্ম করেন। আমাদের দেশে এখন ভাঙনের যুগে সেকালের সংসারযাত্রা—পরিজনবহুল গৃহিণী-পনা, পূজার্চনা, দান ধ্যান তীর্থবাসের ব্যবস্থাও গেছে, আধুনিক জীবনের শিক্ষাও শিকড় গেঁথে বসেনি মনে বাইরের ও সামাজিক কাজ-কর্মের।

মনে বড় দুঃখ হ'ল, যেন কোনো পথ নেই, কোনো উপায় নেই, বাকি জীবনটা কিভাবে কাটাবেন। শরীর এবং মন তাঁর দুই-ই অসুস্থ ও অশান্ত।

তারপর কয়েক বৎসর আর দেখা হয়নি। সহসা সম্প্রতি একদিন সাক্ষাৎ হয়ে গেল। চেহারাতে বেশ শান্তভাব এসেছে—প্রথম শোকের অভিভূতভাবও কেটে গেছে। শরীরও সুস্থ মনে হ'ল। গল্প কথাবার্তা হ'ল খানিকটা ঘরোয়াভাবেই।

যাবার সময় সহসা সহাস্যে বললেন, 'ভাই আমি দীক্ষা নিয়েছি।' পরম আনন্দভরা মুখ।

আমিও আনন্দিত হ'লাম তাঁর আনন্দে। বললাম, 'বেশ করেছ। কোথায় নিলে?'

জানতাম তাঁদের বা আমাদের কুলগুরুর বংশে দীক্ষা দেবার মত প্রবীণ কেউ নেই।

বললেন, 'বেলুড় মঠে নিলাম।' 'বড় ভালো লাগল', এমনি দু-একটি কথার মধ্যেই তাঁর সঙ্গিনীরা গাড়ীতে উঠলেন, আর কথা হ'ল না।

শুধু তাঁর প্রসন্ন মুখটি আমাকে জানিয়ে দিল, তিনি পথ বা অভয় পেয়েছেন। তাঁর শোক-বিক্ষিপ্ত জীবন আত্মস্থতা পেয়েছে।

আর একজন বিধবা বন্ধু নানা চিন্তা ও সংসারে যেমন ঘটে তেমনি ধরনের ঘটনায়—এক কথায় ত্রিতাপে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। পড়াশুনার অভ্যাস ছিল। পিতা কাশীবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। অতি বৃদ্ধ ও জ্ঞানী।

মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম ও তিনি আসতেন। নতুন 'উদ্বোধন' এলে কিংবা কোনো অন্য ভালো বই হাতে পেলে, দু-জনে পড়তাম, আলোচনা করতাম।

তাঁর পারিবারিক ও মানসিক অশান্তির খবর জানা ছিল।

তবু দুজনেরই দেখার সময়টুকুতে পারিবারিক ঘটনা ছিল না, ছিল অন্য জাতের, অন্য ভাবের। তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতার কাশীবাসের নানা কাহিনী বলতেন। আমার হাতে দু-একখানি বই মাত্র। আমরা তখন শিবপুরে।

তারপর ঘটনাচক্রে আমি পাঞ্জাবে অমৃতসরে দিল্লীতে ঘুরে ফিরে শিবপুর গিয়ে দেখা করলাম।

দেখলাম, ভারী খুশী মন, প্রশান্ত।

কিছু কথাবার্তার পর বললেন, 'জানেন দীক্ষা নিলাম।'

'নিলেন? কার কাছে? কুলগুরু?

'না, কুলগুরুর বংশ কোথায় আজকাল কিছুই জানি না। সন্ন্যাসী গুরু ···।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর? বেশ ভাল আছেন মনে হচ্ছে? মন ভাল হয়েছে? নতুন কিছু পেলেন, শিখলেন? দেখা হয় তাঁর সঙ্গে?'

বললেন, 'তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু মন আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে। না, দেখাও তাঁর সঙ্গে কই হয়। কথা, উপদেশও কিছু বিশেষ বলেন নি··।'

সংসারী মানুষ যাঁরা তাঁরা ভাবেন, এ কি করে হয়? একটি নাম বা মন্ত্র, নয়ত কথাকীর্তন কিংবা সৎসঙ্গ-ই মাত্র। এতে কি পাওয়া যায়? সংসার গতকাল যা ছিল, আজও সেই রকমই আছে। তার উত্তাপ দাহ তেমনিই আছে। তবে কি পাওয়া গেল এই থেকে—যা সব দাহ জুড়িয়ে দিল! কিংবা দাহিকা-শক্তিকে আর ভয় রইল না! কি এক নিগূঢ় প্রসাদ এই প্রসন্নতা প্রশান্তি' এনে দিল? তার মনের—সব অশান্তি দূর করে দিল?

উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'আনন্দে জীব জাত হয়, আনন্দের স্রোতরসেই বেঁচে থাকে, আনন্দের মাঝেই তার লয়-প্রাপ্তি হয়।'

বহুদিন আগে শ্লোকটি প্রথম যখন পড়ি, আজ বলতে সঙ্কোচ নেই, সেদিনও অহঙ্কারী মন নিজেকে বলেছিল, এই শোক-দুঃখ-কষ্টময় জীবন-ধারা এর মাঝে আনন্দ কোথায়? জন্ম, জীবনধারা, লয়—এর সবই তো দুঃখময়। দু'চার জন যাঁরা একথা বলেছেন, তাঁরা ত্যাগী মহাত্মা মানুষ তাই, সাধারণ মানুষের কাছে সবটাই দুঃখভয়ভরা। সংশয়ী মনে অহঙ্কার নানা তর্ক ও কুতর্কের জটিল জাল বিস্তার করেছিল।···

জীবনের পথ আজ শেষ হয়ে এসেছে। আজ মনে হয় এই অভয় পাওয়া, সব চেয়ে বড় পাওয়া, শ্রেষ্ঠ দান পাওয়া। অভয়ের পথই আনন্দের পথ। এবং অভয় দিতে পারেন তাঁরাই—তাঁদের আগেই বলেছি। আর বললাম না। কবির কথা মনে জাগে—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবু আনন্দ—তবু আনন্দ—তবু অনন্ত জাগে।

জয় জীবনের, জয় মরণের জয়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বৃন্দাবনে বাঁশি বাজান যিনি
কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজে তিনি
অর্জুনেরে ধরান্ ধনুর্বাণ;
সৃষ্টিরে তাঁর রক্তে করান্ স্নান।
কাল-বোশেখীর ঝড়ে নাচন্ যাঁর
দখিন হাওয়ায় তিনিই তো আবার
অরণ্যেরে সাজান্ ফুলে ফুলে।
ধেনু চরান্ নীল যমুনার কূলে
যে-দেবতা অনিন্দ্যসুন্দর—
প্রলয়-রাতে তিনিই দিগম্বর
নৃত্য করেন উড়িয়ে জটাজাল,—
পিনাকপাণি প্রচণ্ড, ভয়াল।

*　　*　　*

যে-দেবতা পাখীর কাকলিতে,
চাঁদের আলোয় শুভ্র শেফালিতে,
বাসর ঘরে বধূর আলিঙ্গনে
সেই দেবতাই আছেন ভূকম্পনে,
বাঘের নখে, শঙ্খচূড়ের দাঁতে,
বজ্রাঘাতে, বিপ্লবে, বন্যাতে।

*　　*　　*

পূর্ণ ক'রে আছেন তিনি সব।
ধ্বংস বিনা সৃষ্টি অসম্ভব।
যিনি মধুর তিনিই তো ভীষণ।
কুরুক্ষেত্র এবং বৃন্দাবন
একই সূত্রে গাঁথা পরস্পর।
মরণকে কি করতে আছে পর ?
মৃত্যু আছে, তাই আছে জীবন।
বীজের ধান্য জীবন্ত যখন —
মাটির পরে একলাটি সে রয় ;
যেই সে মরে আর সে একা নয়।
ভূগর্ভে তার মৌন আত্মদান
ধূসর মাঠে আনে সবুজ প্রাণ।

*　*　*

বাঁশির সুরে থাকিস্‌নে তুই ভুলে।
মহাকালীর খড়্গ নে তুই তুলে।
কালী এবং কৃষ্ণ ভিন্ন নয় ;
জয় জীবনের, জয় মরণের জয়।

'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

[গত ২৮।৩।৫৫ তারিখে কুমিল্লায় পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজের একটি ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত। অনুলেখিকা— শ্রীমতী সুধা সেন, এম্‌-এ।]

মানুষের 'আমি'টাই পর্দা, সেটিই আবরণ, ভগবানকে ঢেকে রাখে। যত নিজেকে প্রত্যাখ্যান করব, যত 'আমি'টাকে অস্বীকার করতে পারব ততই তিনি প্রকাশিত হবেন। তিনিই তো সর্বভূতে সত্তা হয়ে আছেন ; তিনি যদি না থাকতেন কোথায় জগৎ থাকত। জগৎ তাঁতেই সত্তাবান। কাজেই, যত মনে করতে পারব,—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' ততই 'আমি'টা গিয়ে তাঁর প্রকাশ হবে।

এই আমিটাকে মারার জন্যই তো সব যোগ, ভক্তি, সাধনা। ভক্তেরা হৃদয়-মন্দিরে ভগবানকে বসিয়ে রেখেছেন। ভগবানই সেখানে প্রভু হয়ে আছেন, ভক্ত হয়ে আছেন তাঁর দাস। ভক্তের আমি হচ্ছে সেবক আমি, দাস আমি। জ্ঞানী কি করছেন ? মিথ্যা আমিটাকে কেবলই মারছেন, আর তাঁকেই সত্য বলে ধরছেন। জ্ঞানীর পথ আর ভক্তের পথ দুই পথেই ছোট আমিটার নাশ। জ্ঞানী বলেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', জ্ঞানী নিজেকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলে জানেন। তাঁর ছোট আমিটা একেবারে মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। যোগী পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন, তাঁর আমি একলা নেই, যুক্ত হয়ে আছে পরমাত্মার সঙ্গে। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ।

ঠাকুর বলতেন, কাঁচা আমি আর পাকা আমি। কাঁচা আমিটাই তো যত গণ্ডগোল করে। পাকা আমিতে দোষ নেই তো কিছু। সেটি ভক্তের আমি, দাস আমি। যীশু বলতেন, I and my father are one. রামপ্রসাদ নিজেকে জানতেন কালীর বেটা রামপ্রসাদ—কাজেই তাঁর কোনও ভয় ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের 'আমি' রূপ সত্তাটিও তেমনি মাতৃসত্তাতেই তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর সবই মা, নিজের বলে কিছু ছিল না। তাই তিনি বলতেন—মুক্ত হবে কবে, না আমি যাবে যবে। এ আমি গিয়েছিল ঠাকুরের—তাই তিনি সত্য সত্যই 'মায়ের বেটা' হ'তে পেরেছিলেন।

'তোমার আমি' আর 'তুমি আমার'—এ কথা যদি ভাবতে পারি, সত্যি যদি আমি 'তোমার'

হ'য়ে যাই আর 'তুমি' আমার হও তবে আর কি বাকী রইল? দৃষ্টিটা শুধু নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে, দিতে হবে 'তোমার' দিকে। অর্থাৎ আমার কিছুই নেই—আত্মসমর্পণ করলাম তোমার পায়ে, আমি শরণাগত। তখনই তিনি আমার হবেন—আমিও তাঁর হ'য়ে যাব।

আর একটি হ'চ্ছে পরের কথা—আমিই তুমি; যখন তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা আসবে, তখন আমিই তুমি, তুমিই আমি। গোপীদের যেমন হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হ'য়ে এক এক সময়ে গোপীদের বোধ হত আমিই কৃষ্ণ। এ ভাব পরের কথা। আমাদের দাসভাব, সন্তানভাবই ভাল। ভক্ত বলেন, তোমার আমি দাস। হনুমানের রামের প্রতি কি গভীর অনুরাগ। এই সেবা, এই অনুরক্তি—এইটিই ঠিক 'দাস আমি'র ভাব।

এক একটা ভাব নিয়েই সাধনা করতে হয়। নইলে আমিটা যত গোলমাল ঘটায়। আমির আবার সাত্ত্বিক আছে, রাজসিক আছে, আবার তামসিকও আছে। সাত্ত্বিক আমিই দাস আমি, ভক্তের আমি; সে ভিতরে নিয়ে যায়, পথ দেখিয়ে দেয়। রাজসিক আমির নজর ভোগ, ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, প্রভুত্বের দিকে। আর তামসিক আমি নিয়ে যায় একেবারে অন্ধকারে, বন্ধনের মধ্যে।

খালি 'তোমার আমি'—এইটিই সাধনা করে যেতে হবে। যীশু যেমন বলেছেন, Thou my father who art in heaven আকাশের দেবতা হৃদয়ে এলেন, আমার বাবা হ'য়ে এলেন, মা হয়ে এলেন। যখন প্রেম আরও গাঢ় হবে তখনই প্রেমাস্পদ আর প্রেমিক এক হ'য়ে যাবেন। তখনই 'আমিই তুমি হবে'। এই আনন্দ না চেয়ে আমরা সংসারে কেবল 'সুখ আর আনন্দের পেছনে ছুটছি।' কিন্তু কোটি জন্ম ধরে এ সুখের আশায় ঘুরে তো মরছি—সুখ পেয়েছি কি? যখন এত করেও বাইরে সুখ পাই না, তখনই আমাদের দৃষ্টি ফেরে ভেতরের দিকে। তখনই 'তোমার আমি হতে চাই' আর তোমাকেও আমার করতে চাই। তখনই একেবারে শরণাগত হয়ে থাকতে হবে। পুরুষকারও চাই। বিষয় থেকে, 'আমার' 'আমার' থেকে মনটাকে জোর করে সরাতে হবে। তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মন মুখ এক করতে হবে। কারা তাঁকে 'আমার' করতে পারে? যারা মনটাকে সংসার থেকে, বাইরে থেকে সম্পূর্ণ তুলে আনতে পারে। তাঁকে ষোল আনা দিতে হবে, তবে তো ষোলআনা পাওয়া যাবে।

মীরার সংসারে কিসের অভাব ছিল? চিতোরের অধীশ্বরী, সম্পদের তো অভাব ছিল না কিছু। কিন্তু কেন তিনি সে সম্পদকে ভালবাসতে পারলেন না? কারণ তিনি ভালবেসেছিলেন তাঁর গিরিধারীলালকে, আর কাউকে নয়, আর কিছুকে নয়। তাঁকে সব দিয়েছিলেন, তাই সব পেয়েছিলেন।

আমরা শুনে শিখি, দেখে শিখি, ঠেকে শিখি। বুদ্ধ কি করে শিখলেন? দেখে, শুনে। তাই জরা-মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই পথ খুঁজতে বেরুলেন। আমরাও সংসারে এই তিনটে থেকে শিক্ষা লাভ করি। আঘাত না পেলে, মার না খেলে আমাদের শিক্ষা হয় না। তিনটি ছেলে। একজনকে বলতেই শুনলে। একজনকে একটু ধমক দিলে পরে শুনলে। আর একজনকে কান ধরে মারলে তবে শুনলে। তাকে শাসন করে শেখাতে হয়। এই যে আমরা সংসারকে আঁকড়ে ধরেছিলুম—কি পেলুম? ঠেকে শিখলুম যে কিছুই নেই। তুলসীদাস, বিল্বমঙ্গল এঁরাও ঠেকেই শিখেছিলেন এই জীবনের উদ্দেশ্য কি। পরম উদ্দেশ্য ভগবানকেই আঁকড়ে ধরলেন আর পেলেনও তাঁকে। তাঁকে জানা, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এইটেতেই আমাদের যত ভুল, সংসারে কিন্তু ভুল

হয় না! খালি আমি আর আমার। এই আমি আর আমারটিকে ঘুরিয়ে দিলেই হল তুমি আর তোমার। কেশববাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তো যায় না মশাই! ঠাকুর বললেন, থাক্ না আমি, তাকে দাস করে নাও না!

আমরা সেটা ভুলে যাই, তাই আমিত্বের বন্ধনে পড়ি। কিন্তু যখন আমি তোমার হলুম, কবীর বলেন—

চলতি চাক্কী সব কোঈ দেখে,
কীল না দেখে কোঈ—

কীল দেখলে আর ভয় থাকে না। চলতি চাক্কী তখন আর পিষে ফেলতে পারে না।

আমরা খালি চাকৃতি দেখছি, তাই পিষে মরছি। কীলের কাছে আশ্রয় চাইনি, তাঁর শরণাগত হইনি, সংসারেরই দাসত্ব করছি শুধু, তাঁর দাস হব কি করে? দুই প্রভু থাকবেন কেমন করে? দুই প্রভুর দাসত্ব কেমন করে করবো? One can not serve both God and mammon (ভগবান ও শয়তান দুয়ের সেবা করা যায় না)। তবে ভগবৎবুদ্ধিতে সংসার করলে বন্ধন হয় না। যে জানে মা ছাড়া আর কেউ নেই, আর কিছু নেই তার ভয় কি? সন্তান আমি, দাস আমি। তোমাকেই আমি একমাত্র বলে জেনেছি, অবলম্বন করেছি—এই তো আসল আমি, ভক্তের আমি।

ঠাকুরের কাছে মথুরবাবু বললেন, আমার অবর্তমানে আপনার সেবার অসুবিধা হ'তে পারে, তাই আমি আপনার নামে ৬০০০০৲ টাকার জমিদারি লিখে দিতে চাই। ঠাকুর অস্থির হ'য়ে উঠলেন, 'ও মথুর এ সব কোরো না—আমার মা আছেন, আমার আবার জমিদারি কি?' এমনি করেই ভগবানকে নিয়ে সব ভরে' রাখতে হবে, তাঁকে নিয়ে পূর্ণ হ'য়ে থাকতে হবে, তবেই আর অভাব থাকবে না। 'তুমি আমার' একথাটি বলতেই কত আনন্দ—শান্তি—আর আস্বাদন করতে পারলে তো আর কথাই নাই।

এক ৯০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ সাধুকে হরিদ্বারে দেখেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, কেউ যদি সোনার পাহাড়ও দেখাত আমি ফিরে চাইতাম না। কেন? এমন কি তিনি পেয়েছিলেন?

আমরা কি করি? তাঁকে ফেলে সংসারকে ধরি—উল্টো চলি, তার পর পাই আঘাতের পর আঘাত। তবে এরও দরকার আছে। আমাদের শিক্ষা হয় যে, সংসারে ভগবানের বাইরে আনন্দ নেই। তাই সংসারে যে পথে এগিয়েছিলুম, সেই পথ ধরেই আবার পেছুতে হয়। অশান্তি জ্বালা পেয়ে পেয়ে আবার সে রাস্তাতেই ফিরি যেখান থেকে প্রথমে এসেছিলুম। সেখানে আনন্দের উৎস। ভুল রাস্তা ছেড়ে তখন চলি তাঁর দিকে। তখনই এই ভাবটি নিয়ে সাধনা করতে হয়—'তোমার আমি', আর তাতেই খাঁটি আনন্দ পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ সেই আনন্দ পান করেই গেয়েছিলেন—'চিনি হ'তে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।' বাস্তবিক এ আনন্দ যিনি আস্বাদন করেছেন সংসারের আনন্দ তাঁর কাছে মনে হয় আবিল, নিরর্থক।

সংসার প্রবৃত্তিমার্গ। মানুষের কাম্য, প্রেয়। কিন্তু ভগবানের পথ নিবৃত্তিমার্গ, শুভের পথ, কল্যাণের পথ, শ্রেয়। শ্রেয়কে ফেলে মানুষ প্রেয়ের পেছনে ছুটছে বলেই শান্তি পাচ্ছে না।

যখন দক্ষিণদেশে ত্রিবাঙ্কুরে ছিলুম, তখন এক জজসাহেবের বাড়ীতে কয়েক দিন ছিলুম। আছি কয়েকদিন। বিরাট বড় বাড়ী, ছেলেমেয়ে আসবাব পত্র যা আছে সবই তিনি আমাকে দেখালেন। বললেন,—এ সব তাঁর, আমার নয়। আমি মনে মনে ভাবলুম, 'এ সব তাঁর', সত্যিই যদি এ ভাব হ'য়ে থাকে তবে তো খুবই ভালো। একদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে এসে তিনি আমার ওপরে

নিয়ে গেলেন। একখানি ঘর সুন্দর ঝকঝকে, পবিত্র পরিচ্ছন্ন ঠাকুর ঘর। আমায় ঘরখানিতে নিয়ে গিয়ে বললেন, এতদিন যা দেখেছেন সবই তাঁর। তাঁকে সব দিয়ে আমি কি নিয়ে আছি এই দেখুন। ঠাকুরকে দেখিয়ে বলেন, এই ইনিই শুধু আমার, আর সব তাঁর। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

অর্জুন তো ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাই অহং খোঁটা ধরে ছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কি শেখাচ্ছেন? যোগযুক্ত, নিরাসক্ত কর্ম, সব তাঁর কর্ম। তাঁকে বলছেন, আমি ত্যাগ কর, শরণাগত হও। 'মৎকর্মকৃৎ' আমার কর্ম কর, যা কিছু করছ, সব আমারই কর্ম, তোমার নয়। 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' হে সব্যসাচী! আমার কর্ম কর; তুমি নিমিত্তমাত্র হও। আমিই যন্ত্রী, তুমি যন্ত্রমাত্র হও। আমরা সেটাই ভুলে যাই, আমরা করি 'আমার' কর্ম। তাই গুটিপোকার মতো নিজের জালে, নিজের আবরণে জড়িয়ে পড়ি। কেটে বেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু কয়জনে বেরিয়ে আসেন? দুই একজন মাত্র। যতই তাঁকে আমার করব—ততই তিনি জড়িয়ে ধরবেন। এই যে ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ এটি বড় সুন্দর, বড় মধুর, আমার সত্তা তিনি। আমার সব তিনি, সারাদিন ধ্যানে জ্ঞানে এই চিন্তা এই উপলব্ধি কত আনন্দময়! এই ব্রহ্মসঙ্গীতটির ভাব কী সুন্দর!

"নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার। নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার॥"

তিনি তো কাছে আসেন, আমরাই তাঁকে গ্রহণ করি না। অথচ সংসার একদিন ছাড়তে হবে। এ সংসার চিরস্থায়ী নয়। শ্রীভগবান তাই বলেছেন—"স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" সেই স্থানে যেতে বলেছেন যেখানে চির আনন্দ। এক তাঁরই কৃপা হলে সেই অবস্থা পাওয়া যায়। সর্বদা এই প্রার্থনা করতে হবে, হে ঠাকুর, আমি এতদিন কেবল ঠকে এসেছি, কেবলই বঞ্চিত হয়েছি, আর আমি পারছি না, এবারে তুমি এস, তুমি এসে আমায় ধর। আমায় তুমিই নিয়ে চল তোমার কাছে। শান্তি দাও, আনন্দ দাও। আর এই কোরো যেন তোমাকে আর না ভুলে যাই। এই তো আত্মসমর্পণ, পূর্ণ শরণাগতি।

কুকুর যেমন প্রভুর দরজা ছাড়ে না, শত দুঃখ সহ্য করেও প্রভুরই দরজায় পড়ে থাকে, তেমনি পড়ে থাকতে হবে ভগবানের দরজায়। দরজা খুলবেই। এক ছেলে বাবার হাত ধরে, আর বাবা একছেলের হাত ধরেন। বাবা যার হাত ধরেন সে পড়ে না! তাঁর শরণাগত হলে, তাঁর উপর নির্ভর করলে তিনিই এসে হাত ধরবেন, কোলে তুলে নেবেন।

তিনি কিভাবে পালিয়ে আছেন? লুকোচুরি খেলছেন আমাদের সঙ্গে। তাঁকে ছুঁতে হবে, যেন আর চোর না হই। আর ছুটোছুটি ভাল লাগে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর খেলার সাধ নেই, এবার কৃপা কর, তোমাকে ছুঁতে দাও। প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে এই কথাটি মনে রাখতে হবে, আমি তোমার, তুমি আমার। মন মুখ এক করে তাঁর হয়ে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে। অনেক তো খেললুম, শান্তি তো পেলুম না—তাই কাতর হ'য়ে ডাকতে হবে—খেলনা দিয়েছিলে, খুব খেলেছি—এইবার তুমি এসো এখন তোমাকে চাই।

বহু ভাগ্যবান যাঁরা তারাই সংসারে কষ্ট পান, আঘাত পান। "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।" অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক জন্মের দুঃখ ভোগের পরে আমরা তাঁর দিকে ফিরি, তাঁকে ধরি, ঠেকে শিখি। ঠাকুর বলতেন, মাস্তুল পাকড়াও, আগে আশ্রয় ঠিক করে নাও, তারপর উড়ে' দেখে এসো চারদিকে। সংসারে আমাদেরও যখন জুড়োবার জায়গা মেলে না তখনই মাস্তুলের

খোঁজ করি, তখনই তাঁর ইচ্ছার কাছে মাথা নত করি।

যীশুখ্রীষ্টের জীবনের দিকে ফিরে দেখি। কি অপূর্ব আত্মসমর্পণ! ক্রুশ বিদ্ধ করা হচ্ছে, তবুও বলছেন, "Father, Thy will be done"—হে পিতা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। পেরেক ফুটিয়ে দিচ্ছে সে কোমল অঙ্গে, তবুও ক্ষমাসুন্দর চোখে চেয়ে যীশু বলছেন,—Father, forgive them! They know not what they do. (পিতঃ, ওদের ক্ষমা কর, ওরা জানে না কি করছে।)

একটা গান আছে, খুব সুন্দর—

আর কারে ডাকিব শ্যামা!
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে,
আমি এমন মায়ের ছাওয়াল নয় যে
মা ডাকিব যাকে তাকে।

মা যদি সন্তানকে মারে, ছেলে কাঁদে, মা, মা বলে গলা ধরে। ফেলে দিলেও মা মা বলেই কাঁদে। মাকে অস্বীকার করে না। আমরাও সেই দুঃখের শিক্ষার ভিতর দিয়ে এসেই তাঁকে ধরি, মাস্তলে বসি। পানাপুকুরে জল, পানাতেই ঢাকা থাকে। মাঝে মাঝে কেউ সরিয়ে দেয়, আবার এসে ঢাকে। তাই পরিষ্কার জল পেতে হলে পানা সরিয়ে একটু বেড়া দিয়ে নিতে হয়।

কিছু ভাবনা নেই। তিনি অতীত দেখেন না, দেখেন বর্তমান। মানুষের যদি ৯৯ ভাগ গুণ আর এক ভাগ দোষ থাকে মানুষ পরের সেই এক ভাগ দোষটিকেই বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু ভগবান ৯৯ ভাগ দোষ থাকলেও মানুষের এক ভাগ গুণকেই বড় করে দেখেন। মানুষের দৃষ্টিতে আর ভগবৎ দৃষ্টিতে এই তো তফাৎ।

দুর্যোধনের সম্পদ ছিল, সহায় ছিল, তাই ভগবানকে পেলেন না। পাণ্ডবদের কেউ ছিল না, তাঁরা অসহায় হয়েছিলেন বলেই অসহায়ের সহায়কে পেলেন।

অতীত মুছে যাক্, ভবিষ্যতে কি পাবে জানার দরকার নাই। বর্তমানকে নিয়ে চল। ফিরে দাঁড়াও তাঁর দিকে, ঠাকুর, তুলে নাও আমাকে, ভবিষ্যৎ যা হয় হোক্, এখন তুমি এসো।

তিনি আসবেন—আনন্দের রাজ্যে—অমৃতের রাজ্যে নিয়ে যাবেন।

স্বামীজী ও শক্তির বাণী

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত, এম্-এস্‌সি

"অবহেলিত ও নীতিশূন্য হিন্দুমনে বিবেকানন্দ এসেছিলেন টনিকের মতো"—বলেছেন জওহরলাল নেহরু। টনিক হ'ল বলকারক ঔষধ। স্বামীজীর বাণী যে কোন মানুষের দেহে, প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে নব বল সঞ্চার করে। কিন্তু সাধারণ টনিকের মতো তা ক্ষণিক উত্তেজক নয়; স্বামীজীর বাণী যে একবার মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে তার সমস্ত জীবন পরিবর্তিত হয়ে মঙ্গলে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্বামীজীকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনেকে বলেছেন যে, তাঁকে তাঁদের প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল পুঞ্জীভূত জমাট শক্তির মতো। স্বামীজীর বাণীকে যদিও রোমাঁ রোলাঁ কবির ভাষায় বলেছেন, 'সঙ্গীতের মতো', কিন্তু সে সঙ্গীত বোধ হয় ধ্রুপদসঙ্গীত, তার প্রতিটি সুরমূর্ছনায় শক্তির অনুরণন। এক একটি শব্দ যেন এক একটি শক্তিস্ফুলিঙ্গ, যা মানুষকে নূতন তেজে দীপ্ত করে।

স্বামীজীর ভাষায়, "একমাত্র সত্যই হ'ল শক্তিদায়ক। আমি জানি যে একমাত্র সত্যই সঞ্জীবনী। সত্যাভিমুখী হওয়া ছাড়া শক্তিলাভের অন্য উপায় নেই।"[১] বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যিকারের সত্যের উপাসক ও প্রচারক, তাই বুঝি তাঁর বাণী এত শক্তিগর্ভ।

স্বামীজীর পাপ ও পুণ্যের বিচারও ছিল এই শক্তির মাপকাঠিতে। "শক্তিই পুণ্য, দুর্বলতাই পাপ।"[২] যে কাজ, যে চিন্তা মানুষকে শক্তি দেয়, সবল করে, তাই পবিত্র, তাই পুণ্য, সুতরাং করণীয়; যে চিন্তা ও কাজ মানুষের দেহ, মন বা বুদ্ধিকে দুর্বল করে তাই অপবিত্র, তাই পাপ, অতএব বর্জনীয়। পাপপুণ্যের মাপকাঠি দেশকালভেদে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু স্বামীজীর উপরোক্ত সূত্র বোধ হয় সর্বদেশে সর্বকালেই প্রযোজ্য।

শক্তিলাভ করতে সকলেই চায়। কেউ চায় দৈহিক শক্তি, কেউ চায় মনঃশক্তি,—কেউ চায় বুদ্ধির শক্তি, আবার কেউ চায় আত্মশক্তি। শক্তির যত সূক্ষ্ম প্রকাশ ততই তা বেশী কার্যকরী। দেহের বলের চাইতে মনোবল বড়, তার চেয়ে বুদ্ধিবল, আর সকলের চেয়ে বড় আত্মবল। গীতার ভাষায়, 'দেহাদিবিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা।"[৩] এই আত্মশক্তি লাভই জীবনের উদ্দেশ্য; কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধির শক্তির উৎকর্ষ লাভ না করলে এই আত্মশক্তি লাভ করা যায় না। তাই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্র বলছেন, "শরীরমাদ্যং", তাই বোধ হয় স্বামীজীও বলছেন, "একটু শক্ত মাংসপেশী নিয়ে গীতার মহিমা তোমরা ভাল বুঝবে। একটু শক্ত শরীর নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে তোমরা উপনিষদের বাণী ও আত্মার মহিমা আরও ভাল বুঝবে।"[৪]

স্বামীজী সমস্ত জীবন এই শক্তির বাণীই শুনিয়ে গেছেন। আর আমাদের শাস্ত্রের চরম বাণীও এই শক্তির বাণী। আমাদের শাস্ত্র সমস্ত বিশ্বের কাছে এই শুভবাণীই প্রচার করে যে, মানুষ অমৃতের সন্তান; মানুষের অন্তরে সুপ্ত রয়েছে অসীম শক্তি, মানুষের অন্তরে দেবতা ঘুমিয়ে রয়েছেন। এর চেয়ে অভয় বাণী আর কি হতে পারে? স্বামীজী তাই বলেছেন, "আজকের জগতের যে ব্যাধি শক্তিই হ'ল তার ঔষধ। যখন দরিদ্র ধনীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়, শক্তিই সেই দরিদ্রের ঔষধ। যখন অজ্ঞানী জ্ঞানীর কাছে নিষ্পেষিত হয়—সেই অজ্ঞানীর ঔষধও শক্তি। যখন এক পাপী অন্য পাপীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয় শক্তিই সেই পাপীর ঔষধ। আর অদ্বৈত বেদান্ত যে শক্তি দিতে পারে অন্য কিছুই তেমন পারে না।"[৫]

আত্মজ্ঞান লাভ করলে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই উপলব্ধিতে মানুষ ভয়শূন্য হয়। দ্বৈতভাব থেকেই ভয়ের উৎপত্তি হয়। যেখানে এক বই দুই নেই সেখানে কে কাহাকে ভয় করবে? উপনিষদের বাণী 'অভীঃ'র বাণী। স্বামীজী তাই কেমন জোর দিয়ে বলেছেন, "উপনিষদ্ থেকে যদি কোন শব্দ বোমার মত বেরিয়ে এসে স্তূপীকৃত অজ্ঞানরাশির উপরে ফেটে পড়ে সে শব্দ হচ্ছে 'অভীঃ'। 'অভীঃ'র ধর্মই—আজকাল একমাত্র প্রচার করা প্রয়োজন।··· কেন এই ভয়? আমাদের সত্যিকার প্রকৃতিকে না জানা। সকল সম্রাটের যিনি সম্রাট

১ Complete works of Swami Vivekananda Vol. II, Page 201

২ Complete works of Swami Vivekananda Vol. III, Page 160

৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা.........৩।৪৩

৪ Complete works of Swami Vivekananda Vol. III, Page 242

৫ Complete works of Swami Vivekananda Vol. II, Page 201

আমরা সেই ঈশ্বরের সন্তান। শুধু তাই নয়, আমরা ঈশ্বরই; যদিও আমরা আমাদের সত্যিকার স্বরূপ ভুলে গিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র মানুষ বলে মনে করি।"[৬] আজ তাই অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত জনসাধারণের মধ্যে এই শক্তির বাণী প্রচার করা প্রয়োজন। তবেই না মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। মানুষকে দিনরাত দুর্বল, অসহায়, পাপী বলতে বলতে সে তো তাই হয়ে যাবে। তাকে শক্তির বাণী, আশার বাণী, শোনাতে হবে। স্বামীজী বলছেন, "দুর্বলতার ঔষধ দিনরাত শুধু দুর্বলতার কথা ভাবা নয়, বরং শক্তির কথা চিন্তা করা।"[৭] জনমনের উপযোগী স্বামীজীর বাণী এই শক্তিরই বাণী। মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেদের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান করবে এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অদ্বৈতের এই অভয় বাণী, শক্তির বাণী প্রচার করতে চাইলেও স্বামীজী দ্বৈতবাদীদের নিন্দা করতে চান নি। পরাভক্তি ও পরমজ্ঞান মানুষকে একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লোকই ঠিক ঠিক পরাভক্তি বা পরমজ্ঞান লাভ করতে পারে। সাধারণ লোক অনেক সময় ধর্মের নাম দিয়ে নানারূপ অপকর্ম করে। বেদান্তের দোহাই দিয়েও নানারূপ অনাচার চলে। নানারকম পাপানুষ্ঠান করেও মুখে বলা যায়—আমি বেদান্তবাদী, অতএব পাপপুণ্যের বিচারের ঊর্ধ্বে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এ ধরনের বেদান্তকে নিন্দা করেছেন। স্বামীজীর মতে কিছু সংখ্যক লোকের সত্যের এই সব অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও যা সত্য, যা শক্তিপ্রদ তাই প্রচার করতে হ'বে। তিনি বলছেন, "কেউ কেউ ভয় করে থাকেন যে যদি সম্পূর্ণ সত্য সকলের কাছে প্রচার করা যায়, তাহলে তাদের ক্ষতিই হ'বে। তাদের মতে সকলকে অবিমিশ্র সত্য পরিবেশন করা উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সাথে এই আপোষ সত্ত্বেও পৃথিবীর এমন কিছু উন্নতি হয় নি। যেরূপ রয়েছে তার চেয়ে এমন আর কি খারাপ হতে পারে? সত্যকেই প্রচার কর। যদি সত্য হয়, তাহলে তার প্রচারের শুভফল হবেই।"[৮] দ্বৈত-বাদীদের ব্যক্তি ঈশ্বর, কোমল ভক্তিভাব, দীনতা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু পরিণামে তা অধিকাংশ লোকের কাছে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। স্বামীজীর ভাষায়—"প্রকৃতি থেকে পৃথক ব্যক্তি ঈশ্বর, যাকে পূজা করা যায়, ভালবাসা যায়—এ খুব সুন্দর। এ ভাব খুবই কমনীয়। কিন্তু বেদান্তের মতে এই কোমল কমনীয় ভাব মাদকতা থেকে আসে, অতএব স্বাভাবিক নয়। শেষ পর্যন্ত এ ভাব মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আর আজকের পৃথিবীতে যে জিনিস খুব বেশী করে দরকার সে হচ্ছে—শক্তি।"[৯] তাই বলে স্বামীজী যে পূজাপদ্ধতি বা দ্বৈতভাবের বিপক্ষে ছিলেন তা নয়। জ্ঞানে অনধিষ্ঠিত যে ভক্তি কেবল কোমলতা, কমনীয়তা, আরামপ্রিয়তা নিয়ে আসে, সে ভক্তি আসল ভক্তি নয়—এ বিষয়ে তিনি সাবধান করেছেন। স্বামীজীর কাছে পূজা উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, নিছক ভাবালুতা নয়। তিনি বলেন—

জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার এ ভব-ঈশ্বর,

৬ Complete Works of Swami Vivekananda Vol. III, Page 160.

৭ Complete Works of Swami Vivekananda ol. III, Page 298.

৮ Complete Works of Swami Vivekananda Vol. VIII, Page 96.

৯ Complete Works of Swami Vivekananda Vol. II, Page 198.

মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক্ তোমা
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।[১০]

মানুষের দুঃখ, সব যন্ত্রণার মূলে হ'ল দুর্বলতা, আর এই দুর্বলতার কারণ হ'ল নিজের খাঁটি সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। আমরা যে রাজার ছেলে, ব্রহ্মময়ীর বেটা তা ভুলে গিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র পাপী বলে ভাবছি। তাই স্বামীজী সমস্ত ধর্মের সার তত্ত্বটি আমাদের সামনে তুলে ধরে বলছেন, "এই মায়ার ঠুলি খুলে ফেললেই সব দুঃখ দুরীভূত হয়। অত্যন্ত সহজ ও সরল এই কথা। অসংখ্য দার্শনিক যুক্তিতর্ক ও মানসিক মল্লযুদ্ধের পর আমরা সমগ্র পৃথিবীতে সহজতম এই একটি আধ্যাত্মিক মতবাদে এসে পৌঁছাই।"[১১]

বর্তমানে ভারতে ও ভারতের বাইরে স্বামীজীর এই শক্তিবাদ আরও বিশেষ করে প্রচারের প্রয়োজন। আজও ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের প্রধান সমস্যা হ'ল দৈহিক, মানসিক অথবা নৈতিক দুর্বলতা। স্বামীজী উপনিষদের বাণীকে ভাষ্যরূপ দিয়ে বলছেন, কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? ওসব নেতিবাচক মনোভাব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাহলেই দিনে দিনে তোমার মঙ্গল হ'বে। কিছুই নেতিবাচক নয়, সবই ইতিবাচক। আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আমারই ভেতরে সব আছে। আমি স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান যা কিছু চাই সবই লাভ করব। কে বলে তুমি পীড়িত? ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেল। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি, বলমসি বলং ময়ি ধেহি, ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি, সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি। আবার বলছেন, সোঽহম্। মাতৃদুগ্ধের সাথে সাথে শিশুরা এই শক্তির বাণী গ্রহণ করুক। সোঽহম্, সোঽহম্, সোঽহম্। প্রথমে শ্রবণ করুক। শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদি। তারপরে চিন্তা করে দেখুক, আর সেই চিন্তা থেকে আসবে এমন কাজ যা পৃথিবীতে কেউ কখনও দেখেনি।

১০ বীরবাণী 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' শীর্ষক কবিতা

১১ Complete Works of Swami Vivekananda Vol. II, Page 198.

সন্ন্যাসী

শ্রী নি. চ. ব.

বৃন্দাবনের ধূলিময় পথ
রৌদ্রে করিছে ধূ ধূ—
যতদূর যায় দৃষ্টির রেখা
লোকজন কোন নাহি যায় দেখা,
গ্রীষ্ম-ঋতুর মধ্য প্রহরে
ঘুঘু ডেকে যায় শুধু।

এমন সময়ে সন্ন্যাসী এক
আসেন সে পথ দিয়া—
দূরভ্রমণের দারুণ ক্লান্তি
জড়ায় সর্ব অঙ্গে শ্রান্তি,
আকুলি উঠেছে বারে বারে তাঁর
পিয়াস-কাতর হিয়া।

ক্লান্ত নয়নে হেথা হোথা চান
স্বামীজী বিবেকানন্দ—
বাজার দোকান খোলা নাহি আর
তুলে লয়ে গেছে সকল পশার—
উষ্ণ দিনের খর উত্তাপে
গৃহেরও দুয়ার বন্ধ।

সহসা দেখেন বস্তির মাঝে
ক্ষুদ্র কুটির প্রান্তে—
খাটিয়ার পরে করিয়া শয়ন
মলিনবসন দীন একজন
চক্ষু মুদিয়া হুঁকাটি টানিছে
দিবসের ভোজনান্তে।

কাছে গিয়া তারে শুধান সাধুজী
দ্বিধা সংকোচ নাই—
"বহু দূরে মোরে আজি হবে যেতে;
পথের শ্রান্তি তৃষা নিবারিতে
শুধুই একটি ছিলিম তামাক
দেবে কি আমারে ভাই?"

"মহারাজ, আমি জাতিতে ভাঙ্গী"
গৃহস্থ কহে ধীরে।
চমকি উঠেন শুনি তাহা স্বামী
রাজপথে পুন দাঁড়াইল নামি,
আপন ভাগ্যে ধিক্‌কার দিয়া
আ'বার চলেন ফিরে।

কিছুদূর যেতে বিবেক তাঁহারে
ভৎর্সিয়া যেন উঠে—
ত্যেয়াগী-পুরুষ, একি তব রীত
হেন আচরণ না হয় উচিত
হীন ক্ষুদ্রতা পুষিয়া রেখেছ
আজিও চিত্তপুটে?

ছোট বড় নীচ সকল জীবই
একই বিভুর সৃষ্টি;
আকাশের তলে সবাই সমান
সকলের মাঝে রাজে ভগবান,
সন্ন্যাসী তুমি, তবু কেন হেন
অনুদার তব দৃষ্টি?

বিভেদের রেখা টান চারিধারে
এতো নহে তব শিক্ষা;
তবু কেন অস্পৃশ্য বলিয়া
ছাড়িয়া তাহারে আসিলে চলিয়া,
ব্যর্থ কি তব সকল সাধনা,
বৃথাই তোমার দীক্ষা?

সম্বিত পেয়ে স্বামীজী ত্বরিতে
কুটিরে আসেন ছুটে।
হুঁকা কাড়ি নিয়া তার হাত হতে
লাগেন টানিতে মনের সুখেতে,
স্তম্ভিত হয়ে গৃহস্থ রয়
মুখে নাহি কথা ফুটে।

অচ্ছুৎ সনে ঘরোয়া কথায়
মাতেন বিবেকানন্দ।
দূরিত হইয়া সকল ভ্রান্তি
আননে ভাতিল স্নিগ্ধ শান্তি,
সৌম্য সহাস নয়নে উজলে
অনাবিল আনন্দ।

ম্যাথু আরনল্ড

অধ্যাপক রেজাউল করিম এম্-এ, বি-এল্

ভিক্টোরিয়াযুগের কবি ও সমালোচক ম্যাথু আরনল্ড বৃটিশ সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রাস্‌কিন যেমন আর্টের জগতে একজন বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরশীল 'অথারিটি' ছিলেন, ঠিক সেইরূপ ম্যাথু আরনল্ড সমালোচক রূপে, শিক্ষাবিদ্ রূপে সমাজে একজন 'অথারিটি' বলিয়া মর্যাদা পাইয়াছিলেন। আরনল্ডের রচনার মধ্যে দুইটি বিভিন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যুগে কাব্য-জগতে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বেশ একটা বিরোধ দেখা দিয়াছিল। প্রেরিত ধর্মের (Revealed religion) প্রতি বহু কবির মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। আরনল্ডের বহু কবিতার মধ্যে সেই যুগের এই সন্দেহবাদ প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি নিজেও সন্দেহবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অনেক সময় কর্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি এই 'সন্দেহ'কে স্থির বিশ্বাসে পরিণত করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার কবিতায় আছে দুঃখ, বেদনা, অনুতাপ অথবা আত্মসমর্পণ। তিনি শুধু কবিই নন। একজন প্রথমশ্রেণীর গদ্য লেখকও ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার গদ্য রচনাও অপূর্ব সম্পদ। গদ্যরচনার মাধ্যমে তিনি ভিক্টোরিয়াযুগের বহু অনাচার ও ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আরনল্ড কিছুতেই সভ্যতার ভানকে (sham) সহ্য করিতে পারেন নাই। সেযুগের বৃটিশ সমাজের নোঙরামিকে (barbarism) তিনি আক্রমণ করিয়া বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার এই সব আক্রমণাত্মক রচনার মধ্যে ছিল হাল্কা বিদ্রূপ আর সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ। যুক্তির প্রধান অংশরূপে তিনি বিদ্রূপ ও পরিহাসের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে যুগের বিখ্যাত লেখক কারলাইলও প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ ছিল হিব্রু প্রফেট্‌দের মত। তাহাতে ছিল উত্তাপ, ঝাঁঝ আর তীব্র আঘাত। কারলাইলের কথা বলার ভঙ্গীটা এই রূপ:—যদি তোমরা আমার বাণী গ্রহণ না কর, তবে তোমাদের সর্বনাশ হইবে। কিন্তু আরনল্ড ছিলেন একান্ত সংস্কৃতিমান লেখক। তাঁহার আক্রমণ ছিল সংস্কৃতিমান গ্রীকদার্শনিকের মত। তাঁহার কণ্ঠে মৃদু ভাষণ, তাঁহার বক্তৃতা কোমল ও প্রীতিকর। কেহ যদি তাঁহার সহিত একমত না হইতে পারে তবু তিনি তাহার মনে এই ভাবটা জাগাইতে পারিবেন যে সে একজন অত্যন্ত সংস্কৃতিমান লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছে আর সে নিজে সংস্কৃতির দিক দিয়া অত্যন্ত দরিদ্র। কারলাইল ও আরনল্ড এই দুইজন মহারথী, বহুদিক দিয়া পৃথক। তবুও তাঁহারা একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, একই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশ্য—কেমন করিয়া দেশবাসীর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করা যায়।

ম্যাথু আরনল্ডের রচনাবলী পাঠ করিলে দুইটি বিষয় বুঝিতে হইবে। তিনি গৃহে পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার আরনল্ড সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষক ও নীতিবিশারদ ও ধর্মপ্রাণ সাধক ছিলেন। শৈশবে এই পিতার নিকট ম্যাথু আরনল্ড ধর্মভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পিতা তাঁহার মনে জাগাইয়া দিয়াছিলেন ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী বালক যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে হইল এক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জগতের। তাঁহার হৃদয়ে ছিল ধর্মভাব, মন ছিল সরল ও

সহজ। হৃদয় বলিল, পিতার ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে। আর তাঁহার মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি বলিল, প্রমাণ চাই। বিনা প্রমাণে কিছু বিশ্বাস্য নহে। বৈজ্ঞানিক সত্যতাই সব কিছুর মানদণ্ড। হৃদয় ও মস্তিষ্ক, যুক্তি ও সহজাত জ্ঞান (Intuition)—এই পরস্পরবিরোধী আদর্শের দ্বন্দ্ব চলিল তাঁহার মনে। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা তিনি করিতে পারিলেন না। আর সেই জন্য তাঁহার কবিতা বিশ্বাস ও সন্দেহের সীমারেখার মধ্যে অস্থিরভাবে আলোড়িত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করিতেন যে, কবিতা হইতেছে জীবনের সমালোচনা। কিন্তু যে কোন কবিতাকে এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে চলে কি? যে সব কবিতা 'সত্য ও সৌন্দর্যের' আদর্শ বজায় রাখিয়া লিখিত সেই সব কবিতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহা হইবে জীবনের সমালোচনা। যে সব কবি মনে করেন কবিতা হইতেছে আত্মার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, আরনল্ডের কবিতার আদর্শ তাঁহাদের আদর্শ হইতে বিভিন্ন। কেননা, আরনল্ড মনে করেন যে কবিতা হইতেছে 'সমালোচনা'। আরনল্ড কবিতা লিখিলেন মস্তিষ্কের জন্য, তাহাতে আছে বুদ্ধির দীপ্তি, সমাজের সূক্ষ্ম সমালোচনা। তাহাতে হৃদয়ের আবেদন নাই বলিলেই চলে। আবেগ ও উচ্ছ্বাস অপেক্ষা অনাসক্তি ও সমালোচনার দ্বারা তাঁহার কবিতা প্রভাবিত। তিনি কবিতায় অলঙ্কার ও দীপ্তিময় শব্দ-প্রয়োগ ভাল বাসিতেন না। তিনি মনে করেন যে আলঙ্কারিক ভাষা কবিতাকে তাহার বিষয়বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তাঁহার মডেল বা আদর্শ ছিল গ্রীক কবিতা। তাঁহার ধারণা যে গ্রীক কবিতা হইতেছে খাঁটি আদর্শ। বৃটিশ কবিদের মধ্যে তিনি মিল্টন ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার বহু কবিতায় ইঁহাদের প্রভাব লক্ষিতব্য।

ম্যাথু আরনল্ড বহু কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু গদ্য-সাহিত্যেও তাঁহার দান কম নহে। গদ্য-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। Essays in criticism তাঁহার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। সমালোচনার মান সম্বন্ধে তিনি যে সব সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা আজিও সমালোচক মহলে সমাদৃত। আরনল্ড বলেন যে, সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য দোষত্রুটি ধরাইয়া দেওয়া নহে, অথবা সমালোচকের নিজের বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ করাও নহে। "To know the best which has been thought and said in the world"—অর্থাৎ জগতে যাহা চিন্তা করা ও বলা হইয়াছে তাহাকে উৎকৃষ্টভাবে জানাই হইতেছে সমালোচনার কাজ। একটা গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকেই জগতের মধ্যে এমন ভাবে প্রচার করিতে হইবে যেন সতেজ ও স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার সমালোচনাপূর্ণ রচনার মধ্যে "Study of Poetry"—Wordsworth, Byron, Emerson—এই গুলিই সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার আর একখানি পুস্তকের নাম Literature and Dogma। ধর্মের ব্যাপারে উদারতা অবলম্বনের সমর্থনে ইহা লিখিত। তাঁহার Culture and Anarchy একটি অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি কতকগুলি শব্দকে নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা এখন চলতি কথার মত হইয়া পড়িয়াছে,—যথা, Sweetness and light, culture, Barbarian, Philistine, Hebraism। এই সব শব্দ আরনল্ডের সহিত অমর হইয়া রহিয়াছে।

Barbarian বলিতে তিনি সেই সব অভিজাত শ্রেণীর লোকের কথা মনে করিতেন যাহারা আত্মার সংবাদ রাখে না, যাহারা মনের দিক দিয়া রুক্ষ ও কর্কশ। তাহারা যদিও ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে তবুও তাহাদের মধ্যে কমনীয়তা নাই,

আর তাহাদের সব কিছুই কৃত্রিমতায় ভরা। Philistine সেই সব মধ্যবিত্ত সমাজের লোক যাহারা সঙ্কীর্ণমনা, আত্মসন্তুষ্ট, যাহাদের মনে কোন জিজ্ঞাসা নাই। আরনল্ড ইহাদেরকে লইয়া বেশ ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ইহারা নূতন নূতন চিন্তার সামনে নিজেদের মন খুলিয়া দেয়। Hebrain অর্থে আরনল্ড সেইসব লোককে মনে করেন যাহারা কেবল নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। কারলাইল সব সময় হিব্রু আদর্শ অর্থাৎ জীবনের উপর নৈতিক আদর্শের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাথ্যু আরনল্ড Hellenic অর্থাৎ গ্রীক মানসিক আদর্শ প্রচার করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য সর্বদা নূতন ভাব ও চিন্তাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। শিল্প বা আর্ট জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। যে আর্ট পৃথিবীর সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে সেই আর্টকে তিনি গ্রীক-সভ্যতার অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, গ্রীক শিল্পের চরম বাণী হইতেছে "To see things as they are" প্রকৃতিতে যেমনটি আছে, ঠিক সেইটাকেই দেখা। তাঁহার মতে হিব্রু আদর্শের চরম বাণী হইতেছে "Conduct and obedience" অর্থাৎ আচরণ ও বশ্যতা।

আরনল্ডের যুগে সাহিত্যের আদর্শ ও পদ্ধতির বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগের আর্টের জন্য আর্ট এই নীতির দ্বারা এ যুগের শিল্পীগণ আর প্রভাবিত নহেন। একটা সুস্পষ্ট নৈতিক সুর শিল্পীগণকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিয়াছে। এ যুগের বড় বড় লেখকগণ শুধু শিল্পী নহেন, তাঁহারা শিক্ষাদাতাও বটে। তাঁহাদের রচনায় প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ভাব বিদ্যমান। তাঁহাদের লক্ষ্য এই যে মানুষকে উন্নত করিব, শিক্ষা দিব, বড় করিয়া তুলিব। কারলাইল ও রাসকিন এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্য-সাধনা করিয়াছেন। আরনল্ডও যুগের এভাব পরিহার করিতে পারেন নাই। তিনি বৃটিশ জাতিকে বাস্তব, কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় ধর্মশিক্ষা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কারলাইল বৃটিশ জাতির মধ্যে প্রাচীন এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন (Anglo-Saxon) গুণ অনুপ্রবিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। রাসকিন মধ্যযুগের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন। তিনি ক্লাসিকাল ও রিনেসান্সের যুগ হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া মধ্যযুগের উপর নিবদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু আরনল্ড বলিলেন, না, তাহা হইলে চলিবে না; কেননা বৃটিশ জাতির অভাব হইতেছে ক্লাসিকালগুণগুলির (Classical qualities)। সাহিত্য ও নীতির মধ্যে একটা (Harmonious perfection) একতানিক পূর্ণতা দরকার। ইহা ক্লাসিকাল আদর্শই দিতে পারে। সুতরাং তিনি গ্রীক আর্টকে অবলম্বন করিতে বলিলেন। বস্তুতঃ তিনি বৃটিশ দ্বীপের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করেন। সাংস্কৃতিক দিক হইতে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।

এখন আমরা ম্যাথ্যু আরনল্ডের একটি প্রতি-নিধিমূলক কবিতার বিষয় আলোচনা করিব। তাহাতে পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তি, বিজ্ঞান ও সন্দেহের যুগে তাঁহার মন কি ভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল। কবিতাটির নাম Scholar Gipsy। নিম্নে ইহার মর্মার্থ দেওয়া গেল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র গ্লেন-ভিলের (Glanvil) Vanity of Dogmatising (১৬৫১ সালে লিখিত) পুস্তকটি পড়ার পর এই ধারণা করিল যে, উক্ত পুস্তকে যে জিপসী ছাত্রের কথা (স্কলার জিপসির) উল্লেখ আছে সে এখনও জীবিত আছে। হয়ত সে অক্সফোর্ডের আশেপাশে কোথাও অপেক্ষা করিতেছে এবং কোন এক

মুহূর্তে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিবে। তাহারই অনুসন্ধানে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত কাজ-কর্ম ত্যাগ করিয়া সেই জিপসির সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। একদিন একটি স্থানীয় মেষপালককে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই, তুমি কি আমাকে সাহায্য করিবে?" তদনুসারে উক্ত মেষপালক ঐ অঞ্চলে অনেকদিন ধরিয়া অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মেষ-পালক শেষ পর্যন্ত তাহার মেষপালনের দায়িত্ব অবহেলা করিয়া পাগলের মত খুঁজিতে লাগিল। অক্সফোর্ডের ছাত্রটি এখন বুঝিল যে, এই দ্বিপ্রহর বেলায় মেষপালক তাহার কাজে অবহেলা করিতেছে ইহা কিন্তু মোটেই উচিত নহে। তখন ছাত্রটি তাহাকে তাহার মেষদলের মধ্যে প্রেরণ করিল এবং নিজেই স্কলার জিপসির সন্ধানের জন্য বাহির হইল। ক্লান্ত হইয়া সে একটি শস্যক্ষেত্রের নিকট বসিল। তাহার সঙ্গে ছিল গ্লেনভিলের সেই প্রিয় পুস্তকটি। সেই পুস্তকে পুনরায় দরিদ্র ছাত্রটি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিল, কেননা পুস্তকটি তাহাকে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিয়াছিল।

এক্ষণে কবি আরনল্ড গ্লেনভিল-বর্ণিত সেই জিপসি ছাত্রটির (Scholar Gipsy) পরিচয় দিতেছেন। আজি হইতে দুই শত বৎসর পূর্বে সে অক্সফোর্ডে পড়িত কিন্তু দারিদ্র্যের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া সে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কোন উপায় না দেখিয়া ছাত্রটি একটি যাযাবর-দলের (Gipsy) সহিত মিশিয়া গেল, কারণ সে বিশ্বাস করিত যে এই সব জিপসিগণের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহারা অপর লোকের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। এই ছাত্রটির উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া জিপসিদের গোপন বিদ্যা শিখিয়া ফেলিবে, তারপর সেই বিদ্যা পৃথিবীর মানবসমাজে বিতরণ করিবে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষিত বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে না। ইহার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হয়। সাধনা করিতে করিতে হঠাৎ একটা বিশেষ মুহূর্ত বা লগ্ন উপস্থিত হয়। সেই লগ্নেই জিপসিদের বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীকে ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে গ্লেনভিলের যুগের সেই ছাত্রটি দুইশত বৎসর ধরিয়া জ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। বহু লোকে তাহাকে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে। গুজব যে কয়েকদিন পূর্বে সেই ছাত্রটিকে অক্সফোর্ডের পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলে দেখা গিয়াছে। সে মনমরা হইয়া পথ হারাইয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন দিন তাহাকে মদের দোকানে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। দোকানে সে গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া বসিয়া আছে। কোন দিকে দৃষ্টি নাই। তারপর দেখা গেল হঠাৎ সেখান হইতে উঠিয়া দৌড়াইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আরনল্ডের যুগের ছাত্রটির জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, যেমন করিয়া হউক সেই জিপসি ছাত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। সুতরাং সে চতুষ্পার্শ্বের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিল। সেই জিপসি ছাত্রটি নির্জনতা ভালবাসিত। তাহাকে মাঠের রাখাল বালকগণ বহুদিন দেখিয়াছে—কোলে একগাদা ফুল লইয়া তাহাকে টেম্‌স্ নদী পার হইতে দেখিয়াছে। কখন কখন গ্রামের ছোট ছোট বালিকাগণকে ফুল দিয়াছে। আবার কখন অল্প সময়ের জন্য নদীর তীরে চুপ করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার পর হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে। কোন কোন গৃহস্বামী এবং শিশুগণ তাহাকে কয়েকবার দেখিয়াছে—সে যেন বহুক্ষণ ধরিয়া কিসের দিকে লক্ষ্য করিয়া অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছে। হেমন্ত বা শরৎকালে তাহাকে দেখা গিয়াছে, জিপসিদের

তাঁবুর নিকট বসিয়া আছে। এই সব জিপসিগণের জানা আছে এক অদ্ভুত গূঢ় বিদ্যা। সে তাহা জানিতে চায়—তাহাই পাইবার জন্য ও একটি স্বর্গীয় প্রেরণা লাভ করিবার জন্য সে বহুদিন হইতে জিপসিদের দলে থাকিয়া অপেক্ষা করিতেছে। বর্তমান যুগের ছাত্রটি একবার শীতকালে সেই জিপসি ছাত্রকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে,—সে যেন একটি সেতুর নিকট দাঁড়াইয়া তুষারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। সেই সময় অক্সফোর্ডে ক্রাইষ্ট কলেজ হলে একটা ভোজের উৎসব হইতেছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, সে একদৃষ্টে সেই আলোর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইল যে জিপসি ছাত্রটি এই কথাই চিন্তা করিতেছে যে, সে একদা যে অক্সফোর্ড ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল আজ সেখানে কি নিদারুণভাবে উৎসবের ঘটা হইতেছে। পরক্ষণেই তাহার জীবনের মিশন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল এবং উৎসবের দৃশ্য হইতে উঠিয়া গেল তাহার দীন আশ্রয়-স্থানে। তাহার বর্তমান জীবন অত্যন্ত কষ্টকর, তবুও সে উৎসবের দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। ইহার পর বর্তমান ছাত্রটি হঠাৎ বুঝিতে পারিল যে উক্ত জিপসি ছাত্রটির পক্ষে এক্ষণে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। সেই ১৬৫১ সালে যে ছাত্রটি অক্সফোর্ডে পড়িত সে যে এখনও আত্মপ্রকাশ করিবে, মধ্যে মধ্যে অক্সফোর্ডের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। ইহা তাহার নিছক কল্পনা মাত্র। সে বহু বৎসর পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে এবং পল্লীর কোন এক অজ্ঞাত স্থানে সমাহিত আছে।

এইবার কবি আরনল্ডের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মনে হইল কবি যেন নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছেন। বুঝা গেল যে বর্তমান যুগের ছাত্রটি কবি নিজেই। পূর্বে বলিলেন যে জিপসি ছাত্রটি মরিয়া গিয়াছে, এইবার সেই কথাটা সংশোধন করিয়া বলিলেন যে, বোধ হয় জিপসিরা সাধারণ মানুষের মত নহে। হয়ত তাহারা মৃত্যুকে জয় করিতে পারিয়াছে এবং সাধারণ মানুষের মত তাহাদের মৃত্যু হয় না। কারণ জিপসিদের জীবন সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর। বর্তমান যুগের মানুষ যে সব আঘাত ও পরিবর্তন সহ্য করে তাহার ফলে তাহার আয়ু হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু জিপসিগণকে এই সব আঘাত ও পরিবর্তন (Shocks and changes) সহ্য করিতে হয় না। তাহারা সে সব হইতে মুক্ত। সেই জন্য তাহারা দীর্ঘায়ু হয়। বর্তমান যুগের এই যে পরিবর্তনপূর্ণ অশান্ত জীবন সে প্রকার জীবন জিপসিদের ছিল না, তাহারা মৃত্যুকে জয় করিবার আর্ট শিখিয়াছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে জিপসিগণ হয়ত একদমও মরিবে না। জিপসিদের জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য আছে, একটি মাত্র ব্রত আছে, একটি মাত্র কামনা আছে। তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্ন হয় নাই, সে কোন দিন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে নাই। সেই জন্য তাহার শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। সুতরাং সে যে আমাদের মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এ যুগের মানুষ কোন বিষয়েই গভীর ভাবে চিন্তা করে না অথবা তাহাদের কোন দৃঢ় সংকল্প নাই। আমরা প্রতি কাজে ইতস্ততঃ ভাব দেখাই, এবং একটা অসহনীয় জীবন যাপন করি। কোথাও কাহারও একটু ক্ষীণ আশার আলো নাই,—এমনকি আমাদের বিজ্ঞতম ব্যক্তির সম্মুখে কোন আশার সম্ভাবনা নাই। এই সব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেদের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বলিতে পারেন, তাঁহাদের মনে যে আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহার কথা বলিতে পারেন কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কোন আশা ও আনন্দের সাক্ষাৎ তাঁহারা পান না। বিজ্ঞ লোকের অবস্থা যদি ইহা হয় তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের

জীবন কত করুণ, কত ব্যর্থতায় ভরা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ আমাদের কোন আশা নাই, কোন বিশ্বাস নাই, সম্মুখের দিকে চাহিবার মত কোন আশীর্বাদ (Bliss) আমাদের নাই। আমাদের জন্য কেবল নিদারুণ মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু উক্ত জিপসি ছাত্রটি সরল সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়াছে। কোন সন্দেহ দ্বারা তাহার মন ভারাক্রান্ত হয় নাই। তাহার সম্মুখে ছিল সেই আনন্দের বস্তু, সেই আশীর্বাদের সামগ্রী যাহার নাম মরণহীন অনন্ত আশা। তাহার অবিভক্ত উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুতরাং সে কোন মতেই মরিতে পারে না।

সেই জিপসি ছাত্রের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। কোন বিপরীত ভাব ছিল না। তাহার জীবনের আদর্শের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না। তাই সে দুঃখের সংবাদ জানিত না। তাহার চিন্তার মধ্যে কোন দ্বিধা ও গণ্ডগোল ছিল না, সুতরাং আনন্দই ছিল তাহার চিরসঙ্গী। এই সব কারণে সেই জিপসি ছাত্রটি বর্তমান যুগের চঞ্চল অশান্ত জরাজীর্ণ জীবনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া গভীর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল এবং সযত্নে তাহার নির্জনতা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। যদি সে কোন দিন লোকালয়ে আমাদের নিকটে আসে এবং আমাদের এই বর্তমান সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জীবনের ব্যাধিগুলি তাহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়া যাইবে। সন্দেহ, দুঃখ ও হতাশা এই সব আধুনিক ব্যাধির দ্বারা সেও আক্রান্ত হইবে।

তাহার পর কবি আরনল্ড আবেগভরে বলিতেছেন,—না, না, জিপসি ছাত্রের আমাদের মধ্যে আসিবার কোন দরকার নাই। তাহাকে দূরে পলাইয়া যাইতে দাও। সে যেখানে চলিয়া গিয়াছে সেইখানে সে তাহার নির্জনতা রক্ষা করুক। তাহাকে তাহার বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় লইয়া নিজের পন্থায় চলিতে দাও। দাও তাহাকে তাহার হৃদয় সতেজ, সবুজ রাখিতে। বর্তমান যুগের মানসিক দ্বন্দ্বের ছোঁয়াচ হইতে বহু দূরে তাহাকে থাকিতে দাও।

"Before this strange disease
of modern life,
With its sick hurry,
its divided aims,
Its heads o'ertaxed,
its palsied heart was rife
Fly hence, our contact fear !"

কারণ বর্তমান যুগের এই চঞ্চল ও তরল স্পর্শ তাহার সদানন্দময় আত্মাকে কলুষিত করিয়া দিবে। ফলে সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, সে জরাজীর্ণ ও বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে, এবং অভিশপ্ত ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মানব-মনের যে সব রিপু পবিত্র আনন্দ ও অনাবিল শান্তির প্রতিবন্ধক জিপসি ছাত্র সেই সব রিপুকে বর্জন করিয়া চলিবে। হাসি ও স্তোকবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বর্তমান সমাজের নিকট আনিবার চেষ্টা হয়ত অনেকে করিতে চাহিবে। কিন্তু কেন সে আসিবে? সে আসিয়াই বা কি করিবে? সে যদি আসে তবে তাহার গভীর প্রশান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার সুদৃঢ় ও সুস্থির আশা, এবং মহৎ আদর্শের প্রতি তাহার অপরিবর্তনীয় নিষ্ঠা একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। না, না, তাহাকে পলায়ন করিতে দাও! তাহার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া সে অনাবিল আনন্দ অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ করুক।

উপরে স্কলার জিপসির (Scholar Gipsy) সারাংশটুকু দেওয়া গেল। ইহা শুধু গল্প নহে। ইহার মধ্যে আছে বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার যুগের জীবনদর্শনের কঠোর সমালোচনা। কবিতার

মূল আলোচ্য বিষয় পুরাতন যুগের একজন জিপসি ছাত্র নহে। কবি আরনল্ড চতুর্দিকে যে জীবন-পদ্ধতি দেখিয়াছেন, যে দুঃখ, যে দ্বিধা, সন্দেহ ও অসন্তোষ দেখিয়াছেন তিনি তাহাই একটি জিপসি ছাত্রের গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই কবিতাটিকে বলা যাইতে পারে Criticism of life। এই কবিতার সর্বত্র একটা sad, sombre, melancholy ভাব বিদ্যমান অথচ তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে একটা গভীর বিশ্বাস। বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার একটা আগ্রহ ছিল, যাহার সাহায্যে তিনি তাঁহার আত্মাকে নিরাপদ কূলে নোঙর ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। অতীতের সেই সব দিনে যখন বুদ্ধি ছিল সতেজ, সবুজ ও মুক্ত সেই যুগের প্রতি আরনল্ডের একটা মোহ ছিল। এই কবিতায় তাঁহার সেই মনোভাবটাও ব্যক্ত হইয়াছে। তবুও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই কবিতায় একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের ভাব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি এই কবিতায় এযুগের মানুষকে শিক্ষা দিতে চান যে, গভীর বিশ্বাসের সহিত মহৎ আদর্শের অনুসন্ধান করিলে তবেই জীবনে প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসে। বর্তমান যুগের জীবনের সমালোচনায় তিনি বলিয়াছেন যে মানুষের কোন স্থির লক্ষ্য নাই, এযুগের মানুষ এক লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যান্তরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, কোন একটা সত্য আদর্শের প্রতি আস্থা রাখিতে পারিতেছে না। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা কামনা, সবই দ্বিধা বিভক্ত। পুনঃ পুনঃ আঘাত ও প্রতিঘাত ও তজ্জনিত হতাশা মানুষের জীবনীশক্তিকে নষ্ট করিতেছে, আত্মার প্রসারণশীল ক্ষমতাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। এযুগের মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু সে জানে না যে কি জন্য সংগ্রাম করিতেছে। সুতরাং সে অর্ধেক জীবন যাপন করিতেছে। পরিপূর্ণ জীবনের ধারণা তাহার নাই। শক্তি ও বিশ্বাসের অভাবে বর্তমান জীবন একটা একটানা ব্যর্থতায় ও প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। কবি জিপসি ছাত্রটির সহিত বর্তমান যুগের মানুষের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার ছিল "সত্যের আলো পাইবার জন্য অত্যন্ত অনুসন্ধান", আর আমাদের যুগের মানুষের সামনে কিছুই নাই। সে তাহাতেই সন্তুষ্ট। কোন সত্য তাড়াতাড়ি ও ফাঁকতালে পাওয়া যায় না। ইহার জন্য ধীরে ধীরে অক্লান্তভাবে মনঃপ্রাণ দিয়া সাধনা করিতে হয়। সত্যকারের সাধনার মধ্যে আছে জীবনের সার্থকতা। নিষ্ঠা ও সাধনা ব্যতীত জীবন ব্যর্থ। এই বিংশ-শতাব্দীর মানুষ আজ নানা মতবাদ ও ইজ্‌ম্ দ্বারা বিভ্রান্ত। সত্যের সন্ধানে সে যদি অবিভক্ত লক্ষ্য ধরিয়া চলে তবেই সে জীবনে পরমানন্দ লাভ করিবে।

এসো

(কীর্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সেই রূপ ধরি' এসো আজ হরি, জীবনের কারাগারে,
ঝংকারে,
যুগে যুগে যার টানে অনিবার ধায় হিয়া অভিসারে,
মায়া পারে।

প্রাণে—জয়গানে,

এসো হে ডংকা বাজায়ে, শঙ্কা ঘুচায়ে অভয় তানে.

বরদানে ॥

সেই রূপে আজ এসো হৃদিরাজ, আনন্দ উদ্ভাসি'

অবিনাশী,

যার বরে ফুল স্বপনদোছুল ফুটে, ওঠে রাশি রাশি

উচ্ছ্বাসি'।

কাছে—চিতমাঝে,

বাঁশরী নূপুর বাজায়ে মধুর চিরসুন্দর সাজে,

এসো সাঝে ॥

যে-রূপ মোহন দেখিলে নয়ন দেখে শুধু হে তোমারে

চারিধারে,

যার বরে ঘর আপন ও পর মিশে যায় একাকারে

সুধাসারে,

কালো—দলি' জ্বালো

তোমার সে-জয়সঙ্গীতময় অসীম প্রণয়-আলো

বেসে ভালো ॥

যে-রূপমুরলী উঠিলে উছলি' বাসিতে ভালো সবারে

প্রাণ পারে,

সুখ দুখ হয় সবি চিন্ময় অমৃতঝরা আসারে,

শতধারে,

পারী—ভয়হারী !

অকূল পাথারে ভিড়াও হে পারে, তনু-তরী যে তোমারি,

কাণ্ডারী !

মরণ-ডমরু বাজে গুরু গুরু যবে—এসো উল্লাসি'

অমা নাশি'

ঝলি' অম্বর হে দীপঙ্কর, চিররবি পরকাশি',

ভালোবাসি'।

রোগে—দুর্ভোগে

এসো হে অকায়া, ধরি' প্রেমকায়া এ-নিরানন্দ লোকে

দুর্যোগে ॥

"অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ"

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতীর প্রারম্ভে রয়েছে—জগদবসানে শ্রীভগবান্ তাঁর পালনীশক্তি উপসংহার করে নিদ্রারূপিণী তামসী শক্তির আবরণে সর্বজগৎ সমাচ্ছন্ন করে স্বয়ং মোহিত রয়েছেন, আর এদিকে তাঁরই কর্ণমল থেকে মধুকৈটভ নামক দুই মহাদানব আবির্ভূত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার সংহারের জন্য ধাবিত হল। ব্রহ্মা এদের নিধনের জন্য স্বয়ং বিন্দুমাত্র বিক্রম প্রকাশ না করে যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার শরণ গ্রহণ করলেন। নারায়ণকে এদের নিধনব্যাপারে উন্মুখ করাবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর জাগরণের অভিপ্রায়ে আবরণরূপিণী যোগনিদ্রার স্তুতি আরম্ভ করলেন। তা'তে ব্রহ্মা দ্বিতীয় শ্লোকে মহামায়ার গুণকীর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—

"অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা॥"

অর্থাৎ তুমি বাক্যাতীতা, তুমি নিত্যা এবং অর্ধমাত্রারূপে অবস্থিত আছ। তুমিই বেদসারভূতা গায়ত্রী, তুমিই সর্বোৎকর্ষময়ী জননী। স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতভেদে *মাত্রাত্রয়* স্বরবর্ণগত—সুতরাং স্বরাদি বর্জিত হয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চার্যতা না থাকাতে অর্ধমাত্রতা। সেই ব্যঞ্জনবর্ণনিষ্ঠ অর্ধমাত্ররূপাও তুমি। আপাতপ্রতীয়মান এই অর্থটুকুই এর মর্মার্থ হলে এতে এমন কিছু গৌরব প্রকাশিত হয় না যাতে ব্রহ্মস্তুতির বিশেষত্ব-মর্যাদা রক্ষিত হ'তে পারে। অতি সাধারণভাবে স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণরূপতা প্রকাশ করা এখানে ব্রহ্মার স্তুতির তাৎপর্য হ'তে পারে না, এজন্য এ'র গভীরার্থটি নিষ্কাশিত করে গৌরবমূল গূঢ়ার্থটুকুর সন্ধান না দেখাতে পারলে—এর মর্মার্থটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বলে আমাদের বৃথা অভিমান পোষণ করাও অধিকারসঙ্গত হয় না। এজন্য এই প্রবন্ধে আমরা এর যথার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাদি প্রমাণের অবলম্বনে প্রকৃত তত্ত্বোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবো।

প্রস্তাবিত শ্লোকটির পূর্ণ পরিচয় জানবার পক্ষে পূর্ব শ্লোকটির পরিচয় একান্ত অপেক্ষিত। এর সঙ্গে পূর্বটির এমনই ঘনিষ্ঠতা যে তা'কে বাদ দিয়ে এর ব্যাখ্যাই পূর্ণতর হয়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ মনে হয়, একই তত্ত্বকে বুঝিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা এই দু'টি শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। *প্রকৃতপক্ষে এর নিদর্শনও আমরা* দেখতে পাই, নাগোজী ভট্ট এই শ্লোকের ব্যাখ্যাটি পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই সম্পন্ন করে ফেলেছেন। অর্থাৎ শ্লোকটি ক্রমানুসারে এসে উপস্থিত হবার পূর্বেই পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে তা' করা হ'ল। এক্ষেত্রে প্রমাণ করা যায় এ দু'টি শ্লোকে একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে বলেই তা' টীকাকার দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্যথা এ কার্য অসঙ্গত হ'ত। এজন্য ইনি স্পষ্টতই বলেছেন—"ত্রিধা ইত্যতো বিশেষতঃ ইত্যন্তেন *প্রণবরূপতা চোক্তা॥"* অর্থাৎ *পূর্বশ্লোকের পরার্ধ* এবং পরবর্তী শ্লোকের পূর্বার্ধ মিলিয়ে প্রণবরূপতা প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রহ্মা প্রথমতঃই বললেন—

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।"

অর্থাৎ তুমি যজ্ঞে আহুতির মন্ত্র স্বাহা, তুমি পিণ্ডাদির মন্ত্র স্বধা এবং তুমিই আহুতিদানের মন্ত্রান্তর বষট্। বেদমন্ত্রোচ্চারণের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতরূপা স্বরাত্মিকাও তুমি। অক্ষররূপ স্বরবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতভেদে ত্রিমাত্ররূপেও তুমিই অবস্থিতি করে থাক। অথবা উপচয়াপচয়াদি-রূপান্তর-বর্জিতা নিত্যরূপা হে দেবি, তুমি মাত্রাত্রয়রূপে সংস্থিতা হয়ে আছ। এই ত্রিধামাত্রাত্মিকারূপে স্তুতি

করেই ব্রহ্মা আবার 'অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা' ইত্যাদি দ্বারা স্তুতি করেছেন; তা'তেও এ দু'টি তত্ত্বের পরস্পর একান্ত নিকট সম্বন্ধবত্তাই জ্ঞাপন করা হ'ল বলে মনে হয়। পূর্ব শ্লোকে যে রূপটি উদ্‌যাপিত করা হ'ল তা'তে মায়ের 'স্বাহা স্বধা বষট্' ইত্যাদি গুণকীর্তনে পূর্ণভাবে যজ্ঞরূপতাই বলা হয়ে গেল। আবার 'স্বরাত্মিকা' এই উক্তি দ্বারা পূর্ণ বেদময়ত্বও ধ্বনিত হয়েছে। যা পরবর্তী শ্লোকে 'ত্বং সাবিত্রী' শব্দে প্রকাশ করেই বলে দিয়েছেন। সুধা শব্দটি মোক্ষামৃতেরই দ্যোতক। অক্ষর শব্দে যেন তার পূর্ণতা সম্পাদন করা হ'ল, পরব্রহ্মপদটি প্রকাশ করে। কেননা—"অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ' এই ব্যাসসূত্রে তাই প্রতিপাদন করা হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও রয়েছে—"অক্ষরং ব্রহ্মপরম্॥ মুণ্ডকোপনিষদেও দেখতে পাই "তদক্ষরং ব্রহ্ম।" এভাবে পরমতত্ত্বের প্রকাশ দেখিয়ে তাঁরই বিবর্তনরূপে বলা হ'ল "ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।' এই পদটিতে ব্রহ্মা সুকৌশলে মূলীভূত যাবতীয় তত্ত্ব কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছেন। মাত্রা পদটি এমনই ব্যাপকার্থক যে কোন বিশেষ বিবর্তনে একে বেঁধে দেওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃত জগতের প্রায় সমুদায় বিবর্তনই মাত্রাত্রয়াবলম্বনে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাই বলা যায় এই 'ত্রিধামাত্রাত্মিকা' পদে এখানে এক অচিন্ত্য শক্তি সঞ্চারিত করা হয়েছে, যার ফলে দেখা যায় বিভিন্ন মনীষীর তুলিকায় এপদের বিচিত্র চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ ত্রিধা শব্দটি নানারূপ ত্রিবিধ 'ধারার' দ্যোতক,—যেমন—ত্রিভুবন, ত্রিশক্তি, ত্রিগুণ, তিন বেদ, তিন দেব, ত্রিবিদ্যা তদ্ব্যতীত স্বরাদির ত্রিত্ব ইত্যাদি। তৎসঙ্গে বিভিন্নার্থের বাচক মাত্রাশব্দটিও যোজিত হ'য়েছে। মেদিনীকোষকার মাত্রাপদের বিভিন্নার্থতা প্রকাশ করে বলেছেন—মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে। অক্ষরাবয়বে স্বল্পে ক্লীবং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে॥ ইত্যাদি। তাই দেখা যায় কেহ ব্যাখ্যা করেছেন—'হে দেবি, তুমি তিন প্রকার যে মাত্রা অর্থাৎ বর্ণগত হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতাদি—যা ওঁ-কারাত্মক প্রণবে অকার উকার মকার রূপে অন্তর্নিহিত রয়েছে তা'-ই তুমি। অথবা জীবগত যে অবস্থাত্রয় জাগ্রৎ-স্বপ্ন আর সুষুপ্তি, এতদভিমানী যে চৈতন্য বা প্রকাশময় তত্ত্ব ক্রমানুসারে যা' বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়ে থাকে তুমি তৎস্বরূপা অথবা তৎস্বভাব-সম্পন্না। "ত্রিধা ত্রিপ্রকারা যা মাত্রা হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতা অকারোকারমকারলক্ষণা ইতি, জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যভিমানী বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞাভিধেয়া তদাত্মিকা তৎস্বরূপা তৎস্বভাবা চ ত্বম্॥ (চতুর্ধরীটীকা)। আবার কেহ বা যৌগিকার্থের নৈপুণ্য দেখিয়ে বলে থাকেন, হে দেবি, তুমি তিন লোক—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ—এদের অথবা তিন দেবতা যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এঁদের ধারণ বা ভরণ করে থাক, সুতরাং তুমি 'ত্রিধা' এবং তুমি 'মাত্রা' অর্থাৎ অকারাদি বর্ণরূপা। অথবা তিনটি যে ধাম অর্থাৎ তেজঃস্থান সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি বা ধাম হ'ল গৃহ—ত্রিভুবন—এই ত্রিধামের আ—ত্রাত্মিকা, অর্থাৎ আ-সর্বভাবে ত্রাণ বা পালন করে থাক, সুতরাং ত্রিধামের 'আত্রা' যে মাত্রা—হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত—অকার-উকার-মকার-তৎস্বরূপা, অর্থাৎ প্রণবে অকার হ্রস্ব, উকার দীর্ঘ এবং মকারাবলম্বিত দ্বিক্ষণাধিক স্থায়ী স্বরটি প্লুত বলে গ্রাহ্য। "ত্রীন্ লোকান্ ব্রহ্মাদীন্ বা দধামীতি ত্রিধা, মাত্রাত্মিকা অকারাদি-রূপা। যদ্বা ত্রীণি ধামানি তেজাংসি সূর্য-চন্দ্রাগ্নি-রূপাণি ভুবনানি বা আ সমন্তাৎ ত্রায়সে ইতি ত্রিধামাত্রা, স আত্মা যস্যাঃ সা পালনরূপাসি। যদ্বা ত্রিধা মাত্রা হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতাঃ অকারোকারমকারা বা তদাত্মিকেত্যর্থঃ। (বংশোদ্ধার টীকা)। এখানে কেহ বলেন—তুমি মাত্রাত্মিকা হ'য়ে তিনরূপেতে অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতরূপে অবস্থান করে থাক—এ ব্যাখ্যাতে

অপূর্ণতার আশঙ্কা আসে; কারণ এখানে দেখা গেল এই রীতি অনুসারে স্বরবর্ণগত হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রাকে লক্ষ্য করেই মর্মার্থ ধ্বনিত হ'ল, ব্যঞ্জনবর্ণটি কি তা'হলে মায়ের আত্মরূপের বহির্ভূত? তা'তে বলা হয়—এ অপূর্ণতার পূরণ করা হ'ল পরবর্তী শ্লোকের অর্ধমাত্রাপদের সাহায্যে। অর্থাৎ তুমি হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতভেদে স্বরবর্ণাত্মিকাও বটে এবং অর্ধমাত্রাত্মক ব্যঞ্জনবর্ণও বটে। "ত্বং মাত্রাত্মিকা সতী ত্রিধা হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতরূপেণ স্থিতা। যা চ অর্ধমাত্রা ব্যঞ্জনবর্ণরূপা সাপি ত্বমেব ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ।" এ ক্ষেত্রে শব্দ-বিশ্লেষণের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে অধিকতর ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন—হে দেবি, তুমি তিন লোক, অথবা তিন বেদ, অথবা তিন দেব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতিকে ধারণ বা পোষণ কর বলে তুমি ত্রিধা। অথবা তুমি ত্রিধামা। তিন ধাম বা গৃহ অর্থাৎ ভুবনরূপ আবাসস্থান বা অবস্থিতিক্ষেত্র—ব্রহ্মাদি দেহ, এবং চন্দ্র সূর্য ও অগ্নিরূপ তেজ বা প্রভাবরূপ যে সত্ত্ব-রজ-স্তম আদি ত্রিশক্তি যা'র, সেই তুমি ত্রিধামা। এবং তুমি 'ত্রাত্মিকা'। 'ত্রা' অর্থাৎ পালন-ক্রিয়াটি স্বভাব যা'র, সুতরাং বিষ্ণুরূপা তুমি। অথবা পালনশক্তিই তুমি। অথবা হে দেবি, তুমি তিন প্রকারে অর্থাৎ একমাত্রা, দ্বিমাত্রা এবং ত্রিমাত্রারূপে স্বরবর্ণরূপা অর্থাৎ অকারাদি স্বরবর্ণের হ্রস্বভাবে একমাত্রতা, দীর্ঘভাবে দ্বিমাত্রতা এবং প্লুতভাবে ত্রিমাত্রতা। এইরূপে তুমি ত্রিধামাত্রাত্মিকা, অর্থাৎ স্বরবর্ণেরই মাত্রাভেদ সামর্থ্যবশতঃ তুমি স্বরবর্ণরূপা। অথবা ত্রিধা তিন প্রকারে অর্থাৎ ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী এবং মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃরূপই স্বরূপ যাঁর—তুমি সেই ত্রিশক্তিময়ী মাতৃরূপিণী যোগনিদ্রা। অথবা ওঁকারাত্মক প্রণবরূপা। "হে দেবি, ত্বং ত্রীন্ লোকান্ বেদান্ ত্রীন্ দেবান্ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ বা দধাসি ইতি ত্রিধাসি। যদ্বা ত্রিধামাসি ত্রীণি ধামানি গৃহাণি ভুবনলক্ষণানি দেহানি ব্রহ্মাদি-রূপাণি তেজাংসি চন্দ্রার্কাগ্নিরূপাণি প্রভাবরূপাণি চ ত্রিশক্তিলক্ষণানি যস্যাঃ সা ত্রিধামা। হে দেবি, ত্বং ত্রাত্মিকা। ত্রৈঙ্ পালনে ত্রায়তে ত্রাঃ 'বিষ্ণুঃ' ক্বিপ্। ত্রাঃ আত্মা স্বভাবো যস্যাঃ সা বিষ্ণুরূপাসি। অথবা ভাবে ক্বিপ্ পালনরূপাসি। যদ্বা হে দেবি, ত্বং ত্রিধা ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ একমাত্র-দ্বিমাত্র-ত্রিমাত্ররূপ-স্বরাপরপর্যায়া অবর্ণাত্মক হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতভিন্নমাত্রা আত্মা যস্যাঃ সা ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্বরবর্ণরূপাসি। ......যদ্বা ত্রিধা ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী-মাহেশ্বরীরূপাঃ মাতরঃ আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ সা ত্রিশক্ত্যাকৃতিঃ ত্রিধামাত্রাত্মিকেয়ং বিষ্ণুযোগনিদ্রা স্থিতেতি ত্রিধামাত্রাত্মিকা। ওঁকাররূপেতি চ। (শান্তনবী টীকা)।

এভাবে নানাছন্দে নানাবিধ মহিমায় লৌকিক বা অলৌকিক ত্রিতত্ত্বটি মাতৃস্বরূপের ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হ'লেও মহামায়ার লোকাতীত সে অচিন্ত্যরূপটি ত্রি-আত্মকতায় পরিস্ফুট করা সম্ভব নয় বলে—ত্রিরূপতার খর্বতা বা অপূর্ণতার ত্রুটি সংশোধন করে ব্রহ্মা পরবর্তী শ্লোকে স্তুতি জানালেন "অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা অনুচ্চার্যা" ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি ত্রিমাত্রাত্মিকা হ'য়েও স্বরূপতঃ অর্ধমাত্রারূপা।

এই অর্ধমাত্রা পদটি নানাদিক্ থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বশ্লোকস্থ ত্রিধামাত্রাত্মিকা পদের 'মাত্রা' হ'ল অকার, উকার এবং মকার। এদের সমন্বয়ে 'ওম্' এই পদ সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু এতদাত্মকমাত্র হ'লে ব্রহ্মাভিধায়ক প্রণবরূপতা বলা যায় না, সম্মতিসূচক অব্যয়পদসমানতা প্রকাশিত হয় মাত্র। প্রণবে যে ঊর্ধ্বস্থিত বিন্দুটি রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বেষ্টিত হয়ে, তা' অপ্রকটিত থেকে যায়। এই অপূর্ণতা পূর্ণ করে প্রণবরূপতার সম্পূর্তির জন্য তদূর্ধ্বস্থিত রেখাটির পরিচয়ে বলা হয়েছে অর্ধমাত্রা। এ'টি—উচ্চারণের অযোগ্য নাদ-সঙ্কেত। সুতরাং কথিত মাত্রাত্রয়ের অতীত বস্তু। পরম তত্ত্বের সঙ্গে এই প্রণবাক্ষরের

একান্ত মিল রয়েছে বলে প্রণবকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হ'য়ে থাকে। কারণ প্রণবের মাত্রাত্রয়ের ন্যায় চৈতন্যেরও রয়েছে তিনটি মাত্রা বা অবস্থা; জাগ্রৎ, স্বপ্ন আর সুষুপ্তিযোগে ত্রিবিধ পরিচয়—ব্যষ্টিরূপে বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা। এই তিনটিতেই রয়েছে বন্ধনবেষ্টনী, জাগ্রতে বহির্বিশ্বের মমতার বন্ধন, তৈজসে বাসনা-ভাবনাময় আন্তর কল্পনার বন্ধন। সুষুপ্তিতেও রয়েছে,—আনন্দানুভূতি সত্ত্বেও অজ্ঞানের বন্ধন। এই অবস্থাত্রয়ের ঊর্ধ্বে যে এদের দ্রষ্টৃরূপে, সাক্ষীভাবে বিরাজমান অবস্থার অনাবৃত তত্ত্ব বা এদের অতীত প্রকাশময়ত্ব তারই নাম তুরীয় বা চতুর্থপাদ বা মাত্রা। সুতরাং এই তিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েও তিনেতে আবদ্ধ না থেকে যে তত্ত্ব এদের অতিক্রম করে চিরজাগ্রত রয়েছে, সেই হ'ল পরম তত্ত্ব, এবং তা ভাষার অতীত বলে, ইঙ্গিতের অগম্য বলে পরিচয়ের সূত্র না পেয়ে বলা হ'য়ে থাকে অনুচ্চার্য, মাত্রার বেষ্টনী না থাকলেও স্থিতিশীলতামাত্রকে লক্ষ্য করে, এবং পরিপূর্ণ মাত্রাময় স্বরবর্ণের ন্যায় তার অভিব্যক্তি সম্ভব নয় বলে অপূর্ণমাত্র ব্যঞ্জনের তুলনায় বলা হয়ে থাকে অর্ধমাত্রারূপ। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ এই সাদৃশ্যবশতঃ বলেছেন—"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্"। এবং একথাটির তাৎপর্য বলতে গিয়ে বলেছেন—"সবং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ" এই "চতুষ্পাৎ" কথার বিবৃতি-স্থলে ওঁকার ও ব্রহ্মের একাত্মতা প্রকাশ করে উভয়ের মাত্রা-সাম্য তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত করে বলেছেন—"সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি" অর্থাৎ অকার যেমন সমস্তবর্ণে পরিব্যাপ্ত, তেমনি বিশ্বাভিমানী বৈশ্বানর কর্তৃক সর্বজগৎ ব্যাপ্ত রয়েছে। আর উকার যেমন অকারাপেক্ষায় বর্ণের অভিব্যক্তিতে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে এবং আদিবর্ণ ও অন্ত্যবর্ণ এতদুভয়ের সমন্বয়-সম্বন্ধ ঘটিয়েছে তেমনি মধ্যবর্তি-তৈজস অর্থাৎ ভাবনাভিমানী স্বপ্নাধিষ্ঠাতা ও বৈশ্বানর এবং প্রাজ্ঞ—এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ও চিন্তামাত্রের ক্ষেত্র বলে বিশ্বাপেক্ষা কাঠিন্যবর্জিত নিবন্ধন এবং স্থূলের প্রতি সূক্ষ্মের কারণতাগৌরবে আপেক্ষিক উৎকর্ষময়। আর যেমন মকারে পূর্ববর্ণদ্বয়ের মিতি বা পরিমিতি অথবা মিলিতভাব বা একীভূততা সম্পাদিত হয়, তেমনি তৎস্থানাপন্ন সুষুপ্তিতে পূর্ব দু'টি—জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থাদ্বয়ের বিলয়ে একাত্মতা আসে বা তাদের পরিমাপ করা সম্ভব হ'য়ে থাকে—এই চমৎকার সাদৃশ্য নিবন্ধন প্রণবের অক্ষররূপে ব্রহ্মাত্মতা। কিন্তু তিনটি মাত্রা এভাবে প্রকাশিত হলেও নাদরূপটি এতে প্রকাশিত হ'য়ে উঠলো না, তাকে এদের মাত্রার ন্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। তাই তাকে এদের ন্যায় মাত্রার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এ তাৎপর্যটি প্রকাশ করেই মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ আরো বলেছেন—"অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ।" সুতরাং এ তত্ত্বটি মাত্রাশূন্য চতুর্থ তত্ত্ব।

এই নাদতত্ত্বের ন্যায় ব্রহ্মের ও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত তত্ত্বটি অপ্রকাশ্য, অব্যবহার্য। তাই বললেন, কি দিয়ে এর প্রকাশ করা সম্ভব, প্রকাশের উপায় প্রপঞ্চ যে সেখানে উপশান্ত হয়ে যায়। কেবল শিব—মঙ্গলময় অদ্বৈতরূপতাই অবশিষ্ট থাকে। এই অমাত্রতাকেই নক্রের অপ্রকাশার্থতা অবলম্বন করে মাত্রার অপূর্ণতার ইঙ্গিতে এখানে অর্ধমাত্রতা শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। শাস্ত্রেও তাই বলা হয়েছে—"ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াঽব্যক্তসংজ্ঞিতা। মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্ধমাত্রা পরং পদম্।" এই অমাত্র তুরীয় পদাভিপ্রায়েই দেখা যায় ব্যাখ্যাতৃগণও পদ-ব্যাখ্যার বিন্যাস দেখিয়েছেন—"অর্ধমাত্রা তু বেদান্তবাক্যার্থভূতনিত্যমুক্ততুরীয়াভিধেয়া।" (নাগোজীভট্ট)। এতদনুকূলে শ্লোকস্থ অনুচ্চার্যা পদটিরও যথার্থ সার্থকতা সম্পাদিত

হয়েছে যে পরমপদস্থ নিবন্ধনই অনুচ্চার্যত্ব। তাই টীকাকার চতুর্ধরমিশ্রও বলেছেন—"অপরিণাম নির্বিশেষতো মাত্রাত্রয়বৈলক্ষণ্যেনানুচ্চার্যা বেদান্ত-বাক্যার্থলক্ষণমুক্ত্যভিমানিনী তুরীয়াভিধা যা সা ত্বমেব।"

আরও এক কথা সাধারণতঃ অকারাদি স্বরবর্ণের সাহায্য-ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনবর্ণের স্বাতন্ত্র্য না থাকাতে পূর্ণরূপে মাত্রা-পদবাচ্যতা স্বীকৃত হয় না, এজন্য তাকে অর্ধমাত্রা বলে অভিহিত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কেবলমাত্র স্বরবর্ণের মাত্রাবত্তা সিদ্ধ হ'তে পারে, সুতরাং পূর্বশ্লোকস্থ ত্রিধামাত্রাত্মিকা পদে স্বরবর্ণগত হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতরূপে মাত্রাত্রয়াত্মকতা অভিপ্রেত হ'লে তা' থেকে ওঁকারাত্মকতা প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ 'ওঁ'-আত্মক প্রণবে প্লুতস্বর না থাকাতে দীর্ঘস্বরের অস্তিত্ববশতঃ দ্বিমাত্রতামাত্র সাধিত হ'তে পারে, এজন্য তার পূরণার্থে পরবর্তী শ্লোকে অর্ধমাত্রতা প্রকাশ করে দ্বিমাত্রতা অতিক্রান্ত হ'ল বলে পূর্বোক্ত ত্রিধামাত্রাত্মিকা পদের তাৎপর্যগত সার্থকতা রক্ষা করা সম্ভব। অথবা ওঁকারাত্মক প্রণবে (ওম্ !!!) প্লুতস্বরের স্বীকৃতি মেনে নিলে হ্রস্বদীর্ঘ-প্লুত—তিনটিরই অবস্থিতি সিদ্ধ হয়ে যায়। এরূপ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ত্রিধামাত্রাত্মিকা পদেই ওঁকারের প্রাপ্তি সম্ভব হয়ে ওঠে, পরন্তু একটি বর্ণ তা'তে অনুক্ত বা অব্যাখ্যাত থেকে যায়, তাই বলা হ'ল অর্ধমাত্রা পদটি, তাদৃশ ত্রিমাত্রার অধিক আরও একটি বা অর্ধমাত্রামকাররূপ,—যা প্রণবে রয়েছে, তারও তোমার সত্তাবহির্ভূততা নেই, তা'ও তুমি, এরূপ—বিশ্লেষণেরই এখানে সঙ্গতি সাধন করে নিতে হয়। এই হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঘটিত ত্রিমাত্রতার বিশ্লেষণ-ভঙ্গীটিও মূল্যহীন হ'তে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে রয়েছে: "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে, ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্।" অন্যথা হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতভাবে ত্রিমাত্রতা উপেক্ষা করে কেবলমাত্র অকার-উকার এবং মকার—এই ত্রিবিধ বর্ণের মিলন বশতঃই ত্রিমাত্রতার স্বীকৃতি সর্ববিধ বিরুদ্ধশঙ্কামুক্ত বলে প্রমাণসিদ্ধ হবে না। কারণ প্রণবে এই তিনের সমন্বয় স্বীকৃত হলেও এরা ঠিক স্বরবর্ণের অকার, উকার বা ব্যঞ্জনবর্ণের মকার নয়, কেন না বর্ণান্তরের একাংশরূপে প্রতীয়মান যে সমানাকৃতির বর্ণ তাদের দ্বারা যথার্থতঃ তত্তদ্বর্ণের উপাদেয় কার্যটি সাধিত হয় না। তার জন্য ভিন্ন প্রযত্নের প্রয়োজন হয়ে থাকে, সুতরাং এরা সেই সেই বর্ণের ছায়ানুকারী মাত্র, সেই সেই অকৃত্রিম বর্ণ নয়। কারণ 'অবতি অস্মাদুপাসকম্' এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ রক্ষার্থক অব্ ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করে, মন্ প্রত্যয়ের "টি' লোপান্তে বকারের উবিধান্ দ্বারা "অ+উ+ম" এই প্রণালীতেই "ওম্" (ওঁ) পদটি সাধিত হ'তে পারে। ধাতু প্রত্যয়াদির প্রক্রিয়া বর্জিত হয়ে কোন অন্বিত শব্দ সিদ্ধ হ'তে পারে না। আর এভাবে ওঁ পদের ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করে ওঁ পদের গঠন-পদ্ধতির সার্থকতা স্বীকার করে নিলে এর যোগার্থের অবলম্বনেও একটা অনন্যসাধারণ তাৎপর্য এই "ওঁ" পদ থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়ে আসে যা' আর কারো সঙ্গে উপমিত হ'তে পারে না। এই অনন্যসুলভ বিশেষার্থটি প্রকাশ করবার জন্যে শাস্ত্রকারগণ নানাবিধ যুক্তিজালবিস্তার করে বলেছেন—"এতা মাত্রাঃ পুনস্তিস্রঃ সত্ত্বরাজসতামসাঃ। নিগুর্ণা যোগিগম্যাঽন্যা চার্ধমাত্রা চ সংস্থিতা।" ইত্যাদি। এই যোগিগম্য নিগুর্ণ পরমতত্ত্ব প্রতিপাদনের ফলে এখানে মায়ের বেদসিদ্ধ সর্বোপাদানত্ব এবং সর্ব-প্রসবিত্রীত্ব অর্থবশতঃই সুসিদ্ধ হয়ে গেল, সুতরাং অপরাংশে কেবল ফলকথনের অভিপ্রায়েই বললেন—"ত্বমেব সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা।"

এই অপূর্ব তত্ত্বটি এভাবে আমাদের সম্মুখে উপন্যস্ত করে একটি চরম রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন ব্রহ্মা। অর্থাৎ মানুষ প্রতিনিয়ত অন্ধের

ন্যায় পরিদৃশ্যমান সহজলভ্য গুণসমৃদ্ধ বস্তুরাশির মধ্যে যে আত্মসার্থকাময় পূর্ণতার সন্ধান করে ঘুরে মরছে, অথবা কেহ যে এজগতের ধূলিমলিন বীভৎস দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে অনুভূয়মান বস্তুরাজির বাইরে গিয়ে কোথাও যেন স্বস্তিপ্রদ বসতির মধ্যে পূর্ণতার অন্বেষণে ব্যাকুল হয়েছে—এদুটি প্রণালীই যথার্থতঃ পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপায় নয়। কারণ যাঁ'কে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়—সে সর্বপ্রাপ্তির প্রাপণাত্মা সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে অন্তঃপ্রবিষ্ট করে তদতীত হয়ে বিরাজমান। সুতরাং যখনই যে বস্তুকেই মানব গ্রহণ করুক না, তা'কে বস্তুমাত্ররূপে গ্রহণ না করে সর্বত্র, সর্বভূতে, সর্বজীবে, সর্ববস্তুতে তাঁর স্পর্শ তাঁর সত্তার উপলব্ধিটি একাগ্র মনের অখণ্ড বিশ্বাসে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠায় হৃদয়স্থ করতে যদি সমর্থ হতে পারে, তবে জগদতীতকে জগতে থেকেই, অসীমকে সীমার মধ্যেই বেঁধে স্বয়ং পূর্ণতার মধ্যে বাস করতে পারে। অর্থাৎ তাঁর অভিব্যক্তিপূর্ণ বহুরূপের ভিতর দিয়েই রূপাতীত সে অব্যক্ত-স্বরূপকে লাভ করতে পারে সর্বত্র তদ্রূপতা, তৎ-সত্তার উপলব্ধি দ্বারা। অন্যথা 'সর্ব' বলে বিচিত্র বিকাশ শুদ্ধ হয়ে গেলে 'সর্বত্র বা সর্বজীবে, সর্বভূতে'—একথাটি বা ক্ষেত্রটিই যদি অলীক হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তাতে তাঁর অনুভূতি একথাটি অর্থহীন হ'য়ে পড়ে, তা'তে তাঁকে জানবার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এ ত্রিধা বা বহুধা প্রকাশটি অর্ধমাত্রার উপলব্ধিরই সোপান। সেই তুরীয়স্বরূপের এক একটি ধাপ, যাঁকে লক্ষ্য করে বলা হয়ে থাকে "যন্মনসা ন মনুতে", তাঁকে লক্ষ্য করেই আবার—"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"। এভাবে বহু বিচিত্র বিভিন্নতার ও তৎপরত্বলাভে একটা চরম সার্থকতা ফুটে উঠল। শ্লোকদ্বয়ের মাধ্যমে ব্রহ্মা জীবের সম্মুখে এই পরম তত্ত্বরহস্যটিই উদ্ঘাটিত করে ধরেছেন।

কবীর-বাণী

("কহৈ কবীর সুনো হো সা বো"-বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

কহিছে কবীর   শোন সাধু শোন
  মোর এ অমৃতবাণী;
মঙ্গল যদি চাহ   আপনার
  বিচারি' পরখ-জ্ঞানী!
যাঁহা হ'তে তুমি   আসিলে হেথায়
  তাঁহারে রাখিলে দূরে,
বুদ্ধি বিবেক   হারায়ে তুমি যে
  চলিলে মরণপুরে!
যত মত পথ   তুমি ভাই তাঁরে
  সবার উৎস জা'ন,
পরমতত্ত্বে   নিশ্চয় মানি
  নির্ভয়ে তাঁরে মান।

কার ধ্যানে তুমি   সদাই ব্যাকুল
  কর কার নাম-যোগ?
তোমারে শুধাই   ছাড় তুমি ভাই
  ছাড় সব গোলযোগ।
সবার অন্তরে   বসতি তাঁহার—
  শূন্যে ভরিলে প্রাণ,
স্বামীরে সুদূরে   রাখিয়া তুমি যে
  দূরকে দিয়েছ মান।
প্রভু যদি মোর   রহেন সুদূরে
  কে করে জগৎ সৃষ্টি?
তিনি হেথা নাই   মনে ভাবি' তাই
  দূরে যায় তব দৃষ্টি।

সুদূর হইতে সুদূরে ভ্রমিয়া
নিষ্ফল ফেল শ্বাস,
দুর্লভ সেই দূর দরশন—
নিকটে তাঁহার বাস।
চির আনন্দ বিরাজে তথায়
নাহি দুখ নাহি নাশ।
কহিছে কবীর— আমারে ব্যাপিয়া
প্রভু যে করেন বাস,

তাঁহার ভাবনা— যদি কোনরূপ
দুখ পায় তাঁর দাস!
হে কবীর তুমি নিশ্চল থাকি
লও নিজ পরিচয়,
আদি ও অন্ত তোমারে ব্যাপিয়া
যাঁর স্থিতি তোমাময়!
রহি অবিচল গীত মঙ্গল
গাহ তুমি তাঁরি জয়!

সাধক কমলাকান্ত

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

হালিসহরের সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনায় পরমব্রহ্মকে নিজ জননীরূপে আরাধনা করিবার যে পন্থাটি দেখাইয়াছেন; যে মহামন্ত্র তিনি বিবিধ গানের মধ্য দিয়া জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে শুনাইয়া, যাহার যেমন ইচ্ছা সেই আচারে ব্রহ্মময়ীর আরাধনায় উদ্দীপিত করেন। তাঁর সেই সূত্রটি ধরিয়া অম্বিকা-নিবাসী কমলাকান্ত নিজকীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন সাধকরূপে। রামপ্রসাদের ঐ ভাবধারা ও অনুষ্ঠানাদি স্পষ্ট ভাবেই প্রতিফলিত হইয়াছিল কমলাকান্তে। যৌবনারম্ভে কমলাকান্ত সেই কার্যেই আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার যতই নিবিড় হইতেছিল তাঁহার পরাণপুত্তলীর কালোরূপ সেই অন্ধকার মাঝে ততই ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি যৌবনেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন পরমবস্তু লিঙ্গ-বিচারের বাহিরের পদার্থ। যাঁহাকে বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, যিনি প্রপঞ্চজাত সকল দর্শনের অতি বাহিরে, যিনি মাত্র ভাবগম্য,—ভাব ব্যতিরেকে যাঁহাকে পাওয়া না, তিনি মাতাও বটে, পিতাও বটে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া তাঁহার চরণে লীন হইয়া গিয়াছেন। সেই 'মা' নিজে মায়াতীত, মায়ার জননী, স্বামীর সহবাসে একাকার অবস্থায় মায়ারূপ নিজ বস্ত্রাঞ্চলে উভয়ে অচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন; উপাসনায় সেই পরমবস্তু বিন্দুরূপে কল্পনীয়। সেই সে বিন্দু, যে বিন্দুর জন্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র লালায়িত, সেখানে পৌঁছিবার পথ বিবিধ দীপালোকে মাতৃকা বর্ণমালা বিবিধ নাদধ্বনি সহস্রার-চ্যুত অমৃতবাহী মুখ্য প্রাণ যোনিমুদ্রা সুসজ্জিত, মত্ত ভৃঙ্গাঙ্গনার গীতিময় রাগরাগিনীর মূর্ছনায় নহবতের রেশে সে পথের নির্ঝরিণীর শীতল পবন ভরপুর, চলন্তি বিদ্যুল্লতা খেলিয়া বেড়ায়, পান্থকে পথ দেখাইয়া দেয়। সেখানে এক বই দুই নাই। কৃষ্ণ কালী এ সকলই সেই বিন্দুর কল্পিত রূপভেদ তাই কমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

"জাননারে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ তনয়ে করে
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়া বাঁশী [—সভয়
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন করয়ে সৃজন পালন লয়॥"

কমলাকান্তের মনে দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না।

তিনি সত্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব মিটাইতে এই মধুর প্রাণময় সঙ্গীতগুলি বৈরাগী, বাউল, ভিখারীদের সাহায্যে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছিল। পীড়িত বাঙালীর মর্মবেদনা দূর করিয়া দেশে নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিল—

'যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা,
সেই রূপে তার পুরয়ে কামনা;
দ্বৈত ভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ,
অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই সকল গান করা নিত্য পূজার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। এই সকল গীত গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না।" কমলাকান্তর সে গান, সে সুরের রেশ এখনও বাঙলার আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই গানেই মুগ্ধ হইয়া মরমে মরিয়া আসিয়াছিলেন মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তর পর্ণকুটীরে—'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায়'।

"ত্রিভুবনজননি জন্ম প্রতিপালিনি
সংহারিণি প্রলয়ে।
কমলাকান্ত কৃতান্তবারিণি
নৃপ তেজশ্চন্দ্র সদয়ে।"

সাধক কমলাকান্তর জন্ম তারিখ জানা যায় না, তবে মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে অম্বিকা হইতে বর্ধমান নগরে লইয়া আসেন ১২১৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮০৯ খ্রীঃ), তখন সাধকের বয়স ৪০এর অধিক। এই গণনা অনুসারে তাঁহার জন্ম ১১৭৫ বঙ্গাব্দের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে বলিয়া অনুমিত হয়।

কমলাকান্ত তাঁহার 'সাধক-রঞ্জন' গ্রন্থের ভণিতায় আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন—

"অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দ মঠে গোপালের স্থান॥
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ॥
নামেতে কমলাকান্ত, ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধক-রঞ্জন॥"

ইহা হইতে জানা যায় কমলাকান্তের জন্মভূমি অম্বিকা; (বর্ধমান জেলা)। দীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীপাঠ গোবিন্দ মঠের প্রভুপাদ চন্দ্রশেখর গোস্বামীর নিকট এবং উপনয়ন দিয়াছিলেন অভিভাবক নারায়ণচন্দ্র। তাহা হইলে ইহা ধারণা করিলে—অসমীচীন হইবে না যে শৈশবেই কমলাকান্ত পিতৃহীন হন। আরও জানা যায় তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। কমলাকান্ত ও শ্যামাকান্ত; কমলাকান্তই জ্যেষ্ঠ। তাঁহাদের পিতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয়ের মৃত্যুর পর অনন্যোপায় হইয়া সাধকের মাতা মহামায়া দেবী পুত্র দুইটিকে লইয়া চান্নায় পিত্রালয়ে চলিয়া যান ও তথায় মাতামহ শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়)-র আশ্রয়ে তাঁহারা প্রতিপালিত হন। কমলাকান্তর মাতুল তাঁহাদিগকে গবাদি ও কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য কমলাকান্তকে অম্বিকায় কোন যজমান-গৃহে অবস্থান করিতে হয়। তিনি সেখানে একটি টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। বাল্যে লেখাপড়ায় তাঁহার তাদৃশ মন ছিল না, কিন্তু তিনি অত্যন্ত মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন তাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার প্রয়োজন হইত না, ফলতঃ নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস না করিয়াও তৎসমুদয় আবৃত্তি করিবার সময় প্রতি-ক্ষেত্রেই তিনি অন্যান্য সহাধ্যায়ী অপেক্ষা বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতেন। ইহাতে অধ্যাপক-

গণের মনে সন্দেহ হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ অন্য কাহারও নিকট পাঠ অধ্যয়ন করিতেছেন। কিন্তু এরূপ অনুমানের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান করিয়া সন্তুষ্ট হন ও পরিশেষে নিজেরা গর্বিত বোধ করিয়াছিলেন এই শ্রেণীর একটি ছাত্র পাইয়া।

রামপ্রসাদীগানে বাল্যাবধি কমলাকান্তর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরও ছিল মধুর। তিনি অধ্যয়ন না করিয়া দিনের অধিকাংশ সময় আপন মনে ঐ সকল গান গাহিতেন, কখনও বা বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইয়া ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া থাকিতেন। এই সময় তাঁহার মাতুল তাঁহার উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ গোবিন্দ মঠের প্রভুপাদ চন্দ্রশেখর গোস্বামী তাঁহাকে দীক্ষা এবং সাধনা-বিষয়ক বিবিধ উপদেশ দেন। যাহার ফলে সেই তরুণ বয়সেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাঁহার মনের এই ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কমলাকান্তর মাতা লাড্ডুকা গ্রাম নিবাসী ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের এক সুন্দরী কন্যার সহিত কমলাকান্তর বিবাহ দেন। পরন্তু বালিকা-পত্নী স্বল্পকাল মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহার মাতার অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন কিন্তু মাতার ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া গৃহে থাকিলেও তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেন।

এই সময় বর্ধমানের উত্তরে শুঙ্কড়ে গ্রামে ৺রক্ষা কালীপূজা দেখিতে যাইয়া সেখানে সাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহার নিবাস অমরার গড়, মানকরের নিকটবর্তী। এখানে সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি আছেন। ইঁহাকে দেখিয়া কমলাকান্তর হৃদয়ে প্রবল ভক্তি-তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় এবং কথোপকথনে জানিতে পারেন যে কেনারাম একজন তন্ত্রজ্ঞ সিদ্ধ কৌল। সে এক উন্মাদনা; কমলাকান্ত আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, তিনি সাধক কেনারামের চরণে শিষ্যরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন ও কেনারাম তাঁহার সাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। শাক্তাভিষেকের পর কমলাকান্ত তন্ত্রসাধন-রহস্য অবগত হইয়া বুঝিলেন সংসার ছাড়িবার কোন প্রয়োজন নাই, এবং গৃহস্থাশ্রমেই সাধনা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কমলাকান্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন। প্রথম দিকে তাঁহার ছাত্র-সংখ্যা অন্যান্য চতুষ্পাঠী অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় বিশালাক্ষীর মন্দিরে অতিবাহিত করায় ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যয়নে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তাহা হইলেও তাঁহার অধ্যাপনায় দশ বৎসরের মধ্যে বহু ছাত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তখন কমলাকান্ত অধ্যয়নপরায়ণ ছাত্রগণের শিক্ষার ভার উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্রগণের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে নামমাত্র সর্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে রহিলেন এবং ভাব-উদ্বেলিত হৃদয়ে আত্মক্রিয়ায় অধিকতর মনঃসংযোগ-পূর্বক দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। রাত্রেও কমলাকান্তের চক্ষে নিদ্রা ছিল না। পূজা হোম জপ স্তুতিতে যেমন তিনি দিবাভাগ অতিবাহিত করিতেন, নিত্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তেমনি নির্জন নিস্তব্ধ বনভূমির মধ্যে এক শিমুলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে রাত্রি প্রভাত হইত। সমস্ত মনটাকে টানিয়া মায়ের চরণে লাগাইবার জন্য তাঁহার এই যে আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুলতা তাহাতে জগৎজননী মা ব্রহ্মময়ী সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, সাড়া দিয়াছিলেন, সে ধ্বনি কমলাকান্তের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল, অঙ্গ পুলকিত হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার মাঝে দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। জ্যোতির মধ্যে ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎকার ঘটিল। কিন্তু ইহাতে কমলাকান্ত সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কারণ ইহা তো কৈবল্য

নয়। সমাধিকালেই প্রাণ মন নিশ্চল হয়, সমাধি ভঙ্গ হইলে পুনরায় তাহারা সবল সচেতন হইয়া উঠে, ষড়রিপু আপন আপন কর্মে রত হয় ; ইহাতে তাঁহাকে আরও বিচলিত করিল, তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। অতঃপর দিনমানেও তাঁহার সমাধি হইতে থাকিল। একদিন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া তিনি জলমধ্যে সমাধিস্থ হইলেন। ছাত্ররা মন্দিরে তাঁহাকে না পাওয়ায় অনুসন্ধানে বাহির হইয়া দেখিল, তিনি এতদবস্থায় মৃতদেহের ন্যায় বিশালাক্ষীর পুষ্করিণীর জলে ভাসিতেছেন। তখন সকলে যেমন চমৎকৃত তেমনি শঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া গ্রামের লোক একত্র করিলেন। জলে ডুবিয়া গিয়াছিলেন মনে করিয়া কমলাকান্তর দেহ জল হইতে উত্তোলন করা হইল। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তিনি জীবিত, সমাধিস্থ। সিদ্ধ পুরুষের কার্যকলাপ সকলে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কমলাকান্তর চরণে সকলের মস্তক সসম্মানে অবনত হইল—"জগৎ জুড়ে নাম রটিল কমলাকান্ত কালীর বেটা।"

ধর্ম ও কর্ম উভয় দিকই তিনি সমানভাবে বজায় রাখিয়াছিলেন। যখনই সংসারে অভাব অনটন দেখা দিয়াছে তখনই কর্তব্যবোধে সংসার প্রতিপালনের জন্য দেশবিদেশে অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও তিনি অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই। মা বিশালাক্ষীর জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, দেশে ফিরিয়া আসিতেন। চান্নায় যে সকল প্রবাদ আছে, তাহাতে মনে হয় যে সাধকপ্রবর ৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরস্থিত পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধিলাভ করেন এবং এ প্রবাদও ভিত্তিহীন নহে যে, এখানকার পঞ্চমুণ্ডীর আসন অপদেবতাগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল এবং এক ক্ষেত্রে উহারা ধ্যানরত কমলাকান্তকে আসন হইতে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণেরও সাধন কালে এইরূপ ঘটিয়াছিল।

কমলাকান্ত একাধারে যেমন পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন, কবিত্বশক্তিও ছিল তাঁহার অসাধারণ। তিনি যে সকল পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা সাধারণকে ভুলাইবার জন্য কষ্টকল্পনাপ্রসূত নহে ; ভাব-সাগরে ডুবিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে তিনি গানগুলি গাহিতেন। তিনি তাঁহার অন্তরের মর্মদিয় কথা, ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণা সমস্তই গানের ভিতর দিয়া তাঁহার ইষ্টদেবীর চরণে নিবেদন করিতেন।

তিনি ছিলেন ভাবে ভরপুর। তাঁহার অন্তরে কখনও ভাবের অভাব ঘটে নাই। জগন্মাতা বিশালাক্ষী নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া শিমুলতলায় কমলাকান্তর গান শুনিতে আসিতেন, উভয়ের কথোপকথনও হইত। ৺ভগবতী নিজেকে ধর্মনারায়ণের মা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। একবার বিশালাক্ষীর ভোগের জন্য মৎস্য সংগৃহীত না হওয়ায় কমলাকান্ত বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, এই সময় স্বয়ং ভগবতী এক বাগদী নারীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া কমলাকান্তকে দুইটি মাগুরমাছ দিয়া যান।

এইভাবে কমলাকান্ত যখন সাধনার ঊর্ধ্বমার্গে পৌছিয়াছেন, সেই সময় সাধকের জনৈক ধনাঢ্য শিষ্য অম্বিকা হইতে চান্নায় আসেন। তিনি সাধকের সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগকে চান্না হইতে অম্বিকা নগরে লইয়া যান। এইস্থানে কিছুকাল বসবাসের পর কমলাকান্তর জননী পীড়িত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। অতঃপর সাধক পুনরায় চান্নাগ্রামে ফিরিয়া যান এবং ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় আশ্রম করেন ; এখানে তাঁহার একটি চতুষ্পাঠীও ছিল।

একক্ষেত্রে শিষ্যালয় হইতে সাধক ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার প্রান্তর দিয়া ফিরিতেছেন তখন এই ডাঙ্গার চারিদিকে দস্যুদিগের বড়ই প্রভাব ছিল। সন্ধ্যার পর এই পথে কেহই হাঁটিতে সাহস করিত না। সাধক এই ডাঙ্গায় দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া-

ছিলেন। দস্যুগণ লোভের বশে তাঁহাকে প্রাণে মারিবার উপক্রম করিলে মাতৃভক্ত সাধক অনন্যোপায় হইয়া হৃদয়ের আবেগে গান ধরিলেন—

"আর কিছু নাই মা শ্যামা মা,
তোমার কেবল দুইটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
দেখে হলাম সাহসভাঙ্গা।"

তাঁহার সেই গানে অকস্মাৎ অজানা কারণে দস্যুগণের প্রাণে এমনি একটা প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, যাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহারাই এখন তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চায় ও ভক্তিভাবে তাঁহাকে চান্নায় পৌঁছাইয়া দেয়। প্রবাদ অনুসারে ডাকাতরা তাহাদের আরাধ্য দেবীকে দেখিয়াছিল খড়্গহস্তে তাহাদেরই বিপক্ষে দণ্ডায়মানা। ভাবুকের হৃদয়ে ভাবাবেশ হয়, ভবানীর অনুগ্রহে।

বর্ধমানের রাজবাটীর দেওয়ান রঘুনাথ রায় কমলাকান্তর শক্তিসাধনা ও সিদ্ধি-বিষয়ক নানা কথা শুনিয়া তাঁহাকে মহারাজ বাহাদুর তেজশ্চন্দ্রের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। গুণগ্রাহী মহারাজ কমলাকান্তর পাণ্ডিত্য ও সাধন প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন ও রাজসভার প্রধান সভাপণ্ডিতের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোটালহাটে তাঁহার বসবাসের জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করাইয়া দেন। ইহা ১২১৬ সালের কথা। মহারাজকুমার প্রতাপচন্দ্রও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর আশীর্বাদে যোগৈশ্বর্য ও ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেন।

কোটালহাটের বাটীতে কমলাকান্ত একটি কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি দিনমানে ঐ মন্দির মধ্যেই পূজাজপতপ করিতেন কিন্তু রাত্রে ঐ গৃহের পশ্চাদ্ভাগে এক বিল্ববৃক্ষ-মূলে যোগনিরত থাকিতেন। এই গৃহে বসিয়াই সাধক তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে যোগবিষয়ক উপদেশ দেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন আদ্যাশক্তি ভগবতীর কৃপালাভ করিতে হইলে যোগ-সাধনা চাই। তাঁহার কৃপালাভ করিতে না পারিলে কেবল বিদ্যা অধ্যয়ন, পূজাজপতপের দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। কমলাকান্ত 'সাধক-রঞ্জন' নামে ভাষাছন্দে রচিত একখানি যোগনিবন্ধও রাখিয়া গিয়াছেন।

কমলাকান্তর সহধর্মিণী একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া কোটালহাটের বাটীতেই দেহত্যাগ করেন। কথিত হয়, দামোদরের বেলাভূমিতে যখন সাধকের স্ত্রীর মৃতদেহ ভস্মীভূত হইয়া যায় তখন কমলাকান্ত নৃত্য করিতে করিতে গাহিয়াছিলেন—"কালী সব ঘুচালি লেঠা। শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখবি সেটা॥" সংসারের শোকতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

দামোদরের তীরে এই শ্মশান-ঘাটে বসিয়াও তিনি নির্জনে বহুবিধ অনুষ্ঠানাদি করিয়াছিলেন। বোরহাটে এক নিম্ববৃক্ষ-তলেও তাঁহার একটি আসন ছিল; ইহা ত্রিমুণ্ডীর আসন বলিয়া কথিত হয়।

কোটালহাটের গৃহে একবার কালীপূজার রাত্রে বাহিরে তুমুল বৃষ্টি হইতেছে। ভাবাবিষ্ট কমলাকান্ত নির্বাত ভাবনাহীন, ভাবে বিভোর। ভৃত্য বিষ্ণু ব্যতীত সে সময় কেহ তাঁহার নিকট ছিল না। প্রথম রাত্রি গতপ্রায়, তখন পূজার কোন আয়োজন হয় নাই। বিষ্ণু বলিল, "ঠাকুরপূজার সময় যে অতীত হইয়া যায়, অনুমতি করুন পূজার আয়োজন করিয়া দি।" সাধক উত্তর করেন—"পূজার আয়োজন করিবে কি! মহিষ না হইলে মায়ের পূজা হইতেছে না, একটি মহিষ লইয়া আইস।" বিষ্ণু হতবাক্, এই দুর্যোগের রাত্রে মহিষ কোথা পাইবে, তথাপি কিছু উত্তর করিতে পারিল না, ঘরের বাহির হইয়া গেল। মায়ের আদরের সন্তান কমলাকান্ত, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে মহিষ উৎসর্গ করিবে, মা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? বিষ্ণু দেখিল সেই অন্ধকার পথ ভাঙ্গিয়া কয়েকটি লোক মন্দিরের দিকে

আসিতেছে, সঙ্গে একটি মহিষ। তাহারা আসিয়া বলিল—"ভট্টাচার্য মহাশয়ের কালীর নিকট আমাদের মনিবের একটি মহিষ মানসিক ছিল, সেই মহিষ ও শাড়ী, নথ প্রভৃতি আমরা পৌঁছাইতে আসিয়াছি।" বিষ্ণুরামের মনে আনন্দ আর ধরে না। সে সাধককে খবর দিল আয়োজন সব প্রস্তুত। অনন্তর যথারীতি পূজা শেষ করিয়া ভাবোন্মাদে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। মহিষ কাহার, কে পাঠাইল এ সংবাদ লওয়া দেওয়ার প্রসঙ্গ অদ্যাবধি অবিদিত। পূজার আনন্দে যৎকালে সকলে ব্যস্ত সেই অবসরে ঐ লোকগুলি চলিয়া গিয়াছে।

শোনা যায়, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র উক্ত ঘটনা শুনিয়া কমলাকান্তকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অমাবস্যা রাত্রে তিনি চাঁদ দেখাইতে পারেন কিনা। সময় নিরূপিত হইলে সেই লগ্ননক্ষত্রকালে কমলাকান্ত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর রাত্রে আকাশের দিকে দেখিতে বলেন। অদ্ভুত ঘটনা—মহারাজ প্রভৃতি সকলে উৎফুল্লনেত্রে আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখেন।

কথিত আছে, কমলাকান্তের মৃত্যুকালে মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করা হইবে কিনা জানিতে চাহিলে সাধক প্রবর গাহিয়াছিলেন "কি গরজে গঙ্গাতীরে যাব। আমি কালী মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব।" এই গানটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভ ভেদ করিয়া ভোগবতী গঙ্গা সেখানে আবির্ভূতা হইয়া সাধকের বদনকমলে পতিত হইয়াছিল। অনন্তর সাধক দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। তাঁহার নামে প্রচলিত ২৬৯টি গান আমরা দেখিয়াছি। রামপ্রসাদের গানের সংখ্যা ২৮১।

উদ্বোধন

ওমর আলী

ভয়ার্ত বসুধা কাঁপে তীব্র আর্তনাদে
প্রচণ্ড উন্মাদে,
বজ্রের দামামা নির্ঘোষে,
প্রলয়ের বহ্নিদৃপ্ত রোষে।
রক্তে রক্তে ছেয়েছে আকাশ
কোথা অবকাশ
মৃত্যুশীল মানবে রক্ষিতে,
সবলে লঙ্ঘিতে,
অজ্ঞান কারাগারে,
ক্ষুব্ধ পারাবারে।

নাই ধর্ম, নাই প্রাণ,
দেবতার অবদান
আছে শুধু নগ্ন পরিহাস
সত্যধর্মে ঘৃণ্য উপহাস।
কোথা পথ! অন্ধকার দিগন্তে ছড়ানো।
চোখ ঝল্‌সানো
বিদ্যুতের প্রচণ্ড আভায়
লুপ্তপ্রায়
শুভদৃষ্টি মানবকুলের।
এ নব যুগের
অন্ধত্ব হোক্ বিমোচন
স্বাগত, উদ্বোধন।

সমালোচনা

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য (সাধন ভাগ)—শ্রীগুণদাচরণ সেন-প্রণীত; প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—৯০; মূল্য দেড় টাকা।

প্রাচীনত্বে, আকারে, বিষয়-গৌরবে, ভাব ও ভাষার সৌন্দর্যে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—এই দুইখানি উপনিষদ্ প্রামাণিক উপনিষদ্গুলির শীর্ষস্থানে অবস্থিত। আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত উপনিষদ্ দুইটির অধ্যায়গুলি হইতে বিশেষভাবে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞাপক ও নিদিধ্যাসনের সহায়ক যথাক্রমে ৩৫টি ও ২১টি প্রধান মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রগুলির অন্তর্নিহিত ভাব সংক্ষেপে ও সরলভাবে ব্যাখ্যাত এবং প্রতি অধ্যায়-শেষে প্রয়োজনানুসারে সুচিন্তিত মন্তব্যও দেওয়া হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা তাঁহার 'কৈফিয়তে' লিখিয়াছেন—

"অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা মন্তব্যে কোন বিশেষ ভাষ্য বা টীকার গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করিতে পারি নাই। শ্রদ্ধার সহিত ঋষিদিগের অনুশাসনসমূহ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। * * * কোন বিশেষ স্থান বা সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধক-সাধারণকে স্মরণে রাখিয়াই ভগবদ্বিষয়ক সকল কথা বলা বা লেখা সঙ্গত মনে করিয়াছি।"

আমাদের বিচারে লেখকের এই চেষ্টা বহুলাংশে সফল হইয়াছে এবং সমগ্র উপনিষদ্ দুইটি পড়িবার যাঁহাদের সময় ও ধৈর্য নাই তাঁহারা এই সঙ্কলন-পাঠে উপকৃত হইবেন।

বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু-প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু বুক ডিপো, ৮৪-এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬; পৃষ্ঠা—১৩০; মূল্যের উল্লেখ নাই।

আলোচ্য বইটিতে বৌদ্ধজাতকের ১৪টি প্রসিদ্ধ গল্প ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া সহজ সরল-ভাবে লেখা হইয়াছে—উদ্দেশ্য তাহাদিগকে ভারতের সুমহান্ ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত করা। বইখানির মধ্যে মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ বইটিকে অষ্টম শ্রেণীর দ্রুত পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করিয়া ইহার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছেন।

প্রাচীন কবির কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু-প্রণীত; প্রকাশক: আর. কে বসু, ৫৭।এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১১, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১০৮; মূল্য দেড় টাকা।

বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের জীবনী ছোট করিয়া আলোচ্য বইটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক সাধারণের অজ্ঞাত কয়েকজন প্রাচীন কবির জীবনকথাও গবেষণা করিয়া উদ্ধার পূর্বক বইখানিতে স্থান দিয়া পাঠকগণের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির প্রয়াস করিয়াছেন। রচনা শৈলী উৎকৃষ্ট। ছাপাও ভাল। শিশুসাহিত্যে একখানি মূল্যবান্ সংযোজন হিসাবে পুস্তকটি আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

সঙ্গীত অনুসন্ধিৎসা (প্রথম খণ্ড-খেয়াল)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-প্রণীত ও প্রকাশিত; ১১ জয়দেব কুণ্ডু লেন, হাওড়া; পৃষ্ঠা—১২৫; মূল্য—৪৲ টাকা।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রকৃতি, গঠন ও অভ্যাস সম্বন্ধে বহু তথ্য এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা বর্তমানগ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে। সঙ্গীতাচার্য ৺নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (রাণাঘাট) এবং ওস্তাদ কাদের বক্স (মুর্শিদাবাদ) সাহেবের নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত লেখক নিজে একজন গুণী গায়ক। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর যাঁহাদের অনুরাগ আছে এই পুস্তক

তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসাকে প্রখর করিবে। স্বর-মেল, ঠাট, বাদী-সম্বাদী-বিবাদী, রাগ-অঙ্গ, জাতি-শ্রেণী, রাগোৎপত্তি, রাগমূর্তি, রস, গায়কী—এই বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনায় লেখক তাঁহার ভূয়িষ্ঠ পর্যবেক্ষণ এবং মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। দ্বাবিংশ শ্রুতির প্রয়োগ সম্বন্ধে ওস্তাদরা অনেক সময়ে শিক্ষার্থিগণের নিকট যে একটি ভীতিপ্রদ কুহেলিকা তুলিয়া ধরেন 'ব্যবহারিক সঙ্গীত' সংজ্ঞক উপক্রমণিকায় লেখক উহার মধ্যে সত্যতা কতটুকু এবং ভানই বা কতটা তাহার নির্ভীক বিচার করিয়াছেন। পুস্তকের শেষাংশে ১২টি প্রসিদ্ধ রাগিণীর গান ও স্বরলিপি, তান, উপজ ও গায়কী সহ দেওয়া হইয়াছে।

কীর্তন স্বরলিপি (প্রথম খণ্ড—রূপানুরাগ) —শ্রীহরিদাস কর প্রণীত, ১৩৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫; পৃষ্ঠা রয়াল আট পেজী ৫৪+।৶০; মূল্য—২৷৶০ আনা।

বর্তমানকালে বাঙ্গলার সঙ্গীতামোদিগণের নিকট কীর্তনের সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষার্থি-শিক্ষার্থিনীগণ প্রায়শঃ 'গুরুমুখে'ই কীর্তন শিখিয়া থাকেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি মার্গসঙ্গীত যে ভাবে রাগ-তাল-লয়াদির যথাযথ বৈজ্ঞানিক সন্নিবেশ-সহ শিখানো হয় কীর্তন-শিক্ষায় এখনও সে রীতি তেমন প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু উহা প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা যশস্বী কীর্তনজ্ঞ শ্রীহরিদাস কর এই প্রচেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণের রচিত ১১টি প্রসিদ্ধ পদাবলীর সুসম্বদ্ধ স্বরলিপি আখরসহ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বইএর শেষে খোলের কয়েকটি প্রচলিত তালের বোল ও পরণ—দেওয়া আছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"বর্তমানে আমাদের কর্তব্য, কীর্তনের বিভিন্ন অঙ্গের যথাযথ চর্চা, ইহার তালের সুরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং ইহার পদ্ধতিগত অংশগুলিতে যে বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছে তাহার সংস্কার-সাধন। * * * কীর্তনের রাগরাগিণীর পুনরুদ্ধার অতি প্রয়োজনীয় কার্য। প্রাচীন সঙ্গীতসিদ্ধ আচার্য যে আসরে "আলাপি আলাপি রাগে মূর্তিমন্ত কৈলা", সেই আসরে আধুনিক কীর্তনিয়ার পদ্ধতি-বিহীন নীরস এবং অর্থশূন্য আস্তনের প্রাণহীন পরিবেশন কীর্তনের অবনতির চরম লক্ষণ নয় কি? * * * আমার আশা আছে এই গ্রন্থের মত দুই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে উপপত্তিক-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কীর্তনের প্রকৃতস্বরূপ-নির্ণয়ে অগ্রসর হইবেন।"

শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রগীতি—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ-রচিত। প্রকাশক—শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ (হুগলী); পৃষ্ঠা—১০০; মূল্য—১৲ টাকা।

বিভিন্ন উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, তন্ত্র এবং আরও কয়েকটি শাস্ত্র হইতে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য এবং উপাসনা বাঙলা গীতিকায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রণবোপাসনার গূঢ় মর্ম বহু-শাস্ত্রবিদ্ তত্ত্বদর্শী গ্রন্থকার অতি সরল ও মনোজ্ঞ-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক শাস্ত্রানুসারী এবং সাধনানুরাগীদিগের নিকট সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

যুগের মশাল জ্বাল্‌লে যারা (কবিতার বই) —অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীদেবকণ্ঠ ভট্টাচার্য, মহেশ্বরদী, পোঃ মাধবদী (ঢাকা), পূর্বপাকিস্তান; পৃষ্ঠা—১১২; মূল্য—১৸০ আনা।

ঢাকার বহুজনমান্য পণ্ডিত গ্রন্থকারের পূর্ব-প্রকাশিত 'বিশ্ববীণা' নামক কবিতা পুস্তকটি কিছু পরিবর্তন সহ বর্তমান নামে তৃতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রবীণ গ্রন্থকার দীর্ঘ-কাল সাহিত্যসেবা ও শাস্ত্রপ্রচার করিয়া আসিতেছেন। পুস্তকের ৫০টি কবিতার মধ্যে ১৮টি বাংলার কয়েকজন যুগপ্রবর্তক ধর্মনেতা, কবি ও মনীষীর উদ্দেশ্যে লিখিত। বোধ করি এইজন্যই গ্রন্থের বর্তমান নাম। অন্যান্য কবিতাগুলি প্রধানতঃ ধর্ম ও সমাজসেবা-বিষয়ক। নানা ছন্দে লেখা

কবিতাগুলির ভাব-গভীরতা এবং বলিষ্ঠতা প্রশংসনীয়।

অভিযাত্রী (সাময়িক পত্রিকা, চতুর্থ প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬২)—খড়্গপুর অতুলমণি উচ্চ বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

এই পত্রিকাটিতে পরিচালকগণের একটি সুস্পষ্ট শিক্ষাদর্শের পরিচয় পাইয়া আমরা প্রভূত আনন্দলাভ করিয়াছি। ছাত্র (প্রাক্তন এবং বর্তমান) এবং শিক্ষকগণের প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি সুলিখিত। ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপটের মধ্যে অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্নতা, মনোযোগ ও শিল্পবোধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই যোগ্য।

দুর্মুখ (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬২)—সম্পাদক : শ্রীঅপূর্ব সাহা, ২২।২এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩।

১৬ পৃষ্ঠার দুই আনা দামের এই নূতন মাসিক পত্রিকাটির আদর্শগত নীতি, সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শুভেচ্ছা'র মধ্যে পরিস্ফুট।

"শ্রীরামচন্দ্রের 'দুর্মুখ' সত্যভাষণে ছিলেন নির্ভীক—প্রভু-পত্নী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী জানকী দেবীর বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদ অসত্য জেনেও প্রভুসমক্ষে ব্যক্ত করার সাহস হারান নাই। সেই সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠা হোক্ দুর্মুখের যাত্রাপথে পাথেয়।"

মলাটে ঘোষিত হইয়াছে ইহা "জনগণের বার্তাবহ পত্র।" এই আগন্তুক সহযাত্রীকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি—এই বৎসর পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ৯৪তম জন্মতিথির (পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী) তারিখ পড়িয়াছে ২০শে মাঘ, শুক্রবার (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬)। ঐ দিন বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ডেয়ারী, সুরভিকানন, বেলুড় মঠ—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের গোশালাটি বর্তমানে বেলুড় খেয়াঘাট হইতে মঠগামী রাস্তার পশ্চিমদিকে একটি বৃহৎ বাগানবাড়িতে ('সুরভি-কানন') শ্রীরামকৃষ্ণমিশন শিল্পবিদ্যালয়ের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত। অর্থনৈতিক সঙ্গতি বজায় রাখিয়া কি ভাবে সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে গৃহে গৃহে গোপালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন করা যায় জনসাধারণকে তাহার যথাযথ শিক্ষাদান এই ডেয়ারীটির অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। গোপালন সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কার্যকরী তথ্য ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গোশালায় মোট ৩৬টি পশু ছিল (১টি ষাঁড়, ১৩টি দুগ্ধবতী গাভী, ১০টি ভাবী প্রসূতি, ১২টি বাছুর)। সংগৃহীত দুগ্ধের পরিমাণ—৫০৩ মণ ২৪ সের। যাবতীয় খরচ বাদ দিয়া বৎসরের শেষে মোট উদ্বৃত্ত—৫,৪৮৯ টাকা ৩ পয়সা। গোরক্ষা ও গোপালন সম্বন্ধে এই গোশালার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি শাখাকেন্দ্র এবং স্ব স্ব গৃহে গাভীপালনে সমুৎসুক বহু ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন।

দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী—নূতন দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন রোডে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দিল্লী শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পুস্তিকা কয়েকমাস আগে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে আশ্রমে ২৪টি এবং আশ্রমের বাহিরে ২১টি শাস্ত্রালোচনার ক্লাস লওয়া হইয়াছিল ; মোট উপস্থিতি যথাক্রমে—২১৫৫০ এবং ১,৭৮২। কেন্দ্র-সেবক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ নানা স্থানে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক ৬৩টি বক্তৃতা দেন। প্রতি রবিবার

আশ্রমে একটি সংস্কৃতশিক্ষার ক্লাস বসে। ইহাতে গড় উপস্থিতি ছিল—১১০। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, খ্রীষ্টজয়ন্তী, বুদ্ধজয়ন্তী তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের বহুতর উৎসাহের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের উৎসব-সংশ্লিষ্ট বার্ষিক সভার নেতৃত্ব করেন উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। শ্রীরামকৃষ্ণজয়ন্তী-সংক্রান্ত সাধারণ জনসভার পরিচালক ছিলেন লোকসভার স্পীকার শ্রীজি ভি মবলঙ্কর। প্রথমোক্ত সভার কার্যক্রম অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক রাত্রি ১০টায় বেতার যোগে প্রচারিত হয়। আলোচ্যবর্ষে শ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী বহুবিধ কর্মসূচী সহ শহরের নানা স্থানে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মিশনের লাইব্রেরীতে আলোচ্যবর্ষে পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৬,৩৮৭ ; ৬,৫৬৯টি বই বাহিরে পাঠের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। এই বৎসর পাঠাগারে ১০টি সংবাদপত্র এবং ৬০টি সাময়িক পত্রিকা আসিয়াছে। নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে—৭৫।

দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে রোগি-সংখ্যা ছিল—৪০,৯৭৮ (নূতন—৮,৯১২)। ক্যারল-বাগ এলাকায় স্থাপিত যক্ষ্মা ক্লিনিকের বহির্বিভাগে রোগিসংখ্যা ছিল—৮৩,৩৬৯ (নূতন—১,৪৬১); অন্তর্বিভাগে—৩৫৯।

মিশনের উৎসাহে ও প্রেরণায় জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত দিল্লীর একটি মহিলাদল 'সারদা মহিলা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকাল কলেজে দরিদ্র নারী ও শিশু রোগিদের বিবিধ পরিচর্যা ছিল ইহাদের সেবাকার্যের একটি অন্যতম অঙ্গ।

সৌরাষ্ট্রে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সেবামূলক কার্য—সৌরাষ্ট্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য শুরু হয় ১৯২৭ সালে। মভির মহারাজাসাহেব শ্রীপৃথ্বীরাজী বিনা ভাড়ায় রাজকোটে একটি বাড়ী আশ্রম স্থাপন করিতে দেন এবং ওখানেই আশ্রমের কাজ চলিতে থাকে। কাজ ধীরে ধীরে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাজকোটের ঠাকুরসাহেবের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে বর্তমান স্থায়ী বাড়ীটি ১৯৩৪ সালে ক্রয় করা হয়। আশ্রমের বর্তমান কর্মধারার পাঁচটি বিভাগ—(১ম) ধর্মালোচনা (২য়) প্রকাশন (৩য়) চিকিৎসা (৪র্থ) ছাত্রাবাস (৫ম) লাইব্রেরী ও পাঠাগার।

(১ম) আশ্রমের ঠাকুরঘরে নিয়মিত পূজা ও উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমবাসিগণ ব্যতীত অনেকেও উপাসনার জন্য আসিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে পৃথক ভজনাদির আয়োজন করা হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মাচার্যগণের জন্মদিনে উদ্‌যাপিত উৎসবে শহরের জনসাধারণ সোৎসাহে যোগ দিয়া থাকেন।

(২য়) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলি গুজরাটী পুস্তক আশ্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩য়) হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ মতে বিনা-মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আশ্রমের সেবাবিভাগের প্রধান কাজ। ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ এই বৎসর মোট রোগার সংখ্যা ছিল ২০,১৪২ (নূতন—৪৮০৪, পুরাতন—১৫৩৩৮)।

(৪র্থ) আলোচ্যবর্ষে ছাত্রাবাসে ৪০ জন বিদ্যার্থী ছিল (৯ জন সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ৫ জন আংশিক খরচ দিয়া)। সন্ন্যাসি-কর্মিগণের সস্নেহ পর্যবেক্ষণে ছেলেদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রচুর সহায়তা হয়।

(৫ম) অবৈতনিক লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা—৬০৭২ ; পাঠাগারে ৭২টি সাময়িক ও সংবাদ-পত্র আসে। আলোচ্যবর্ষে ১৪,২৮৮ খানি বই

পাঠের জন্য বাহিরে গিয়াছে। দৈনিক গড়ে ১২৫ জন ব্যক্তি পাঠাগারে বসিয়া পত্রিকাদি পড়িয়াছেন।

পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম—এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের (১৮ ও ২০, যদুলাল মল্লিক রোড, কলিকাতা-৬) ১৯৫২, '৫৩ ও '৫৪ সালের বর্ষ-বিবরণী মুদ্রিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষগুলিতে এই আশ্রম-ছাত্রাবাসটির ক্রমোন্নতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে দরিদ্র সচ্চরিত্র ও মেধাবী ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার বাসস্থান ও আশ্রমের সর্ববিধ সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। '৫২ সালের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬০ (৫১ জন অবৈতনিক, ৪ জন আংশিক খরচে ও ৭ জন সম্পূর্ণ খরচ দিয়া); '৫৩ সালে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ী (নামকরণ হয় ব্রহ্মানন্দ ধাম) ছাত্রাবাসে সংযোজিত হইলে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ১১০ ; তন্মধ্যে বিনা খরচাতে থাকে ৮২ জন। ১৯৫৪ সালে ১১৬ জন বিদ্যার্থী আশ্রমে স্থান লাভ করিয়াছিল (অবৈতনিক—৮৯, আংশিক খরচে—১৭ এবং সম্পূর্ণ খরচে—১০ জন)। প্রতি বৎসর আশ্রম-বিদ্যার্থিগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ফল প্রশংসাযোগ্য। ১৯৫৪ সালে ১৮ জন ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম স্থান অধিকার করে ; ১৩ জন ডিগ্রী পরীক্ষার্থীই সাফল্যমণ্ডিত হয়, একজন ঈশান-বৃত্তি ও ৯ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পায় ; ২ জন এম্-এ পরীক্ষার্থীর উভয়েই সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়। এই আশ্রম কর্তৃক 'বিবেকানন্দ সমাজ-সেবা কেন্দ্র' নামে একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সাল হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কাজ কলিকাতার রামবাগানে অনুন্নত বস্তিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার।

বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আট ভাগে বিভক্ত। (১) বিদ্যালয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় বিভাগই স্কুলে রহিয়াছে। বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের অনুমোদিত। আশ্রমবাসী ছাত্রগণ ছাড়া বাহিরের ছেলেদেরও ভর্তি করা হয়। (২) ছাত্রাবাস। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শে পরিচালিত এই ছাত্রাবাসে ১৯৫৪ সালে ১২৪টি বালক ছিল। শরীরচর্চা, স্বাবলম্বন, ধর্মানুরাগ, শ্রদ্ধা, নিয়মানুবর্তিতা, সামরিক ড্রিল, পড়াশুনায় মনোযোগ, উদ্যানরচনা, সঙ্গীত এইগুলি এখানকার আবাসিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। (৩) অবৈতনিক চিকিৎসালয়। আশেপাশের দরিদ্র পীড়িতগণকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হয়। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের উপর চিকিৎসার ভার রহিয়াছে। (৪) সাপ্তাহিক ধর্মসভা। ১৯৫৩ সালে নির্মিত আশ্রমের সুবৃহৎ প্রার্থনা-গৃহে প্রতিসপ্তাহে সর্বসাধারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও চণ্ডীর আলোচনা অভিজ্ঞ ভক্তগণের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হয়। বহু ধর্মপিপাসু নরনারী সাগ্রহে এই পাঠে উপস্থিত থাকেন। (৫) অসহায়গণকে আর্থিক সাহায্য ও দরিদ্র শিশুগণের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ। (৬) চতুষ্পাঠী। এই বিভাগে সংস্কৃত চর্চার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে ৩২ জন শিক্ষার্থী ছিলেন।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী নিম্নরূপ : হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয়ে চিকিৎসালাভ করেন ৪৮০৯৮ জন (নূতন ৮৩৮৩), দৈনিক গড়ে ৩৯২ জনকে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়। মিশন-পরিচালিত ৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (প্রাথমিক), বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (মাধ্যমিক) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০৪, ৩০৫ ও ১১২ ; এতদ্ভিন্ন কয়েকটি দূরবর্তী পল্লী-অঞ্চলে অনুন্নত ও আদিবাসী

সাঁওতাল, পলিয়া, রাজবংশীদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষাবিভাগ সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। আশ্রম গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা—৯১১, পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা—১০৭০। ছাত্রাবাসে ১৪ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৯ জন বিনা ব্যয়ে ও আংশিক ব্যয়ে ছিল। শিশু-সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা—২৫০। ধর্মক্লাস, বক্তৃতাদি, জন্মতিথি-পূজা, শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীশ্যামা ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মিশন-প্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তু-পল্লীতে বর্তমানে ১০৫টি ছিন্নমূল পরিবার বসবাস করিতেছেন।

জামসেদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের ৩৪তম বার্ষিক মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। বিহার প্রদেশের এই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানটির কর্মধারা প্রধানতঃ দুইটি বিভাগে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে: প্রথম ধর্মবিষয়ক, দ্বিতীয় শিক্ষাসম্বন্ধীয়, প্রথম বিভাগে আলোচ্যবর্ষে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, শিবরাত্রি, শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী, খ্রীষ্ট জন্মদিন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দৈনিক ও রবিবাসরীয় ক্লাসগুলিও যথাযথভাবে পরিচালিত হয়। শিক্ষা-বিভাগের অনেকগুলি শাখা। (১) প্রধান গ্রন্থাগার ও পাঠাগার—আলোচ্য বর্ষের পুস্তক সংখ্যা ১৫২৬; ১০টি মাসিক, ৪টি দৈনিক এবং ৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়াছিল। (২) ছাত্রাবাস—দুইটি ছাত্রাবাসে ফ্রি ও হাফ্ ফ্রি সহ মোট বিদ্যার্থী ছিল ২৯ জন করিয়া। (৩) উচ্চ বিদ্যালয়—(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ হাই স্কুল, বিষ্টুপুর—ছাত্রসংখ্যা ৩২৫, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল ৮২'৭%, লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা ৫০১ (খ) বিবেকানন্দ হাইস্কুল, চেনাব রোড— ছাত্রসংখ্যা ৪৮৩, পরীক্ষার ফল ৯২%, লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা ১৩০৭ (গ) শ্রীসারদামণি বালিকা বিদ্যালয়, সাকচি—ছাত্রীসংখ্যা ২২৬, গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৮৫২ (ঘ) সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বার্মা মাইনস্—ছাত্রীসংখ্যা ২৭০, লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা ১০০০; (৪) মধ্য বিদ্যালয়: তিনটি মধ্য বিদ্যালয়—ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬৩ (৩৪৩+২২০), ১০৯৫ (৬৪৯+৪৪৬), ১৪০ (৭৮+৬২), প্রথম দুইটির পুস্তক-সংখ্যা যথাক্রমে ৫৯৪, ১৪৩৩; (৫) তিনটি উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা—ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৪৭৩ (২৬৯+২০৪), ৬২ (৪৫+১৭), ২৪৭ (১৫০+৯৭), ৭৭ (৫৫+২২); (৬) বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ে পড়িয়াছেন ৫৯ জন (পুরুষ ৪৪, স্ত্রীলোক ১৫)। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটির আরও দুইটি স্মরণীয় ঘটনা হইল শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর শুভাগমন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

(১) **The Holy Mother Birth Centenary Souvenir (1853—1953)**—Published by Swami Avinashananda, Secretary, The Holy Mother Birth Centenary, Belur Math, Howrah. Price: Rs. 8/-

ক্রাউন কোয়ার্টো সাইজ উৎকৃষ্ট বিলাতী আর্ট কাগজে ছাপা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর স্মারক এই আলেখ্য-গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন অবস্থার ২৫ খানি ছবি, তিনি জীবিতকালে যে সমস্ত স্থানে অবস্থান করিয়া তপস্যা ও লোককল্যাণকার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন এবং যে সকল তীর্থস্থানে গিয়াছিলেন উহাদের চিত্র, তথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমায়ের জননী শ্যামাসুন্দরী, মায়ের

সখী যোগীন-মা, ভগিনী নিবেদিতা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মী দিদি, গোপালের মা ও মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুর ছবিও আছে। নানাস্থানে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরগুলির প্রতিকৃতি, মায়ের পবিত্র পাদপদ্মচিহ্ন, সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও ভাস্করকৃত শ্রীমায়ের আলেখ্য ও মূর্তির ফটো এবং শ্রীমা-শতবার্ষিকী শোভাযাত্রার চিত্রাবলীও সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে দ্রব্যাদির সঙ্গে শ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি জড়িত রহিয়াছে যথা তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র, ষোড়শীপূজার কাষ্ঠাসন, তাঁহার ব্যবহৃত কঙ্কণ, কণ্ঠহার ইত্যাদির ছবিও দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি ছবির পার্শ্বে বা নিম্নে ইংরেজীতে পরিচিতি এবং পুস্তকমধ্যে শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীও *পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।*

(২) **Sri Sarada Devi The Holy** Mother—By Swami Gambhirananda, Published by the Ramakrishna Math, Mylapore, Madras—4. *Pages 590; Price:* Board Rs. 6/-; Calico, Rs. 9/-.

শ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী-গ্রন্থহিসাবে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক জীবন-রচিত। বহু ভক্ত নরনারীকে কথোপকথনস্থলে প্রদত্ত ধর্মজীবনের নানা সমস্যার সমাধানমূলক শ্রীমায়ের অমূল্য উপদেশাবলীর একটি মূল্যবান্‌ সংযোজনও পুস্তকখানিতে পাওয়া যাইবে।

(৩) **পৌরাণিকী**—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রণীত ; উপনিষদ্‌ ও বিভিন্ন পুরাণ হইতে সঙ্কলিত ১২টি কাহিনী ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা। *পৃষ্ঠা—১২৪ ; মূল্য—১৷৷০ টাকা। প্রকাশক—* শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বাঁকুড়া। পরিবেশক—মডেল পাবলিশিং হাউস, ২-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বিবিধ সংবাদ

আমেদাবাদ বিবেকানন্দ পাঠচক্র—এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব গত ২৫শে ও ২৬শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় প্রেমাভাই হলে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন বক্তা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ১৫ জন গুণী ভজন সঙ্গীত দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে আশ্রম কর্তৃক দুইটি পাঠাগার ও দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। শহরের অভ্যন্তরস্থ চিকিৎসালয় হইতে ৩১০৫ জন এবং আশ্রমস্থ ঔষধালয় হইতে ৭৫০৯ জন আর্তনারায়ণ চিকিৎসালাভ করেন। প্রত্যহ ৬০ জন বালক-বালিকাকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। দুইটি পাঠাগারে মোট ২৫৫৪ খানি পুস্তক, ৭ খানি দৈনিক এবং ১৩ খানি মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা ছিল। মোট ৫১৮৯ খানি পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হয়।

৬ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আশ্রম-মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীযীশু প্রভৃতির জন্মদিবস যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতি শনিবার রামনাম-সংকীর্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল।

উৎ-শিষ্ট

উচ্ছিষ্টে নাম রূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিতঃ।
উচ্ছিষ্ট ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বিশ্বমন্তঃ সমাহিতম্॥
উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বং ভূতং সমাহিতম্।
আপঃ সমুদ্র উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমা বাত আহিতঃ॥
ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে॥

অথর্ববেদসংহিতা—১১।৪।১, ২, ১৭

[আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির গোচর নিখিল বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াই ভগবানের শক্তি শেষ হইয়া যায় নাই। প্রপঞ্চের মায়িকতার সহিত লেশমাত্রস্পর্শশূন্য তাঁহার এক অপরিবর্তনীয়, অব্যয়, অক্ষয় সত্তা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।] সেই উৎ-শিষ্টে—দেশ-কাল-নিমিত্তের ঊর্ধ্বে বিরাজমান আপ্তকাম মনসো-গোচর সত্তাতেই নামরূপাত্মক অখিল লোকসমূহ আশ্রিত; সেই উৎ-শিষ্টের শক্তিতেই ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ শক্তিমান, চরাচর বিশ্ব ক্রিয়াশীল। সেই উৎ-শিষ্টেই গ্রথিত রহিয়াছে দ্যুলোক-ভূলোক, অসংখ্য প্রাণী, সলিল-বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত, সমুদ্র, চন্দ্রমা।

ব্রহ্মের সেই পরম ঊর্ধ্ব নির্বিশেষ সত্তাই ধরিয়া রাখিয়াছে মানুষের যাবতীয় অন্তঃসম্পদ, বহিঃসম্পদকে—মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমাজ-সংসারকে, মানুষের ঋত (যথার্থ সঙ্কল্প), সত্য (যথার্থ-ভাষণ), ব্রত-উপবাস প্রভৃতি তপস্যা, রাষ্ট্র, শ্রম (শান্তি), ধর্ম, কর্মকে। মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে সেই ত্রিকালাতীত ঊর্ধ্ব দ্বারা; মানুষের বীর্য, শ্রী, সামর্থ্যের যত কিছু অভিব্যক্তি তাহাও সম্ভবপর হইতেছে উৎ-শিষ্টেরই অলক্ষ্য শক্তিতে।

কথাপ্রসঙ্গে

আমরা কে?

আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন মনীষী লেখক অলডাস হাক্সলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড বেদান্ত সোসাইটির মুখপত্র Vedanta and the West পত্রিকায় (জুলাই-আগস্ট, ১৯৫৫) একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু—'আমরা কে?' যে শরীর-মন মানুষের নিত্য-পরিচিত, তাহার দৈনন্দিন অজস্র ব্যবহারের মুখ্য অবলম্বন, সেই শরীর-মনের সম্পর্কে মানুষ নিজে কে?

ভারতবর্ষে এই প্রশ্ন শুনিয়া কাহারও হাসিয়া উঠিবার কথা নয়, কেননা ভারতীয় তত্ত্বচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই জিজ্ঞাসাই মানুষের শ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা। যেমন, কেনোপনিষদের আরম্ভই এই প্রশ্ন লইয়া; কে আমাদের মনকে চালাইতেছে, কাহার নির্দেশে দেহে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, আমরা যে কথা বলি, দেখিতে পাই, শুনিয়া যাই—কাহার ক্ষমতায় তাহা সম্ভবপর হয়? স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করিবার যে ক্লান্তিহীন বিপুল উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছে এবং উহাতে যে সার্থকতা ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় এখানকার বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি-পুরাণ-কাব্য-সাহিত্যেই শুধু নয়, শিল্পে, ভাস্কর্যে, কিংবদন্তীতে, লোকসঙ্গীতে পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 'আমরা কে?' প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি ও সংহতি বর্ধন করিয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে ব্যাপার অন্যরূপ। গ্রীকো-রোমান সভ্যতায় পরিপুষ্ট মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আত্ম-জিজ্ঞাসা নয়, জগৎ-জিজ্ঞাসা। এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময়ী বিচিত্র বহিঃপ্রকৃতিকে একান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া রাখিতেই হইবে এবং উহা ধরিয়া রাখিবার জন্য মানুষের যতটুকু পরিচয় প্রয়োজন ততটুকুই যথেষ্ট। মানুষ সম্বন্ধে উহার অধিক জিজ্ঞাসা অলস প্রশ্ন। পাশ্চাত্ত্যে যে সকল মনীষী এবং মরমীয়া সাধক-সাধিকারা সময় সময়ে মানুষের আত্মিক পরিচয়ের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্ত্য-মানস শুধু মেধাবী দার্শনিক মতস্থাপক রূপেই দেখিয়াছে অথবা ইহকালবিমুখ (other-worldly) কল্পনাবিলাসী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে। বৃহৎ জন-জীবনে তাঁহাদের কথা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

তবে আর অলডাস্ হাক্সলি আজ পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর কাছে নূতন করিয়া "আমরা কে?" প্রশ্নের ভণিতা করিতে বসিলেন কেন? শুনিবার লোক পাইবেন কি? সম্ভবতঃ পাইবেন। পাশ্চাত্ত্যে জনসাধারণের তাত্ত্বিক আলোচনার সময় নাই, কিন্তু বিজ্ঞান শুনিবার পূর্ণ উৎসাহ আছে। অলডাস বুঝাইতে চাহিতেছেন, এই প্রশ্নটি নিছক একটি কাল্পনিক প্রশ্ন নয়, কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকদের ভাব-বিলাস নয়, ইহা একটি পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। বিজ্ঞানের এলাকা তো দিন দিনই সম্প্রসারিত হইতেছে। ষাট বৎসর আগে কে ভাবিতে পারিত মানুষের মনকে লেবরেটরীতে বসিয়া নাড়াচাড়া করা যায়? আজ কিন্তু মনস্তত্ত্ব একটি রীতিমত বিজ্ঞান। সেইরূপ খাড়া হইয়াছে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতির বিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্র বিজ্ঞানের কুক্ষিগত হইতেছে। মানুষের নিবিড়তম পরিচয় তবে কেন কল্পলোকে থাকিবে? মানুষের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি কেন মানুষের চামড়া-মাংস-অস্থি-মজ্জা ভেদ করিয়া আরও সূক্ষ্মে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত হইবে না? অলডাস উপনিষদ্ পড়িয়াছেন। উপনিষদে আত্মবিদ্যাকে বলা হইয়াছে 'সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা'। মানুষের গূঢ়তম সত্য উপনিষদ্ যে পদ্ধতিতে আবিষ্কার

করিয়াছেন তাহা আজকালকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী (Scientific Method) বলিলে ভুল হয় না। অলডাস হাক্সলির স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্যে প্রদত্ত বেদান্ত-বক্তৃতাবলীও পড়া আছে। তিনি জানেন, আমেরিকান মনে স্বামী বিবেকানন্দ যে সাড়া আনিয়াছিলেন উহা বিশ্বাসের আবেদন-মূলক 'থিয়লজি' দ্বারা নয়, পাশ্চত্ত্যের বহু-সমাদৃত সমীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্তাশ্রয়ী বিজ্ঞানের উপমা, যুক্তি ও বিচার উপস্থাপিত করিয়া। বিবেকানন্দ মানব-সত্যের বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। অলডাস্ বিবেকানন্দেরই পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। মানব-সত্যের বিজ্ঞান বিবেকানন্দের সময় হইতে আজ ষাট বৎসর পরে পাশ্চাত্ত্যে প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, কেননা পাশ্চাত্ত্যের জানা অন্য যতপ্রকারের বিজ্ঞান আছে কোনটির দ্বারাই মানুষের জীবনে প্রকৃত সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতেছে না। সমস্ত বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে সুসংহত রাখিবার জন্য যেন একটি নূতন বিজ্ঞান চাই। এই নূতন বিজ্ঞানই মানুষের স্বীয় পরিচিতির বিজ্ঞান—সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা আত্মবিদ্যা। অতএব অলডাস হাক্সলি একটি সময়োপযোগী সুসমীচীন প্রশ্নেরই অবতারণা করিয়াছেন—'আমরা কে?'

অন্তর্মুখীনতাই ধর্মবিকাশের সোপান

গত ৬ই চৈত্র (২০।৩।৫৬) বোধগয়ায় 'বোধগয়া মন্দির উপদেষ্টা-সমিতি'র প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ধর্মধ্বজিতা এবং প্রকৃত ধার্মিকতার পার্থক্য সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, আজকাল ধর্ম লইয়া অনেক মাতামাতি দেখা যাইতেছে, কিন্তু যথার্থ ধর্মভাবের বড়ই অভাব। অপর ধর্মের প্রতি ঈর্ষ্যা, বৈরী বা মুরুব্বিয়ানার ভাব কিছুতেই থাকা উচিত নয়। এগুলি প্রকৃত ধার্মিকতার সহিত কখনও একযোগে থাকিতে পারে না।

"আমরা নিজেদের অন্তঃসম্পদের দিকে মোটেই নজর দিই না। আমাদের জীবন একান্তই ভাসাভাসা, বহির্মুখ জীবন। যদি কয়েক মুহূর্ত অবসর পাই উহা আমরা নষ্ট করি পার্থিব আমোদ-প্রমোদে। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, তপস্যা বিনা সত্যলাভ হয় না। মানুষ যখন স্থির হইয়া বসিয়া নিজের অন্তঃশক্তিকে সংহত করিবার চেষ্টা করে তখনই সে তাহার বৃহৎ সত্যের সম্মুখীন হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খানিকটা অংশ আমরা যদি এই আত্মিক অনুভূতির জন্য ব্যয় না করি তাহা হইলে আমরা নিজদিগকে যথার্থ ধার্মিক মনে করিতে পারি না।"

'বোধগয়ামন্দিরের উপদেষ্টা সমিতি'তে যেমন ভারতের এবং বিদেশেরও বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রতিনিধি আছেন, তেমনি অনেক হিন্দুসভ্যও রহিয়াছেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ সমিতির এই প্রকার সংগঠনকে সৌভ্রাত্রের প্রতীক বলিয়া বর্ণনা করেন। বোধগয়া সকল সত্যান্বেষীরই পবিত্র তীর্থ, কেননা বুদ্ধ যে বোধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা সকল ধর্মেরই মূল লক্ষ্য। আমরা যে জগতে বাস করি উহা সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ। উপনিষদের 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়' প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়া ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলেন,—

"আমাদিগকে একটি সত্য ও অমৃতত্বের জগতে জাগ্রত হইতে হইবে। এই পৃথিবীর সব কিছুই তো চলিয়া যায়। সভ্যতার যত কীর্তি ও গৌরব তাহাও ধ্বংস হইতে বাধ্য। সকল জীবনেরই পরিণাম মৃত্যু। আমরা প্রত্যেকেই কালের অধীন। জন্ম-মৃত্যু হইল কালেরই প্রতীক। আমাদিগকে কালের অধীনতা হইতে কালাতীত অবস্থায় উঠিতে হইবে।"

ইহারই নাম সত্য-মিথ্যায় সংমিশ্রিত জগতের মিথ্যা অংশ বর্জন করিয়া সত্যে আশ্রয়লাভ, অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্যোতিতে গমন। ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান—বোধি। ইহাই সকল ধর্মের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যকে জীবনে বাস্তব করিতে হইলে অন্তর্জীবনের প্রতি অবহিত হইতে হইবে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য।

সমতার অভ্যাস

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'ত্রেকেটে তাক্‌' প্রভৃতি তবলার বোল শুধু মুখস্থ করিলে কেহ তবলচী হয় না, দীর্ঘকাল হাত সাধিলে তবেই মুখের বোল হাতে তবলায় উঠে। তিনি নিজে কাঞ্চনাসক্তি দূর করিবার জন্য এক হাতে মাটি আর এক হাতে টাকা লইয়া 'মাটি টাকা, টাকা মাটি' সাধিয়াছিলেন। 'হাজার টাকা মূল্যের শাল, যে পঞ্চভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই তো এটাও তৈরী হয়েছে'—এই বিচার শুধু মনে মনে করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, "শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া—ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, 'থু থু' বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘষিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

কোন একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ভাবকে ঔপপত্তিক পর্যায়ে রাখা এক কথা, আর জীবনে উহাকে রূপায়িত করা সম্পূর্ণ পৃথক কথা। শেষোক্তের জন্য প্রখর মনোযোগ, আত্মপরীক্ষা ও সক্রিয় অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। ২৫।৩।৫৬ তারিখের 'ভূদানযজ্ঞ' পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্য বিনোবা ভাবের একটি সাম্প্রতিক ভাষণে তিনি তাঁহার নিজের সমতা-অভ্যাসের একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনাটি কৌতুকপ্রদ বটে, কিন্তু গভীর শিক্ষার বাহক। বিনোবাজী বলিতেছেন—

"সে সময় আমার গণিতের অধ্যয়ন চলছিল। মাঝে মাঝে গাধার ডাক কানে আসত আর তাতে আমার অসুবিধা হত। একদিন চিন্তা করলাম, এতে অসুবিধা কেন হবে? এতে তো আনন্দই হওয়াই উচিত। ঐ গাধার ডাক শুনে অন্য গাধার তো ভালই লেগে থাকবে এবং প্রেমের সঙ্গে সে কাছে ছুটে এসে থাকবে। আমারই বা তবে খারাপ কেন লাগবে? তাই এও ভাল ডাকই—এরূপ মনে করতে চেষ্টা করেছিলাম। পরে এক ঘটনা থেকে আরও শক্তি পেলাম। তখন আমি বরোদায় ছলাম। সেখানে এক সঙ্গীত-সম্মেলন হচ্ছিল। শুনতে গেলাম। নানা রকমের আওয়াজ সেখানে বের করা হচ্ছিল। ওসব শুনে আমার বিশ্রী লাগল। গায়করা তো নিজ নিজ ঢং-এর নিপুণতাই প্রদর্শন করছিলেন, কিন্তু আমি আনন্দ পেলাম না। ভাবলাম, একেও তো সঙ্গীতই বলা হয়, তবে এখন থেকে গাধার ডাককেও সঙ্গীতই বলতে হবে। পরে যখনই গাধার ডাক শুনতাম, অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে তাকে মধুর আওয়াজ বলে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতাম।

কিছুদিন পরে গাধার ডাক শুনতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে, তাতে এক করুণার ভাব এল। আমি ভাবলাম, গাধার উপর কত বোঝা চাপানো হয় আর ওকে খাওয়ানো হয় কত কম। * * * এখন আমার এমন হয়েছে যে, কোনও গাধা যখন চীৎকার করে তখন খুব ভাল লাগে। যেমন অন্য সব রাগ রয়েছে, তেমনি আমি একে 'গর্দভ রাগ' বলে মনে করি এবং আনন্দের সঙ্গে শুনি।"

সেন্ট্‌ পল কলেজে ছাত্রদের উদ্যম

গত ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬২ (১৪।৩।৫৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মতিথির দিন কলিকাতা সেন্ট্‌ পল কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের উদ্যোগে ঐ কলেজে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুসজ্জিত পটের সম্মুখে ছাত্রেরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হইতে পাঠ, আবৃত্তি এবং ভগবৎ-সঙ্গীত গান করিয়াছে, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী আমন্ত্রিত বক্তারূপে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। এই কলেজে অবাঙালী ছাত্রদের সংখ্যাই অধিক। তাহাদেরও অধিকাংশ এবং কলেজের অনেক অধ্যাপকও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। কি অধ্যাপকগণ এবং কি ছাত্রবৃন্দ—সকলেই অনুষ্ঠানটিতে প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

সেন্ট্‌ পল কলেজের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক যুগের এই মহান হিন্দু ধর্মাচার্যের জন্মজয়ন্তী পালনের অনুমতি দিয়া তাঁহাদের যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। উক্ত কলেজে এই ধরনের অনুষ্ঠান এই প্রথম। অনুষ্ঠানটির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার

কোন গন্ধ ছিল না। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের নিকটও যে প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিতে পারে ঐ অনুষ্ঠানের খ্রীষ্টান শ্রোতৃবৃন্দ তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

সেণ্ট পল কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নকেও তাঁহাদের এই উদ্যমের জন্য অভিনন্দিত করি। স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠান অর্থেই তো আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় অভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীতের জলসা। মহাপুরুষদের চরিত্রানুধ্যান ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিকে অবলম্বন করিয়াও যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইতে পারে এবং শুধু আনন্দই নয়, চরিত্রের বল ও উচ্চাদর্শের প্রেরণাও লাভ করা যায় তাহা সেণ্ট পল কলেজের ছাত্রগণ প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উদ্যম অন্যান্য বিদ্যায়তনেও অনুসৃত হউক ইহাই প্রার্থনা। বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হইতে যুবসমাজ নিজেদের চরিত্রগঠনের বিপুল উদ্দীপনা লাভ করিতে পারেন। আজ যাঁহারা ছাত্র, কাল তাঁহাদিগকে দেশের বিবিধ কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারাই হইবেন দেশের শিক্ষক, সংগঠক, নেতা। এখন হইতেই তাহার প্রস্তুতি আবশ্যক। ছাত্রদিগকে ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, ঐ আদর্শের ছাঁচে নিজদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে একজন National Hero—জাতীয় মহত্তম আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান ভারতীয় বিদ্যার্থিবৃন্দের অবান্তর ভাবুকতা নয়, অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

সংস্কৃত ভাষায় নূতন প্রাণ সঞ্চার

গত ১২ই ফেব্রুআরি, ১৯৫৬, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী কে এম্ মুন্সী বারাণসী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সমাবর্তন-ভাষণে সংস্কৃত ভাষায় নূতন প্রাণ সঞ্চার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। মানবতার সমক্ষে সংস্কৃতের একটি বিশিষ্ট বাণী রহিয়াছে। ঐ বাণীই মানুষকে ভোগসর্বস্বতা, মিথ্যা এবং হিংসা হইতে রক্ষা করিতে পারে। এই ভাষার মাধ্যমেই আমরা শিক্ষা পাই বিশ্বজগতের নৈতিক সংহতি যে মহাব্রত-গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত—অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, এবং অপরিগ্রহ—সেইগুলি। মানুষ তাহার রাগ (আসক্তি), ভয় এবং ক্রোধরূপ মানবীয় পরিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে পারে—মানুষের এই চরম লক্ষ্যে তাহাকে প্রবুদ্ধ করা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষার পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

সংস্কৃতই হইল ভারতবর্ষের মূল জাতীয় ভাষা। ইহার ব্যাকরণ ও শব্দসম্পদ শুধু উত্তর ভারতেরই নয় দক্ষিণ ভারতের ভাষাসমূহকেও গঠন, স্বচ্ছতা ও প্রকাশ-শৈলী দিয়াছে। গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভাষা আমাদিগকে যে একতা দিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইবার নয়। সংস্কৃতকে অনাদর করিলে এই একতা ব্যাহত হইবে।

আমাদের বর্তমান জীবনে সংস্কৃতের প্রভাব বলবান রাখিবার জন্য শ্রীমুন্সী এই ভাষার শিক্ষা-প্রণালীকে কালোপযোগী করিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে চতুষ্পাঠীসমূহে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। যাঁহারা সংস্কৃত উপাধি লইয়া বাহির হইবেন তাঁহারা যেন জীবন-সংগ্রামে যুঝিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া আসিতে পারেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ কঠিন বটে কিন্তু সহজ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলিবার ক্ষমতা কিছু অভ্যাস করিলেই আয়ত্ত করা যায়। দক্ষিণ ভারতে বিদ্যার্থীদের মধ্যে এই রীতি এখনও দেখা যায়। ব্যাকরণের অধিক নিয়ম কানুনের মধ্যে না গিয়াও কথোপকথনের মাধ্যমে সংস্কৃত শিখিবার প্রণালী চালু করিতে পারিলে এই ভাষায় একটি নূতন প্রাণ সঞ্চার করার অনেক সহায়তা হইবে।

পাশাপাশি

নাথুয়া বা নাথ সিং তাহার খুড়তুতো ভাই ভসুয়াকে (ভসম্‌ সিং) হাওড়া স্টেশনে মোকামা-এক্সপ্রেস হইতে নামাইয়া বাসস্থান জোড়াবাগানের একটি ব্যারাকের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছে। পথে কলিকাতার কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়া লইবে। বিরাটকায় স্টেট বাসের পা-দানিতে তাহাকে পদক্ষেপ করিতে দেখিয়া ভসুয়া খুবই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, ভয়ও পাইয়াছিল। নাথুয়া তাহাকে বুঝাইয়াছিল, ভয় নাই, এ কলকত্তা শহর, এক আনা পয়সা খরচ করিয়া অল্প সময়ে তাহারা অনেকদূর চলিয়া যাইবে, মিছামিছি "পৈদলে" গিয়া লাভ কি, বিশেষতঃ রেলভ্রমণে ভসুয়ার "থকাই" (পরিশ্রম) তো কম হয় নাই। নাথুয়ার পাশে ভসুয়া জড়সড় হইয়া স্প্রীং-আঁটা বেঞ্চিতে বসিল। এত সস্তায় জীবনে তাহার এত আরাম-দায়ক অভিজ্ঞতা এই প্রথম। নাথুয়া-ভসুয়ার সামনে পিছনে এবং পাশে বাঙ্গালী বাবুরা বসিয়াছেন, বাঙ্গালী মহিলারাও। এত নিবিড় অভিজাত-সংস্পর্শও ভসুয়ার জীবনে এই প্রথম। সে ঘামিতে লাগিল, রোমাঞ্চ অনুভব করিতে লাগিল। পোস্তার মোড়ে বাস থামিতে নাথুয়া ভসুয়াকে কলিকাতার প্রথম দ্রষ্টব্যস্থান দেখাইল—এ জী, দেখো আলুপোস্তা; আলুপোস্তা নাথুয়ার কর্মক্ষেত্র—এখানে সে ঝাঁকামুটের কাজ করে।

ভসুয়া কলিকাতাকে চিনিয়া লইয়াছে, তাহার দেশওয়ালা হাজার হাজার ভাইএর মত একটি কাজে লাগিয়া যাইতেও তাহার দেরি হয় নাই। কলিকাতায় সে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছে না। মোটা খাবার, পরিচ্ছদ এবং সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহ রাত্রের কয়েকঘণ্টা নিদ্রায় স্বস্থ করিবার মতো একটি স্থান—মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তিনটি বস্তু সে এখানে পাইয়াছে, তাহার মতো করিয়া পাইয়াছে। তাহার আকাঙ্ক্ষা কম, শরীর-মনের সহজ পরিতৃপ্তি তাই তাহার দুর্লভ নয়।

নাথুয়া ভসুয়াকে আনিয়াছে। নাথুয়াকে গ্রাম হইতে বাংলাদেশে আনিয়াছিল তাহার চাচা, সেই চাচা আসিয়াছিল তাহার পাশের গ্রামের এক কুটুম্বের ডাকে। কুটুম্বটিরও এখানে আসিবার ইতিহাস অনুরূপই। সদ্য আগত ভসুয়াও যখন বাড়ী যাইবে সেও তাহার এক আত্মীয়কে ডাকিয়া আনিবে। কলিকাতায় এবং বাংলা দেশের আরও শত শত স্থানে বিহারী শ্রমিক এই ভাবে বহুবৎসর ধরিয়া তাহার জীবন-কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া আসিয়াছে। তাহারা বাংলার মোট বয়, মিল চালায়, জাহাজ মালগাড়ী মোটরলরী বোঝাই ও খালি করে, কলিকাতার গাঙে বড় বড় নৌকার হাল ধরে, দাঁড় চালায়, রেলের লাইন পাতে, ঠিক রাখে, সেই লাইনের উপর দিয়া যে গাড়ী ছুটে তাহার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে দূর দূরান্তরে স্টেশনে স্টেশনে পয়েণ্টস্‌ম্যানের নীল কোর্তা পরিয়া। বাঙ্গালী বাবুদের গৃহস্থালী ঠিক রাখিতে নাথুয়া-ভসুয়াদের সহায়তা অপরিহার্য। তাহারাই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কয়লা পৌঁছাইয়া দেয়, কাপড় কাচে, জুতা শেলাই করে, বাঙ্গালী মাতা-ভগিনী-কন্যাদের কলিকাতার গলির রাস্তায় রিক্‌শায় চড়াইয়া লইয়া চলে। বাঙ্গালীর ইমারত ওঠে ইহাদেরই পরিশ্রমে, বাঙ্গালীর উৎসব-ব্যসনের বৃহৎ-সজ্জা-পারিপাট্য সম্ভবপর হয় ইহাদেরই ঘামে। নাথুয়া-ভসুয়ারা না থাকিলে বাংলার জীবন অচল।

ভোর পাঁচটায় নাথুয়াদের জীবন আরম্ভ হয়, ১২।১৪ ঘণ্টা অব্যাহত বেগে অগ্রসর হইতে থাকে; শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, ক্ষোভ নাই, নালিশ নাই। সন্ধ্যার পর রাস্তার পাশে কোথাও বসিয়া পনর কুড়ি জনে মিলিয়া যদি তাহারা কোনও দিন ঢোলক বাজাইয়া গান করিয়া লইতে পারে তাহাতেই তাহাদের পর্যাপ্ত চিত্ত-বিশ্রাম। বাঙ্গালী যাহাকে

'সংস্কৃতি' বলে সেই হিসাবে নাথুয়া-ভসুয়াদের কোন 'সংস্কৃতি' নাই এবং সেইজন্ত অনেক বাঙ্গালীর কিছু কিছু উপহাস, কটু-কাটব্য তাহাদিগকে শুনিতে হয়। কিন্তু নাথুয়া-ভসুয়ারা হাসিমুখে সহিয়া যায়। বাঙ্গালীর মতো তাহারা সংবেদনশীল নয়।

কলিকাতা এবং বাংলা দেশ নাথুয়া-ভসুয়াদের কেমন লাগে? মন্দ লাগিবার কথা নয়। জীবনের বড় চাহিদা যেখানে মিটে সেখানে একটা প্রীতি স্বভাবতই জন্মাইতে বাধ্য। নাথুয়া-ভসুয়াও বাঙ্গালীদের ভালবাসে—বাঙ্গালী মায়েদের, বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের। তাহারা যখন দেশে যায় গ্রামবাসীদের কাছে বাংলার গল্প বলে বই কি। কিন্তু সম্ভবতঃ বাংলার মাটি নাথুয়া-ভসুয়াদের প্রাণের শিকড় টানিয়া রাখিতে পারে নাই। বাংলার মাটির উপর তাহাদের নিবিড় মমত্ববোধ আসা কঠিন। সুদীর্ঘকালের সহাস্তিত্ব সত্বেও বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাংলায় বাঙ্গালী ও বিহারীর জীবনস্রোত পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে নিজ নিজ খাতে, সংঘর্ষ নাই, কিন্তু একাত্মতাও নাই। বোধ হয় এইরূপই বাঞ্ছনীয়। ইহার বেশী হইলে হয় তো সংঘর্ষ দুর্নিবার্য হইয়া উঠিত। নাথুয়া-ভসুয়ারা বাংলার প্রতি কৃতজ্ঞ—বাংলা তাহাদিগের রুটি-কাপড়-ডেরা যোগাইতেছে। বাঙ্গালীরও নাথুয়া-ভাসুয়াদের প্রতি বিপুল কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত—তাহারা বাংলার শ্রম-জীবন অব্যাহত রাখিয়াছে।

১৯৫১ সালের লোকগণনার পরিসংখ্যানানুযায়ী বাংলা দেশে বিহারীর মোট সংখ্যা ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৬ শত বাহান্ন (উত্তর প্রদেশে মাত্র দেড় লক্ষের কিছু উপর, আসামে ২ লক্ষ ৬ হাজার, বোম্বাই রাজ্যে প্রায় ৭ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ২২½ হাজার)। এখন ১৯৫৬ সালে বাংলা দেশে ঐ সংখ্যা আরও অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। বাংলাদেশে এই বিপুলসংখ্যক বিহারী শ্রমিকের আগমন বাংলার প্রয়োজনবশেই ঘটিয়াছে, বাঙালীর ইহাতে সমালোচনা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সাল হইতে আজ পর্যন্ত এই আট বৎসরে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। বাংলার বেকার-সমস্যা আজ অতি ভয়াবহ। সর্বপ্রকার কায়িক পরিশ্রমের কাজে বাঙ্গালী ব্রতী না হইলে এই সমস্যা কিছুতেই মিটিতে পারে না। বাঙ্গালীর ছেলেকে এখন মোট বহিতে হইবে, ঠেলাগাড়ী ঠেলিতে হইবে, দাঁড়ী - মাঝি - ধোপা - নাপিত-দারোয়ানের কাজ করিতে হইবে। বাঙ্গালী যুবকরা কিছু কিছু এই সব কাজে নামিয়াও পড়িয়াছে। নাথুয়া-ভসুয়ারা হইবে তাহাদের শিক্ষাগুরু। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, আনাচে-কানাচে টহল দিয়া নাথুয়া-ভসুয়ারা কিভাবে, কত প্রকারে অন্নসংস্থান করিতেছে তাহা বাঙ্গালীর ছেলেরা নিজের চোখে দেখিয়া নিজের কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লউক।

সংঘর্ষ আসিবে কি? সম্ভবতঃ না। 'বাঙ্গালী-বিহারী ভাই ভাই' শ্লোগানের অর্থ বোধ করি এই যে, বাঙ্গালী ১১ লক্ষ বিহারীকে বাংলা হইতে দূর করিয়া দিতে চায় না। তাহারা যেমন বাঙ্গালীর সহিত সম্পূর্ণ সখ্যভাবে বহুবৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে নিজেদের অন্নসংস্থান করিতেছে এখনও সেইরূপই করুক, ক্ষতি নাই। তবে বিহারী শ্রমিকের আদর্শে আজ বাঙ্গালী যদি নিজেদের মাতৃভূমিতে বাঁচিবার জন্ত জীবিকার কতকগুলি নূতন পন্থা গ্রহণ করে এবং তাহাতে যদি ১১ লক্ষ বিহারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ব্যাহত হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীকে দোষ দেওয়া যায় না। উহাকে প্রাদেশিকতা বলা চলে না।

শুনিতে পাওয়া যায়, আচার্য বিনোবা ভাবে বিহারে তাঁহার ভূদানযজ্ঞের বিপুল সফলতা লাভ করিয়াছেন; সহস্র সহস্র একর জমি ভূমিহীনদের জন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এই সহস্র সহস্র একর জমি যতশীঘ্র সম্ভব বিহারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে হয়তো অন্নসংস্থানের জন্ত তাহাদিগের আর দলে দলে বাংলায় আসিবার প্রয়োজন ততটা থাকিবে না।

বর্ষোৎসবে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অসীম প্রকৃতি জীবনপ্রবাহে গাহন করিছে নেমে,
পূজার কুসুম ভেসে চলে যায় বস্তুবিশ্ব হোতে ;
বর্ষবিদায়ে ঋতু-উৎসব করি আনন্দস্রোতে
তীর্থপথের প্রেমে।
ধেয়ানে মননে রসচেতনায় ব্যাপ্তিতে চিদাভাস,
শুভ শুচিতায় আয়াতপ্রভাতে আলোকিত হৃদাকাশ।

দেবতার মাঝে মানুষের ছায়া আবিষ্করণ করি
ভাবের বাউল গান গেয়ে চলে মহাজীবনের তরে।
আশার তোরণে বাজে আশাবরী,—বলাকারা ওড়ে চরে
পোহায়েছে বিভাবরী।
অশ্রুশোণিতে ইতিহাসে যেথা বিরচিত বেদনাতে
একটি আয়ুর ঝরে গেল পাতা কালের দৃষ্টিপাতে।

পূব-দিগন্তে নূতন সূর্য অভ্যুদয়ের লাগি
মহাভারতের দৈব যুগের শাশ্বত জ্যোতি জাগে ;
মহাজাগতিক রশ্মিধারায় সৃষ্টির পথে ডাকে
ভাগবত বৈরাগী।
মহামানবের চরণের ধ্বনি নব বরষের ক্ষণে—
কানে আসে যেন মর্ত্যলোকের প্রেমের উদ্বোধনে।

মায়ার কাননে মোহন খেলায় মুক্তপ্রাণের কূলে
কিরণলোচনা জোনাকীরা জ্বলে জোছনার ঢেউ মেখে।
সবুজ দিনের সোনালী বাসনা তারা যায় এঁকে এঁকে
বর্ণলিপিকা তুলে।
রূপের ভিতরে ভাবের বিহারে চিৎপ্রকর্ষ হোলো,
অন্তর হ'তে রহস্যময়ী অবগুণ্ঠন খোলো।

লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ*

স্বামী বিরজানন্দ

যে যুগে সকলেই প্রচার এবং উপদেশ-দানের জন্যে ব্যাকুল অথচ শুনবার লোক কেউ নেই, সে যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ আমাদের পক্ষে অতীব শিক্ষাপ্রদ; আমরা তা হতে অশেষ লাভবান হই। তিনি আধুনিক কালের আত্মপ্রচার-প্রথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলতেন—"এ যেন একজনের আয়োজন ক'রে একশজনকে খেতে ডাকা।" বলতেন, "ফুল ফুটলে ভ্রমরকে ডেকে আনতে হয় না, ফুলের সুগন্ধে তারা আপনা থেকেই আসে। ঠিক ঠিক আচার্য 'এস, তোমরা আমার কথা শোন' বলে কখনও লোকের পিছনে পিছনে দৌড়ান না। তারা নিজেরাই এসে তাঁকে ঘিরে ধরে এবং উপদেশ শুনতে চায়।" প্রকৃত লোকশিক্ষা একেই বলে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত্যহিক জীবনে এর পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। তিনি তো থাকতেন অনাড়ম্বরভাবে একটি কোণে পড়ে—সভ্যভব্য নন, 'অশিক্ষিত' একটি মানুষ, অতি দীনহীন—তথাপি শত শত নামজাদা জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতজন, ও সাধু সন্ত তাঁর চরণতলে শিক্ষা-গ্রহণের জন্য সমবেত হতেন। তাঁরা তাঁকে দেবতার সম্মান দিয়ে স্তুতি ও পূজা করলেও তাঁর শিশুর মত সরল প্রকৃতিতে কোন বিকার আসত না। তিনি নিজে কখনও গুরু সাজেন নি. তবুও তিনি ছিলেন একজন মহোত্তম আচার্য। লোকে যে তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে আসে, তিনি সে বিষয়ে আদৌ সচেতন ছিলেন না। যদি কেউ কখনও উপদেশের জন্য পীড়াপীড়ি করত, তিনি শিশুর মতই বলতেন, "আমি কিছু জানি নি বাপু। আমি জানি আমার মা আছেন, আর আমি তাঁর সন্তান।" কাউকে কখনও কিছু বলতে হলে বলতেন, "মা এই বললেন।" যদি কেউ কখনও তাঁর সামনে তাঁকে আচার্য বা গুরু বলত, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন ও তাকে তিরস্কার করে বলতেন "কে কার গুরু? ভগবানই সবার গুরু।" আর তাঁর কাছে ধনী ও দরিদ্র, প্রতাপশালী বা খ্যাতিমান ও সামান্য বা অখ্যাত লোকের কোনও ভেদ ছিল না।

তিনি দেখতেন না কে দ্বৈতবাদী, কে অদ্বৈত-বাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এমনকি শূন্যবাদী, কে বিষ্ণুর উপাসক আর কে রাম কালী বা যীশুখ্রীষ্টের ভজনা করে; হৃদয়ের আন্তরিকতা কত গভীর তাই দিয়েই তিনি বিচার করতেন। কেউ ঠিক ঠিক অকপট কিনা এইটুকুই তিনি যাচাই করতেন তা সে বিশ্বাসীই হোক আর ঘোর অবিশ্বাসীই হোক, সমাজ তাকে ঘৃণা করুক বা মহাপাপী বলেই আখ্যা দিক। এমনকি পতিতা নারী এবং সুরাসক্ত মাতালকেও তিনি নিন্দা বা ঘৃণা করেন নি। তাদের তিনি কখনও বলতেন না, "বদ অভ্যাস এক্ষুণি ছেড়ে দাও", কারণ তিনি জানতেন সে নির্দেশ তদ্দণ্ডে পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তাদের মাঝে মাঝে ওখানে আসতে বলতেন যাতে তারা সাধুসঙ্গের প্রভাবে সময়ে দোষমুক্ত হতে সক্ষম হয়। কে কি বলল তা তিনি একটুও গ্রাহ্য করতেন না। সোজা ও স্পষ্ট সত্য তিনি বলতেন। প্রতিষ্ঠাবান অতি প্রতিপত্তিশালী লোককেও তাঁর দোষ দেখিয়ে দিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন না, সেই ব্যক্তি পছন্দ করুন আর নাই করুন—অবশ্য তার কারণ এই যে তাঁর কোন

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ লোকান্তরিত পূজ্যপাদ লেখকের একটি মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধ্যাপিকা শ্রীসান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্‌-এ কর্তৃক অনূদিত।

স্বার্থাভিসন্ধি থাকত না। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে নিজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুঝছে, সে কখনও তার দোষ দেখিয়ে দিলে অসন্তুষ্ট হয় না। অহংকার ও গর্বে যারা বিভ্রান্ত তারাই একমাত্র বিরক্ত হয়। যে একটিমাত্র জিনিসকে শ্রীরামকৃষ্ণ সবচেয়ে প্রাধান্য দিতেন তা হচ্ছে আন্তরিকতা। মনমুখ এক করা—এই ছিল তাঁর মতে শিষ্য হওয়ার বিশিষ্টতম গুণ।

প্রকৃত আচার্যকে শিক্ষাদাতার মনোভাব হতে মুক্ত হতে হবে। এই মনোভাবের দরুণ যে পরিমাণ অভিমান ও অহঙ্কার এসে পড়ে তা সর্বনাশা। আর একটি বিষয়ের উপর তিনি খুবই জোর দিতেন—শিক্ষা দিতে হলে আগে 'চাপরাশ' চাই—ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ লাভ কর। আচার্যের হাতে এই ভগবৎআদেশের পূর্ণ পরিচয়পত্র না থাকলে তাঁর শুধু গলাবাজিই সার হবে, তার দ্বারা কোনও স্থায়ী ফল ফলবে না। তিনি বলতেন, একটি মাত্র পুলিশের লোক একটি দাঙ্গা থামিয়ে দিতে পারে। কেন? না তার সরকারের চাপরাশ আছে। তেমনি আচার্যকে ঈশ্বরের চাপরাশ পেতে হবে, তা যদি থাকে, তাহলে লোকে তাঁর কথা না শুনে পারবে না। তাঁর কখনও ভাব বা যুক্তির অভাব হয় না; তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অফুরন্ত,—কারণ অনন্ত জ্ঞানের উৎস হতে তিনি প্রেরণা লাভ করছেন।

যারা তাঁর কাছে আসত তাদের সঙ্গে তাঁর ছিল অতি মধুর সম্পর্ক। প্রত্যেকের প্রতি তাঁর ব্যাপক বিপুল ভালবাসা সত্যই ছিল স্বর্গীয় বস্তু। তাঁর কাছে সবকিছুই ছিল প্রাণবন্ত ও চৈতন্যময়। অনেক সময় তিনি ফুলটি পর্যন্ত তুলতে পারতেন না। কেউ ঘাসের উপর পা ফেলে মাড়িয়ে যাচ্ছে দেখলে কষ্টবোধ করতেন। তাঁর সমগ্র জীবনটি ছিল মানুষের হিতের জন্যে একটি মহান যজ্ঞস্বরূপ। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যখন তিনি ভয়াবহ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, ডাক্তাররা কথা বলতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন, তখনও কেউ উপদেশ বা শান্তিলাভের জন্যে তাঁর কাছে এলে তিনি ডাক্তারদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, রোগ বৃদ্ধি পাবে সুনিশ্চিত জেনেও তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। ঐরূপ করতে নিষেধ করে অনুনয় জানালে তিনি বলতেন "কি! এই দেহটার কথা ভাবতে হবে শেষকালে। ওরে আমি মহানন্দে শতবার জন্মাব এবং এইরূপ সাবু খেয়ে দিন কাটাব—যদি এদের একজনকেও তার দ্বারা সংসার যন্ত্রণা হতে রক্ষা করতে পারি।" তিনি ছিলেন মানবকল্যাণের জন্য বলিপ্রদত্ত—একটি জীবের পরিত্রাণের জন্যে শত শত বার মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। তাঁর হৃদয় অনুক্ষণ দীনদরিদ্র, অসহায়, পতিত নির্যাতিত দুঃখী-তাপীর জন্যে কাঁদত।

এদিকে দীনতার প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। প্রতিদিন যারা তাঁর কাছে আসত তাদেরও তিনি এই দীনতাই শিক্ষা দিতেন। আগেই তাঁর নমস্কার না পেয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পেরেছেন, একথা কেউ গর্ব করে বলতে পারবেন না। ধর্মজীবনের বাহ্যানুষ্ঠানও তিনি বড় মেনে চলতেন না। কিন্তু সর্বপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড—যথা, জাতির আচার, মূর্তিপূজা প্রভৃতি একেবারে বিসর্জন দেবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যতক্ষণ না ভিতর থেকে ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠছে ততক্ষণ প্রবর্তকের পক্ষে এগুলি সহায়ক। তিনি বলতেন, আগুন ধরে উঠতে না উঠতে যদি তার উপর এক বোঝা খুব শুকনো কাঠও চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আগুন নিবে যাবে। কিন্তু যখন খুব দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তখন যদি তাতে কলাগাছও—যা একেবারে জলে ভর্তি—দেওয়া যায় তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নারকেলের বেল্লো যেমন আপনা থেকেই শুকিয়ে গেলে খসে পড়ে, তেমনি সময় হলেই এই সকল বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান আপনা থেকেই খসে পড়ে। সকলের সঙ্গে নির্বিচারে বসে পানাহার করাটাই

বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিদর্শন নয়, যদি সেই সঙ্গে মনের মধ্যে প্রবলভাবে রয়ে গেল ঘৃণা, অভিমান, অহঙ্কার ও ঈর্ষা! তিনি নিজে উপবীত পরে থাকতে পারতেন না, কারণ যতবারই পরতেন, ততবারই কোথায় পড়ে হারিয়ে যেত। তিনি পিতৃপুরুষের ও দেবতাদের উদ্দেশে তর্পণের জন্য যুক্তকরে জল নিতে পারতেন না। আঙুল বেঁকে অসাড় হয়ে যেত। যাঁর পক্ষে সকল কর্ম আপনা থেকেই ত্যাগ হয়েছে, যিনি সর্বপ্রকার কর্ম ও বন্ধনের পারে চলে গেছেন এগুলি তাঁরই লক্ষণ।

যে সময়ে পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের বিপুল বন্যা তার সর্বধ্বংসী জলস্রোতে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যখন প্রতীচ্য ভাবধারার প্রবল আকর্ষণ দেশের তরুণ মনকে আচ্ছন্ন করে হিন্দুধর্মের ভিতর কোন সত্য দেখতে দেয়নি, যখন তারা পূর্বপুরুষদের ধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে বিদেশ থেকে ধার-করে-আনা চিন্তাধারায় আস্থা স্থাপন করছিল, তখন এমন একজন ব্যক্তি জন্মালেন যিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রতিপন্ন করে দিয়ে গেলেন যে প্রত্যেক ধর্মেই কেবল আংশিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য নিহিত আছে; যে প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধির জন্যে ব্যাকুল, কেবল "পাতা গোনা" যার উদ্দেশ্যে নয়, সেই এই সত্যে উপনীত হবে; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতায় বলেছিলেন—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥" —তখন তিনি ইতিহাস দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রমাণিত বিশ্বজগতে শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মটিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। এই আশ্চর্য মহাশক্তির কার্য যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় তা নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার প্রজ্বলন্ত প্রকাশ দেখা যায়। ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে জাতির প্রাণকেন্দ্র, এবং এই ধর্মই সেদিন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল সেই মহাশক্তি।

এ কি প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তি! কে কল্পনা করতে পেরেছিল অখ্যাত পল্লীপ্রান্তের দীনদরিদ্র অশিক্ষিত একটি মানুষ সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনগতির মোড় ফিরিয়ে দেবেন। শক্তির কি আশ্চর্য প্রকাশ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পন্থায়—সম্পূর্ণ অচিন্ত্য কৌশলের মাধ্যমে! আমরা স্বভাবতই নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের ধারণা করতে পারি না। আমাদের সমুখে দরকার জ্বলন্ত আধ্যাত্মিকতার আদর্শ, ধর্মের মূর্ত দৃষ্টান্ত যা দেখে আমরা নিজেরা শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করতে পারি এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে পথ চলতে পারি। এইরূপই একজন আমাদের সম্মুখে। তাঁকে বাস্তবিকই পরমদেবতার প্রকাশ মনে করা যেতে পারে। কিন্তু অসংখ্য দেবতাদের আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই তিনি আবির্ভূত হন নি; তিনি আসেন নি মন্দিরে আবদ্ধ হয়ে প্রতিকৃতির মাধ্যমে পত্রপুষ্প সহযোগে ও জাঁকজমক সহকারে পূজিত হতে। তাঁর মত একই প্রকার পরিস্থিতিতে যারা পড়বে তারা তাঁকে অনুসরণ করবে,—তাঁর জীবন হতে নির্দেশ গ্রহণ করবে—এই জন্যই তাঁর আবির্ভাব। তিনি যেমন বলতেন, তিনি নিজে ষোল টাং করেছেন, কেউ যদি এক টাংও করতে পারে তাহলেই যথেষ্ট।

* * *

তাঁর একটি সামান্য কথা বা আচরণও যদি গভীরভাবে অনুধ্যান করা যায় তো তা' থেকে রাশিরাশি শিক্ষা পাওয়া যাবে। তাঁর গতি সাধারণ কাজগুলি, যথা, খাওয়া, চলা ফেরা, কথা বলা—এ সকলের মধ্যে একটা বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যেত যা এ জগতের নয়, যা মধুর স্নিগ্ধ ত্যাগ ও দিব্য প্রেম মাখা দুর্লভ এক বস্তু—অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্যপ্রভা—যা আমাদের মনকে এমন এক রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে যে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। যে সকল

অভিযাত্রী পূর্ণতার চরম লক্ষ্যে পৌছুবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন একটি অতি নির্ভরযোগ্য পথ-বিবরণী। জীবনের সর্বতোব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে শরণাগতের জন্যে যে আলোক তিনি নিয়ে এসেছেন সেই জ্যোতিময় পথে যেন আমরা চলতে পারি, দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই প্রার্থনা।

মুণ্ডক উপনিষদ্

(ফাল্গুন-সংখ্যার পর)

[দ্বিতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড]

'বনফুল'

সেই সত্য এই—

প্রজ্বলিত অগ্নি হ'তে অগ্নিরই মতন
শত শত স্ফুলিঙ্গের জন্ম যথা হয়
হে সৌম্য, অক্ষর হ'তে সেইরূপ বহু জীব
জন্ম লভি' তাহাতেই হয় পুন লয় ॥ ১ ॥

স্বয়ম্প্রভ যে পুরুষ অন্তরে বাহিরে বর্তমান
যাহা শুভ্র মূর্তিহীন জন্মহীন, অমনা অপ্রাণ
অক্ষর হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর জেন হে ধীমান ॥ ২ ॥

এ পুরুষ হ'তে জন্মে প্রাণ-মন ইন্দ্রিয় সকল
জন্মে তেজ মরুৎ ব্যোম নিখিল-ধারিণী ক্ষিতি, জল ॥ ৩ ॥

শির যাঁর মহাকাশ, চন্দ্র সূর্য যুগল নয়ান
দশ দিশা কর্ণ যাঁর, বাক্য বেদ, বায়ু যাঁর প্রাণ,
হৃদয় নিখিল বিশ্ব, ধরা জন্মে যাঁর পদ হ'তে
সর্বভূত অন্তরাত্মা তিনিই জগতে ॥ ৪ ॥

সে পুরুষ হ'তে জন্মে মহাকাল-রূপী অগ্নি
যে অগ্নির ইন্ধন তপন ;
সোম হ'তে মেঘ হয় ; বৃষ্টি হ'তে জন্মে ওষধিরা
ওষধি হইতে রেতঃ যাহা মানবেরা
নারীমধ্যে করেন সিঞ্চন।
পরমপুরুষ হ'তে এইরূপে বহু প্রজা হয় উৎপাদন ॥ ৫ ॥

ঋক্ সাম যজুর্বেদ দীক্ষা যজ্ঞ দক্ষিণা যজমান
সকলেরই উৎস তিনি, তাঁহা হ'তে জন্মে সম্বৎসর
জন্মে সেই লোক-লোকোত্তর
সোম যা পবিত্র করে, সূর্য যেথা হয় দীপ্যমান ॥ ৬ ॥

বহু দেব তাঁহা হ'তে উৎপন্ন হন
বহু সাধ্য, বহু নর, পশুপক্ষীগণ
প্রাণ-অপান ব্রীহি যব তপঃ শ্রদ্ধা বিধি
সত্য আর ব্রহ্মচর্য তাঁহারই সৃজন ॥ ৭

তাঁহা হ'তে সমুদ্ভূত সপ্ত-প্রাণ, সপ্ত-শিখা, সপ্ত হোম, সপ্ত ইন্ধন,
আর সেই সপ্তলোক যেথা প্রাণ করে সঞ্চরণ
সপ্তক্রমে গুহাশয়ে প্রতি জীবে যাহার স্থাপন ॥ ৮ ॥

তাঁহা হ'তে উৎপন্ন সমুদ্র পর্বত
তাঁহা হ'তে বহুরূপে নদী বহমান
ওষধিরা জন্মে সেথা, তিনি সর্ব রসের নিদান
যে রসেতে অন্তরাত্মা পঞ্চভূতময় দেহে করে অবস্থান ॥ ৯ ॥

সেই পুরুষই এই বিশ্ব, তপঃ ব্রহ্ম, পরম-অমৃত
সত্য জেন এই
হৃদয়-কন্দর-শায়ী যে পেয়েছে সন্ধান তাহার
হে সৌম্য, সে ছিন্ন করে গ্রন্থি অবিদ্যার
ইহ জীবনেই ॥ ১০ ॥

ক্রমশঃ

ধর্ম কোথায় সবল এবং দুর্বল ?

স্বামী প্রভবানন্দ

আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি তাহা যে একটি দারুণ সংকটময় কাল তাহা অস্বীকার করা যায় না। সর্বকালেই লোকের বিপদ থাকে সত্য, কিন্তু একটি জীবিতকালের মধ্যে দুটি সর্বনাশা যুদ্ধ ও তৃতীয় আর একটি প্রস্তুতি এক অদৃষ্টপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা নয় কি ? তথাপি শান্তি আমাদের সকলেরই কাম্য। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতি শান্তি ও সামঞ্জস্য চায়। কিন্তু উহার উৎস কোথায় তাহা ভুলিয়া যাওয়াতেই বিপদ হইয়াছে। একটা কিছুর যেন অভাব পড়িতেছে আর উহারই ফলে আমাদের সভ্যতা সংকটাপন্ন।

তাই বলিয়া ইহা যেন আমরা আদৌ মনে না

করি যে বর্তমান সভ্যতায় শুভ বা বৃহৎ বলিয়া কিছু নাই, বিপুল মঙ্গল ও মহান্ কিছু আছেই। বৈজ্ঞানিক মনোভাব, যুক্তিবাদ ও ঐহিক মানবতার প্রভাবেই আজকাল সবকিছু গড়িয়া উঠিতেছে এবং মানুষের স্থূল বাস্তব সত্তাই জাতি ও ব্যক্তিগুলির মূল লক্ষ্য হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষ যে এখন নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সমবায় বলিয়া মনে করে, দৈহিক বাসনা কামনার তৃপ্তি ও মানসিক শক্তির বিকাশ-সাধনই যে তাহার প্রধান কাম্য, তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর বা আত্মা, তাহার নিকট একেবারে অপরিচিত বস্তু, যেন তাহার নিজস্ব বলিতে যাহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বাহিরের কিছু। অতএব সে যদি ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনাও করে উহা প্রধানতঃ তাহার স্থূল বাস্তব সত্তার পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যেই।

প্রশ্ন হইতে পারে সভ্যতার রূপায়ণে পাশ্চাত্ত্যের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির কি কোন অবদান নাই? প্রশ্নটি বিচার করা যাক। জুদীয় এবং খ্রীষ্টীয়—উভয় ধর্মেরই প্রধান অবদান হইল মানুষের যুক্তিতর্ক যে পর্যাপ্ত নয় এইটির উপর জোর দেওয়া ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রত্যাদেশ-লব্ধ জ্ঞানের প্রাধান্য-খ্যাপন। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায়, বিশেষতঃ মধ্যযুগে এই ধর্মদ্বয় খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রত্যাদেশ-লব্ধ জ্ঞানের উপরই উভয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আর এই প্রত্যাদেশকে উহারা বিশ্বাস ও আনুগত্যের সহিত গ্রহণ করিতে বলে, কেননা, সত্যসমূহের উপলব্ধি বা ধারণার পক্ষে একমাত্র মানবীয় যুক্তিই পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্তি ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের উপর পাশ্চাত্ত্যে সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মানুষ বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন। মাত্র বিশ্বাসের বলেই প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানকে স্বীকার করিবার আগ্রহ তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। উহার ফলে প্রতিক্রিয়া ঘটিতে বাধ্য। শুধু বিশ্বাস ও ব্যক্তিবিশেষের আনুগত্যের শক্তিতে নির্ভর করিয়া কোন ধর্মকে স্বীকার করিলে যে ফাঁকি থাকিয়া যায় তাহা মানবীয় যুক্তি অতি শীঘ্রই আবিষ্কার করিয়া ফেলে। ধর্মের জন্য ধর্মানুশীলনের চেষ্টা না করিয়া কেবল গতানুগতিক বিশ্বাসে উহা আচরণ করিলে মানুষ একটি সংকীর্ণচিত্ত ধর্মান্ধ ও গোঁড়া 'মতুয়া'তে পরিণত হয়। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রভাব সত্ত্বেও কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ উপদেশ ও রীতিনীতির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াই ঐগুলিকে অন্ধের মত স্বীকার করে এমন বহু লোক আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় উহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

রিনেসান্সের* যুগে অধিকাংশ লোকের মনে জিজ্ঞাসা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় যুক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সময় আসিল। ফলে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে দেখা দিল বিপুল উন্নতি। স্থূল বাস্তবসত্তায় পরিতৃপ্তিলাভের সামর্থ্য কিভাবে বাড়ানো যায় সেদিকে যথার্থই মানুষ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ধর্মকে লোকেরা এখন আর গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করে না; বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত পাশ্চাত্ত্য ধর্ম কার্যতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার স্থলে প্রবর্তিত ও গৃহীত হইয়াছে এক সামাজিক শাস্ত্র। ঐ সামাজিক শাস্ত্রানুযায়ী চিন্তাশীল লোকেরা যদিও নৈতিক জীবন, সাধু উদ্দেশ্য এবং পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সেবায় বিশ্বাসী, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কার্যক্ষেত্রে উহা অচল। আমরা মাত্র বাহ্যিক শিষ্টাচারেই নীতিশীল। অথচ নৈতিক জীবনের আসল মর্মই হইল অন্তঃসংযম। ধর্মের ভাব অগ্রাহ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মূল নৈতিক নীতিগুলিও অবহেলিত হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, মনোবিদ্যার নামে এক নূতন 'আপ্ত শাস্ত্র' প্রচারিত হইতেছে।

* খ্রীঃ ১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে সাহিত্য ও শিল্পের পুনরভ্যুদয়।

সংযমের পরিবর্তে অভিব্যক্তিকেই অধিকতর মর্যাদা দেওয়া হইতেছে। তথাপি যে অতিশয় চরিত্রভ্রষ্ট সেও অন্তরের অন্তরে অন্তঃশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মসংযমের মঙ্গল, মহত্ত্ব এবং সত্যকে স্বতই স্বীকার করে।

ফরাসী দার্শনিক আর্নে রেনাঁ (Earnest Renan) ক্যাথলিক-ধর্ম ত্যাগ করিবার সময় অতি দুঃখে মন্তব্য করেন যে, যে 'যাদু-চক্র' জীবনকে বাঁচিবার যোগ্য করিয়াছিল তাহা আর নাই বলিয়া তাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যুক্তির সাহায্যে যাহা টিকিয়া থাকিতে অসমর্থ, সেই প্রত্যাদেশের শক্তিতে বিশ্বাসই ছিল তাঁহার এই 'যাদু-চক্র'। ধর্মকে যদি যথাযথ না বুঝা যায় তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই ইহা হইতে পারে। ধরুন একজন অতি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান, বিশ্বাসের বলে তাঁহাকে সব কিছু স্বীকার করিতে দেখিতেছি। একটু খটকা উপস্থিত হইল, যুক্তির দিক দিয়া সন্দেহ আসিতে লাগিল। কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ ও সিদ্ধান্ত আদৌ তিনি কেন স্বীকার করিয়াছিলেন বা এইগুলিকে কিভাবেই বা বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যে কোন প্রগতিশীল ব্যক্তি যদি বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া নির্বিচারে ধর্মকে স্বীকার করিতে যান এবং মনে করেন ধর্ম শুধু মৃত্যুর পরেই অনুভবযোগ্য বস্তু তাহা হইলে তাঁহারও এই দশাই হইয়া থাকে। ধর্মকে যদি সত্য ও বাস্তব হইতে হয় তাহা হইলে উহা যেন আমাদের অন্তশ্চেতনায় রূপান্তর আনিতে সক্ষম হয় এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সুস্পষ্ট কিছু দিতে পারে।

এখন ধর্ম সম্বন্ধে বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং কিভাবে জুদীয়, খ্রীষ্টীয় বা জগতের অন্যান্য ধর্ম-গুলির মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া উহাদিগকে যেন 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত' করা যায় তাহা আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃ, অপর সকল ধর্মবিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়া কেবল একটিমাত্র বিশ্বব্যাপী ধর্মমত থাকুক বেদান্ত ইহা বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে উহা চেষ্টা করে প্রত্যেক ধর্মের মূল সত্যের অনুসন্ধান এবং অজ্ঞতা ও বিকৃতি-জনিত প্রত্যেক ধর্মের দুর্বলতাসমূহকে আবিষ্কার করিতে।

ধর্ম মূলতঃ অতিপ্রাকৃতিক এবং তুরীয়। অন্য সকল ধর্মের ন্যায় বেদান্তেরও ভিত্তি আপ্তোপলব্ধি। ঈশ্বর বা আত্মার সত্য ইন্দ্রিয়লভ্য নহে। চর্মচক্ষু দিয়া কেহই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। অপরের চক্ষুর মাধ্যমে যেমন সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না সেইরূপ কেবল বিশ্বাস ও পৌরো-হিত্যের শাসন দ্বারা আপ্তোলব্ধির মর্মবোধ হয় না। বেদান্ত বলে অতিপ্রাকৃতজ্ঞান আসে একটি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দ্বারা। শুধু 'বিশ্বাস' করিয়া কেহ ধার্মিক হয় না, ঐশ্বরিক জ্ঞান অনুভব করিলেই ধার্মিক হওয়া যায়। চাই আমাদের সমগ্র জীবনের রূপান্তর। যিনি তুরীয় চেতনা লাভ করিয়াছেন কেবল তাঁহারই পক্ষে ঠিক ঠিক স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা সম্ভব। উক্ত জ্ঞান লাভ হইলেই তবে প্রকৃত সাম্য উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ যে অবস্থাকে আমরা স্বাভাবিক জীবন বলিয়া মনে করি সেই অবস্থায় কিছু না কিছু অস্বাভাবিকতা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বিড়াল হয়ত ভাবিতে পারে যে তাহার জীবনই স্বাভাবিক চেতন জীবন। তাহা হইলে, মানুষ ও তাহার পোষা বিড়ালের মধ্যে পার্থক্য রহিল কি? মানবচেতনার অর্থ কি? উহা হইল চেতনার প্রসারণ। অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষ কিছু বেশী বই কি। সে হইল দৈবীসত্তাসম্পন্ন আর স্বকীয় এই দেবত্বের অনুভূতিই হইল ধর্ম। চেতনার বিস্তার যাঁহার মধ্যে সর্বোচ্চ তাঁহাকেই আমরা নর-দেব আখ্যা দিয়া থাকি।

সদাচারী বা নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত কেন? যদি পূর্ণতার আদর্শ স্বীকৃত না হয়, ঈশ্বরের রাজ্য যে অন্তরে এবং মৃত্যুর পর নহে আর এখনই ও

এখানেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হইবে যদি ইহা বিশ্বাস না করি তবে আমাদের কাছে জীবন যে নিশ্চিতই অর্থহীন হইয়া পড়ে। নৈতিকতা ব্যতীত, নৈতিক জীবনের একমাত্র ভিত্তি সংযম ব্যতীত, চেতনার বিস্তার সম্ভব নহে। আচার্য রামানুজ ভাল ও মন্দকে এইভাবে সংজ্ঞিত করিয়াছেন: যাহা আমাদিগকে সংকুচিত করে তাহা মন্দ এবং যাহাতে বিস্তার হয় তাহা ভাল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন উহাই মন্দ যাহা আত্মাকে, অন্তরের ঐশ্বরিক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং যাহাতে আত্মার বিকাশ হয় তাহাই ভাল।

সংযমাভ্যাস সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে: যতক্ষণ না আমার দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইতেছে ততক্ষণ আমি খুশীমত চলিব না কেন? উত্তর হইল—সব কিছুই সংক্রামক। ব্যাধি সংক্রামক; স্বাস্থ্যও তদ্রূপ। অতএব যাহার মন ব্যাধিগ্রস্ত সে অপরের ক্ষতি করিতে বাধ্য, আবার যাহার মন সুস্থ সে নিজেকে ও সেই সঙ্গে অপরকেও যে সাহায্য করিবে ইহা অপরিহার্য। ইহাই নিয়ম। কিন্তু সম্মুখে ধর্মের ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ থাকিলে তবেই সংযত হইবার চেষ্টা আসে এবং ঐ নিয়মটি বোধগম্য হয়। স্বর্গসুখের আশায় বা অনন্ত নরক-যন্ত্রণার ভয়ে কেবল জোর করিয়া চাপানো নৈতিক নীতির স্বীকৃতি যুক্তির আলোকে দাঁড়াইতে পারে না।

ধর্মের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ বা মানবিকতার যে বিলোপ করিতে হইবে তাহা নহে। পক্ষান্তরে, ইহারা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছিবার মহা সহায়ক। মানসিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে থাকিবে এই ভাব বহু চিন্তাশীল লোকের মনে প্রবল। ইহা সত্য নয়। কিন্তু তাই বলিয়া এমনও নয় যে আমরা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করিব না বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যুক্তিবাদের শ্বাসরোধ করিব। বিজ্ঞান ও যুক্তি ধর্মবিরোধী নহে। অতিপ্রাকৃত জ্ঞান যুক্তিকে অতিক্রম করে কিন্তু উহাকে অস্বীকার করে না। যুক্তিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়করূপে সর্বদাই প্রয়োগ করিতে হইবে। বেদান্তমতে, যুক্তি ঈশ্বরানুভূতির অন্যতম পন্থা।

যুক্তির দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে আপ্তোপলব্ধিরূপে স্বীকার করা যায় না। একটি সত্য অপর সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করিতেছে যে, এই বিশ্বজগৎ অনাদি ও অন্তহীন। পাশ্চাত্য জগতে বিবর্তন শব্দটি প্রচলিত হইবার বহু পূর্বেই ভারতে ক্রম-বিকাশবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর-বিরোধী নহে। যথার্থ প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞান যেমন বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করে না, তেমনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাও আপ্তোপলব্ধিকে নস্যাৎ করিতে পারে না।

এই সত্যটি যখন আমরা বুঝিতে পারি তখন আমরা দেখিতে পাই যে, গতানুগতিক কতকগুলি বিশ্বাস বা মতবাদ দ্বারা জগৎ রক্ষা পাইতে পারে না, পরন্তু তত্ত্বোপলব্ধি ও প্রজ্ঞার সামর্থ্যেই উহা সম্ভবপর। বর্তমান বিশৃঙ্খলার মধ্যে চারিদিক হইতে "ধর্মের দিকে ফিরিয়া চল" এই রোল উঠিতে শুনিতেছি। কিন্তু সংসারের প্রতিটি ব্যক্তি খ্রীষ্টান, বা হিন্দু অথবা বৌদ্ধ হইলেই কি জগৎ রক্ষা পাইবে? আমরা জানি যে তাহা হইবে না। অজ্ঞতা থাকিয়াই যাইবে। তাহা হইলে কোন্ শক্তিতে ব্যক্তি ও মানবগোষ্ঠী রক্ষা পাইতে পারে? "তোমরা সত্যকে জানো এবং সত্যই তোমাদিগকে মুক্ত করিবে।" ইহাই জ্ঞান—সত্যের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি—চেতনার বিস্তার। ইহারই নাম ধর্ম এবং ইহাকেই আধ্যাত্মিক জীবনরূপে জানিলে পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। এই জ্ঞানের আলোকে প্রত্যেক ধর্মই সত্যধর্ম এবং একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথরূপে প্রতীত হইবে।

কাহাকেও হিন্দু বা ক্যাথলিক বা প্রটেষ্ট্যাণ্ট হইতেই হইবে বেদান্তের ইহা আদর্শ নয়। আদর্শ এই যে প্রত্যেককে হইতে হইবে ঈশ্বরমুখী মানুষ।

ইহার অর্থ এই নয় যে, বাহিরের স্থূল ধরা-ছোঁয়ার মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করিতে হইবে বা সর্বপ্রকার দৈহিক বাসনা এবং অধিকতর মানসিক বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের প্ররোচনাকে অস্বীকার করিতে হইবে। বরং সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ মানুষকে যতখানি জানা যায় উহাই তাহার সবটা নয়। নিজেকে কেবল দেহমাত্র-সার জানিলেই কি কেহ যথার্থ সুখী হইতে পারে? এরূপ ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চেতনা সঙ্কুচিত হইবে এবং তাহার সুখ ও উপভোগের পরিধিও কমিয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তির নিকট তখন জীবনের অর্থ থাকিবে অতি সামান্য।

আমাদের বিচারশক্তি তো ব্যবহারের জন্যই। যদি আমরা ঠিক ঠিক বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে একটা অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে তাহা আবিষ্কার করিবই। আমরা জানি, মানসিক ও দৈহিক সত্তা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি একটি পৃথক ব্যক্তিত্বের বোধ আমাদের থাকিয়া যায়। এই ব্যক্তিত্ববোধ হইল অন্তর্নিহিত এক অপরিবর্তনীয় সত্তারই অবিচ্ছিন্ন অংশ। ইহাই আত্মা, ঈশ্বর বা যীশুখ্রীষ্ট কথিত 'স্বর্গরাজ্য'।

বর্তমানে সেই পরমসত্তার সম্বন্ধে আমাদের কোন হুঁস নাই। আমাদের জাগিতে হইবে; নিজেদের ও বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে যে ভাগবত-চেতনা রহিয়াছে সেইদিকে অবহিত হইতে হইবে। এই সত্যের অনুভূতি লাভ করাই মানবজন্ম ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের বাঞ্ছিত শান্তি ও স্বাধীনতা কেবল ইহাতেই মিলিবে।

যতদিন মানুষ নিজেকে দৈহিক বা মানসিক জীব বলিয়া জানিবে ততদিন মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিয়াই যাইবে। এই পার্থক্য থাকিলে তথা-কথিত স্বার্থবুদ্ধি সংরক্ষণ করিবার প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হইবেই। এই দৃষ্টিতে কি মনে হয় না যে মানুষের জীবন প্রাণহীন? বর্তমান সভ্যতা কি ঈশ্বরহীন সভ্যতা নয়? এই অবস্থায় কি করিয়া আশা করা যায় যে জাতিসকল পরস্পর শান্তিতে বাস করিবে? ঐক্য আছে একমাত্র আত্মায়, ঈশ্বরে। মানুষ দেহ-মন বিশিষ্ট আত্মা। সাংসারিক জীবনের প্রতিটি লক্ষ্য, প্রতিটি প্রচেষ্টাকে এই সত্য উপলব্ধির উপায়রূপে নিয়োগ করিতে হইবে। ব্যক্তিকে লইয়া জাতি গঠিত এবং শুধু ব্যক্তি হিসাবে আমাদের যদি এই আদর্শে লক্ষ্য থাকে তবেই "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে" যীশুখ্রীষ্টের এই আদর্শ শিক্ষা অনুযায়ী যথাযথ জীবন-যাপন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব।

মা শুচঃ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারে ঐ শুনি তব কণ্ঠস্বর:
'ভয় নাই, এ বিশ্বের বাহির ভিতর
পূর্ণ ক'রে আছি আমি আত্মা সুমহান্।
আমারে আশ্রয় করো; পাবে পরিত্রাণ
দুঃখ হ'তে, শোক হ'তে, দুর্বলতা হ'তে।'
ঈশ্বর, বিশ্বাস দাও। করুণার স্রোতে
দিগন্তে ভাসায়ে দাও সমস্ত সংশয়।

অন্ধকারে কাঁদি আমি বদ্ধ জলাশয়
ব্যাধির বীজাণুভরা, কুৎসিত, পঙ্কিল।
অদূরে তোমার সিন্ধু নির্মল উর্মিল!
করুণা করিয়া যদি ঐ সিন্ধুজল
আনো মোর মর্মমাঝে—শ্বেত শতদল
বিকশি উঠিবে বুকে, পাবো নব প্রাণ;
ধ্বনিবে সীমার বক্ষে অনন্তের গান।

বৃন্দাবনে সাধুসঙ্গ

শ্রীমতী লীলাবতী সরকার

সেবার গরমের ছুটিতে আমার স্বামী ডক্টর ৺মহেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত বৃন্দাবনে উপনীত হয়ে প্রথমে মোহান্ত সন্তদাস বাবাজীর সাক্ষাৎলাভ করা গেল। সন্তদাস বাবাজীর পূর্বাশ্রম শ্রীহট্টে। পূর্বাশ্রমে তিনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল তারাকিশোর রায়চৌধুরী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার পিতা ৺যদুনাথ মজুমদারের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। আমাদের দেখে বাবাজী খুব আনন্দিত হলেন। পূর্বাশ্রমে তিনি বহু অর্থ দান-ধ্যান করে পদব্রজে ব্রজধামে এসে উপনীত হয়েছিলেন। সন্তদাস বাবাজী শ্রীমৎ কাঠিয়াবাবার শিষ্য।

আমরা আশ্রমপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে দেখি, বাবাজী বাসন মাজছেন। এ দৃশ্য দেখে আমার হৃদয় ব্যথায় আকুল হয়ে উঠল। আমি না বলে পারলাম না, "কাকাবাবু, একি, সন্ন্যাস নিয়ে শেষে আপনি বাসন মাজতে বসেছেন?" জবাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ মা, আমি বাসন মাজছি। ২৪ ঘণ্টা সময় দিবারাত্র—এই দীর্ঘ সময়কে কি করে অতিবাহিত করি মা! কয়েক ঘণ্টার বেশী তো জপ করতে পারি না, এক ঘণ্টার বেশী ধ্যানে মন বসে না, দু'ঘণ্টার বেশী পড়া নিয়ে থাকতে পারি না, আরও বাকী থাকে উনিশ ঘণ্টা। এই উনিশ ঘণ্টা আমি কি করে কাটাই, মা? তাই এই ঠাকুরের বাসনমাজা কাজটা আমি গ্রহণ করেছি। তোমরা বস মা। আমি বাসন মেজে আসি, তারপর তোমাদের ঠাকুরঘর দেখাবো। আর হ্যাঁ মহেন্দ্র, তোমরা আজ এখানে প্রসাদ পাবে। যত দিন ব্রজধামে আছ যখন খুশী এখানে প্রসাদ খেয়ে যাবে।"

বাসন মেজে ধুয়ে তিনি পরিপাটী হয়ে এলেন। আমাদের ঠাকুরঘর দেখাতে নিয়ে চললেন। গিয়ে দেখি মনোরম যুগলমূর্তি একদিকে, অন্যদিকে শ্রীমৎ কাঠিয়াবাবার মূর্তি। অন্যান্য সাজসজ্জার ভেতর প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল সুবিরাট এক কলিকাযুক্ত আলবোলা। কলিকা গহ্বর থেকে এক সের দেড় সের পরিমাণ তামাকু পোড়ার গন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্রে উঠে এলো!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, আপনার গুরুদেব বুঝি খুব তামাকুপ্রিয় ছিলেন?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ মা, ছিলেন। এ তো দেখছে এক-দেড়সেরী কলকে। তাঁর আমলে আমি দেখেছি পাঁচ সের গাঁজা ও পাঁচ সের তামাকের দুটি কলকে, গাছের যে স্থলে দু'ডাল একত্রিত হয়ে সন্ধি পাতিয়েছে, সে রকম জায়গায় এই দুইটি কলকে অগ্নিসংযোগ করে বসিয়ে দেওয়া হ'ত। ঐ দুই কলকের দুই টান দিয়ে প্রভু ধাতস্থ হতেন।"

তাঁর গুরুদেবের কথা বলতে বলতে সন্তদাস বাবাজী মহারাজ বিভোর হয়ে গেলেন। জানালেন, "পাতার ঝুপড়ির নীচে তিনি বাস করতেন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা- ছয় ঋতু ভর। এক কাঠের কৌপীন ছাড়া আর কোনো আবরণ তিনি অঙ্গে রাখতেন না। একবার কি হ'ল জানো মা, তাঁর কুঠিয়াতে এক চোর এসে হাজির। কিই বা কুঠিয়াতে ছিল, চোর তবু চুরির জন্য প্রবেশ করল। তিনি তখন একটু বাইরে ছিলেন। তাঁকে কুঠিয়ার পানে ফিরে আসতে দেখে তো চোর দে ছুট। কুঠিয়াতে বাকী যে দ্রব্য ছিল সেগুলো নিয়ে তিনিও দৌড়ালেন চোরের পিছু পিছু। আর চোরকে ডেকে বলতে লাগলেন, 'ও ভাই চোরনারায়ণ, মিছে কেন ছল করে চলে যাচ্ছ? কিছুই তো নিয়ে গেলে না।

সবই তো ফেলে গেলে। এইগুলিও দয়া করে নিয়ে যাও। যে রুটি নিয়েছ, তাতে ঘি মাখানো হয়নি। একটু দাঁড়াও দয়া করে, ঘি মাখিয়ে দিই।'

"কোন ভোগবিলাস বলতে কিছু তাঁর দেখিনি, কেবল ছিল এই তামাকু-বিলাস।"

ডাঃ সরকার জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বাবাজী মহারাজ, বলতে পারেন এখানে সত্যকার ভগবদ-নুরাগী কোনও বৈষ্ণব আছেন কিনা?" তিনি বললেন, "আমার জানা দু'জন আছেন। তাঁরা গভীর জঙ্গলে বাস করেন। সন্ধ্যার পর একবার গ্রামে আসেন মাধুকরীতে। দু'বেলার আহার সংগ্রহান্তে পুনরায় জঙ্গলে ফিরে যান।" "কোথায় কোন্ জঙ্গলে বাস করেন, আপনি কি তা জানেন?" ……ডাক্তার সরকারের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "না, তা আমি জানি না। তবে যে সব রাখাল ছেলেরা গরু ভেড়া চরায় এবং ময়ূরের পাখনা কুড়িয়ে বেড়ায়, তারা বলতে পারে। তারা হয়তো বা মাঝে মাঝে তাঁদের সন্ধ্যার পর গাঁয়ের পথে দেখে থাকবে?"

ডাঃ সরকার বৃন্দাবনের প্রায় সকল জঙ্গল জনপদ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। দিবা দ্বিপ্রহরে এই অভিযান শুরু হত, রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকা পড়লে অন্বেষণের বিরাম হত। এমনি করে জাবট, বংশীবট, গোকুল, নন্দগ্রাম, বৃষভানুপুর, গোবর্ধন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি বৃন্দাবনের নয়নমনোমুগ্ধকর বন উপবন তিনি তছনছ করে বেড়ালেন। কোথাও বা দেখলেন ময়ূর ময়ূরী ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা যূথবদ্ধ হরিণহরিণী ক্রীড়া-নিরত। বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবর্ণের বিহগকুল মধুর কূজন-কোলাহলে নিমগ্ন। সত্যিই বনবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের কেন এত প্রিয় ছিল বৃন্দাবন, তা বৃন্দাবনের পল্লীপথে দাঁড়িয়েই সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।

এমনি করে এক মাস পার হয়ে গেল। এক সন্ধ্যায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। সেই অরণ্যচারী সাধু-দ্বয়ের মধ্যে একজনের দর্শন মিলল। এঁর নাম রামকৃষ্ণদাস বাবাজী। গৌরবর্ণ সুন্দর সৌম্য অবয়ব। পরিধানে একটি চটের আবরণ। বহির্বাসও চটনির্মিত। ডান হাতে একটি জপমালা, বাম হাতে মাটির পাত্র। সাধু তন্ময়চিত্তে নামকীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। রাখাল বালকগণ আমাদের দেখিয়ে বললে, "ওই যে সাধু যাচ্ছেন।"

আমরা এগিয়ে গিয়ে সাধুর যাত্রাপথ অবরোধ করে দাঁড়ালুম। আমরা যখনই সাধু অন্বেষণে বেরিয়েছি, তখনই কিছু ফলমূল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি। সেদিনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমরা ফল দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "এ ফল কেন এনেছেন আপনারা?"

আমি বললাম, "আপনি ঠাকুরকে ভোগ দেবেন বলে।"

তিনি বললেন, "আমার তো ঠাকুরকে কিছু ভোগ দেবার অধিকার নেই।"

আমি বললাম, "কেন নেই?"

তিনি বললেন, "আমার তো আমার বলতে এখানে কিছুই নেই। সবই তো তাঁর। আমি তাঁকে কি দেবো?"

আমি বললাম, "কিছুই কি নেই?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আছে। কেবল একটি জিনিস আছে। সে জীবের মন। সেই মন দেবার জন্যই তো শিশুকাল থেকে এই জঙ্গলে বসে শত আকুলি বিকুলি করছি। তবু তো তিনি আমার মন গ্রহণ করছেন না। হয়তো আমারই দোষ। আমার মনই জঞ্জালে পরিপূর্ণ। মনকে আমিই বোধহয় ঠিক ঠিক তাঁর পায়ে সমর্পণ করতে পারি না। এ ফল আপনারা নিয়ে যান। জগতে আহারের সমস্যা বড় প্রবল। এ ফল কোন ক্ষুধার্ত প্রাণীকে দিলে সে তৃপ্ত হবে।"

তারপর প্রায় এক ঘণ্টা ডাঃ সরকারের সঙ্গে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ডাঃ সরকার মধ্যে মধ্যে বলতেন, এমন অহংকারশূন্য পণ্ডিত তিনি দ্বিতীয় দেখেন নি।

এই ঘটনার পর বৃন্দাবনে থাকা কালে আরও দু'তিন বার আমরা এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেছিলাম। একদিন তিনি আমাদের তাঁর কুটিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুটির অর্থাৎ কতকগুলো বৃক্ষপত্র আচ্ছাদিত ঝুপড়ি। যে চট বহির্বাস ও উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করেন, তাই বিছিয়েই শয়ন করেন তিনি। আধুনিক নব্য সভ্যতার চক্ষে হয়তো এ দৃশ্য মূর্খ বর্বরতা। কিন্তু তিনি যে লোকের অধিবাসী সেখানে বাহ্যবস্তুর মূল্য কপর্দক মাত্রও নয়।

ডাঃ সরকার সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৃন্দাবনে এই যে সব দৃশ্য বস্তু এর প্রত্যেক কিছুতেই কি শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শন দর্শন ও অনুভূতি বিদ্যমান? নিত্য দিন এই কি সত্য?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ সত্য। যেমন তুমি আমি সত্য, অবিকল তেমনি। তবে তা সমস্ত মনঃপ্রাণ ও ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে।"

এই সাধুর সঙ্গে আলাপ করে ডাঃ সরকার খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাধনা বৈষ্ণব-মার্গের বলে তাঁর সঙ্গে কেবলমাত্র শাস্ত্রকথাই আলোচনা করেছেন, সাধনার পদ্ধতি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

একদিন কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী মহীয়সী মীরাবাঈয়ের সাধনস্থান দর্শন করে ফিরে আসছি। দেখি গোবর্ধনের পাদমূলে কে একজন লোক বসে আছে। বহুক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চরাচর অন্ধকারের সমুদ্রে অবগাহন করছিল। লোকটি যে স্থলে বসেছিল, সে স্থানও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখেই আমি ডক্টর সরকারের উদ্দেশে বললাম, "আশা করি এইবার তোমার সাধু খোঁজার পালা সাঙ্গ হবে।"

ডাঃ সরকার বললেন, "কেন, দেখছো তো চুপটি করে ভাল মানুষ সেজে বসে আছে। একবার কাছে গিয়ে দেখ, মুহূর্তে নিজমূর্তি ধারণ করবে।"

আমার মনে পড়ল, শুনেছিলাম গোবর্ধনের এই জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য পথে যেমন বন্য জন্তু আছে, তেমনি আবার আছে চোর ডাকাতের উপদ্রব। রাত্রি ক্রমেই গভীর হচ্ছিল। অনেকেই এ পথে রাত্রে বিচরণ করতে বারণ করেছিলেন। তাঁদের কথা মনে পড়ল। অপর কোন পথও আমাদের জানা নেই। আর এতটা নিকটে আমরা এসে পড়েছিলাম যে, লোকটি অনায়াসেই আমাদের দেখতে পায়। অতএব ভিন্ন পথ খুঁজে বের করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভয়ে শরীরের রক্ত ক্রমেই হিম হয়ে আসছিল।

নীরবে নিশ্চিত বিপদ জেনেই দু'জন আমরা পথ অতিবাহন করে চললাম শম্বুকগতিতে। বুক দুরু দুরু। কণ্ঠস্বর বিলুপ্তপ্রায়। কেবলমাত্র ইশারায় দু'এক কথা হচ্ছে আমাতে আর ডাঃ সরকারের মাঝে। ক্রমে লোকটির সমীপবর্তী হলাম। এমন সময় আঁধারের অবগুণ্ঠন সরিয়ে কৃষ্ণা পঞ্চমীর চন্দ্র পূর্বাকাশে উঁকি দিল। সেই আলোকে দেখলাম সমুখের লোকটির দেহে মাত্র এক টুকরো কৌপীন জড়ানো। নিমীলিত দুই নয়ন দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা ও যমুনা। আমার অবিশ্বাসী মন কিন্তু এ দৃশ্য দেখার পরেও সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হল না। আমার মনে হল শয়তানি করার এ এক অভিনয়!

কিন্তু ডাঃ সরকার কি পেলেন এই লোকটির মাঝে তা তিনিই জানেন। এই লোকটির পায়ের কাছে তিনি বসে পড়লেন। মুখে কথা নেই, চক্ষু মুদ্রিত। এইরূপ ভাবে কতক্ষণ কাটল মনে নেই, হঠাৎ চেয়ে দেখি, সজাগ দৃষ্টি মেলে অপলক চোখে চেয়ে আছে লোকটি। হৃদয়ে এবার বল পেলাম।

চোখাচোখি হতে আমি বললাম, "আপনি এখানে বসে আছেন কেন?"

উত্তরে তিনি বললেন, "ব্রজগোপীবল্লভ যশোদা-দুলাল আমার সখা প্রাণধনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

আমি বললাম, "এই আঁধার রাতে এই গহন বনে তাঁকে কোথায় পাবেন?"

তিনি বললেন, "পাব বই কি, নিশ্চয় পাব সজনী। এই গোবর্ধন পর্বতেই তো সে তার সখাদের সঙ্গে দিবারাত্র খেলা করে বেড়ায়।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কি কখনো তিনি খেলা করেছেন? আপনি কি কখনো তাঁকে দেখেছেন?"

তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে যদি খেলাই না করল তো আমায় সৃষ্টি করেছে কেন? সকলের সঙ্গেই সে খেলা করে, মা। খেলা করাই তো তার কাজ। যদি বল দেখা হয়েছে কি? দেখা নিশ্চয় সেদিন হবে, যেদিন তাকে দেখার মতন এই শরীরমন তৈরী হবে। মাগো, এই তো সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার যে, সে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই আছে অথচ তাকে আমরা দেখতে পাই না। ওদিকে আমাদের কোন কিছুই কিন্তু তার অজানা নয়। জীবনে কি মরণে একদিন তার দেখা পাবই, সেই আশাতেই বসে আছি, বসে থাকব।"

সাধুকে আমরা কিছু অর্থ দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বললেন, "তোমাদের যদি এতই ইচ্ছা, তাহলে অমুক লোকের কাছে একটি টাকা দিও। সে আমায় শীতের সময় একখানা কম্বল কিনে দেবে।"

আজ কথাটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখনকার দিনে এক টাকায় শীতপ্রশমনোপযোগী বেশ ভাল কম্বলই পাওয়া যেত।

রবীন্দ্রকাব্যে কাব্যতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

ভাষার উদ্ভবের পর যেমন ব্যাকরণের সৃষ্টি, কাব্যতত্ত্বের আলোচনাও তেমনি কাব্যসৃষ্টির পরবর্তী ঘটনা। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাকে অবলম্বন করে, দেশে দেশে বিদগ্ধ কাব্যরসিকদের উৎসাহে অলঙ্কারশাস্ত্র ও সমালোচনা-সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই আলোচনায় সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ কাব্যস্রষ্টারা অংশ গ্রহণ করেন না। তাঁরা তাঁদের কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকথার আলোচনায় বিমুখ থাকেন। তাঁদের সৃজনী প্রতিভা অনেক সময়েই এই বিশ্লেষণধর্মের পরিপন্থী হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমালোচক হতে দেখা যায় না। কাব্যতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্বের নিয়মগুলো নিখুঁতভাবে মেনে চলেও তাঁরা যে এগুলো সম্বন্ধে অতি সচেতন থাকেন না সেটা এক বিস্ময়ের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা খুবই বিস্মিত হই যখন দেখি যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি কখনও কখনও সমালোচনা ও কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণেও অপরাজেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এইরূপ দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হয়েই রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। কাব্যতত্ত্বের মূল তথ্যগুলো সম্বন্ধে এতদূর বেশী সচেতন থেকেও তাঁর কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি।

সাহিত্যসমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্য আছে। দেশকাল-নিরপেক্ষভাবে

সাহিত্যসমালোচনার প্রধান মাপকাঠিকে গ্রহণ করেও তিনি কিভাবে নিজ সমালোচনারীতির এক আদর্শস্থাপন করে গেছেন তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বক্তব্য দীর্ঘতর হয়ে যাবে। প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে তাঁর আলোচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থনিরপেক্ষভাবে কাব্যতত্ত্বের আলোচনা হিসাবে তাঁর 'সাহিত্য' কিংবা 'সাহিত্যের পথে' আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে।

সবচেয়ে অপূর্ব ঘটনা ঘটেছে তাঁর কয়েকটি কবিতায়। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' বা 'আধুনিক সাহিত্য'এর পরিচয় সাহিত্য-সমালোচনা হিসাবেই ;—তাঁর 'সাহিত্যের পথে'র রচনার সাহিত্যিক ভঙ্গীতে মুগ্ধ হ'লেও সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ-হিসাবে তাকে আমরা চিনে নিতে পারি। কিন্তু তাঁর কয়েকটি রচনা কবিতা হয়েও কেমন বিস্ময়করভাবে কাব্যতত্ত্বালোচনার চূড়ান্ত নিদর্শন হতে পেরেছে তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে তাদের কয়েকটির উল্লেখে বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে। 'সোনারতরী'র 'পুরস্কার', 'চিত্রার' 'আবেদন' কিংবা 'কাহিনী'র 'ভাষা ও ছন্দ'কে এর উদাহরণরূপে উপস্থিত করতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার গতি অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায় যে, তা' এক ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তনের পথ অনুসরণ করে চলেছে। এক এক যুগের কবিমানসের ইতিহাস তাঁর এক একটি কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা যায়। এক একটি সঙ্কলনগ্রন্থে প্রতিটি কবিতার স্বতন্ত্রমূল্যের সঙ্গে সেই যুগের কবিমনের বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। উপরোক্ত কবিতা কয়েকটিতেও তাই হয়েছে। 'সোনার তরী'র অনেক কবিতার মতো 'পুরস্কার'-কবিতাতেও ছোটগল্পের শেষ পরিণতির বর্ণিত মাধুর্য কবির জীবনের ঘটনায় অভিব্যক্ত হতে দেখি। 'চিত্রায়' কবি নিমগ্ন হয়েছেন বিশ্বজগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে। এখানে কবি প্রশান্তহাসিনী অন্তরবাসিনীকে জগতের মাঝে বিচিত্ররূপে দেখতে পেয়েছেন। 'আবেদন' কবিতায় কবির সেই বিচিত্র সৌন্দর্যে বিচরণের কামনা অপূর্বভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। 'কাহিনী'র কবিতা 'ভাষা ও ছন্দে' অন্যান্য কবিতার মতই প্রাচীন প্রসিদ্ধ কাব্যকথাকে কবি নবরূপে আস্বাদ করেছেন। এইভাবে কাব্যগ্রন্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং প্রকৃত 'কবিতা' হয়েও এই রচনাগুলি কেমন করে কাব্যতত্ত্বের আলোচনার অক্ষয় নিদর্শন হয়ে উঠেছে তাই আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ আলোচনার বিষয়।

'পুরস্কার' কবিতার কাহিনীটির নিজস্ব একটি মাধুর্য আছে। সেই মধুর কাহিনীরই অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কবি ও কবিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। কবিতায় বর্ণিত অর্থকরী রচনার প্রতি বিমুখ কবি এখানে সাহিত্যসাধকদের প্রতিনিধি। রাজকার্যপরিচালনায় সাহায্যকারী চর, 'দাঁতভাঙ্গা' ছন্দরচনাকারী বৈয়াকরণ ও অন্যান্য অর্থলোলুপ সংসারী মানুষদের থেকে তাঁর কত পার্থক্য! এই প্রকৃতির লোকে কাব্যসৃষ্টি বা কাব্যালোচনাকে মনে করে 'ছেলে খেলা।' রাজসমক্ষে কাব্যালোচনা করতে গিয়ে কবি তার নিজের জীবনের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। বাণী-আরাধনাকে জীবনের ব্রত করে কবি স্বার্থে উদাসীন হয়ে জীবনযাপন করে চলেন। তিনি কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্নেহবচন শুনে স্বর্গসুধা লাভ করেন। যদিও দেহধারণের নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে কবি মধ্যে মধ্যে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বলেন—

> 'সুরের খাদ্যে জানো তো মা বাণী
> নরের মিটে না ক্ষুধা।'

তবু এটাও তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই জানা আছে—

'যেজন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী
জানে না আপনা, জানে না ধরণী
সংসার-কোলাহল।'

'পুরস্কারে' বর্ণিত এই কবির প্রার্থনা সকল কবিরই চিরন্তন প্রার্থনা—

'থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী—
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহিনা চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।'

এইভাবে কবিজীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর কাব্যের প্রকৃতি-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জগতে কত রাজ্যের ভাঙাগড়া হয়ে গেছে, কত সুখদুঃখের উত্থানপতনে আন্দোলিত হয়েছে জগৎসংসার। কত বুকফাটা হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হয়েছে, আজ তার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু কবির কাব্যে এই ধরনের ঘটনা স্থান পাবা মাত্রই তা' চিরজীবন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর বুকে প্রকৃতিরাজ্যের বৈচিত্র্য বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে, মানুষের জীবনেও এসেছে কত উত্থানপতন। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের মনের এই লীলাবৈচিত্র্য কবির নিপুণতায় স্থায়িত্বলাভ করে এসেছে বহুবার।

'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহুদিবসের সুখে দুখে আঁকা, লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা' এই পৃথিবীতে কবির কর্তব্য কি তাও আলোচনা করা হয়েছে এখানে। কবি বলেন—

'অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিচরণ
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।'

কবি বিশ্বের অসীম ও অনন্ত রহস্যের মাধুর্য উদ্‌ঘাটিত করেন, প্রকৃতিরাজ্যে যে সুধা ছড়িয়ে আছে তা' তাঁর লেখনী-কৌশলে মধুরতর হয়ে ওঠে, সংসারের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কোলাহল তাঁর রচিত কাব্যের সাহায্যে সমাধানের পথে এগিয়ে চলে, আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনকে আমরা কতটা যে ভালবাসি তা' নতুন করে উপলব্ধি করি। সাধারণ মানুষ সুখে উৎফুল্ল ও দুঃখে বিচলিত হয়, কিন্তু ভাষা তার সীমাবদ্ধ; আত্মপ্রকাশে অক্ষম মানুষের এই প্রয়োজন মেটাতে কবির লেখা সাহায্য করে। সুখে-দুঃখে, শোকে-আনন্দে কবির ভাষা আমাদের সকলেরই ভাষা হয়ে উঠে।

'পুরস্কার' কবিতায় এই ভাবে কবি ও কবিতা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তত্ত্বকথা প্রকাশিত হয়েছে, অথচ কবিতা তত্ত্বভারে প্রপীড়িত হয় নি—কবিতার অঙ্গ থেকে এসকল কথা বাদ দিলে গল্পাংশের দিক দিয়েও কবিতার কোন মূল্যই থাকে না।

'আবেদন' কবিতায় এত বেশী কথা পাই না। তবে কবির মনের কামনা বা কবিতার ও যে-কোন শিল্পসাধনার মূল লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে কবির বক্তব্য রূপকধর্মলাভ করেছে। মহারাণীর কাছে ভৃত্যের আবেদন জীবনদেবতা বা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর কাছে সৌন্দর্যের উপাসক কবি-শিল্পীর মনের কামনারই কাব্যিক রূপ। বৈষয়িক কাজে নিযুক্ত অনেক কর্মচারীর সঙ্গে এই কবিভৃত্যের যে-ভাবে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তাতে 'পুরস্কার' কবিতার অংশবিশেষ মনে পড়ে যায়। বৈষয়িক কাজের সঙ্গে শিল্পকাজ বা কবিত্বসৃষ্টির পার্থক্য দেখানো হয়েছে। সাধারণ লোক কবিশিল্পীর কাজের মর্ম বোঝে না। এই কাজকে বলা হয়েছে 'অকাজের কাজ,' 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়।' সাধারণ লোক এই কাজকে মূল্যহীন বিবেচনা করলেও তার গভীর মূল্য সুললিত ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে এই কবিতায়। শিল্পীর সাধনা আলস্যের প্রশ্রয় বলে বিষয়-পরিপক লোকের কাছে মনে

হলেও, অন্য আদর্শে একে অক্ষয় সঞ্চয় মনে করলে ভুল হবে না। আগেই বলা হয়েছে, 'চিত্রা'র যুগে কবি বিচিত্ররূপে জগৎকে দেখতে চেয়েছেন। এই কবিতাতেও ঐ তত্ত্বকথাকে ভিত্তি করে কবির সেই প্রচেষ্টার সফলতা ঘটতে দেখা যায়।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার নামকরণ এর বিষয়-বস্তুর ইঙ্গিত দেয়। রামায়ণের ঘটনাকে ভিত্তি করে কবি যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে রামায়ণ রচনার গোড়ার কথার সঙ্গে সকল কাব্যের ভাষা ও ছন্দের কথা, সাহিত্যিক সত্যের কথা, কাব্যসৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে কবিমনের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও রয়েছে। এই বর্ণনা-গুলিও যথারীতি সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত হতে দেখে কবির অন্তর আন্দোলিত হয়েছে। সেই অনুভূতির প্লাবনে কবিচিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে। দেবতার দানস্বরূপ এই সাহিত্য-সামগ্রী যতক্ষণ না বাইরে প্রকাশলাভ করছে ততক্ষণ কবিচিত্তের অস্বস্তির অন্ত নেই।

'অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।'

রামায়ণ রচনার প্রাক্কালে এইভাবে বাল্মীকির মনের অবস্থা বিবৃত করতে গিয়ে যা' বলা হয়েছে তা' অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সর্বকালের সকল সাহিত্য স্রস্টারই মনের চিত্র।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহুব্যবহৃত ভাষায় হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করতে পারা যায় না। তা' করতে হ'লে প্রয়োজন হয় ছন্দের সাহায্যের। মানুষের এই সাধারণ ভাষাকে সঙ্গীতের মতন 'স্বাধীন' ও 'অর্থভারহীন' করার জন্য কবিগুরু বাল্মীকির মত সকল কবিই বলেন—

'মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।'

সবচেয়ে বেশী মূল্যবান কথা বলা হয়েছে এই কবিতার সমাপ্তিতে। চরিতকথামূলক আখ্যান-কাব্য লিখতে গিয়ে রামায়ণের কবির ভয় হয়েছিল, পাছে তিনি সত্যের অপলাপ করে ফেলেন। তার প্রতি এ বিষয়ে নারদের উপদেশে কাব্যতত্ত্বের চরম কথা বলা হয়েছে।

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা' তা' সব সত্য নহে।

সাহিত্যসৃষ্টিতে সংবাদিক-সুলভ তথ্যবিবৃতি আকাঙ্ক্ষিত নয়। কবির কল্পনা ও অনুভূতির মিশ্রণে যে পরম উপভোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় তা' বাস্তবজগতের ঘটনার সঙ্গে হুবহু না মিলতে পারে। এতে কাব্য-সত্যের অপলাপ করা হয় না। তখনই কবির রচনা 'অবাস্তব' বা 'অসত্য' হয়—যখন তাঁর নিজের কল্পনার মধ্যে থাকে অসঙ্গতি বা তা' পাঠকের হৃদয়ানুভূতির অনুকূল হয়ে ওঠে না। তাই এই কবিতায় বাল্মীকির প্রতি নারদের উপদেশ চিরকাল কবি ও কাব্য-সমালোচকদের মনে রাখার মতো হয়ে আছে :—

'কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

রবীন্দ্রনাথের এই সব কবিতার আলোচনায় দেখা যায় যে তিনি কেমন অপূর্বভাবে কাব্যতত্ত্বের মূল্যবান বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন, অথচ সে আলোচনা শুষ্ক ও নীরস হয়ে রইলো না, অনির্বচনীয়ভাবে কাব্যরূপ লাভ করতে পারল। রসোপলব্ধির সামগ্রী করে কাব্যতত্ত্বের এই গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়গুলো পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে খুব কম সাহিত্যিকদেরই দেখা গেছে। এরকম কাব্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা অবশ্য দেখা গিয়েছে আমাদের

বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যেই। মহাকবি মধুসূদনের চতুর্দশপদী-কবিতায় এরকম প্রয়াসের একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। দু' এক জায়গায় কাব্যতত্ত্বই কবির সনেটের বিষয়বস্তু হয়েছে দেখা যায়। তিনি তাঁর 'কবি' কবিতায় প্রশ্ন তুলেছেন—'কে কবি? কবে কে মোরে?'

আবার উত্তরও দিয়েছেন নিজে—

'সেই কবি মোর মতে কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।'

উদ্ধৃত অংশ এবং কবিতার অন্য অংশের আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কাব্যতত্ত্বের বিশদ আলোচনায় এগুলো মূল্যহীন নয়। কবির কাব্যের গুণ সম্বন্ধে সচেতনতার প্রমাণরূপে এগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে, এই জাতীয় বিবৃতি কাব্যরূপ লাভ করে নি। প্রবন্ধাকারে বর্ণনায় বক্তব্যকে কবি ছন্দোমাধুর্যের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন মাত্র। উদ্ধৃত অংশে 'সেই কবি মোর মতে' বাক্যাংশে সেটা আরো ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই মহাকবির এই ধরনের আরও কবিতা আছে। সেগুলো সম্বন্ধে এই এক মন্তব্যই প্রয়োগ করা যায় যে কোন স্থলেই কাব্যতত্ত্ব কবিতায় পরিণত হতে পারে নি।

বাঙ্গালা কাব্যে কাব্যতত্ত্বের রূপদানপ্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আর একজন মহাকবির প্রয়াসের সঙ্গে তুলনায় আরও স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়। কবির রচনা পাঠ করে কখনও মনে হয় না যে, তত্ত্বকথামূলক প্রবন্ধকে ছন্দোগরিমার সাহায্যে তিনি প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যপাঠজনিত প্রত্যাশিত আনন্দকে বজায় রেখে কবি এক বিচিত্র কৌশলে তাঁর এই কবিতাগুলি রচনা করেছেন।

সাহিত্য-সৃষ্টির এক একটি শাখায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই পথিকৃৎ এবং তাতে তাঁর রচনা অননুকরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। তাঁর প্রতিভার এই নব নব অভিব্যক্তি দেখে আমরা বিস্ময়বিহ্বল হয়েছি বারবার। কাব্যতত্ত্বের এই অপরূপ কাব্যরূপদানে আমরা নূতনভাবে বিস্মিত হই। শ্রেষ্ঠ সমালোচক হয়ে তিনি তাঁর অসাধারণত্ব প্রমাণ করেছেন—সাহিত্যের স্বরূপ ও মূলনীতি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন তাঁর মৌলিকতা, সেই স্বরূপ ও মূলনীতি যে আবার মানুষের হৃদয়ানুভূতির অবলম্বন হয়ে সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে, তা দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর প্রতিভার অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠত্ব!

জীবন-মৃত্যু

শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এক ঘুম থেকে জেগে, আর ঘুমে, যেটুকু সময়,
সেইটুকু এ জীবন? তার বেশী আর কিছু নয়?
অনেক কালের বর্ষে সময়ের প্রতীক্ষার মাপে,
মাঝে মাঝে তারা জাগে, নিবিড় আনন্দ স্বপ্নে কাঁপে
জন্ম জীবনের ছবি, পৃথিবী প্রাঙ্গণে খেলা করে,
পৃথিবীর বহুদিন, জীবনের একদিন ভরে।
রিক্ত অভিজ্ঞান নয়, সেই কটি মুহূর্তের ছবি,
আঁকা থাকে এই প্রাণে, উজ্জ্বল অমৃতস্পর্শ লভি।
সব ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকে যে স্বচ্ছ-জীবন,
সে আরেক জন্মান্তরে বহে আনে আমাদের মন।
সর্ব অঙ্গে ক্লান্তি নামে, ক্লান্তি নামে আমরা ঘুমাই,
কী গভীর বিস্মরণে, আরেক জীবন খুঁজে পাই।

যার কোন স্মৃতি মনে থাকে না'ক শুধু অন্ধকার,
নিমেষে হারায়ে ফেলি শিখাটুকু প্রাণ-প্রতিজ্ঞার।
অনেক নিঃসীম ঘুমে পরিব্যাপ্ত আবিষ্ট জীবন,
স্বপ্ন দেখে অন্ধকারে, আমাদের স্বপ্ন-কল্প-মন।
সেই স্বপ্ন অনুভূতি চেতনার প্রত্যন্ত গভীরে,
ছড়ায় অনেক ঘুম, আচ্ছন্ন করে সে ধীরে ধীরে।
স্বপ্নের বিরাম হয় অন্ধকার রাত্রি অবসান,
ঘুম থেকে জেগে দেখি প্রজ্ঞায় প্রসন্ন এক প্রাণ॥

রামায়ণের রূপান্তর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাল্মীকির নামে অদ্ভুত রামায়ণ নামে একখানি রামায়ণ আছে। সে রামায়ণের সবই অদ্ভুত। সে রামায়ণখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

তমসার তীরে বাল্মীকির তপোবনে একদিন ভরদ্বাজ উপস্থিত হইয়া গুরু বাল্মীকিকে রাম ও সীতার জন্মরহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বাল্মীকি বলিলেন—সীতা কে জান?

প্রকৃতিবিকৃতির্দেবী চিন্ময়ী চিদ্‌বিলাসিনী।
মহাকুণ্ডলিনী সর্বান্তর্যাতা ব্রহ্মসংজ্ঞিতা।

ইনিই সীতা। ইনি মাঝে মাঝে অবতীর্ণা হন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি সুব্রত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা প্রকৃতিসম্ভবঃ॥

আর রামচন্দ্র? ইনি—সাক্ষাৎ পরম জ্যোতিঃ, পরম ধাম, পরম পুরুষ। রাম ও সীতার স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।

অরূপিণো রূপবিধারণং পুন-
র্নামতোঽনুগ্রহ এব কেবলম্।

এই ব্রহ্মস্বরূপ রামসীতা কেবল মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহবশতই রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাম সীতার রূপ গ্রহণের কারণ বাল্মীকি যাহা বলিলেন—ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ইহাতে-ত অদ্ভুত রামায়ণ হয় না। অদ্ভুত রামায়ণে সীতা ও রামের অবতরণের কাহিনী এইভাবে বিবৃত হইয়াছে—

সূর্যবংশের হরিভক্ত রাজা অম্বরীষের উপাখ্যানের সহিত রামচন্দ্রের জন্মের সম্বন্ধ আছে। সেজন্য গ্রন্থে অম্বরীষের জন্ম, তপস্যায় বরপ্রাপ্তি, সুদর্শনচক্রলাভ ও আদর্শ রাজধর্মপালনের কথা বিবৃত হইয়াছে। অম্বরীষের শ্রীমতী নামে এক কন্যা ছিল। শ্রীমতী রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী। একদিন নারদ ও পর্বতমুনি অম্বরীষের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন ইঁহারা বয়সে তরুণ। ইঁহারা দুইজনেই অম্বরীষকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলেন। অম্বরীষ তাহাদের বলিলেন,—কন্যা যাঁহাকে বরণ করিবে—তাঁহাকেই দান করিব। এক কন্যা দুই জনকে ত দান করিতে পারি না।

মুনিদ্বয় 'পরদিন আবার আসিব' বলিয়া চলিয়া গেলেন। দুইজনেই বিষ্ণুর পরমভক্ত। নারদ প্রথমে বিষ্ণুলোকে গিয়া বিষ্ণুকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া প্রার্থনা করিলেন—'কাল যখন আমি ও পর্বত দুজনে শ্রীমতীর পতি-নির্বাচনের জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব তখন পর্বতের মুখখানা যেন শ্রীমতীর চোখে বানরের মত দেখায়।' বিষ্ণু নারদের প্রস্তাবে মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে।" এদিকে পর্বত মুনিও বিষ্ণুর কাছে সেইরূপই প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু তাঁহার প্রস্তাবেও সম্মতি জানাইলেন।

পরদিন দুইজনেই শ্রীমতীর নির্বাচনের জন্য অযোধ্যাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে শ্রীমতী নববধূবেশে হস্তে বরমাল্য লইয়া মুনিদ্বয়ের

নিকটবর্তী হইলেন। কিন্তু দুইজনেরই বানরের মত ভীষণাকৃতি মুখ দেখিয়া শ্রীমতী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দুইজনের মধ্যে একজন পরম সুন্দর ষোড়শ বর্ষীয় যুবককে দেখিতে পাইলেন—

সর্বাভরণসংযুক্তমতসীপুষ্পসন্নিভম্।
দীর্ঘবাহুং বিশালাক্ষং তুঙ্গোরঃস্থলমুত্তমম্॥

শ্রীমতী আর ইতস্ততঃ না করিয়া দুইজনের মধ্যবর্তী এই মায়া-পুরুষের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতীও অন্তর্হিত হইলেন।

তখন নারদ ও পর্বত দুইজনেই কুপিত হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তুমি মায়ার দ্বারা আমাদের বঞ্চনা করিলে! তোমার ইহাতে মঙ্গল হইবে না।"

অম্বরীষ বলিলেন—"আপনারা ক্রোধ সংবরণ করুন। আমি ইহার কিছুই জানি না। বরং আমার কন্যা কোথায় অন্তর্হিত হইল—আপনারা বলিয়া দিন। আপনারাই এই বিপদের জন্য দায়ী।"

নারদ ও পর্বত দুইজনেই বুঝিলেন 'ইহা বিষ্ণু-মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন তাঁহারা ক্রোধ-ভরে বিষ্ণুলোকের দিকে ধাবিত হইলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুকেই নিজের স্বামিরূপে কামনা করিয়া পূর্বজন্মে তপস্যা এবং বর্তমানে তপজপ করিতেন। বিষ্ণুই তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে লইয়া গেলেন।

মুনিদ্বয় বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইলে বিষ্ণুর আদেশে শ্রীমতী আত্মগোপন করিলেন। মুনিদ্বয় বিষ্ণুকে এই ব্যাপারের কথা বলিলেন। নারায়ণ উত্তরে বলিলেন—তোমরা দুইজনেই আমার ভক্ত। ভক্তের বাঞ্ছা আমি অপূর্ণ রাখি না। দুইজনেই চাহিয়াছিলে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ বানরের মত দেখিতে হউক। সেজন্য শ্রীমতীর চোখে তোমরা দুজনেই কদাকার প্রতীত হইয়াছ।" মুনিদ্বয় বলিলেন—"আমাদের মধ্যে দ্বিভুজ ধনুষ্পাণি কোন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের প্রতারিত করিল?"

বিষ্ণু বলিলেন—"আমি ত চতুর্ভুজ, আমাকে তোমরা সন্দেহ করিতে পার না। এই ত্রিভুবনে কত মায়াপুরুষ আছেন, কে যে শ্রীমতীকে হরণ করিল তাহা আমি কি করিয়া জানিব?"

তখন মুনিদ্বয় বিষ্ণুলোক ত্যাগ করিয়া আবার অযোধ্যায় অম্বরীষের নিকটে আসিলেন। তাঁহারা অম্বরীষকে বলিলেন—"তুমি আমাদের প্রতারিত করিয়া আমাদের মোহ জন্মাইয়া কোনো মায়াবী পুরুষকে কন্যাদান করিয়াছ। এই অপরাধে—

মায়াযোগেন তস্মাত্ত্বাং তমোহভিভবিষ্যতি।
তেন নাত্মানমত্যর্থং যথাবৎ ত্বং হি বেৎস্যসি॥

মোহ তোমাকে আক্রমণ করিবে—মোহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তুমি আত্মবিস্মৃত হইবে।

এই অভিশাপ দিবা মাত্র তমোময়-মোহরাশি রাজাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুচক্র আবির্ভূত হইয়া সে মোহ-জালকে নিবারণ করিয়া মুনিদ্বয়ের দিকে তাহা প্রেরণ করিল। মুনিদ্বয় তখন ভয় পাইয়া সমস্ত ত্রিভুবনে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—কোথাও আশ্রয় নাই। বিষ্ণুচক্র মোহরাশি লইয়া সর্বত্র অনুসরণ করিতে লাগিল। মুনিদ্বয় তখন বিষ্ণুলোকে গিয়া বিষ্ণুর চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু তখন ভক্তদের বিপন্ন দেখিয়া চক্রকে প্রতিসংহার করিয়া মুনিদ্বয়কে বলিলেন—

"শ্রীমতী পূর্বজন্ম হইতে আমাকে স্বামিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল। আমিই তাহাকে তোমাদের মধ্যে দ্বিভুজ ধনুষ্পাণিরূপে দেখা দিয়াছিলাম। সে আমাকে তোমাদের সাক্ষাতেই বরণ করিয়াছে। আমিও তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। তোমাদিগকে এখন তোমাদের দুর্মতির সৃষ্ট মোহজাল হইতে রক্ষা করিলাম—ভক্ত অম্বরীষকেও রক্ষা করিলাম। এখন তোমরা প্রসন্ন হও, আর রোষ পোষণ করিও না।"

কিন্তু মুনিদ্বয়ের রোষ ইহাতেও শান্ত হইল না। তাঁহারা বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন—"তুমি

যে মূর্তিতে শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছ—অম্বরীষের বংশে তুমি সেই মূর্তিতেই নরজন্ম লাভ কর। তুমি রাক্ষসধর্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছ, তোমার শ্রীমতীকে সে জন্মে রাক্ষসে হরণ করিবে। আমরা যেমন দুঃখ পাইলাম,—শ্রীমতীকে হারাইয়া তুমিও তেমনি বনে বনে দুঃখ পাইবে।"

বিষ্ণু বলিলেন—"তোমাদের বাক্য অন্যথা হইবে না। আমি রাম নামে নরজন্ম গ্রহণ করিব।" তমোরাশিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"তোমরা অন্যত্র প্রতীক্ষা কর—রাম-জন্ম গ্রহণ করিলে তোমরা আমাকেই আশ্রয় করিও।"

মুনিদ্বয় তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন—"দেহান্ত পর্যন্ত আমরা আর দার পরিগ্রহ করিব না।" এই বলিয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

তারপর কবি সীতার জন্মকথা বিবৃত করিলেন।

কুশস্থলীর ঋষি কৌশিক হরিগুণগান করিয়া শিষ্যগণ সহ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহার সংবর্ধনার জন্য বিষ্ণুলোকে একটি সঙ্গীতসভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় দেব-যক্ষ-কিন্নর-অপ্সর সিদ্ধসাধ্য ও গন্ধর্বগণের জনতা হয়। লক্ষ্মীর চেটিকাগণ এই জনতার শৃঙ্খলার জন্য দেবগণের অনেককে বেত্রপ্রহারের দ্বারা দূরে সরাইয়া দেয়। নারদও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। নারদ তাহাতে অপমান বোধ করেন। তারপর নারদকে উপেক্ষা করিয়া বিষ্ণু যখন তুম্বুরুকে সভার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক-রূপে পুরস্কৃত করিলেন, তখন নারদের কোপের আর সীমা থাকিল না। নারদ কোপবশে লক্ষ্মী-দেবীকে অভিশাপ দিলেন—

> যদহং রাক্ষসং ভাবং গৃহীত্বা বিষ্ণুকান্তয়া।
> চেটীভির্বারিতো দূরং বেত্রপাতেন তাড়িতঃ॥
> তস্মাৎ সঞ্জায়তাং লক্ষ্মী রাক্ষসীগর্ভসম্ভবা।
> যতোহহং বহিরাক্ষিপ্তশ্চেটীভিঃ সাবহেলনম্॥
> হেলয়া রাক্ষসী চ ত্বাং বহিঃক্ষেপ্স্যতি ভূতলে॥

"বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী রাক্ষসপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়া যেহেতু চেটীগণ দ্বারা বেত্রাঘাতে আমাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে এই জন্য আমার শাপে তাহার রাক্ষসী-গর্ভে জন্ম হইবে। তাহার চেটীগণ আমাকে অবজ্ঞাভরে যেমন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, রাক্ষসীও তেমনি তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে।"

অদ্ভুত রামায়ণের মতে লক্ষ্মী নারায়ণ দুই জনেই নারদের অভিশাপে ভূতলে অবতারিত হইলেন।

অভিশাপ শুনিয়া লক্ষ্মী নারায়ণ দুই জনেই নারদকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন —"মুনিবর, আপনার কথার অন্যথা হইবে না। কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে যে রাক্ষসী আপন ইচ্ছায় অরণ্যবাসী মুনিগণের অল্প অল্প শোণিত দ্বারা পূর্ণ কলসের শোণিত পান করিবে—আমি সেই শোণিতে তাহার গর্ভেই যেন জন্ম গ্রহণ করি।" নারদ 'তথাস্তু' বলিলেন।

তারপর নারায়ণ নারদকে বলিলেন—"তুম্বুরু সঙ্গীত-বিদ্যায় তোমার চেয়ে নিপুণ। সেইজন্য সে তোমার চেয়ে আমার প্রিয়তর। তুমি মনোযোগ দিয়া এই বিদ্যার অনুশীলন করিয়া তুম্বুরুর তুল্য হইতে চেষ্টা কর। মানসসরোবরের নিকটে পর্বতশৃঙ্গে গানবন্ধু উলূক বাস করেন। তাঁহার আশ্রমে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই বিদ্যার অনুশীলন কর।

নারদ নারায়ণের আদেশ পাইয়া উলূকের নিকট সঙ্গীতবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রস্থান করিলেন।

ঋষিকবি তারপর ভরদ্বাজকে সীতার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন।

দশানন রাবণ দুশ্চর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিলে ব্রহ্মা দশাননকে বলিলেন, 'বরং বৃণু।' দশানন অমরত্ব বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাহা দিতে সম্মত না হইলে দশানন প্রকারান্তরে অমর হইতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—"সুর অসুর

যক্ষ পিশাচ উরগ রাক্ষস বিদ্যাধর কিন্নর অথবা অপ্সরোগণের মধ্যে কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। আর যদি মোহবশে কখনও আমি নিজের দুহিতাকে জোর করিয়া কাম পরিতৃপ্তির জন্য প্রার্থনা করি—তবে যেন সেই পাপেই আমার মৃত্যু হয়। নতুবা আমার যেন মৃত্যু না হয়।" ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাবণ উপেক্ষা ভরে যক্ষ রক্ষ সুরাসুরের সঙ্গে মানুষের নামই করে নাই।

রাবণ এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকবিজয়ী হইল। তারপর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া সে ভাবিল—এই অরণ্যের ঋষিগণকেও জয় করার প্রয়োজন। ঋষিগণকে জয় করার চিহ্নস্বরূপ রাবণ প্রত্যেক ঋষির দেহ হইতে একটু একটু রক্ত বাহির করিয়া একটি কলস পূর্ণ করিল। এই কলসটি রাবণ জয়-চিহ্ন স্বরূপ গৃহে লইয়া গিয়া মন্দোদরীকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিতে বলিল। আর বলিল—"এই কলসে বিষ আছে—ইহা নিজেও ভক্ষণ করিও না, অন্য কাহাকেও দিও না।"

এই বলিয়া রাবণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া সুমেরু-শৃঙ্গে বাস করিয়া প্রমোদ-মত্ত হইয়া রহিল। এক বৎসর অতীত হইল—সে মন্দোদরীর সহিত সাক্ষাৎই করিল না। মন্দোদরী পতিবিরহে কাতর হইয়া একদিন আত্মহত্যার জন্য বিষ মনে করিয়া কলস-পূর্ণ শোণিত পান করিল। কিন্তু তাহাতে মন্দোদরীর মৃত্যু হইল না—ঐ শোণিতে হইল তাহার গর্ভসঞ্চার। লক্ষ্মীদেবী নারদের অভিশাপে ঐ গর্ভে প্রবেশ করিলেন।

মন্দোদরী গর্ভবতী হইয়া ভাবিলেন—পতির সহিত বৎসরাধিককাল সাক্ষাৎ নাই। অথচ গর্ভ-সঞ্চার হইল। এই গর্ভ অচিরে ত্যাগ করা কর্তব্য। এই চিন্তা করিয়া মন্দোদরী বিমানযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া গর্ভত্যাগ করিলেন—এবং ঐ ভ্রূণটিকে ভূতলে প্রোথিত করিয়া চলিয়া আসিলেন।

কিছুকাল পরে রাজর্ষি জনক গেলেন সেখানে লাঙ্গল-যজ্ঞ করিতে। তিনি সহস্তে স্বর্ণলাঙ্গলের দ্বারা ভূমিকর্ষণকালে মন্দোদরীর গর্ভ-ভ্রষ্ট কন্যাটিকে ভূমিগর্ভ হইতে লাভ করিলেন। লাঙ্গলের সীতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই কন্যার নাম হইল সীতা। রাজর্ষি সীতাকে গৃহে আনিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মন্দোদরীর সম্পর্কে সীতা রাবণের কন্যাই হইল। এই কন্যাকে হরণ করার পাপেই রাবণের মৃত্যু!

অদ্ভুত রামায়ণে—রামের ধনুর্ভঙ্গের কথা নাই। রামচন্দ্রের সহিত সীতার পরিণয় হইল—শুধু এই কথাই আছে। বিবাহান্তে অযোধ্যাযাত্রার পথে ভার্গববিজয়ের কথা আছে। ভার্গব রামচন্দ্রের বীর্যপরীক্ষার জন্য তাঁহার পথরোধ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভার্গবের তেজ হরণ করিলেন।

তারপর রামবনবাসের উপাখ্যান ইহাতে কিছুই নাই। শুধু বলা হইয়াছে—

অথ সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ কেনাপি হেতুনা।
জগাম বিপিনং রামো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥

সীতার সহিত রামের বিবাহের পর লক্ষ্মণ ও সীতা সহ কোন কারণে রাম দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মূল উপখ্যানের মাঝখানকার কোন কথা নাই। এখানে বাস করিবার সময় রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। একটি শ্লোকেই এই ব্যাপারটির সংবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। তারপর ৩।৪টি শ্লোকের পরই সুগ্রীবের সহিত সখ্য-স্থাপনের কথা আছে।

অদ্ভুত রামায়ণে কেবল রাম ও সীতার মর্ত্যে অবতরণের কারণ এবং সীতার সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ—এই দুইটি ব্যাপারই উপজীব্য। বাকি সমস্ত ঘটনা সকলেই জানে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই অদ্ভুত রামায়ণের সবই অদ্ভুত। ইহা প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক। তত্ত্বমূলক অংশ গীতা ও উপনিষদের অনেক তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি।

সুগ্রীব রাম লক্ষ্মণকে বালিপ্রেরিত চর মনে করিয়া ত্রস্ত হইয়া হনুমানকে ভিক্ষুকের বেশে রামচন্দ্রের সমীপে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র নারায়ণ মূর্তিতে হনুমানকে দর্শন দিলেন—লক্ষ্মণ অনন্তদেবের মূর্তিতে সহস্রফণা-বিরচিত আতপত্র রামচন্দ্রের শীর্ষে ধারণ করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনের অনুরূপ। হনুমান প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, আপনি 'কে?' ইহার উত্তরে রামচন্দ্র নিজের ব্রহ্মস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া হনুমানকে বুঝাইলেন এবং প্রসঙ্গচ্ছলে হনুমানকে অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। তারপর হনুমান গীতার অর্জুনের স্তবের মত উপজাতিচ্ছন্দে রামচন্দ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন—

ত্বামেকমীশং পুরুষং প্রধানং
প্রাণেশ্বরং বামমনন্তযোগং।
নমামি সর্বান্তরসন্নিবিষ্টং
প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্॥
হিরণ্যগর্ভো জগদন্তরাত্মা
ত্বত্তোঽধিজাতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
স জায়মানো ভবতা বিসৃষ্টো
যথাভিধানং সকলং সসর্জ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোত্তমোঽসি॥
ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব রুদ্রো ভগবানধীশঃ।
ত্বং বিশ্বনাভিঃ প্রকৃতিঃ প্রতিষ্ঠা
সর্বেশ্বরস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি॥
ত্বামেকমাহুঃ পুরুষং পুরাণ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
চিন্মাত্রমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং
খং ব্রহ্ম শূন্যং প্রকৃতিং নিগুর্ণঞ্চ॥

ভাবে ভাষায় ছন্দে এইভাবে গীতা-উপনিষদের তথ্যগুলি এই অংশে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

রামচন্দ্র এইভাবে হনুমানকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ অবিগত করিয়া বলিলেন—"বৎস, রাবণ আমার ভার্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তুমি সুগ্রীবের সঙ্গে আমার সখ্য স্থাপন করিয়া ভার্যার উদ্ধারের উপায় করিয়া দাও।"

হনুমান ইহার চমৎকার উত্তর দিয়াছেন। রামের মুখে অধ্যাত্মবিদ্যার ব্যাখ্যা শুনিয়া হনুমানের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছিল। হনুমান তাই উত্তর করিলেন—

তব ভার্যা মহাভাগ রাবণেন হৃতেতি যৎ।
বিশ্বং যথেদমাভাতি তথেদং প্রতিভাতি মে॥

এই দৃশ্যমান বিশ্ব যেমন আমার নিকট অসত্য ও মায়াময় মনে হইতেছে—আপনার ভার্যা রাবণ হরণ করিয়াছে আমার কাছে তেমনি অসম্ভব অলীক বলিয়া মনে হইতেছে।

হনুমানের দৌত্যে রামের সহিত সুগ্রীবের সখ্যবন্ধন হইল, বালিবধ হইল, তারপর বানরসৈন্য লইয়া রামচন্দ্র লঙ্কাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এসকল কথার উল্লেখমাত্র আছে। একটি শ্লোকেই সব বলা হইয়াছে।

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া রাম সমুদ্রকে বলিলেন,—"সমুদ্র, তুমি স্তম্ভিত রূপ ধারণ করিয়া বানরগণকে পার করিয়া দাও।" সমুদ্র আদেশ পালন করিলেন না। তখন লক্ষ্মণ সমুদ্রজলে নামিয়া নিজের তেজের দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন। তখন ত্রিলোকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

রামচন্দ্র তখন বলিলেন—'পুনরেনং পূরয়ামি সীতাবিরহজেন বৈ' আমি ইহাকে সীতাবিরহজাত অশ্রু-সলিলে পূর্ণ করিয়া দিতেছি। অশ্রুও লবণাক্ত

সলিল। এই একটিমাত্র চরণে চমৎকার কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর একটিমাত্র শ্লোকে লঙ্কাকাণ্ড শেষ হইয়াছে—তারপরই উত্তরাকাণ্ড।

লঙ্কায়াং রাবণং হত্বা সগণঃ মধুসূদনঃ
আরোপ্য পুষ্পকে সীতাং বিভীষণসহায়বান্
অযোধ্যামাগমদ্রামঃ —ইত্যাদি

তারপর রামচন্দ্র সিংহাসনে আরূঢ় হইলে ঋষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিলেন। রামচন্দ্র সীতা ও ভ্রাতৃগণ সহ ঋষিদের প্রশস্তি-বাক্য শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে সীতা বলিয়া উঠিলেন—"দশবদন রাবণকে বধ করার জন্য এত প্রশস্তিবচনের সার্থকতা নাই। আর্য্যপুত্র যদি সহস্রবদন রাবণকে বধ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই স্তুতিবচন শোভা পায়।"

ঋষিরা বলিলেন—"দেবি, সে আবার কে? তাহার কথা ত শুনি নাই।"

সীতা বলিলেন—"আমি অনূঢ়া অবস্থায় এক পরিব্রাজকের মুখে শুনিয়াছি সুমালীর কন্যা নিকষার জ্যেষ্ঠপুত্র সহস্রবদন রাবণ, দশানন মধ্যমপুত্র। এই সহস্রবদন রাবণের ন্যায় ভীষণ রাক্ষস আর ত্রিভুবনে জন্মে নাই। সে দধিসমুদ্রের উত্তরে যে সমুদ্র—সেই সমুদ্রের পুষ্কর দ্বীপে বাস করে। সীতা তাহার বিক্রমের বর্ণনাচ্ছলে বলিলেন—

ইদানীং ত্রিদশান্ সর্বান্ গলে বদ্ধা সকিন্নরান্।
গন্ধর্বান দানবান্ ভীমান্নাগান্ বিদ্যাধরাংস্তথা॥
বালক্রীড়নয়া ক্রীড়েন্মেরুং মন্যতে সর্ষপম্।
গোষ্পদং মন্যতে চাব্ধিং সর্বান্ লোকান্ তৃণোপমান্॥

সীতার এই উক্তি শুনিয়া ঋষিগণ বিস্মিত হইলেন। রামচন্দ্রের পৌরুষ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যসামন্ত ও ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পকে আরোহণ করিয়া পুষ্কর দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতাদেবীও সঙ্গে গেলেন।

রামচন্দ্র সেখানে গিয়া বুঝিলেন—সীতার কথা সত্য এবং লঙ্কেশ্বর রাবণের চেয়ে এ রাবণ ঢের বেশি পরাক্রান্ত। যাহাই হউক রামচন্দ্রকে পুষ্পকে চড়িয়াই যুদ্ধ করিতে হইল, অবতরণ করিতে সাহস করিলেন না। এক সময়ে স্বয়ং বিষ্ণু এই রাবণে দমন করিতে আসিয়াছিলেন গরুড়ে চড়িয়া। রাবণ বামপাণির দ্বারা বিষ্ণুকে লবণ সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাবণের অস্ত্রে রামচন্দ্রের সৈন্য সামন্ত সমস্তই কোথায় অন্তর্হিত হইল, রাম তাহা বুঝিতেই পারিলেন না। রাবণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রের দ্বারা রামচন্দ্রকে আঘাত করিল। রামচন্দ্র সংজ্ঞা হারাইয়া পুষ্পকের উপর পতিত হইলেন। ত্রিভুবনে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। তখন সীতা ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া পুষ্পক হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মূর্তি হইল—

স্বরূপং প্রজহৌ দেবী মহাবিকটরূপিণী।
ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী চ চক্রভ্রমিতলোচনা॥
দীর্ঘজঙ্ঘা মহারাবা মুণ্ডমালাবিভূষণা।
অস্থিকিঙ্কিণিকা ভীমা ভীমবেগপরাক্রমা॥
খরস্বনা মহাঘোরা বিকৃতা বিবৃতাননা
লোলজিহ্বা জটাজুটৈর্মণ্ডিতা চণ্ডরোমিকা।
প্রলয়াম্ভোদকালাভা ঘণ্টাপাশবিধারিণী॥

অর্থাৎ শুম্ভনিশুম্ভ-বধে চণ্ডী যে মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন এ মূর্তি তাহাই। তাঁহার লোমকূপ হইতে সহস্র সহস্র মাতৃকাগণের আবির্ভাব হইল।

সীতা সহস্রবদন রাবণকে বধ করিলেন। ব্রহ্মার পাণিস্পর্শে রামচন্দ্রের চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি পুষ্পক হইতে দেখিলেন রণক্ষেত্রে মহাকালী মূর্তি রাক্ষসের মুণ্ডগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। রামচন্দ্র সেই মূর্তিকে স্তব করিতে লাগিলেন।

সীতা তখন নিজ মূর্তি ধরিয়া—রামচন্দ্রকে বলিলেন—"আর্যপুত্র, আমি এই মূর্তিতে মানসোত্তর শৈলে বাস করি। তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।"

রামচন্দ্র বলিলেন—"দেবি, তুমি যে ঐশ্বরিকরূপ

দেখাইলে সেরূপ যেন আমার হৃদয় হইতে অপগত না হয়। আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবর্গ রাবণের মায়াবশে অন্তর্হিত, তাহারা আবার আমার সঙ্গে মিলিত হউক।"

সীতা প্রসন্না হইয়া রামচন্দ্রকে বর প্রদান করিলে রামচন্দ্র সকলের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

অদ্ভুত রামায়ণে ইহাই উত্তরাকাণ্ড। বাল্মীকির রামায়ণে সীতার প্রতি অবিচার হইয়াছিল—রামচন্দ্র প্রজাভয়ে বিনা অপরাধে সীতাকে সাধারণ নারীর মত বনবাস দিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে (তদনুগত কৃত্তিবাসী রামায়ণে) লবকুশের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণসহ হতচেতন হইয়া পড়েন। সীতার কৃপায় তাঁহারা পুনর্জীবন লাভ করেন। এইভাবে সীতার প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে। তুলসীদাসের রামায়ণে আসল সীতার হরণই হয় নাই। ছায়া-সীতাই অপহৃতা হইয়াছিল। কাজেই ঐ রামায়ণে সীতার প্রতি অবিচারের প্রয়োজন হয় নাই—সীতার বনবাসও হয় নাই। অদ্ভুত রামায়ণে সীতার প্রতি অবিচারের চরম প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে। মূল আর্ষ রামায়ণে সীতা কৃপার পাত্রী, সাধারণ নারী মাত্র। অদ্ভুত রামায়ণে সীতার পরাক্রম রামচন্দ্রের চেয়ে শতগুণ অধিক। রামচন্দ্রই কৃপার পাত্র।

শ্রীকালহস্তীশ্বর

(ভ্রমণকাহিনী)

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দাক্ষিণাত্যে অসংখ্য তীর্থ। ভারতের প্রায় সব অঞ্চল থেকেই এ সব তীর্থ দর্শন করতে যাত্রীরা অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে প্রায়ই আসেন। এ অঞ্চলের হিন্দুদের একটি প্রধান অংশ শৈব-মতাবলম্বী, কাজেই সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বহু শিবমন্দির বর্তমান। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য খুব বেশী, যথা—(১) রামেশ্বরে শ্রীরামেশ্বর, (২) চিদম্বরমে শ্রীনটরাজ, (৩) কাঞ্চীতে শ্রীএকাম্বরনাথ বা একাম্রনাথ, (৪) মাদ্রাজ শহরে শ্রীকপালীশ্বর এবং (৫) কালহস্তীতে শ্রীকালহস্তীশ্বর।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত থেকে এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। পঞ্চভূতের কারণ হলেন পরমাত্মা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এদের মধ্যে পরমাত্মারই সত্তা। এই পঞ্চভূতের এক একটির প্রকাশকরূপে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি বিখ্যাত শিব মন্দির আছে। পূর্বোল্লিখিত কাঞ্চীর বিখ্যাত শিব-লিঙ্গ ক্ষিতির (মাটি) প্রতীক। ঐ শিবলিঙ্গ মাটি দিয়ে গড়া। সেজন্য কাঞ্চীতে শিবলিঙ্গের জল দিয়ে অভিষেক হয় না—বিল্বপত্র দিয়ে করা হয়। অপ্ (জল)এর প্রতীক হচ্ছেন ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীজম্বুকেশ্বর। ত্রিচিনাপল্লীতে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির বিশেষ বিখ্যাত হলেও শ্রীজম্বুকেশ্বরের মাহাত্ম্যও কম নয়। ছোট্ট গর্ভমন্দিরের মধ্যে গেলে দেখা যায় যে সেখানে মেজে থেকে সব সময় অল্প অল্প জল উঠছে। বছরের কয়েক মাসই ওখানকার ছোট শিবলিঙ্গ জলে নিমজ্জিত থাকেন। তেজের প্রতীক হচ্ছেন তিরুবন্নামালাই-য়ের জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ। পাহাড়ের পাদদেশে এই সুন্দর পুরাতন মন্দিরটি অবস্থিত। হাজার হাজার যাত্রী এই মন্দির দর্শনে যান। এই মন্দিরের এক পাশেই শ্রীরমণ মহর্ষি সাধন করে সিদ্ধিলাভ

করেছিলেন। মন্দির হতে আধ মাইলের মধ্যে তাঁর আশ্রম অবস্থিত। মহাভূত মরুতের (বায়ু) প্রতীক হলেন এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু শ্রীকালহস্তীশ্বর। ব্যোমের (আকাশ) প্রতীক রয়েছেন চিদম্বরমে। চিদম্বরমে শ্রীনটরাজের বিখ্যাত মন্দির। ভগবান যেন নিজ আনন্দেই ভরপুর হয়ে নৃত্য করছেন, আর সেই নৃত্যের ছন্দে সমগ্র বিশ্ব যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। শ্রীনটরাজের ডান পাশেই পর্দার অন্তরালে রয়েছে তাঁর মূর্তিহীন নিরাকার ভাবের প্রতীকস্বরূপ আকাশ বা শূন্যতা। মাঝে মাঝে পর্দা খুলে বৃন্দাবনে শ্রীবাঁকেবিহারীজীর মন্দিরের ন্যায় ভক্তদের ঝাঁকি দর্শন করানো হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার।" এই উক্তির সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় চিদম্বরমে শ্রীনটরাজের মন্দিরে। পাশাপাশি ভগবানের সাকার ও নিরাকার ভাবের এক অপূর্ব সমাবেশ। কোনও সাধককেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় না।

দাক্ষিণাত্যের প্রায় অধিকাংশ মন্দিরেরই দুইটি বা তিনটি প্রাকার বা পরিক্রমা আছে। সব মন্দিরেরই বাহিরের সীমানা উঁচু প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। কোনও কোনও মন্দিরে এই প্রাচীর প্রায় ১৪।১৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু। সব পরিক্রমা প্রদক্ষিণ করে গর্ভমন্দিরের দরজার সামনে পৌঁছুলে স্বাভাবিক আলো-বাতাসের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না। গর্ভমন্দিরের দরজার উপরের ও দুপাশের চৌকাঠের সঙ্গে বহু প্রদীপ লাগানো থাকে। এ ছাড়া এখানে সেখানে আশে পাশেও অনেক প্রদীপ। মন্দির খোলা থাকলে সব প্রদীপই জেলে দেওয়া হয়। এতগুলি প্রদীপ একসঙ্গে জ্বললে আলো খুব কম হয় না। যাত্রীরা যাতে দেবতাকে দেখতে পান সেজন্য পুরোহিতরা কর্পূর আরতির পরই আরতির রেকাবিটি দেবতার মুখের কাছে, মধ্যদেশে ও পাদপদ্মের কাছে ধরে রাখেন। তাতে বেশ দর্শন হয়। আবার কোনও কোনও স্থানে তেলের এক লম্বা প্রদীপ জালিয়েও দেবতাকে দর্শন করানো হয়। কালহস্তীশ্বরে শিবের স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ—বেশ বড়। অধিকাংশ অংশ কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। এখানে ভগবান যে বায়ুর প্রতীক তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় মন্দিরাভ্যন্তরে বহু জলন্ত প্রদীপের মধ্যে দুটি প্রধান প্রদীপের শিখা সব সময়ই দোদুল্যমান, অর্থাৎ নড়ছে (flickering), অথচ অন্য সব প্রদীপের শিখা একেবারে স্থির ও নিশ্চল। গর্ভ-মন্দিরে বায়ুর কোনও গতিবিধি নেই, কাজেই সেখানে প্রদীপের শিখাগুলি অচঞ্চল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দরজার দুদিকের দুটি প্রধান প্রদীপের শিখা যে কিভাবে সব সময় কাঁপছে তার ব্যাখ্যা করা কঠিন। মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে ঐ রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক বিশেষ চেষ্টা ও গবেষণা করেও কোনও কূলকিনারা পান নি।

কালহস্তীশ্বরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলব। শ্রীকালহস্তীশ্বরের নামানুসারে মন্দিরের পাশে ছোট শহরটির নামও কালহস্তী। অন্ধ্রপ্রদেশের চিতুর জেলায় কালহস্তী অবস্থিত। মাদ্রাজ শহর হ'তে তিরুপতি যাওয়ার পিচ দেওয়া বড় রাস্তা কালহস্তী শহরের মধ্যে দিয়েই গেছে। কাজেই মাদ্রাজ হ'তে মোটর বাসেও যাওয়া চলে, দূরত্ব ৬৫ মাইল। মাদ্রাজ হ'তে রেণেগুণ্টা জংশন হ'য়ে রেলেও যাওয়া যায়। কালহস্তী একটি রেলষ্টেশন। কালহস্তী হ'তে তিরুপতি ২৪ মাইল। শহরটি ছোট হলেও সুন্দর। শহরের একধারে উত্তরবাহিনী স্বর্ণমুখী নদীর উপর শ্রীকালহস্তীশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ না পাওয়া গেলেও মন্দির যে বহু পুরাতন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে তীর্থ-যাত্রাকালে অর্জুন এই স্থানে এসেছিলেন এবং শ্রীকালহস্তীশ্বরকে পূজা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত শিবপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণেও উল্লেখ আছে যে

কোনও কারণে ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ায় তিনি কৈলাস হ'তে শিবকে এখানে এনে স্থাপন ক'রে তপস্যা করেছিলেন, উদ্দেশ্য—হৃত সৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করা। ছোট্ট পাহাড়ের ওপর শিবলিঙ্গকে তিনি স্থাপন করেন এবং তদবধি ঐ পাহাড়ের নাম হয় দক্ষিণ কৈলাস গিরি। মন্দিরের একাংশে জ্ঞান-প্রস্থনম্বা নামে দেবীর মন্দিরও আছে। শ্রীশঙ্করাচার্য দেবীমন্দিরের সামনে শ্রীচক্র স্থাপন করে পূজা করেছিলেন এবং একটি স্ফটিক লিঙ্গও স্থাপনা করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত উহা বর্তমান।

এতদ্ব্যতীত আদি শঙ্করের আগমনের পূর্বে নায়ানার নামে কথিত ৬৩ জন বিখ্যাত প্রাচীন শৈব সাধুদের মধ্যে সম্বন্দর, আপ্পার, মাণিকভাস্কর ও সুন্দরমূর্তি এস্থানে আগমন করেছিলেন। শ্রীকাল-হস্তীশ্বরের উদ্দেশ্যে কতকগুলি স্তবস্তুতিও এঁরা লিখেছেন। খ্রীষ্টীয় নবম হ'তে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চোল ও পাণ্ড্য রাজাদের মধ্যে অনেকে এই তীর্থের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বহু মুদ্রা ব্যয়ে এর সংস্কার সাধন করেন। মন্দিরের চারদিকে চারটি বিরাট 'গোপুরম' অবস্থিত। প্রধান প্রবেশ-দ্বারের গোপুরমের উচ্চতা ১২০ ফুট। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার নবাব এই মন্দির আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করে বহু মূল্যবান মণিমুক্তাদি নিয়ে যান। ১৯১১ সালে নাটুকোট্টি চেট্টিয়াররা সাড়ে নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনরায় মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন।

মন্দিরের আশে পাশে এবং চার পাঁচ মাইলের মধ্যে অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত। কথিত আছে মহামুনি ভরদ্বাজ এবং মার্কণ্ডেয় এখানে তপস্যাদি করেছিলেন। মন্দিরের আধ মাইল দূরে তাঁরা যে স্থানে তপস্যা করেছিলেন সেখানে তাঁদের নামে ভরদ্বাজ তীর্থ ও মার্কণ্ডেয় তীর্থ রয়েছে। এ ছাড়া সরস্বতী তীর্থ, সূর্য পুষ্করিণী, চন্দ্র পুষ্করিণী, শুক তীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ প্রভৃতি অনেক তীর্থ রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত স্বর্ণমুখী নদীর মাহাত্ম্যও কম নয়। মহামুনি অগস্ত্য স্বর্ণমুখী নদীকে ঐ স্থানে এনেছিলেন এইরূপ বলা হয়। পুরাণে আছে দেবরাজ ইন্দ্র এই নদীতে অবগাহন ক'রে মহর্ষি গৌতমের শাপ হ'তে মুক্ত হয়েছিলেন। মন্দির হ'তে পাঁচ মাইল দূরে সহস্র লিঙ্গম তীর্থ অবস্থিত। একটি বৃহৎ প্রস্তর লিঙ্গে খোদাই করে এক হাজার ছোট ছোট লিঙ্গ নির্মিত হয়েছে। এখানে একটি জলপ্রপাতও আছে। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

শ্রীকালহস্তীশ্বরের নামমাহাত্ম্যের আলোচনা এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দুই ফুট উচ্চ বেদীর মধ্যস্থলে প্রায় তিন ফুট উঁচু প্রধান লিঙ্গ অবস্থিত। মনোযোগ সহকারে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে লিঙ্গটির আকৃতি হাতীর শুঁড়ের ন্যায়। দুপাশে হাতীর দাঁতের ন্যায় দুইটি ডাণ্ডা রয়েছে। নীচে একটি মাকড়সার চিত্র এবং উপরে পঞ্চফণাবিশিষ্ট সাপের মাথা দৃষ্ট হয়। ভগবানের নাম শ্রীকালহস্তীশ্বর। 'শ্রী' অর্থে মাকড়সা, 'কাল' অর্থে সর্প, এবং হস্তী। মাকড়সা, সর্প ও হস্তীরূপী তিন মহাভক্ত সেবককে ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে এস্থানে মুক্তি দিয়েছিলেন, সেজন্য তিনি শ্রীকাল-হস্তীশ্বর নামে সুপরিচিত। কিভাবে ওরা মুক্তি লাভে ধন্য হয়েছিল সে কথাই এখন বলব।

কথিত আছে সত্যযুগে যখন ছোট্ট পাহাড়টির উপরে ভগবান উন্মুক্ত অবস্থায় ছিলেন, তখন রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য একটি মাকড়সা লিঙ্গের কিছু উপরে এক ঘন জাল নির্মাণ করে। অন্যভাবে ভগবানের পূজা সেবা করবার তার পক্ষে সম্ভাবনা না থাকায় সে এই ভাবেই ভগবানের সেবা করতে থাকে। একটি হাতীও ভগবানের লিঙ্গমূর্তি দর্শনে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁর কোনও পূজা বা অভিষেক (স্নান) হচ্ছে না দেখে মনে ব্যথা পায়। শিবজীকে অভিষেক করানোর উদ্দেশ্যে সে নিকটস্থ স্বর্ণমুখী নদী হ'তে শুঁড়ে করে জল নিয়ে এসে লিঙ্গের উপর ঢালতে আরম্ভ করে। বিল্ববৃক্ষ হ'তে

কিছু শাখা ও পত্র সংগ্রহ করে সে লিঙ্গের অর্চনাও করে। এইভাবে কিছুদিন যায়, এমন সময়ে এক বিরাট সর্পও ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিস্তারিত ফণা দিয়ে লিঙ্গের আরতি করে। ভক্তের ভক্তিমেশানো পূজা ভগবান গ্রহণ করেন, কাজেই এদের পূজায় ভগবান খুব সন্তুষ্ট হন। ভগবান অন্যরূপে নিজেই কি বলেন নি, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ?" সর্প একদিন পূজা করতে এসে দেখে যে লিঙ্গের উপর জল ও পাতা রয়েছে ; এতে তার মনে হয় কেউ ভগবানের ক্ষতি করছে। সে খুব রেগে যায় এবং কে অনিষ্টকারী তা দেখবার জন্য নিজের লম্বা শরীর দিয়ে লিঙ্গকে জড়িয়ে অবস্থান করতে থাকে। যথাসময়ে হাতী এসে লিঙ্গের উপর তার, শুঁড় হ'তে জল ঢেলে ভগবানের অভিষেক করতে আরম্ভ করে। এতে সাপটি অত্যন্ত চটে যায় এবং অনিষ্টকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার শুঁড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শুঁড় হ'তে সাপটিকে বের করে ফেলার জন্য হাতী লিঙ্গের উপর শুঁড়টি আছড়াতে থাকে। ফলে উপরের মাকড়সাটি এবং সাপটি উভয়েই মারা যায় এবং হাতিটিও অসহ্য যন্ত্রণায় সেখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কৃপাময় ভগবান ওদের তিনজনকেই মুক্তি দেন এবং ওদের পার্থিব শরীরের মূর্তি নিজ শরীরে গ্রহণ করেন। যেহেতু শ্রী, কাল এবং হস্তীকে তিনি মুক্তি দেন সেইহেতু তিনি শ্রীকাল-হস্তীশ্বর নামে পরিচিত। ভগবান কৃপা করে এখানে দেখালেন যে ভক্তের জাতি বা জন্ম বিচার নেই। যে দেহেই যে জন্মই গ্রহণ করুক না কেন, ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সকলেই মুক্তির অধিকারী। তাঁর কাছে সব সমান। ভগবানের কিছুরই অভাব নেই। ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয়টি সম্পদ পূর্ণমাত্রায় তাঁতে বিরাজমান। কিন্তু তিনি একটি জিনিসের ভিখারী, সেটি হচ্ছে ভক্তের আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তি। ভগবানের প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শন করে তার সাত খুন মাপ। ভগবান তার জাতবিচার করেন না।

শ্রীকালহস্তীশ্বর একজনের ভক্তি পরীক্ষা করে-ছিলেন এবং তার প্রতি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হ'য়ে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিত মোক্ষপদ তাকে প্রদান করেন। ভক্তটির নাম ছিল কানাপ্পান। শ্রীশঙ্করা-চার্য তাঁর শিবানন্দলহরীতে কানাপ্পা নায়ানারের গুণগান করেছেন। শিবভক্তকে 'নায়ানার' বলা হয়। কানাপ্পান জাতিতে ব্যাধ। তার পূর্ব নাম ছিল তিনাপ্পা। একদিন শিকারের সন্ধানে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একটি সুন্দর শিবলিঙ্গ সে দেখতে পেল। আশ্চর্যের বিষয় লিঙ্গটির দুটি চোখ ছিল এবং তাঁকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। লিঙ্গটিকে দেখে তার মনে খুব ভক্তি হল। লিঙ্গের নিকটে গিয়ে সে চারিপাশ বেশ করে পরিষ্কার করল এবং নিকটস্থ নদী হতে জল এনে তাঁকে স্নান করিয়ে ধ্যান করতে বসল। হঠাৎ তিনাপ্পার মনে হ'ল— "ভগবানকে স্নান করালাম, কিন্তু কিছু ত খেতে দেওয়া হ'ল না। কিন্তু কি দেব ? ভাল জিনিস ত কিছুই নেই।" তার নজরে পড়ল যে সব পশুপক্ষী সে শিকার করেছে তাদের প্রতি। তার মধ্যে নিজে প্রথমে চেখে দেখে সব থেকে সুস্বাদু মাংস সে তার প্রিয় দেবতাকে নিবেদন করল। এই শিবলিঙ্গ আর কেহই নন— ইনিই শ্রীকালহস্তীশ্বর। এই ভাবে দিন যায়। তিনাপ্পার ভক্তি ও প্রেম দিন দিন বর্ধিত হ'তে থাকে। ইতিমধ্যে ভগবানের ইচ্ছা হ'ল তিনাপ্পার ভক্তি পরীক্ষা করবেন। একদিন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনাপ্পা দেখল যে ভগবানের এক চোখ দিয়ে জল পড়ছে এবং চোখটা ঝাপসা ঝাপসা দেখাচ্ছে। তার মনে হ'ল নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চোখটি নষ্ট করে দিয়েছে। প্রাণের দেবতাকে এই ভাবে কষ্ট পেতে দেখে তার মনও দুঃখে ভরে গেল এবং তৎক্ষণাৎ

তীরের সাহায্যে নিজের একটি চক্ষু তুলে নিয়ে ভগবানের বিনষ্ট চক্ষুটি সরিয়ে তার স্থানে বসিয়ে দিল। একটি চক্ষু যাওয়াতে তার কষ্ট তো মোটেই হ'ল না, উপরন্তু প্রাণপ্রিয় ভগবানের কিছু সেবা করতে পেরে তার মন এক অনাবিল আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। ভগবান তার ভক্তি দেখে খুশী হলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তখনও তাঁর পরীক্ষা শেষ হয় নি। এই ভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর—তিনাপ্পা আর একদিন দেখতে পেল যে ভগবানের অপর চক্ষুটিও পূর্বের ন্যায় হয়েছে। সে সঙ্কল্প করল তার বাকী চক্ষুটিও সে ভগবানকে দেবে। কিন্তু তার দুটি চক্ষু গেলে কিভাবে ভগবানের অঙ্গে ঠিক জায়গায় সে চক্ষুটি বসাবে? বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না করে ভগবানের শরীর হতে বিনষ্ট চক্ষুটি সে তুলে ফেলল এবং নিজের জুতাপরা পা ভগবানের শরীরে যেখানে চক্ষু বসাতে হবে সেখানে তুলে দিয়ে সেই জায়গাটি স্পর্শ ক'রে রইল। তারপর যেই তীর দিয়ে নিজের বাকী চক্ষুটি তুলতে যাবে এমন সময় ভগবান তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তাকে নিরস্ত করলেন। তার আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি দর্শনে শ্রীকালহস্তীশ্বর অত্যন্ত খুশী হ'য়ে তাকে মোক্ষপদ প্রদান করেন। সে তার পূর্বের চোখ ফিরে পেল। পাঁচ দিন সমাধিস্থ অবস্থায় থাকার পর তিনাপ্পা অমৃতত্ব লাভ করে। তখন হ'তে তিনাপ্পা ভক্ত কানাপ্পান নামে পরিচিত 'কান' মানে চোখ। গর্ভমন্দিরে প্রবেশের ঠিক পূর্বে বামদিকে করযোড়ে দণ্ডায়মান কানাপ্পা নায়ানারের মূর্তি এখনও বিদ্যমান।

ভগবান শ্রীকালহস্তীশ্বরের এইরূপ যোগবিভূতি ও আপামর সাধারণের প্রতি কৃপার অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ভক্তাধীন ভগবান শ্রীকালহস্তীশ্বর এখনও ভক্তিমান যাত্রী ও পূজারীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন। তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক্। কৃপা ক'রে তিনি আমাদেরও অন্তর ভক্তিতে পূর্ণ করুন এবং আমাদের মানবজীবন ধন্য হোক্।

নীলের গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্

বাঙলাদেশের নিভৃত পল্লীগ্রামগুলিতে আজও নাগরিক সভ্যতার প্রবল ঢেউ গিয়া লাগে নাই। সেখানে এখনও তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই। শান্ত, নিরুদ্বেগ জীবন-প্রবাহ সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী সমানে বহিয়া আসিতেছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসবে ঘটাছটার দিন আজও ফুরায় নাই। শহর-অঞ্চলে যতই দুর্ভিক্ষ মহামারী ঘটুক, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া চলুক, রোগের প্রাদুর্ভাব হোক্—সমগ্রভাবে গ্রামগুলিতে কোনদিনই তাহা তেমন-ভাবে সংক্রামিত হয় নাই।

তবে ইদানীং মহাযুদ্ধের ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব হইতে গ্রামবাসী সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। পূর্ববঙ্গের হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি টলিয়া উঠিয়াছে। যাই হোক্—তবু পালপার্বণে আজও সেভাবেই ঢাক বাজে, খোলের ধ্বনি দূর হইতে এখনও ভাসিয়া আসে।

পল্লীবাসীদের জীবন গণ্ডীবদ্ধ; বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অভাব। আবার অসংখ্য কাজের সঙ্গে অফুরন্ত অবসরও রহিয়াছে। অর্থের প্রাচুর্য না থাকিলেও সমবেত গ্রাম্য সমাজের আবেদন আছে, তাই উপলক্ষ্য জুটিলেই সেখানে উপভোগের আয়োজন হয়। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি গানের সঙ্গে সঙ্গে লোকের ধর্মতৃষ্ণা নিবারণের জন্য

আগমনী-বিজয়ার গান, মনসার ভাসান গান, নীলের গান, শিবের গাজনের গানেরও রচনা সারা বাংলা-দেশের গ্রামে গ্রামে আজও হইতেছে।

নিজেদের জীবনের সঙ্গে উপাস্যের জীবনের সামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া শিবের গম্ভীরা গান গ্রাম-বাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ!
তোমারে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ॥
খোল চন্দন-কাঠের কপাট, দেও দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম॥
শিবনাথ কি মহেশ॥

জল বন্দ, স্থল বন্দ, বন্দ শিবের কুড়্যা।
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ্র সূর্য যুড্যা॥
'কাউসেন দত্তে'র ব্যাটা 'নয়সেন দও'।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত॥
তাঁহার চরণে আমার দণ্ডবৎ।
শিবনাথ কি মহেশ॥

অন্যান্য গানের মতই নীলের গানেরও একটি বিশেষ সময় আছে। পশ্চিমবঙ্গের গাজন গানের আর পূর্ববঙ্গের নীলের গানের আবেদন ও রীতি সমগোত্রীয়। প্রতি বৎসর শরতের প্রথম রৌদ্র-কিরণে উদ্ভাসিত শিউলি ফুলে পথঢাকা গ্রামপথে মাঠে ঘাটে আপনা হইতেই যেমন পথিকের কণ্ঠে আগমনীর গান গুঞ্জরিয়া উঠে, শীতের শেষে বসন্তের মাঝামাঝি তেমনি হঠাৎ একদিন ধনধান্যপূর্ণ গৃহে গৃহে দেহমনে উৎফুল্ল ভক্ত গৃহবাসীর দল শিবের কথা ব্যগ্র হইয়া স্মরণ করে। শিব তো হইলেন চাষী গৃহস্থেরই দেবতা, তাহাদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার অচ্ছেদ্য যোগ আছে—

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কার্পাস॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল গৃহস্থপাড়া।
গৃহস্থপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া॥

শুধু তাই নয়—

কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত॥
হর সমুদ্র হরের জল, ক্ষীর সমুদ্রের পানি।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী॥
শিবনাথ কি মহেশ॥

শিব তো চিরকাঙাল, ভোলানাথ; সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গলের দিকে তো তাঁহার দৃষ্টি নাই। তাঁহার ভক্তদেরই কর্তব্য তাঁহাকে গৃহবাসী করা, তাঁহার সুখসুবিধার সুব্যবস্থা করা। এতদিন আগ্রহ থাকিলেও তাহাদের অবসর ছিল না, ভাণ্ডারে অন্ন ছিল না, দেহে স্বাস্থ্য, মনে আনন্দ ছিল না, আজ বসুন্ধরার কৃপায় তাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ, নববসন্তের পবনে আজ তাহাদের দেহমনের ক্লান্তি বিদূরিত হইয়াছে। আজ তাই সবাই মিলিয়া এই অনাদৃত গৃহদেবতাটিকে সংসারী করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি তো আত্মভোলা ক্ষ্যাপা, তাঁহার চাল-চুলো নাই, হুঁশ খেয়াল নাই, কবে মন হইলে হয়ত আবার তিনি গৃহস্থকে পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে গিয়া আশ্রয় লইবেন। তাই অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাঁহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে চিরকালের তরে ঘরে বাঁধিবার আয়োজন হয়। গৃহস্থদের প্রতিনিধি হইয়া নারদ মুনি তাঁহার বিবাহের ঘটকালি শুরু করেন। পূর্ববঙ্গে নীলের এই শ্রেণীর গানের নাম 'পাট গোঁসাইয়ের বিয়ের গান।'

—শুন সবে মন দিয়ে হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হবে অধিবাস।
নারদ করে আনাগোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
শুন শিবের বিয়ার ইতিহাস॥

রাজসভায় বড়ো বড়ো কবিরা শিবের রাজকীয় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত বিবাহের বহু বর্ণনা দিয়াছেন।

পল্লীকবিরা তাঁহাদের অনাড়ম্বর ভাষাতে তাহার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া বাজিল ঢোলতগর কাঁড়া
সানাই শঙ্খ বাজে শত শত।
সেতার চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত ॥
সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা পাকে।
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মারে কারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে ॥

বাঙলা সাহিত্যের সেই আদিযুগ হইতেই শিব গৃহস্থের করুণাপ্রার্থী হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন। রমাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আদি গ্রন্থ, তাহাতে মহাদেব গৃহস্থের অতি অন্তরঙ্গরূপেই অঙ্কিত হইয়াছেন। চাষীভক্ত তাঁহার অন্নকষ্টে চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে চাষ করিতে উপদেশ দিতেছে—

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হত্র গোসাঞি কখন উপবাস ॥
ঘরে ধান্য থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাওব ॥

রামেশ্বর চক্রবর্তীও তাঁহার শিবায়নে শিবের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে কৃষিকার্য করিবার পরামর্শ দিয়াছেন—

চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক বর্তুক পরিজন ॥
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লঙ্কার বাণিজ্য বসি বাকুড়ির কোণে ॥
পরিজন পোষে চাষী শুধে সাধু রাজা।
লক্ষ্মী পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা ॥

শিব এই ভাবেই চিরকাল চাষী গৃহস্থের উপাস্য হইয়া রহিয়াছেন। চাষীদের এই বাৎসরিক আনন্দের সময়ে তাই তো তাঁহার কথাই সর্বপ্রথম উদয় হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যে গ্রামের সকল নরনারীর হৃদয়ের যোগ আছে। সেখানে তাঁহার অন্য নাম ভক্তদের আর মনে পড়ে না, ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা-প্রয়াসে একদিন তিনি নিজের কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি নীলকণ্ঠ। নিরানন্দ, নিষ্প্রাণ গ্রামবাসিগণের দুঃখ শোক হরণ করিয়া নবান্নের আসরে তিনি বৎসরান্তে আশাভরসার আশ্বাস আনিয়া দেন, তাই তো তাঁহারই পূজা, তাঁহারই গান।

গৃহবধূরা কুমারীবেলায় একদিন শিবপূজা করিয়াছে, তাঁহার ন্যায় গুণবান্ সদানন্দকে পতি-রূপে কামনা করিয়াছে, আজ নিজের গৃহস্থালীতে বসিয়া তাহারা কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হয় নাই। আজ যখন তাহাদের গোলা নবীন ধানে পূর্ণ, ঢেঁকির অবিরাম পাড় পড়িতেছে, পিঠাপায়েসের সুগন্ধে গৃহের বাতাস সুরভিত, অন্য পাঁচজন প্রিয়জন পরিজনের সঙ্গে স্বতই গৃহদেবতার কথাও স্মরণে আসে।

তাঁহার পূজার আয়োজন হয়, ফুল তুলিবার ধুম পড়ে শুভ্র পুষ্পই তো সদাশিবের সর্বাপেক্ষা যোগ্য উপহার—

হেমন্ত বসন্তকালে বিকশিত ডালে ডালে হে,
ওকি ভাইরে—হরের মালঞ্চে নানা ফুল।
দূর্বা তুলি আঁটি আঁটি ফুলেতে ভরিল সাজি হে,
ও কি ভাইরে,—হরের মালঞ্চে নানা ফুল ॥
অশোক অপরাজিতা, সুবর্ণ মাধবীলতা হে,
ওকি ভাইরে—হরের মালঞ্চে নানা ফুল।
পৃথিবীতে পুষ্প যত তাহা বা কহিব কত হে,
স্থলপদ্ম দেখিতে সুন্দর ॥
ফুলেতে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি হে,
কিয়ারে মনে লয় আসিও আরবার।
প্রাণ কাশীনাথ, মনে প্রাণ ভোলানাথ, মনে
মনে লয় আসিও আরবার ॥

ইহা ছাড়া, নীলের গানে গৌরীর শাঁখা পরানোর গান এবং তাঁহাদের সাংসারিক কলহ-বিবাদের কথা

আছে। সেগুলিতে কবিত্ব না থাকিলেও দরিদ্র গৃহস্থ সংসারের একটি সুন্দর চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। শিব দুর্গার নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করিতেছেন, ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের নিদর্শন—

দুর্গে আমি জানি তোমার গুণের কথা
　আমি খাই ভাঙ ধুতুরা, তুমি খাও দুর্গে রুধি।
(ঐ) অসুর বধিতে ডাকিনী সঙ্গেতে
　যখন গেলে দুর্গে তুমি।
তখন তোমারে হেরিয়ে দেবকুল যত
　ভয়েতে অস্থির হইল।
(তখন) তোমারে রুখিতে এ বক্ষ পাতিয়ে
　শয়ন করিলাম আমি॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী

(মহাকবি বাণভট্টের চিত্রণে)

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মহাকবি বাণভট্ট কাদম্বরীর প্রারম্ভাংশে চণ্ডাল-কন্যার বর্ণনায় তুলনাক্রমে বলছেন—"অচিরমৃদিত-মহিষাসুররুধির-রক্তচরণামিব কাত্যায়নীম্"[১] অর্থাৎ চণ্ডালকন্যাকে দেখে যেন মনে হলো সে কাত্যায়নী, যে কাত্যায়নীর চরণ সদ্যোবিনাশিত মহিষের রক্তে রক্তাক্ত হয়ে আছে। মহাকবি বাণভট্ট তাঁর চণ্ডী-শতক নামক গ্রন্থে শ্রীশ্রীদেবীর এই মূর্তিটিরই অপূর্ব মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

কবির বর্ণনায় এই বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যদিও ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেববৃন্দ সমরাঙ্গণে প্রথমে উপনীত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নতৎপর হয়েছিলেন। ৬৬নং শ্লোকে কবি বলছেন—

বিদ্রাণে রুদ্রবৃন্দে সবিতরি তরলে বজ্রিণি ধ্বস্তবজ্রে
জাতাশঙ্কে শশাঙ্কে বিরমতি মরুতি ত্যক্তবৈরে
　কুবেরে।
বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিতাস্ত্রে মহিষমতিরুষং পৌরুষোপঘ্ননিঘ্নং
নির্বিঘ্নং নিঘ্নতী বঃ শময়তু দুরিতং ভূরিভাবা
　ভবানী॥

অর্থাৎ যখন মহিষাসুরের ভয়ে রুদ্রগণ পলায়ন করলো, সবিতা কম্পমান, ইন্দ্র হলেন বজ্রচ্যুত, চন্দ্র ভয়গ্রস্ত, পবনদেব নিরুদ্ধগতি, কুবের সাহসহীন, নারায়ণের অস্ত্র (চক্র) কুণ্ঠিত, তখন ভূরিভাবা ভবানী নির্বিঘ্নে মহিষাসুরকে হত্যা করলেন।[২]

৪২নং শ্লোকে কবি বলেছেন যে যখন অগ্নি, চন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য পরাভূত হলো,[৩] মহিষাসুর ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু টুকরো টুকরো করে উপড়ে দিল,[৪] তখন দেবী বাম পাদপদ্মের খণ্ড-চন্দ্রাকৃতি নখরসমূহ দ্বারা মহিষের নিধন সাধন করলেন। দেবীর সহচরী জয়া[৫] ও বিজয়া[৬] তো দেবতাদের এ নিয়ে কতই না উপহাস করেছেন। দেবীর মহিষাসুর-বিজয়ের

১। পিটার্সনের সংস্করণ, বোম্বে, ১৮৮৯, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪১।

২। এই কবিতাটি পরবর্তী বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ১৪২ ; হরিকবির সুভাষিত হারাবলী ; সদুক্তি কর্ণামৃত, ১।২৫।৫ ; সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, ২।২৯৫। এই শেষোক্ত গ্রন্থে এই শ্লোকটি 'বেণিকা'র উদাহরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। "আ বাক্যসমাপ্তেঃ বর্ণানুপ্রাসনির্বাহো বেণিকা"—অর্থাৎ বাক্য-পরিসমাপ্তি পর্যন্ত বর্ণানুপ্রাস চলতে থাকে, তখন সেই বর্ণানু-প্রাসকে 'বেণিকা' বলা হয়।

৩। দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ স্থানের ভিন্নাবস্থ সূর্য ; ময়ূরের সূর্যশতক ৯০ এবং ৯০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪। ৭৩ শ্লোকে বলা হয়েছে যে শুধু নারায়ণের চক্র নয়, এমনকি শিবের বাণও ব্যর্থ হল।

৫। শ্লোক ১৫, ১৯, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৬৯, ৮৬, এবং ৮৯।

৬। শ্লোক ১২ ও ২১।

পরে দেবতারা স্ব স্ব অস্ত্র ফিরে পেয়ে আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন। মহাকবি বলছেন—

বজ্রং মজ্জো মরুত্বানরি হরিরুরসঃ শূলমীশঃ শিরস্তো দণ্ডং তুণ্ডাৎ কৃতান্তস্ত্বরিতগতি গদামস্থিতোহর্থাধিনাথঃ।

প্রাপন্যৎপাদপিষ্টে দ্বিষি মহিষবপুষ্যুজ্জলগ্নানি ভূয়োহপ্যায়ুংষীবায়ুধানি দ্যুবসতয় ইতি স্তাদুমা সা,

শ্রিয়ে বঃ॥ ৩৬

অর্থাৎ উমা যখন তাঁহার পায়ের দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করলেন, স্বর্গের অধিবাসিগণ মহিষাসুরের দেহে বিদ্ধ অস্ত্রসমূহ ফিরে পেলেন, নিজের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলেন। মহিষের মজ্জা থেকে ইন্দ্র ফিরে পেলেন বজ্র, হরি ফিরে পেলেন মহিষের বক্ষ থেকে তাঁর চক্র, শিব তার মস্তক থেকে শূল, কৃতান্ত তার মুখ থেকে দণ্ড এবং কুবের তার অস্থি থেকে ত্বরিতগতি গদা ফিরে পেলেন।

ফলতঃ এই সব অস্ত্র মহিষাসুরের গায়ে কোনও রেখাপাত করতে পারছিল না। মহিষাসুর বিভিন্ন দেবতার সংবোধন করে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তোমাদের এ অস্ত্রগুলি কি? হে শিব! তোমার শূল কি তুলো? বিষ্ণো! তোমার চক্র কি আমার কেশটাকে পর্যন্ত বাঁকাতে পারলো না? হে ইন্দ্র! তোমার বজ্র কি আকাশপ্রান্ত রক্ষণে সমর্থ নয়? জলধীশ্বর বরুণ! তোমার পাশরাশি কি মৃণাল-তন্তু? অগ্নে! তুমি কি জ্বলতে পার না আরো ভাল করে?—

শূলং তূলং নু গাঢ়ং প্রহর হর হৃষীকেশ কেশোহপি বক্রশ্চক্রেণাকারি কিং মে পবিরবতি নহি স্বাষ্ট্রশক্রো

দ্যুরাষ্ট্রম্।

পাশাঃ কেশাম্বুনালাম্বনল ন লভসে ভাতুমিত্যাত্তদর্পং জল্পন্ দেবান্দিবৌকোরিপুরবধি যয়া সাহস্ত শাস্ত্যৈ

শিবা বঃ॥ ২৩

এই মহাযোদ্ধা মহিষাসুর দেবীর পায়ে আঘাত দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, সে আঘাতকে দেবী কুশাঙ্কুরবেধের থেকেও তুচ্ছতর বলে মনে করেছিলেন।[৭] দেবীর কোনও অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিশ্বাস ছিল না; খড়্গ, বাণ, দণ্ড বিভিন্ন বুদ্ধিতে তিনি উপেক্ষা করলেন এবং পায়ের গোড়ালির আঘাতেই মহিষাসুরকে নিহত করলেন।[৮] মহিষাসুরের সকল দেবতার শৌর্য-বীর্য-সম্বন্ধে নীচ ধারণা থাকলেও দেবীর বিষয়ে তার উচ্চ ধারণা ছিল।[৯] একটি শ্লোকে[১০] মহাকবি বাণভট্ট খুব সুন্দর করে দেখিয়েছেন দেবী যুদ্ধের প্রথম দিকে মহিষাসুরের অত্যাচারের ফলে জগতের অন্তসময় ভেবে তিনি কালীরূপ ধারণ করেছিলেন; পরে মহিষাসুর যুদ্ধের সময় তাঁর পাদযুগল শৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টন করার চেষ্টা করলে তিনি ক্রোধে আরক্ত হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করলেন। কিন্তু যখন মহিষাসুর প্রাণ ত্যাগ করে তাঁর পায়ের তলায় নিপতিত হলো,[১১] তখন তিনি তাঁর স্বাভাবিক গৌরীরূপ ধারণ করেছিলেন। এ তিন বর্ণ মহাদেবের চক্ষুর বর্ণের বিভিন্ন অনুবর্তন মাত্র।[১২]

বাণভট্টের মাতৃচিত্রে একটি রূপ অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে—সেটি হচ্ছে জননীর অতি কোমল মন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তিনি দেবতাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥[১৩]

অর্থাৎ পুত্রগণ। তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ

৭। শ্লোক ৭।

৮। শ্লোক ২০।

৯। শ্লোক ৮।

১০। ৪১ নং শ্লোক।

১১। একস্থানে (শ্লোক ১৭) মহাকবি বাণভট্ট বলেছেন মহিষাসুরের যুদ্ধের সময় বিন্ধ্যাচল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে বিধ্বস্ত অসুরকে একখণ্ড ইন্দ্রনীলমণির মতই দেখাচ্ছিল। (লেভে লোলেন্দ্রনীলোপলশকলতুলাম্)।

১২। গৌরী বঃ পাতু পত্যুঃ প্রতিনয়নমিবাবিকৃতাত্মোস্তরূপা।

১৩। ১১, ৫৫।

নাই—জননী আমি—পুত্রের বিপদে স্থির থাকতে পারবো না—যখনি যখনি প্রয়োজন হয়, আমি তোমাদের বিপদে উপস্থিত হব, দানবদের পরাভূত ক'রে তোমাদের সুখ অক্ষুণ্ণ রাখবো। তিনি মাতৃ-হৃদয় নিয়ে স্থির থাকতে পারেন না—আসেন; মহিষাসুরকে নিধনের সময়েও তাঁকে স্বয়ং অবতীর্ণ হতে হয়েছিল[১৪]। তা' বলে তিনি কারো প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না—তাঁর শত্রুরাও তাঁকে যেন পর ভাবতে পারে না।

একটি জিনিস বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। সেটি হচ্ছে—বাণভট্টের কবিদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীজননী চিরনূপুরপরিহিতা। যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যেও জননীর রাজীবচরণ নূপুরবিবর্জিত হয়নি। ষষ্ঠ কবিতায় মহাকবি বলছেন যে মহিষ তার শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা রণিত মণিনূপুরমণ্ডলীকে শব্দায়িত করেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রেও রুনুঝুনুধ্বনির বিরতি ঘটেনি। ত্রয়োদশ শ্লোকেও এ কথার প্রতিধ্বনি করে কবি বলেছেন—'বাচালং নূপুরং নো জগদজনি জয়ং শংসং'—তাঁর বিজয় ঘোষণা করে পায়ের নূপুর কেবল রুনুঝুনু ধ্বনি করেনি, নিখিল জগৎও তাতে মুখর হয়ে উঠেছিল। ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে নূপুরবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এক অখণ্ড সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন—নূপুর-বিমণ্ডিত দেবীর শ্রীপাদ যখন তাঁর সিংহের কেশরমণ্ডিত স্কন্ধে শ্রমাপনোদনাবসরে বিন্যস্ত হলো মুহূর্তের জন্য, কেসরবিমণ্ডিত ভ্রমর-গুঞ্জনমুখর পদ্মের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য অনুভূত হলো না—তাঁর ধরণীরক্ষা-প্রণালীর এমন অপূর্ব মহিমা—

"বিশ্রান্ত্যৈ পাতু যুষ্মান্ ক্ষণমুপরিধৃতং কেশরিস্কন্ধভিত্তে-
বিভ্রদ্বৎকেসবালীমলিমুখররণন্নূপুরং পাদপদ্মম্ ॥৪৩

এ প্রসঙ্গে টীকাকার কয্যট বলেছেন—"পদ্মে হি কেসরৈর্ভ্রমরৈশ্চ ভাব্যম্"। সিংহের কেশর ও পদ্মের কেসরে অপূর্ব মিলন ঘটেছে। মহাকবির চিত্তমুকুরে জননীর রণন্নূপুর চরণ এমন সুনির্মলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল যে ঠিক পরবর্তী চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকেও এই চিত্রের পুনরবতারণা করেছেন এবং বলেছেন দেবীর পাদ—

"শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গাগ্রকোণক্বণিতমণিতুলাকোটিহুংকারগর্ভ"

অর্থাৎ মহিষ তার শৃঙ্গাগ্রদ্বারা দেবীর চরণ বেষ্টন করেছিল বলে শ্রীচরণের নূপুর নিরন্তর ঝঙ্কৃত হচ্ছিল।

এভাবে কবির ভক্তিবিনোদিত প্রেমময় মানস নিরন্তর পরিভ্রমণ করেছে শ্রীশ্রীজননীর এমনি একটি চিরপবিত্র চিরকোমল মাতৃহৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে। যুদ্ধের ভয়াবহ ঝঞ্চনা তাঁর শ্রুতিগোচর হচ্ছে না, তা নয়—[১৫] তন্মধ্যেও তিনি ভাবছেন—শ্রীশ্রীজননীর হৃদয়ে পশুমারণ দারুণ কর্ম সংসাধন সময়েও একটি চিন্তা নিশ্চয়ই আছে যে তাঁর ত্রিপুরবধকর্তা

১৪। মহাভারতের একস্থানে (৩।২২৯—২৩১) আছে দেবাসুর-সংগ্রামে কার্তিকেয় সেনাপতিরূপে বৃত হয়েছিলেন এবং তিনিই তাঁর "শক্তি" অস্ত্র প্রয়োগ করে মহিষের মস্তক ভূপাতিত করেন। মহাভারতের অন্যত্র (৯।৪৪—৪৬, বিশেষতঃ ৯।৪৬।৭৪—৭৫) আছে যে কার্তিকেয় এক যুদ্ধে তারক, মহিষ, ত্রিপীড় এবং প্রদোষের নামক অসুরকে হত্যা করেছিলেন। তবে মহাভারতেও (৪।৬।১৫) জননীকে "মহিষাসুরমর্দিনী" বলা হয়েছে; মহাভারত ৬।২৩।৮এ উক্ত "মহিষাসৃকপ্রিয়ে" পদের দ্বারা জননীকেই বোঝায়। হরিবংশে দেবীকে "মহিষাসুরঘাতিনী" (২।১০৬।১১), 'মহিষাসুরার্দিনী' (২।১২০।৪৩) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের মধ্যম-চরিতে (অধ্যায় ২—৪) মহিষাসুরবধ বিশদতমভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে মহিষাসুরের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধের বর্ণনা আছে; অন্যান্য পুরাণে (যেথা, বামনপুরাণ অধ্যায় ১৯—২১) চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের পরে মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ হয়—এই বলা হয়েছে; কিন্তু "শ্রীশ্রীচণ্ডী" গ্রন্থে চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের পরে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ হয়। অন্যান্য পুরাণে যুদ্ধস্থল বিন্ধ্যাচল; কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে হিমাচল।

১৫। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিতা জননী যে ঘোর হুঙ্কার দিলেন, তাতে সমগ্র ভুবন ক্ষুব্ধ হলো, বসুধা হলো চঞ্চলা, সকল পর্বত যেন প্রচলনশীল হলো—

চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ ২।৩৪ ॥

ত্রিলোকীর ভর্তা কর্তা ত্র্যম্বক ত্রিনয়নেই তো তাঁকে এ অবস্থায় দেখছেন, সত্যি কি নারীজনোচিত কাযে ব্যাপৃতা হয়েছেন তিনি এ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা হয়ে? এই সকল কথা ভেবে তিনি ব্যাজচ্ছলে যেন দক্ষিণ চরণের চরণাঙ্গুষ্ঠকোণের পেষণ দ্বারাই (সত্যই বাম চরণের দ্বারা) মহিষের বধ সাধন করেছিলেন—

"ভর্তা কর্তা ত্রিলোক্যাস্ত্রিপুরবধকৃতী পশ্যতি ত্র্যক্ষ এষ ক স্ত্রী কার্য্যোধনেচ্ছা ন তু সদৃশমিদং প্রস্তুতং কিং ময়েতি।

মত্বা সব্যাজসব্যেতরচরণচলাঙ্গুষ্ঠকোণাভিমৃষ্টং সদ্যো যা লজ্জিতেবাসুরপতিমবধীৎ পার্বতী পাতু সা বঃ॥" ৪৭

পার্বতী মহিষাসুরকে যেন লজ্জাসহকারেই বধ করেছিলেন, বাম চরণে সত্যি মেরেছিলেন[১৬] তবু মনে হচ্ছিল যেন তিনি দক্ষিণ পাদই প্রস্তুত করেছেন।

অন্য একটি শ্লোকে (৫৩) জননীর কোমল হৃদয় কি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। যে জননীর বদনমণ্ডল সংস্রায়ুধপাতেও বক্রভাব ধারণ করেনি, মহিষের মস্তকোদ্ভূত রক্তধারা দেখে জননী দয়ার উদ্রেকে বদনমণ্ডল আকুঞ্চন করলেন। হৃদয়ের শত্রুভাব তো তিনি পোষণ করেননি—তাই চিরদয়াময়ী দয়া থেকে কাকেও বঞ্চিত করতে পারেন না—

চক্রে চক্রস্য ন্যস্ত্যা ন চ খলু পরশোর্নক্ষুরপ্রস্য নাসে-র্যদ্বক্রং কৈতবাবিষ্কৃতমহিষতনৌ বিদ্বিষত্যাজি ভাজি। প্রোতাৎ প্রাসেন মূর্ধ্নঃ সৃগণমভিমুখারাতয়া কালরাত্র্যা কল্যাণাস্তাননাব্জং সৃজতু তদসৃজো ধারয়া বক্রিতং বঃ॥ ৫৩॥

অর্থাৎ মহিষের চক্র, কুঠার, বাণ অথবা খড়্গ যুদ্ধসময়ে কালরাত্রি বা জননীর বদনকে কিছুতেই বক্র করতে পারলো না; কিন্তু প্রোতাঘাতে বা কুন্তের আঘাতে যখন ধারাকারে মহিষের মস্তক থেকে রুধির নির্গত হতে লাগলো, তখন তাঁর বদনপদ্ম বক্রিমভাব ধারণ করলো। অন্যত্রও (৪০) মহাকবি বলেছেন যে মহিষাসুর চিরনিদ্রা প্রাপ্ত হলে দেবী সমস্ত রোষ পরিহার করে স্বকীয় মধুর স্বভাব ফিরে পেলেন[১৭]। মহাকবি এও বলেছেন[১৮] যে যাঁকে ভৃগু, অত্রি প্রমুখ মুনিগণ ভক্তিভরে বন্দনা করেন অথচ যিনি সর্বগর্ববিরহিতা, তিনি সকলের প্রভূত উপকার সাধন করলেন মহিষাসুরের বধ সাধন করে; কিন্তু তিনি নিজের পাদপ্রহারে জর্জরিত মৃত অসুরের গাত্র থেকে বিগলিত বজ্র, কুন্ত, পাশ ও ত্রিশূলধারী দেববৃন্দকে এবং নিজের হস্তসমূহকে অবস্তু বলে গণনা করলেন—অর্থাৎ সংহার ও প্রহার বিহারকুশলা নারীর কায নয়।

সংহারে জননীর যতই বিতৃষ্ণা হোক, কর্তব্যনিষ্ঠার খাতিরে যে গুরুভার তিনি বহন করে সার্থকনামা হয়েছিলেন, তজ্জন্য তাঁর পিতা হিমালয়, মাতা মেনা, পুত্রদ্বয় এবং স্বামীর আর আনন্দের সীমা রইলো না।

পিতা হিমালয়, ধীর-স্থির, অচল-অটল, কিন্তু পুত্রীর বিজয়সংবাদে পাগলের মত ছুটে এলেন; মহিষাসুরকে বিন্ধ্যাচল ভেবে তাকে সগোত্র বলে আলিঙ্গন করলেন; শ্রীশ্রীজননীর দশনমণ্ডলী থেকে বিচ্ছুরিত কিরণজালে মহিষাসুরও প্রোজ্জ্বল হয়ে গেল—ফলে হিমাচল আরো প্রশস্তিলাভ করলো। হিমালয়ের আজ আর আনন্দের অবধি নেই[১৯]।

জননী মেনা ছুটে এসে কন্যার গৌরবে সমুৎফুল্লা হয়ে করলেন তাঁর মস্তকচুম্বন, তাঁর জামাতা মহা-

১৬। দশক শ্লোকের দক্ষিণ পাদোল্লেখের মীমাংসাও এ ভাবেই করতে হবে। ৪২, ৭৪, ৭৫, ৮২, ৮৯, ৯৪ এবং ১০১ শ্লোকে বামচরণের দ্বারা মহিষাসুর-বধের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

১৭। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে চণ্ডীশতকের এই শ্লোকটি চিত্রবর্ণানুপ্রাসের উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত হয়েছে।

১৮। ৩৪ শ্লোক।

১৯। ৫৮ শ্লোক—শ্রুত্বা শত্রুং দুহিত্রা নিহতং, ইত্যাদি

দেবের সম্মুখেই ; শিব তো নিজে পরাস্ত হয়েছিলেন, কাজেই, শ্বশ্রূর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেনা সঙ্গে করে আদরের দৌহিত্র ষড়ানন বা কার্তিককে হাতে ধরে নিয়ে এসেছিলেন—কার্তিকের তাঁর পেছনের দিকে ছিলেন[২০]।—

নন্দীশোৎসার্যমাণাপস্থিতিসম নমস্কারিলোকং সুবত্যা
নপ্তুর্হস্তেন হস্তং তদনুগতগতেঃ যপ্ত্রু খশ্রাবলম্ব্য।
জামাতুর্মাতৃমধ্যোপগমপরিহৃতে দর্শনে শর্ম দিশ্যা-
ন্দেবীযচ্ছ্যমানা মহিষবধমহে মেনয়া মূর্ধ্ন্যমা বঃ॥৬৩॥

যুদ্ধের সময় গণেশের দাঁত একটি মহিষ শৃঙ্গ দিয়ে উপড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁর মনঃকষ্টের অবধি ছিল না। আজ জননীর বিজয়োৎসব-ক্ষণে মহিষের জননীর শ্বেতদন্তচ্ছটায় শ্বেতায়মান মহিষাসুরের শৃঙ্গদ্বয় ছুঁড়ে দিলেন কার্তিক গণেশের দিকে। বললেন—তোমার একটি দাঁত তো গেছে, এই নাও—মহিষের শৃঙ্গ দুটো, যা জননীর দন্তচ্ছটায় শ্বেতবর্ণে রূপান্বিত[২১] ; একটার জায়গায় দুটা দাঁত ফিরিয়ে দিলাম তোমাকে। দুঃখের কি আছে আজ।—

ভূষাং ভূয়স্তবাদ্য দ্বিগুণতরমহং দাতুমেবৈষ লগ্নো
ভগ্নে দৈত্যেন দর্পান্ মহিষিতবপুষা কিং বিষাণে
বিষণ্ণঃ।
ইত্যুক্ত্বা পাতু মাতুর্মহিষবধমহে কুঞ্জরেন্দ্রাননস্য
স্কন্দস্যাস্যে গুহো বঃ স্মিতসিতরুচিনী দেবিণো দ্বে
বিষাণে॥ ১৭॥

নারীর জীবনের সর্বস্ব তাঁর পতি—সুখে দুখে যিনি সম্পূর্ণ সমবয়—সমস্ত আনন্দ-আহ্লাদ এবং নিরানন্দ দুঃখভোগের যিনি একক অংশীদার। পত্নীর বিজয়গৌরবে পতির হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—মহাকবি বলছেন—

শ্রুত্বৈতৎ কর্ম ভাবাদনিভৃতরভসং স্থাণুনাভ্যেত্য দূরা-
চ্ছ্লিষ্টা বাহুপ্রসারং শ্বসিতভরচলত্তারকা ধুতহস্তা।
দৈত্যে গীর্বাণশত্রৌ ভুবনসুখমুষি প্রেষিতে প্রেতকাষ্ঠাং
গৌরী বোঽব্যাদ্মিলৎসু ত্রিদিবিষু তমলং লজ্জয়া
বারয়ন্তী[২২]।

মহাদেব নিজে পরাজিত হয়েছিলেন অসুরের হস্তে ; তার বিক্রম স্বভাবতই তাঁর জানা। আজ এ প্রচণ্ডবিক্রম মহিষাসুরকে যিনি পরাভূত করে ত্রিভুবনবিজয়িনী হয়েছেন, তিনি তাঁর জয়াবিজয়াসহচরী আপন গৃহিণী। কাজেই বন্যার স্রোতোধারে হৃদয়ে তাঁর ডেকেছে আনন্দের বান—দূর থেকে ছুটে এসে সমস্ত দেবতাদের সম্মুখেই দেবাদিদেব তাঁকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। ভীষণ লজ্জায় দেবী তাঁকে বাধা দিলেন আলিঙ্গনে। শিব স্থানান্তরে (১৪ নং শ্লোক) বলছেন—"দানবদল পলায়নতৎপর ; তুমি মহিষ নিধন করেছ বলে আমি আজ তোমাকে 'মহিষী'[২৩] বলে সংবোধন করছি না[২৪] ; নারীজনোত্তর শক্তির অধিকারিণী বলে আমি তোমাকে নারীরূপে সংবোধনও করতে পারছি না।" এভাবে কাত্যায়নীর সঙ্গে তিনি কৌতুক করতে লাগলেন।

দেবাদিদেব মহাদেবীকে আদর করে আরো বলছেন—

ভদ্রে! স্থাণুস্তবাঙ্‌ঘ্রিঃ ক্ষতমহিষরণব্যাজকণ্ডূতিরেষ
ত্রৈলোক্যক্ষেমদাতা ভুবনভয়হরঃ শংকরোঽহতো
হরোঽপি।
দেবানাং নাম্নিকে ত্বদ্‌গুণকৃতবচনোঽহতো মহাদেব এষ
কেলাবেবং স্মরারির্হসতি রিপুবধে যাং শিবা
পাতু সা বঃ॥ ৮৮॥

অর্থাৎ আজ থেকে আমি আর স্থাণু নই, স্থাণু তোমার অঙ্‌ঘ্রি—যে বৃক্ষকাণ্ডে এসে মহিষ তার রণকণ্ডূতি করেছে নিবারণ[২৫], তোমার অঙ্‌ঘ্রি ত্রৈলোক্যের

২০। ৬৩ শ্লোক।

২১। ৬৮ এবং ৫০ নং শ্লোকেও মহিষের দেবীদন্তচ্ছটায় শ্বেতবর্ণে রূপান্বিত শৃঙ্গদ্বয়ের উল্লেখ আছে।

২২। শ্লোক ৮৭।

২৩। মহিষী—স্ত্রী মহিষ, পট্টরাণী।

২৪। টীকাকার বলছেন মহিষী মহিষের থেকে দুর্বলা। শিবমহিষী মহিষ বধ করেছে ; তাঁকে মহিষী বলা যায় না।

২৫। চুলকানি হ'লে গাছের কাণ্ডে গিয়ে দেহঘর্ষণ মহিষের জাতিধর্ম।

ক্ষেমদাতা, তাই আজ থেকে সেই শঙ্কর; ভুবনভয় সে হরণ করেছে, তাই সেই আজ থেকে শঙ্কর; হে দেবগণনায়িকে, তোমার অঙ্ঘ্রি তোমার মাহাত্ম্যানুযায়ী কার্য সম্পাদন করেছে—কাজেই আজ থেকে সেই মহাদেব। স্মরারি দেবাদিদেব এই সব বলে দেবীকে কতই না আদর করতে লাগলেন।

এভাবে মহাকবি স্বল্পসংখ্যক—মাত্র ১০২টি শ্লোকে দেবীর এক অপূর্ব কমনীয়, নমনীয়, মহনীয় প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেছেন। শত শত বৎসর পূর্বের এ অতুলনীয় চিত্র আমাদের ভাবোন্মত্ত করে তোলে। কিন্তু এক ক্ষেত্রে যেন তিনি মহাদেবীর প্রতি সুবিচার করেননি। মনে হয়—তাঁর নিজের জীবনের দুর্বলতা তাঁর লেখনীতুলিকাকে একটু বিপথে পরিচালিত করেছিল।[২৬] দেবাদিদেব ভোলানাথ শিব যখন তখন দেবীর চরণে পতিত হবেন[২৭]—দেবীর সম্মুখে একদিন "সন্ধ্যা"র নাম করেছিলেন বলে তিনি তাঁকে পাদতাড়না করেছিলেন (৭৪ শ্লোক), আর শিব পায়ে পড়েছেন—এ চিত্র সুখকর নয়, সহৃদয়হৃদয়গ্রাহ্যও নয়, দেবীরও নিশ্চয় এতে আনন্দ হবার নয়। জননীকে বড় করতে গিয়ে মহাকবি বিশ্বপতিকে গুণে একেবারে খর্ব করে দিয়েছেন, এটিও শোভন নয়। ১০১নং শ্লোকে কবি বলেছেন—

স্রস্তাঙ্গঃ সন্নচেষ্টো ভয়হতবচনঃ সন্নদোর্দণ্ডশাখঃ
স্থাণুর্দৃষ্ট্বা যমাজৌ ক্ষণমিহ সরুষং স্থাণুরেবোপজাতঃ।
তস্য ধ্বংসাৎ সুরারের্মহিষিতবপুষো লব্ধমানাবকাশঃ
পার্বত্যা বামপাদঃ শময়তু দুরিতং দারুণং বঃ সদৈব॥ ১০১॥

অর্থাৎ—যুদ্ধে রুষ্ট মহিষাসুরকে ক্ষণকাল দেখে মহাদেবের অঙ্গ শিথিল হলো। সমস্ত চেষ্টা লোপ পেল, ভয়ে বাক্ রুদ্ধ হলো, তাঁর বাহুশাখা নুইয়ে গেল; কিন্তু সেই মহিষাসুরকে বাম পায়ে বধ করায় দেবীর মান গেল বেড়ে।

দুই হাজার বৎসরের পূর্ববর্তিনী প্রাকৃতভাষায় ভারতীয় নারী মাধবী বলেছিলেন—

নূমেন্তি জে পহুত্তং কুবি অং দাসা ব্ব জে পসাঅন্তি।
তে ব্বিঅ মহিলাণং পিআ সেসা সামি ব্বিঅ
অরা আ॥[২৮]

অর্থাৎ "যে স্বামিগণ প্রভুত্বের ভাব মনে পোষণ করেন না, ক্রোধান্বিতা হলে পত্নীকে দাসের মত প্রসন্ন করার চেষ্টা করেন, তাঁরাই মহিলাদের প্রিয়, অন্য সকলে হতভাগ্য।"

কিন্তু এই প্রাকৃতভাষার নারীকবির বিংশ-শতাব্দীর নারী-ভাষ্যকার ইংরেজী ভাষায় ভাববিশ্লেষণ পূর্বক স্বকীয় মত ব্যক্ত করতে গিয়ে এ মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।[২৯] প্যানপ্যানে পায়েপড়া স্বামীকে কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না নারী ভালবাসতে পারেন না। শ্রীশ্রীজগজ্জননী যদি মহিষাসুরকে বধ করতে পারেন, তাঁর হৃদয়নাথ নিশ্চয় তাঁরি সঙ্গে তুলনীয় বা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হবেন—এই দেবীর হৃদয়াভিলাষ। কবির উক্তিতে এই সত্যের অপলাপ ঘটেছে। ফলতঃ পুরাণে বা অন্য কোনও স্থলে শিবের চরিত্রে এ দুর্বলতা ফুটে উঠেনি।

২৬। বাণভট্ট নিজেই বলেছেন যে হর্ষবর্ধন তাঁকে "ভুজঙ্গম" নামে অভিহিত করেছিলেন। পত্নী তাঁর অত্যন্ত সুন্দরী, কিন্তু ভীষণ "মাথার চড়া" রমণী ছিলেন—ক্রোধান্ধ হয়ে নিজের পিতাকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ার জন্য শাপ দিয়েছিলেন। পিতা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ময়ূরভট্টের অপরাধ—তিনি তাঁর স্বামী কবি বাণভট্টের পক্ষ নিয়ে স্বামীকে পদাঘাত করবার জন্য কন্যাকে তিরস্কার করেছিলেন।

২৭। ৭৪, ৭৫, ইত্যাদি। ৭৬নং শ্লোকে শিব দেবীর নিকট ভিন্ন প্রিয়ার নামোচ্চারণ করছেন। ৪৯ শ্লোকে বলা হয়েছে যে কামদেবকে নিধন করার জন্য শিব জননীর চরণতলে নিপতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

২৮। গোপায়ন্তি যে প্রভুত্বং কুপিতাং দাসা ইব যে
প্রসাদয়ন্তি।
ত এব মহিলানাং প্রিয়াঃ শেষাঃ স্বামিন এব বরাকাঃ॥

২৯। Sanskrit and Prakrit Poetess, Vol. I, 2nd ed., Introduction P. LXXIV-LXXV.

বাণভট্টের দেবীচরিত্র অতি অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত, তা হলেও এ রচনা বিষয়বস্তুর গুরুত্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ পরিহাসচপল হয়ে উঠেছে। কবির ভাষায় গৌড়ীরীতির অন্তর্গত রচনা যমকাদি অলঙ্কার-বহুল, তা হলেও এগ্রন্থে একটি ভক্তির স্বচ্ছ উচ্ছ্বাস আছে। যে যুগে উত্তর ভারতে সম্রাটের রাজত্ব-সময়ে—তাঁরি সভাকবিগণ সৌরদের সূর্য-শতক, শাক্তদের চণ্ডীশতক এবং জৈনদের ভক্তামর-স্তোত্র লিখেন এবং সম্রাট্ নিজে ছিলেন বৌদ্ধ—সে যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবির এ রচনা চমকপ্রদ ও সম্রাটের সহনীয়তার পরিচায়ক। তাঁর গ্রন্থের মধ্যমণি দেব চরিত্র যুগযুগান্তরের অভ্রংলেহি গ্রন্থ-সৌধশ্রেণীর শীর্ষমণিরূপে বিরাজ করবে, সন্দেহ নাই।

আমি যে গ্রামে আছি

শ্রীনীরদবরণ বসু

আজ আমি গ্রামের কথা লিখতে বসেছি। গ্রাম ও তার শিক্ষার কথা। এ কথায় স্মৃতির জীবন-প্রশ্ন নিহিত।

শিক্ষার কথা বলতে গেলেই পরিবেশ, অভিভাবক, শিক্ষার স্বরূপ ও ব্যবস্থা, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিতে হয়। অনেক কথাই এসে পড়ে। কিন্তু তা এখানে সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে আজ শুধু পরিবেশ, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকের প্রসঙ্গ আলোচনা করব। বর্তমানে যে গ্রামে বসে লিখছি, এই গ্রামের কথাই বলতে চাই। এতে বলা ও বোঝার সুবিধা।

এই গ্রামে মাত্র একজনের পুষ্পপ্রীতি আছে। কিন্তু এখন তাঁর বাগান শ্রীহীন। সামান্য সঙ্গীত-চর্চা বহুদিন আগে ছিল, এখন তার গল্প অল্পমাত্রায় আছে। পাঠাগার নেই। খবরের কাগজের গ্রাহক নেই। পত্রিকার প্রবেশ বলতে একজন 'ভূদানযজ্ঞ' নেন।

গ্রামটি গোয়ালা-প্রধান। প্রত্যহ কলকাতায় ছানা পাঠায়। খবরাখবর ও ভাবধারা বড়বাজার থেকেই আনে। বলিষ্ঠ বারোয়ারী নেই। সক্রিয় সঙ্ঘ নেই। খেলার মাঠ নেই। খেলাও নেই বলা যায়। সংহত তরুণ নেই। সন্ধ্যার শাঁখ বাজে না। আরতি হয় না। মন্দিরের সে কাঁসর-ঘণ্টা যেন ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পালপার্বণ-তিথিচক্রের নিয়মে আসে। সে উচ্ছল আনন্দ, সকলকে কাছে টেনে মনের খুশীতে অভিষিক্ত করার সে উদ্দাম চাঞ্চল্য আর জাগে না। উৎসব যেন উপদ্রব। রামায়ণ-মহাভারত, কথকতা, কবিগান প্রভৃতি গল্পকথা হয়ে গেছে। একটি যাত্রার সখের দল হয়েছে। মহড়ায় লোক জমে না। সংগঠনী মনোভাব ও অর্থের একান্ত অভাব।

গ্রামে দুজন ম্যাট্রিকুলেট। তাঁরাই তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত। একজন পাস করেছিলেন ১৯৪৩এ। অপরজন ১৯৫৪তে। নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই বেশী। সাক্ষর তালিকাভুক্ত লোকদের অধিকাংশের লেখাপড়া পাঠশালা পর্যন্ত। (বর্ণপরিচয়) দ্বিতীয় ভাগের বানান মুখস্থ করা ও ধারাপাতের ডাক (মানসাঙ্ক) শেখাই এ-গ্রামের বহুকষ্টার্জিত শিক্ষা-সম্পর্কিত ধারণা। আর শিক্ষক হল শাসন-যন্ত্র। "আমার ছেলেটাকে বেশ দুচার ঘা ক'রে দেবেন মাষ্টার মশাই, নইলে কিছু হবে না।" এ হ'ল মাষ্টারের প্রতি অযাচিত উপদেশ। এবং শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতাও এই।

লেখাপড়াই শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকরি।

মাতব্বর শ্রেণী বলেন, লেখাপড়া শিখেই কী হবে, গরমেণ্ট চাকরি দেবে? এ-উক্তি ইস্কুল উপদেষ্টা সমিতির সম্পাদকেরও। ছেলেদের পড়াশুনার দিকে নজর দেবার কারো সময় নেই। শক্তির কথা তো ওঠেই না। ছেলেরা পড়তে বসল, সেইখানেই গল্পের আসর বসল। অন্তমনস্ক ছেলের প্রতি উপদেশ হ'ল, আমরা যাই করি না, তোরা তোদের কাজ করবি তো। খাতার কাগজ ফুরিয়ে গেলে তা জোটাতে ছেলেকে রীতিমত সাধনা করতে হয়। কোন বই ছিঁড়ে গেলে কি দরকার হলে, বছর ঘুরে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে একটা দু-আনা দামের লেড্-পেনসিল পূজার কাপড়ের মত। আর রাত্রে পড়ার জন্তে যা হারিকেন, তাতে অনেক ক্ষেত্রে আলো অপেক্ষা অন্ধকারটাই বেশী হয় দেখেছি। এসব হ'ল গ্রামের উচ্চ বিত্তদের বাড়ীর খবর। আর কার্যতঃ উচ্চবিত্তরাই গ্রাম।

গ্রামের পরিবেশ রচনায় গোয়ালার পরেই বাগ্দী ও বাউরীর স্থান। সাঁওতালও আছে, কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যেই থাকে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কুমোর, কামার, ব্রাহ্মণ। মজুর-শ্রেণীভুক্ত লোক, গরীব লোকই বেশী। গোটা গ্রাম যেন একখানা অভাবের ছবি। প্রধান অভাব শিক্ষার। স্ব স্ব বৃত্তিতে লজ্জা ও গ্লানিবোধ দেখা দিয়েছে। হবেই তো। গ্রাম তো আর দেশছাড়া নয়।

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—

বড় ভাল লাগে আমার পাড়াগাঁয়ে বাস,
কতই সুখে সেথায় লোকে কাটায় বারোমাস।

সেদিন এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়েছে। দেখে মনে হয় গ্রামে যেন প্রাণ নেই। আত্ম-কেন্দ্রিকতা, অসহিষ্ণুতা, অপরিচ্ছন্নতা, ঈর্ষা প্রভৃতি ক্রমবর্ধমান। যেন নতুন এক নীলকর সাহেবদের আমল চলছে। হুকুম জারি হয়েছে—কাঞ্চন-কৌলিন্ত প্রতিষ্ঠিত করো। তোমার ছেলেকে আমার অফিসের পিওন করে পাঠাও। নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ!

গ্রাম ক্রমেই সরকার মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছে। (না হয়ে উপায়ই বা কী?) পাড়ার রাস্তায় দু-ঝুড়ি মাটি দেওয়া ছেড়ে দরখাস্তে চার-ঝুড়ি কাঁদুনি ঢালতে সে এখন প্রস্তুত বলা যায়। এখন গ্রাম্য মাতব্বরী, কাউকে জরিমানা ও জব্বার্থে বিচার প্রভৃতি দু-একটি কাজ ছাড়া, সন্তান-পালন, পোষ্য-পোষণ, সামাজিক কাজকারবার, অল্প খাটুনিতে অধিক অর্থাগমের সুব্যবস্থা প্রভৃতি সরকার করে দিলে ভাল হয়।

গ্রাম আজ দিশেহারা। হঠাৎ তার ঘুমচোখে অত্যুজ্জ্বল আলো লেগেছে। সুখ ও জীবনের চরিতার্থতা সব জন্মেছে কলকাতায়। গ্রামের উচ্চচিত্তদের দিকে চেয়ে কবির কথা মনে পড়ে—

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।

গ্রাম তার ঘরে কলকাতা আমদানী করতে শুরু করেছে। গ্রাম-সাধনার দ্বারা কলকাতা!

গ্রামজীবন আজ অসুস্থ। অসহায়, বিপর্যস্ত। আত্মকেন্দ্রিকতা ও কাঞ্চনকৌলিন্তে ক্লান্ত। অথচ নেশাতুর। এ আত্মক্ষয়কারী অসুখের কবল থেকে গ্রাম মুক্তি চায়। কিন্তু এ-চাওয়া এত ক্ষীণ যে, নিজের কণ্ঠস্বর সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে না।

শহরমুখী সভ্যতার মাইক না থামলে কি আর শুনতে পাবে?

একটি গ্রামের জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে আমি যা বললাম দু' একটি বিষয় ছাড়া অধিকাংশই অধিকাংশ গ্রাম সম্পর্কে খাটে। এই হ'ল দেশের শিক্ষার পরিবেশ।

এই হচ্ছে শিক্ষার স্বরূপ ও ব্যবস্থাপ্রসঙ্গ।

এই পরিবেশে বেসিক ইস্কুল হয়েছে। মহাত্মাজীর ধ্যানলোকের যে শ্রেণীশোষণহীন গ্রামরাষ্ট্র, তার বাসিন্দা তৈরীর পীঠস্থান এই বেসিক ইস্কুল। অবশ্য এটা আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা ফটো। যাই হোক, আজকের দিনে গ্রাম্য শিক্ষার কথায় 'নঈ তালিম' বা বুনিয়াদী শিক্ষার এই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রসঙ্গই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু এ গ্রামে নয়, এখানে এক স্বল্লায়ন এলাকা জুড়ে এক ও দু-মাইল ব্যবধানে সাতটি বেসিক ইস্কুল হয়েছে। পুরানো প্রাইমারী ইস্কুল, স্পেশাল কেডারের প্রাইমারী ইস্কুলও আশেপাশে বিদ্যমান। দু প্রান্তে দুটি হাই ইস্কুল; আর এক প্রান্তে একটি ক্রমবর্ধমানশ্রেণী হাই ইস্কুল। দুটি হাই ইস্কুলের সংলগ্ন দুটি বেসিক ইস্কুল। একটি হাই ইস্কুলের মধ্যেই। কার্যতঃ সাতটিকেই হাই ইস্কুলের আওতায় বলা যায়।

সাধারণতঃ পুরানো প্রাইমারী ইস্কুলগুলিকেই বেসিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পুরানো ঘর পরিত্যক্ত হয়ে নতুন পাকা বাড়ী উঠেছে। পুরানো শিক্ষক বর্জিত হ'য়ে নতুন শিক্ষক গৃহীত হয়েছে। ছ-টি ইস্কুলে চারজন করে শিক্ষক থাকার ঘর আছে। কৃষিকাজের জন্য প্রায় বিঘা চারেক হিসাবে কোথাও জমি, কোথাও পতিত জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা আছে।

এখন প্রশ্ন, বেসিক ইস্কুল কেমন হয়েছে বা চলছে? বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে হয়, পুরানো নিত্যকর্মপদ্ধতিটা শিক্ষাবোর্ড বোর্ডবাঁধাই করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ, সেই তথ্য ও নীতিকথা এবং ইম্পরট্যাণ্ট পিসেস মুখস্থ করানো 'কলেছঁটা' বিদ্যে, পাসের চাপ, 'মাষ্টারের কটু গালির মসলামিশানো বেত', সেই ঘণ্টাবাজানো রুটিনেবাঁধা শ্রান্তিকর দিনগত পাপক্ষয় পাঠ-ব্যবসায়-প্রথা, ছেলের থেকে ছেলের পাঠ্য-বইএর ওজনে আধিক্য—সবই আছে। বরং চাপ ও ফাঁকি এবং অশান্তি খানিক বেড়েছে।

বেসিক ইস্কুলে কী হয়?

বেসিক ইস্কুল কাজের ইস্কুল। সাফাই, কাতাই, কৃষি, সহযোগী হাতের কাজ প্রভৃতি কিছু কিছু করানো হয়। 'কিশলয়ে' তো অনেকেই 'নতুন ইস্কুল' দেখেছেন। সে ইস্কুলে শিক্ষককে ছাত্রেরা 'দাদা' বলে। এখানে ওটা এখনও চালু হয়নি। এইরকম দু একটা বিষয় বাদ দিয়ে এখানকার বেসিক ইস্কুলের ধারণা গড়ে নিলেই চলবে।

যাঁরা দেশের ছেলেমেয়েদের 'ভাবী সুমঙ্গল' বলে ধারণা করেন, তাদের দেহেমনে সুস্থ ও শুদ্ধ হ'য়ে গড়ে ওঠার শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকে বেসিক ইস্কুলকে দেখতে বা বুঝতে চান, তাঁদের আমি এইটুকু বলতে পারি—বেসিক ইস্কুল একপ্রকার ইস্কুল বিশেষ। অপর কিছু নয়।

শিক্ষার কথায় শিক্ষকের প্রসঙ্গই মনে হয় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ছেলেদের জীবনগঠন ব্যাপারে মায়ের পরেই শিক্ষাগুরুর স্থান।

সে-শিক্ষাগুরুর দিন গেছে। এখন যাঁরা ইস্কুলে কাজ করেন, তাঁরা মাষ্টার। ডাকনাম গ্রাম্য প্রাইমারী ইস্কুলে 'মাষ্ সাই'; শহরে ও হাই ইস্কুলে 'স্যার'।

আমি গ্রাম্য প্রাইমারী শিক্ষকদের কথাই লিখছি। বেসিক ইস্কুলের শিক্ষরাও এ পর্যায়ভুক্ত।

অনেকেই বলেন শিক্ষকরা কিছু করেন না। এবং তাঁদের এ অবহেলা এ ফাঁকি ইচ্ছাকৃত। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ছাত্রেরা ভাল হোক, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যথাযথ আয়ত্ত করুক—এ তাঁরা চান। স্বপ্ন-সাধ তাঁদেরও থাকে। সুকুমার ভাববৃত্তি তাঁদেরও আছে।

তাহলে তাঁদের দোষ কি কিছু নেই? হ্যাঁ

আছে। তাঁরা এদেশের শিক্ষক হয়েছেন, এইটেই তাঁদের একমাত্র দোষ।

প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষকেরা অসহায়। তাঁদের জীবন সমস্যা-নাগপাশে জর্জরিত। দৈন্যে দীর্ণ—অভাবে অক্ষম। অজ্ঞ, বিকারশীল অভিভাবকদের আবেষ্টনীতে শিশুদের অবস্থা যেমন, আজকের এই অফিসার-অধ্যুষিত রাজনৈতিক সমাজে শিক্ষকদের অবস্থাও তদ্রূপ। শিক্ষক যেন মিলের শ্রমিক, আর সমাজের বাকী সবাই মিল-মালিক। 'অবহেলিত' শব্দটিতে আর কতটুকু বোঝায়! শিক্ষকেরা আজ ক্রীতদাসী রাবেয়া, অতীতের আন্দামান-নির্বাসিত কয়েদী, কারবালা-প্রান্তরে হাসান।

তাঁদের সঙ্গে শিক্ষাবিভাগীয় কর্মকর্তাদের চোর-পুলিশ সম্পর্ক। তাঁদের আশেপাশের আলো হাওয়া ব্যতিরেকে বাকী সবাই 'কীল মারবার গোসাই'। চিত্তের যোগ, বোধের যোগ, দরদ ও মমতার একটুকু পরশ, একটুকু আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা—এসব তাঁদের জন্য নয়! অন্নের সঙ্গে এগুলিও তাঁদের ত্যাগের তালিকাভুক্ত!! বক্তৃতা ও সাময়িক পত্রিকার রচনার উপজীব্য হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোন প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা নেই।

ছোট ছেলেদের শেখানোই সবচেয়ে কঠিন। অজ্ঞ, বিবিধকুসংস্কারাচ্ছন্ন, কূপমণ্ডুক ও সভ্যতার সঙ্কটাধার, অসংযমী অভিভাবকদের সন্তানেরাই ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাঠ্য বই আর মাষ্টার মশাই ছাড়া ন্যায়, নীতি, শৃঙ্খলা, পরার্থপরতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতির কথা শোনানোর লোক তাদের অনেকের ভাগেই জুটছে না। তা, সেই সব পরিবেশ-প্রতীকগুলিকে একাগ্র করা, শিক্ষানুরাগী করা, শিক্ষিত করা কি সহজ? একটা শিক্ষা সংস্কৃতিসম্পন্ন বাড়ীর ছেলেকে শেখানোই গ্যালভ্যানোমিটার ব্যবহার করা অপেক্ষাও কঠিন। এই কঠিনতম কাজের ভার ন্যস্ত আছে কাদের উপর?

কতটুকু পুঁজি তাঁদের—কতটুকু সংগ্রামশক্তি?

গাঁয়ের বামুনদের হারা। কোনমতে অষ্টম শ্রেণীতে উঠতেই মাথায় চার চালের ভার পড়ল। প্রাইমারী ট্রেণিং নিয়ে একটা ইস্কুলের চেয়ারে বসে সে হল হারা-মাষ্টার। এক বছর ধরে অনেক বিজ্ঞান-কথা সে শুনল। ধর গেল তার বিজ্ঞান-প্রীতিও জন্মাল। কিন্তু তারপর? তার মানসিক মান উন্নয়নের, তার বাস্তব সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার কেউ কোথাও আছে কি? ক্লান্তি আসা তো স্বাভাবিক। কিন্তু তা অপনোদন ও নতুন করে প্রেরণা সঞ্চারণের কোন ব্যবস্থা আছে কি? সর্বোপরি দেহযাত্রা নির্বাহ করাই তো দারুণ-কষ্টকর।

ক্ষুধাক্লিষ্ট, পারিবারিক অশান্তি জর্জরিত, আপন ভার বহনে অক্ষম (বিদ্যা ও অর্থ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই) হারা-মাষ্টার। তিনি 'গরমেণ্টের' লোক। তাঁর কাঞ্চনকৌলিন্য নেই, কোনদিকে কোন মর্যাদা দেই। কে শুনবে তাঁর কথা? গ্রামে তিনি তো 'গেঁয়ো যোগী'।

তারপর ট্রেণিং। প্রথম কথা এক বছরের একটা ট্রেণিং দিয়ে দিলেই শিক্ষক তৈরী হয়না। ট্রেণিং আংশিক সহায়ক মাত্র। কিন্তু তা এত ত্রুটিপূর্ণ যে, হিতে বিপরীত ঘটছে। যে ট্রেণিংএ পাস করে বেরিয়ে এল, সে ভাবলো—আর আমায় পায় কে। আর ট্রেণিং সম্পর্কে প্রবচন প্রচলিত হয়েছে যে, ও যে যায়, সেই-ই পাস করে।

বেসিক ট্রেণিং এর একটা কথা বলি। ছাত্রদের শিশু-পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কখন ও কোথায় করবে? ঠিক হ'ল, পূজার ছুটিতে ও বাড়ীতে। এবং পূজার ছুটির দু এক দিন আগে শিশু-পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে দুটো বক্তৃতা পরিবেশিত হয়ে গেল। পূজার ছুটির পর সবাই শিশু-পর্যবেক্ষণের খাতা দাখিল করল। এর অনুকূলে যে যুক্তিই থাকনা কেন, 'অন্নবিদ্যা ভয়ঙ্করী'কে হটানো যায়নি।

বেসিক শিক্ষকেরা কয়েকটা মনোবিজ্ঞানের নোট পড়ে এসে সবাই মনোবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে।

ট্রেণিংএ ভাল কিছু নেই, এ আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু একবছরে এত বেশী 'ভাল'র এমন বিপুল পরিমাণ ভাল নয়। তাছাড়া গলদ অনেক। শিক্ষকরাই বলছেন, 'আমাদের ট্রেণিংটা কাজের কিছু হয়নি'।

তারপর দু-রকম প্রাইমারী ট্রেণিং। প্রাইমারী ও বেসিক। এতে শিক্ষকদের মধ্যে বেশ একটা কুলীন মৌলিক শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এর কুফলও ফলছে।

যেদিন থেকে শিক্ষাদান ব্যবসায়ে পরিবর্তিত হতে শুরু হয়েছে, সেই দিন থেকেই—শিক্ষায় গলদ প্রবিষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। আচার্যের আসন তখনই টলেছে। 'মানুষে'র রাজ্য 'পদ্ধতি'র হাতে যেতে বসেছে। কিন্তু আমরা শিখি মানুষের কাছে, পদ্ধতির কাছে নয়। ট্রেণিং সেণ্টার পদ্ধতির গঞ্জ।

আগেকার আচার্যেরা ছিলেন শিক্ষাব্রতী। এখনকার মাষ্টারেরা হলেন শিক্ষা-অফিসার। আচার্যেরা শুধু শিক্ষা নিয়েই থাকতেন। এখন মাষ্টারেরা বহু-বিদ্। কেউ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দালাল, কেউ ডাক্তার, কেউ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, কেউ পোষ্টম্যান্ বা পোষ্টমাষ্টার. কেউ রাজনৈতিক কর্মী, কেউ চাষী। পাইকারি-হারে টুইশানি, সাইড বিজিনেস প্রভৃতি তো আছেই। এবং যাঁরা অর্থোপার্জনের দ্বিতীয় কোন পন্থা পাননি, তাঁরা জগতের হালচাল ও নিজের অযোগ্যতা দেখে স্তম্ভিত, বিমূঢ়, ক্রমক্ষীয়মান। এইতো আমাদের দেশের শিক্ষকের কথা। এঁদের কাছ থেকে আমরা কী আশা করতে পারি? মানুষ না তোতাপাখী?

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষা

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, এম্-এস্‌সি, বি-এল্

(এক)

জ্ঞান মার্গ শ্রেষ্ঠ পথ বলে কেহ কেহ
'কখনো না, ছি ছি' বলি ভক্তের সন্দেহ।
যোগী বলে, যেই জন মনোনাশ করে
সেই যে ভিতরে দেখে সবদাই তাঁরে।
কেহ লক্ষ কোটি নাম শুধু জপে হায়
দিন নাই রাত নাই মালাটি ঘোরায়।
কর্মী বলে, 'নাহি বুঝি এই সব কথা
নিষ্কাম কাজেতে পাব তাঁহার বারতা।'
বাঁকা সরু অন্ধকার নর্দমার পথে
বীরাচারী চায় তাঁর গৃহেতে ঢুকিতে।
'কার পেটে কিবা সয়' মা শুধু জানেন
ভাল মাছ ঝাল ঝোল পৃথক বাটেন।
নিজের যাহাতে রুচি সেইটাই ধরো
মাকে শুধু মনে রেখো বাঁচো কিংবা মরো।

(দুই)

রাজপাশে ভাগবত পণ্ডিত প্রত্যহ
শুনান কত না শাস্ত্র ঘুচাতে সন্দেহ।
"বুঝেছ ত?" পণ্ডিতের ছিল মুদ্রাদোষ
ভক্তি-মুক্তি-মায়াতত্ত্ব, তত্ত্ব পঞ্চকোষ
ব্যাখ্যাকালে "বুঝেছ ত?" ব্রাহ্মণ বলেন
"তুমি আগে বোঝো" বলি রাজা সম্ভাষেন।
একদিন প্রতিবেশী আনে সমাচার
এক বস্ত্রে সে ব্রাহ্মণ ছেড়েছে সংসার।
মুখে সদা হরিনাম ঢুলু ঢুলু আঁখি
সর্বাঙ্গে বিমল জ্যোতি, বলেছেন ডাকি—
"ভাই, তুমি একবার গিয়া রাজদ্বারে
'এতদিনে বুঝিয়াছি' কহিও রাজারে।"

সমালোচনা

শ্রীবচনভূষণ—শ্রীলোকাচারী স্বামী প্রণীত (শ্রীবরবরমুনিকৃত ব্যাখ্যা সহ); অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস; প্রকাশক—শ্রীহয়গ্রীব রামানুজদাস, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা—৬৭৬; মূল্য আট টাকা মাত্র।

বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট শ্রীবচনভূষণ মহাগ্রন্থখানি অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থগুলির সংখ্যা অতি বিপুল এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতের প্রাচুর্যও কম নয়; তাই কোন একটি বিশেষ মতের সমর্থনসূচক সাধনপ্রণালী সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার এবং অধিকারভেদে উচ্চ অধিকারী হইতে নিম্ন অধিকারী পর্যন্ত সকলের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য উপদিষ্ট অপার শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য অবধারণ করাও সাধারণের পক্ষে অতীব দুষ্কর। সারতম নিরবয়ব বস্তুর আলোচনাসমৃদ্ধ বেদান্তশাস্ত্র দুর্গম বলিয়া বেদেরই অর্থবিস্তারক রামায়ণ মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থে সাধারণের জন্য সুগম তত্ত্বের উপদেশ আছে।

আলোচ্য গ্রন্থে পরমদয়ালু লোকাচারী স্বামী বেদ-বেদান্ত ও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে এবং দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ প্রেমিক ভক্ত আড়্‌বারগণের দিব্য জীবনী ও প্রবন্ধ হইতে সাধক-জীবনে কিভাবে তত্ত্বজ্ঞান, মাধুর্য ও প্রেম লাভ হয় তাহা সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থে ১৮টি প্রকরণের মধ্য দিয়া ৪৬৭টি সূত্রে বক্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একখানি অত্যুত্তম মৌলিক গ্রন্থ বলা চলে। পুস্তকস্থ প্রকরণগুলির ক্রম যথা: (১) বেদার্থনির্ণয় (২) শ্রীরামায়ণ এবং শ্রীমহাভারতের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (৩) পুরুষকার-বৈভব (৪) উপায়ের বিশেষ বৈভব (৫) পুরুষকারের এবং উপায়ের সাধারণ বৈভব (৬) উপায় (প্রপত্তি) (৭) অর্চাবতার বৈভব (প্রাসঙ্গিক) (৮) অধিকারী-শোধন (প্রপন্নজনের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান) (৯) উপায়ান্তর-দোষ (১০) সিদ্ধোপায়-অধিকার (১১) সিদ্ধোপায়-বৈভব (১২) সিদ্ধোপায়নিষ্ঠের বৈভব (১৩) ভাগবত-বৈভব (১৪) প্রপন্ন-দিনচর্যা (১৫) সদাচার্য-লক্ষণ (১৬) সৎ-শিষ্য-লক্ষণ (১৭) নির্হেতুক-বিষয়ীকার (ভগবৎ-নির্হেতুককৃপাবৈভব) (১৮) চরম প্রাপ্য-প্রাপক (আচার্য-অভিমান)।

আলোচ্য গ্রন্থে মূল সূত্রগ্রন্থ বচনভূষণের শ্রীবরবরমুনি-কৃত অতি উপাদেয় বিস্তৃত সংস্কৃত ব্যাখ্যা এবং সূত্র ও ব্যাখ্যার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ এবং উপযুক্তক্ষেত্রে বোধসৌকর্যার্থে টীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

—জীবানন্দ

অশ্বিনীকুমার দত্ত—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ, 'অশ্বিনী কুমার জন্ম-শতবার্ষিকী'—২৭, ল্যান্সডাউন টেরাস, কলিকাতা; পৃষ্ঠা—৬৮+২; মূল্য—১৲ টাকা।

যশস্বী ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের লিখিত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের এই ক্ষুদ্র জীবন-পরিচিতিটি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। অশ্বিনীকুমারের ন্যায় দৃঢ়চরিত্র প্রতিভাবান শিক্ষাব্রতী, নির্ভীক জননেতা ও দেশসেবক এবং নিষ্কলুষ ভগবন্নিষ্ঠ মানবপ্রেমিক দুর্লভ। বাংলার জাতীয় জীবনকে তিনি তাঁহার কর্ম ও মনীষা দ্বারা প্রভূতভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গমাতা বিশেষতঃ বরিশাল তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই নেতৃত্ব-সঙ্কটের দিনে অশ্বিনীকুমারের

ন্যায় একটি মহৎ চরিত্রের অনুশীলন বাঙ্গালীকে বহুতর উৎসাহ এবং প্রেরণা দিবে। লেখক ঘনিষ্ঠভাবে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী অতি মর্মস্পর্শী। এই পুস্তকের ব্যাপক প্রচার কামনা করি, বিশেষতঃ যুবক এবং দেশকর্মিগণের নিকট।

পরিক্রমণ (কবিতার বই)—শান্তশীল দাশ রচিত ; প্রকাশক—তুলি-কলম, ৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ; পৃষ্ঠা—৬০ ; মূল্য ২৲ টাকা।

বহু সাময়িক পত্রিকার নিয়মিত লেখক শান্তশীল বাবুর ২০টি কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জীবনায়ন' সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল, আমাদের বিশ্বাস 'পরিক্রমণ'ও অনুরূপ মর্যাদা লাভ করিবে। জগৎ ও জীবন পরিক্রমণের পশ্চাতে কবির একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু কোন দুর্বল মোহ নাই।

"হিসাব-নিকাশ করি না বন্ধু কত লাভ কত ক্ষতি ;
চাওয়া-পাওয়া মাঝে আছে গরমিল জানি ;
না-পাওয়ার ব্যথা বেদনায় মোর রুদ্ধ হয়নি গতি—
জীবন সত্য—সহজে নিয়েছি মানি।" (পৃঃ ১০)

জীবন সত্য, কিন্তু উহা নিশ্চিতই কোন অদৃশ্য পরম সত্যে বিধৃত, বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে বুঝিতে পারি বা না পারি। সেই পরমসত্যে আস্থা এবং হৃদয়ের সংযোগ কবি-প্রাণের স্বাভাবিক কামনা।

"বারে বারে করেছি সন্ধান :
আমার বন্দনা গান,
নির্ঝরের ধারা সম
স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের পূজার্ঘ রচনা ;
অদৃশ্যের আরাধনা
নহে কোন প্রত্যাশা মলিন ;
আমার হৃদয়-মন তৃপ্ত হয়, তাই প্রতিদিন
অর্ঘ রচি নিরলস সংগীতের হারে :
জানি না সে কার লাগি,
সে-আরতি তুষ্ট করে কোন্ দেবতারে।"
(পৃঃ ১৩—'কৈছে দেবায়')

'আভাস' কবিতায় (পৃঃ ৪৪) কবি সেই পরম সত্যকে 'আলোক' রূপে আবিষ্কার করিয়াছেন।

"চারিদিকে দেখি শুধু আলোকের মেলা :
আকাশের গায়, ধরণীর বুকে, শুধু আলোকের খেলা।
আলোক-পরশে নিঃশেষে সব
মুছে গেছে যত গ্লানি,
নীরব ভাষায় চারিধারে শুধু
শুনি আলোকের বাণী !
সারা দেহ মন ভরে গেছে দেখি আলোকের স্বরণায়।
এসেছি কি তবে আলোক তীর্থে, আলোকের আঙিনায় !"

কবি কর্মকে স্বীকার করেন, সংগ্রামকে নয়। 'আলোকে'র আভাস চিত্তে উদিত হইলে ইহাই তো স্বাভাবিক।

"সংগ্রাম নয়, ধরণীর বুকে কর্মের আহ্বান,
দয়ামায়াহীন নির্মম সুকঠোর ;
কিশোর মনের সকল স্বপ্ন ভেঙে হ'ল খান খান,
ধুলায় লুটাল ছিন্ন কুসুমডোর।"
(পৃঃ ৫৪, 'পথ : পাথেয়')

সংসারের ঋজু কুটিল নানাপথ পরিক্রমণে, অসংখ্য বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে দেহ-মন ক্লান্ত, কিন্তু কবি-প্রাণে কোন অভিযোগ নাই।

"যা তুমি দিয়েছ সবই হে নিয়তি, করেছি গ্রহণ,
তার সাথে মিশায়েছি পেয়েছি যা এই ধরণীতে ;
অভিযোগে, অভিমানে এ ললাটে আঁকিনি কুঞ্চন,
বিফল হয়নি কিছু আমার জীবন-সরণীতে।"
(পৃঃ ৫৯, 'নিয়তি : আমি')

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী — শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিদ্যা নিকেতন, ১৭৩,২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ; পৃষ্ঠা—৩৮ ; মূল্য—৷১০ আনা।

চণ্ডীমঙ্গল হইতে দুইটি এবং শিব, অন্নদা, মনসা, রায়, ধর্ম, সারদা, মহারাষ্ট্র, শীতলা ও ষষ্ঠী—এই মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে এক একটি কাহিনী লইয়া ছেলে-মেয়েদের উপযোগী সহজ কথ্যভাষায় লিখিত এই বইখানি কিশোরদের মনোরঞ্জন এবং বাংলার

প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে সহায়তা করিবে। লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিশ্বরূপ দর্শন (গীতার একাদশ অধ্যায়ের পদ্যানুবাদ)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত; প্রকাশক—বাসুদেব আশ্রম, ৬, কেদারনাথ মুখার্জী লেন, বালী, (হাওড়া) পকেট সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৬৪ ; মূল্য—।০ আনা।

'সুদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক, বহু ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের গীতার ১১শ অধ্যায়ের এই সুললিত পদ্যানুবাদ পাঠে আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির পংক্তি-সংখ্যা এবং শব্দসন্নিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্লোকগুলিকে সহজ সরস বাংলা কবিতায় পরিনয়ন বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—গত ৩০শে ফাল্গুন, বুধবার (১৪।৩।৫৬) বেলুড় মঠের পুণ্যতীর্থে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর সমুপস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মতিথি বিশেষ পূজা পাঠ-হোম-ভজনকীর্তনাদির মাধ্যমে যথারীতি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আঙ্গিক অনুষ্ঠান-গুলির প্রত্যেকটির স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেরণা সমাগত সকলকেই গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় সাত হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে মঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে একটি মহতী জনসভায় ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী অজয়ানন্দ (বাংলায়), স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ (ইংরেজীতে) এবং অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ (হিন্দীতে)। স্বামী গম্ভীরানন্দ এই সভার পরিচালনা করেন। সারারাত্রি মন্দিরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শেষ রাত্রে যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে ১৭ জন ব্রতীকে ব্রহ্মচর্যদীক্ষা এবং ২১ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দেওয়া হয়। ৪ঠা চৈত্র, রবিবারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ মহোৎসব উপলক্ষ্যে মঠে প্রায় ৪ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রতিবারকার মত শ্রীমন্দির এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী মাঠের উত্তর দিকে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে যুগাবতারের সুবৃহৎ রঙীন চিত্র পত্রপুষ্পাদি দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। ঠাকুরের জীবৎকালে ব্যবহৃত কয়েকটি দ্রব্যও মণ্ডপের দুই পাশে কাচের আলমারির মধ্যে রাখা ছিল। মণ্ডপের সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপে ভজন কীর্তনাদি সারাদিনই চলিয়াছিল। মঠবাড়ীর আঙ্গিনাতে অনুষ্ঠিত আন্দুলের কালীকীর্তনও শত শত ভক্ত নরনারী নিবিষ্টভাবে বসিয়া শুনিতেছিলেন। মঠের লাইব্রেরী বাড়ীর দ্বিতলে সকাল ৮টা হইতে অপরাহ্ণ ৫॥টা পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ, ভজন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা মাইক্রোফোন যোগে প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বাহির হইতে অনেকগুলি কীর্তনের দল উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হন। শত শত দোকানপাটও যথারীতি বসিয়াছিল। প্রায় ষাট হাজার লোককে মাটির খুরিতে খেচরান্ন প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৬টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় হাজার স্বেচ্ছাসেবক মঠের সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারিগণের সহিত সারাদিন উৎসব ক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা-রক্ষা, প্রসাদ বিতরণাদি নানাকার্য প্রশংসনীয়ভাবে সম্পন্ন করেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শীতল পানীয় এবং বিকালে চা বিতরণ করিয়া শ্রান্তজনতার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় সন্ধ্যারতির পর নানাবিধ চমৎকার

আতস বাজি বিপুল জনমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। সেণ্ট্ জন অ্যাম্বুলেন্স, হাওড়া রেড্ ক্রস্ এবং হাওড়া পুলিশ তাঁহাদের সেবাকার্যের জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

শাখাকেন্দ্রসমূহের উৎসব—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানসূচির মাধ্যমে পরিনিষ্পন্ন হইবার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। কয়েকটি উৎসব-সংবাদের চুম্বক পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তিথি-পূজার দিন মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোম এবং চণ্ডী পাঠ হয়। দুপুরে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে একটি জনসভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাত্রে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ৫।৬ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের পক্ষ হইতে প্রদর্শিত শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ খুব আগ্রহ সহকারে দেখিয়াছিল।

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের উদ্যোগে তিথিপূজার দিন হইতে ছয় দিন পূজা পাঠ ভজন শাস্ত্রব্যাখ্যান ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পাঠ ও ভাষণাদিতে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী ভাস্বরানন্দ, শ্রী ভি ভি নারলিকর (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রী মালানী (স্থানীয় সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) বারাণসী বসন্ত মহিলাকলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত টি, এ, ভাণ্ডারকর, অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মিশ্র, শ্রী এম্ এস্ রামস্বামী, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শোভারাণী বসু, কাশী সন্ন্যাসী কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত উপাধ্যায় সাহিত্যবেদান্তাচার্য (ইনি হিন্দীতে 'প্রহ্লাদ চরিত্রে'র ব্যাখ্যান করেন)। স্থানীয় একজন প্রসিদ্ধ কথক হিন্দীতে তুলসীদাসের রামায়ণ ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গীতাদিতে অংশ নেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী রামানন্দ, শ্রীমহাদেব শর্মা, শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য সুধাকণ্ঠ এবং বিষ্ণুপুরের একটি কথকদল। তিথিপূজার দিন আড়াই হাজার নর-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। একদিন কাশীর নানা সম্প্রদায় ও আখড়ার সাধুদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হইয়াছিল।

নয়া দিল্লীতে উৎসব-উপলক্ষ্যে ১৮ই মার্চ, রবিবারে আহূত একটি জনসভার নেতৃত্ব করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে এরূপ মনে করা ভুল। বরং আধ্যাত্মিকতাই মানুষের জীবনে সামঞ্জস্য আনে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বর্তমানকালে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আধুনিক জগৎ প্রভূত ঐহিক উন্নতি আনিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু 'মানবিক দিক'টি সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন ভাবকে সহ্য করা এবং পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা এই দ্বন্দ্বাকুল পৃথিবীতে আজ বড় দরকার। ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ আরও বলেন, এই দেশে যখন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজত্ব চলিতেছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেশের 'দেউলিয়া' জনগণের মধ্যে ভারতের উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যে বিশ্বাস উদ্রিক্ত করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ জাতিকে একটি মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, কেননা বিদেশীদের অনুকরণ-প্রচেষ্টায় জাতি দ্রুত নিজের ভিত্তি হারাইতে বসিয়াছিল। সভায় দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, ডক্টর ই এ পিরেস্ এবং স্বামী চিদাত্মানন্দও বক্তৃতা দেন।

সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণজয়ন্তী ১৭ই ও ১৮ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম

সম্পন্ন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বীতশোকানন্দ। জনসভায় স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইংরেজ অধ্যাপক ইংরেজীতে, 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর প্রথম কর্মসচিব হিন্দীতে এবং আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী তামিলে বক্তৃতা দেন। সভাপতি ছিলেন স্বামী বীতশোকানন্দ। তিনজন গুণী তামিল ও হিন্দুস্থানী ভজনসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্যন্ত পাঁচ দিন উৎসব পালন করেন। কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষপূজা-হোম-শাস্ত্রপাঠ, ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ জননী সারদা-দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথা, নারায়ণ-সেবা, রামায়ণ-গান (দুই দিন) ছাত্রদের অভিনয় ('আত্মদর্শন' ও 'কর্ণার্জুন'), মিশন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, একটি ছাত্রসভা এবং দুইটি সাধারণ সভা। শেষদিনকার (৪ঠা চৈত্র) সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিভিন্ন ধর্মের মূল বাণী'। পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবু হোসেন সরকার এই সভায় তাঁহার ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন, ধর্ম লইয়া মানুষে মানুষে গালিগালাজ বা কলহ থাকা উচিত নয়। 'এক পৃথিবী'—এই আদর্শের জন্য মানুষকে কাজ করিতে হইবে। যে কোন অবস্থায় বা ধর্মে কেহ থাকুক না কেন, সে যদি তাহার কর্তব্যকর্ম করিয়া যায় তাহা হইলে উহা দ্বারাই আসে শান্তি ও শ্রী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ধের হস্তীদর্শন গল্পটি উদাহৃত করিয়া বক্তা বলেন, যে কোন ধর্মই হউক না কেন মানুষ বিভিন্ন পথে একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সভায় অপর বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দেব, জনাব এ আবদর রহমান খান এবং কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ।

বাগের হাট (খুলনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৯ই ও ১০ই চৈত্র অনুষ্ঠিত উৎসব স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়াছে। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ দুইদিন ছায়াচিত্র যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাধনা ও বাণী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। সাধারণ সভার বক্তা ছিলেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উকীল শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস। একদিন রামায়ণ-গান হয়। উৎসবে অন্যূন তিন হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ৩০শে ফাল্গুন হইতে পাঁচদিনব্যাপী প্রতিপালিত কর্মসূচির প্রধান অঙ্গগুলি ছিল — বিশেষপূজাহোমাদি, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ, তিথিপূজার রাত্রে কালিকাপূজা, স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক ভজন-সঙ্গীত, রাধামাধব নাট্যসংঘ কর্তৃক পৌরাণিক নাটক 'চক্রী'র অভিনয়, জনসভা (সভাপতি—প্রবীণ নাগরিক শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, অন্যতম বক্তা—বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপক শ্রীগোপাল লাল দে), প্রসাদবিতরণ এবং বাঁকুড়া জেলা প্রচার বিভাগ কর্তৃক সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

জলপাইগুড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ) রবিবার, স্বামী বিবেকানন্দের ৯৪তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আহূত একটি জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দ তাঁহার প্রধান অতিথির ভাষণে বর্তমান স্বাধীন ভারতের জনগণমানসের বেগমুখর গতিপথকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বোধসানন্দ এবং সভা-পরিচালক শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়ও নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব—১৩ই ফেব্রুয়ারী ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উৎসব বিশেষ আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, বৈদিকমন্ত্র ও চণ্ডীপাঠ, বিশেষপূজা-হোম এবং ভজনকীর্তনাদিতে সারাদিন মঠপ্রাঙ্গণ যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। মঠাধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ কর্তৃক 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পাঠান্তে সমাগত প্রায় দেড় সহস্র নরনারায়ণকে বসাইয়া পরিতোষসহকারে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে শ্রীরামনাম সঙ্কীর্তনান্তে মঠপ্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন হয়। কটক মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ কাশীনাথ মিশ্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পটভূমিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবনালোচনা করেন। সভাপতি ছিলেন কটকের প্রাচীন ভক্ত ও শিক্ষাব্রতী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত। সন্ধ্যারতি ও ভজনের পর কলিকাতার কৌতুক-শিল্পী শ্রীযুত মনোরঞ্জন সরকার মহাশয় তাঁর উচ্চাঙ্গ 'হাস্যকৌতুক' দ্বারা সমবেত সকলকে আপ্যায়িত করেন।

দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বেদান্ত সমিতির নূতন উদ্যোগ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডে অবস্থিত 'দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বেদান্ত সমিতি'র পরিচালনাধীন স্যান্টা বারবারা শ্রীসারদা মঠে গত ১৩ই ফেব্রুআরি, ১৯৫৬, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্যজন্মতিথিতে একটি 'বেদান্ত মন্দিরে'র শুভ উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবনির্মিত মন্দিরটির পরিকল্পনা করেন মিস্ লুতা রিগ্স্ নাম্নী একজন প্রসিদ্ধা নারী-শিল্পী। মন্দিরের বহির্ভাগ দক্ষিণভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একশ্রেণীর অনাড়ম্বর দারুগৃহের অনুরূপ। ভিতরটি দেখিলে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় কাষ্ঠস্থাপত্যের কথা মনে পড়ে। (পরে কার্লি ও অজন্তা প্রভৃতি গুহামন্দিরে এই স্থাপত্যেরই অনুকরণ করা হইয়াছিল)। বক্তৃতা-গৃহের এক প্রান্তে কয়েকটি সিঁড়ির আকারে পৃথক পূজাকক্ষ উঠিয়াছে। পূজাবেদিটি কৃষ্ণমর্মরের। স্বর্ণপত্রবসানো কারুকার্যময় কয়েকটি কাষ্ঠস্তম্ভ উহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। চারটি খুঁটির উপর অবস্থিত একটি চন্দ্রাতপ বেদির উপর শোভমান। বেদির শেষ ধাপে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ চিত্র রহিয়াছে। কালিফর্ণিয়ার আরণ্য-প্রকৃতির প্রস্তর ও শষ্পসম্ভারের সহিত ভারতীয় স্থাপত্যের সুসমঞ্জস সংমিশ্রণ মন্দিরটিকে দিয়াছে একটি অনুপম লালিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী এবং বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি স্বামী নির্বাণানন্দজী (সূর্য মহারাজ) এই প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান করিতে ভারত হইতে বিমানযোগে ১০ই ফেব্রুআরি লস্ অ্যাঞ্জেলিস্ পৌঁছান। বেদান্ত-মন্দিরে উদ্বোধনী-পূজা সম্পন্ন করেন স্বামী নির্বাণানন্দজী। স্বামী মাধবানন্দজী ছিলেন তত্ত্বধারক। অনুষ্ঠানটিতে দক্ষিণ কালিফর্নিয়া বেদান্ত সমিতির নায়ক স্বামী প্রভবানন্দজী, তাঁহার সহকারী সন্ন্যাসী স্বামী বন্দনানন্দ, বার্কলি বেদান্তকেন্দ্রের স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ এবং দক্ষিণ কালিফর্নিয়া বেদান্ত-সমিতির শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। শ্বেত এবং নীল পুষ্পে পরিশোভিত উপাসনা-বেদির সৌন্দর্য এবং পূজানুষ্ঠানের গম্ভীর শুচিতা সকলেরই চিত্তকে আনন্দাভিভূত করিয়াছিল। পূজার পর হোম হয়। সন্ন্যাসিগণের উপস্থিতিতে ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ যজ্ঞাগ্নিতে তাঁহাদের ব্রত-স্মারক আহুতি প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীসারদা মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ কর্তৃক প্রসাদ পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী নির্বাণানন্দজী মন্দিরে প্রথম আরতি সম্পাদন করেন। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীগণ অর্গানে, গং এবং করতাল সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক সঙ্গীত "খণ্ডন-ভববন্ধন" গান করেন। তৎপরে অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণগীত ও মাতৃ-সঙ্গীত গাওয়া হয়।

পরবর্তী রবিবারে সর্বসাধারণের জন্য একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। চারি শতের অধিক নরনারী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক অবলম্বনে ব্রহ্মচারিণী বরদা রচিত একটি গীত এবং স্বামী প্রভবানন্দজীর স্বস্তিবচন দ্বারা অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। স্বামী নির্বাণানন্দজী কর্তৃক আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, জড়বাদ-প্রভাবিত যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইয়া গিয়াছেন ঈশ্বরই বৃহত্তম সত্য, স্পষ্টতম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরানুভূতিই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রধান কথা এই যে নিজ নিজ সাধনপথে গিয়া প্রত্যেকেই ভগবানরূপ একই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে। স্বামী মাধবানন্দজী আরও বলেন, "সত্য ভিতরেই রহিয়াছে। একটু বিশ্বাস এবং অভ্যাস করিলে উহা প্রকাশিত হইতে বাধ্য। তোমাদের জীবনের পরম সত্যকে অনুভব করিয়া অপরের সেবায় ব্রতী হও। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মন্দির প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মেরই মন্দির। এই মন্দির হইতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হইবে উহা যে কোন মতের যে কোন ব্যক্তিকেই দ্রুত ঈশ্বরানুভূতি লাভে সহায়তা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ তোমাদের সকলের উপর বর্ষিত হউক। এই মন্দির সকলকে ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমের বন্ধনে এক করুক।"

স্বামী নির্বাণানন্দজী বাংলায় বলেন। স্বামী বন্দনানন্দ উহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া শুনান। সান্ ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির পরিচালক স্বামী অশোকানন্দজী এবং নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির স্বামী পবিত্রানন্দজীও বক্তৃতা দেন। স্বামী প্রভবানন্দজী তখন নূতন মন্দিরের কার্যসূচি জ্ঞাপন করেন। তিনি সকলকে দিনে এখানে আসিয়া উপাসনা ও ধ্যানধারণাদির সুযোগ লইতে বলেন এবং প্রাতঃকালীন ধ্যান, মধ্যাহ্ন-পূজা, সন্ধ্যারতি এবং রবিবাসরীয় ক্লাসে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ জানান। সমবেত ছয় জন সন্ন্যাসীর সমুচ্চারিত মঙ্গলকামনা দ্বারা উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী — বিগত ২৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার (১৩৬২) ডক্টর সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের অকস্মাৎ পরলোকগমনে বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক, লেখক ও সমালোচকের অভাব ঘটিল। চারিত্রিক ও নৈতিকবলের জন্য তিনি কি শিক্ষক কি ছাত্র সকলেরই সমভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। সুধীরবাবু উদ্বোধন-পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। কিভাবে ছাত্রসমাজের মধ্যে উপনিষদ্ ও স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ভাবধারা অনুপ্রবেশ করে তাহাতে তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। শ্রীভগবান এই পুণ্যাত্মার সদ্গতি বিধান করুন ইহাই প্রার্থনা। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি—এই প্রতিষ্ঠানের অষ্টাদশ বার্ষিকী (১৩৬১-৬২) কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুরে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি সুপরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে এ্যালোপ্যাথিক বহিবিভাগে মোট ৩৬৪৯টি (নূতন ১১১৫) রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক দাতব্য বিভাগের কার্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সেবা-সমিতির কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর ৮টি ছাত্র লইয়া একটি ছাত্রাবাস ও ১৪৭ খানি পুস্তক লইয়া একটি ক্ষুদ্র পাঠাগারও পরিচালনা করিতেছেন।

মুণ্ডক উপনিষদ্

(পূর্বানুবৃত্তি)

[দ্বিতীয় মুণ্ডক; দ্বিতীয় খণ্ড]

'বনফুল'

স্বয়ম্প্রকাশ যিনি, সর্বাশ্রয়, সকলের অন্তর-বিহারী,
গুহাচর নামে খ্যাত, হৃদয়-সঞ্চারী,
চঞ্চল, প্রাণবান, পলকী বা নিষ্পলক, স্থূল সূক্ষ্ম যেথা সমর্পিত
তিনিই বরেণ্য জেন, ওহে শিষ্যগণ,
তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অতীত ॥১॥

অণু হ'তে অণুতর যিনি দীপ্তিমান,
সর্বলোক, লোকবাসী যাঁর মাঝে লীন,
যিনি মৃত্যুহীন,
যিনি বাক্য, যিনি মন-প্রাণ,
তাঁরেই অক্ষর বলি জান বারেবারে
তিনি সত্য, তিনি লক্ষ্য
ওহে সৌম্য, ভেদ কর তাঁরে ॥২॥

লহ ধনু মহা-অস্ত্র উপনিষদের
ধ্যান-তীক্ষ্ণ শর তাহে করহ সন্ধান
ব্রহ্ম-ভাব-গত-চিত্তে আকর্ষিয়া গুণ
হে সৌম্য, অক্ষর-লক্ষ্যে বিদ্ধ কর বাণ ॥৩॥

প্রণব সে ধনু, সৌম্য, আত্মাই সে শর,
ব্রহ্মাই লক্ষ্য সবে কয়,
অপ্রমত্ত হও যদি হবে লক্ষ্য-ভেদ,
লক্ষ্য-বিদ্ধ শর সম হবে ব্রহ্মময় ॥৪॥

যার মাঝে আবর্তিছে দ্যুলোক ভূলোক,
আবর্তিছে অন্তরীক্ষ, আবর্তিছে সর্ব-মন-প্রাণ
সেই সে আত্মারে জান, পরিহরি অন্য কথা,
সেই জেন অমৃত-সোপান ॥৫॥

রথচক্র-শলাকার সম যে হৃদয়ে শিরাগণ করেছে প্রবেশ
সে হৃদয়ে নানারূপে তাঁর সঞ্চরণ,
সে আত্মারে 'ওম্' রূপে ধ্যান কর, কর স্বস্তি-লাভ
তমসারে করি' উত্তরণ ॥৬॥
সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যাঁহার মহিমা বিশ্বময়,
আকাশেতে প্রতিষ্ঠিত যিনি,
ব্রহ্মপুরে যিনি জ্যোতির্ময়,
মনোময় যিনি,
প্রাণ-শরীরের নেতা যিনি,
অন্নপুষ্ট শরীরেতে হৃদয়েতে অবস্থিত তিনি।
বিজ্ঞানের প্রভাবেতে তাঁরে ধীরগণ
আনন্দ-অমৃতরূপে পূর্ণ-ভাতি সর্বত্র করেন দর্শন ॥৭॥
খুলে যায় গ্রন্থি হৃদয়ের
ছিন্ন হয় সকল সংশয়,
উচ্চে নীচে দেখিলে তাঁহারে
কর্ম হয় ক্ষয় ॥৮॥
শ্রেষ্ঠ হিরণ্ময়-কোশে* নিষ্কলঙ্ক যিনি
অশরীরী ব্রহ্ম নিরাকার,
আলোকের আলো যিনি, শুভ্র জ্যোতির্ময়,
আত্মজ্ঞানীরাই জানে সন্ধান তাঁহার ॥৯॥
সূর্য-চন্দ্র-তারকারা দেয় না সেথায় ভাতি,
বিদ্যুৎও নাহি সেথা, অগ্নি কোথায়,
তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্ত বিশ্ব চরাচর
সব দীপ্তি তাঁহারই বিভায় ॥১০॥
সম্মুখে যাহা কিছু ব্রহ্মই তা' অমৃত-স্বরূপ
পশ্চাতেও ব্রহ্ম অভয়,
দক্ষিণেতে উত্তরেতে ঊর্ধ্ব-অধঃ সর্বলোকে
ব্রহ্মই প্রসারিত রয়,
এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥১১॥

ক্রমশঃ

* বুদ্ধিতে

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান বুদ্ধের স্মরণে

আগামী ১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে, ১৯৫৬) বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে উৎসব-আয়োজন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বৌদ্ধ-সমাজ এই উৎসব পরিপালন করিবেন।

বৈশাখী পূর্ণিমাকে Thrice Blessed Day—'ত্রিধা ধন্য দিবস' বলা হইয়া থাকে, কেননা এই একই তিথিতে তথাগত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, বোধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মহাপরিনির্বাণ ঘটিয়াছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শাক্যমুনির লোকোত্তর চরিত্র এবং কল্যাণ-বাণী দেশে দেশে মানুষকে শান্তি ও মৈত্রীর প্রেরণা দিয়াছে। সত্য, আমরা যাহাকে প্রচলিত 'বৌদ্ধধর্ম' বলি তাহা বুদ্ধের প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে ভারতবর্ষ হইতে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছিল কিন্তু বুদ্ধকে ভারত-মানস কখনও ত্যাগ করে নাই। বুদ্ধ-চরিত্র এবং বুদ্ধ-বাণী এদেশের ধর্মাদর্শ ও ধর্মসাধনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে এবং থাকিবে। হিন্দুগণ গৌতম বুদ্ধকে শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণের সহিত দশাবতারের এক অবতার বলিয়াই সম্মান ও পূজা করেন। আজ ভারত যে তাঁহার মহাপরিনির্বাণের সার্ধ-দ্বিসহস্রতম পরিপূর্তি দেশব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করিবে ইহা কোন একটি বিশেষ ধর্মমতকে প্রচার করিবার জন্য নয়, সকল মত-আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে মানুষের মধ্যে যে শাশ্বত মানবিকতা-বোধ রহিয়াছে—যাহা শ্রীবুদ্ধে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল উহাকেই গৌরব দিবার উদ্দেশ্যে। স্বার্থসংঘাতবিত্রস্ত পৃথিবীকে স্বস্থ ও সুস্থ করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন যে এই বোধেরই।

ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম।

আচার্য শঙ্কর

শাক্যমুনির প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে এক বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে দক্ষিণ ভারতের কেরল ভূমিতে আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বৎসর ঐ পুণ্যতিথি পড়িয়াছে ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে, ১৯৫৬)। ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির এক সঙ্কটময় মুহূর্তে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। মাত্র ৩২ বৎসরের জীবনে তাঁহাতে যে অলোকসামান্য প্রতিভা, তত্ত্বজ্ঞান, চরিত্রবল এবং জনকল্যাণচিকীর্ষা বিকশিত হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। বিশাল ভারতবর্ষের দক্ষিণ হইতে উত্তরে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিনি উপনিষদের আত্মবিজ্ঞান এবং উহার উপলব্ধির অনুকূল জনগণের উপযোগী আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্যা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দর্শনকে শঙ্কর মুক্ত করিলেন শব্দারণ্য হইতে, মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করিলেন বহুমতভ্রান্ত অস্পষ্টতার পরিবর্তে একলক্ষ্য স্বচ্ছ ধ্রুবসত্যের উপর, সমাজের নীতি ও প্রাত্যহিক ধর্মাচরণে যে বহুতর আবিলতা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া উহাদিগকে প্রচালিত করিলেন সনাতন ভারতীয় সাধনার প্রশস্ত রাজমার্গে। বুদ্ধের সহিত শঙ্করের কোন বিরোধ ছিল না, বিরোধ ছিল বুদ্ধবাণীর অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের সহিত। বুদ্ধের মানবিকতা এবং শঙ্করের অদ্বৈত-ব্রহ্মৈকাত্মতা—উভয়েরই উৎস উপনিষদ। শঙ্কর বৌদ্ধ না হইয়াও বুদ্ধবাণীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার। বুদ্ধ বেদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও বেদসত্যের নিগূঢ় মর্মবোদ্ধা।

ভগবান তথাগতের সহিত আচার্য শঙ্করকে প্রণাম।

যতিরাজ শ্রীরামানুজ

শঙ্করাচার্যের প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পরে আর এক বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীকে গৌরবান্বিত করিয়া দ্রাবিড়ভূমিতে আচার্য শ্রীরামানুজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্যতম প্রবর্তক এই মহান সন্ন্যাসী ভারতবর্ষের ধর্মসাধনায় এক নূতন শক্তি ও প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের প্রভাব যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সেই অবিস্মরণীয় দিনটি। অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইবার পর সেদিন রামানুজ গুরু গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট সরহস্য নারায়ণের মহামন্ত্র লাভ করিয়াছেন। গুরু বলিয়াছেন, যে কেহ ইহা শুনিবে সে নিশ্চয়ই দেহান্তে মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। রামানুজের হৃদয় সংসারতাপক্লিষ্ট জনগণের শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের দ্বার লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। পথে যাহারই সহিত দেখা হইতেছে বলিতেছেন, "এস মন্দিরে এস, আজ এক অমূল্য রত্ন বিলাইব।" অচিরে বৃহৎ জনতা তথায় সমবেত হইয়াছে। রামানুজ মন্দিরের উচ্চ গোপুরে উঠিয়া সকলকে ডাকিয়া তিনবার মহামন্ত্র শুনাইয়া দিলেন—ওঁ নমো নারায়ণায়। অধিকারিনির্বিশেষে সুগোপ্য মহামন্ত্র প্রকাশ্যভাবে বিতরণের কথা শুনিয়া গুরু গোষ্ঠিপূর্ণ রুষ্ট হইয়াছেন। বলিলেন, "দূর হও নরাধম। মহারত্ন তোমার ন্যায় নরপশুকে দিয়া আমি মহাপাপ করেছি। তোমার ন্যায় পিশাচের নরকেও স্থান হওয়া দুষ্কর।" নির্ভীক রামানুজ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "যদি আমার মত একজন তুচ্ছ লোক নরকে যায় ও তৎপরিবর্তে সহস্র সহস্র নরনারী বৈকুণ্ঠগমনের অধিকার পেয়ে কৃতকৃত্য হয়, তাহলে এরূপ নরকগমন আমার প্রার্থনীয়।"

আচার্য রামানুজস্বামীর পুণ্যজন্মতিথিতে তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের সহস্র সহস্র প্রণাম।

বুদ্ধবাণী

ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তি এবং শরীরপীড়ন—এই দুই চরম পন্থা পরিহার করিয়া তথাগত সেই মধ্যপন্থার সন্ধান পাইয়াছেন—যাহা আনে বোধি, আনে প্রশান্তি, অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞার আলোক, নির্বাণ।

সেই মধ্যপন্থা কি? উহা হইল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বচন, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

দুঃখ বিষয়ে আর্যসত্য এই :—জন্ম, ক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু দুঃখ; ক্লেশ, পরিতাপ, নিরাশা দুঃখ; অপ্রিয়ের সংযোগ দুঃখ, প্রিয়ের বিরহ দুঃখ। এক কথায় পঞ্চস্কন্ধাত্মক এই জীবিত দেহপিণ্ড দুঃখ দ্বারা বেষ্টিত।

দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর্যসত্য এই :—অবিদ্যা (অজ্ঞান) হইতে কারণপরম্পরায় 'সংস্কার', 'বিজ্ঞান', 'নামরূপ', 'ষড়ায়তন', 'স্পর্শ' ও 'বেদনা'র (ইন্দ্রিয়সুখ) পর জন্মে 'তৃষ্ণা' (ভোগস্পৃহা)। তৃষ্ণা আনে 'উপাদান' বা বহু বিষয়ে আসক্তি। উপাদান হইতে উদ্ভূত হয় 'ভব'—আমাদের সত্তা। 'ভব' হইতে আসে 'জাতি' বা পুনর্জন্ম। 'জাতি'র ফল জরা-মরণাদি দুঃখ।

দুঃখের নিরোধ সম্বন্ধে আর্যসত্য এই :—তৃষ্ণার সম্পূর্ণ আসক্তিলেশশূন্য নিবৃত্তি, ত্যাগ, বর্জন; তৃষ্ণা হইতে মুক্তি, তৃষ্ণার উপরম—ইহারই নাম দুঃখ নিরোধ।

দুঃখ নিরোধের পথ সম্বন্ধে আর্যসত্য এই: উহা হইল আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ।

তুমি আজো ইতিহাসে সভ্যতার শাশ্বত বিগ্রহ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সার্ধ-দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ণ হোলো হে মহাজীবন !
সংসারের মরুপথে চির করুণার প্রস্রবণ
করে গেছ কেদারবাহিনী। আজো তার কলধ্বনি
শোনা যায় দিকে দিকে--মহামানবের আগমনী-
সুর বাজে তার প্রবাহেতে। সংসারের প্রহেলিকা
রহস্যের মায়াজালে : তারি মাঝে কত বিভীষিকা
নিয়তির নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে ওঠে বিশ্বে অহরহ !
মানবের মর্মে মর্মে প্রতিদিন আতঙ্ক দুঃসহ
কেন রহে ? অনন্তকালের এই প্রশ্ন হোতে তুমি
লভেছ জনম ঐশ্বর্যের পানপাত্র ওষ্ঠে চুমি।

সুখাচ্ছন্ন সম্ভোগের পটভূমিকায় জন্ম লভি
তুমি দেখেছিলে জীব-জগতের বেদনার ছবি,
স্নেহাশ্রিত শৈশবে তোমার। মানুষের হাহাকার
চিরন্তন পশিয়া শ্রবণে নিখিলের অন্ধকার
দেখেছিলে কৈশোরে তোমার, তত্ত্বগর্ভ কথা লয়ে
জনে জনে শুধায়েছ অন্তরে ব্যাকুল হয়ে
সৃষ্টির রহস্য সদা। বার্তা পেলে জন্মান্তরে কত !
এশিয়ার তুমি তীর্থগুরু, ভারতের তথাগত।

জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক তাপ দিল তব মনে
চরম বেদনা। নিভৃতে নির্জনে প্রভু ! সঙ্গোপনে
করেছ সাধনা। সমাজ-সংসার-চিত্রাবলী হোতে
পরম চেতনা পেলে। ভেসে গেলে সাধনার স্রোতে
মননের দূর দূরান্তরে। আত্মমগ্ন হয়ে সদা
শুনেছিলে জীবের ক্রন্দন, অঙ্গে তব অশ্রুলতা
হয়েছে বিস্তৃত। মায়ার বন্ধন তুমি ছিন্ন করি
যৌবন-প্রভাতে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে, পরিহরি
পার্থিব সম্পদ সুখ চীর-বাস পরি দেশে দেশে
দীন হীন বেশে বিশ্বে প্রেম দিয়ে গেলে অবশেষে
বন উপবনে কত গিরিগুহা অরণ্য নির্ঝরে
অশ্রু তব রহিয়াছে। ভূমানন্দে ব্যক্তাতীত স্তরে
অনির্বাণ মহাজ্যোতিঃ মাঝে নির্বাণের বাণী পেলে
বোধিদ্রুমে বোধিসত্ত্ব হয়ে। রাজগৃহে ফিরে এলে
বার্তা লয়ে নব। কত রাজ্য কত চৈত্য অবলুপ্ত
কত না বিহার ভূমি-গর্ভে সমাহিত। রহে সুপ্ত
কত না অশোক বিম্বিসার। তুমি আজো ইতিহাসে
সভ্যতার শাশ্বত বিগ্রহ জ্যোতির্ময় চিত্তাকাশে।
নিরঞ্জনাতীরে আজো কেঁদে কহে ধীরে চম্পা যূঁথি
মাধবী মল্লিকা। কত স্মৃতিলতা তব করে স্তুতি
মৃগদাব শ্রাবস্তীর পথে তব পদচিহ্ন-রেখা
খুঁজিতেছে তীর্থযাত্রী কত, সুজাতার অশ্রুলেখা
আজো রহে। আজো জীব করিছে ক্রন্দন দুঃখে শোকে।
মোরা ভ্রান্ত-পথে চলি স্বার্থ লয়ে সহস্র দুর্ভোগে।

কত বর্ষ আগে তুমি মর্তভূমি হোতে গেছ চলে
প্রাণের কল্লোলে কাব্য তব সিংহলের তটে দোলে
ভারতের তটপ্রান্ত হোতে। হিংসারাত্রি ভেদ করি
অসত্যের বক্ষে বজ্র হানি কল্যাণের শতনরী
পরায়েছ বসুধারে। ধর্মচক্র প্রবর্তনে নব
আপনারে করেছ প্রকাশ জীবে সেবা প্রেমে তব
চির ব্যাপ্ত রহে। ধ্যানের নিগূঢ়স্তরে তব নাম
ধ্বনিতেছে অবিরাম বিশ্বমাঝে তোমারে প্রণাম।

"হে প্রভো ! আমি মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, বন্ধু, সখা, গুরু, রত্নসমুদয়, ধনধান্য, ক্ষেত্র, গৃহ, সমস্ত ধর্ম এবং বিনাশরহিত মোক্ষপদ সহ সকল কামনাবাসনা সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডবিক্রান্তকারী আপনার চরণযুগলের শরণ লইলাম।"

—আচার্য শ্রীরামানুজ

"বিশ্বাসে মিলয়ে—"

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুজাতা হাজরা, এম্‌-এ

"কহৈঁ কবীর শুনো ভাই সাধূ, ম্যাঁয় হুঁ তেরা বিশোয়াস্ মে।"

ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে আমরা প্রধানতঃ সামনে দুটি পথ দেখতে পাই। একটা বিশ্বাসের পথ, আর একটা তর্কের পথ। এই দুই পথের যে কোন একটিকে দৃঢ়ভাবে না ধরলে আমরা অভীপ্সিত পথে কোনমতেই অগ্রসর হতে পারব না। যখন আমরা যুক্তিতর্ককে অবলম্বন করি, তখন সাধারণতঃ আমরা কোন এক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করি; কিন্তু বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কোন মতকে আমরা বিনাবিচারে গ্রহণ করতে পারি না, যদি না তা কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট হতে আসে। সেখানে আমরা মতের চেয়ে মতের প্রচারকর্তাকেই বেশী প্রাধান্য দিই। তাঁর কথাকে মেনে নিই সেটা তাঁরই মুখের কথা বলে। তাঁর নির্দেশ যখন পালন করি, তখন সে নির্দেশের যৌক্তিকতা ভেবে তা করি না, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই আমাদের সেই নির্দেশ পালনে প্রবৃত্ত করায়। আমাদের সাধারণ সাংসারিক জীবনেও দেখা যায় পিতামাতার অনেক নিষেধ বা অনুরোধ আমরা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই না করেই স্বীকার করে নিই। এই পথই বিশ্বাসের পথ। এখানে যুক্তিতর্ক, বিচার-বিবেচনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইজন্য বলতেন—"বিশ্বাস মানেই অন্ধ বিশ্বাস।"

এখন এইরকম বিচারবিবেচনাহীন বিশ্বাস আমাদের শ্রীভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে কি না তাই দেখতে হবে। ঈশ্বরাভিলাষীকে তাঁর পথ এবং লক্ষ্যের বিষয় দৃঢ়নিষ্ঠ হতে হবে। তিনি যাঁর জন্য ব্যাকুল সেই ঈশ্বর যে সত্যই আছেন এবং আন্তরিকভাবে তাঁকে পেতে চাইলে তাঁকে যে সত্যসত্যই পাওয়া যায়—এই দুটি বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা হওয়া দরকার। এই ধারণা তিনি নানারকম শাস্ত্রবিচার করে যুক্তিতর্কের সাহায্যে গড়ে নিতে পারেন অথবা কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা গুরুদেবের মুখে শুনে বিশ্বাস করে নিতে পারেন। যে কোন প্রকারেই হোক্, দৃঢ়তা এবং একনিষ্ঠতা না আসলে আমরা ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হতে পারব না। প্রথমেই তর্কবিচারের কথাই ধরা যাক্। ধন, জন, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, কোন কিছুই আমাদের চিরন্তন তৃপ্তি দিতে পারে না। এই অতৃপ্তিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা এমন এক বস্তু কামনা করি, সমস্ত জগৎ তার সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়েও যা মেটাতে পারে না। সেই বস্তুর স্বরূপ কি তা আমরা জানি না। কিন্তু এই জানি যে তৃপ্তি পেতে হ'লে, সেই অনির্দেশ্য, অজ্ঞাত বস্তুকে আমাদের লাভ করতেই হবে। সেই বস্তু কি এই জগৎ? না, তা নয়। এই দেহ? তাও নয়। "নেতি নেতি!" —কেন না, এদের কোনটার ভেতরেই আমরা সম্পূর্ণ কামনার শান্তি খুঁজে পাই না। সুতরাং সে বস্তু এই জীব নয়, জগৎ নয়—সাধারণ জ্ঞানের বাইরে, তর্কবিচারের বাইরে, অজ্ঞাতপূর্ব, অপূর্ব কোন বস্তু। সমস্ত যুক্তিতর্কের এই শেষ সীমা। তারপরে পদক্ষেপ করতে গেলেই আমাদের বিশ্বাসের সাহায্য নিতে হবে। তখন আমাদের সেই বিশ্বাসের সম্ভাব্যতা, অসম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা—সব কিছুর সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হবে; এসব কিছুর সম্বন্ধেই আমরা কোন প্রশ্ন তুলতে পারব না।

যুক্তিতর্কের সঙ্গে সন্দেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আমাদের তর্কবিচার করার প্রবৃত্তিই আসে, সন্দেহ থেকে। যুক্তির সাহায্যে যাচাই করে যাকে আমরা মেনে নেব—তাকে আমাদের অসন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু যদি আমরা পরে এমন কিছুর সংস্পর্শে আসি যা মনে হয় পূর্বগ্রাহ্য মতের বিরোধী—আমাদের বিশ্বাস তখনই টলে যায়—কেননা, আমরা বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সুতরাং ঈশ্বরকে পাবার পথে আমাদের যে দৃঢ়তা এবং একনিষ্ঠতা প্রয়োজন—সেই দৃঢ়তা এবং একনিষ্ঠতা আমরা রাখতে পারি না। বেদান্তদর্শনেও আমরা দেখতে পাই তর্কের পথকে নিরবলম্ব বলা হয়েছে। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।"

কিন্তু বিশ্বাসের পথে এ প্রশ্ন ওঠে না। বিশ্বাস বলে—"তোমরা যে যাই বল, যে যুক্তিই দেখাও—আমি জানি তাঁর শ্রীমুখ থেকে যে বাণী এসেছে তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। বরং আমার চোখ, কানকে অবিশ্বাস করব—কিন্তু শ্রীভগবানের কথায় আমার কখনও অবিশ্বাস হবে না।" এই রকম বিশ্বাসের দৃঢ়তার কাছে অটল মেরুও টলে যায়। তার এই বিশ্বাস কে টলাবে? যুক্তি দিয়ে তাকে টলানো যাবে না—কারণ নিজের চোখের চেয়েও সে শ্রীভগবানের কথায় অধিকতর বিশ্বাসী। তার নিষ্ঠার কাছে সবকিছুই হার মানে। নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসকে একই মুদ্রার দুই পিঠ বলা যেতে পারে। সেইজন্য যে কোন কাজে নিষ্ঠা আনতে হলে তাতে বিশ্বাস করতেই হবে—সে তর্ক বিচারের পথেই হোক্, বা বিচারহীন অনুসরণের পথেই হোক্।

বিশ্বাস শুধু নিষ্ঠাই আনে না, কাজে শক্তিও জোগায়। যুক্তিবিচারের পথ ক্রমোন্নতির পথ। তাতে আমাদের প্রতি ধাপ বিচার করে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে গেলে যে ঈশ্বরোন্মাদনা প্রয়োজন, যুক্তির পথে তা অনেক দেরিতে আসে। কিন্তু বিশ্বাস আমাদের বলে প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়তে। যার ঈশ্বরে ঠিক ঠিক বিশ্বাস এসেছে, ঈশ্বর তাঁর অতি সন্নিকটে। দৃঢ় বিশ্বাসে অসাধ্য সাধন করতে পারে। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব একটী গল্প বলতেন এসম্বন্ধে; একবার একটি লোক সমুদ্র কি করে পার হবে ভেবে চিন্তিত হচ্ছিল। বিভীষণ তার কাপড়ের প্রান্তে একটি জিনিস বেঁধে দিয়ে বললেন—"ব্যস্, আর কোন ভয় নেই। এই বস্তুটির প্রভাবে সমুদ্র তোমার কাছে হাঁটুজল হয়ে যাবে—তুমি হেঁটেই পার হয়ে যেতে পারবে।" লোকটি বিভীষণের কথায় বিশ্বাস করে হেঁটে সমুদ্র পার হতে লাগল। বেশ খানিকটা যাবার পর তার হঠাৎ কৌতূহল হল—দেখি তো কী এমন বস্তু যার প্রভাবে অতল সমুদ্রও অগভীর হয়ে যায়। কাপড়ের প্রান্ত খুলে দেখে একটা পাতা, তাতে রামনাম লেখা। "মাত্র এই জিনিস!" —যেমনি তার মনে অবজ্ঞা এল, এল অবিশ্বাস, অমনি সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে উঠল—সে জলের তলায় গেল তলিয়ে। আমরা যদি এই রকম তলিয়ে না যেতে চাই তবে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে। বিশ্বাসই আমাদের ধৃতিশক্তি জুগিয়ে দেয়। শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক জীবনেও নয়, সমাজজীবনেও বিশ্বাসই একমাত্র অবলম্বন যা সংসারকে সমাজকে গড়ে তোলে। সংসারে আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি বলেই এক পরিবারভুক্ত হ'তে পারি। সমাজে আমরা একজন আর একজনকে বিশ্বাস করি বলেই আমাদের মধ্যে সমাজজীবন সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে, যে সমাজে বিশ্বাসঘাতকতা প্রবেশ করে সেই সমাজই বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং কোন কিছুকে ধরে রাখতে বা গড়ে তুলতে চাইলে বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। যে শিক্ষকের কাছে আমরা শিক্ষালাভ করতে যাই, তাঁকে বা তাঁর বাক্যকে যদি আমরা বিশ্বাস না করি তবে আমরা কোনমতেই জ্ঞানলাভ করতে পারব না। যথার্থ

শিক্ষা নিতে হলে শিক্ষককে, তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে ; যে নির্দেশ আমরা সুপ্রাচীন গীতাতেই পাই—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রথম এই শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—'শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ"—শ্রদ্ধাশীল, ভগবদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির বাসুদেবের কথায় রুচি জন্মায়। যাঁরা সত্য সত্যই 'সত্যকে' জানতে চান, তাঁদের প্রথমেই শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বাসপ্রবণ হতে হবে। সাধারণ বুদ্ধির অগম্য যা, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টা করা মূঢ়তা। সেখানে সত্যদ্রষ্টাদের সাহায্য না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই এবং ঈশ্বর লাভ করতে হলে, যুক্তিবিচারের পথেই হোক্ বা বিশ্বাসের পথেই হোক্—তাঁদের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। নিজের জীবনে তাঁদের বাণীকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আমরা তর্ক বিচারকে অবলম্বন করতে পারি, কিন্তু তাঁদের বাণী যে অভ্রান্ত এ বিশ্বাস আমাদের থাকতেই হবে। তর্ক, বিচার ইত্যাদি করতে গেলে একটা মানদণ্ড (standard) চাই, যার সাহায্যে আমরা অন্য কিছুর সত্যতা বা অসত্যতা বিচার করব। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে সেই মানদণ্ড করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এই মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথ এবং বাণীই সত্যকার মাপকাঠি। সেইজন্য বিশ্বাস বা তর্কবিচার যে পথেই আমরা অগ্রসর হতে চাই না কেন,—প্রথমে আমাদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা দিয়েই শুরু করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে—

"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

জয়তু বুদ্ধ জয়

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়তু বুদ্ধ জয়, জয় অমিতাভ
ত্রিলোকপাবন
সঙ্কটতারণ
পরম কারুণিক মহানুভাব।
জয়তু বুদ্ধ জয়, জয় অমিতাভ ॥

স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় জয় অরুণাভ।
পরম-নির্ভর
অমৃত-আকর
চিরনির্বাপক ভবদুখদাব।
জয়তু বুদ্ধ জয়, জয় অমিতাভ ॥

মধুরমমতাদ্রব শুদ্ধস্বভাব।
সর্বগুণাকর
হিংসাদ্বেষহর
'ধর্মচক্র'ধর সত্যানুভাব।
জয়তু বুদ্ধ জয়, জয় অমিতাভ ॥

গঙ্গা

(আচার্যশঙ্করের গঙ্গাস্তোত্রের ছায়াবলম্বনে)

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

নমি নমি সুন্দরি স্নিগ্ধে ও গঙ্গে
কত শোভা বিরাজিত তরল তরঙ্গে।
তব স্থান শিব চির-শির-জটারণ্যে,
মর্তেতে প্রবাহিত পবহিত জন্যে।
সকলি তো সন্তাপ, তব জলবিন্দু—
স্পর্শেতে দূরে যায়, ভাসে সুখ-সিন্ধু!
স্বর্গেরও উচ্চেতে তব তট-তীর্থ,
পুণ্য ও পূত হয়ে বিরাজিছে নিত্য।
যেবা রয় সেথা চির ভাবি নিজ রত্ন,
স্মরিবে কি—করিবে কি যম তার যত্ন?
তব মাতঃ জন্ম যে হরিপাদ-পদ্মে
বিশ্বের বন্দিত জহ্নুর মধ্যে।
যার গুণগান গেয়ে হার মানে ব্রহ্মা,
তার গান গাহিব কি আমি ক্ষণজন্মা!
প্রার্থনা শুধু মাগো, মৃত্যুতে অন্তি
নিয়ে তব অঙ্কেতে দিয়ো মোরে স্বস্তি!

গৌতম বুদ্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ

(সঙ্কলিত)

আর সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহান্ তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসাইয়াছিল, তাহার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্তি দেখিয়া থাকি। তিনি আর কেহই নহেন, আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। তোমরা সকলেই তাঁহার উপদেশ ও প্রচারকার্যের বিষয় অবগত আছ। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, জগৎ এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্মযোগীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজেরই শিষ্যরূপে তাঁহার নিজ মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। * * * বুদ্ধ দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন তজ্জন্য দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি দ্বিতীয় রামের ন্যায় চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

(ভারতে বিবেকানন্দ, 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ')

আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ও-সম্বন্ধে কখনও প্রশ্নই করেন নাই, ও-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন লোকের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের মঙ্গল কিসে হয়, ইহাই যাঁহার চিন্তা ছিল। বুদ্ধের জীবনচরিত-লেখক বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্য ধ্যানধারণা করিতে বনে যান নাই। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন জগৎ জ্বলিয়া গেল,—উহা হইতে বাঁচিবার পথ তাঁহাকে বাহির করিতে হইবে। তাঁহার সারা জীবনকে অধিকার করিয়া ছিল এই একটি প্রশ্ন—'জগতে এত দুঃখ কেন ?'

(জ্ঞানযোগ, 'কর্মজীবনে বেদান্ত', ৪র্থ প্রস্তাব)

অপরদিকে আবার ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বাণী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিতেছে। সেই বাণী বলিতেছে,—সময় চলিয়া যাইতেছে, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপূর্ণ। হে মোহনিদ্রাভূত নরনারীগণ! তোমরা পরম মনোহর হর্ম্যতলে বসিয়া বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম উপাদেয় চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা

রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছ—এদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদের কথা কি ভ্রমেও তোমাদের মানসপটে উদিত হয়? ভাবিয়া দেখ, জগতের মধ্যে মহাসত্য এই—সর্বং দুঃখমনিত্যমধ্রুবং—দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ—সমগ্র জগৎ দুঃখপূর্ণ। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াই কাঁদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন—ইহাই মহাসত্য ঘটনা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাঁদিবারই স্থান। সুতরাং আমরা যদি ভগবান বুদ্ধদেবের বাক্যকে হৃদয়ে স্থান দিই, তবে আমরা যেন কখনও স্বার্থপর না হই।

(মহাপুরুষপ্রসঙ্গ, 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ')

শাক্যমুনি নূতন মত প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর ন্যায় তিনিও পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, প্রাচীন য়াহুদীগণ নূতন ধর্মপুস্তককে প্রাচীন ধর্মপুস্তকের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু এদিকে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মস্থ সত্যসমূহের পরিণতি, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি পুনর্বার বলিতেছি যে, শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নহে। হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি, স্বাভাবিক বিকাশ হইলে যাহা হয় তিনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। * * * শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন এবং বেদে যে সমুদয় সত্য সুগুপ্ত ছিল, তাহার উদার হৃদয় সেই সমুদয় সত্যকে পৃথিবীর যাবতীয় জনসাধারণের গোচর করিয়া দিয়াছিল। জগতে কার্যতঃ ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে তিনিই সকলের আদিগুরু।

(চিকাগো বক্তৃতা, 'বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ')

বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন, (কারণ, বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের শাখাবিশেষ মাত্র) আর শঙ্করকেও কেউ কেউ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বল্‌ত। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন—শঙ্কর সেইগুলো সংশ্লেষণ কর্‌লেন। বুদ্ধ কখনও বেদ বা জাতিভেদ বা পুরোহিত বা সামাজিক প্রথা—কারো কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চল্‌তে পারে, ততদূর নির্ভীকভাবে যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। বুদ্ধ যেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিন জাতির জন্য করেছিলেন। বুদ্ধ নিজের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করতেন না।

(দেববাণী, পৃষ্ঠা ১৩০)

থের-গাথা থেকে*

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এম্-এ

'নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স'

খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দীতে ধর্মজগতের ভাস্কর ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য দেবমানবের পূজনীয় এক অপূর্ব সন্ন্যাসিসংঘ সৃষ্টি করেন। এই সংঘের প্রত্যেকের নাম ছিল ভিক্ষু, কারণ তাঁদের ব্রত ছিল বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করা। অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেওয়া, অসুস্থকে সুস্থ করা এবং আর্তকে পরিত্রাণ করা ছিল তাঁদের ধর্ম। গৃহস্থেরা তাঁদের বাসের জন্য 'সংঘারাম' করে দিতেন, বেশীর ভাগ এঁরা সেইখানেই থাকতেন। অল্পসংখ্যক বনে-জঙ্গলে, নদীর ধারে, পর্বতে গিয়ে নির্জনে তপস্যা করতেন। সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। কেবল যাঁরা শিক্ষা দিতেন তাঁদের 'থের' বলা হত। থের শব্দটি সংস্কৃত স্থবির হতে নিষ্পন্ন হলেও এর দ্বারা সংঘে বৃদ্ধ বুঝাত না, বিজ্ঞ ভিক্ষু বুঝাত। থের-গাথা পুস্তকখানি মহারাজ অশোকের সময় সংকলিত হয়ে বৌদ্ধ মূল ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত হয়। গাথা বলতে আমরা ছন্দে প্রাণের উচ্ছ্বাস বুঝি। এতে কিন্তু কবিত্ব, প্রেমতত্ত্ব, অনুরাগ, বন্দনা এসব কিছুরই পরিচয় নাই, আছে গুরুগম্ভীর উপদেশ ও থেরদের পূর্বজীবনের কিছু কিছু স্মৃতি—মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষাশ্রিত উদাসী সন্ন্যাসীর বাণী—থেরদের প্রাণে তাঁদের দেবতা বুদ্ধদেব কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন তারই ভাব—ভারতের নানাদেশ এবং জাতির অন্তর্গত হয়ে তাঁরা কি ভাবে তাঁকে দর্শন করেছেন তারই কথা।

কেহ তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিকতা নিয়েছেন, কেহ তাঁর মহাশক্তি লাভ করে ধ্যান করেছেন, কেহ ব্যাকুল সংসারের প্রলোভন থেকে পালাবার জন্য, আবার কেহ তাঁর অনন্ত সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে সকলের মধ্যে সেই সৌন্দর্য দেখছেন।

অল্পদিন হল এই থেরদের মধ্যে দুইজনের—বুদ্ধের দুই কৃতী সন্তান সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলায়নের সম্মাননায় সারা বৌদ্ধজগৎ এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত উদ্বেলিত হয়েছিল। এঁদেরই গাথার কিছু অংশ প্রথমে উল্লেখ করব। এঁরা দুজনেই বুদ্ধদেবের পূর্বে দেহত্যাগ করেছিলেন, প্রথমে সারিপুত্ত, পরে মোগ্‌গলায়ন।

মহাপ্রজ্ঞাবান থের সারিপুত্ত বলছেন :

> নিধীনং ব পবত্তারং যংপস্‌সে বজ্জদস্‌সিনং
> নিগ্‌গয়হ বাদীং মেধাবীং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে
> তাদিসং ভজমানস্‌স সেয্যো হোতি ন পাপিয়ো

ধনলাভের সন্ধানদাতার মত মেধাবী পণ্ডিতকে ভজনা করবে, যিনি দোষ দেখিয়ে তোমার ভুলগুলি সংশোধন করে দিবেন। এরূপ লোককে ভজনা করলে ভাল হয়, মন্দ হয় না।

> ওবাদেয্যো নুসাসেয্যা অসত্তা চ নিবারয়ে
> সতং হি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি অপ্পিয়ো

হিতকর কথা বলবে, মঙ্গলের জন্য শাসন করবে, অশ্লীল কর্ম হতে বিরত করবে। এরূপ লোক সাধুদের প্রিয়, অসাধুর অপ্রিয়।

> অঞ্‌ঞস্‌সম ভগবা বুদ্ধো ধম্মং দেসেসি চক্খুমা
> ধম্মে দেখিয়মানম্‌হি সোতং ও ধেসিং অত্থিকো
> তং মে অমোঘং সবনং বিমুত্তোম্‌হি অনাসবো

ভগবান বুদ্ধ যখন অন্যকে ধর্ম উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন আর একজন সেই উপদেশ পাবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। সেই শ্রবণ আমার

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।

অমোঘ হয়েছে, আমি সমস্ত আসক্তি ও পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি।

যথাপি পব্বতো সেলো অচলো সুপ্পতিট্ঠিতো
এবং মোহক্খয়া ভিক্খু পব্বতো ব ন বেধতি

যে রকম পর্বত অচলভাবে প্রস্তরের মত প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই রকম মোহক্ষয়প্রাপ্ত ভিক্ষু অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং
নিক্খিপিস্সং ইমং কায়ং সম্পজানো পটিস্সতো

আমি মরণকে অভিনন্দন করি না, বাঁচবার জন্য চেষ্টা করি না। স্মৃতিবান ও সজ্ঞান হয়ে আমি দেহত্যাগ করতে পারি।

'সম্পাদেথ অপ্পমাদেন' এসামে অনুসাসনী
হন্দাহং পরিনিব্বিস্সং বিপ্পমুত্তোম্হি সব্বধি

আমাদের উপদেশ, অপ্রমাদের দ্বারা নির্বাণ লাভ কর। দেখ, সব দিক হতে মুক্ত হয়ে আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হচ্ছি।

দ্বিতীয়—মোগ্গলায়ন ছিলেন মহাশক্তিশালী ও ঋদ্ধিবান মহাপুরুষ, অলৌকিক কার্য করতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষু। ইনি বলছেন—

আরঞ্ঞকা পিণ্ডপাতিকা উন্ছাপত্তাগতেরতা
দালেমু মচ্চুনো সেনং অজ্ঝত্তং সুসমাহিতং

অরণ্যে থেকে, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে এবং যদৃচ্ছালাভ ব্রত লয়ে আমি ধ্যানে মৃত্যুর সেনানী-দিগকে পরাস্ত করব।

সত্তিয়া বিয় ওমট্ঠো ডয়্হমানেন মথকে
কামরাগ পহানায় সতো ভিক্খু পরিব্বজে

শূলের মত বিদ্ধকারী আর মস্তকদগ্ধকারী কামরাগ পরিত্যাগ করবার জন্যে ভিক্ষু স্মৃতিবান হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন।

চোদিতো ভাবিতত্তেন সরীরন্তিম ধারিনো
মিগারমাতু পাসাদং পদনঙ্গুট্ঠেন কম্পয়িং
ন ইদং শিথিলং আরত্ত নয়িদং অপ্পেন থামসা
নিব্বানং অধিগন্তব্বং সব্বগন্থ পমোচনং

অন্তিম দেহধারী ভগবান বুদ্ধ দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আমি পদনোঙ্গুষ্ঠে বিশাখার বিরাট প্রাসাদ কম্পিত করেছি। এই কার্যটি সোজা নয় বা অল্প আয়াসে হয় না। সমস্ত গ্রন্থিছিন্নকারী নির্বাণ লাভ করতে হয়।

বিবরং অনুপতন্তি বিজ্জুতং বিভারস্স পণ্ডবস্স চ
নগবিবরগতস্স চ ঝায়তিপুত্তো অপটিমস্স তাদিনো

অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র বেভার ও পাণ্ডব পর্বতের গুহামধ্যে ধ্যান করছেন আর তার মধ্যে বিদ্যুৎপাত হচ্ছে।

উপসন্তো উপরতো পন্তসেনা সনো মুনি
দায়াদো বুদ্ধ সেট্ঠস্স ব্রহ্মুনা অভিনন্দিতো

শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের দায়াদ শান্ত উপরতো এবং গ্রামের প্রান্তে বসবাসরত মুনিকে আজ ব্রহ্মা এসে অভিবাদন করছেন।

তৃতীয়—থের তালপুট সংসারের প্রলোভন থেকে পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন এবং গাথায় ব্যাকুলতা ও দীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। এখানে ভাষা স্থির ও ধীর নয়, আবেগময়ী ও গতিশীল।

কদানু হং পব্বত-কন্দরাসু
একাকিয়ো অদ্দুতিয়ো বিহস্সং
অনিচ্চতো সব্ব ভবং বিপস্সং তং মে ইদং
তং নু কদা ভবিস্সতি

কবে আমি সমস্ত জগৎ সংসার অনিত্য জেনে পর্বত কন্দরে একাকী বাস করব; কবে আমার এই অদ্বিতীয় অবস্থাটি পূর্ণ হবে।

কদানু হং ভিন্ন-পটন্ধরো মুনি
কসাববথো অমমো নিরাসয়ো
রাগঞ্চ দোষঞ্চ তথ এব মোহং
হন্ত্বা সুখী পবনোগতো বিহস্সং

কবে ছিন্ন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মমতা এবং আসক্তি শূন্য হয়ে কাষায় ধারণ করে রাগ দ্বেষ মোহ বিনাশ করে আনন্দে বনে বাস করব।

কদা অনিচ্চং বধ রোগ নীড়ং কায়ং ইমং
মচ্চু জরায় উপদ্দুতং
বিপস্স-মানোবীতভয়ো বিহস্সং
একো বনে তং নু কদা ভবিস্সতি।

কবে আমার দেহকে জরা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, রোগ বধ বন্ধন প্রভৃতির আবাসস্থল ও অনিত্য দেখে ভয়শূন্য হয়ে বনে একাকী বাস করব, সেদিন কবে হবে।

কদা ইনট্টোব দলিদ্দকো নিধিং
আরাধয়িত্বা ধনিকম্হি পীড়িতো।
তুট্ঠো ভবিস্সং অধিগম্ম সাসনং
মহেসিনো তং নু কদা ভবিস্সতি॥

ধনিকের দ্বারা নিপীড়িত ঋণার্ত ব্যক্তির ধন-প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়ার মত মহান ঋষির ধর্ম লাভ করে কবে আমি তুষ্ট হব।

বহুনি বস্সানি তয়াম্হি যাচিতো
অগার বাসেন অলং নু তে ইদং
তং দানি মং পব্বজ্জিতং সমানং
কিং কারণ চিত্ত তুবং ন যুঞ্জসি

হে চিত্ত, আমি যখন গৃহে বাস করতাম তুমি আমাকে প্রব্রজ্যা নিতে উৎসাহ দিতে। আজ আমি সন্ন্যাসী, কেন আমাকে সেই উৎসাহ আর দিচ্ছ না।

চতুর্থ—কেহ নির্বাণের অনন্ত সৌন্দর্য দেখে প্রকৃতির মধ্যেও সেই সৌন্দর্য দেখছেন এবং কবিত্বের দ্বারা শাস্তাকে প্রসন্ন করছেন :– রাজা শুদ্ধোদন, পুত্র বুদ্ধ হয়েছেন জেনে তাকে কপিলবস্তুতে আনবার জন্য দুবার লোক পাঠালেন, প্রথমটি এসে সন্ন্যাসী হলেন আর উদ্দেশ্য ভুলে গেলেন ; দ্বিতীয়টি সন্ন্যাসী হলেন বটে কিন্তু উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। তাই কালুদায়ী থের বসন্তের আগমনে বুদ্ধদেবকে বলছেন :

অঙ্গারিনো দানি দুমা ভদন্তে
ফলেসিনো ছদনং বিপ্পহায়
তে অচ্চিমন্তো ব পভাসয়ন্তি
সময়ো মহাবীর ভগীরসানং
ন এবাতি সীতং ন পনাতি উন্হং
সুখী উতু অদ্ধনীয়া ভদন্তে
পস্সন্তু তং সাকিয়া কোলিয়া চ
পচ্ছামুখং রোহিনিয়ং তরন্তং

ভদন্ত, এখন বৃক্ষশীর্ষগুলি লালবর্ণ দেখাচ্ছে, পুরনো পত্রাচ্ছাদন ফেলে তারা এখন নূতন পত্র ও পল্লব ধারণ করবার ইচ্ছা করছে এবং দূর হতে অগ্নিশিখার মত শোভা পাচ্ছে। হে মহাবীর, যারা আশান্বিত এই তাদের আশা পূর্ণ হবার সময়। এখন বেশী শীত নাই, বেশী গ্রীষ্মও নাই, ঋতু গমনা-গমনের পক্ষে সুখকর। শাক্য এবং কোলিয়োগণ আবার দেখুক আপনি রোহিণী পার হয়ে ফিরে আসছেন।

আসায় কস্সতে খেত্তং
বিজং আসায় বুপ্পতি
আসায় বনিজা যন্তি
সমুদ্দং ধনহারকা
যায় আসায় তিট্ঠামি
সামে আসা সমিজ্ঝতু

আশাতেই লোক ক্ষেত্র কর্ষণ করে, আশাতেই বীজ বপণ করে। আশাতেই ধন আহরণ করবার জন্য বণিকেরা সমুদ্র পারে যায়। যে আশায় আমি আশান্বিত সেই আশা এখন পূর্ণ হ'ক।

ভগবানের মনে পড়ল যে তিনি কপিলবস্তু ত্যাগ করে আসবার সময় রোহিণীর পরপারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন 'কপিলবস্তু, আমি বোধি লাভ করে আবার তোমার কোলে ফিরে আসব।' তখনি তিনি কপিলবস্তু যাত্রা করবার উদ্যোগ করলেন।

ইতিহাসাশ্রিত জাতক

শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্

জাতকের গল্পগুলি অধিকাংশই গৌতমের গতজন্মে আরোপিত সরস উপাখ্যান। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য ইতর জীবের মাধ্যমেও বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে; বারবার জন্মগ্রহণ করিলেও প্রতিবারই তিনি যে সৎকর্ম করিতেছেন, যে সদাচার করিতেছেন—গল্পগুলিতে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ সকল কাহিনী গল্পই মাত্র; ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রাকৃতজনকে বিতরণ করিবার এ একটি সরস ও সহজ পন্থামাত্র।

এই সকল কাহিনীতে আরোপিত চরিত্রগুলি হইতে সেকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের বিস্তারিত চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্বের জন্মান্তরের স্মৃতিকথার মাধ্যমে জাতককারেরা তাঁহাদের আমলের কথাই বিবৃত করিয়াছেন।

এগুলি ছাড়া বুদ্ধদেবের সময়ের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি জাতক রচিত হয়। অধিকাংশ জাতকের মধ্যে যেমন বৌদ্ধধর্মের মূল অনুশাসন, রীতি-নির্দেশ, নীতি-উপদেশ বিবৃত হইয়াছে, এগুলিতে তেমনই তাঁহার সময়ের ইতিহাসের ছায়াপাত হইয়াছে।

ভগবান বুদ্ধদেবের জীবন তো রীতিমত নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ ছিল, তাঁহাকে নানা প্রতিকূলতা, নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, নানা বৈরিতাকে জয় করিতে হইয়াছে। বিশ্বমানবের দুঃখ-দুর্দশা দূরিত করিতে তাঁহাকে বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। সেগুলির মধ্যে দেবদত্তের শত্রুতা একটি বিশিষ্ট ঘটনাসংস্থান। দেবদত্ত ছিলেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অন্তরঙ্গজন, কিন্তু বহুভাবেই তিনি বুদ্ধদেবের প্রতিকূলতা করিয়াছেন, তাঁহাকে হত্যা করিবার বারবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সমস্ত ঘটনা জাতকে রূপায়িত হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সম্রাট অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজারা ইতিহাসখ্যাত রাজন্য, তাঁহাদের কথাও অনেক জাতকে প্রসঙ্গক্রমে স্থান পাইয়াছে।

বিরোচন জাতক, খণ্ডহাল জাতক, চুল্লহংস জাতক, সমুদ্দবাণিজ জাতক, থুস জাতক, বড়্ঢকি-সূকর জাতক প্রভৃতি জাতক এইরূপ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। এখানে তাহার মধ্যে মূল পালি হইতে 'খণ্ডহাল জাতক' গল্পটি বিবৃত হইতেছে—

অজাতশত্রু তাঁহার পিতা রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। অনেকে অনুমান করেন দেবদত্ত ছিলেন অজাতশত্রুর পরামর্শদাতা।

তিনি রাজা হইলে পর দেবদত্ত আসিয়া নির্জনে তাঁহাকে একদিন বলিলেন—"আপনার বাসনা সিদ্ধ হয়েছে, এবার আমার বহুদিনের সাধ গৌতমকে হত্যা করে তাঁর স্থানাভিষিক্ত হই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

পাপিষ্ঠ অজাতশত্রু ইতিপূর্বেই তাঁহাকে সহায়তা করিবার কথা দিয়াছিলেন, তিনি সানন্দে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—"বলুন, তাঁকে কিভাবে হত্যা করা যায়! আমারও তাঁর ওপর বেশ আক্রোশ আছে।"

দেবদত্ত রাজার কাছ থেকে একত্রিশ জন নির্বাচিত তীরন্দাজ বাছিয়া লইলেন। তিনি ছিলেন যেমন কূটচক্রী, তেমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। যোদ্ধাদের আলাদা আলাদা ডাকিয়া গোপনে তিনি নির্দেশ দিতে লাগিলেন।

প্রথমেই তাহাদের দলপতিকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—"দেখ, গৌতম গৃধ্রকূটে তাঁর সাধনাশ্রম থেকে বহির্গত হয়ে এই সময়টায় বাইরে পায়চারি করে থাকেন, তুমি গিয়ে তাঁকে হত্যা করে প্রথম পথ দিয়ে ফিরে এসো।"

নেতাটি চলিয়া গেলে, তিনি দুইজন তীরন্দাজকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—"তোমরা প্রথম পথে অপেক্ষা কর, রক্তাক্ত দেহে কাউকে আসতে দেখলেই তাকে নির্বিচারে হত্যা করবে, তারপর দ্বিতীয় পথে ফিরে এসো।"

তাহারা বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল। তখন অপর চারজন যোদ্ধাকে ডাকিয়া দেবদত্ত বলিলেন—

"তোমরা দ্বিতীয়পথে দাঁড়িয়ে থাকো, দুজন লোককে রক্তাক্ত দেহে আসতে দেখলেই হত্যা করে তৃতীয় পথে সত্বর ফিরে আসবে।"

তারপর আটজন যোদ্ধাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা তৃতীয় পথে চারিব্যক্তিকে রক্তাক্ত কলেবরে আসতে দেখলেই তাদের মেরে চতুর্থ পথে ফিরে আসবে।"

তারপর ষোলজন যোদ্ধাকে আড়ালে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—"তোমরা চতুর্থ পথে আটটি লোককে রক্তাক্ত দেহে ফিরতে দেখলেই তাদের হত্যা করবে।"

ভগবান বুদ্ধদেবের হত্যাকাণ্ডের কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যাহাতে না থাকে, চক্রী দেবদত্তও সেইজন্য এইরূপ আয়োজন করিলেন। কেবল গৌতমই নয়, এতগুলি যোদ্ধাকেও অকারণে হত্যা করিবার তিনি ব্যবস্থা করিলেন।

নেতা ছিল যেমন সুপ্রসিদ্ধ বীর, তেমনই নিষ্ঠুর হত্যাকারী। সে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তথাগতের পথ অবরোধ করিল। ধনুকে শর-সজ্জা করিয়াও কিন্তু কি এক মায়াবলে আর সে হাত নাড়াইতে পারে না! কোন অজানা আশঙ্কায় সেই অসমসাহসী যোদ্ধা ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বুদ্ধদেব তাহাকে দেখিয়া সকল ব্যাপার অনুমান করিলেন, তারপর মধুর স্বরে আহ্বান করিলেন—"এসো বৎস, আমার কাছে এগিয়ে এসো।"

লোকটি অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে পড়িল। ভগবান তাহার মস্তকে কৃপাহস্ত রাখিলেন। সে কাতরস্বরে বলিল—"আমাকে মার্জনা করুন, ভগবন্। আমি দেবদত্তের কথায় আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম।"

বুদ্ধদেব তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া নিকটে বসাইলেন, তারপর তাহাকে ধর্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেবদত্তের কাছ থেকে দূরে থাকো।"

এদিকে তাহার দেরি দেখিয়া প্রথম পথের অপেক্ষমান যোদ্ধাদ্বয় তাহার খোঁজে আগাইয়া আসিল, তারপর বুদ্ধদেবকে দেখিয়া তাঁহার কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিল।

এইভাবে একে একে সব কয়টি হন্তাই তাঁহার কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিল। পরবর্তীকালে দেবদত্তের নিয়োজিত ঐ হত্যাকারীরা সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে।

এদিকে দেবদত্তও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় নেতা যোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"আমাকে ক্ষমা করবেন। তথাগত বুদ্ধদেবকে আমি হত্যা করতে পারব না—বরং আপনি আমাকে বধ করুন।"

"নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়; মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধস্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ (বুদ্ধপ্রসঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৩।২৫।১)

অনির্বাণ

শান্তশীল দাশ

প্রসন্ন প্রশান্ত চিত্তে যেন প্রতিদিন
তোমার সকল দান, হে চিরসুন্দর
নিতে পারি আমি সর্বদ্বিধাদ্বন্দ্বহীন
অন্তরের অন্তরেতে ; ললাটের 'পর
সংশয়ের কৃষ্ণরেখা, অতৃপ্ত কুঞ্চন
নাহি যেন জাগে ; যেন প্রশস্ত উদার
থাকি সর্ব দুঃখ-সুখে ; মিথ্যা অকারণ

সৃষ্টি ক'রে অভিযোগ, ক্ষুদ্র খণ্ডতার
আবরণ দিয়ে ঘিরে রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে
অভিশপ্ত করে যেন নাহি তুলি এই
জীবনের দিনগুলি ক্ষুব্ধ অবিশ্বাসে।
তোমার দানের মাঝে অকল্যাণ নেই—
এই চিরসত্য যেন না হই বিস্মৃত,
চিত্ত থাক্ নিঃসংশয় শুদ্ধ অবিকৃত।

দুঃখনিবৃত্তি—নির্বাণ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

দুঃখের নিবৃত্তি আছে, ইহাই বুদ্ধদেবের ঘোষিত তৃতীয় আর্য সত্য। দুঃখের কারণ যখন আছে, তখন সেই কারণ দূরীভূত হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। 'কষায়'দিগকে (passions) দমন করিয়া যখন সত্যজ্ঞান লাভ হয় তখন বন্ধন হইতে জীব মুক্তি লাভ করে এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তখন মানুষ 'অর্হৎ' হয়। এই অবস্থা 'নির্বাণের' অবস্থা—কষায়ের বিনাশ এবং দুঃখের বিনাশের অবস্থা। ইহ জন্মেই এই অবস্থা লাভ করা যায়। বুদ্ধ তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নির্বাণের স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। 'নির্বাণ' শব্দের ধাতুগত অর্থ নিভিয়া যাওয়া—দীপ যেমন নিভিয়া যায়, সেইরূপ। নির্বাণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নেতিবাচক। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "বন্ধনমুক্ত মন অগ্নিশিখার নির্বাণের সদৃশ" (দীঘানিকায়, ২।১৫) তৃণ অথবা কাষ্ঠ পুড়িয়া শেষ হইলে অগ্নির যে অবস্থা হয়, তাহার সহিতও বুদ্ধ নির্বাণের উপমা দিয়াছেন। উপনিষৎ যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন—পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়া, নির্বাণ তাহা নহে। বুদ্ধ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ৩৫ বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং নির্বাণলাভের পর অশীতি বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন ; ইহা হইতে বোঝা যায় যে নির্বাণ অর্থ অস্তিত্বের নাশ নহে। নির্বাণ লাভের পর ৪৫ বৎসর তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিবিধ নির্বাণের কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়—উপাধিশেষ নির্বাণ ও অনুপাধিশেষ নির্বাণ। চাইলডার্সের (Childers) মতে অর্হতের নির্বাণ উপাধিশেষ নির্বাণ, তাহাতে পঞ্চস্কন্ধরূপ উপাধিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কামনার বিলোপ হয়। অনুপাধিশেষ নির্বাণে মৃত্যুর পরে অর্হতের সমগ্র সত্তার বিলোপ হয়। যে নির্বাণে উপাধি অবশিষ্ট থাকে না, তাহাই যদি অনুপাধিশেষ হয়, তাহা হইলে সে নির্বাণে অস্তিত্বেরও বিনাশ হয় বলিলে অত্যুক্তি হয়। উপাধি বিহীন অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে থাকিতে যখন কেহ নির্বাণ লাভ করে, তখন সেই নির্বাণ উপাধিশেষ নির্বাণ। তাহা নির্বাণপ্রাপ্ত অর্হৎ যখন নশ্বর জগৎ হইতে প্রস্থান

করেন, তখন সেই নির্বাণকে পরিনির্বাণ বলে। সুতরাং উপাধিশেষ ও অনুপাধিশেষ নির্বাণে যে অস্তিত্বের বিলোপ হয়, তাহা ইহা দ্বারা সমর্থিত হয় না। কেহ কেহ বলেন সত্তার ঐকান্তিক পূর্ণতাই পরিনির্বাণ। "বুদ্ধ সংবিদের অনবদ্য অবস্থার প্রবাহকে পরিনির্বাণ বলিয়াছেন (সর্বসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ—ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের গ্রন্থে উদ্ধৃত) নির্বাণ পূর্ণতার শেষ সীমা, পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা, বিনাশের অতল গহ্বর নহে। নির্বাণে ব্যক্তিত্বের অহংকারের নাশ হয়। আমরা সমগ্র বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হই, সমগ্রের সঙ্গে—অতীত, আগত ও অনাগত—সকলের সঙ্গে একীভূত হই। সত্তার পরিধি তখন সতের (Reality) প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইহা অহংভাববর্জিত কালাতীত শান্তিপূর্ণ পবিত্র আনন্দের অবস্থা।"[১]

'মিলিন্দপংহে' নাগসেন নির্বাণ সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন: "তথাগত (সংসার হইতে) চলিয়া গিয়াছেন, এমন ভাবে গিয়াছেন যে কোনও মূল অবশিষ্ট নাই, যাহা হইতে অন্য আর এক ব্যক্তির উদ্ভব হইতে পারে। তথাগতের সমাপত্তি হইয়াছে এবং তিনি এখানে বা ওখানে আছেন ইহা নির্দেশ করা যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মতের মধ্যে তাঁহার নির্দেশ করা যায়।" "বুদ্ধের অস্তিত্ব আর নাই, সেইজন্য আমরা তাঁহার পূজা করিতে পারি না। সেইজন্য আমরা তাঁহার দেহাবশেষের পূজা করি।" এই সকল উক্তি হইতে মনে হয় নাগসেন নির্বাণকে ঐকান্তিক বিনাশ বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু মোক্ষমূলার (Maxmuller) এবং চাইল্ডার্স নির্বাণ সম্বন্ধে সমস্ত উক্তির পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এমন কোনও উক্তি দেখিতে পান নাই যাহাতে ঐকান্তিক বিনাশ অর্থে নির্বাণ শব্দ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু মিসেস্ রাইস্ ডেভিড্স (Rhys-Davids) বলিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ ঐকান্তিক বিনাশ।" ওলডেনবার্গের (Oldenberg) মতও ঐরূপ। বিশপ বিগান্‌ডেট্ বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্মে নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টার পুরস্কার হইতেছে বিনাশের অতল সমুদ্র। ডাহ্‌লক্ লিখিয়াছেন, "কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মেই দুঃখ হইতে মুক্তির ধারণার মধ্যে ভাবমূলক কিছু নাই, ইহা সম্পূর্ণ অভাবাত্মক ধারণা। ইহার মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দের ভাব নাই।"

জীবের মধ্যে অবিনশ্বর কিছু আছে অথবা নাই, এই প্রশ্ন উত্থাপন করা বৌদ্ধশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তথাগতকে শাশ্বত অথবা অশাশ্বত রূপে চিন্তা করা, অথবা তাঁহার অস্তিত্ব আছেও এবং নাইও—এই ভাবে চিন্তা করা, অথবা তিনি আছেন ইহা নহে এবং আছেন না ইহাও নহে—এইরূপে তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করা বৌদ্ধধর্মবিরোধী। নির্বাণ কি ভাবাত্মক ও শাশ্বত অবস্থা অথবা অভাবাত্মক ঐকান্তিক বিনাশের অবস্থা, ইহার আলোচনা করাও নিষিদ্ধ।[২]

এই মতের অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে নাগার্জুন এবং চন্দ্রকীর্তি বলিয়াছিলেন, কোনও বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, সুতরাং বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা অর্থহীন। সংসার ও নির্বাণের কোনও পার্থক্য নাই, কেননা সকলই প্রতিভাস মাত্র, কিছুর মধ্যেই কোনও সার নাই। সংসারের মধ্যে কখনও কিছুই ছিল না ও নাই, এবং নির্বাণেও বিনষ্ট হইবার কিছু নাই।[৩]

বুদ্ধের সময়েও তাঁহার মত সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ইহা বলিয়াছি বলিয়া (নির্বাণের অবস্থা বর্ণনার অযোগ্য) আমাতে

১ Dr. S. Radhakrishnan

২ Das Gupta, History of Indian Philosophy Vol. 1-P 109

৩ Das Gupta, History of Indian Philosophy.

মিথ্যা দোষের আরোপ করে।...তাহারা বলে, শ্রমণ গৌতম নাস্তিক। সে বলে সৎবস্তু নশ্বর, তাহার ঐকান্তিক বিনাশ হয়, তাহার কিছুই থাকে না। আমি যাহা নহি, তাহারা আমাকে তাহাই বলে, যাহা আমার মত নহে, তাহারা তাহাই আমার মত বলে।" (মাজ্ঝিম নিকায়—২২)

মহাযানী বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভবাঙ্গ' বা সত্তাসাগরের বর্ণনা আছে। সত্তাসাগরের উপর অবিদ্যা বায়ু প্রবাহিত হইবার ফলে, তাহার শান্ত প্রবাহে তরঙ্গের উদ্ভব হয়। তখন সুপ্ত আত্মা জাগরিত হয় এবং তাহাতে চিন্তার এবং সসীম ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়া সত্তাসমুদ্র হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তিত্বের প্রাচীর সুষুপ্তিকালে বিদূরিত হয়। এই ব্যক্তিত্ব-বিহীন অবস্থাই নির্বাণ। সুষুপ্তিতে সুষুপ্ত ব্যক্তির সত্তা শান্ত প্রবাহে প্রবাহিত। তখন চিন্তার তরঙ্গে সে প্রবাহে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় না। শাশ্বত সত্তার সহিত একীভূত হওয়াই নির্বাণ, ঐকান্তিক বিনাশ নহে। সত্তা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও নহে। বুদ্ধ স্পষ্টভাবে এই শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন নাই, কেননা তাহা মানবীয় চিন্তার অতীত অবস্থা। নেতি, নেতি বলিয়াই তাহার বর্ণনা করা যায়, তাহার ভাবাত্মক বর্ণনা অসম্ভব, কেননা তাহার সদৃশ কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে নাই বলিয়া তাহার উপযোগী ভাষাও নাই। ইহার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ নাই, স্বয়ং সংবিদের কোনও চিহ্নই নাই। ইহা সক্রিয় অবস্থা কিন্তু কার্যকারণ নিয়মাধীন নহে—কারণহীন স্বাধীনতার অবস্থা—দেশকালের অতীত অবস্থা। থের-গাথা ও থেরী-গাথায় এই অবস্থার প্রগাঢ় সুখ ও অবিনশ্বর আনন্দের মনোরম বর্ণনা আছে। ব্যক্তির সসীম সংবিদ্ তখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপেক্ষিক সত্তাবান কিছুই থাকে না। থাকে নিরবচ্ছিন্ন মৌন ও শান্তি। ইহা আত্মনাশ, কেননা ইহাতে অহংকারের লেশমাত্র থাকে না। আবার ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা। সূর্যোদয়ে নক্ষত্ররাজির এবং গ্রীষ্মাগমে মেঘের তিরোভাব ইহার উপমাস্থল। নির্বাণ ঐকান্তিক বিনাশ নহে।

নির্বাণ আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নহে বলিয়া বুদ্ধ তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তেবিজ্জসুত্তে তিনি নির্বাণকে ব্রহ্মার সহিত মিলন বলিয়াছেন। ব্রহ্মার সহিত মিলনের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেননা বুদ্ধের মতে জগতে সকলই অস্থায়ী। কিন্তু বুদ্ধ এক স্থায়ী বস্তু যে আছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "শিষ্যগণ, উৎপন্ন হয় নাই, সৃষ্ট হয় নাই, পিণ্ডীকৃত হয় নাই, এরূপ কোনও বস্তু আছে। যদি না থাকিত, তাহা হইলে জাত বস্তুর সংসার হইতে বাহির হইবার উপায় থাকিত না।"

"চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু কর দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক্ প্রাণবান।"

—রবীন্দ্রনাথ

কোথায় সুখ, শান্তি কিসে ?

নরেন্দ্র দেব

বন্ধু, কেন মলিন মুখ ? কেন এ ঘন দীর্ঘশ্বাস ?
মাটির বুকে মনের সুখে ইচ্ছা যদি করিতে বাস,
আছেন বিধি একথা মেনো, রেখনা মনে অবিশ্বাস ;
নিজের প্রভু নও হে কভু ; সেবক তুমি সবার দাস।
সবাই জেনো মানুষ ভাল, ভেবনা কেউ মন্দ লোক,
দিওনা সায় সন্দেহেতে. যতই কেন প্রবল হোক।
ঠকাও ভাল বিশ্বাসেতে, অবিশ্বাসে অনেক ক্ষতি,
বিচার করে দেখতে হবে—হয় না যেন এ. দুর্মতি।
বিচারপতি নও তো তুমি, বিচার কেন করতে যাও ?
তোমার মতে সত্য যেটা, সত্য সেটা হয়ত' না-ও !

স্মরণ রেখ বিপুল ধরা, নেইকো হেথা কালের শেষ,
মানুষ চির-অবোধ শিশু, জ্ঞানীর নিও জ্ঞানোপদেশ।
বাদানুবাদ তর্ক ছেড়ে সবার কথা শোনাই ভালো,
ধর্মে যদি আস্থা থাকে অন্ধকারে পাবেই আলো।
সৃষ্টি ঘেরা রহস্যটা সঠিক যেবা বুঝতে পারে
প্রকৃতি দেন তাকেই ধরা, দেখান গূঢ় রূপটি তারে।
আধার তিনি সবার মূলে এই কথাটা জানবে যবে
স্রষ্টা আছে সৃষ্টি মাঝে দ্রষ্টা হয়ে বুঝবে তবে।
দেখবে নহে মানুষ একা সকল প্রাণী জন্তু জীব,
বৃক্ষ লতা তুচ্ছ তৃণ সবার মাঝে আছেন শিব।

মনের যদি শান্তি চাও, শরণ নাও চরণে তাঁর,
দুঃখ, শোক, সর্বগ্লানি, ঘুচবে তব অহংকার।
পূর্ণ করে দেবেন তিনি তোমার যত অপূর্ণতা
জন্ম হবে সফল যদি সবাই ভাবো তাঁহার কথা।
নিত্য পাবে ধ্যানের ধনে, বিশ্বরূপে ভরবে চিত,
কুণ্ডলিনী উঠবে জেগে আত্মা হবে আনন্দিত।

ভগবান শ্রীবুদ্ধের অন্তিম ভোজন।*

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

বৈশালিস্থিত উপস্থানশালায় সমবেত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া ভগবান তথাগত তাঁহার জ্ঞানলব্ধ সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে কহিতেছি সংযোগ মাত্রই বিপ্রযোগান্ত। অপ্রমত্ত হইয়া মুক্তির পথ পরিষ্কৃত কর। অচিরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।"

ইহার পরে প্রাতে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাত্র ও চীবরহস্তে ভগবান পিণ্ডপাতের উদ্দেশ্যে বৈশালিনগরে প্রবেশ করিয়া আহার সমাপনপূর্বক উক্ত স্থান ত্যাগ করিবার সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আনন্দ, ইহাই তথাগতের শেষ বৈশালি দর্শন। এখন ভণ্ডগ্রামে চল।" আনন্দ বৃহৎভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত ভগবানকে ভণ্ডগ্রামে লইয়া গেলেন। তথায় ভিক্ষুগণকে আর্যশীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার পর ভগবান সকলকে সঙ্গে লইয়া হস্তীগ্রাম, অম্বগ্রাম ও জম্বুগ্রাম হইয়া ভোগনগরে আসিয়া ভিক্ষুদিগকে চারি মহাপ্রদেশ (সত্যশিক্ষা নির্ণয়ের চারিটি উপায়) শিক্ষা দিয়া পরে সকলকে লইয়া পাবা গ্রামে কর্মকার চুন্দর আম্রবনে সমাসীন হইলেন।

ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ তাঁহার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া চুন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান ধর্মালোচনা দ্বারা চুন্দকে শিক্ষা, উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও হর্ষ প্রদান করিলেন। চুন্দের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তিনি যেন অভয়প্রাপ্ত হইলেন। কৃতকৃতার্থ হইয়া তিনি পরম বিনয়ের সহিত ভগবানকে ভিক্ষুসঙ্ঘসমেত পরদিন স্বীয় গৃহে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু মৌনাবলম্বন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চুন্দ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং সেই দিনই আহার্যের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

পরদিন প্রত্যূষ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাসময়ে বহুবিধ খাদ্যাদি চুন্দ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করাইলেন। ইহার মধ্যে 'শূকর মদ্দব' † বা শূকর মার্দব নামে একটি বিশেষ উপকরণের সহিত প্রস্তুত আহার্য ছিল। ইহা অতি উপাদেয় ভোজ্য জানিয়া চুন্দ ভিক্ষুগণের তৃপ্তির জন্য এই ব্যঞ্জন অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সকল প্রকার আহার্য প্রস্তুত করাইয়া চুন্দ

* শ্রীমৎ ভিক্ষু শীলভদ্র কৃত মহাপরিনির্বাণ-সূত্রান্তের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীমৎ ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ প্রণীত হিন্দী উদানগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

† 'মহা অট্ঠকথা' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে 'শূকরমদ্দব' অর্থে শূকরের মৃদু অর্থাৎ কোমল মাংস বুঝায়। কেহ বলেন ইহা শূকরের মাংস নহে, শূকর দ্বারা মর্দিত বাঁশের কোঁড় বা কচি বাঁশ। পল্লী অঞ্চলে কোঁড়ের ব্যঞ্জন এখনও প্রচলিত আছে। কেহ বলেন ইহা শূকর দ্বারা মর্দিত স্থানে স্বভাবতঃ জাত ব্যাঙের ছাতা (mushroom)। আবার কেহ বলেন শূকরমদ্দব নামে একপ্রকার রসায়ন প্রচলিত ছিল। আজ শ্রীবুদ্ধের পরিনির্বাণ হইবে জানিতে পারিয়া চুন্দ ভোজ্যের সহিত সেই রসায়ন মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই আশায় যে ভগবান যেন আরও কিছুদিন জীবন ধারণ করেন। ভিক্ষু শীলভদ্র মহাশয় ইহাকে 'শূকরকন্দ-পাক' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা সর্বসম্মত যে 'শূকরমদ্দব' আহার করিয়াই ভগবান তথাগতের প্রাণবিয়োগ হয়।

ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে আহার্য প্রস্তুত।

ভগবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাত্র ও চীবর হস্তে বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত চুন্দের ভবনে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরে চুন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি যে শূকরকন্দ-পাক প্রস্তুত করিয়াছ তাহা কেবল আমাকে পরিবেশন করিবে; বাকী যাহা সব আহার্য তাহা ভিক্ষুসঙ্ঘকে দাও। চুন্দ ভগবানের আদেশ পালন করিলেন।

তারপর ভগবান চুন্দকে বলিলেন—"চুন্দ, শূকরকন্দ-পাক যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া প্রোথিত করিয়া ফেল, কেননা দেব-লোকে, পৃথিবীতে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ অথবা দেব, মনুষ্যের মধ্যে তথাগত ব্যতীত এমন কাহাকেও দেখিনা যে উহা আহার করিয়া জীর্ণ করিতে পারে।" চুন্দ ভগবানের আদেশ পালনপূর্বক ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে অভি-বাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তখন বুদ্ধদেব তাঁহাকে ধর্মদেশনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও হর্ষান্বিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

কর্মকার-পুত্র চুন্দ প্রদত্ত শূকরকন্দ-পাক আহার করিয়া বুদ্ধদেব ভীষণ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। দুঃসহ তীব্র যাতনায় তিনি কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কিন্তু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে নীরবে উহা সহ্য করিতে লাগিলেন।

তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, চল আমরা কুশিনারায় যাই।" আনন্দ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া কুশিনারায় চলিলেন। পথে ভগবানের বার বার বিরেচন হওয়ায় শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। বয়স তখন তাঁহার আশী বৎসর। কুশিনারা যাইবার সময় ব্যাধির প্রবল আক্রমণে তিনি পথি-পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে গমন করিয়া আনন্দ দ্বারা অন্ত-বস্ত্র বিছাইয়া উপবেশন করিয়া আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ পানীয় সংগ্রহ কর, আমি তৃষ্ণার্ত।"

নিকটে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল, কিন্তু অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ শত শকট তাহার মধ্য দিয়া পরপারে যাওয়ায় জল ঘোলা হইয়া গিয়াছিল। আনন্দ ভগবানকে তাহা জানাইয়া বলিলেন অল্প দূরে ককুত্থা নদী আছে, তাহার জল অতি নির্মল ও সুপেয়, ভগবান তাহাই পান করিবেন। কিন্তু শ্রীবুদ্ধ বার বার পানীয় আনিতে বলায় আনন্দ নিকটস্থ ক্ষুদ্র নদীতে গিয়া দেখিলেন যে তাহার জল অতি স্বচ্ছ ও স্বাদু। তিনি বিস্ময়ে ভগবানের মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করিতে করিতে জল আনিয়া তাঁহাকে দিলেন ও জলের অভাবনীয় নির্মলতার কথা বলিলেন। ভগবান জল পান করিলেন।

অতঃপর আলার কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুক্কস সেই রাজপথে পাবায় যাইতে যাইতে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা ও ধর্মদেশনা লাভ করিয়া তাঁহাকে দুইটি মনোহর পরিচ্ছদ উপহার দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন—"আনন্দ, আজ রাত্রির পশ্চিম যামে কুশিনারায় মল্লগণের উপবর্তন নামক শালবনে যুগ্ম শালতরুর মধ্যস্থলে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। চল ককুত্থা নদীতে গমন করি।" তখন পুক্কস-উপহৃত অতি মহার্ঘ বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া কাঞ্চনবর্ণ শাস্তা যেন সুবর্ণনির্মিত মনোরম মূর্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সর্বত্যাগী চীবরধারী সন্ন্যাসী, অপর কোনও মহার্ঘ পরিধেয় ব্যবহার করিতেন না। নিয়মবিরুদ্ধ হইলেও তিনি পুক্কসের এই শ্রদ্ধার দানের অবমাননা করিলেন না। যিনি নিষ্কাম, পরিধেয়ের আরোপিত সৌষ্ঠব তাঁহার কি করিবে? "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?"

ইহার পর সকলে মিলিয়া ককুত্থা নদীতে গমন করিলেন। ভগবান তাহাতে অবগাহন ও স্নান করিয়া

জলপান করিলেন, পরে নদী পার হইয়া এক আম্র-কাননে গমন করিয়া আয়ুষ্মান চুন্দকে অজবস্ত্র চারিপাট করিয়া পাতিতে বলিলেন। তাহা পাতা হইলে ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া উত্থান সংজ্ঞা মনস্থ করিয়া পাদোপরি পাদ রক্ষা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব ফিরিয়া সিংহশয্যায় শয়ন করিলেন।

শাস্তা বুঝিলেন তাঁহার পরিনির্বাণ আসন্ন। তখন করুণার সাগর শাক্যসিংহ সমাজের নিমস্তর-ভুক্ত প্রায়-অবজ্ঞাত কর্মকার চুন্দের কথা উত্থাপন করিলেন। চুন্দের কথা বোধহয় একবারও তাঁহার স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। চুন্দের প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করিয়াই তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া পাছে কেহ চুন্দকে গঞ্জনা দেয়, বা চুন্দের অনুশোচনা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইতেছিল। তাই প্রথমেই ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আনন্দ, কেহ কর্মকার-পুত্র চুন্দকে এইরূপ কহিয়া তাহার হৃদয়ে অনুতাপ আনয়ন করিতে পারে :—চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ আহার গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তোমার অমঙ্গলকর, হানিকর। আনন্দ, চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে দূর করিতে হইবে :—

"চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ অন্ন গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহা তোমার মঙ্গলকর এবং লাভজনক। আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে এরূপ শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি : এই দুই প্রকার দান সমফলপ্রদায়ী, সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান হইতে অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক। ঐ দুই প্রকার কি কি? বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কালে তথাগত যে আহার করেন তাহা, এবং তাঁহার অন্তর্ধানকালে—যে চরম অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—তিনি যে আহার করেন তাহা, এই দুই দান সমফলপ্রদায়ী, সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক। কর্মকার চুন্দের কৃত কর্ম দীর্ঘজীবন, উচ্চ জন্ম, সৌভাগ্য, সুযশ, স্বর্গপ্রাপ্তি এবং বৃহৎ ক্ষমতায় পর্যবসিত হইবে।"

"আনন্দ, কর্মকার-পুত্র চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে শান্ত করিতে হইবে।" অতঃপর ভগবান ভবিষ্যতে চুন্দের মনের অবস্থা যেন কল্পনায় উপলব্ধি করিয়াই উক্ত উক্তি সমর্থনের জন্য পুনশ্চ বলিলেন :—
"দানকারীর পুণ্য বর্ধিত হয়, সংযমকারীর হৃদয়ে দ্বেষের উৎপত্তি হয় না, সজ্জন পাপ পরিহার করেন, রাগদ্বেষমোহের ক্ষয়হেতু তিনি নিবৃ'ত।"

এইরূপে ভগবান কর্মকার চুন্দের প্রদত্ত অন্ন শ্রদ্ধায় প্রদত্ত হইলেও তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ হইবে জানিয়াও চুন্দের শ্রদ্ধার দানের সম্মান রক্ষা করিয়া তাহা আহার করিয়াছিলেন, তাঁহার দানের অবমাননা করিলেন না। এই প্রাণহানিকর আহার্য গ্রহণ করিবার কিছু পরেই পীড়িত হইয়া মারাত্মক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতে করিতে দেহত্যাগের পূর্বে চুন্দের আতিথেয়তার জন্য তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। চুন্দের কোনও অপরাধ হয় নাই, তাঁহার অনুশোচনার কোনও কারণ নাই, বরঞ্চ তিনি তথাগত ও বুদ্ধসঙ্ঘকে অন্নদান করিয়া পুণ্যকাজ করিয়াছেন এবং তথাগতের পরিনির্বাণসময়ে তাঁহাকে অন্নদান করিয়া তিনি প্রভূত পুণ্যফল লাভ করিবেন, পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবার পূর্বে এই কথা প্রকাশ করিয়া, এই আশীর্বাদ করিয়া চুন্দের অপরিসীম লজ্জা ও অনুশোচনা দূর করিবার উপায় করিলেন এবং নিজের অপার করুণার, ক্ষমাশীলতার ও মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। জগতে এ দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে? ইহা শাক্যসিংহেরই উপযুক্ত এবং ইহা চিরদিন জগতের উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া থাকিবে।

তোমার অমিত আভা রেখেছে উজ্জ্বল ক'রে
রত্নপ্রসূ এ ভারতভূমি,
ধন্য শাক্য-অবতার, নমি ও অভয়পদে
জগতের দীপ্ত দীপ তুমি!

"ডুব্, ডুব্, ডুব্"

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

[গত ১৪।৫।৫৫ তারিখে কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত।
লিপিকার—শ্রীমাধুর্যময় মিত্র।]

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন" এই গানটির, জীবন্ত উদাহরণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জীবনে ডুব দেওয়া অদ্ভুত। ডুবুরী মানে ভাবসমুদ্রে যে ডুব দেয়। ঠাকুরের মত আশ্চর্য ডুবুরীর কথা শুনি নাই। মুহুর্মুহু তিনি ডুব দিচ্ছেন। এক একটি ভাব অবলম্বন করে ডুব দিচ্ছেন। কত ভাবে ডুব দিচ্ছেন,—অনন্ত ভাবসমুদ্রে ডুব দিয়ে কত মণিমাণিক্য তুলছেন। এমন আর দেখতে পাই না।

অশ্বিনী বাবু (অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন। দেখেন ঠাকুর এই গানটিই গাইছেন, "ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে।" গাইতে গাইতে ডুবে গেছেন, তলিয়ে গেছেন। একেবারে স্থির বসে আছেন—সমাধিস্থ। অশ্বিনী বাবু অবাক হয়ে ভাবছেন, "এই মানুষ, কোথায় ছিল—কোথায় গেল।" ঠাকুরের জীবনে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেত কোনও ব্যাপার মনে এলেই তিনি সেই ভাব নিয়ে ডুবে আছেন—তিনি বলতেন, "শুকনো দেশলাই ঘষলেই জলে ওঠে, কিন্তু ভিজে দেশলাই শত ঘষলেও জ্বলে না।" তাঁর একটুতেই উদ্দীপন হত। কখনও সবিকল্প কখনও নির্বিকল্প সমাধি হত। কত সব অদ্ভুত দর্শন হত। বঙ্কিম বাবু এসেছিলেন তাঁকে দর্শন করতে। তাঁকে বললেন, "না ডুবলে পাওয়া যায় না।" বঙ্কিম বাবু বললেন, "ডুবি কি করে, পেটে যে সোলা বাঁধা!"

রামপ্রসাদও বলছেন, "ডুব দেরে মন কালী বলে।" কোথায় ডুব দিতে হবে? ডুব দিতে হবে "হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে"—যেখানে প্রচুর মাণিক রত্ন আছে। তলাতল পাতাল ভুবন কি? ওগুলি মনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর। ডুব দিয়ে নীচে চলে যেতে হবে। সেখানে সবিকল্প সমাধি। আরও নীচে চলে যাও, সেখানে নির্বিকল্প সমাধি। ধর্মজীবনের সাধনা হচ্ছে ডুব দেওয়া। কিন্তু কামনা বাসনা হচ্ছে তার অন্তরায়। রামপ্রসাদ বলছেন, কামনা বাসনা রয়েছে ডুব দেবে কি করে? বলছেন,—

"কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
বিবেক-হল্দি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে!"

বলছেন, এই যে কাম ক্রোধ ইত্যাদি ছয় রিপু এরাই আমাদের ধর্মজীবনের প্রধান বাধা। এদের সাথে যুদ্ধ করে ডুবতে হবে। গায়ে বিবেক-হল্দি মেখে ডুব দিলে কুম্ভীররূপী রিপুরা কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না। এই বিবেককে অবলম্বন করে ডুব দিয়ে কত সাধক ভাবসমুদ্রের নিম্নস্তর পর্যন্ত গেছেন—জগদম্বার দর্শন পেয়েছেন।

বিবেক-হল্দি কি? সদসৎ বিচার। ঠাকুরের জীবনে এই বিচার আমরা অনবরত দেখতে পাই। কোন্‌টা সৎ কোন্‌টা অসৎ তা তিনি বিচার করে তবে অগ্রসর হ'তেন। বিবেক সাহায্য করে মনকে অন্তর্মুখী হবার জন্য। অসৎকে ত্যাগ করে সৎকে গ্রহণ করতে বিবেক সাহায্য করে। বিবেক আমাদের পথপ্রদর্শক। ঠাকুরের জীবনে দেখি

তিনি বিচার করছেন—'টাকা মাটি, মাটি টাকা।" এক হাতে টাকা আর হাতে মাটি নিয়ে তিনি বিচার করছেন। যেই তাঁর বিচার হ'ল দুইই এক —দুইই অনিত্য—তখনই তা ফেলে দিলেন। বেদান্তেও তাই দেখি নিত্যানিত্য বিচার। নিত্য বস্তু অনিত্য বস্তুতে প্রভেদ জানতে হবে। বিবেকের সাহায্যে বিচার করতে হবে, কোনটি নিত্য কোনটি অনিত্য। তারপর অনিত্যকে ত্যাগ করে নিত্যকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁকে পেতে হ'লে নিত্যানিত্য বিচার খুবই দরকার। যেখানে যা কিছু আছে তা বিচার করে গ্রহণ করা প্রয়োজন। মন ভুল বোঝায়—সত্যকে অসত্য আর অসত্যকে সত্য বোঝায়। তাই বিবেকের সাহায্যে অতি সাবধানে বিচার করতে হয়।

গীতাতে এই বিবেকের কথায় রয়েছে সাত্বিক বুদ্ধি—যা মনকে অন্তর্মুখী করে। আর রাজসিক বুদ্ধি তা', যা' মনকে বহির্মুখী করে। বিবেক বা সাত্বিক বুদ্ধির আসল উদ্দেশ্য ভিতরে ডুব দিতে হবে। কিন্তু এই ডুব দিতে হলেই প্রয়োজন সদসদ্বিচার। তাই দেখি এই অন্তর্মুখী সাধনার মধ্য দিয়ে ঠাকুর বিচার করছেন। প্রার্থনা করলেন, "দেহসুখ চাই না মা।" এখানেও বিচার দেহসুখে পাওয়া যায় না মাকে। এই বিচার তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছে। মথুর বাবু তাঁর জন্য হাজার টাকা দামের শাল আনালেন। আজকাল পাওয়াই যায় না। ঠাকুর সেই শাল নিয়ে বিচার করতে লাগলেন, "এই দামী শাল—এতে অহংকার আছে। অহংকার ভগবান-লাভে অন্তরায়। আমার শীত ত' একটা লেপ বা কম্বলে কেটে যায়—শাল ত' অহংকার।" তাই শালকে পদদলিত করে তিনি ছেড়ে দিলেন।

ভগবানকে ডাকতে গিয়েও তিনি বিচার করছেন। প্রথমে মন্দিরে পূজায় ব্রতী হ'লেন। তারপর উত্তর দিকে আমলকী গাছতলায়। খানা-ডোবাগুলি তখনও ভরা হয় নাই। রাত্রে পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে সেই গাছতলায় ভগবানকে ডাকতে গিয়ে বিচার করতেন। তিনি বিচার করতেন, "পৈতে তো অভিমান। অভিমান এই যে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে।" লোকচক্ষুর অন্তরালে তাই সাধনা করছেন ব্রাহ্মণের ছেলে ব'লে অভিমানের মূলসূত্র ব্রহ্মসূত্র ফেলে দিয়ে। মাকে পাওয়ার অন্তরায় লজ্জাও একটি পাশ। তাই তিনি কাপড়ও ত্যাগ করতেন। এই সব পাশ থেকে মুক্ত হলেই ত' জীব শিব হয়। ভক্তি-পথেও এই বিচার বিবেকের প্রয়োজন আছে। জ্ঞানপথেও দেখি ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ প্রভৃতি। সেখানেও সদসৎ বিচার প্রয়োজন। বিবেক না থাকলে হয় না।

লোকে বলে মন চঞ্চল। কিন্তু তারা জানে না যে বিবেকবুদ্ধিই তাকে সংযত রাখতে পারে। বুদ্ধি যদি সংযত হয়, আমাদের মোক্ষমার্গ খুলে যায়। কঠোপনিষৎ বলছেন, বুদ্ধি সারথি। রূপ রস গন্ধ ইত্যাদির লোভে ইন্দ্রিয়গুলি চতুর্দিকে ছুটছে। মনরূপ লাগাম ধরে ওদের সংযত করতে হবে। বুদ্ধি যদি নির্মল হয় তবে মোক্ষমার্গ খুলে যায়। এরই উপর সব নির্ভর করছে। এ যদি শুচি পবিত্র হয় তবে কোনও ভাবনাই থাকে না। ঠাকুর প্রত্যেক জিনিসে বিচার করতেন তা' সাধন পথের, মাকে পাওয়ার পথে অন্তরায় কি না। এই বিচারই হল সংসারপথে চলবার একমাত্র উপায়। তাহলে আর ভয় থাকে না।

একই মায়া, তার দুই শক্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। একটি অপরটির উল্টো। কিন্তু দুয়েরই মূল তিনি। এই বিচার খ্রীষ্টান ধর্মে বা মুসলমান ধর্মে নাই। তাদের শয়তান (Satan) আছে। কিন্তু আমাদের দুই শক্তিই তাঁরই। বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই আছে। দুয়ের মূলেই মা। তবে অবিদ্যাশক্তি আমাদের বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। তিনিই নিয়ে যান। আবার বিদ্যাশক্তিকে আশ্রয় করলে তিনিই

মোক্ষপথে নিয়ে যান। তবে সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও বিবেক আশ্রয় না করলে হয় না।

ঠাকুরের জীবনে বড় শিক্ষা ডুব দেওয়া। পণ্ডিত বিদ্বান্ কত লোক তাঁর কাছে আসত। সবাই মস্তিষ্কবান্, কিন্তু তাঁদের বিদ্যা নাই। তাঁরা অপরা বিদ্যার পণ্ডিত। ঠাকুরের পরা বিদ্যা। শকুনের দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে তা সে যত উর্ধ্বেই উঠুক না কেন। আর চাতক থাকে মাটিতে কিন্তু সব সময় উর্ধ্বমুখ। বৃষ্টির জল পড়লে তার পিপাসা দূর হবে।

সাধনপথের অন্তরায় সমস্ত বিরোধী সংস্কারকে বিচার করে দূর করতে হবে। তারপর প্রার্থনা করতে হবে, "আমায় কৃপা কর।" তিনিই কৃপা করে আমাদের সব বন্ধন মুক্ত করেন। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। এই যে আমাদের মন—এ যদি সংযত হয়, বিচার করে, তবে তা' আমাদের বন্ধু, আর যদি সংযত না হয়, চঞ্চল হয়ে থাকে তবে তা' আমাদের শত্রু। মন বন্ধুই হোক্ বা শত্রুই হোক্—দুয়েরই পেছনে তিনি রয়েছেন। তাই তাঁর কৃপা চাই।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

(গীতা, ১৮।৬১)

এটা পাকা জেনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, আমায় আর ঘুরিও না। রামপ্রসাদ গাইছেন,—

"মা আমায় ঘুরাবি কত,
(কলুর) চোখঢাকা বলদের মত।"

এ ধারে ঘানিগাছ—মায়া মোহ। ভগবানই আমাদের বেঁধে রেখেছেন সেই গাছে। কি অবস্থা! এই অবিদ্যাশক্তি দিয়ে বদ্ধ হয়ে আমরা ঘানিগাছের চারদিকে কলুর চোখঢাকা বলদের মত ঘুরছি। তাঁর কৃপা না হ'লে ছাড়া পাব না। তাই প্রার্থনা করতে হবে, "ঠুলি খুলে দাও।" তা না হওয়া পর্যন্ত কোথায় শান্তি। বলদের মত কেবল ঘুরতেই হবে। বিচার করে এর পাশ ছিন্ন করতে হবে। লালাবাবুর জীবনে বিচার এল। বিচার করলেন। তারপর সেই বিচার সমস্ত পাশ ছিন্ন করে দিলে। আমাদের কই কোনও আগ্রহ তো হয় না। তাই বলদের মত কেবল ঘুরি।

বুদ্ধদেবের দেখ বিবেক বিচার। রাজার ছেলে। দুঃখশোকের নাম জানেন না। পাছে কোন দুঃখ পান তার জন্য তাঁর বাবা তাঁকে কত যত্নে রাখতেন। একদিন বাইরে এসে মানুষের জরা ও ব্যাধির কষ্ট দেখে এসে বিচার করতে লাগলেন। শেষে বিচার দ্বারা সমস্ত পাশ ছিন্ন করে গভীর রাত্রে সংসার ত্যাগ করলেন। এই বিচারই মানুষকে ঠিক পথে চালায়। এর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমরা তো বিবেকের কথা শুনি না। গ্রাহ্য করি না। বিবেক ঘুমিয়ে থাকে। জেগে উঠে যখন ধাক্কা দেয় তখন, আবার তাকে ঘুম পাড়াই। জানবে বিবেকই আসল। বিবেক গেলে সব গেল। বিবেকই আমাদের অনিত্য থেকে উঠিয়ে নিত্যে নিয়ে যায়, সার অসার বিচার করে। এই যে মানুষ ছিল, কোথায় গেল! অনিত্য সংসার তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা তাই নিত্য বলে মনে করছি। সে মরে গেলে বিবেক জেগে উঠল। এই বিবেকই নিত্যবস্তুকে পেতে সাহায্য করে। তাই রামপ্রসাদ গাইছেন, "বিবেক হলুদি গায়ে মেখে যাও।"

ঠাকুর গৃহস্থদের আদর্শ সংসারী ছিলেন। সংসারে বিবেক বিচারই পথ-প্রদর্শক। পদে পদে বিচার করতে হবে। রামপ্রসাদ গাইছেন,—

"আয় মন বেড়াতে যাবি
কালী-কল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥"

সংসারে নিবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে। গীতার শিক্ষায়

আগাগোড়া দেখতে পাবে, "অভিমানশূন্য হও।" ধর্ম জিনিসটাই হল ত্যাগ। নিবৃত্তি চাই।

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
কালী-কল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥"

এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নাই। নান্যঃ পন্থাঃ। যা কিছু ভগবান-লাভে সাহায্য করে তার সবই এই গীতার শিক্ষা :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।"

যা কিছু করছ সবই আমায় অর্পণ কর। অর্পণ মানে আমায় স্মরণ কর। স্মরণ বড় জিনিস—বড় সাধনা। স্মরণ করলে রাজসিক তামসিক ময়লা মনের পেছনে আপনি টেনে নেবেন। মন পবিত্র হবে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি জেগে উঠবে।

অশ্বিনী বাবু আবার প্রশ্ন করছেন, "কি করে তাঁকে পাওয়া যায়?" শুভদিন—তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস্ করছেন—অবসর পেয়েছেন। ঠাকুর বললেন, তিনি চুম্বক। সর্বদা আমাদের আকর্ষণ করছেন; আর আমরা কাদামাখানো ছুঁচ। মনের আবিলতার জন্য সে আকর্ষণে ফল হচ্ছে না। তাঁকে ডাকতে ডাকতে যখন সে আবিলতা চলে যায় তখন তাঁর আকর্ষণ আরও বেশী হয়ে ওঠে। যেখানে বিবেক বিচার নাই সেখানে কোনও আশা নাই। আমরা বাইরের জিনিস নিয়ে আছি। লোকসান হয় আর আমরা যাই অপরের কাছে বুদ্ধি ধার করতে।

রাজসিক বুদ্ধি বন্ধন করছে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি সাধুর কাছে নিয়ে যায়। সাধুসঙ্গে বিবেক জাগে। সত্য অসত্য—নিত্য অনিত্য বিচার করে। যত সাধুসঙ্গ বেশী হয় তত সাধনায় ডোববার সাহায্য করে। ঠাকুর বলতেন, সাধুসঙ্গ হল ঘড়ি মেলানো। ঘড়ি মেলানো কি? সাধুসঙ্গ করলে বুঝতে পারা যায় ভগবানের দিকে কতটা স্লো আর সংসারের দিকে কতটা ফাস্ট চলেছি। সাধুসঙ্গে বিবেকের উদয় হয়—বিবেক বলে দেয় এই ডোবাই হ'ল জীবনের উদ্দেশ্য।

অশ্বিনী বাবু যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা নিজের জন্য নয়, কারণ তিনি ঠিক পথেই ছিলেন। এ কেবল আমাদের শিক্ষার জন্য। অর্জুনের ন্যায় উপলক্ষ্য মাত্র ছিলেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সংসারে কি ভাবে থাকব?" এটা অশ্বিনী বাবুর একলার প্রশ্ন মনে কোরো না। এ সমস্ত জগতের চিরন্তন প্রশ্ন, "সংসারে কি ভাবে থাকব?"

থাকতে হবে সর্বদা গোলাপী নেশা করে। শুকদেবের মত এক পেট, এক বোতল অর্থাৎ নেশায় বিভোর হতে সকলে পারে না। গোলাপী নেশা মানে একটু খাওয়া—সাংসারিক কাজ চলছে কিন্তু নেশা আছে। এতে সাত্ত্বিক মনের দরকার। রাজসিক মন কি? রাজসিক মনে যত মলিনতা। যেমন ময়লা কাপড়। তাতে রং ধরে না। তেমনই রাজসিক মনে গোলাপী নেশা হয় না। ময়লা কাপড়ে রং করতে হলে কাপড়টা সাদা করতে হবে সাবান সোডা দিয়ে। তবে রং ধরে। রাজসিক রংএ মনের মলিনতা এসেছে। এই মলিনতা তোলার জন্য জপ বল, সাধন বল, প্রার্থনা বল—সব করতে হয়। ঠিক যেন কাদা ধোওয়া। আমাদের মনের মালিন্য ঠিক যেন ছুঁচে কাদা। ভগবানের আকর্ষণ রয়েছে চুম্বকের মত কিন্তু কাদার জন্য কিছুই হচ্ছে না।"

সাত্ত্বিক মন থেকে বাইরের আকর্ষণগুলি দূর হয়ে যায়। তখন অবিদ্যাশক্তির থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিদ্যাশক্তি নিয়ে যায় এগিয়ে। মন থেকেই সব হয়। দেখনা ঠাকুর বলতেন,—

"আপনাতে মন আপনি থেক, যেও নাক' কারও ঘরে।
যা পাবি তা' বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।" মানে কি? সবই মন থেকে হল।

মনকে যতক্ষণ না শুদ্ধসত্ত্বে নিয়ে যেতে পারবে ততক্ষণ কিছুই হবে না। কিন্তু যদি নিয়ে যেতে পার তবে আর কিছুরই দরকার হবে না। বসে বসেই সব হয়ে যাবে।

জীবনের উদ্দেশ্য ডোবা। ঠাকুরের জীবনে দেখা যায় নিজের মনের অন্তঃপুরে নিজেই ডুবছেন। বিভিন্ন তলে ডুব দিয়েছেন। বিভিন্ন উপলব্ধি হয়েছে। কিন্তু সবই নিজের মনে। নিজের মনে নিজে ডুবে নিজে সব জিনিস তুলেছেন—জ্ঞানের কত মণিমুক্তা। এই জন্য চালকলা-বাঁধা বিদ্যা শেখেন নাই। অনুভূতি-রাজ্যে এই চালকলা-বাঁধা অবিদ্যার কোনও প্রয়োজন নাই।

অক্ষয় রত্ন

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী

বিরামবিহীন পান্থ
পথ চলি যায়—
চলিতে চলিতে পথে
থমকি দাঁড়ায়।
সঙ্গেতে ছিল যে তার
অক্ষয় রতন,
কোথায় পড়িয়া গেছে
হয় না স্মরণ।

যুক্ত করে উর্ধ্বে চাহি—
কহে ভগবানে
"হে প্রভু, ফিরায়ে দাও
হারানো রতনে।"
অদৃশ্য দেবতা ডাকি
কহেন তাহারে—
"অক্ষয় রতন কভু
হারাতে না পারে!"

শ্রীপশুপতিনাথে শিবরাত্রি মেলা

শ্রীঅহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৪ সালের ফেব্রুআরি। একমাস এখনও হয়নি, ছুটি নিয়ে এলাহাবাদ কুম্ভ মেলা হতে ফিরেছি, এর মধ্যেই আবার কি করে ছুটির জন্য দরখাস্ত দেব, এই চিন্তায় যখন মত্ত তখন 'তোমার কর্ম তুমি কর মা'—এই ভেবে 'জয় পশুপতি নাথ' বলে একখানি ছুটির দরখাস্ত অফিসে পেশ করলাম। দিন দশেক ছুটি হলেই পশুপতিনাথ দর্শন হয়ে যায়। শুনেছিলাম, যাঁরা কেদারনাথ দর্শন করে আসেন তাঁদের পশুপতিনাথ দর্শন করতে যেতে হয়। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার-বদরী ইত্যাদি ঘুরে ফিরেছিলাম। সাধারণ কেরানীর পকেটের কথা ও আফিসের ছুটি পাওয়া এই দুইই বিরাট সমস্যা। কিন্তু কোন্ অদৃশ্য শক্তি এবার আমার মত নির্বিরোধ ভদ্রলোককে যাওয়া না হলে চাকরিতে ইস্তফা দেবার সঙ্কল্প সগর্বে অফিসারের সম্মুখে ঘোষণা করে দেবার সাহস এনে দিল তা আজ ভেবে যথেষ্ট বিস্ময় বোধ করছি। যাক্, পশুপতিনাথের দয়ায় এবারের মত ছুটি মঞ্জুর হ'ল এবং ১৯৫৪ সালের ২৭শে ফেব্রুআরি আসানসোল থেকে মোকামা এক্সপ্রেসে কোনরকমে একটা জায়গা করে নেওয়া গেল। দুটি ঝোলায় অতি প্রয়োজনীয় জিনিস্।

ভোর ৫টায় মোকামাঘাট স্টেশনে পৌঁছলাম। তাড়াতাড়ি কাঁধে ঝোলা ফেলে গাড়ী হতে নেমে সোজা গঙ্গার বালুকাময় তট দিয়ে আধ মাইল হেঁটে দূরবর্তী ফেরী ষ্টীমার ধরলাম। নির্বিবাদে প্রায় ৪।৫ শত লোককে নিজগর্ভে প্রবেশ করিয়ে ষ্টীমার মন্থর গতিতে গজেন্দ্রগমনে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে বেলা ৭টার সময় সেমারিয়া ঘাটে এনে পৌঁছে দিল। দেখলাম প্রায় ৫০০ গজ দূরে ট্রেন দাঁড়িয়ে। সকলেরই একটু ভালভাবে গাড়ীতে বসে যেতে ইচ্ছা করে—বিশেষতঃ ৩য় শ্রেণীর গাড়ীতে চাপার যে কি দুর্ভোগ তাতো সকলেরই জানা। দৌড়, দৌড়, ট্রেন ফেল হবার দৌড়কে হার মানায় এই ট্রেনে বসার দৌড়। যাক্, কোনরকমে শরীরে নাভিশ্বাস উঠিয়ে গাড়ীতে চাপা গেল, ভালভাবেই বলতে হবে। জানালার ধারে একটি মনোমত জায়গায় বসে যাত্রীর ভিড় দেখছি,—দূরে স্বচ্ছ কলস্রোতা গঙ্গা—জাহাজ ঘাট হতে স্টেশন পর্যন্ত জনস্রোত—আকুল আগ্রহে ছোটাছুটি-করা মুখে ভয়মিশ্রিত চিন্তার আভাস —এসব দেখবার জিনিস বই কি!

প্রায় ৮টার সময় গাড়ী ছাড়ল এবং সমস্তিপুর, মজঃফরপুর প্রভৃতি পার হয়ে বেলা ৪টার সময় সগৌলী জংশন এসে পৌঁছল। এখানে গাড়ী বদলে অপর এক ট্রেনে ভারতের শেষ সীমানা রকসৌল পর্যন্ত যেতে হবে। গাড়ীতে ভিড় নেই বললেই হয়। মাত্র নেপালযাত্রীরা এই গাড়ীর আরোহী। গাড়ী বদল করে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সন্ধ্যা ৭টার সময় রকসৌল ষ্টেশনে পৌঁছানো গেল। গাড়ী পরের দিন সকালে। রকসৌলে থাকার অসুবিধা। জনৈক স্থানীয় ব্যক্তির পরামর্শে ৪ মাইল দূরবর্তী বীরগঞ্জ স্টেশনে একায় চললাম। সেখান নাকি আরামে রাত্রিযাপন করতে পারব এবং সকালে ট্রেন পাওয়া যাবে।

যেমন রাস্তা, তেমনি একার চলন। ছমকি তালে নৃত্যের ছন্দে একা চলতে লাগল। আমি ঝোলা সামলে কখনও বামে কখনও বা দক্ষিণে হেলতে দুলতে শরীর বেচারাকে একেবারে কাপড়কাচা অবস্থা করে নিয়ে রাত্রি ৯টার সময় বীরগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। প্রায় সমস্ত দোকান তখন বন্ধ হয়ে গেছে। একাওয়ালা সহৃদয় বলতে হবে। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে এক ধরমশালায় এনে হাজির করল ও থাকার এবং চিড়া-দই খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। পরের দিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে তৈরী হয়ে নিলাম। গাড়ী এল। রক্সৌল থেকেই এসেছে। খুব ভিড়। এমন জানলে রাত্রে রক্সৌলেই কষ্ট করে থেকে যেতাম। যাহোক্ বহু পরিশ্রমে জানালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দুই পা রাখার জায়গা না থাকায় এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে 'যোগী পুরুষ' সাজা গেল।

ঘণ্টা দুই চলার পর সিমেরা স্টেশনে প্লেনের যাত্রীদের কিছু খালি করে গাড়ী আবার পাহাড়ের গা ঘেঁসে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা নদীর উপর দিয়ে কখন সোজা পথে, কখনও সর্পিল গতিতে বেলা ১২টার সময় আমলেখগঞ্জ স্টেশনে এসে পৌঁছল। ট্রেনে চাপার পরিসমাপ্তি ঘটল এখানেই। এইবার মোটরে, পরে পদযাত্রা।

স্টেশনের পাশেই ২০।২৫টি বাস, ট্রাক ইত্যাদি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ী হ'তে নেমেই সেই দিকে গিয়ে প্রথম বাসের আপার ক্লাসে বসে পড়লাম। এখান থেকে ভিমফেরী পর্যন্ত প্রায় ২৫ মাইল এই বাসে যেতে হবে। আমলেখগঞ্জ স্টেশনে খাবার জিনিস যথেষ্টই পাওয়া যায় কিন্তু বিশ্রামের সময়ের সম্পূর্ণ অভাব। প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়ল, খাবার ব্যবস্থা একরকম মুলতবী থাকল। বাস পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কখনও উৎরাই কখনও চড়াইএর পথে চলতে লাগলো। দুর্গম, দুর্ভেদ্য পাহাড়ের ধার কেটে মোটর যাবার রাস্তা

তৈরী হয়েছে। মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গল। কিছু দূর যাবার পর যাত্রীদের সাবধানে হাত ভিতরে রেখে বসতে অনুরোধ করা হল। গাড়ী এবার এক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে গাড়ী অন্ধকার গুহার ভিতর প্রবেশ করল এবং বেশ খানিক সময় কাটিয়ে তবে আবার আলোর রাজ্যে ফিরে এল। আরো কিছুদুর যাবার পর মোটর ভৈঁসে নামক এক জায়গায় পৌছল। এখান হতে একটি নূতন রাস্তা কাটমণ্ডু পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে দেখলাম।

ঘুমিগ হ'তে নেপাল রাজার যাবতীয় জিনিস রোপ লাইন দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ের এক চূড়া হ'তে আরেক চূড়া পর্যন্ত তারের লাইনের উপর ঝুলানো পুলীর সাহায্যে বড় বড় ওজনদার জিনিস পার হতে দেখলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। ঘুমিগ হতে ১৫।২০ মিনিট মোটর চলার পর ভীমফেরী পৌছলাম। আমলেখগঞ্জ থেকে এই ২৫ মাইল আসতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগলো। গাড়ী হতে নেমেই তাড়াতাড়ি 'রাহদানী' (পাশপোর্ট) পরীক্ষার অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আগে হতেই এখানে বেশ ভিড় জমে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাহদানী বদল করে অন্য রাহদানী নিয়ে টাকা বদলাবার অফিসের সন্ধানে অগ্রসর হলাম। আমাদের এক টাকা এদের দেড় টাকা হিসাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করে সেইদিনই কিছুদূর আগে যাবার ইচ্ছায় ধীরে ধীরে 'জয় পশুপতি নাথ' বলে পায়ে চলার পথে যাত্রা আরম্ভ করলাম।

ধীরে ধীরে রাস্তা উপরে উঠতে শুরু করেছে। ২ মাইল চড়াইএর পর গড়ী চটী। এখানে থাকার জায়গা মোটেই নেই। চায়ের ব্যবস্থা আছে, তবে পাহাড়ী চা। চা-পায়ীদের এতে মোটেই আরাম হবে না। মিষ্টি সরবৎ জাতীয়। এখানে জিনিসপত্র ও পাসপোর্ট আর একদফা পরীক্ষার পর যাবার অনুমতি মেলে। এরপর আরো কিছু চড়াই পার হবার পর পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌছে উৎরাই শুরু হল। ৪ মাইল নীচে কুলীখানি চটী। সেখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যা সমাগতা, আঁধারে পাহাড়ী পথ চলা যে কি কষ্টকর তা বোঝানো খুবই শক্ত। গত ২ দিন খাওয়ার ব্যবস্থা মোটে না থাকায় প্রায় অভুক্ত থাকতে হয়েছে। থাকার ব্যবস্থাও তথৈবচ। কুলীখানি চটীতে ঐ দুটি জিনিসেরই ভাল ব্যবস্থা আছে শুনে দ্বিগুণ উৎসাহে অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলা আরম্ভ করলাম। উঁচু-নীচু পাথরে পা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে একেবারে কয়েক মাইল নীচে পড়ে যাবার মতন অবস্থা দাঁড়াচ্ছে। পশুপতিনাথের চরণে জীবন সমর্পণ করে কয়েক মাইল নীচে ক্ষীণ আলোর আভা দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ করে পা বাড়িয়ে চলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। মনে যথেষ্ট ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। একেবারে নিঃসঙ্গ, অন্ধকার রাত, অজানা পাহাড়ী পথ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, হিংস্র জন্তু কি দু' একটা না আছে—এই সব চিন্তা মনকে তোলপাড় করছে। সঙ্গে যে টর্চ আছে সেটার প্রয়োজন যে এখানে কত বড় সেকথা মনেই ছিল না। ঝোলা হতে টর্চ বের করে আলো জেলে বেশ জোরেই যেতে আরম্ভ করলাম। কিছুদূর যাবার পর পথে ২ জন যাত্রীকে ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অপেক্ষা করতে দেখে আমিও দাঁড়ালাম। এই অন্ধকার, তদুপরি উৎরাই পথে আলোসমেত এক সঙ্গীর দেখা পেয়ে তাদের আর আনন্দের সীমা রইলো না। বারংবার বলতে লাগলো পশুপতিনাথ 'বাবাকে' পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের পিতৃ-সম্বোধন (যদিও বয়সে তারা আমার দ্বিগুণ হবে) মোটের উপর ভালই লাগল। আমিও ২ জন সঙ্গী পেয়ে পশুপতিনাথকে আর একবার প্রণাম জানালাম। কোনক্রমে বহু পরিশ্রমে রাত্রি ৯টা নাগাদ কুলীখানি পৌছলাম।

সঙ্গী দু'জনের বীরগঞ্জের নিকটেই বাড়ী। মোটের উপর চলনসই এদেশের ভাষা জানে। ওরা প্রথম চটীওয়ালার সঙ্গে থাকাখাওয়ার একটা

রক্ষা করে ফেলল। এখানে একটি ভাল হোটেল আছে শুনেছিলাম, কিন্তু তার সন্ধানে আর ঘুরে বেড়ান অসম্ভব জেনে এখানেই আশ্রয় নেওয়া গেল। দ্বিতলে শোবার ব্যবস্থা হ'ল। বেশ শীত পড়েছে। কম্বল গায়ে দিয়ে কোনরকমে কিছু সময় কাটিয়ে দিয়ে আহারের জন্য আবার নীচে নামতে হ'ল। অন্ধকার একটি ছোট জানালাবিহীন ঘরের মধ্যে খাবার দেওয়া হয়েছে। সেই ঘরেই রান্না হ'চ্ছে। অসম্ভব রকম ধোঁয়া, চোখ বন্ধ করে বসে পড়ে তবে চোখ খোলা গেল। খাবারের ব্যবস্থা দেখে আর একবার চোখে জল এল। কিন্তু দুই দিন অনাহারের পর তাই অমৃতসমান বলে মনে হল। মোটা মোটা পাহাড়ী চালের ভাত—জলবৎতরল ডাল ও একটু আলুর ঝোল, তাও বিস্বাদ। কোনরকমে আহার পর্ব শেষ হ'ল। এবার বিশ্রাম। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি ছোট ঘরে তিন জনে শোবার ব্যবস্থা করা গেল। শোবার আগে বন্ধু দু'জনের গাঁজা খাবার ইচ্ছা হ'ল। সমস্ত সরঞ্জাম বের করে ওরা আমায় আগুন ধরিয়ে দিতে বলল। জানালাম—আমি এ রসে বঞ্চিত। তবুও নিস্তার নেই। আগুন ধরিয়ে দিয়ে তবে খালাস। অত্যন্ত শীতের জন্য আমার বেশ কষ্ট হতে লাগল। যাহোক, মাথা পর্যন্ত কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙ্গল ভোর ৫টায়। বন্ধুদের ডেকে উঠাবার চেষ্টা করলাম। শীতের ভয়ে রাত্রের সাথী আর দিনে আমার সঙ্গে যেতে চাইল না! একাই বেরিয়ে পড়লাম। এখান হ'তে বেশ কিছু রাস্তা চড়াই উৎরাই পার হয়ে মার্ঘু হয়ে ফিতলাঙ্ এসে পৌছলাম। ভারতীয় মুদ্রার সব জায়গাতেই চলন আছে। তারা আমাদের টাকাই নিতে চায়, ওদের টাকা হিসাব করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। এখানে এক দোকানে বিস্কুট দেখে খান আষ্টেক নিয়ে একটি নেপালী টাকা দিলাম। তাতে দোকানী আমায় একটি সিকিজাতীয় মুদ্রা ফেরত দিল। হিন্দীতে লেখা বিশ পয়সা। তাদের জিনিসের দাম তাদের টাকায় দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠকতে হবে ভেবে এখন হতে যা কিছু সব আমাদের টাকায় দেনাপাওনা শুরু করলাম। এতে তাদের লাভ বেশি, তবু আমারও লাভ কম নয়, আত্মতৃপ্তি। এখান হতে একটি চড়াই মাইল দুই আন্দাজ পার হতে হবে শুনে মনে বেশ ভয় লাগল। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। নীচু হতে পাহাড়ের চূড়া ভালভাবে দেখা যায় না। যদিও রাস্তা কিছু ঘুরে ঘুরে উঠেছে কিন্তু গন্তব্য স্থান সোজা খাড়া উপর দিকে। পথের দৃশ্য মনোরম। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য ফুলের গাছ। তার মধ্যে রোডোডেনড্রন গাছই সমধিক প্রসিদ্ধ। নাম-জানা এবং না-জানা নানা রংয়ের বনফুলের গালিচা পাতা রাস্তার দুধারে। কারাই বা তাদের সমাদর ক'রছে?

"এমনকি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে
যার কোন দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয়নি কখনো।"

বেলা ১০টার মধ্যে পাহাড়শীর্ষে পৌছলাম। এখান হতে আবার ২ মাইল নীচে থানকোট। বহুদূরে কাটমণ্ডু শহর অস্পষ্ট ছবির মত দেখা যাচ্ছে। শীঘ্র পায়েচলার পথের পরিসমাপ্তি হবে জেনে প্রাণ আশান্বিত। স্থানে স্থানে পাহাড়ী ঝরণা। সূর্যালোকের প্রবেশরহিত পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলার সুখ অনুভব করছি মর্মে মর্মে। প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে থানকোট এসে পৌছলাম। এখান হতে বাস, ট্রাক বা ট্যাক্সি করে কাটমণ্ডু যাওয়া যায়। ৬।৭ মাইল রাস্তা। থানকোট বাজারে আসতেই বাস ও ট্যাক্সিওয়ালারা সাধাসাধি আরম্ভ

করে দিল তাদের গাড়ীতে যাবার জন্য। একটি ট্যাক্সি এখনই ছাড়বে জেনে তাতে চড়ে বসলাম। বসে আছি তো বসেই আছি। গাড়ী ছাড়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম আরো সওয়ারী জোগাড় হচ্ছে। পরে একদল যাত্রীকে কম ভাড়ায় নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে গাড়ীতে উঠাল এবং গাড়ী ছাড়ল।

একটা মাঠে গাড়ী থামার ব্যবস্থা হয়েছে। বহু গাড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে। এখান হ'তে পশুপতিনাথের মন্দির কয়েক মিনিটের পথ। মন্দির ও মেলা-সংলগ্ন জায়গা খুব কম এবং বসতি খুব ঘন বলে একটু দূরে গাড়ী থামার ব্যবস্থা হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় নেপালী ছেলেমেয়ে স্বেচ্ছাসেবক। তাদের কাজ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। মেয়েদের এখানে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ঘরে বাইরে সব কাজই মেয়েদের করতে দেখলাম। যাত্রীদের সুখসুবিধা হতে আরম্ভ করে দোকান পাট পর্যন্ত সবই মেয়েদের হাতে। যদি কোন সংবাদ জানার দরকার হয় তো যেকোন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন, সে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে। এতে আমাদের একটু লজ্জা করে বইকি। আমরা অভ্যস্ত নই। মনে হয় কি ভাববে বুঝি। কিন্তু তাদের ও ভাবনার বালাই নেই। নিঃসঙ্কোচে খোলাখুলি ভাবে আলাপ করে যান, কোন সন্দেহ করবার কারণ ঘটবে না। বেলা ২টার সময় পশুপতিনাথের মন্দিরের কাছে পৌছলাম। মেলা রাস্তার উপরই বসেছে। জায়গার বড় অভাব। এখন সর্বপ্রথম কাজ দাঁড়াল একটা জায়গা ঠিক করা। একের পর এক ধর্মশালা, মন্দির, বাড়ী, যে কোন জায়গা সন্ধান করে ফিরলাম। কিন্তু প্রতি জায়গাই এমনভাবে ভরতি যে একজন লোকও কোন রকমে শোবার ব্যবস্থা করে নিতে পারে না। কত জায়গায় জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু একই কথা—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। উপায়বিহীন হয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের শরণাপন্ন হ'লাম। মেয়েদের সাহায্য নিতে যেন পৌরুষে বাধল। এইখানেই আমি তালে ভুল করলাম। হাজার হোক্ মায়ের জাত তো, বিপন্ন পথিককে কি একটু জায়গা দিত না?—নিশ্চয়ই দিত। যাক্ সে কথা—স্বেচ্ছাসেবক আমায় সঙ্গে নিয়ে তাদের অফিসে গেল। যা ভাড়া লাগে আমি দিতে প্রস্তুতই ছিলাম। আমাকে খাতির করে বসিয়ে একের পর এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ঘুরতে লাগল বাড়ীর সন্ধানে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ হ'লে যা হয়। সেই একই পুরাতন 'ঠাই নাই' শব্দ। প্রায় ১ ঘণ্টা এইভাবে কাটিয়ে হতাশ হয়ে মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করলাম। ওঁরা অনেক আশ্বাস দিলেন। চেষ্টাও করলেন অনেক। কিন্তু পশুপতিনাথের দয়া আর হল না। ক্রমশঃ বিকাল হয়ে আসছে। শীত পড়ছে বেশ। কি করি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। এমন সময় একটু আশার সঞ্চার হল। আসানসোলেরই বেশ বড় ব্যবসাদার এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্র-চাকর সমেত একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছেন খোঁজ পেলাম। পূর্ব পরিচয় যথেষ্টই আছে। কিন্তু এখানে তাঁর কোন সাহায্যই পেলাম না। হেসে গড়িয়ে পড়ে "হেঁ-হেঁ আমার একটু অসুবিধা আছে। লেকিন আপনি খুঁজিয়ে দেখেন, যদি না পাবেন তো হামি দেখিয়া দেবে।" - বলেই খালাস। চক্ষুলজ্জা বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা ওঁদের শাস্ত্রে বিরল। সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, যখন উনি শুনলেন যে আমি একদিন পরেই এখান হতে চলে যাব তখন আমায় অনুরোধ করে বসলেন যে, তাঁর বড় ছেলেকে তাঁর সুখে দিন কাটানোর সংবাদটি যেন পৌছে দিই। ধন্যবাদ শেঠজি, তোমার কথা মনে রাখবার চেষ্টা করবো—এই বলে সেখান হ'তে বিদায় নিলাম।

উপায় আর না দেখে সোজা বাগমতী নদীর ধারে পুলের নীচে একটু ফাঁকা জায়গায় আস্তানা

পাড়বার বন্দোবস্ত করলাম। হাঁ, এখানে আসার আগে একটা খাবারের দোকান হতে এক পেট পুরী তরকারি জিলাপি ইত্যাদি খেয়ে এসেছিলাম। জঠরানলের জ্বালা আর সহ্য করতে হবে না ভেবে নিশ্চিন্তে নদীর ধারে আশ্রয় নেওয়া গেল। স্নানের ইচ্ছা খুবই প্রবল ছিল কিন্তু এক হাঁটু নদীর জল, ভীষণ নোংরা। লোকে লোকারণ্য। সমস্ত লোকের প্রাণ ঐ জলটুকু, তাও এভাবে নষ্ট করা হচ্ছে দেখে কান্না পেল। নেহাত বাবা পশুপতিনাথের দয়ার জোরেই বোধহয় মহামারীর হাত হতে লোকগুলো বেঁচে যাচ্ছে। শুনেছি, বাগমতীর মত পবিত্র জল আর পৃথিবীতে নেই। একটু জল হাতে করে নিয়ে মাথায় দিয়ে মনেমনে অপরাধ খণ্ডনের আশায় 'অপরাধ নিয়ো না মা—তোমার অকৃতী সন্তান তোমায় অসম্মান দেখায়নি—তোমার অন্য সন্তানদের অজ্ঞতায় আস্থা হারিয়ে ফেলছে' বলে আবার নিজের জায়গা অপরে অধিকার করে নেবার ভয়ে তাড়াতাড়ি অধিকার কায়েমী করে বিশ্রাম শুরু করলাম। তখন বেলা বোধহয় ৫টা হবে। সূর্যদেব তাঁর সোনার বরণ কিরণছটা একে একে কুড়িয়ে পাহাড়ের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে আমাদের গভীর আঁধারে ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। যত মনে করি কিছু ভাববো না—কিন্তু পোড়া মন ততই এলোমেলো চিন্তাজালে জড়িয়ে পড়ে। বাহিরই আমার ঘর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আজ নূতন নয়। তবুও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমি আমার অসুবিধা বা দুঃখের কথা জানিয়ে অপরের সহানুভূতি আকর্ষণ করব এ আমার ধাতে সহ্য হয় না,—কিন্তু এখানে এসে তাও করতে হয়েছে। নিজের অসহায় অবস্থার কথা অনেককে বলে আশ্রয় ভিক্ষা করেছি। যাক্ আর না, এবার প্রভুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? ভাবলাম বেশ রাত কেটে যাবে এই ভাবে। পাশেই ১০০ গজের মধ্যে শ্মশান। সেখানে দুটি মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে; তাই দেখতে দেখতে রাত ১২।১ টা কি না হবে? পরেও কি আর একটা দুটো আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে—শুনেছি এখানে মড়া পোড়ানোর বিরাম নেই। তবে তো সঙ্গীর অভাব হবে না। ভয়ের আর কারণ কি? ঘরের মধ্যে আরামে তো অনেকদিন কেটেছে। একটা রাত এখানে বই তো নয়। বেশ তো দেখিই না। একদিন না একদিন এখানেই তো শেষ গতি হবে। আগে থেকেই একটু পরিচয় হোক না।—যা ভেবেছিলাম তাই। কয়েকজন লোক একটা লোককে কাঁধে করে নিয়ে নদীর জলের উপর শুইয়ে দিতে দেখলাম। বেশ সুন্দর নধর শরীর—অবস্থাপন্ন বলেই মনে হল। শবদেহ স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে চিতায় স্থাপনের উদ্যোগ চলল। বিচার সত্ত্বেও প্রাণ মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে 'এ আমায় কোথায় এনে ফেললে প্রভু!' উঠে পড়লাম। আর একবার চেষ্টা করে দেখিনা কেন। সোজা শ্মশান পেরিয়ে কিছু দূরে আর এক মন্দিরে হাজির হলাম। সেখানেও বারান্দা পর্যন্ত 'তিল ঠাঁই আর নাহি রে।' মন্দিরের ঘণ্টাবাদক জেগে ছিল। আমায় সোজা-সুজি প্রশ্ন করল যে আমি থাকার জায়গা খুঁজছি কি না। উত্তর শুনে সে আমায় তার অনুসরণ করতে বলল। কিছু দূর যাবার পর তার ঘরে আমায় নিয়ে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। আর এক দফা চিন্তায় পড়লাম। যেখানে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার জন্য কত সাধ্যসাধনা সেখানে সেধে রাজাসন দেওয়া, একি রসিকতা নাকি? না কিছু বদ মতলব আছে? যা থাকে থাক্, 'লইনু শরণ, যা কর প্রভু'—বলে নির্ভাবনায় শুয়ে পড়লাম। এতক্ষণ পরে সত্যিই একজন দরদী বন্ধু পেয়ে যা আনন্দ হল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাকে বললাম, "সাথী, যদিও আমার এখানে ২।৪ দিন থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তোমাদের রাজার

বেবন্দোবস্তের জন্য আর একদিনও থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আগামী কাল শিবরাত্রি শেষ হলেই এখান হতে চলে যাব।" বোধহয় তার দেশের নিন্দায় তার আত্মসম্মানে লাগলো। বললে, "তা হবে না বাবুজি, তোমার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করব। কাল থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা আমার এখানে, আর কাটমণ্ডু হতে ১০।১৫ মাইল দূর পর্যন্ত যত দেখার জিনিস আছে সব দেখানোর ভারও আমার উপর।"

* * *

শিবরাত্রি। ভোর বেলা শয্যা ত্যাগ করে রাতের আশ্রয়দাতার পূজাসংক্রান্ত অনেক কাজ জেনে একলাই বেরিয়ে পড়লাম। একটি ট্রাকে স্থান করে নিয়ে কাটমণ্ডু হয়ে সোজা উত্তরে মাইল কয়েক দূরে বুড়া নীলকণ্ঠ দর্শন করতে চললাম। পাথরের মূর্তি—একটি বাঁধানো চৌবাচ্চায় জলের উপর শয়ান অবস্থায় বুড়া নীলকণ্ঠ। পায়ের দিকটা সিঁড়ির সঙ্গে লাগান। যার যা ইচ্ছা পূজা, ফুল পায়ে নিবেদন করছে। একই রাস্তায় কাটমণ্ডু ফিরে অন্য রাস্তায় শহর হ'তে ২॥০ মাইল দূরবর্তী বালাজু মন্দিরে এসে হাজির হলাম। এখানেও জলের উপর ভগবান নীলকণ্ঠ শয়ান অবস্থায়। তবে আকারে বুড়া নীলকণ্ঠ অপেক্ষা কিছু ছোট। পাশেই বাইশ ধারা। নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না! বাইশধারা দর্শনীয় বস্তু শুনেছিলাম, এখন দেখলাম বাড়ীর ছাদে কিছু জল জমে থাকলে যদি গোটা বাইশেক নল দিয়ে বার করবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলেই বাইশধারা হল!

ট্রাক্ এবার পরের দর্শনীয় স্থানে হাজির—স্বয়ম্ভু মন্দির। একে দুপুর, বেশ গরম পড়ছে, তার উপর স্বর্গে পৌঁছবার সিঁড়ির মত খাড়া উপর দিকে উঠছে, দেখলেই চক্ষুস্থির। সবাই উঠছে, আমিও জোরে পা চালিয়ে দিলাম। অনেকগুলি ছোট মন্দিরের মাঝে প্রধান মন্দির। সেখানে কোন মূর্তি নেই। মন্দিরের গায়ে চারদিকে ঠাকুরদের মূর্তি। মন্দিরের উপর পিতল দিয়ে মোড়া। এখানকার এটি একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির। এখান হ'তে সমস্ত শহরটি বেশ সুন্দর ছবির মত দেখায়। হনুমানের উৎপাত ভয়ানক। কোনরকমে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ফিরে এলাম। কাছেই একটা কাঠের মণ্ডপ আছে। কথিত আছে যে ওর থেকে কাটমণ্ডু নামের উৎপত্তি। আরো কিছুদূর গিয়ে নেপালের যাদুঘর। এক আনা করে টিকিট নিয়ে তবে ভিতরে যেতে দেয়। ট্রাকের সহযাত্রীরা যেতে নারাজ। কিছুই বুঝবে না—আবার বাজে পয়সা খরচ। সব কটিই হিন্দুস্থানী দেহাতী ভাই বোন। তাদের দোষ দেওয়া বৃথা। ড্রাইভার আমায় ধরে বসল, বাবুজি আপনাকে যেতেই হ'বে। আমি আপনার জন্য গাড়ী আটকে রাখবো। আর কথা কি। আমি তো এই চাই। সোজা এক আনার টিকেট নিয়ে দুটি ব্লকের সামনে গিয়ে ছবি নেবার মতলব করছি। কোথা হ'তে দ্বারবান ছুটে এসে অনুরোধ জানিয়ে আমার ক্যামেরা সমেত ঝোলাটি নিয়ে নিল। যাবার সময় ফেরত দেবে। ছবি তোলার নিয়ম নেই। যাদুঘরে প্রাচীন যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম, কাঠের কাজ, পিতল ও তামার প্রাচীন মূর্তি, অনেক পুরনো পুস্তক দেখলাম। কিছু বাংলা বইও চোখে পড়ল। পাহাড়ের ভিতর এত সুন্দর শহর ও যাবতীয় আধুনিক জিনিসের সমন্বয় এর আগে আর কখনও দেখিনি। বেলা প্রায় তিনটা। এক জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে ভাড়া আদায় আরম্ভ করল। আমি বললাম এখন কেন বাপু, তোমার ঘোরা শেষ কর, আমরা তো আর পালাতে পারছি না। ড্রাইভার জানাল, আগে ভাড়া না নিলে পরে আদায় করা কষ্ট হবে। তার সন্দেহ অমূলক নয়। দেখলাম যে ভারতীয় মুদ্রায় ২৲ টাকা ভাড়া ঠিক করে এখন যাত্রীরা নেপালী মুদ্রা দিতে চাইছে।

তাদের ওজর, কি আর এমন দেখাবে? ২৲ টাকা করে জলে গেল। এ সব বিষয়ে অজ্ঞ হ'লে কি হবে, টাকার হিসাবের ভুল করে, এ মিথ্যা অপবাদ তাদের অতি বড় শত্রুও দিতে পারবে না। যাক্, বহু পরিশ্রমে পুরা টাকাই আদায় হ'ল। আবার গাড়ী মাইল ছয়েক দূরবর্তী ভক্তপুর অভিমুখে রওনা হ'ল। দুপুর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে—ফাকা মাঠের মাঝ দিয়ে গাড়ী প্রবলবেগে চলেছে।

ভক্তপুরে যেখানে গাড়ী দাঁড়াল সেখান হতে পল্লীর ভিতর দিয়ে প্রায় ১ মাইল রাস্তা পার হলে তবে ভগবান দত্তাত্রেয়ের মন্দিরে আসা যায়। এই পল্লীর সমস্ত ঘরবাড়ীই কাঠের বিচিত্র কারুকার্য খচিত। প্যাগোডা ধরনের মন্দিরেরও অভাব নেই। পথে, ঘাটে, মন্দিরে, সিঁড়িতে ভগবান তথাগতের মূর্তির ছড়াছড়ি। যেন এটি ভগবান বুদ্ধের দেশ। ফেরার পথে ভুল রাস্তায় যাওয়ায় একটু ঘুরিয়ে ছাড়ল। পথে ওদেশীয় সাজসজ্জায় মুখোস পরে নাচ দেখবারও সুযোগ ঘটল। ওদের সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা করবার ইচ্ছা প্রবল থাকলেও ফিরতে হল। সকলে একে একে ফেরার পর গাড়ী ছাড়ল। আর কোন জায়গায় অপেক্ষা না করে সোজা বেলা ৫টা নাগাদ পশুপতিনাথ ফিরে এলাম। সকাল আটটায় শুরু করে এই বেলা ৫টা পর্যন্ত ঘুরেও আমার সহযাত্রিগণ টাকার সদ্ব্যবহার হল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ থাকল। ড্রাইভারকে আর এক দফা ধন্যবাদ দিয়ে মেলার দোকানে পুরী ইত্যাদি ভক্ষণ কার্য সমাধা করে সন্ধ্যার সময় আশ্রয়দাতার সকাশে ফিরে এলাম। আমার ভ্রমণ সুখের হ'য়েছে শুনে সেও যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করল। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাদেবী আমার উপর ভর করলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আশ্রয়দাতার ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গল। প্রায় রাত্রি ১২টার সময় পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। শিবরাত্রির সারারাত্রি ব্যাপী পূজা, দেবদর্শন, জন-সমুদ্রদর্শন করতে করতে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে এক সাধুর আস্তানায় ভজন-গানের আসরে জমে যাওয়া গেল। এইভাবে কতকটা রাত কেটে ছিল ঠিক নাই। তবে ফিরে এসে বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেবার সুযোগ ঘটে নি। পশুপতিনাথের পূজার জন্য পাণ্ডার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। দরজার সামনে উপচার দিলেই হ'ল। ভিতরে পুরোহিত সমস্ত করেন। দেবদর্শনেরও কোন অসুবিধা হয় না। মন্দিরের চারিদিকেই দরজা। মন্দির পরিক্রমার সাথে সাথেই দেবদর্শনের সুযোগ মিলে যায়। স্পর্শ করে পূজার কোন ব্যবস্থা নাই। এখানে মহাদেবের মাথার অংশ কেবলমাত্র দেখা যায়। শুনা যায় কেদারনাথে দেহ ও এখানে মাথা —এইভাবে দর্শন সম্পূর্ণ করতে হয়।

সকালে বিদায় নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দর্শনাদি মোটামুটিভাবে শেষ করা হয়েছে। আর মায়া বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। আশ্রয়দাতাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের অফিসে আর একবার হাওয়াই জাহাজের সন্ধানের জন্য এসে হাজির হ'লাম। শুনলাম বুকিং ৭ দিন আগে আগে চলছে। আজ টিকিট কিনে ৭ দিন নেপালের জল হাওয়ায় বসে বসে শরীর ফেরান আর কি! সুবিধা হল না, বেরিয়ে পড়লাম। বাসের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই হল। একেবারে সোজা থানকোটে ফিরে এলাম। আর অপেক্ষা নয়। আজই নীচে নেমে যেতে হ'বে। শরীর বেশ ভাল যাচ্ছে না। সামান্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করে—কঠিন চড়াই মাইল দুই শুরু করা গেল। আবার সেই গতানুগতিক-ভাব। একই রাস্তায় ফেরা। তবে এবারে কুলি-খানিতে হোটেলটি খুঁজে বের করলাম। হোটেলের কর্ত্রী ও তাঁর মেয়ে কঠিনহস্তে হাল ধরে হোটেল চালাচ্ছেন। কর্তা একজন আছেন নির্জীব হাত

পা বাঁধা আফিং খোরের মত। তাঁর কাজ খালি গাঁজা খাওয়া ও বসে বসে ঝিমানো। দুপুরে খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম করছি—দেখি তিনজন কলকাতার ছেলে ফিরছে। আমায় বাঙালী দেখে ছাড়ল না। তাদের সঙ্গ নিতে হ'ল। আবার চলা শুরু হ'ল। সন্ধ্যার পূর্বে ভীমফেরীতে ফিরে এসে আস্তানার ব্যবস্থা করছি—এমন সময় ২ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক যাঁরা নেপালরাজের রাস্তার কাজে এসেছেন —তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'ল। বেশ আমুদে লোক তাঁরা। বাঙালী দেখার জন্য—দুটো প্রাণের কথা কইবার জন্য মাইল ছয়েক দূর হতে এখানে এসেছেন। আমাদের ভাল জায়গায় থাকার ব্যবস্থা থেকে খাওয়া পর্যন্ত সমস্ত তাঁরা ঠিক করে দিয়ে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরলেন। তাঁদের অযাচিত ব্যবহারের কথা বেশ কিছুদিন মনে থাকবে।

ভীমফেরী থেকে পরের দিন ভোর বেলা বাসে রওনা হয়ে বেলা ৭টার মধ্যেই আমলেখগঞ্জ এসে পৌছলাম। এখানের সবথেকে অসুবিধা মাইল খানেক লম্বা কিউ থেকে টিকিট কাটা আর গাড়ী চাপাও তথৈবচ। দোকানে খাবারের আশায় গিয়ে আলাপ আলাচনা হ'চ্ছে, শুনে দোকানী এখানকার মালবাবু চাটার্জী সাহেবের শরণাপন্ন হ'তে অনুরোধ করল ও বাসার নিশানা দিয়ে দিল। একেবারে চার মূর্তি তাঁর বাড়ী চড়াও হতে দেখে পূজা ছেড়ে ভদ্রলোক উঠে পড়তে বাধ্য হ'লেন। আমাদের অবস্থার কথা শুনে গাছতলায় বাইরে বসতে বললেন—এবং পরে কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখবেন জানালেন। বেশ কিছু পর তিনি এসে আমাদের টিকিটগুলি কেটে দিলেন। একটা সমস্যার হাত হতে রেহাই পেয়ে বেশ আরাম বোধ করলাম। পরের ব্যাপার গাড়ী চাপা। সেটার ব্যবস্থা তিনি কিছু করতে নারাজ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানাচ্ছেন, এই বাজারে দু-পয়সা সবাই কামাচ্ছে, শুধু হাতে কাজ হওয়া বড় শক্ত। ব্যাপার বুঝলাম। খোলাখুলি কিছু টাকা আমরা দিতে রাজি, তাও জানালাম,—যদি ভাল বসবার জায়গা পাই। কিন্তু কি ভেবে তিনি একটু পিছিয়ে পড়লেন। টাকা নিতে সাহস করলেন না। যাক্, অনেক কষ্টে নিজেদের চেষ্টায় জায়গা করে নেওয়া গেল। চাটার্জী সাহেবের আর দেখা পাইনি।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রকসৌল ষ্টেশনে এক নেপালী হোটেলে আমাদের চারজনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হ'ল। এখানেও কর্ত্রীঠাকরুনের যত্নে পরম পরিতোষ লাভ করেছিলাম। পরের দিন পথের সাথীদের বারংবার নমস্কার করে বিদায় নেওয়া গেল। বিদায় নেপালী ভাইবোনেরা, তোমাদের স্মৃতি ইহজীবনে ভোলবার নয়। বিদায় পশুপতি-নাথ—অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অপরাধ শ্রীচরণে করে থাকি নিজগুণে ক্ষমা ক'রো প্রভু। অশ্রু-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে কলিকাতাভিমুখী গাড়ীতে চেপে বসলাম।

"পিতার যদি ঋণ থাকে উহা তাঁহার পুত্র প্রভৃতি শোধ করিতে পারে, কিন্তু ভববন্ধনের মোচন নিজে ছাড়া অপর কাহারও দ্বারা হইবার নয়। মাথার উপর যদি ভার থাকে অন্যে আসিয়া উহা তুলিয়া লইতে পারে, কিন্তু ক্ষুধাদিজনিত দুঃখ নিজে ছাড়া অপর কাহারও মাধ্যমে মিটিবার নয়। চন্দ্রের সৌন্দর্য নিজেই উপভোগ করিতে হয়, অপরের চোখ দিয়া উহা পারা যায় কি ? আত্মার স্বরূপ স্বানুভবগম্য।"

—শঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি,

৫৩, ৫৪, ৫৬

বালাকি ও অজাতশত্রু

[ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গ]

(বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২য় অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ অবলম্বনে)

স্বামী জীবানন্দ

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"—বিদ্যা বিনয় দান করে, তবে উপযুক্ত পাত্র হওয়া চাই। অপাত্রে অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীনে বিদ্যা প্রদত্ত হলে শুধু অহংকারেরই প্রকাশ দেখা যায়, সেইজন্যে আমাদের ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন—"শ্রদ্ধাবান্ হও।" ভগবদ্গীতার "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" কথাটির উপযুক্ততা সুপ্রাচীন কাল থেকে দেশে বিদেশে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিদ্যার ক্ষেত্রেই যাচাই করা হয়েছে। শ্রদ্ধা না থাকলে যে বিদ্যালাভ হয় না—এ বিষয়ে সকলেই একমত। যে মুহূর্তে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব জাগে তখন থেকেই জীবনের গতি পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে; পূর্বে যা ছিল দুঃখদায়ক তাইই হয়ে দাঁড়ায় আনন্দের খনি—অহংকারী হয় অতি বিনয়ী। শ্রদ্ধারূপ পরশমণির ক্ষণেকের ছোঁয়াচ যে কত মূল্যবান্ তা যাঁদের জীবন কাঞ্চনে পরিণত হয়েছে তাঁরাই জানেন।

ঔপনিষদিক যুগের একটি উদ্ধত চরিত্র কিভাবে অপূর্ব শ্রদ্ধার আবেশে আপ্লুত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিল, সে এক চমৎকার কাহিনী। বক্তা ও শ্রোতা কিরূপ গুণসম্পন্ন হবেন, কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে এবং গুরু-শিষ্যের কর্তব্য কি—তার সম্বন্ধে একটি প্রচ্ছন্ন নির্দেশ এর মধ্যে পাওয়া যায়।

গর্গবংশীয় ঋষিপুত্র বালাকি যৌবনে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তার উপর অসাধারণ বাগ্মিতা—যেন মণিকাঞ্চন যোগ! কিন্তু যত না বিদ্যাবত্তা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি তার অহংকার। দর্পে পা পড়ে না—টলমল ধরণী! লোকে গর্বভরা চালচলন দেখে তাঁকে উপযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। 'দৃপ্ত বালাকি' এই কথাটুকুতে 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ' প্রবাদবাক্যটি যেন অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। যেখানে সেখানে ক্ষেত্র উপযুক্ত হোক্ আর না হোক্ বিদ্যা জাহির করায় দৃপ্ত বালাকির নামটিও ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। অনেকেই সমীহ করে চলেন—কখন যে কার উপর লঘুগুরু-ওজন-ছাড়া অপমানসূচক বাক্য প্রযুক্ত হবে তার তো ঠিক নেই! লোককে যেচে যেচে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বালাকির স্বভাবে পরিণত কিন্তু জ্ঞান এক জিনিস আর বই-পড়া বিদ্যা যে অন্য জিনিস! শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা—চাপরাশ না পেলে প্রচার হয় না।

অনেক দিন থেকে রাজা অজাতশত্রুকে নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে দৃপ্ত বালাকির ইচ্ছা। কাশীরাজ অজাতশত্রু ছিলেন সে যুগের ব্রহ্মবিদ্-বরিষ্ঠগণের অন্যতম, লোকের মুখে মুখে বিশেষ ক'রে গুণিসমাজের সর্বত্রই তাঁর নাম। সকলেই তাঁর জ্ঞানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু তাঁর হিমাচলের গাম্ভীর্যের কাছে কেউ এগুতে সাহস করেন না। দূর থেকেই বুঝি সুন্দর প্রশান্ত মহাসাগরের দর্শন!

একদিন সুযোগ বুঝে দৃপ্ত বালাকি রাজসভায় উপস্থিত। সদম্ভে অজাতশত্রুকে বললেন, "মহারাজ, আমি গার্গ্য বালাকি, সর্বশাস্ত্র অধ্যয়নে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করেছি, আপনাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে উপদেশ দেবার ইচ্ছায় এখানে সমাগত। আপনি প্রস্তুত হোন্, আমি ব্রহ্মোপদেশ করব।"

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ অজাতশত্রু ঋষিকুমারের দম্ভোক্তি শ্রবণে মনে মনে হাসলেন নিশ্চয়ই, মনের গোপনে

ইচ্ছাও ছিল তাঁর জ্ঞানের বহর কত দূর দেখেন, তাই প্রকাশ্যে বললেন, "ঋষিপুত্র, আমি আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনার আগমনে ও কথায় আমি খুবই আনন্দিত। আপনি যে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে ইচ্ছা করেন—শুধু এই কথাটি বলার জন্তই আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি। বিদ্বজ্জন ও ব্রহ্মজ্ঞেরা কেবল রাজর্ষি জনকের কাছেই যান—জ্ঞানের নানাপ্রকার চর্চা ও ভাবের আদানপ্রদান করেন। দাতারূপেও তাঁর অশেষ খ্যাতি শুনতে পাই। জনক রাজা গুণগ্রাহী সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ছাড়া আরও তো গুণের সমাদরকারী থাকতে পারেন। আজ সর্বসাধারণে দেখুক—মহারাজ অজাতশত্রুও ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করতে চান এবং দান করার ক্ষমতাও রাখেন। আমি প্রস্তুত, আপনি প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।"

শুধু একটি মাত্র কথা—ব্রহ্মবিদ্যা দান করব তাতেই সহস্র গোদানের প্রতিশ্রুতি, তবে সম্পূর্ণ বিদ্যা প্রকাশ করলে যে কত ধনসম্পত্তিপ্রাপ্তি হবে তা সহজেই অনুমেয়। খুশিতে বালাকির প্রাণ ভরে গেল। সোৎসাহে উদ্ঘাটন করতে লাগলেন তাঁর অধিগত বিদ্যার ভাণ্ডার। কিন্তু হায়, যাই তিনি একটি উপদেশ করেন অমনি অজাতশত্রু বলে ওঠেন—ইনি প্রকৃত ব্রহ্ম নন্, এঁকে উপাসনার এই ফল লাভ হয়। রাজা আশ্চর্যভাবে উপাসনার বিষয় ও তার ফল বর্ণনা করে বালাকির বিস্ময় উৎপাদন করে চলেন।

প্রসঙ্গ এমনিভাবে শুরু হল :

"মহারাজ, ঐ যে সূর্যে অবস্থিত পুরুষ, আমি তাঁকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।" রাজা অজাতশত্রু বাধা দিয়ে বললেন, "না না ঋষিকুমার, এরূপ বলবেন না ; আমিও তাঁকে উপাসনা করি তবে শুধু ঐভাবে নয়—তিনি হলেন সর্বাতীত, নিখিল ভূতের মস্তক ও জ্যোতিষ্মান্—এইভাবেও তিনি আমার উপাসনা প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি তাঁকে এইরূপে উপাসনা করেন তিনিও সর্বাতীত, নিখিল ভূতের মস্তক ও জ্যোতিষ্মান্ হন, কারণ উপাসক যে যে ভাব নিয়ে উপাসনায় রত থাকেন সেই সেই ভাব প্রাপ্তিই উপাসনার ফল।"

"যিনি সবিতৃমণ্ডলে অবস্থিত তিনি কার্যকারণ-সঙ্ঘাতে চক্ষুর্দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয়পুণ্ডরীকে অবস্থান করেন—নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে তাঁর উপাসনা, এ যে অহংগ্রহ* উপাসনা—মহারাজ অজাত-শত্রু যেন এই নির্দেশই দিচ্ছেন। তবে সূর্যস্থিত পুরুষের উপাসনা মুখ্যব্রহ্মের উপাসনা নয়—আমার ধারণা ভুল!"—ভাবতে থাকেন বালাকি। কিন্তু ভাবলে তো চলবে না! তাই ক্ষণপরে বললেন, "এই যে চন্দ্রমণ্ডলে অধিষ্ঠিত দেবতা, আমি এঁকে ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করি।"

সঙ্গে সঙ্গে বাধা আসল রাজার কাছ থেকে : "না না—এ প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন। আমি এঁর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নই, ইনি ব্রহ্ম নন্। এঁর সম্বন্ধে আমার যে শুধু সাধারণ জ্ঞান আছে তা নয়, ইনি আমার বিশেষ জ্ঞাত। এঁর উপাসনার ফলও আপনাকে বলছি শুনুন। চন্দ্রে অধিষ্ঠিত পুরুষকে মহান্, শুক্লাম্বর, ভাস্বর, সোমরূপে জানি। একই পুরুষ অভিন্নরূপে চন্দ্রে, মনে, বুদ্ধিতে ও সোমে রয়েছেন—এঁকে আমি অহংগ্রহরূপে উপাসনা করে থাকি। আর যিনি এইভাবে উপাসনা করেন তিনি প্রধান এবং অঙ্গ সমস্ত যজ্ঞই অক্লেশে অনুষ্ঠান করতে পারেন, উপরন্তু তাঁর কোনদিন অন্নাভাব হয় না।"

"এটিও দেখছি মহারাজের জানা, আমার যেভাবে জানা ছিল—তা তো ভুল প্রতিপন্ন হল। তবে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষও মুখ্য ব্রহ্ম নন্"—চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে বালাকির চিত্ত। কিন্তু আশা ছাড়লে তো চলবে না! আশাই যে আশ্বাসিনী। অনেক আয়াসে মনে বল সঞ্চয় করে বলে উঠলেন,

* প্রবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য

"মহারাজ, এই যে বিদ্যুতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, আমি এঁকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি ; আপনিও করুন।"

গম্ভীর কণ্ঠ থেকে বাণী নির্গত হল ; "ঋষি-কুমার, এরূপ বলে আমাকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন করতে পারবেন না। শুনুন, এই বিদ্যুদধিষ্ঠিত পুরুষকে আমি তেজস্বী বলে উপাসনা করি। একই দেবতা বিদ্যুৎ, ত্বক্ ও হৃদয়ে সমভাবে অবস্থিত আছেন—এ আমি জানি। এও একপ্রকার অহংগ্রহ উপাসনা। যে ব্যক্তি এই অহংগ্রহ উপাসনায় ব্যাপৃত হন, তিনি নিজে ও তাঁহার সন্তান-সন্ততি তেজস্বিতা লাভ করেন। এই উপাসনার ফল সুদূরপ্রসারী, বংশ পরম্পরায় ইহা সঞ্চারিত হয়। বিদ্যুতে অবস্থিত পুরুষ মুখ্য ব্রহ্ম নন্, আপনার ভ্রম ত্যাগ করুন।"

দৃপ্ত বালাকির তৃতীয়বার দর্প চূর্ণ হল। আশায় বুক বেঁধে আবার প্রসঙ্গ চালালেন, "মহারাজ, এই যে আকাশাভিমানী পুরুষ -আমি এঁকে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করি।" আবার বাধা : "না না কখনই নয়, আকাশে অধিষ্ঠিত পুরুষকে আমি ব্যাপক ও নিষ্ক্রিয়রূপে জানি এবং সেইভাবেই তিনি আমার উপাস্য। যে কেহ এঁকে এইভাবে পূর্ণ ও অবিলুপ্তস্বভাবরূপে উপাসনা করেন তিনি সর্বদা সন্তানসন্ততি ও পশুবৃন্দে পূর্ণ থাকেন, ইহলোকে তাঁর কখনও বংশলোপ হয় না। ঋষিকুমার, মুখ্য ব্রহ্ম কি না জানার জন্যই অব্রহ্মবস্তুকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করছেন।"

আকাশাধিষ্ঠিত পুরুষে ব্রহ্মরূপের ধারণা প্রত্যাখ্যাত হল ; অনিমেষে বালাকি চেয়ে থাকেন অজাতশত্রুর মুখের দিকে। "আকাশের পর বায়ু—এইবার বায়ুর প্রসঙ্গ আরম্ভ করি, দেখা যাক্ কি হয় !"

"এই যে বায়ুতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, আমি এঁকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি"—সংশয়াকুলচিত্তে বলতে থাকেন গার্গ্য। এই বুঝি মহারাজের ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হতে হল।

"সে কি ঋষিকুমার, প্রাণে ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বায়ুদেবতা হলেন সর্বাধীশ, অদম্য ও অপরাজিত। এঁতে ও মুখ্য ব্রহ্মে পার্থক্য বিপুল। এঁকে উপাসনা করেই তো লোকে জয়শীল, অপরাজেয় ও শত্রুদমনকারী হয়।"

বালাকি সহজে নিরস্ত হবেন না। সে পাত্র তিনি নন্। আর হবেনই বা কেন ? ব্রহ্মজ্ঞান দিতে এসে এমনিভাবে অপদস্থ হয়ে ফিরতে হবে ? শেষপর্যন্ত নিজের বুদ্ধি যতদূর যায়—ছাড়বেন না প্রতিজ্ঞা। দৃপ্ত বালাকি আর একবার দৃপ্ত হয়ে ওঠেন। যাঁরা পুরুষকারে বিশ্বাসবান্ তাঁরা তাকেই যে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকেন ; বললেন, "অগ্নিমধ্যস্থ পুরুষকে আমি ব্রহ্মবোধে উপাসনা করি।"

"এ বিষয়ে মোটেই এরূপ প্রসঙ্গ করবেন না। অগ্নিস্থ যে পুরুষ বাগিন্দ্রিয়ে ও হৃদয়ে তিনিই। এঁর সম্বন্ধে গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে—ইনি মুখ্য ব্রহ্ম নন্, ইনি হলেন 'বিষাসহি' অর্থাৎ পরসহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। এঁর উপাসনাকারী ক্ষমাগুণের আকর হন এবং তাঁর বংশধরগণও ক্ষমাসম্পন্ন, দীপ্তাগ্নি বা বহুভোজী হয়। এই অহংগ্রহোপাসনার ফল বহুবিস্তৃত।" অজাতশত্রুর পাণ্ডিত্যে ক্রমশঃ মুগ্ধ হচ্ছেন গার্গ্য।

"আচ্ছা মহারাজ, এই যে জলাভিমানী পুরুষ, আমি এঁকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি, আপনি কী বলেন ?" "না গার্গ্য এও ঠিক নয়—জলে অধিষ্ঠিত পুরুষকে আশ্রয়ানুরূপ বলেই উপাসনা করি, প্রকৃত ব্রহ্মরূপে নয়। জলে, শুক্রে, হৃদয়ে একই দেবতা অবস্থিত—ইনিই 'অনুরূপ', শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের অবিরোধী বলে এঁর এই বিশেষণ। যে ব্যক্তি এঁর উপাসনায় কাল যাপন করেন তিনি অনুকূল বিষয়-সমূহই প্রাপ্ত হন, কখনও তার বিপরীত হয় না, অধিকন্তু তাঁর অনুরূপ সন্তানই জাত হয়।"

গার্গ্য যে আজ কার মুখ দেখে শয্যা ত্যাগ করেছিলেন, তাই চিন্তা করতে থাকেন। "কোন

দিন তো এ রকম হয়নি। এত কাল যা শিখলাম সবই ভুল নাকি!" পুনরায় বললেন সাহসে ভর ক'রে "এই যে পুরুষ দর্পণে অধিষ্ঠিত আমি এঁকে ব্রহ্ম ব'লে উপসনা করে থাকি।"

"ঋষিকুমার, দর্পণে ও স্বভাবতঃ নির্মল খড়্গাদিতে আর বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হৃদয়ে একই দেবতা অবস্থিত রয়েছেন, রোচিষ্ণু অর্থাৎ দীপ্তিশীল এঁর বিশেষণ, তাই এঁকে মুখ্যব্রহ্মরূপে গ্রহণ না করে দীপ্তিশীল বলেই এঁকে উপাসনা করি। এই উপাসনার ফল স্বভাবসিদ্ধভাবে দীপ্তিপ্রাপ্তি, উপাসক নিজে ও তাঁর সন্তানগণ দীপ্তিলাভ করেন।"

গার্গ্য বললেন, "কোন প্রাণী যখন গমন করে তখন তার পশ্চাতে একরকম শব্দ উত্থিত হয়, আমি এটিকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি।" এই কথা শ্রবণমাত্র অজাতশত্রু বলে উঠলেন, "না না, তা হতেই পারে না, একথা সম্পূর্ণ অসমীচীন, ইনি প্রকৃত ব্রহ্ম নন্। আমি এঁকে অসু বা জীবন-কারণ প্রাণ বলে উপাসনা করি। রহস্যটি এই—গমনকারীর পশ্চাতে উত্থিত শব্দ এবং জীবনের হেতুভূত অধ্যাত্ম প্রাণ উভয়ই এক, কারণ বৃত্তি-বিশেষের সহায়তায় প্রাণই কয়েকটি অবয়বকে সঞ্চালিত ক'রে চলমানের পশ্চাতে শব্দ উৎপাদন করে। এই অহংগ্রহ উপাসনার ফল ইহলোকে পূর্ণায়ু লাভ। প্রাক্তন কর্মানুসারে যে পরিমাণ আয়ু নির্দিষ্ট থাকে, কর্মফল অনুযায়ী সেই পরিমিত আয়ুষ্কালের পূর্বে রোগাদির দ্বারা আক্রান্ত হলেও প্রাণ এই উপাসককে পরিত্যাগ করে না।"

"তবে এই যে পুরুষ যিনি দিক্‌সকলের অধিষ্ঠাতা, আমি এঁকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি—আমার এই উপাসনা নিশ্চয়ই নির্ভুল, আপনিও এটি মেনে নিন।" —এইভাবে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন গার্গ্য।

"না, তা কখনই হতে পারে না, এ উপাসনাও ত্রুটিহীন নয়, উপরন্তু একেবারে অসঙ্গত। দিক্‌সমূহে, কর্ণদ্বয়ে ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্নতাগুণে বিভূষিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দিগভিমানী দেবতা অবিযুক্তস্বভাবরূপে উপাসনার যোগ্য। এঁর সঙ্গেও প্রকৃত ব্রহ্মের আকাশ পাতাল তফাৎ। এই অহংগ্রহোপাসক সহায়যুক্ত হন, কখনও তাঁর স্বগণবিচ্ছেদ হয় না ও সহায়ের অভাব ঘটে না।"

গার্গ্য আরেকটি প্রসঙ্গ উঠালেন, "এই যে ছায়াময় পুরুষ, আমি এঁকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করি।" বাধা দিয়ে অজাতশত্রু বললেন, "এ বিষয়ে প্রসঙ্গ মোটেই তুলবেন না। ইনি মৃত্যুরূপে আমার উপাস্য। ছায়াতে বা বহিঃস্থিত অন্ধকারে ও দেহমধ্যস্থ আবরণাত্মক অজ্ঞানে একই দেবতা। মুখ্য ব্রহ্ম এঁর থেকে যে বহু দূর! মৃত্যুই এঁর বিশেষণ। যে কেহ এঁর উপাসনা করেন তিনি দীর্ঘায়ু হন, ইহলোকে নির্দিষ্টকালের পূর্বে অকালমৃত্যু তাঁকে গ্রাস করে না ও তাঁকে রোগযন্ত্রণারও অধীন হতে হয় না।"

একবার নয়, দুবার নয় উপর্যুপরি একাদশ বার পরাজয় বরণ করতে হল। সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। কিন্তু উপায় কি? অসারের তর্জনগর্জনই সার! আর একটি মাত্র প্রসঙ্গ জানা, এটি হলেই সব শেষ, সব হিসাব নিকাশ চুকে যাবে। বড় আশায় বুক বেঁধে শেষ বারের মতো প্রসঙ্গ করেন গার্গ্য, "এই যে পুরুষ প্রজাপতিতে অধিষ্ঠিত, এঁকে আমি ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, "না না, ইনিও মুখ্য ব্রহ্ম নন্। এইরূপ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অসমীচীন। আমি এঁকে আত্মবান্‌রূপে উপাসনা করি। এতক্ষণ যে সমস্ত আলোচনা হ'ল সবই ব্যষ্টিব্রহ্মসম্বন্ধীয়—এটি হচ্ছে সমষ্টিব্রহ্মবিষয়ক। আত্মাতে অর্থাৎ সমষ্টি-বুদ্ধিভূত প্রজাপতিতে ও হৃদয়ে একই দেবতা অধিষ্ঠিত এবং 'আত্মবান্' এই বিশেষণে তিনি বিশেষিত। যে ব্যক্তি যথাযথরূপে এঁর উপাসনা

করেন, তিনি প্রশান্তাত্মা ও সংযতচিত্ত হন, তাঁর বংশও প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। উপযুক্ত অধিকারীর দ্বারা পূর্বোক্ত উপাসনাগুলি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হলে ক্রমশঃ তাঁর মুখ্য ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মে। হে ঋষিকুমার গার্গ্য, আপনি অমুখ্যব্রহ্মবিদ্ হয়েও মুখ্যব্রহ্মের উপদেশ দিতে গিয়ে সব গোলমাল করে বসলেন, তাই আপনার ভুল ধরিয়ে দিলাম। অজানা জিনিস সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া কী মারাত্মক! আপনার মতো অনধিকারীর হাতে পড়ে হায় হায় বিদ্যার এহেন দুর্দশা! শুধু আপনি কেন, এ রকম আরও কত যে আছে তার ঠিক নেই। অযোগ্য পাত্রে বিদ্যা সুফলপ্রসূ হয় কি? আগে আত্মজ্ঞানলাভ তারপরে তো লোকশিক্ষা। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে—তা আবার চক্ষুষ্মান্‌কে দেখাতে চায়। আশা করি আপনার ভুল ভেঙেছে।"

গার্গ্য যথোক্তক্রমে যে সমস্ত ব্রহ্মবিষয়ক কথা বলেছেন—সবই অজাতশত্রুর পরিজ্ঞাত থাকায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, উপরন্তু তাঁর ত্রুটিও দেখিয়ে দিয়েছেন। গার্গ্যের ব্রহ্মবিজ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেল—বিদ্যার ভাণ্ডার একেবারে খালি! এখন আর তিনি কি করবেন, কোনও উত্তর দিতে সমর্থ না হয়ে অধোমুখে চুপ করে রইলেন। দৃপ্ত বালাকির দৃপ্ততা চিরতরে ম্রিয়মাণ হল। প্রজ্বলিত হুতাশনে অজাতশত্রু জল ঢেলে দিলেন যে!

ঋষিকুমাররকে মৌন দেখে অজাতশত্রু বললেন, "এই পর্যন্তই তো আপনার বিদ্যার দৌড়, এখানেই নিশ্চয় আপনার ব্রহ্মবিজ্ঞান পরিসমাপ্ত হল।" গার্গ্য উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, এই পর্যন্তই—এর বেশি আমার জানা নেই।" "কিন্তু ঋষিকুমার, ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে এইটুকু জানাই যথেষ্ট নয়, এইটুকু জানলেই ব্রহ্মকে জানা যায় না"—বললেন অজাতশত্রু স্নেহভরে। যেন সেই স্নেহসিক্ত বাণীর পরশ পেল গার্গ্যের কর্ণরন্ধ্র দুটি।

আঘাতের পর আঘাত পেয়ে অহংকার একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে। নীরবে ভাবছেন ঋষিকুমার "এসেছিলাম আত্মজ্ঞান দিতে—যা নেই তাই দিতে এসেছিলাম, তবে এখন ফিরব কি করে? লোকে যে মুখে চুনকালি দেবে। না-না লজ্জাই বা কী! আমি তো ব্রহ্মজ্ঞ নই। ইনি অজাতশত্রু, কত বড় পণ্ডিত—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতে ও আত্মজ্ঞানে তাঁর মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত। তিনি এতক্ষণ আমার পরীক্ষা করছিলেন—আমার বিদ্যারও পরিচয় পেলেন। এক কাজ করি না—আমি তো এঁর কাছে পরাস্ত—এখন এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুখ্যব্রহ্মের উপদেশ লাভ করি না কেন।"

ভাবতে ভাবতে ভিতরটা গুমরে কেঁদে ওঠে—রুদ্ধ অশ্রু চোখ ফেটে বেরুতে চায়! অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটির উপর দৃষ্টি পড়ল অজাতশত্রুর—করুণায় বিগলিত হল তাঁর হৃদয়। তিনি চিন্তিত হলেন "আমি গার্গ্যকে পরীক্ষা করলাম—মৃদুভাবে অনেক ভর্ৎসনাও করেছি, এখন এই ঋষিকুমারের কিছু উপকার করা দরকার।" মহাপুরুষগণের কার্যই তাঁদের হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। তিরস্কার-ভর্ৎসনার মধ্য দিয়েও তাঁরা কল্যাণ করেন। কোন্ রোগের কি চিকিৎসা তাঁরা যে জানেন!

জীবনের সেই অপূর্বক্ষণ—সেই পরম কাম্য মুহূর্তটি সমুপস্থিত—শ্রদ্ধা দেবী সুপ্রসন্না হলেন। গার্গ্যের জীবনের গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে। অজাতশত্রুও তাঁর মনের পরিবর্তন সবই বুঝতে পারছেন, তাই মৃদু মৃদু হাসছেন। আত্মজ্ঞের কাছে যে কিছুই অবিদিত থাকে না! গার্গ্য শ্রদ্ধার আবেশে আপ্লুত হয়ে বললেন, "মহারাজ, আমি শিষ্যভাবে আপনার কাছে উপদেশ নিতে চাই। আপনি আমায় কৃপা করে শিষ্যত্বে বরণ করুন—আমায় মুখ্যব্রহ্মের উপদেশ দিন।" শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলে গুরু ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেন না, তাই গার্গ্য ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত হয়েও ক্ষত্রিয়গুরুর

শরণাপন্ন! 'অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে' —আপৎকালে অব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাগ্রহণ বিধি-বহির্ভূত নয়। আজ যে ব্রাহ্মণকুমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রশ্নের সম্মুখীন! এর সমাধান চাই-ই চাই—সম্মুখে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, তিনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সে বিচারে কাজ কি? কাছে রয়েছে সুপেয় জল, তা ফেলে কোথায় ছুটবে পিপাসার্ত অনিশ্চিতের আশায়!

বালাকির বিনয় ও ব্রহ্মবিদ্যালাভের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন অজাতশত্রু। একটি প্রজ্বলিত দীপ আরেকটিতে দীপ্তি সঞ্চার করতে প্রয়াসী! তিনি বললেন, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মের উপদেশ লাভ করবে ইহা প্রতিলোম বা প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ হলেও আমি অবশ্যই আপনাকে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দেব, কারণ আপনার মধ্যে শ্রদ্ধা জেগেছে, শ্রদ্ধাবানকে উপদেশদানে মহাপুণ্য।" এই কথা বলে রাজা সাদরে তাঁর হাত ধরে উঠালেন। সলজ্জ ঋষিকুমারকে যেন তিনি আশ্বাস দিতে চান—এই ভাব।

অতঃপর দুজনে রাজবাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত এক ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলেন। অজাতশত্রু সেই সুপ্ত পুরুষকে গার্গ্যোক্ত 'মহান্ শুক্লাম্বর, জ্যোতিষ্মান্, সোম' ইত্যাদি নামে বার বার আহ্বান করতে লাগলেন, কিন্তু সেই ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগরিত হল না। তখন তাকে হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে জাগালেন। গাত্রোত্থান করল সুপ্ত পুরুষ। এর থেকে বোঝা গেল যে, গার্গ্য যাঁকে কর্তা ভোক্তা বলে মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে এই দেহমধ্যে তিনি কখনই কর্তা, ভোক্তা ও ব্রহ্ম নন্।

অজাতশত্রু গার্গ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে বিজ্ঞানময়—বুদ্ধিপ্রধান পুরুষ, ইনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন কোথায় ছিলেন, কোথা থেকেই বা এইরূপে এলেন?"

গুরুর প্রশ্নে শিষ্য বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেন। প্রশ্নের মর্মার্থ তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর বুদ্ধিস্ফূর্তি হল না।

অজাতশত্রু তখন বললেন, "এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি যখন সুপ্ত হন তখন অন্তঃকরণোৎপন্ন বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের জ্ঞান গ্রহণ ক'রে হৃদয়মধ্যবর্তী পরমাত্মরূপ আকাশে অবস্থান করেন। এই পুরুষ তখন স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হন ব'লে সেই সময় এঁর নাম হয় 'স্বপিতি'; তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাক্, চক্ষু, ও শ্রবণেন্দ্রিয় এবং মনও সংগৃহীত হয়।" অজাতশত্রুর অভিনব বিশ্লেষণে গার্গ্যের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সুষুপ্তিকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়নিচয় গৃহীত হওয়ায় ক্রিয়া, কারক ও ফলাত্মক ব্যবহারও তখন থাকে না, কাজেই পুরুষ সেই অবস্থায় স্বীয় আত্মস্বরূপেই অবস্থান করেন।

গুরু বলে চলেছেন অপূর্ব জ্ঞানের কথা আর মুগ্ধ শিষ্য উৎকর্ণ হয়ে সেই অমৃত পান করছেন। গুরুর হৃদয় আর শিষ্যের হৃদয় দুটি মিলে যেন এক হয়ে যেতে চায়!

এখন সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থার ভেদ দেখাচ্ছেন: "সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে স্বপ্নবৃত্তি অবলম্বনে বিচরণ করেন, সে সময় তাঁর জাগ্রৎকালে অনুভূত ভোগস্থানগুলি উপসংহৃত হয়। তখন তাঁর কর্মফল এইরূপ হয়—তিনি যেন মহারাজ বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হন অথবা উত্তমাধম ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হন। লোক-প্রসিদ্ধ মহারাজ যেমন রাষ্ট্রের ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ ক'রে নিজের জনপদে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করেন, সেইরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষও নিজের বাগাদি ইন্দ্রিয়-গণকে জাগরিত স্থান থেকে উপসংহৃত ক'রে স্বকর্মার্জিত দেহের মধ্যেই বিচরণ করেন। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কার্য স্থগিত হলেও অন্তঃকরণের কার্য চলে, কিন্তু সুষুপ্তি সময়ে সেই অন্তঃকরণের কার্যও স্থগিত হয়। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার এই পার্থক্য।"

গার্গ্য এই উপদেশে বুঝতে পারলেন যে, বিজ্ঞানময় দ্রষ্টা স্বপ্ন ও জাগরণের দৃশ্যাবলী থেকে ভিন্ন, ক্রিয়াকারণ-ফলশূন্য ও বিশুদ্ধ।

অজাতশত্রু বললেন, "এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যখন সুষুপ্ত হন, যখন তাঁর কোন বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকে না—তখন তিনি হৃদয় থেকে নির্গত সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত ৭২ হাজার নাড়ী দিয়ে বহির্গত হয়ে শরীরে অবস্থান করেন। যেমন শিশু, মহারাজ বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তেমনি বিজ্ঞানময় পুরুষ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হন।"

এখন গার্গ্যের একটি নূতন জ্ঞান হল,—তিনি বুঝলেন, "সুষুপ্তিকালে সংসারধর্মাতীত আত্মাতেই পুরুষের অবস্থিতি; তাঁর থাকার জন্যে তাঁর থেকে ভিন্ন অপর কোনও স্থান নেই, তাঁতে কোন আধার-আধেয় বিভাগও নেই।" এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর শ্লোকও যেন তাঁর মনে পড়ল। সেই শ্লোকের অনুরূপ একটি :

"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্মযোগাৎ
স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥"

মনে মনে তিনি এর অর্থটিও চিন্তা করতে লাগলেন—"সুষুপ্তি-সময়ে এই জড়দেহের সমস্তই কারণ-শরীর অজ্ঞানে বিলীন হয়, (এমনকি দৃশ্যমান এই স্থূল দেহটিও তখন থাকে না। অপরে যে সুষুপ্তের স্থূল দেহ দর্শন করে তা তাদের ভ্রান্তিমাত্র।) জীব তখন তমোগুণে অভিভূত হয়ে কর্মসহযোগে কেবল আনন্দময় অবস্থা অনুভব করেন, আবার প্রাক্তন কর্মের প্রেরণায় পরিচালিত হয়ে স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থা প্রাপ্ত হন।"

অজাতশত্রু বললেন, "ঋষিকুমার, এ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত আছে, শুনুন। মাকড়সা যেমন স্বশরীরোৎপন্ন তন্তু অবলম্বনে বিচরণ করে কিংবা অগ্নি থেকে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয় ঠিক তদ্রূপ এই আত্মা থেকেও সমস্ত ইন্দ্রিয়, সকল লোক, দেবগণ ও প্রাণিসমূহ নানাপ্রকারে তির্যক ও মনুষ্যাদিরূপে উৎপন্ন হয়। এই আত্মার *রহস্য নাম—সত্যের সত্য; প্রাণসমূহ* সত্য কিন্তু ইনি তাদেরও সত্য অর্থাৎ সত্যতা-সম্পাদক—ইহাই আত্মার উপনিষৎ।"

অজাতশত্রু এই পর্যন্ত বলে প্রকৃত বা মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ শেষ করলেন।

গার্গ্যের অনুভূতি হল যে, জগৎ যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়, যাঁতে অবস্থান করে ও যাঁতে লীন হয় তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর অন্তর আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলেন "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই আনন্দের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। শূন্য কুম্ভ পূর্ণ হয়ে গেছে তাই আর কোন শব্দ নেই—শুধু অনুভূতি। গুরুবাক্য মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে চলেছেন ঋষিকুমার গার্গ্য : "তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।"

অহংগ্রহ উপাসনা—'দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি' (দেবতা হয়ে দেবতাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়), 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি' (ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) ইত্যাদি বেদবাক্যবলে উপাসনার উচ্চস্তরে উপাস্য দেবতাকে নিজ থেকে অভিন্নরূপে এবং নিজেকে স্বীয় উপাস্য হতে অভিন্নরূপে ধ্যান করার প্রণালী আছে। তখন উপাসক নিজেকে দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত ও জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীবরূপে চিন্তা করবেন না। পরন্তু তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ এইরূপে নিজের স্বরূপের চিন্তা ক'রে উহার সহিত গুণযুক্ত উপাস্যদেবতার অভেদ চিন্তন করবেন। ইহারই নাম অহংগ্রহোপাসনা। এই প্রকার ধ্যানে উপাস্যদেবতানিষ্ঠ গুণসকল জীবে ধ্যেয় হওয়ায় নিকৃষ্ট জীবের উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধি

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

বৈশালী মঠে আছেন বুদ্ধ, শুনিতে তাঁহার বাণী—
কী এক প্রেরণা দিক্ দিক্ হ'তে আনিছে
সবারে টানি।

ভুলিতেছে লোক যত তাপ শোক শাস্তা-চরণে আসি,
পরমা শান্তি বিরাজিছে সেথা সকল দুঃখ নাশি।
একদিন আসে দূর পথ ভ্রমি শাক্যরমণীদল
ধূলিধূসরিত অঙ্গ তাঁদের চরণেতে নাহি বল।
রোরুদ্যমানা একটি বৃদ্ধা সবাকার পুরোভাগে
অতি ক্ষীণকায়া, মুখখানি তাঁর দেখিলে মমতা জাগে।
মহাপ্রজাপতি গোতমী ইনি বুদ্ধ-পালিকা-মাতা
নারীগণও পাবে ভিক্ষুধর্ম এই তাঁর ব্যাকুলতা।
জননীর বেশ জীর্ণ বসন কেশজাল নাই মাথে
দৃঢ়পণ তাঁর যাবেন না ফিরি নিষ্ফল মনোরথে।
বুদ্ধ-সেবক আনন্দ যান মাতার মিনতি ব'য়ে
বুদ্ধ-সকাশে গোতমী র'ন বহু প্রত্যাশা লয়ে।
ভিক্ষু ফিরেন ক্ষণকাল পর শুষ্ক মলিন মুখে
প্রার্থনা তাঁর হয়নি পূরণ কহিলেন অতি দুখে।
"কেন হ'ল নাক'?" শুধান গোতমী—"নারীর
উপরে তবে

শুধু অবহেলা রহিবে এমনি, সুবিচার নাহি হবে?
কি কারণে নারী হ'ল অপরাধী পদতলে দেবতার
পুরুষের সম মোক্ষধনে পাইবে না অধিকার?
কেহ ভাবিবে না ইহাদের তরে চাহিবে না মুখপানে
জ্বালাভরা প্রাণ জুড়াবে না কেহ শান্তির বাণীদানে?
কেহ দেখাবে না পথহারাগণে পথের সীমানা কোথা
রুদ্ধ কক্ষে লুকাইয়া মুখ মরিবে ঠুকিয়া মাথা?"

আনন্দ পুনঃ ফিরি চলি যান তথাগত-সম্মুখে,
শাক্যমাতার ব্যথা কাঁটাসম বিঁধিয়াছে তাঁর বুকে।
ভিক্ষুরে হেরি কহেন বুদ্ধ, "আনন্দ! আমি জানি
সমবেদনায় হয়েছ আকুল হিতাহিত নাহি মানি।

অহমিকা আর ব্যাধি-মৃত্যুর প্রতীক জানিয়ো নারী
ভিক্ষুসঙ্ঘে তাহাদের স্থান কভু নাহি দিতে পারি।
বুদ্ধ-আজ্ঞা মানি আনন্দ গোতমী নিকটেতে,
আসিয়া জানান ব্যথিতকণ্ঠে গৃহেতে ফিরিয়া যেতে।
শুনি নির্দেশ মহাপ্রজাপতি লুটান ভূমির পর
দারুণ নিরাশা-আহত ক্লান্ত দেহ কাঁপে থরথর।
গণ্ড বহিয়া ঝ'রে পড়ে ধারা দুহাতে ঢাকিয়া মুখ
কাঁদেন শাক্য-জননী দুঃখে ভাঙিয়া যেতেছে বুক।
দুটি কর জুড়ি রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুজলেতে ভাসি
বলেন গোতমী, "সে কি বুঝিল না আমার
বেদনারাশি?

আমার এ বেশ, কর্তিত কেশ, প্রাণভরা ব্যাকুলতা—
শুধু অহমিকা? কেবলি ছলনা? শুধুই কথার কথা?"

নীরবে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকেন ভিক্ষু গোতমী-পানে
বলিবার মত কোনও সান্ত্বনা নাহি আর হায় প্রাণে!
ক্ষণকাল যতি কি যেন ভাবেন মনে মনে আপনার
শেষ চেষ্টায় দেখি একবার করুণা পাইকি তাঁর।
বুদ্ধ-চরণে প্রণাম জানায়ে আনন্দ কন্ তাঁরে,
"প্রভু, তথাগত, আসিয়াছি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবারে।
পরিজন-স্নেহ, গৃহের মমতা ত্যাগ করে যদি নারী,
তোমার আদেশে সকল নিয়ম যতনে পালন করি—
তবুও কি নারী পাইতে পারে না কাম্য সে অধিকার
ভিক্ষুধর্মযোগ্যতালাভ হ'তে পারে নাকি তার?"
উত্তর-আশে সন্ন্যাসী চান বুদ্ধের মুখপানে
অতি সুমধুর দুটি কথা তাঁর তখনি পশিল কানে।
"হ'তে পারে নারী ভিক্ষুণী যদি রাখে সুকঠোর ব্রত"
প্রিয় সেবকের যুক্তিতে দেন সম্মতি তথাগত।

শুনিয়া সে বাণী আনন্দ তবে আনন্দে ছুটি যায়
গোতমী যথা বসিয়া ছিলেন নিশ্চল স্থাণুপ্রায়।

নিকটে আসিয়া দাঁড়ালেন যতি আবেগপূর্ণ স্বরে
কহিলেন, "মাতঃ, অনুমতি প্রভু দিয়াছেন
কৃপা ক'রে।"

দুনয়ন ছাপি মহাপ্রজাপতি গোতমীর বহে ধারা
কম্পিত দেহে আনন্দ সনে চলেন বাক্যহারা।
লুটালেন মাতা বুদ্ধচরণে প্রণিপাত করি তাঁরে
নতজানু হ'য়ে করজোড়ে কন্, "ক্ষমা কর প্রভু মোরে।

তোমার বিরাগ যদি হয়ে থাকে মোর কোন আচরণে—
ওগো ক্ষমাময়! ক'রে নিও ক্ষমা, রাখিও না
তাহা মনে।

শিশুকাল হতে পালিনু তোমায় আপন তনয় গণি
শুনেছিনু আমি মহামানবের নিশ্চিত পদধ্বনি।
তুমি চলে গেলে ছিলাম বাঁচিয়া এইটুকু আশা লয়ে
তোমার মন্ত্র করিব প্রচার নিজে ভিক্ষুণী হয়ে।

"মিটাইলে আশা করুণা-সাগর, জননীর জাতি আজি
নব মহিমায় হবে উন্নীতা ত্যাগের ধর্মে সাজি।
শোকাতুরা যত আর্ত নারীরা নীরবে দহিয়া মরে
তোমার মন্ত্র দিব আজ ঢেলে তাদের প্রাণের পরে।"

পৃথিবীতে মহান ঐক্য প্রতিষ্ঠা

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' বইটিতে শূদ্রত্ব-সহিত শূদ্রযুগের আবির্ভাব অনুপম ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি যোগনেত্রে দেখেছিলেন, রাশিয়ার ও বৃহৎ চীনের ভবিষ্যৎ শ্রমিক-অভ্যুদয়। ইহা ষাট বৎসর পূর্বের কথা, যখন অমিততেজা সম্রাট ও বৈশ্যকুলের কেহ এমন 'ভয়াবহ' ব্যাপার কল্পনাতেও আনতে সাহস করেনি। ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র-রুদ্রমরুত: প্রভৃতি আধিকারিক পুরুষেরা রাশিয়া ও চীন-ভূখণ্ডে বাছাই করা কর্মবীরদের পাঠিয়ে তাদের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কামোপভোগী রাজপুরুষদের কবল থেকে শাসনদণ্ড কেড়ে নিয়ে 'শূদ্রত্ব-সহিত' শূদ্র-শাসনরূপ অসাধ্য সাধন করিয়েছেন। নূতন কল্পের এই অভ্যুত্থান জগতে এক মহান ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সূচনা মাত্র। পরিপূর্ণ সাম্য-মৈত্রী পরে আসছে।

বিরাট পুরুষ দুই প্রণালীতে সর্বজীবে ব্রহ্মানুভূতি-রূপ মহান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী মনে হয়: ধ্বংসের মাধ্যমে এবং যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে। তিনি প্রবল রজোগুণী অসুর জাতিদের যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে, ধ্বংসস্তূপের ভস্ম থেকে নূতন সৃজন, সাম্য-মৈত্রীভাবান্বিত ঐক্যবদ্ধ নূতন জাতি সমষ্টি গড়ে তুলেন। ইতিহাসে পড়ি, অতীত যুগে যুদ্ধবিগ্রহ পাশাপাশি দুই চার সাম্রাজ্যের ভিতরেই নিবদ্ধ থাকত। সাধারণ প্রজাদের গায়ে যুদ্ধের আঁচ লাগত না। ক্রমে অনেকগুলি মিত্ররাজ্য একজোট হ'য়ে বড়রকমের লড়াই চালাতে থাকে। ইদানীং শুরু হয়েছে একেবারে বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীর সাদাকালো, পীতহরিত প্রায় সকল জাতিই দুপক্ষে জোট বেঁধে বছরের পর বছর ধরে আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে বিরাট ধ্বংসাত্মক কুরুক্ষেত্র লাগিয়ে দিয়েছে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ কারুর নিস্তার নাই। সাইরেন, ব্লাক্ আউট, বোমার ফাটন, এরোপ্লেনের গর্জনে সকলেই কম্পমান। এবার আসছে যে ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর তৃতীয় ওয়ার্লড

ওয়ার্ তার আতঙ্কে পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী, এমন কি নিরীহ নিরপেক্ষতাবাদীরাও সন্ত্রস্ত। ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু কোনোপক্ষে যোগ না দিয়ে ধৈর্য ও পঞ্চশীল পাঠ গ্রহণ করিয়ে দুই পক্ষকে ঠাণ্ডা করতে যত্নবান। বিরাট পুরুষ এই ধ্বংসলীলার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মৃত্যুর সামনে দাঁড় করিয়ে, রাজা-প্রজা, সাদা-কালোর ভেদ ঘুচিয়ে দিচ্ছেন; শ্বেতপীত, কাফ্রিনিগ্রো সকলকে পাশাপাশি সাজিয়ে একীকরণের মজা দেখছেন।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবীর আদিম কাল থেকেই বিরাট পুরুষ ভারতের কৃষ্টি সত্ত্বপ্রধান ধাতু দিয়ে গঠন করেছেন এবং যুগে যুগে "পরিত্রাণায় সাধূনাং" ও "ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়" মহাপুরুষদের ভারতে অবতরণ করিয়ে হিন্দুজাতি কর্তৃক সংগ্রামশীল অসুরদের সাম্য-মৈত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করবার ব্যবস্থা রেখেছেন। শ্রীবুদ্ধ এই ভারতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। একটি মত আছে যে প্রভু যীশুও ভারতে কিছুকাল সাধনা করে-ছিলেন। পুণ্যভূমি ভারতের কৃষ্টি ও বেদান্তবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যেই যেন বহির্ভূখণ্ড থেকে শক, হূণ, যবন, গ্রীক, পার্শী এবং ইংরেজ প্রভৃতি জাতিদের মহামায়া এখানে এনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীজীর তপস্যা এবং সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশৈকপ্রাণ তরুণদের আত্মোৎসর্গের ফলে আর্যভারত আজ পৃথিবীতে শান্তির দূতরূপে অভ্যর্থিত।

আমার বিশ্বাস এই যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের তাৎপর্য—বিরাট পুরুষের দ্বিতীয় প্রণালীর জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবার্তা পৃথিবীর মধ্যে প্রচার করা, প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামকামী অসুরদের কানে বেদান্তের শাশ্বত সমন্বয়-মন্ত্র শুনিয়ে সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তি ও পৃথিবীতে মহান ঐক্য স্থাপন। এই উদ্দেশ্যেই স্বামীজীর প্রচার কার্য মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্যেই সংঘটিত হয়েছিল। গত পঞ্চাশ বৎসরে পৃথিবীতে অতি দ্রুত অভিনব সৃজন ও মারণ বিবিধ প্রকারের যন্ত্রকলা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফলে একদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহ পরস্পরের নিকটে এসে গিয়েছে, স্থান কালের বিভেদ ক্ষীণতম হয়ে এসেছে, একীকরণের মালমসলা মজুদ হয়েছে; আর অন্য দিকে, যত দিন যাচ্ছে, ঠাকুর স্বামীজীর সমন্বয়ভাব ততই আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের এই জীবনে ভারতের, তথা পৃথিবীর ধর্ম ও সমাজ-জীবনে যে দ্রুত ও অভিনব পরিবর্তন ঘটেছে, তা ভাবলে বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হয়।

আমার মনে পড়ছে ষাট বৎসর পূর্বের বাংলাকে। স্বামীজী মহারাজ পাশ্চাত্ত্য জয় করে (১৮৯৭, জানুয়ারী) দেশে ফিরে এলেন। ভারতের জ্ঞানী, গুণী ও রাজা মহারাজারা তাঁকে সম্রাটোচিত শ্রদ্ধা ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। বাংলার দু চার জন নেতাও তাঁকে নিয়ে দু একটা সভা ডাকলেন। তারপরেই হাউইএর মতো উদ্দীপনা নিভে গেল, আর তার ছাই উড়ে 'বঙ্গবাসী' কাগজের স্তম্ভে বাঙ্গালী-সুলভ ঈর্ষা ও গোঁড়ামির কালিমাখা প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০২ সালের জুলাই স্বামীজী দেহ ছেড়ে স্বধামে চলে গেলেন। তাঁর একটা স্মৃতিসভার কোনো উদ্যোগ আয়োজন না দেখে আমরা কয়েকজন তরুণ এল্‌বার্ট হলে শোকসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য তদানীন্তন কোনো নেতাকেও রাজী করাতে পারিনি। অপিচ মর্মান্তিক দুর্বাক্য শুনে কাতর হৃদয়ে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা শ্রীহরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) কাছে কেঁদে পড়ি। তাঁর সে সময়ের তেজোদীপ্ত মূর্তি এখনো আমার চিত্তপটে আঁকা রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "তোরা যদি স্বামীজীকে সত্যই ভালবাসিস্ তবে প্রতিজ্ঞা কর্ কখনো কোনো বড় লোকের দ্বারস্থ হবি না। স্বামীজী

তোদের ভালবেসে, তোদের কল্যাণ কামনা হৃদয়ে ভরে নিয়ে তোদের জন্য কেঁদে কেঁদে চলে গেছেন, তোদেরই উত্তরাধিকারী করে। জানিস্ না, এই মঠ করতে দেশের লোক এক পয়সাতো দেয়ই নি, উল্টে নানা বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করে? তাইতো ঠাকুর তাঁর নরেন্দরকে প্রথমেই আমেরিকাতে প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন।”

তারপরে এই তরুণের দলই মঠে থেকে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র, চরিত্রগঠনের মালমস্‌লা সংগ্রহ করত। শ্রীশরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দ) আচার্য ক'রে 'বিবেকানন্দ সমিতি' গঠন ক'রে ঠাকুর স্বামীজীর বাণী নিজেদের জীবনে গেঁথে নিয়েছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে আজ অনুভব করছি যুগপ্রবর্তক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা ও সমন্বয় মন্ত্র, সকলের মধ্যে কেমন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার করছে। আজিকার আকাশে বাতাসে ঠাকুর-স্বামীজী-মাঠাকুরানীর পূত বাণীর ছড়াছড়ি, দিকে দিকে সভা-সমিতি, সারা ভারতে এবং পাশ্চাত্ত্যের মনীষীদের প্রাণেও এই হাওয়া বহে যাচ্ছে,—এই থেকে বেশ বুঝা যায় যে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মহান ঐক্যের ভাব প্রচারের জন্য একত্রে ঠাকুর স্বামীজীর অবতরণ ঘটেছে।

এবারকার আবির্ভাবের নূতনত্ব -এর পৃথিবী-ব্যাপী প্রচারে, এর সর্বজনমনোমুগ্ধকর সরল সমন্বয়-বাণীর উদাত্ত আহ্বানে এবং যুগপ্রবর্তনকারী জীব-শিবরূপ 'মানব ধর্ম' স্থাপনের আলোকচ্ছটায়। এর অভিনবত্ব ঠাকুরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে, যথা—লেখাপড়া না শিখেই শাস্ত্রবিৎ ও মন্ত্রদ্রষ্টা হওয়া, সন্ন্যাসজীবনে সাদা কাপড়ে থেকে সামাজিক বিবাহবন্ধনপ্রথা মান্য ক'রে সরস্বতীস্বরূপা শ্রীশ্রীসারদা-মণিকে শিষ্যা ক'রে আপন পার্শ্বে স্থান দেওয়া, বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ছাড়াও প্রচলিত ইস্‌লাম এবং খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম নিজে হাতেকলমে সাধন ক'রে প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য স্বয়ং উপলব্ধি করা। ঠাকুর এবার কোনো ধর্ম, সমাজ, রীতিনীতি ভাঙেন নি, কাকেও গালি দেন নি, অলৌকিক ভালবাসার মাধ্যমে সেকালের সকল আচার্য, পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ মনীষীদের ঘরে ঘরে দেখা ক'রে তাঁদের আপন ক'রে নিয়েছিলেন। অভিমানশূন্য ঠাকুর জীবের মঙ্গলের জন্য নিজের দেহকে অকালে বিসর্জন দিয়েছেন।

সর্বাপেক্ষা অলৌকিক খেলা ঠাকুর খেলেছেন তাঁর ১৮টি শক্তির আধার নরেন্দ্রকে দিয়ে। দেহ ত্যাগের পূর্বে তাঁর সাধনার সমগ্র ধন সমেত সূক্ষ্ম সিদ্ধদেহ নরেন্দ্রের সত্তার সাথে গেঁথে দিয়ে বললেন, জগদ্ধিতায় জগদম্বার কাজ করগে যাও।

যেমন অলৌকিক ও মাতৃগতপ্রাণ আমাদের ঠাকুর, তাঁর নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দরটিও তেমনি সরল, আপনভোলা ছিলেন। ভারতবাসীর মর্মবেদনা আকণ্ঠ পান ক'রে নীলকণ্ঠের ন্যায় ৫।৬ বৎসর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অজ্ঞাত, অপরিচিত ভিক্ষু পরিব্রাজক-জীবন যাপন করলেন। তারপর ঠাকুরের নির্দেশে, একেবারে ভুস করে গিয়ে হাজির হলেন, কুবেরের রাজ্যে—তদানীন্তন জগতের উদীয়মান শ্রেষ্ঠীদের দেশে, যেখানে অভিনব ধর্মসভায় সমবেত হয়েছেন ক্রীশ্চান সাম্রাজ্যের মুকুটমণিরা, প্রভু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা, তাঁর রক্তপতাকা সগৌরবে উড্ডীন করার উদ্দেশ্যে। ঠাকুরের নরেন্দ্র এর আগে কোন সভায় বক্তৃতা করেন নি, তিনি কোন ধর্ম বা সাংস্কৃতিক সমাজের প্রতিভূ নন, এমনকি তাঁর গুরুভাইরাও ৬ মাস জানতেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ নামে যে সন্ন্যাসী শিকাগো ধর্মসভায় জয়পতাকা লাভ করেছেন—তিনি ঠাকুরের নরেন্দরনাথ, তাঁদের অন্তরঙ্গ নরেন ভাই! এ যেন এক ভুঁইফোড় মল্লরাজ, যে কখনো কোনো আসরে নামেনি, সে পৃথিবীর অলিম্পিক খেলায়

একেবারে ফার্স্ট হ'ল!! আমাদের চোখের সামনে এই অভূতপূর্ব নাট্য অভিনীত হয়েছে।

শ্রীস্বামীজী মহারাজের সমগ্র জীবনবেদ লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট বোধ হয়, তিনি অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নূতন যুগের "গীত শুনাবার" জন্যই এসেছিলেন। "আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে…… ফিরে ফিরে গাই……দাস তব জনমে জনমে।" তাঁর পরিব্রাজক-জীবন ভারতবাসীর ধর্ম ও সমাজের উন্নতিচিন্তায় অগ্নিগর্ভ, পাশ্চাত্য প্রচারকার্য "চাপরাসধারীর" দিব্য চেতনায় ভরপুর, আর জীবনের শেষ ৫ বৎসর গুরুভ্রাতাদের সংহত করে "রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন" প্রতিষ্ঠায় উপসংহৃত।

আমি যখন ভাবি—শিকাগো ধর্মসভা ভেঙ্গে গেল, ডেলিগেটরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন, স্বামীজীর জয়গান চারিভিতে ধ্বনিত, এমন সুবর্ণ সুযোগে সাধারণ ডেলিগেটদের মতো তিনি দেশে রাজকীয় অভ্যর্থনা ও সমগ্র দেশবাসীর বাহবা লাভের কথা ভাবলেন না, বরং কপর্দকশূন্য পকেটে শ্বেতকায় প্রবলপ্রতাপ বিধর্মীদের নবযুগের বাণী, 'ঠাকুরের গীত' শুনাবার জন্য, পাদরীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিন বছর প্রচার কার্য চালিয়ে এলেন—এ কি কোনো সাধারণ পুরুষের পক্ষে সম্ভব? দৈবশক্তি ও ভগবৎপ্রেরণা ব্যতিরেকে এমনটিতো হয় না। বাগ্মী অজ্ঞেয়বাদী ইঙ্গারসল (Ingersol) ঐ সময়ে স্বামীজীকে বলেছিলেন, "স্বামীজী, আপনি দু এক যুগ আগে যদি এই বার্তা নিয়ে এখানে আসতেন তাহ'লে আপনাকে এরা টিলিয়েই মেরে ফেলত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখেন ১৮৮৬ সালে; স্বামীজী মহারাজ ১৯০২ সালে ৪ঠা জুলাই দেহ ছেড়ে স্বধামে ফিরে যান। মধ্যের মাত্র পনর বছর তাঁর সাধনার কাল। পাঁচ বৎসর কাটে পরিব্রাজক হিসাবে অজ্ঞাত; পাশ্চাত্যে কাটে দুবারে ৫ বছরের উপর; ভারতে ছিলেন ৫ বছরের কম সময় এবং তার মধ্যে ২ বছর রুগ্নদেহ নিয়ে তাঁর গুরুভ্রাতাদের সংহত করে মঠ ও মিশন তৈরীতেই কেটেছিল। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচার কার্য অতি অল্পই করেছিলেন।

ভারতবাসীদের ভিতরে বাঙ্গালীরাই সর্বাপেক্ষা উদার এবং সর্বজনীন ভাবধারা সহজে আত্মসাৎ করতে পারে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, আচার্য কেশবচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ সকলেই বাঙ্গালী। স্বামীজীও বাঙ্গালীর দেহ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সমগ্র ভারতবাসীর মর্মবেদনা, অপিচ কৃষ্টির মূর্ত বিগ্রহরূপে পাশ্চাত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে সকল দেশে তিনি এই কল্পাবতারের সর্বধর্মসমন্বয় ও জীব-শিব বাণী অপূর্ব বাগ্মিতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহায়ে মনীষীদের হৃদয়ে স্থাপিত করেন। তাঁর প্রচারিত নবযুগের ভাবধারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর চিন্তাশীল ধর্মপ্রাণ প্রত্যেক খাঁটি মানুষকে প্রভাবিত করছে।

আজ শ্রীনেহেরু শান্তির দূত হিসাবে শ্বেত ও পীত জাতিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভে যত্নবান। তাঁর পিছনে রয়েছে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয় ভাবধারা এবং মহাত্মা গান্ধীর পূতস্পর্শ, তাঁর রাজনীতিজ্ঞতা অথবা বাগ্মিতা নয়। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে কূটনীতিজ্ঞের অভাব নাই, পাশ্চাত্য মহারথীদের বাগবিভূতি, আসুরিক ছলচাতুরী ও ধূম্রজালিক ভাষণের অপ্রাচুর্য দেখা যায় না। যদি পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী—উভয় পক্ষের সামনে কালপুরুষের লোকক্ষয়কারী ভয়াবহ মূর্তি প্রকট না হত, 'তোমভি মিলিটারি, হামভি মিলিটারি', এই দুশ্চিন্তা না থাকত, তা হ'লে শান্তি ও পঞ্চশীলের ভাষণ কোথায় ভেসে যেত। স্থূল কামোপভোগী, রজস্তমবিলাসী প্রেয়তাত্ত্বিকের কাছে এই বাণীর মর্ম কতটুকু উদ্ঘাটিত হতে পারে? বহুজনের হিতচিন্তা, জীব-শিব জ্ঞান, প্রকৃত উদার মনোভাব দুর্লভ। স্বাধীন ভারতে এখনো বাঙ্গালী বিহারী ওড়িয়া অসমীয় শিখ হিন্দুর

মধ্যে মনের মিল নেই, ঐক্য নেই। নেতৃবর্গের ঝুড়ি ঝুড়ি ঐক্যের বুক্‌নি প্রাদেশিক কর্ণধারদের এক কান দিয়ে প্রবেশ ক'রে অপর কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। হৃদয়ে প্রবেশ করে না। আপন ঘরের মানুষকেই যে পঞ্চশীলা পাঠ শোধরাতে পারে না, হিন্দুর মধ্যেও একতা আনতে পারে না, দুর্ধর্ষ অসুরদের তা কেমন কোরে বশ করবে, এ আমার বুদ্ধির অতীত।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাম্য-মৈত্রী-একতা দুই পন্থায় সাধিত হয়। এক—ধ্বংসের ভিতর দিয়ে কালপুরুষের দ্বারা, যাঁর কাছে ক্ষুদ্র বৃহৎ, সাদা কালো কোনো বাছবিচার নাই। তিনি ধ্বংসের ভস্ম থেকে নূতন মানুষের সৃষ্টি করেন, যাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বৃহত্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যারা আপামর সকল প্রাণীর ব্রহ্ম বিকাশের সমান সুযোগ দিয়ে মহান জাতি গঠন করে। এর সঙ্গে পাশাপাশি অবতারাখ্য মহাপুরুষদের তাঁদের আত্মত্যাগ ও সমন্বয়-বাণীর মাধ্যমে জগতে শান্তি ও ঐক্যের ভাবধারা বহিয়ে দেন। স্বামীজী বলেছেন, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।*

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি, তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য। আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড় বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে।

অলৌকিক অভিনব প্রণালীতে কল্পাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পৃথিবীতে মহান ঐক্যের বীজ বপন করে গেছেন। এই বীজ ক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে। এখন সময় এসেছে। তাঁদের ভাবে উদ্বুদ্ধ মহাপ্রাণেরা জীব-শিব সেবা-ব্রতকে আরো ব্যাপক ভাবে প্রসারিত ক'রে প্রথমতঃ ভারতের বিভিন্ন জাতিদের ঐক্য ও সমন্বয় মন্ত্রে দীক্ষিত করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যেও এই ভাবের প্রচার কার্য চালিয়ে যান। বেদান্তের "ভোক্তা-ভোগ্যং-প্রেরিতারং", ত্রিবিধ ব্রহ্মরূপের সমন্বয়-বাণী এবং জীব-শিবের বার্তা দিকে দিকে প্রচারিত হোক। ভারতের ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ভাষায় পুস্তিকা প্রণয়ন ও বিতরণ এবং সর্বত্র ধর্মসভা আহ্বান ক'রে প্রতি জীবের কর্ণে আধ্যাত্মিক সাম্যমন্ত্র প্রদান—এই মহাব্রত নিয়ে হাজার হাজার শ্রমণ বেরিয়ে পড়ুন পৃথিবীর সর্বত্র। সময় ও সুযোগ অনুকূল, ধ্বংস-দেবতার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। গৈরিক পতাকা জগতে উড্ডীন করার প্রকৃষ্ট অবকাশ উপস্থিত।

"অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু
হয়ে যান।
ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর, সখে, এ সবার পায়।"

সমালোচনা

ভারতের ধর্ম—শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক—নন্দিতা মুখোপাধ্যায়, চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী। পৃষ্ঠা—৬৬; মূল্যের উল্লেখ নাই।

উপনিষদে আছে, "যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ"—সেই যে ধর্ম, উহাই সত্য—ধর্মের এই শাশ্বত রূপটিই 'ভারতের ধর্ম' শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই কাব্যগ্রন্থখানিতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম এমনি বিশাল যে একখানি স্বল্পায়তন পুস্তকের মাধ্যমে তাহার ব্যাপকতার সমগ্র রূপটির পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নয়। তাহা হইলেও লেখক আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রমত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। বেদ, উপনিষদ্, ন্যায়, বৈশেষিক,

মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, পুরুষোত্তম, সগুণ-ব্রহ্ম, নিগুর্ণপুরুষ প্রভৃতির বর্ণনা পাঠকবর্গকে আনন্দদান করিবে। শেষাংশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীও মনোরমভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছোটদের বিবেকানন্দ—মণি বাগচি প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—১৪৪; মূল্য দুই টাকা।

তরুণমনে মহাপুরুষ চরিত্রের প্রভাব যাহাতে সহজেই পৌঁছাইতে পারে বর্তমানে সেইভাবেই তাঁহাদের অমূল্য জীবনচরিত রচনা করা প্রয়োজন। শৈশবের সাহসিকতা, ভালবাসা, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলি পরবর্তীকালে কিরূপে পরিপূর্ণতা লাভের মধ্য দিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্ববিজয়ী ও মানবপ্রেমিক করিয়াছিল আলোচ্য বইটি লেখার সময় লেখক স্বামীজীর জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা বৈচিত্র্যের রূপায়ণে না গিয়া সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছেন। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও আন্তরিকতা সহকারে সতেজ ভাষায় লিখিত বলিয়া বইটির আবেদন ছোটদের হৃদয়ে পৌঁছিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। লেখককে অভিনন্দিত করি। স্বামীজীর এই কিশোরোপযোগী জীবনীটি বহুল প্রচারিত হউক ইহাই কামনা।

নূতন সূর্যোদয়—শ্রীদধীচি মৈত্র প্রণীত; শ্রীনূপুর মৈত্র কর্তৃক ৪।৩এ, মদন দত্ত লেন, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬৩; মূল্য—১৲ টাকা।

প্রচলিত "লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর গল্প"কে কেন্দ্র করিয়া আলোচ্য নাটিকাটি রচিত। সত্যাশ্রয়ী রাজা শশাঙ্কমাণিক্য অলক্ষ্মীর পট কিনিয়া কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলেন—রাজমাতা, রাজলক্ষ্মী, পাত্রমিত্র সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। এমন অবস্থায় শৌর্যবীর্যকর্মশক্তিও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত—কিন্তু যিনি সত্যের পূজারী বলবীর্যপুরুষকার হইতে তিনি তো কখনও চ্যুত হন না, তাই অদৃষ্ট-পুরুষকার, লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর দ্বন্দ্বে রাজা শশাঙ্কমাণিক্য জয়ী হইলেন। যাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। রাজা গ্রামের কুম্ভকার, কর্মকার, তন্তুবায় ও কৃষককুলের মধ্যে কর্মশক্তি জাগাইলেন—চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিল—অলক্ষ্মী চিরতরে বিদায় লইল। শ্রমবিহীন আলস্যময় জীবন অপেক্ষা কর্মমুখর জীবন ভাল—রূপকের সাহায্যে নাট্যকার ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কর্মশক্তির উদ্বোধনে লক্ষ্মীর আবির্ভাব—এই ভাবটি বেশ যুগোপযোগী হইয়াছে। স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত সাতটি দৃশ্যসম্বলিত "নূতন সূর্যোদয়" কিশোরবয়স্ক বালকবৃন্দের মধ্যে গ্রামসংগঠনের প্রেরণা যোগাইবে।

ত্রয়ী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত। ২৬বি, আর জি কর রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৫৩; মূল্য এক টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁহার লীলাসঙ্গিনী জননী সারদাদেবী এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ—এই চরিত্রত্রয়ের জীবন ও শিক্ষা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার বিষয়বস্তু। বইটি বিভিন্ন সময়ে দৈনিক বসুমতী ও আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত লেখকের চারটি রচনা ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাচতুষ্টয়ের সঙ্কলন। ঠাকুর-মা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে লেখক যাহা যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অনেকটা সুসঙ্গত এবং স্পষ্টভাবে বলিতে পারিয়াছেন। "শ্রীশ্রীমা সারদার আত্মকথা" শিরোনামায় নির্ভর-যোগ্য পুস্তকাবলী হইতে শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃতবাণী-সংকলনটি পাঠে পাঠকমাত্রেই আনন্দ পাইবেন। বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাশয়।

পথ্য বিজ্ঞান—ডক্টর শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ

এ, এম্, ডি, আয়ুর্বেদাচার্য ; প্রকাশক—শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ২৩৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯ ; পৃষ্ঠা—১৪৪ ; মূল্য তিন টাকা।

যে কোন মতে চিকিৎসা করা হউক না কেন পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পথ্যজ্ঞানের অভাবে রোগ সারিতে বিলম্ব হয়, আবার পথ্য সুনির্বাচিত হইলে সাধারণ অসুখগুলি কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হইবার সুযোগ না পাইয়া অল্প আয়াসে এমনকি বিনা চিকিৎসাতেও অনেক সময় সারিয়া যায়। 'পথ্য বিজ্ঞান' বইখানিতে প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মতে পথ্যনির্বাচনে দ্রব্যগুণের উপযোগিতা, দ্রব্যের অচিন্ত্যশক্তি ও ভিটামিনতত্ত্ব, বিভিন্ন রোগের সুবিস্তৃত পথ্যব্যবস্থা, শিশুদের পথ্য, আমাদের খাদ্য প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সুচাস্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রবীণ চিকিৎসকগণের অভিমতসহ নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতাও লেখক মাঝে মাঝে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের ধারণা—আলোচ্য বইটি এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, কবিরাজ, শিক্ষার্থী এবং গৃহস্থ সকলেরই উপকারে আসিবে।

আদর্শ নরেশ—পণ্ডিত ঝাবরমল্ল শর্মা প্রণীত, প্রকাশক—শেখাবাটী হিষ্টরিকল রিসার্চ অফিস, জসরাপুর—খেতড়ী (রাজস্থান) ; পৃষ্ঠা—৩৮৩ ; মূল্য—২৷৷০ টাকা।

ভারতের সর্বত্র বিদ্যোৎসাহী, দানশীল, প্রজাবৎসল, স্বধর্মনিষ্ঠ, গুণগ্রাহী ও রাজনীতিজ্ঞ রাজা অজিতসিংহজী বাহাদুরের নাম সুপরিচিত। হিন্দী, ইংরেজী, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় এবং গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এক সময়ে তাঁহার যশোগাথা লোকমুখে সর্বত্রই গীত হইত।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাও হইত না যদি না খেতড়ী-নরেশ অজিতসিংহজী বাহাদুরের সহিত আমার অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটিত। স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি রাজাজীর নিকট হইতে বহুতর সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য পুস্তকখানি হিন্দী ভাষায় এই আদর্শ নরপতির বহুচিত্র-সমন্বিত একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত। ইহাতে রাজাবাহাদুরের বাল্যজীবন ; শিক্ষালাভ ; প্রজাহিতকর কীর্তিকলাপ ; স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মিলন, ঘনিষ্ঠতা, তাঁহাকে আমেরিকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সর্বধর্মসম্মেলনে প্রেরণ, তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার ও সংলাপ ; রাজাজীর স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ এবং মহাপ্রয়াণ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত লেখক চমৎকার ভাষায় যেভাবে এই অমূল্য জীবন-কাহিনী লেখনীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য। পাঠকমাত্রই এই পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

खेतड़ी-नरेश और विवेकानन्द—পণ্ডিত ঝাবরমল্ল শর্মা-প্রণীত ; প্রকাশক—রাজস্থান এজেন্সী, ৮, রামকুমার রক্ষিত লেন (চীনাপট্টী) বড়বাজার, কলিকাতা ; পৃষ্ঠা—১০৮ + ১৪ ; মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি আদর্শ নরপতি অজিত সিংহ বাহাদুর ও স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মিলন ও উভয়ের সংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধজ্ঞাপক নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত। অধিকন্তু স্বামীজীর সম্পূর্ণ চিকাগো বক্তৃতা ও রাজাজীকে লিখিত পত্রাবলীর হিন্দী তর্জমা, Hold on yet a while, Brave Heart কবিতার হিন্দী পদ্যানুবাদ এবং স্বামীজীর গুরুভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে আছে। বইখানি

ক্ষুদ্র হইলেও হিন্দী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সংযোজনরূপে অভিনন্দনযোগ্য।

নিবেদিতা—মণি বাগচি প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২; পৃষ্ঠা— ৩২২+৬ (ডিমাই অক্টেভো); মূল্য—চার টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতার ভারত-প্রীতি এবং ভারতবর্ষের জন্য বিস্ময়কর আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত সেবা ভারতবাসীর প্রাণে চিরদিন প্রেরণা দিবে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, আদর্শ, অগ্রগতি এবং সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এই বিদেশিনী নারী নিজেকে কি পরিপূর্ণ ভাবে মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার অদ্ভুত ত্যাগ-ভাস্বর কর্মময় জীবনের একটি ধারাবাহিক তথ্যবহুল পরিচিতি উপস্থাপিত করিয়া শ্রীমণি বাগচি বাঙালী পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতে পৃথক করিয়া ভাবা যায় না সেইরূপ ভগিনী নিবেদিতার জীবনও স্বামীজীর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। লেখক নিবেদিতা-জীবনের মূল প্রেরণা ও পটভূমিকায় স্বামীজীর স্থান অতি চমৎকারভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য পুস্তকটি একদিকে যেমন ভগিনীর জীবন-সাধনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যান, অন্যদিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনে যুগাচার্য বিবেকানন্দের সুমহৎ অবদানের নির্ণায়ক। যে গভীর শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতা লইয়া শক্তিমান লেখক ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন তাহা পুস্তকের সতেজ সাবলীল ভাষার মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকার প্রাণে অনেকটা সংক্রামিত হইবে এবং ভারতীয় জাতির যে বৃহৎ ভবিষ্যতের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদের জীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন উহার রূপায়ণে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাকে সচেতন করিবে।

এই গ্রন্থ রচনায় লেখককে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানা প্রকাশন ব্যতীত আরও বহুতর পুরাতন পত্র-পত্রিকাদি ও পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে, বিশেষতঃ ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনাস্থলে। নানা সময়ে নানাজনের লিপিবদ্ধ ঘটনাকে একত্রে গাঁথিতে গেলে কিছু কিছু ভুল, অসঙ্গতি ও তথ্য-বিকৃতি ঢুকিয়া পড়া অস্বাভাবিক নয়; এই পুস্তকেও তাহা ঘটিয়াছে। কয়েকটি তারিখের ভুল, যথা—(১) নিবেদিতার সহিত স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ—২২শে অক্টোবর, ১৮৯৫ [পৃঃ ২]; ভগিনী নিবেদিতার The master as I saw him গ্রন্থে কিন্তু উহা ১৮৯৫এর নভেম্বর লিপিবদ্ধ আছে। (২) স্বামীজীর লণ্ডন ত্যাগের তারিখ ৮ই জুন, ১৮৯৬ [পৃঃ ২২]; উহা 'জুলাইয়ের শেষে' হইবে। (৩) স্বামীজীর লণ্ডনে প্রত্যাগমন—সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ [পৃঃ ২৬]; উহা অক্টোবর হইবে। (৪) "বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিলেন নিবেদিতা" [পৃঃ ৪৫]; স্বামীজী ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী কলম্বোতে পৌছান, নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসেন প্রায় এক বৎসর পরে। (৫) ভগিনী নিবেদিতা সহ স্বামীজীর কলিকাতা প্রিন্সেপ ঘাট হইতে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রার তারিখ, ৬ই জুন, ১৮৯৯ [পৃঃ ৯৬]; উহা ২০শে জুন হইবে। (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় লর্ড কার্জনের উক্তির নিবেদিতা কর্তৃক প্রতিবাদ যদি ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ সালে [পৃঃ ১৭০] হয়, তাহা হইলে "বিদায়ের কালে তিনি (বিবেকানন্দ) ইহাকেই (স্বয়ম্ভু-প্রজ্বলিত দীপ্তিময়ী শিখা) তাঁহার স্বজাতির হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন"—লেখকের এই উক্তির সামঞ্জস্য থাকে না, কেননা স্বামীজী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ৪ঠা জুলাই ১৯০২।

তথ্যবিকৃতির কয়েকটি উদাহরণ, যথা:—

[পৃঃ ৫৬, পৃঃ ১১৬, পৃঃ ১৫৬] নিবেদিতার

সন্ন্যাসিনী সাজা এবং গৈরিক বেশের উল্লেখ; ভগিনী নিবেদিতাকে যে স্বামীজী ব্রহ্মচারিণীর ব্রত দিয়াছিলেন ইহাই সুবিদিত। 'সন্ন্যাস' নয়, তিনি গৈরিকও পরিতেন না, কখনো কখনো এক টুকরা গেরুয়া কাপড় ধ্যানের সময় মাথায় veil এর ন্যায় জড়াইয়া রাখিতেন। [পৃঃ ৮৪] "বিবেকানন্দ নিজে বিদ্যালয়ের নামকরণ করিলেন—'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'।" না, বিবেকানন্দ এই নামকরণ করেন নাই। [পৃঃ ৮৭] "৮ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ি"; উহা ১৭নং হইবে।

[পৃঃ ৯৮, ৩০১] "তাঁহার (স্বামী বিবেকানন্দের) অসমাপ্ত কার্য শেষ করিবার জন্য পিছনে রাখিয়া গেলেন তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যার ফল নিবেদিতাকে। নিবেদিতার হাতেই তাঁহার সমস্ত ভাব, আদর্শ এবং চিন্তার সম্পদ তিনি (স্বামীজী) তুলিয়া দিয়া গেলেন।" "নিবেদিতা না থাকিলে বিবেকানন্দের বাণী জগতের সর্বত্র এমনভাবে প্রচারিত হইত কি না সন্দেহ।"

স্বামীজীর নিজের ভূরি ভূরি উক্তি, কর্মপন্থা, সংঘগঠন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার গুরুভ্রাতাদের জীবনধারা ও কর্মপ্রণালীর সহিত লেখকের উপরকার মন্তব্যের কোন সামঞ্জস্য নাই। গ্রন্থকার এখানে বাস্তব ঘটনাকে উপেক্ষা করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

[পৃঃ ৯৯] "বিদ্যালয়ের জন্য নূতন বাড়ি নির্মিত হইতেছে।" নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের বাড়ি স্বামীজীর দেহত্যাগের বহু বৎসর পরে নির্মিত হয়। [পৃঃ ১১৮] "সেই মহামারীর সময় কতদিন না নিবেদিতা তাঁহাকে (রবীন্দ্রনাথকে) লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়াছেন।" এই তথ্য ঠিক নয়।

[পৃঃ ১৪৩—১৪৫] "বিপ্লবী বিবেকানন্দ"; স্বামী বিবেকানন্দ বিপ্লবী ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু লেখক তাঁহার বিপ্লববাদের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা আমরা সর্বাংশে মানিয়া লইতে পারিলাম না। স্বামীজী সর্বাগ্রে দেশের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মধ্যে আনিতে চাহিয়াছিলেন শিক্ষার বিপ্লব, যথার্থ দেশাত্মবোধ। মানুষ তৈরি হইলে তবেই অন্য বিপ্লব সম্ভবপর হয় এবং স্বাধীনতার বনিয়াদ দৃঢ় থাকে। স্বামীজীর বিপ্লব ছিল ভারত-প্রাণকে জাগাইবার বিপ্লব। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার একটি দিক মাত্র। ভগিনী নিবেদিতার "The Master as I saw him" গ্রন্থেই ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

[পৃঃ ১৪৬] "শোকে মুহ্যমান 'মিশন' তো বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বদেশপ্রেমকে স্বীকারই করিল না।" 'মিশন'কে স্বামীজী কোন রাজনৈতিক কর্মপন্থা দেন নাই। দেশের গঠনমূলক যে কর্মপ্রণালী নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন 'মিশনে'র পক্ষে তাহারই অনুসরণ স্বাভাবিক ছিল। 'মিশন' স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমকে স্বীকার করিল না"—লেখকের এই উৎকট কাল্পনিক অভিযোগের আমরা কি উত্তর দিব বুঝিতেছি না।

[পৃঃ ১৫৯—১৬০] "স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার কথোপকথন"; লেখক এই কাল্পনিক কথোপকথনটি কোথা হইতে পাইলেন উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য ভগিনী নিবেদিতা মিশনের কর্মপরিধি হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন সত্য কথা, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে বেলুড় মঠের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিন্ন হইয়াছিল। শ্রীমতী লিজেল রেমঁ বরং তাঁহার নিবেদিতা-জীবনীতে এই ঘটনার সুষ্ঠুতর বিবৃতি দিয়াছেন -

"এর পর নিবেদিতার সম্পর্কে সংঘের কোনও দায়িত্ব থাকল না, অথচ গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ অটুট রইল।" ('নিবেদিতা'—শ্রীমতী লিজেল রেমঁ; অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী; উমাচল প্রকাশনী, ৫৮।১।৭-বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬; পৃষ্ঠা ৪০৪)

বস্তুতঃ স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিজের মৃত্যু

পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা মিশনের শিক্ষা এবং প্রচার-মূলক কাজে সাধ্যানুযায়ী বরাবর অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিতেন এবং মঠের সন্ন্যাসিগণও তাঁহাকে কখনও নিজদের গোষ্ঠীর বহির্ভূত মনে করেন নাই। লেখক নিজেই গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় আর্যসমাজী সাধু সুন্দরানন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে কথোপকথন এবং ২৮১ পৃষ্ঠায় ভগিনীর উইলের যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে মিশনের সহিত ভগিনী নিবেদিতার আত্মিক যোগ সুস্পষ্ট। (১৫৯-৬০ পৃষ্ঠার মন্তব্যের সহিত ইহার বিরোধ ঘটে নাই কি ?

[পৃঃ ১৬২, ১৬৩] "স্কুল-গৃহের প্রবেশ পথে বাহিরের দেওয়ালে আঁটা কাঠের একটি বোর্ড যখনই কোন পথচারীর দৃষ্টিতে পড়িত, সে দেখিতে পাইত উহাতে লেখা : 'ভগিনী নিবাস। নারী-সমিতি-পাঠশালা গ্রন্থাগার।" এই তথ্য ঠিক নহে।

[পৃঃ ১৯৯] "শ্রীমা সারদাদেবীর ভগিনী নিবেদিতাকে দীক্ষাদানের প্রস্তাব"; এই কথোপকথনটিরও সূত্র উল্লিখিত থাকিলে ভাল হইত। সারদাদেবীর পক্ষে এইরূপ প্রস্তাব খুবই অস্বাভাবিক।

মণি বাবুর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলা উচিত যাহা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার 'নিবেদিতাপ্রসঙ্গে' (দেশ, ২১শে মাঘ, ১৩৬২) নামক প্রবন্ধে এবং আনন্দবাজার পত্রিকা আলোচ্য পুস্তকের সমালোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের বহু স্থানে অপরের রচনা (পুস্তক বা প্রবন্ধ) হইতে উদ্ধৃতি চিহ্ন বিনা হুবহু ছোট বড় অনেক অংশ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা যশস্বী লেখকের পক্ষে গৌরবজনক নয়।

যাহা হউক এ সকল ত্রুটি গ্রন্থের সামগ্রিক সার্থকতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ভূমিকায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন—"এই বই বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান লাভ করুক। এই মহীয়সী নারীর জীবনী আমাদের নিশ্চয়ই সহায়তা করবে মানব-প্রেমের ও নিষ্কাম কর্মের অপরাজেয় শক্তি উপলব্ধি করতে"—আমরাও ঐ উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। শ্রদ্ধেয় লেখক পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে তথ্যের বিকৃতিগুলি সংশোধন করিয়া লইলে গ্রন্থটি ভগিনী নিবেদিতার একটি আদর্শ জীবনী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৫ সালের ৩৫তম বর্ষের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

আশ্রমস্থ 'ভুবনেশ্বর হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে' ১,৩২৮ (নূতন ৭৪৮২) জন এবং এ্যালোপ্যাথিক বিভাগে ২২,৩০১ (নূতন ৪১৪৬) জন রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। 'অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' ছাত্র ছিল ১৩০টি, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের। 'তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের' পুস্তকসংখ্যা ছিল ২১৫৮ (গত বর্ষের সংখ্যা ১৮১৮) এবং ৩৩৯৯ খানি বই পঠনার্থে দেওয়া হইয়াছিল। পাঠাগারে ছয়টি দৈনিকপত্র ও ২০টি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। হিন্দী ও বাংলায় ৪৫৪টি ধর্মবিষয়ক ক্লাস ও আলোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। দ্বারভাঙ্গা জেলায় বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কেন্দ্রস্থাপন করিয়া ১৭৮৭ পরিবারের ৪৭১৪ জনকে ১২৫০ মন গম চাউল ইত্যাদি, ৪৩২০টি (২৪৯৬টি নূতন) কাপড়, ১৮৬০ গজ জামার ছিট দেওয়া হইয়াছিল। বিতরিত গুঁড়া দুধ ও আমেরিকান ঘৃতের পরিমাণ যথাক্রমে ৮১৪ ও ৪০৭ পাউণ্ড।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী— মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিগত ৩০শে ফাল্গুন, '৬২ (১৪।৩।৫৬) শ্রীরামকৃষ্ণতিথি-পূজার দিন ভোর ৫টায় মঙ্গলারতি ও সুমধুর ভজনগান দিয়া শুভারম্ভ করিয়া উপনিষদ্ ও গীতা

হইতে আরতি, দেবী-মাহাত্ম্য পারায়ণ, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি পরপর অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। হোমাবসানে ৮০০ ভক্ত ও ১১০০ দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যজীবনী আলোচিত হয়। সাধারণ উৎসবের দিন ছিল ১৮ই মার্চ রবিবার। এই দিন বেলা ৮টা হইতে ১০৷৩০মিঃ পর্যন্ত ৬০ জনেরও অধিক ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ২ ঘণ্টা ধরিয়া তিরুপ্পগলমণি টি এম্ কৃষ্ণস্বামী 'হরিকথা' করিয়া সমবেত নরনারীগণকে আনন্দ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে সকালে ইংরেজীতে আলোচনা করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ ও স্বামী কৈলাসানন্দ এবং তামিলে বিবেকানন্দ কলেজের সহাধ্যক্ষ অধ্যাপক কে সুব্রহ্মণ্যম্। বৈকালের সভায় সভাপতি হন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র মহাশয়। বক্তা ছিলেন শ্রীঅমৃতানন্দ যোগী (তামিলে) এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ শর্মা (তেলেগুতে)। শ্রীশর্মাজী বলেন জগতের বিভিন্ন ধর্মকে নব চেতনায় সঞ্জীবিত করিতে অবতাররূপে বর্তমানযুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বামী বিমলানন্দ (ইংরেজী বক্তা) শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোকে আমাদের চলার পথ নির্দেশ করেন। সভামণ্ডপে কৃত্রিম পঞ্চবটী মধ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অতি মনোরমভাবে সাজানো হইয়াছিল।

বোম্বাই আশ্রমের উৎসবসূচী ১৭ই এবং ১৮ই মার্চ দুইদিন ধরিয়া অনুসৃত হয়। প্রথম দিন শহরের কয়াজী জাহাঙ্গীর হলে ব্যবস্থাপিত একটি জনসভার পরিচালনা করেন ডক্টর জন মাথাই। বক্তা ছিলেন বিচারপতি শ্রী ডি ভি ব্যাস, অধ্যাপক ডক্টর পি এন্ রাউ এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। দ্বিতীয় দিনের জনসভা আশ্রমেই আহূত হয়। সভাপতি ছিলেন বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাব। বক্তা ছিলেন বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্র গড়কার ও অধ্যাপক ডক্টর পি এন্ রাউ। দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং বোম্বাইএর বিখ্যাত সুরশিল্পীদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ছিল উৎসব-সূচীর অন্যতম অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছাত্রাবাসের সম্প্রসারিত নবনির্মিত সুবৃহৎ ত্রিতলাংশের শুভ উদ্বোধনও সম্পন্ন করেন।

উটাকামণ্ড (নীলগিরি) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম উৎসবের আয়োজন করেন ৪ঠা মার্চ। শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ হইতে ১৮টি ভজনদল আশ্রমে সমবেত হয়। প্রায় ৫½ হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে সাধু মুকুন্দদাসের সুমধুর ভজন তিন সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তামিল মাসিক পত্র 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্'-এর সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দের নেতৃত্বে একটি জনসভা এবং তিরুপারয়থুরাই (তিরুচি) শ্রীবিবেকানন্দ বিদ্যাবনম্ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'পাদুকা পট্টাভিষেকম্' নামক নাটকাভিনয় ছিল বৈকালীন কর্মসূচী।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী কার্যসূচী অনুসরণে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২৪শে মার্চ অপরাহ্ণে কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনার শ্রীরাণা কে, ডি, এন, সিংহ আই-এ-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় শ্রীযুক্তা মায়া গুপ্ত ও শ্রীক্ষীরোদ ব্রহ্মচারী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম, শ্রীসুধীর কুমার ভট্টাচার্য ই, এ, সি, অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা স্মৃতিকণা গুহ এবং করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় রাষ্ট্র ভাষায় তাঁহার ভাষণ প্রদান করেন। ২৫শে মার্চ রবিবার সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। ভোর ৫টা হইতে মঙ্গলারতি, ভজন তৎপর পূজা ও

ভোগরাগাদি হয়। স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্রীগৌরীসদয় দাস কর্তৃক কালীকীর্তন, সেবাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক রামনাম সংকীর্তন, শ্রীরাধারমণ দাস বৈষ্ণব কর্তৃক পদাবলী কীর্তন এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ধর কর্তৃক বাউল সংগীত জনগণকে আনন্দ দান করে। প্রায় ১০ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় উক্ত বৈষ্ণব পুনঃ পদাবলী কীর্তন করেন এবং ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী আলোচিত হয়।

মনসাদ্বীপ (সাগরদ্বীপ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিগত ২০শে চৈত্র, ১৩৬২ শ্রীরামকৃষ্ণের ১২১তম জন্মোৎসব অহোরাত্রব্যাপী কর্মসূচী লইয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে পূজা হোম ও চণ্ডীপাঠ এবং অপরাহ্ণে ভজনাদি হয়। বৈকালে শোভাযাত্রার পর স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের পরিচালনায় একটি সভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ এবং ব্রহ্মচারী চিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বুঝাইয়া বলেন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতাই মানুষের জীবনের ও ধর্মের ভিত্তি। সভার পর পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। অতঃপর প্রায় ২৫০০ (আড়াই হাজার) ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পায়। সবশেষে প্রাক্তন ছাত্রগণ কর্তৃক "রাঙারাখী" যাত্রা অভিনীত হয়।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সংলগ্ন উদ্যানে বহরমপুরবাসী জনসাধারণের উদ্যোগে ২৮শে মার্চ হইতে পাঁচদিবসব্যাপী এক মনোজ্ঞ কার্যসূচীর মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ও ২৯শে মার্চ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। ৩০শে মার্চ বেলুড় মঠের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং সুসাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় ভাবমধুর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। প্রায় তিন সহস্র নরনারী তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হন। জেলাশাসক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৩১শে মার্চ শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বৃহৎ জনসমাবেশে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও শিক্ষা বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। গোরাবাজার-নিবাসী শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী এবং শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় ২ দিন কীর্তন গান করেন। কলিকাতার গীতরত্ন শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় দুইটি পালা কীর্তন গান করিয়া সকলকে বিপুল আনন্দ দান করেন। ১লা এপ্রিল পূজা পাঠ ভজনাদির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অন্যূন ৮০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—এর শাখা-কেন্দ্রের ত্রৈবার্ষিক (১৯৫২-৫৪) মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আশ্রমের বিদ্যার্থি-নিবাসে গড়ে ১১ জন ছাত্র ছিল। তরুণদের চরিত্রে স্বাবলম্বন, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, কর্মপটুতা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং ধর্মভাবের উন্মেষের জন্য বিশেষ নজর রাখা হয়। বিবেকানন্দ নৈশ বিদ্যালয়টি সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। আসাম সরকার এই অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত করিবার পর এই বিদ্যালয়টি এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে এখন একটি কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আলোচ্য সময়ে আশ্রমের ১৫৪টি ধর্মালোচনা-সভা পরিচালিত হইয়াছিল। কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে ৪৭টি ছায়াচিত্রবক্তৃতা দেওয়া হয়। উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণও এই

সকল বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত উৎসাহ ও উপকার লাভ করে। পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুগণকে পুনর্বাসন, হস্তশিল্পশিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করা এই কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কাজ। আশ্রম কর্তৃক মহাপুরুষদের জন্মোৎসব পালন প্রতিবৎসর শহরে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ৪ দিন ধরিয়া নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে এই আশ্রম পরিদর্শনান্তে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন,—"শিলচরে একদিনের জন্য আসিয়া এই আশ্রম দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। * * * ভারতের সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমগুলি চতুষ্পার্শ্বে আলোকবিকীরণের কেন্দ্ররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এখানে কর্মক্ষেত্র আরও বিপুল, কেননা পার্বত্য-অঞ্চলগুলি এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। * * *"

উত্তর ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্তসমিতি—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে অবস্থিত এই বেদান্তকেন্দ্রে গত জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজীর রবি ও বুধবাসরীয় বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু ছিল—(১) প্রথম জিনিস প্রথমে (২) ভগবদ্গীতার চিন্তাধারা (দ্বিতীয় পর্যায়) (৩) মানুষ যেখানে ভগবানকে সাক্ষাৎ করে (৪) মন্দরূপী ভাল (৫) চিরন্তন জীবন কি? (৬) কর্ম এবং পুনর্জন্ম।

কেন্দ্র-সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজীর এক বুধবাসরীয় ভাষণের বিষয় ছিল—"মরমী অনুভূতির স্বরূপ।" প্রতি শুক্রবার সকালে আচার্য শঙ্করের 'আত্মবোধ' গ্রন্থ অবলম্বনে স্বামী অশোকানন্দজী বেদান্তদর্শনের ক্লাস লইয়া থাকেন। এই ক্লাস-গুলিতে ধ্যানাভ্যাসও শিক্ষা দেওয়া হয়। বেদান্ত সম্বন্ধে যাঁহারা গভীরতর ভাবে জানিতে ইচ্ছুক বা আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহশীল, কেন্দ্রাধ্যক্ষের সহিত পৃথকভাবে সাক্ষাৎ ও আলোচনাদির সুযোগ তাঁহারা পাইয়া থাকেন। বালক-বালিকাদিগের জন্য একটি রবিবাসরীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বেদান্তের সর্বজনীন নীতি, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জগতের ধর্মাচার্যগণের জীবন-কথা কিশোরদের উপযোগী করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। কেন্দ্রের লাইব্রেরীতে সকলেই বসিয়া পুস্তক পড়িতে পারেন; গৃহে লইয়া যাইবার অধিকার কেবল সভ্যদেরই।

বিবিধ সংবাদ

রাজারহাট বিষ্ণুপুরে উৎসব—বিগত ১৮ই চৈত্র, '৬২ (১লা এপ্রিল, '৫৬) রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর পুণ্য জন্মস্থান রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে (২৪ পরগণা) শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২১তম শুভজন্মজয়ন্তী মনোরম পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন, ভজন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী প্রমুখ বেলুড় মঠের নয়জন সন্ন্যাসী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজা-হোমাদি সম্পন্ন করেন স্বামী প্রেমারূপানন্দ। পূজান্তে প্রায় এক সহস্র ভক্ত নরনারী পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে একটি সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও নিরঞ্জন মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এবং স্বামী জীবানন্দ। বেলুড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়।

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি
আচার্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি ॥

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্যঃ স্বর্ আভরৎ ॥

— অথর্ববেদসংহিতা, ১১।৭।১৭-১৯

ব্রহ্মচর্যরূপ তপস্যা দ্বারা রাজা রাষ্ট্রকে বিশেষরূপে রক্ষা করেন, অর্থাৎ যে নৃপতির রাজ্যে বেদবিদ্যানুশীলনের জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক ব্রতিগণ তপস্যার (উপবাসাদি ব্রত নিয়ম) অনুষ্ঠান করেন সেই রাজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা আচার্য শিষ্যকে অভিলাষ করেন অর্থাৎ যে আচার্য সম্যক ব্রহ্মচর্য-নিষ্ঠ তাঁহারই নিকট বেদবিদ্যালাভের জন্য নানাস্থান হইতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শিষ্যেরা উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মচর্য দ্বারা কন্যা গুণবান উৎকৃষ্ট যুবাপতি লাভ করে। পশুজগতেও ব্রহ্মচর্যের সুফল সুস্পষ্ট লক্ষিত। ব্রহ্মচর্যশালী বৃষ আপন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া প্রচুর যত্ন ও সমাদর পায়, ব্রহ্মচর্যপরিপুষ্ট অশ্ব উত্তমরূপে তৃণাদি ভক্ষণ করিতে পারে।

দেবগণ যে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন তাহা ব্রহ্মচর্যের শক্তিতেই। আবার, দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র যে দেবতাবৃন্দের জন্য স্বর্গলোক আহরণ করিয়াছেন তাহাও ব্রহ্মচর্যরূপ সাধন-বলেই।

[ব্রহ্মচর্য হইতে মানুষ তাহার চরিত্রের মাধুর্য, সংহতি ও শক্তিলাভ করে; ব্রহ্মচর্য মানুষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিদান। তাহার সমাজগত ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণও ব্রহ্মচর্যাদর্শের দৃঢ়তার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বৈদিক-সংস্কৃতিতে ব্রহ্মচর্যকে এইরূপ উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছিল।]

কথাপ্রসঙ্গে

দেহ ও বিদেহ

এই পৃথিবীতে বাঁচিতে গেলে দেহকে তুচ্ছ করা চলে না, কিন্তু বাঁচিবার অর্থ যদি আমরা বুঝি দেহকেই বাঁচাইয়া রাখা, তাহা হইলে আমরা মনুষ্যত্বের প্রচণ্ড অপমান করিয়া বসি। মানুষ দেহ-ধারী সত্য তবে দেহের জন্যই সে মহিমান্বিত নয়। দেহকে যতটুকু মান দিবার অবশ্যই দিতে হইবে কিন্তু আমাদিগকে যেন দৈহিকতার দাসত্ব করিতে না হয়। মানুষের চিন্তা, ভাব, কল্পনা, হৃদয়াবেগ—এইগুলিই তো প্রমাণ করে যে তাহার শক্তি ও সার্থকতা শুধু রক্তমাংসস্নায়ুঅস্থির মধ্যে নিহিত নয়। দেহকে বাদ দিয়া মন ও হৃদয় ক্রিয়া করে না সত্যকথা, কিন্তু মন ও হৃদয়ের ক্ষমতা এবং বিস্তৃতি দেহের তুলনায় অতি বিপুল। মানুষের মানসিক এবং ভাব জীবনের সমৃদ্ধির কথা ভাবিলে তাহার দৈহিক সৌন্দর্য, ক্ষমতা ও কীর্তি কত ক্ষুদ্র মনে হয়!

একথা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠের সব কিছুকে অনবরত পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান দিতেছে তেমনি মানুষের জৈবিক দেহও তাহার জীবনের সব কিছুকে ক্রমাগত নিজের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। দেহের প্রভাব এক এক সময়ে এত অনতিক্রম্য হইয়া উঠে যে, মানুষ ভাবিতে বাধ্য হয় সে দেহ ছাড়া আর কিছু নয়। দৈহিকতার ঊর্ধ্বে জীবনের কেন্দ্র স্থাপন করা বাস্তবিকই কঠিন কথা।

কিন্তু তথাপি মানুষ কখনও প্রাণে প্রাণে অনুভব করে যে দেহের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের তাহার একটা জন্মগত অধিকার আছে। অনেক সময়ে সে এই মুক্তি খোঁজে তাহার মনোরাজ্যে, তাহার সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প-দর্শনে। মুক্তি অনেক সময় পায়ও। মানসলোকের ঐশ্বর্য দেখিয়া দেহের কথা সে ভুলিতে পারে বই কি। কিন্তু অনেক সময়েই তাহার ভুল ভাঙিয়া যায়। দেহের বুভুক্ষা, জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার বুদ্ধিবিবেককে গুলাইয়া দেয়, নিমেষে তাহার হৃদয়ের গভীর প্রেরণা ও ভাবরাশি ধরণীর ধূলায় চুরমার হইয়া লুটায়। গভীর বেদনায় মানুষ তখন অনুভব করে সে একান্তই রক্তমাংসের ক্রীতদাস, দেহের কামনাই তাহার শাশ্বত কামনা!

কাহারও কাহারও ভুল ভাঙে—দেহের আনুগত্য চিরকালের জন্য স্বীকার করিয়া নয়, মন এবং হৃদয়ের এলাকারও ঊর্ধ্বে অন্য কোন স্থানে আশ্রয় খুঁজিয়া। সেই আশ্রয়ের সন্ধান উপনিষদের ঋষি দিয়াছেন—

মঘবন্মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যা-মৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্ (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮।১২।১)।

[প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিতেছেন] "শুন মঘবন, এই শরীর মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত কিন্তু এই মরণশীল রক্তমাংসের পিণ্ডের মধ্যে বাস করিতেছেন অশরীরী অমর আত্মা। দেহ হইল সেই বিদেহেরই অধিষ্ঠান।"

দৈহিকতা হইতে বুদ্ধির ও হৃদয়ের ঐশ্বর্য বড়, কিন্তু এত বড় নয় যে, দৈহিকতার আক্রমণ ও বিপর্যয় হইতে মানুষকে তাহারা রক্ষা করিবে। মানুষের সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয় মন ও হৃদয় নয়, আত্মা—দেহ-প্রাণ-অন্তঃকরণ-ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র চৈতন্যসত্তা। মানুষ যখন আত্মার সন্ধান পায় তখনই সে বি-দেহের শক্তি অনুভব করে। দেহের সঙ্কীর্ণতা, মর্ত্যতা, মলিনতা আত্মাতে নাই; দেহের বহুশাখান্বিত কামনা আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। দেহ-মাধ্যাকর্ষণের পরিধির বাহিরে আত্মার অবস্থান।

আত্মার সন্ধান পাই কি করিয়া? দেহকেই তো দেখি, দেহের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া অনুভব করি, মনকেও জানি, হৃদয়ের অস্তিত্বও বুঝিতে পারি কিন্তু ইহাদের ব্যতিরিক্ত চৈতন্যসত্তা আত্মার তো সন্ধান পাই না। শুধু মানিয়া লইতে হইবে, শুধু বিশ্বাস? না। উপনিষদ বলেন, আমরা অনবরত বাহিরের দিকে চাহিয়া আছি বলিয়া আত্মা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যান। মানুষের জীবনের মহত্তম ঐশ্বর্য মানুষেরই মূঢ়তার জন্য তাহার নজরে পড়ে না। মানুষের জীবনের ইহা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কিন্তু যে সৌভাগ্যবান বাহির হইতে ভিতরে দৃষ্টি ঘুরাইয়া আনিতে পারেন তিনি আত্মার সাক্ষাৎকার পান, দেখেন—আত্মা দেহের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে, মন-বুদ্ধির মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। আত্মার আলোতেই জীবনের সকল আলো। আত্মারই অস্তিত্বে দেহ মন-প্রাণাদির অস্তিত্ব, আত্মারই জ্ঞানে আমাদের সকল জ্ঞান, আত্মারই আনন্দে আমাদের সকল আনন্দ।*

বেদান্তের একটি গ্রন্থ (পঞ্চদশী), আত্মা আছেন অথচ তাঁহাকে আমরা ধরিতে পারি না কেন ইহা সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। পাঠশালায় অনেকগুলি ছেলে একসঙ্গে বসিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছে। কেহ পড়িতেছে ভূগোল, কেহ কবিতা, কেহ নামতা, কেহ ইতিহাস বা অন্য কোন বই। নানা বালকের নানা স্বর। সকল বালকের বহু প্রকারের কণ্ঠধ্বনি ও পাঠ মিশিয়া একটা সমবেত কোলাহলের সৃষ্টি হইতেছে। কোন অভিভাবক সেখানে আসিয়া যদি তাঁর নিজের ছেলেটির গলার স্বর ধরিতে চান তো ঐ সমুচ্চারিত ধ্বনির ভিতরে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অপর বালকদিগকে বলিতে হইবে, তোমরা থামো। তখন পিতা স্বীয়পুত্রের কণ্ঠস্বর ধরিতে পারিবেন। ঠিক এমনিই ভাবে আত্মার সুর অনবরত অপর সহস্র অনাত্মবস্তুর ধ্বনির সহিত মিশিয়া চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অজস্র বিষয়বাসনার কোলাহলকে যদি থামাইতে পারা যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত সুরলহরী আমাদের কানে ধ্বনিত হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আত্মাকে আবিষ্কারের কয়েকটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

(১৩শ অধ্যায়, ২৪, ২৫)

"কেহ কেহ ধ্যানাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিতে নিজকে প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে দর্শন করেন। কাহারাও বা আত্মা-অনাত্মার বিচার দ্বারা, আবার অপরে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুশীলন দ্বারাও আত্মার সাক্ষাৎ পান। এই সকল উপায় যাঁহারা অবলম্বন করিতে পারেন না তাঁহারা গুরুর নিকট শুনিয়া শ্রদ্ধালু চিত্তে আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইঁহারাও একদিন আত্মার অনুভব দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।"

(১) পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠ উঃ, ২।১।১

(২) প্রতিবোধবিদিতম্ —কেন উঃ, ২।৪

(৩) এষ হ্যেবানন্দয়াতি —তৈত্তিরীয় উঃ, ২।৭

(৪) মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥
—মুণ্ডক উঃ, ২।২।৫

(৫) সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ—ছান্দোগ্য উঃ, ৬।৮।৪

(৬) তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি
—কঠ উঃ, ২।২।১৫

মানুষ যখন আত্মাকে আবিষ্কার করে তখন সে দেহে থাকিয়াও বি-দেহ। বি-দেহের শক্তি, সৌন্দর্য ও আনন্দে তাহার জীবনে আসে অদ্ভুত রূপান্তর। তখন দেহের সসীমতা বাধা-ভ্রান্তি, মনের মলিনতা, হৃদয়ের অবসন্নতা তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। "সকৃদ্বিভাতম্"—চিরদিনের মত তাহার জীবন যে দীপান্বিত হইয়া গিয়াছে। বি-দেহকে সে শুধু দেহমনঃপ্রাণের মধ্যেই অনুভব করে না—উহার বাহিরেও সারা জগৎ-প্রকৃতিতে উহার প্রকাশ দেখিতে পায়। সে বুঝিতে পারে "যাহা ভাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে"—দেহাভ্যন্তরে যিনি দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধির ধারক জীবাত্মা, তিনিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বিশ্বাত্মা। একই আকাশ ঘটের মধ্যে আটক পড়িলে আমরা বলি ঘটাকাশ, আর ঘটের বাহিরে উহাকে বলি মহাকাশ। পার্থক্য শুধু কথায়। আকাশকে কি কেহ ভাগ করিতে পারে? তেমনি আত্মা কখনও খণ্ডিত হন না, বহু হন না।

বি-দেহের জ্ঞানলাভ করাই বাঁচিয়া থাকার চরম সার্থকতা, বি দেহকে আবিষ্কার করিয়া বাচাই প্রকৃত বাঁচা, বি-দেহ-কেন্দ্রিক জীবনই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শক্তি। দেহ-কেন্দ্রিক সভ্যতার পদে পদে কাম, লোভ, দম্ভ, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ দ্বারা দূষিত এবং বিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা। জীবন ও জগতের পরম সাম্য ভূমা আত্মার জ্ঞান যে সভ্যতার বনিয়াদ সেই সভ্যতার চিরন্তন লক্ষ্য থাকে বিশ্বের সকলের হিত। সেই সভ্যতার সাধনা—শান্তি ও সামঞ্জস্য, সংঘর্ষ নয়।

মানুষের আত্মিক সত্য তাহার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিকে এবং তাহার হৃদয়াবেগসমূহকে সবল, সুন্দর, স্বচ্ছ করে। আত্মজ্ঞানপ্রবুদ্ধ মানুষ সমাজে লইয়া আসেন এক তন শক্তি ও সংহতি। অতএব আধ্যাত্মিকতা ব্যষ্টি ও সমষ্টির অশেষ কল্যাণের নিদান। "অলস ও নিষ্ফল আধ্যাত্মিকতা" বলিয়া কোন বস্তু নাই, উহা পরনিন্দাপ্রবণ সমালোচকের স্বকপোলকল্পিত অর্থহীন শব্দাড়ম্বর মাত্র।

বি-দেহের সন্ধান, আবিষ্কার ও উপলব্ধিকে কোন একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের কৃত্য বলিয়া মনে করা উচিত নয়। যে কোন মানুষের যেমন দেহ থাকে, মন থাকে, হৃদয় থাকে—তেমনি আত্মাও রহিয়াছে। যে কোন মানুষের যেমন অনন্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইবার অধিকার আছে, দাঁড়াইয়া সে মুগ্ধ হয়, আনন্দিত হয়—তেমনি ভূমা আত্মসত্য সকল মানুষেরই সত্য। উহার উপলব্ধি সকল মানুষকেই সমৃদ্ধ করে, শক্তিমান করে।

সন্ন্যাসী ও সমাজ

সন্ন্যাসী পরিবার ও সমাজ ত্যাগ করিয়া যান কিন্তু সমাজের সেবা ত্যাগ করেন না। একটি ক্ষুদ্র গৃহকে ছাড়িয়া অখিল বিশ্বকে তিনি গৃহরূপে লাভ করেন, অসংখ্য মানুষকে স্বজনরূপে দেখিতে পান। মানুষের সেবা তাঁহার সাধনারই অঙ্গ। সেবা নানা প্রকারের—দেহের সেবা, মনের সেবা, আত্মার সেবা। অন্নবস্ত্র ও ঔষধাদি দিয়া আর্ত ও পীড়িতের যেমন সেবা করা যায়, সেইরূপ বিদ্যাদান করিয়া, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করিয়াও মানুষের মনের ও আত্মার যে উপকার সাধন উহাও মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠসেবা। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে সন্ন্যাসীরা বরাবর আত্মমুক্তির জন্য চেষ্টার সহিত জনগণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক সেবাও করিয়া আসিতেছেন। ইহা দ্বারা ভারতীয় সমাজ যে প্রভূত উপকৃত হইয়া থাকে আমাদের তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, যীশুখ্রীষ্টকে পৃথিবী আর কয় টুকরা রুটি খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী সারাজগতে ধর্মভাব বিকীরণ করিয়া মানুষের যে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহার কি পরিমাপ আছে? সমাজ সমাজত্যাগী

সন্ন্যাসীদের দেহযাত্রার উপকরণ যোগায় বটে কিন্তু সন্ন্যাসীর নিকট সমাজ যাহা পায় তাহা তো কম নয়। সন্ন্যাসী ও সমাজের মধ্যে আদানপ্রদান-সম্বন্ধটি গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেবতা ও যাজ্ঞিক মানুষের সম্পর্কে উক্ত "ভাবয়ন্তঃ পরস্পরম্" বাক্যের আলোকে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

সন্ন্যাসীরা ভারতবর্ষে শুধু যে সমাজের আধ্যাত্মিক সেবাই করিয়া আসিয়াছেন তাহা নয়, প্রয়োজন মত নিঃস্বার্থ লৌকিক সেবাও তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে করিতে হইয়াছে। বিদ্যার প্রসারে এবং শিল্প ও ভাস্কর্যের উন্নতিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অবদান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীজওহর লাল নেহরু তাঁহার 'ভারত আবিষ্কার' (Discovery of India) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অজন্তা আমাদিগকে একটি বহুদূরের জগতে লইয়া যায় যাহা স্বপ্নলোকের মতো অথচ অত্যন্ত বাস্তব। এখানকার গুহাচিত্রগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের আঁকা। তাঁহাদের আচার্য বুদ্ধ বহুপূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, 'স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকিবে, এমন কি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না কেননা স্ত্রীলোক সঙ্কট-নায়িকা।' কিন্তু তথাপি এই গুহাচিত্রগুলিতে আমরা কত স্ত্রীমূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই—সুন্দরীগণ, রাজকন্যারা, গায়িকা-বাদিকাদল, কাহারাও উপবিষ্টা বা দণ্ডায়মানা, কাহারাও বা অলঙ্করণ-নিরতা কিংবা শোভাযাত্রায় গমনশীলা। অজন্তা-গুহার এই নারী-আকৃতিগুলি বহুতর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। জগত এবং জীবনের চলমান নাট্যের সহিত ঐ শিল্পী-সন্ন্যাসি-গণের কত গভীর পরিচয় ছিল! অপার্থিব মহিমায় অবস্থিত প্রশান্ত বোধিসত্ত্ব মূর্তিটি তাঁহারা যে মনোযোগ ও দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন সেই প্রীতি ও ধ্যান দিয়াই তাঁহারা ঐ সব লৌকিক দৃশ্যাবলীও তুলিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।" (The Discovery of India, Chap. V—18)

সমাজের লৌকিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নিঃস্বার্থ কর্মে আত্মনিয়োগ বৌদ্ধযুগের পর যে সন্ন্যাসীরা আর করেন নাই তাহা বলে চলে না। তবে রাজশক্তি যখন প্রজার লৌকিক কল্যাণের ভার লয় তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ঐ দিকে কাজ করিবার প্রয়োজনও থাকে না। তাঁহারা নিজদের ভজন-সাধন এবং জিজ্ঞাসুকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান লইয়া দিনাতিপাত করেন। ভারতবর্ষে চিরদিন তাঁহাদিগের এইরূপ জীবনধারা শাস্ত্রের ও জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছে, কেননা আধ্যাত্মিকতা ভারতমানসের একটি অলস বিলাস নয়, জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন করিয়া সন্ন্যাসি-সমাজকে দেশের লৌকিক সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিবার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া শিক্ষা প্রচারের কাজে। রাজশক্তি তখন বিদেশীর হাতে। বৈদেশিক সরকারের নিকট ভারতের জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা প্রত্যাশা করা বৃথা, তাই স্বামীজী দেশবাসীকেই ডাকিয়াছিলেন দেশের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা এই বিষয়ে পথ দেখাইবেন ইহাই ছিল তাঁহার আশা। তিনি নিজে যে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার আদর্শ তিনি ধরিয়াছিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নিজের মুক্তি এবং জগতের হিতসাধন। এই আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া স্বামীজীর অনুগামিগণ ভারতের নানাস্থানে লোক-সেবামূলক নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। গোঁড়া সাধুসমাজের অনেকে সন্ন্যাসীদের এইরূপ রোগীসেবা, বিদ্যালয়-পরিচালন প্রভৃতি কাজ যে বিরূপ সমালোচনার চোখে দেখেন নাই (বা এখনও দেখেন না) তাহাও নয়, তবে ধীরে ধীরে স্বামীজীর আদর্শের প্রতি সাধু-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের বাহিরেও কিছু সন্ন্যাসী একক বা সমবেতভাবে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। ইহা বাঞ্ছনীয়ই।

সম্প্রতি ভারত-সরকারের দ্বারা প্রণোদিত বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠান 'ভারতসেবক-সমাজ' দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাজসেবামূলক

কাজে সন্ন্যাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয়ে পর পর যে বিবৃতি বাহির হইতেছে আমরা সাগ্রহে সেগুলি লক্ষ্য করিতেছি। পাটনায় ১২ই জানুয়ারীর 'ইউ পি'র সংবাদ :—

"দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের কাজে লাগাইবার উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শ্রীনন্দ নয়া দিল্লীতে সকল রাজ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় সাধুদের এক সম্মেলন আহ্বান করিবেন। * * * হিসাব করা হইয়াছে যে ভারতে মোট সাধুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ। বিহারে ৫০ হাজার সাধু আছেন।"

বোম্বাইএর ২রা ফেব্রুআরির 'পি টি আই' সংবাদ :—

"জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিকাশের জন্য শ্রীনন্দ সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়োগ করিবেন বলিয়া একটি পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতেছেন। তিনি বলেন, ভারতের সাধুসন্ন্যাসীর সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। তাঁহারা এই কাজে সাফল্যলাভ করিবেন বলিয়াই তাঁহার ধারণা। সাধুরা সমাজের কোন কাজে লাগেন না একথা তিনি স্বীকার করেন না। ছাপার অক্ষরে লক্ষ লক্ষ শব্দ যাহা আমাদের শিক্ষা দিতে পারে না, সাধুসন্ন্যাসীরা তাহা পারেন। এই সমস্ত স্বার্থবুদ্ধিহীন জ্ঞানের পূজারীগণ মনের দিক হইতে আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত।"

ভারতে মোট সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা কত তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু একবার বলিয়াছিলেন ৮০ লক্ষ, পরে আর একটি সভায় যখন বলেন ৫০ লক্ষ তখন উহার প্রতিবাদ হইয়াছিল। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ সংখ্যা কমাইয়া আনিয়াছেন দেখিতেছি!

নয়া দিল্লীর ১৮ই ফেব্রুআরির সংবাদ—'ভারত-সেবক-সমাজের' অনুরূপ 'ভারত সাধু সমাজ' নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। জনসেবায় আত্মনিয়োগকামী সাধুসন্ন্যাসীরা ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। হরিদ্বারের একটি পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ সেখানে সাধুসন্ন্যাসীদের লইয়া এই বিষয়ে একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কোন কোন মণ্ডলী প্রস্তাবটিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আবার কোন কোন স্থল হইতে বিরোধিতাও আসিয়াছে। এইরূপ আলাপ আলোচনার দ্বারা দেশের গঠনমূলক সেবাকাজে সাধুসন্ন্যাসীগণের আরও অধিক মাত্রায় আত্মনিয়োগ বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, তবে কর্মক্ষেত্র এবং কর্মপ্রণালীর নির্বাচন সাধুদেরই উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তাঁহাদের কাজের উপর সরকারের চাপ যত কম থাকে ততই মঙ্গল।

এক মাতা ও বহু মাতা

ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ দেশে নানা আঞ্চলিক ভাষা ও জীবনরীতি থাকা স্বাভাবিক। ইহা ভারতের দুর্বলতা নয়—গৌরব। এক এক অঞ্চলের অধিবাসী সেই সেই অঞ্চলের উপর একটি সহজাত মমতা অনুভব করিবেন ইহাও কিছু দোষের নয়। ভারতের অখণ্ড একতাবোধের সহিত এই আঞ্চলিক মমতাবোধের যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না চৈত্র মাসের 'প্রবর্তক' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহার অতি চমৎকার বিশ্লেষণ দেখিতে পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিছুকাল পূর্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু যখন কর্ণাটক প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একটি সভায় শ্রোতৃমণ্ডলী 'ভারত মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়া পরে 'কর্ণাটক মাতা কী জয়' বলিয়া উঠেন। প্রধান মন্ত্রীর মতে কর্ণাটক মাতার উদ্দেশ্যে আলাদা জয়ধ্বনি দিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, এক ভারত-মাতাই যথেষ্ট। "কেননা, যে গৃহে একাধিক মাতা থাকেন সেখানে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। বহু মাতা অর্থেই বহু পরিবার এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী।" 'প্রবর্তক' বলিতেছেন

"পণ্ডিতজীর এই উক্তি বাহির হইতে শুনিতে বেশ...... কিন্তু ইহাতে চিন্তার গভীরতা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। বিশেষ মাতা ও বিশেষ সন্তানের সম্পর্ক, বিশেষ হইয়াও নির্বিশেষ, সার্বজনীন হইতে পারে। বিশেষ-এর মধ্যে যে মাতৃত্ব বা সন্তানত্বের অনুভব তাহাই বিস্তৃত হইয়া বৃহৎ হওয়াই সৃষ্টির ক্রম।

ইহার বিপরীত ক্রম অবাস্তব আকাশকুসুম—সৃজনের নিগূঢ় তাৎপর্য নহে। কর্ণাটককে প্রথমে মা না ভাবিতে পারিলে নিখিল ভারতকে মা ভাবনা সম্ভবপর নয়।"

প্রবর্তক-সম্পাদক এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীর হনুমানের জীবনের উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

"এমনি করিয়া দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর পাষাণ বিগ্রহ ঠাকুরের নিকট বিশ্বমাতৃত্বের চিন্ময় রসঘন বিগ্রহে পরিণত হইয়াছিলেন। বীর হনুমানের নিকট ভাবতঃ কৃষ্ণ-বিষ্ণু-রাম-শিব সব এক হইলেও জানকীনাথই তাঁর জীবন-সর্বস্ব।"

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যদি সকল প্রকার গণ্ডীকে, সকল প্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সার্বজনীনতা বলে তবে সার্বজনীনতা বস্তুতই আকাশকুসুম সন্দেহ নাই।"

"বহু মাতা অর্থেই বহু পরিবার এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী" শ্রীনেহরুর এই উক্তি সম্পর্কে প্রবর্তক লিখিতেছেন—

"ইহাও আকাশচারী অবাস্তব আদর্শবাদীর কথা। * * * হাটে বাজারে বহু পরিবারের নরনারী একত্র হয় কিন্তু তাই বলিয়া এক হয় না। একত্ব একটা বোধ। উহা কাল্পনিক আকাশকুসুমের মত শূন্যে ফুটিয়া উঠে না—দেশ, কাল, পাত্র, বিশেষ নামরূপের গণ্ডীর আশ্রয়েই ব্যষ্টি-মানুষের চিত্তে উন্মেষ হইয়াই সর্বানুভূ হয়—সবকে আলিঙ্গন করিয়া পরিব্যাপ্ত হয়।"

আমরা প্রবন্ধটি হইতে সামান্যই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম। সমগ্র প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগের সহিত সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

স্বামী বাসুদেবানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি, উদ্বোধনের অন্যতম ভূতপূর্ব যশস্বী সম্পাদক স্বামী বাসুদেবানন্দজী (হরিহর মহারাজ) গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে, ১৯৫৬) বেলা ১-৫০ মিনিটে ৬৫ বৎসর বয়সে বেলুড়মঠে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগান্তে ভগবৎপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর তিনি হৃদ্‌রোগে পীড়িত ছিলেন। মাঝে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। দেহত্যাগের দিন সকাল হইতেই তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইতে থাকে। নিশ্বাসের কষ্টের জন্য তিনি বিশেষ শুইতে পারিতেন না। শয্যায় বসিয়া থাকা অবস্থায় ধীরে ধীরে তাঁহার সর্বশরীর শীতল হইতে থাকে, তথাপি শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ পর্যন্ত তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা বজায় ছিল।

স্বামী বাসুদেবানন্দজীর পূর্বনাম ছিল হরিহর মুখোপাধ্যায়। খ্রীঃ ১৯১৪ সালে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি মঠে যোগদান করেন। ১৯১৫ সালে তাঁহার ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা (নাম—ধ্রুব চৈতন্য) হয়। ১৯১৮ সালে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে সন্ন্যাস দেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের বিশেষ স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের নানাবিধ সাময়িক সেবাকার্যে, উদ্বোধন-সম্পাদনায় এবং পরে পাটনা, কাটিহার ও কলিকাতা গদাধর আশ্রম পরিচালনাতেও হরিহর মহারাজ প্রশংসনীয় উদ্যম ও কর্মকৌশল দেখাইয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাধনানুরাগ, গভীর পাণ্ডিত্য, সবল বাগ্মিতা এবং আরও বহুবিধ সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে বিভূষিত করিয়াছিল।

উদ্বোধনের সহিত স্বামী বাসুদেবানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ এই পত্রিকার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। বঙ্গাব্দ ১৩২৬ হইতে ১৩৪২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ ষোল বৎসর উদ্বোধনের সম্পাদনার ভার ছিল তাঁহারই উপর। সম্পাদনার দায়িত্ব হইতে অবসর পাইবার পরও বরাবরই

তিনি ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ মৌলিক প্রবন্ধাদি দ্বারা উদ্বোধনকে অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র সঙ্গ ও সদুপদেশ অনেককে ব্যক্তিগত ধর্মজীবনে প্রেরণা ও সহায়তা দিয়াছে। জননী সারদাদেবীর শ্রীচরণাশ্রিত মঠের এই প্রাচীন সন্ন্যাসীর দেহনির্মুক্ত আত্মা জগদম্বার অভয় অঙ্কে শাশ্বতশান্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মুণ্ডক উপনিষদ

(পূর্বানুবৃত্তি)

[তৃতীয় মুণ্ডক ; প্রথম খণ্ড]

'বনফুল'

সুপর্ণ দুইটি পাখী সখাভাবে সম্মিলিত
রহিয়াছে একই বৃক্ষ 'পরে
এক পাখী স্বাদু ফল করিছে ভক্ষণ
দ্বিতীয়টি না খাইয়া নিরীক্ষণ করে॥ ১ ॥

সেই বৃক্ষে আসক্ত জীবগণও দীনভাবে
দুশ্চিন্তায় হয় শোকাতুর
যখন সে সর্বপূজ্য ঈশ্বরের মহিমা নেহারে
দুঃখ হয় দূর ॥ ২ ॥

সে দ্রষ্টা যখন দেখে সে ঈশ্বরে সে পুরুষে
যিনি কর্তা, ব্রহ্মযোনি, স্বয়ম্প্রভ হিরণ্যবরণ
পরিহরি পুণ্যপাপ তখন সে হয় গত ক্লেশ
লাভ করে সে পরম সাম্য নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥

সর্বভূতে যাঁর ভাতি, তিনিই তো প্রাণ—
তাঁরে জানি মুখরিত হ'ন না বিদ্বান।
তিনি আত্মক্রীড়াশীল আত্মানন্দে নিমজ্জিত,
তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্, তিনি ক্রিয়াবান্ ॥ ৪ ॥

সত্য ও সম্যক জ্ঞানে তপস্যায় ব্রহ্মচর্যে
নিষ্কাম যতিদের সেই ব্রহ্ম অপরোক্ষ হয়
অন্তরবিহারী যাহা শুভ্র জ্যোতির্ময় ॥ ৫ ॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নহে ;
সত্যেই প্রসারিত পন্থা দেবযান
সে পথে গমন করি নিষ্কাম ঋষিগণ
পান সত্য পরম নিধান ॥ ৬ ॥

সুবৃহৎ স্বয়ম্প্রভ অচিন্ত্যস্বরূপ তিনি
প্রকাশিত তিনি পুন সূক্ষ্মে সূক্ষ্মতরে
দূর হ'তে অতিদূরে অথচ নিকটে তিনি
সচেতন প্রাণীদের হৃদয়-কন্দরে ॥ ৭ ॥

চক্ষু দিয়া, বাক্য দিয়া, অপর ইন্দ্রিয় দিয়া
তপস্যা বা কর্ম দিয়া সে ব্রহ্মরে ধরা নাহি যায়
জ্ঞান-শুদ্ধ সত্তা যার শুধু সেই ধ্যানী
নিরাকার সে ব্রহ্মরে দেখিবারে পায় ॥ ৮ ॥

এই সূক্ষ্ম আত্মারে জানা যায় চিত্ত দিয়া
যেই চিত্তে পঞ্চরূপে সন্নিবিষ্ট প্রাণ
সর্বজীবে প্রাণে চিত্তে আত্মাই ওত-প্রোত
বিশুদ্ধ করিলে চিত্ত দেখা যায়
আত্মা সুমহান ॥ ৯ ॥

শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ যেই লোক করেন কামনা
সে লোক লভেন তাঁরা, পূর্ণ হয় তাঁদের বাসনা।
সুখ-ভোগ কামনা যাঁদের
আত্মজ্ঞজনের পূজা কর্তব্য তাঁদের ॥ ১০ ॥ ক্রমশঃ

দিব্য প্রেম

স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বে অপ্রকাশিত স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে খ্রীঃ ১৯০০ সালের ১২ই এপ্রিল প্রদত্ত হইয়াছিল। মূল ইংরেজী ভাষণটি হলিউড বেদান্ত সোসাইটির দ্বৈমাসিক Vedanta and the West পত্রিকার Sept-Oct, 1955 সংখ্যায় 'Divine Love' শিরোনামায় ছাপা হইয়াছে। যেখানে সাঙ্কেতিক লিপিকার ও অনুলেখিকা আইডা আনসেল স্বামীজীর কতকগুলি কথা যথাযথভাবে ধরিতে পারেন নাই সেখানে...... চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যস্থিত অংশ স্বামীজীর ভাব পরিস্ফুটনের জন্য লিপিকার নিজেই সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। —উঃ সঃ]

(প্রেমকে একটি ত্রিকোণের প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রথম কোণটি এই যে,) প্রেম কোন প্রশ্ন করে না। ইহা ভিক্ষুক নয়! ......ভিখারীর ভালবাসা ভালবাসাই নয়। প্রেমের প্রথম লক্ষণ হইতেছে যে ইহা কিছুই চাহে না, (বরং ইহা) সবই বিলাইয়া দেয়। ইহাই হইল প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনা, ভালবাসার মাধ্যমে উপাসনা। ঈশ্বর করুণাময় কি না এই প্রশ্ন আর উঠে না। তিনি ঈশ্বর; তিনি আমার প্রেমাস্পদ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ এবং অসীম ক্ষমতাময় কিনা, তিনি সান্ত কিংবা অনন্ত—এ সব আর জিজ্ঞাস্য নয়। যদি তিনি মঙ্গল বিতরণ করেন ভালই, যদি অমঙ্গল আনেন তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? তাঁহার অন্যান্য সমস্ত গুণই মিলাইয়া যায়, কেবল ঐ একটি ছাড়া—অনন্ত প্রেম।

ভারতবর্ষে একজন প্রাচীন সম্রাট ছিলেন। তিনি একবার শিকার অভিযানে গিয়া বনের মধ্যে অনেক বড় যোগীর সাক্ষাৎ পান। সাধুর উপর তিনি এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহাকে রাজধানীতে আসিয়া কিছু উপহার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। (প্রথমে) সাধু রাজী হন নাই, (কিন্তু) বারংবার সম্রাটের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যাইতে স্বীকার করিলেন। তিনি (প্রাসাদে) উপস্থিত হইলে, বাদশাহকে জানানো হইল। বাদশাহ বলিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আমার প্রার্থনা শেষ করিয়া লই।" সম্রাট প্রার্থনা করিতেছিলেন, "প্রভু, আমাকে আরও ধন দাও—আরও (জমি-জায়গা, স্বাস্থ্য), আরও সন্তান-সন্ততি।" সাধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "কই, আপনি আমার উপহার তো গ্রহণ করিলেন না?" যোগী উত্তর দিলেন, "আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেই অধিক ভূসম্পত্তি, টাকাকড়ি, আরও কত কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, আপনি আর আমাকে কি দিবেন? আগে নিজের অভাবগুলি মিটাইয়া নিন্।" • •

প্রেম কখনও যাচ্ঞা করে না, ইহা সব সময় দিয়াই যায়। ...... যখন একটি যুবক তাহার প্রিয়তমাকে দেখিতে যায়,...তাহাদের মধ্যে বেচা-কেনার সম্বন্ধ থাকে না; তাহাদের সম্বন্ধ হইতেছে প্রেমের, আর প্রেম ভিক্ষুক নয়। (এইরূপে), আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনার অর্থ ভিক্ষা নয়। যখন আমরা সমস্ত যাচ্ঞা শেষ করিয়াছি—"প্রভু, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও"—তখনই ধর্মজীবন আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয়টি (ত্রিকোণ-স্বরূপ প্রেমের দ্বিতীয় কোণ) হইতেছে এই যে, প্রেমে ভয় নাই। তুমি আমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পার, তবু আমি তোমাকে ভালবাসিতেই (থাকিব)। মনে কর, তোমাদের মধ্যে একজন মা, শরীর খুব দুর্বল,—দেখিলে, রাস্তায় একটি বাঘ তোমার শিশুটিকে

ছিনাইয়া লইতেছে। বলতো, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? জানি, তুমি ঐ ব্যাঘ্রটির সম্মুখীন হইবে। অন্য সময়ে পথে একটি কুকুর পড়িলেই তোমাকে পলাইতে হয়, কিন্তু এখন তুমি বাঘের মুখে ঝাঁপ দিয়া তোমার শিশুটিকে কাড়িয়া লইবে। ভালবাসা ভয় মানে না। ইহা সমস্ত মন্দকে জয় করে। ঈশ্বরকে ভয় করা ধর্মের সূত্রপাত মাত্র, উহার পর্যবসান হইল ঈশ্বরপ্রেমে। সমস্ত ভয় যেন তখন মরিয়া গিয়াছে।

তৃতীয়টি (ত্রিকোণাত্মক প্রেমের তৃতীয় কোণ) হইল এই যে, প্রেম নিজেই নিজের লক্ষ্য। ইহা কখনই অপর কোন কিছুর 'উপায়' হইতে পারে না। যে বলে, "আমি তোমাকে ভালবাসি এই সব জিনিসের জন্য" সে ভালবাসে না। প্রেম কখনই কোন উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নহে; ইহা নিশ্চিতই পূর্ণতম সিদ্ধি। প্রেমের প্রান্তসীমা এবং আদর্শ কি? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ—ইহাই সব। কেন মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে? এই 'কেন'র কোন্ উত্তর নাই, কেননা ভালবাসা তো কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নয়। ভালবাসা আসিলে উহাই মুক্তি, উহাই পূর্ণতা, উহাই স্বর্গ। আর কি চাই? অন্য আর কি প্রাপ্তব্য থাকিতে পারে? প্রেম অপেক্ষা মহত্তর আর কি তুমি পাইতে পার?

আমরা সকলে প্রেম অর্থে যাহা বুঝি আমি সে কথা বলিতেছি না। একটুখানি ভাবপ্রবণ ভালবাসা দেখিতে বেশ সুন্দর। পুরুষ নারীকে ভালবাসিল আর নারী পুরুষের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখাও তো যায় যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জন জেনকে পদাঘাত করিল এবং জেনও জনকে লাথি মারিতে ছাড়িল না। ইহা বৈষয়িকতা, ভালবাসাই নয়। যদি জন বাস্তবিকই জেনকে ভালবাসিত, তবে সেই মুহূর্তেই সে পূর্ণ হইয়া যাইত। (তাহার প্রকৃত) স্বরূপই প্রেম; সে স্বয়ংপূর্ণ। জন কেবলমাত্র জেনকে ভালবাসিয়া যোগের সমুদয় শক্তি পাইতে পারে (যদিও) সে হয়তো ধর্মের, মনস্তত্ত্বের বা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মতবাদসমূহের একটি অক্ষরও জানে না। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি কোন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক পরস্পর পরস্পরকে যথার্থ ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে যোগিগণ যেসকল বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন এই দম্পতীও সেই সমস্ত শক্তি (অর্জন করিতে সমর্থ হইবে,) যেহেতু প্রেম যে স্বয়ং ঈশ্বরই। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং (সেইজন্য) তোমাদেরও মধ্যে এই ভালবাসা রহিয়াছে, তোমরা জান বা না জান।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটি যুবককে একটি তরুণীর জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম। ···মনে করিলাম ছেলেটিকে যাচাই করিবার ইহা একটি উপযুক্ত পরীক্ষাবিশেষ। সে তাহার প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় দর্শন ও দূর-শ্রবণের ক্ষমতা বিকাশ করিয়াছিল। ষাট কি সত্তর বার ছেলেটি একবারও ভুল করে নাই এবং মেয়েটি ছিল দুইশত মাইল দূরে। (সে বলিত), "এইভাবে মেয়েটি সাজগোজ করিয়াছে।" (কিংবা), "ঐ সে চলিয়া যাইতেছে।" আমি ইহা নিজের চোখে দেখিয়াছি।

ইহাই হইতেছে প্রশ্ন: তোমার স্বামী কি ঈশ্বর নন্? তোমার সন্তান কি ঈশ্বর নয়? তুমি যদি তোমার পত্নীকে ঠিক ঠিক ভালবাসিতে পার জগতের সমস্ত ধর্ম তোমাতে ফুটিয়া উঠিবে। তোমার মধ্যেই তুমি লাভ করিবে ধর্মের ও যোগের সমস্ত রহস্য। কিন্তু ভালবাসিতে পার কি? প্রশ্ন তো ইহাই। তুমি বল, "মেরী, আমি তোমায় ভালবাসি···অহো, আমি তোমার জন্য মরিতে পারি!" (কিন্তু যদি তুমি) মেরীকে অপর এক ব্যক্তিকে চুম্বন করিতে দেখ, তুমি তাহার গলা কাটিয়া দিতে চাহিবে। আবার মেরী যদি জনকে অন্য একটি মেয়ের সহিত কথাবার্তা বলিতে দেখে

তবে সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না এবং জনের জীবন নরকের ন্যায় দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে। ইহার নাম ভালবাসা নয়। ইহা যৌন ক্রয়-বিক্রয়। ইহাকে প্রেম বলা অতীব নিন্দার্হ। জগৎ দিবা-রাত্র ঈশ্বর এবং ধর্মের কথা বলিয়া থাকে—তেমনি প্রেমের কথাও। প্রতি বিষয়টিকে একটি ভণ্ডামিতে পরিণত করা—ইহাই তো তোমরা করিতেছ! সকলেই প্রেমের কথা বলে, (তবু) সংবাদপত্রের স্তম্ভে (আমরা পড়ি) প্রত্যেক দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কাহিনী। যখন তুমি জনকে ভালবাস তখন কি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাস অথবা তোমার জন্য? (যদি তুমি তোমার নিজের জন্য তাহাকে ভালবাস) তাহা হইলে জনের নিকট হইতে কিছু আশা কর। (যদি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাস) তবে জনের কাছ হইতে তুমি কিছুরই প্রত্যাশা রাখ না। সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যাহা খুশি করিতে পারে (এবং) তুমি তাহাকে একই-ভাবে ভালবাসিবে।

এই তিনটি বিন্দু, তিনটি কোণ লইয়া (প্রেম)-ত্রিভুজ। প্রেম ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র শুকনা হাড়ের মত, মনস্তত্ত্ব একপ্রকার মতবাদ-বিশেষ এবং কর্ম শুধুই পণ্ডশ্রম। (প্রেম থাকিলে) দর্শন হইয়া যায় কবিতা, মনোবিজ্ঞান হয় (মরমী অনুভূতি) আর কর্ম সৃষ্টির মাঝে মধুরতম বস্তুরূপে পরিগণিত হয়। (কেবলমাত্র) গ্রন্থ অধ্যয়নে (লোকে) শুষ্ক হইয়া যায়। কে বিদ্বান? যে অন্ততঃ এক বিন্দু প্রেমও অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বরই প্রেম এবং প্রেমই ঈশ্বর। আর ঈশ্বর তো সব জায়গাতেই রহিয়াছেন। ভগবান প্রেমস্বরূপ এবং সর্বত্র বিরাজমান এইটি যে অনুভব করে, সে বুঝিতে পারে না যে, সে মাথায় ভর করিয়া বা পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেমন যে লোক এক বোতল মদ খাইয়াছে সে জানে না যে, সে কোথায় রহিয়াছে। ... যদি আমরা দশ মিনিট ভগবানের জন্য কাঁদি পরের দশ মাস আমরা কোথায় আছি—সে জ্ঞান আমাদের থাকিবে না। ......আহারের সময়ও আমরা মনে করিতে পারিব না। খাইতেছি, সে হুঁশও থাকিবে না। ঈশ্বরকেও ভালবাসিবে আবার সর্বদা খোপ-দুরস্ত ব্যবসায়ীবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকিবে ইহা (কি করিয়া) সম্ভবপর? ......সেই...সর্বগ্রাসিনী সর্বব্যাপিনী শক্তি কিরূপে আসিতে পারে?......

মানুষ বিচারশীল নয়। তাহারা সকলেই পাগল। শিশুরা (পাগল) খেলায়, তরুণ তরুণীকে লইয়া, বৃদ্ধেরা তাহাদের অতীতের চর্বিত চর্বণে। কেহ বা পাগল অর্থের পিছনে। কেহ কেহ তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হইবে না কেন? জন বা জেনের জন্য যেরূপ পাগল হইয়া ছুটিতেছ ঈশ্বরের প্রেমের জন্য সেইরূপ উন্মাদ হও। কই, এমন লোক কই? (অনেকে) বলে, "আমি কি এইটি ছাড়িব? অমুকটা ত্যাগ করিব?" একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বিবাহ কি করিব না?" না, কোন বিষয়ই ছাড়িতে যাইও না। বিষয়ই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে। অপেক্ষা কর, তুমি সব কিছুই ভুলিবে।

(সম্পূর্ণরূপে) ভগবৎপ্রেমে পরিণত হওয়া—এখানেই প্রকৃত উপাসনা! রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে সময় সময় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়; সেই সব অত্যাশ্চর্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ অলৌকিক ভগবৎপ্রেমে কিরূপ আত্মহারা হইয়া বেড়াইতেছেন! এইরূপ প্রেমই লাভ করিতে হইবে। ঐশ্বরিক প্রেম এই প্রকার হওয়াই উচিত—কিছুই না চাহিয়া, কিছুরই অন্বেষণ না করিয়া।

প্রশ্ন হইয়াছিল কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে। তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পদ, তোমার সকল পরিজন, সন্তান-সন্ততি—সব কিছু হইতে, সকলের হইতে প্রিয়তর ভাবিয়া তাঁহাকে উপাসনা কর। (তাঁহাকে উপাসনা কর) যেন তুমি স্বয়ং ভালবাসাকেই ভালবাসিতেছ। এমন একজন আছেন যাঁহার

নাম অনন্ত প্রেম। ইহাই ঈশ্বরের একমাত্র সংজ্ঞা। যদি এই···বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায় কিছুমাত্র ভাবিও না। যতক্ষণ অনন্ত প্রেমস্বরূপ তিনি রহিয়াছেন ততক্ষণ আমাদের ভাবনা কিসের? উপাসনার অর্থ কি, (তোমরা) দেখিলে তো? অন্য সব চিন্তা অবশ্যই চলিয়া যায়। ঈশ্বর ছাড়া সমস্তই তিরোহিত হয়। পিতা বা মাতার সন্তানের উপর যে ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর যে প্রেম, স্বামীর পত্নীর প্রতি যে মমতা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে আকর্ষণ—এই সব প্রেম একত্রে ঘনীভূত করিয়া ঈশ্বরকে দিতে হইবে। যদি কোন রমণী কোন পুরুষকে ভালবাসে, তবে সে পরপুরুষকে ভালবাসিতে পারে না। যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোন (রমণীকে) ভালবাসা সম্ভব নয়। ইহাই হইল ভালবাসার ধর্ম।

আমার বৃদ্ধ আচার্যদেব বলিতেন, "মনে কর এই ঘরের মধ্যে এক থলে মোহর রহিয়াছে, আর পাশের ঘরে একটি চোর আছে—যে ঐ মোহরের থলের কথা জানে। চোরটি কি ঘুমাইতে পারিবে? নিশ্চয়ই নয়। সব সময়েই সে পাগল হইয়া ভাবিতে থাকিবে, কি উপায়ে মোহরগুলি আত্মসাৎ করা যায়।"····· (এইরূপে), কোন লোক যদি ভগবানকে ভালবাসে তবে সে কি করিয়া অন্য কোন কিছুকে ভালবাসিবে? ঈশ্বরের বিপুল প্রেমের সম্মুখে অন্য কিছু দাঁড়াইবে কিরূপে? উহার কাছে সব কিছুই নস্যাৎ হইয়া যাইবে। সেই প্রেমকে লাভ করিবার জন্য, বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য, উহা অনুভব করিয়া উহাতেই অবস্থান করিবার জন্য পাগল হইয়া ছুটাছুটি না করিয়া মন থামিতে পারে কি?

আমরা এইভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিব: "আমি ধন চাই না, (বন্ধুবান্ধব বা সৌন্দর্য চাই না) বিষয়-সম্পত্তি, বিদ্যা, এমনকি মুক্তিও চাই না। যদি ইহাই তোমার ইচ্ছা হয়—আমাকে সহস্র মৃত্যুর কবলে পাঠাইয়া দাও। আমার শুধু এই প্রার্থনা যে, আমি যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি আর যেন কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ের প্রতি যে টান সেইরূপ তীব্র ভালবাসা যেন আমার হৃদয়ে আসে, কিন্তু কেবল সেই চিরসুন্দরের জন্য। ঈশ্বরকে বন্দনা! প্রেমময় ঈশ্বরকে বন্দনা!" ঈশ্বর ইহা ছাড়া অন্য কিছু নন্। অনেক যোগী যে সব অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতে পারেন তিনি সেগুলি গ্রাহ্য করেন না। ক্ষুদ্র যাদুকরেরা ক্ষুদ্র কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ যাদুকর; তিনি সমুদয় যাদুবিদ্যা দেখাইতে পারেন। কে জানে কত ব্রহ্মাণ্ড (আছে,) কে ভ্রূক্ষেপ করে? ······

আর একটি পথ (আছে। ইহা বলে) সব কিছু জয় করিতে, সমস্ত কিছু দমন করিতে—শরীর (এবং) মন উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে। ······কিন্তু (ভক্ত বলেন,) "সমস্ত কিছু জয় করিবার কি সার্থকতা? আমার কাজ ঈশ্বরকে লইয়া!"

একজন যোগী ছিলেন, খুব ভক্ত! গলক্ষত রোগে তিনি যখন মুমূর্ষু তখন অপর একজন যোগী—যিনি দার্শনিক, তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। (শেষোক্ত) যোগী বলিলেন, "দেখুন, আপনি আপনার ক্ষতের উপর মন একাগ্র করিয়া উহা সারাইয়া ফেলুন না কেন?" তৃতীয় বার যখন এইরূপ বলা হইল তখন (সেই পরমযোগী) উত্তর দিলেন, "তুমি কি ইহা সম্ভবপর মনে কর যে, যে মন সম্পূর্ণরূপে আমি ভগবানকে নিবেদন করিয়াছি, (তাহা এই হাড়মাসের খাঁচায় টানিয়া আনিব?)" যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার সাহায্যের জন্য দেব-সেনাদলকে আহ্বান করিতে সম্মত হন নাই। এই ক্ষুদ্র শরীরটি কি এতই মূল্যবান যে ইহা দুই বা তিন দিন বেশী জিয়াইয়া রাখিবার জন্য আমি বিশ হাজার দেবদূতকে ডাকিয়া আনিব?

(জাগতিক দিক হইতে) এই শরীরটিই আমার সর্বস্ব। ইহাই আমার জগৎ, আমার ভগবান। আমি শরীর। দেহে চিমটি কাটিলে, আমি মনে করি আমাকেই কাটিলে। যদি মাথা ধরিল তো মুহূর্তে আমি ভগবানকে ভুলিয়া যাই। আমি দেহের সহিত এমনই জড়িত! ঈশ্বর এবং সব কিছুকেই নামাইয়া আনিতে হইবে আমার এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য —দেহের জন্য। এই দৃষ্টিকোণ হইতে, যীশুখ্রীষ্ট যখন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মরণ বরণ করিলেন এবং (তাঁহার সাহায্যের জন্য) দেবদূতগণকে ডাকিলেন না, তখন তিনি মূর্খের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে নামাইয়া আনিয়া ক্রুশ হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু প্রেমিক যাঁহার কাছে এই দেহটি কিছুই নয়—তাঁহার দিক হইতে দেখিলে কে এই অকিঞ্চিৎকর জিনিসের জন্য মাথা ঘামাইবে? এই শরীর থাকে কিংবা যায়—বৃথা চিন্তায় কি লাভ? রোমান সৈন্যগণের ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরার চেয়ে এর দাম বেশী নয়।

(জাগতিক দৃষ্টি) ও প্রেমিকের দৃষ্টিতে আকাশ পাতাল তফাৎ। ভালবাসিয়া যাও। যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তোমাকেও যে ক্রুদ্ধ হইতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। যদি কেহ নিজেকে হীন করিয়া ফেলে তোমাকেও যে সেই হীন স্তরে নামিতে হইবে তাহার কি মানে? ······"অন্য লোক বোকামি করিয়াছে বলিয়া আমিও রাগ করিব? অশুভকে প্রতিরোধ করিও না।" ঈশ্বরপ্রেমিকগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। জগৎ যাহাই করুক, যে ভাবেই ইহা চলুক (তাঁহাদের উপর) ইহা কোন প্রভাব ফেলিতে পারে না।

জনৈক যোগী অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "দেখ আমার শক্তি। আকাশের দিকে তাকাও; আমি ইহাকে মেঘ দিয়া ঢাকিয়া দিব।" বৃষ্টি আরম্ভ হইল। (কেহ) বলিল, "প্রভু, অদ্ভুত আপনার শক্তি। কিন্তু আমাকে সেই জিনিসটি শিক্ষা দিন যাহা পাইলে আমি আর কোন কিছু চাহিব না।" ··· · শক্তিরও ঊর্ধ্বে যাওয়া—কিছুই চাই না, শক্তিলাভেও বাসনা নাই! (ইহার তাৎপর্য) শুধু বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না। ····· হাজার হাজার বই পড়িয়াও তুমি জানিতে সক্ষম হইবে না। ······যখন আমরা ইহা বুঝিতে আরম্ভ করি, সমুদয় জগৎরহস্য যেন আমাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়। ······একটি ছোট মেয়ে তাহার পুতুল লইয়া খেলিতেছে—সব সময় সে নতুন নতুন স্বামী পাইতেছে, কিন্তু যখন তাহার সত্যকারের স্বামী আসে, তখন (চিরদিনের জন্য) সে তাহার পুতুল-স্বামীগুলি দূরে ফেলিয়া দেয়। ····· জগতের সব কিছু সম্বন্ধে ঐ একই কথা। (যখন) প্রেমসূর্য উদিত হয়, তখন এই সব খেলার শক্তিসূর্য—এই সমস্ত (কামনা-বাসনা) অন্তর্হিত হয়। শক্তি লইয়া আমরা কি করিব? যেটুকু শক্তি তোমার আছে তাহা হইতেও যদি অব্যাহতি পাও তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। ভালবাসিতে আরম্ভ কর। ক্ষমতার মোহ নিশ্চয়ই কাটানো চাই। আমার এবং ভগবানের মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন খাড়া না হয়। ভগবান একমাত্র প্রেমই, আর কিছুই নন—আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম এবং অন্তেও প্রেম।

এক রানীর সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প আছে। তিনি রাস্তায় রাস্তায় (ভগবৎপ্রেমের বিষয়) প্রচার করিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত নির্যাতন করিতেন এবং সর্বত্র তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেন। রানী তাঁহার ভগবৎ-প্রেম বর্ণনা করিয়া গান গাহিতেন। তাঁহার এই গীতগুলি সর্বত্র গাওয়া হয়। "চোখের জল সিঞ্চন করিয়া আমি (প্রেম-লতা পুষ্ট করিয়াছি"······) ইহাই চরম, মহান্ (লক্ষ্য)। ইহা ব্যতীত আর কি আছে? (লোকে) ইহা চায়, উহা চায়।

তাহারা সবাই পাইতে ও সঞ্চয় করিতে চায়। এই জন্যই এত কম লোক (প্রেমকে) বুঝিতে পারে, এত কম লোক ইহাকে লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে জাগাও এবং বল। তাহা হইলে তাহারা এ বিষয়ে আরও কিছু সঙ্কেত পাইবে।

প্রেম স্বয়ং শাশ্বত, অন্তহীন ত্যাগ-স্বরূপ। তোমাকে সব কিছু ছাড়িতে হইবে। কিছুই তোমার অধিকারে রাখা চলিবে না। প্রেম লাভ করিলে তোমার আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। ······"চিরকালের জন্য কেবল তুমিই আমার ভালবাসার ধন থাকিয়ো।" প্রেম ইহাই চাহে। "আমার প্রেমাস্পদের অধরোষ্ঠের একটি মাত্র চুম্বন! আহা, যে তোমার চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার সমস্ত দুঃখ যে চলিয়া গিয়াছে! একটি মাত্র চুম্বনে মানুষ এত সুখী হয় যে, অন্য বস্তুর উপর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে কেবল একমাত্র তোমারই স্তুতিতে মগ্ন থাকে আর একমাত্র তোমাকেই দেখে।" মানবীয় ভালবাসাতেও (দিব্য প্রেমের সত্তা লুকানো থাকে।) গভীর প্রেমের প্রথমক্ষণে সমস্ত জগৎ যেন এক সুরে তোমার হৃদয় বীণার সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বিশ্বের প্রতিটি পাখী যেন তোমারই প্রেমের গান গাহিয়া যায়, প্রতিটি ফুল তোমার জন্যই ফুটিয়া থাকে। চিরন্তন অসীম প্রেম হইতেই (মানবীয়) ভালবাসা উদ্ভূত।

ঈশ্বরপ্রেমিক কোন কিছুকে ভয় করিবেন কেন? দস্যুতস্করের, দুঃখ-দুর্বিপাকের এমনকি নিজের জীবনেরও ভয় তাঁহার নাই। ······প্রেমিক অনন্ত নরকে যাইতেও প্রস্তুত, কিন্তু উহা কি নরক থাকিবে? স্বর্গ নরক এই সব ধারণা আমাদের ত্যাগ করিয়া উচ্চতর প্রেমের আস্বাদ লাভ করিতে হইবে।······শত শত লোক প্রেমের অনুসন্ধানে তৎপর, কিন্তু উহা আসিলে ভগবান্ ছাড়া আর সবই অদৃশ্য হয়।

অবশেষে প্রেম, প্রেমাস্পদ এবং প্রেমিক এক হইয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য।······আত্মা এবং মানুষের মধ্যে এবং আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে কেন?······কেবল এই প্রেম উপভোগ করিবার জন্য। ঈশ্বর নিজে নিজেকে ভালবাসিতে চাহিলেন, সেই জন্য তিনি আপনাকে নানা ভাগে বিভক্ত করিলেন।······প্রেমিক বলেন, "সৃষ্টির সমস্ত তাৎপর্য ইহাই।" আমরা সকলেই এক। "আমি এবং আমার পিতা এক।" এইক্ষণে ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্য আমি পৃথক হইয়াছি।······কোন্‌টি ভাল—চিনি হওয়া, না চিনি খাওয়া? চিনি হওয়া—তাহাতে আর কি মজা? চিনি খাওয়া—ইহাই হইল প্রেমের অনন্ত উপভোগ।

প্রেমের সমস্ত আদর্শ—(ঈশ্বরকে) আমাদের পিতা, মাতা, সখা, সন্তানভাবে (ভাবিবার প্রণালী—ভক্তিকে দৃঢ় করিবার এবং গভীরতরভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য।) স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই ভালবাসার তীব্র অভিব্যক্তি। ঈশ্বরকে এইভাবেও ভালবাসিতে হইবে। নারী তাহার পিতাকে ভালবাসে, মাতা-সন্তান-বন্ধুকেও ভালবাসে, কিন্তু পিতা, মাতা, সন্তান বা বন্ধুর কাছে নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল একজনের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই থাকে না। এইরূপ পুরুষের পক্ষেও। ······ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি সর্বসম্পূর্ণ। এই সম্পর্কে অন্য সব ভালবাসা একীভূত হইয়াছে। রমণী স্বামীর মধ্যে পিতা, মাতা, সন্তান সবই পায়। পত্নীর মধ্যে স্বামীও মাতা, কন্যা আরও কিছু লাভ করে। এই সর্বগ্রাসী পরিপূর্ণ স্ত্রীপুরুষের প্রেম ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে—যে প্রেম স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে, নির্ভয়ে, লজ্জা না করিয়া, রক্তের সম্বন্ধ না মানিয়া তাহার প্রিয়তমকে নিবেদন করে। কোন অন্ধকার নাই। তাহার নিজের নিকট হইতে যেমন গোপন করিবার কিছু নাই সেইরূপ তাহার

প্রেমাস্পদের নিকটেও গোপনীয় বলিতে কিছুই থাকে না। এইরূপ প্রেম (ঈশ্বরের উপর) আসা চাই। এই জিনিসগুলি ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। তোমরা ধীরে ধীরে এই সব বুঝিতে পারিবে, তখন সমস্ত যৌনভাবও দূরে চলিয়া যাইবে। "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম" এই জীবন ও ইহার সকল সম্পর্কগুলি।

এই সমস্ত ধারণা "তিনি স্রষ্টা ইত্যাদি—"এইগুলি তো বালকদিগের উপযুক্ত। তিনি—আমার প্রিয়—আমার জীবন ইহাই আমার অন্তরের ধ্বনি হউক।......

"আমার একমাত্র আশা আছে। লোকে তোমাকে বলে জগতের প্রভু। ভাল মন্দ, ছোট বড় সবই তুমি। আমিও তোমার এই জগতের অংশ এবং তুমিও আমার প্রিয়। আমার শরীর, মন, আত্মা তোমারই পূজাবেদী তলে। হে প্রিয়, আমার এই উপচারগুলি প্রত্যাখ্যান করিও না।"

পিপাসিতা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বহুদূর হ'তে এসেছি—হরির দরশন-পিপাসায়।
ইতি উতি চাই—কোথাও সে নাই নাম যার শ্যামরায়॥

জানি না তো ধ্যান, জানি না তো জ্ঞান—আমি প্রেমপাগলিনী।
অজানা বঁধুরে বাসি ভালো—রীতি যাহার আজো না চিনি।
হরির মিলন চাই শুধু—কাঁদে নয়ন তৃষায় হায়!
বহুদূর হ'তে এসেছি—হরির দরশন-পিপাসায়॥

নাম শুনে তার ভুলেছি নিখিল, গৃহকাজ, পরিজন।
সখী সহচরী গেছে দূরে—নাই বলিতে কেহ আপন।
দেশে দেশে আমি ভিখারিণী—লোকলাজেরে দিয়ে বিদায়।
বহুদূর হ'তে এসেছি—হরির দরশন-পিপাসায়॥

কেমন সে-স্বামী? কেমন বা আমি?—প্রার্থী আমি, সে নাথ।
ধরণী কি পায় চাঁদে? ভেবে প্রাণ উছসায় দিনরাত।
শুধু জানি—সে-ই অনাথের নাথ, নিঃস্বের সে সহায়।
বহুদূর হ'তে এসেছি—হরির দরশন-পিপাসায়॥

আঁখির মুকুতা দিব তারে, দিব হিয়ার গাঢ় বেদন।
জনম-মরণ-আশা সঁপি' লব' চরণে তার শরণ।
মীরার কান্ত গোপাল শান্ত দিও ঠাঁই রাঙা পায়।
বহুদূর হ'তে এসেছি—হরির দরশন-পিপাসায়॥

"কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্"

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্। কথকতার বেশীর ভাগ আরম্ভই এই, কৈলাসের মনোরম শৈলশিখরে বসে গৌরী যোগীশ্বর মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন। কি জিজ্ঞাসা করছেন? তার আদি অন্ত নেই। তন্ত্রশাস্ত্রে আগাগোড়াই গৌরীর প্রশ্ন আর মহাদেবের উত্তরমালা শাস্ত্রকথায় পরিণত হয়েছে। নানাবিধ সংশয় খণ্ডন করেছে। তার মন্ত্র কবচ করণেও পার্বতীরই প্রশ্ন। তুলসীদাসের রামায়ণেও রামায়ণের আরম্ভ মহাদেবীর প্রশ্নে। তাঁর নানা সন্দেহ, নানা সংশয় মহাদেব খণ্ডন করছেন। পাঁজিতেও দেখি বর্ষফল জানতে চাইছেন গৌরীই—

'হর প্রতি ভাষে কন হৈমবতী,
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।'

লক্ষ্মীর পাঁচালি ও নানাবিধ ব্রতকথাতেও বেশীর ভাগই মহাদেবীর মহাদেবের কাছে জিজ্ঞাসার উত্তর। হৈমবতীর মত এত কৌতূহল, এত জিজ্ঞাসা—নারায়ণী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী কোন দেবীর দেখা যায় না।

ত্রিতাপদগ্ধ সংসারের যত সংশয়, যত আধিব্যাধি দুঃখ-বিপাকের যত জিজ্ঞাসা জগন্মাতাই করছেন। সংস্কৃত-শাস্ত্র তো জানি না। মেয়েলী কথায় দেখি, নানা ভাষার কাহিনী-কথারও আরম্ভ প্রায়ই হৈমবতী মহামায়ার জিজ্ঞাসায়। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক সব জিজ্ঞাসাই মহাদেবী করেছেন। সেই অপূর্ব জিজ্ঞাসার ভাষ্য করেছেন আমাদের দেশ-দেশান্তরের গ্রাম-গ্রামান্তরের পাঁচালিকারেরা—কথকঠাকুরেরা। নিজেদের মত জ্ঞানে ও ভাষায় রচনা করেছেন সেই কথাকাহিনী, সাজিয়েছেন তাকে লৌকিক সুখদুঃখের অনুভূতি মিশিয়ে। হাজার হাজার গল্প-কাহিনীকে মিশিয়ে সুর ও রঙ্ দিয়েছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের রত্নাকর থেকে সেই কত বিষয়ে গৌরীর প্রশ্ন ও দেবাদিদেবের সমাধানকে নিজেদের ভাষায় নিজেদের দেশের কালের মতো তাকে রচনা করেছেন। তাঁদের আজও দেখা যায় কথকতার আসর-প্রাঙ্গণে।

এই যে কথকতা আমরা কয়েকজন উপরের স্তরের বা শিক্ষিত অভিমানী স্তরের লোকেরা মনে ভাবি, বুঝি গ্রামেই আছে, হয়তো নেই, লুপ্ত হ'য়ে এলো। কিন্তু তা নয়। যেদিন আয়ু-সূর্য অস্তে যাব যাব হয়, সেই সেদিন মানুষ আভিজাত্যের খোলস ফেলে এখনও দেবালয়ে, মন্দিরে, গঙ্গাতীরে কথকতার প্রাঙ্গণে এসে দু'একটি পয়সা নিয়ে বসে পড়ে, কথা শোনে। আশেপাশে তার থাকে জাতি-শ্রেণী-নির্বিশেষে প্রাসাদবাসিনী থেকে বস্তিবাসিনী মুখে হাসি, চোখে জল, মনে অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে। কার কথা? তার কি ঠিক ঠিকানা আছে? নিশ্চয়ই আধুনিক গল্প, কাব্য-কথা নয়। ভগবৎ কথা, ভাগবতী কথা, পুরাণ-কথা, ভক্তলীলা-কথায় সেই সব মন্দিরের কথক-সভা ভরা। কেমন করে ভগবৎকথা, পুরাণকথা থেকে ভক্তকথা আসছে, মানুষের সুখ-দুঃখের লীলাতরঙ্গ তাতে মিশে যাচ্ছে, আনন্দে অশ্রুজলে। অপরূপ সেই কথকতার অঙ্গন। ত্রেতার রামসীতার মহত্তম ও পরম দুঃখ-লীলা যদি শেষ হল, আরম্ভ হল দ্বাপরের মানুষের শৌর্য-বীর্যময় কুরুপাণ্ডবের জীবনকথা। সেই একই ভাবে যেমন করে শুকদেব বলেছিলেন সমগ্র ভাগবতকথা রাজা পরীক্ষিতকে নরনারায়ণ, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীর নাম উচ্চারণ করে। তেমনি করে আজও আমরা সেই মঙ্গলাচরণ মন্ত্রোচ্চারণ শুনি, প্রণাম করি, চির পুরানো কথা নতুন করে শুনে বাড়ী ফিরে আসি।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষ হলেও কলিযুগেই কি কথকতা আছে! নূতন দিল্লীর হনুমানজীর মন্দিরে গেছি সকাল ৭।৮টার সময়। হনুমানজীর আশে পাশে নানা মন্দির—শিব রাধাকৃষ্ণ রামসীতা সব আছেন। দর্শন করে ফিরছি—সহসা শোনা গেল, "শাক্যসিংহনে আখিরমেঁ ছন্দককো অশ্ব ছোড় দিয়া। ঔর বোলা কি, তুম ঘর চলা যাও, হম্ লৌটকে ঔর নেহী যায়েঙ্গে।" কুমার শাক্যসিংহ ছন্দককে ঘোড়া ফেরত দিয়ে গৃহে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। ছন্দক হতবুদ্ধিপ্রায় দাঁড়াল। তরুণী রূপসী পত্নী যশোধরা, শিশুপুত্র রাহুল, বৃদ্ধ পিতামাতাকে কি বলবে, কি জানাবে ছন্দক? কি বলবে দেশবাসীকে? তাঁরাই বা তাকে কি বলবেন? এমন কাজ কি করে ছন্দক করবে? "প্রভু, ফিরে চলুন! একবারটি ফিরে চলুন। না হয় একবার গিয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসুন। আমি কি করে এই নিষ্ঠুর বাণী আপনার বৃদ্ধ পিতামাতার কাছে উচ্চারণ করব? রামের অভাবে দশরথের মৃত্যু হয়েছিল, এও তেমনি হবে। কেমন করে তরুণী রাজবধূকে—এই নবীনবয়স্কা অনিন্দিতা দেবীমূর্তিকে এই অগ্নিসম দগ্ধকারী বার্তা শোনাব? রামের সঙ্গে সীতা লক্ষ্মণ বনে গিয়েছিলেন, তিনি একলা যান নি। প্রভু, আপনি কারুকে না নেন, আমাকে সঙ্গে নিন। একবার সাক্ষাৎ করে ফিরে আসুন। সকলের অনুমতি নিয়ে আসুন প্রভু!"

কথক বলছেন, লোকে যেন দেখছে ছন্দকই বলছে।

কথাপ্রাঙ্গণে বিষণ্ণ ম্লান নরনারী। কারো কারো চোখে জল। পিছনের দিকে ধুলামাটির উপরেই একটু বসে পড়লাম। সতরঞ্চিতে স্থান নেই। খানিক বাদে কথা শেষ হ'ল সেদিনের মত। পণ্ডিত উঠে পড়লেন। বাকী কথা কাল হবে।

দুপুর রৌদ্রে "আজমলখাঁ বাজারে" কি বাজার করতে গেছি। শীতের মধ্যাহ্ন—মিউনিসিপ্যালিটির মস্ত বাগানে দলে দলে মানুষ রৌদ্রে ছায়ায় বসছে। শিখদের দল, হিন্দুর দল, সব মিশানো দল। রামায়ণ-মহাভারতের কথা, শিখ দশগুরুর জীবনকথা চলছে। গায়ে চাদর জড়িয়ে পরম রূপবতী নানা বয়সী নানা জাতির মেয়ে ও মহিলারা আছেন। শ্রোত্রী বেশীর ভাগই নারী আর বৃদ্ধ পুরুষ—বয়স্ক মানুষ। পথ চলতে চলতে কথা কানে এলে লোক একটু দাঁড়াচ্ছে, থেমে যাচ্ছে। দ্যূত-সভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা-কথা চলেছে……। কে নেই সেই সভাতে? ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর শকুনি কর্ণ, শত ভাই সহ দুর্যোধন, দ্রৌপদীর পঞ্চপতি! রাজসভা মূক মূঢ়ভাবে বসে আছে। অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর শাশুড়ীরা আছেন, মায়েরা আছেন। তাঁরাও বাতায়নান্তরালে দেখতে এলেন। কথক দ্রৌপদীর অপমান বর্ণনা করতে লাগলেন। নারীর চিরকালের লাঞ্ছনার কথা। পুরুষে পুরুষে যুদ্ধে বিগ্রহে, রাগে ক্রোধে, হিংসায় বিরাগে, চিরকালের এই একই কাহিনী। আজো সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়, যখনই কোনো বিপ্লব ঘটে, যখনি মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে। অতি প্রবলের এই অতি নীচ হীন অস্ত্রে অতি দুর্বল নিরীহ শরীরে এই অপমানের আঘাত আসে সমবেত হয়ে। যার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই তাকেই আঘাত করে একত্রে সমবেতভাবে। আমরা আজো দেখতে পাই সেই ঘটনা। মানুষ সহসা কেমন করে হিংস্র নির্লজ্জ বর্বর হয়ে ওঠে, কেমন করে নারীর লাঞ্ছনাতে নিষ্ঠুর বর্বর আনন্দে মেতে ওঠে।

মাথা নিচু করে উদ্বাস্তু নরনারী যেন চিরন্তনী দ্রৌপদীর কথা শুনল। তারাও মাতা স্ত্রী কন্যা ভগিনীর অপমান লাঞ্ছনা দেখছে, শুনেছে……।

বেলা ৪টার সময় কথা শেষ হল। যেন স্বপ্ন ভেঙে উঠল সবই। ছেলে মেয়ে ফিরছে স্কুল থেকে, কলেজ থেকে। স্বামী ফিরছেন কর্মক্ষেত্র থেকে।

সব ঘরে ফেরেন। বাড়ী গিয়ে সেই একই কর্ম-চক্রে নিযুক্ত হবেন হয়ত কলহ বিবাদও করবেন। তবু আবার কাল আসতে হবে। হবেই। যেন তাদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে কে যেন টেনে আনে, এই ভক্ত-সভায় কথক-সভায় বসতে খানিক ক্ষণের জন্য। কি হয় শুনে? তা জানা নেই কারো। কি পায় তারা? তাও কেউ জানে না। কিন্তু পায় যে কিছু তাতে সন্দেহ নেই। মঙ্গলাচরণ শোনে, "কালে বর্ষতু পর্জন্যম্, পৃথিবী শস্যশালিনী লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।" আর মনে মনে তার গ্রামের দেশের মাঠঘাট পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে জলে শস্যে ধনধান্যে। শরীর সুস্থ হয়, মন প্রসন্ন শান্ত হয়ে ওঠে। মানে জানুক, বা না জানুক, বুঝুক বা না বুঝুক এ অপূর্ব ভাষায় অপূর্ব ছন্দোময় মঙ্গলাচরণ—আশীর্বাদ তারা শোনে। নতশিরে অনুভব করে তাকে। যেন মহাপ্রসাদের মত। যে কণিকা-প্রসাদ মন অন্তর পরিপূর্ণ পবিত্র করে।

এই অপূর্ব ঐতিহ্য গঙ্গা যমুনা গোদাবরী নর্মদা কাবেরীর মত পুণ্য ধারায় মানুষের মনের কূল আজো ভিজিয়ে চলেছে। মানুষ গেছে, বিপ্লব ঘটেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, তবু এই পুণ্য কথা ভুলে যায় না মানুষ, পুণ্য ধারা শুকিয়ে যায় না। ব্যারিষ্টার এ ওয়াজিদ্ আলী সাহেবের 'ভারতবর্ষ' নামে একটি লেখায় পড়েছিলাম; বহুদিন আগে কবে নিজের পল্লীতে ছোট বেলায় এক মুদীর দোকানের পাশে কি জন্য দাঁড়িয়েছেন। দেখলেন, সন্ধ্যা হল। মুদী দোকানে সন্ধ্যা জেলে দিয়ে সন্ধ্যা প্রণাম করে একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ খুলে পড়তে বসল। চাল ডাল নুন তেল কিনতে ক্রেতা এলো। পথচারী এলো। তামাক খেতে বন্ধুবান্ধব এলো। কখন ক্রেতা হয়ে গেলো শ্রোতা। পথিক দাঁড়ালো পাশে এসে। তামাক খাওয়া শেষ হল, বন্ধুজন বাড়ী গেল না। মুদী সুর করে রামায়ণ পড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আবার তার ক্রেতা ও দোকান সামলাচ্ছে। হিসাব নিকাশ জিনিস দেওয়া চলছে। সন্ধ্যা রাত্রি, কারুর তাড়া নেই ঘরে ফেরার।··· পড়া হচ্ছে সেতুবন্ধের কাহিনী। মুদীর ছেলেমেয়ে পৌত্রেরাও কাছে আছে। বালক ওয়াজিদ্ আলী সাহেবও শুনলেন খানিকটা। তারপর বহুদিন পরে দীর্ঘ ২০।২৫ বছর পরে আবার সন্ধ্যার সময়ে সেই পথে গেছেন এক সময়। দেখলেন, সেই দোকান ও দোকানী তেমনি আছে। সেই কেরোসিনের আলোটি জেলে ডালচালের গামলার ঝুড়ির মাঝে মুদী রামায়ণ নিয়ে বসে আছে। তার ছেলে ও নাতি নাতনী বসে আছে, দোকানে কাজ করছে। আর সে রামায়ণ পাঠ করছে। সেই সেতুবন্ধ পাঠ হচ্ছে। আলী সাহেব আশ্চর্য হয়ে দোকানে গেলেন, বললেন, "তুমি এখনো সেইরকম রামায়ণ পাঠ কর, করতে পার? সেই কবে দেখেছি কত বছর আগে। 'সেই সে দিনের সেতুবন্ধ' পাঠ আজও শেষ হয়নি?" মুদ সসম্ভ্রমে বললে, "আপনি যাঁকে দেখেছেন তিনি আমার বাবা। তিনি গত হয়েছেন। তখন আমি এই বালকের মত ছোট ছিলাম। এটি আমার ছেলে। আর এরা আমার পৌত্র-পৌত্রী। পিতার মত আমিও প্রতিদিন পাঠ করি রামায়ণ।······" আলী মনে মনে বললেন, "এই ভারতবর্ষ!" ও লিখলেন "ভারতবর্ষ" নামের লেখাটি। লিখলেন, এই চিরকালের তার ঐতিহ্য। মুদী তার ছেলেকে দিয়ে গেছে—এ তার সন্তানকে দিচ্ছে।·· ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকের রচনা-সঙ্কলনে লেখাটি চোখে পড়ল। আশ্চর্য শ্রদ্ধায় মনে হল, এই ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী আলী সাহেব। হাজার ভাবে অস্বীকার করলেও, দ্বিজাতি বললেও রাজনীতিক্ষেত্রে—ভারতবাসী তাঁদের অন্তর জানে!

আমরাও শুনেছিলাম সেই কত কাল আগে কত কথা সব। সেই কথা একটু বলি।

তখন কিশোর বয়স, জয়পুরে আছি

পিত্রালয়ে। পিতামহী 'গোপাল-সহস্রনাম' শুনছেন। সকাল বেলা ৯।১০টার সময় একজন পণ্ডিতজী আসতেন। একটি চৌকীর ওপর আসন পেতে সহস্রনাম বইখানি রাখা হত। পণ্ডিতজী আরেকটি আসনে বসতেন সামনে। পিতামহী তাঁর নিত্যপূজা আহ্নিক সেরে সেখানে এসে বসতেন, সঙ্গে থাকতাম নাতিনাতনীর দল। বাড়ীর আর সকলে নানা কর্মে থাকতেন। সকালের কাজ, তার শেষ কোথা!

পণ্ডিতজী মঙ্গলাচরণ করে সুললিত সুরে পাঠ আরম্ভ করতেন। প্রথমেই বলতেন, "কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্"...... অমনি যে যেখানে আছে ছেলেমেয়ের দল একে একে সমবেত হ'ত, পাঠের দালানে। গৌরীর জিজ্ঞাসা ও মহাদেবের উত্তর দেওয়া শেষ হ'ল কি বলে তা আর বড় মনে নেই। (শুধু মনে আছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার প্রথম শ্লোকের খানিকটা। তাও সুরের জন্ম।)

পণ্ডিতজী তারপরে স্তব আরম্ভ করলেন,

কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভম্
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।

* * * *

গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ।

এর পরে শুরু হল গোপাল-সহস্রনাম। "শ্রীগোপাল মহীপাল সর্ববেদান্তপালক।..." সে সময়ে সমস্ত সহস্রনাম ভাইবোনদের অনেকের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার সামান্য প্রথম দিকটা মনে ছিল। আজ আর মনে পড়ে না। ঘণ্টা দেড়েক পরে পিতামহীর নাম শোনা শেষ হ'লে তিনি উঠে যেতেন। শিশুজনতাও চলে যেত।

এছাড়াও মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীতে নানা বিষয়ে কথকতা হ'ত। কখনো একাদশীর মাহাত্ম্য—কখনো ভাগবতের কোনো বিশেষ কথা। সেদিন গুরুজনেরা কথার আসরে শ্রোত্রী—আমরা নিরঙ্কুশ স্বাধীনভাবে কখনো আবার দু পাঁচ মিনিট বসছি, কখনো বাইরে বাগানের ধারে গল্প খেলা করতে যাচ্ছি—। কথা কে শোনে বসে! কিন্তু মনে রয়ে গেল যেন কথা শোনার, নাম শোনার আনন্দ-রসের ছোট বীজটুকু।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে তারই অঙ্কুর জেগে উঠল একদিন। কোথায় পাঞ্জাবে হরিদ্বারে কাশীতে। যেন কার আহ্বান টেনে নিয়ে এলো মন্দিরে মন্দিরে, পথের পাশের আসরে, লোকের বাড়ীর কথকতার আসরে। গরমের দুপুরের রৌদ্রে, রাত্রির অন্ধকারে। সহসা মনে পড়ে গেল, 'কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্' লাইনটুকু। স্বপ্নের মত মনে হয়, কি জিজ্ঞাসা করতেন গৌরী? কখন জিজ্ঞাসা করতেন? সন্ধ্যায় না নিশীথরাত্রে? কোন্ কথা? কাদের কথা?

হিমালয়ের কৈলাসের অপূর্ব শিখরে শিলাসনে বসে দিনের পর দিন গৌরী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করতেন, কাদের কথা? এই ত্রিতাপদগ্ধ পৃথিবীর মানুষের কথা, না দেবদেবীর কথা? যেন সেই কথাই চিরদিন ধরে পাহাড়ের শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হয়। আজো অলকানন্দা মন্দাকিনী কলস্বরে ভীমগর্জনে তার দু'কূলের অধিবাসী মানুষের কাছে বলে যায়। আকাশের তারায় তারায় যেন সেই কথাই লেখা থাকে। বাতাসে গুঞ্জরিত হয়। তাই আজো তারা বিস্মৃতিতে লুপ্ত হয়ে যায় নি! চিরকাল ধরে কারা মানুষের কাছে বহন করে নিয়ে এলো সেই কথা? কত যুগের কত দিনের পুরানো দেবতা মানুষের সুখদুঃখের অনাদি অনন্ত কথা?

যেন শঙ্কর বলছেন, হে পার্বতী শোনো শোনো, মোহমুগ্ধ মানুষের চিরকালের যুগযুগান্তের মোহ-লোভ-ক্ষোভের কথা, সুখদুঃখের কথা, হিংসা-অহঙ্কারের কথা—তারপর কেমন করে একদিন সব ফেলে ভগবানের শরণাগতির কথা। সকলের নয় কারো কারো—তবু কি করে যে শরণাগতির পথে

সে পৌঁছায় সেই আশ্চর্য কথা। ভগবান কেমন করে কর্মফল গ্রহণ করেছেন, রামাবতারে, কৃষ্ণাবতারে, মর্ত্য মানুষের দেহে; সেই অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যের কথা, যত সুখদুঃখ ভোগের কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব বলছেন, রাজা পরীক্ষিৎকে এই অনতিক্রম্য কর্মফলের বিবরণ। রাজা মহারাজা থেকে দীন মানুষও যা অতিক্রম করতে পারে না।

এখনো সকল দেশের সব কথকতার আসরে কথক তেমনি করেই মঙ্গলাচরণ করে কথা আরম্ভ করেন। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত পুরাণের নিত্যকথা—চির নতুন। তারি মাঝে ফাঁকে ফাঁকে অজস্র সাধকের, ভক্তের অলৌকিক, সাধারণ লোকের লৌকিক কাহিনী মিশিয়ে। আর শ্রোতা শ্রোত্রীদের মন অকস্মাৎ শান্ত সমাহিত হয়ে যায়। যেন মনে পড়ে যায় পৃথিবীর এই নিয়ম, এই জগৎ "সাগরলহরী সমানা", "আদি অবসানহীন।" এই জগতে কারুর কিছু করবার নেই। যেন "ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার" এই পরম সত্যটি মেনে নিতে হবে!

তাই সহসা সমস্ত ভোগ-মোহের পথ থেকে সে ফিরে আসে ক্ষণেকের জন্যও এই কথা শোনার ধূলামলিন জনতাময় আসরে। অনভিমতে দীন-দরিদ্র মানুষের পাশে সমান হয়ে বসে। শোনে গল্পে গানে মহৎ মানুষের মহৎ জীবনের কাহিনী।

কথায় শোনে, কেমন করে গুরু নানক ভগবানের বিভূতি তুচ্ছ বস্তুতে দেখতে পেতেন তার গল্প। যুবক নানকের (তখনো সাধক-রূপ প্রচারিত হয় নি) সংসারে মন নেই। বাপ ঘোর বিষয়ী লোক, মহা ভাবনায় পড়লেন। বিয়ে দিলেন, যদি মন হয় সংসারে। সন্তানও হল, তাতেও উদাসী নানক। অবশেষে এক জায়গায় চাকরি করে দিলেন, এক জমিদারের বাড়ীতে। বেশ কাজকর্ম করেন নানক। একদিন গোলায় বসে গম মেপে নেবার ও দেবার আদেশ পেলেন। ওদেশে ওজন করে মাপার নিয়ম হচ্ছে—'এক রাম', দু 'দো রাম' বলে ওজন করা (এদেশেও আছে 'রামে রাম' বলে ওজন করা)। এক দুই তিন চার থেকে বারো এলো, তারপর এলো তেরো। নানক ওজন করছেন 'বারা রাম বারা' তারপর 'তেরা রাম তেরা'। অকস্মাৎ মনে হল 'তেরা রাম তেরা' 'তেরা'রাম! মনে জাগল, তাইতো সবই রাম তেরা! অভিভূতভাবে বলতে লাগলেন, তেরা রাম! হে রাম, সবই তো তোমার! এতে আমার বা মনিবের কি অধিকার! হে রাম সব তেরা। সবই তোমার। এতো ওজন করার মাপের 'তেরা' (তেরো) নয়, এ তোমার, তাই'তেরা'। ভাবমুগ্ধ নানক সমস্ত শস্যের গোলা খুলে দিলেন, নিতে বললেন সবাইকে। দরিদ্র প্রজাদের বললেন, সব নিয়ে যাও তোমরা। হে দীন দরিদ্রজন, এ গম শস্য আর কারুর নয়। রাজার নয়, জমিদারের নয়। এ 'সব রামের, 'তেরা রাম তেরা।' রামের জিনিসে আলো জল বাতাসের মত সকলের সমান অধিকার। যেন আদেশ পেলেন 'তেরা' তেরো গুণতে। 'সব তেরা, হে রাম!' নানকের মুখে আর অন্য কথা নেই। ভাবোন্মত্ত নানকের কাণ্ডকারখানার খবর পৌঁছল জমিদারের কাছে। ক্রুদ্ধ জমিদার এলেন, দেখলেন গোলা খালি। নানকের কাজ গেল। নানক বললেন শুধু, তোমার কম হবে না। তোমার ক্ষতি হবে না। তোমার গোলা পূর্ণ থাকবে।

গল্পে কেউ বলে মধুসূদনদাদার দইয়ের ভাঁড়ের মত গোলা পরিপূর্ণই ছিল। কেউ বলে জমিদারের ক্ষেতে সেবার এত শস্য হ'ল যে, জমিদার চমৎকৃত হয়ে গেলেন। সকলে বললে, নানক সাধু, নানকের কৃপায় সব হয়েছে। যাই হোক সংসারী—গৃহী, উদাসী নানককে আর চাকরির অসম্মান সহ্য করতে হ'ল না। গ্রামের জমিদার প্রজা সকলেই

তাঁর পরম ভক্ত হয়ে উঠল। সেই জমিদার চিরদিন নানকের ভক্ত ছিলেন।

শোনো 'সৎসঙ্গে'র সরল মাহাত্ম্য কথা।

এক দরিদ্র বিধবার সন্তান প্রত্যহই এক সাধুর কাছে ও কথার সভায় গিয়ে বসত। ছোট ছেলে, সাধু তাকে খুব স্নেহ করতেন। ঐ সূত্রে অনেক লোকের সঙ্গে তার জানাশোনা হত। একদিন তার জননী তাকে বললে, "বেটা, আমার এই চরকাটার একটা খিল খুলে গেছে, এটা ছুতোরের দোকানে বসিয়ে নিয়ে আয়। এই দুটা পয়সা দিচ্ছি মেরামতির জন্য।" বালক বললে, "পয়সা লাগবেনা, মা। আমার ঢের বন্ধু আছে। আর রোজ 'কথা' শুনি, একসঙ্গে বসি, আমার কাছে ছুতোর ভাই পয়সা নেবেনা।" জননী হাসলে, বললে, "তুমি জান না, পয়সা লাগবে।"

বালক শুনলে না, চরকা নিয়ে চলে গেল।

চরকা মেরামত হ'ল, ছুতোর ভাই পয়সা চাইল। বালক বললে, "রোজ কথা শুনি এক সঙ্গে। কত দান উপকারের কথা 'মহারাজ' বলেন, আর সামান্য দু' পয়সার কাজ করে তুমি পয়সা চাইছ!" ছুতোর হাসলে, "ধর্মের কথার সঙ্গে—পয়সার বা কাজের কি সম্বন্ধ। চরকা তোমার এখানে থাক্, পয়সা দিয়ে নিয়ে যেয়ো।"

বালক ক্ষুব্ধভাবে ফিরে এসে পয়সা নিয়ে গেল, চরকা নিয়ে ফিরে এলো এবং আর মহারাজের কথার আসরে নিয়মমত যাওয়া বন্ধ করলে। মনে ভাবে কি লাভ? শুধু শুধু বসে সময় নষ্ট!

একদিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আর আসনা কেন, বৎস?"

বালক বললে, 'এসে বসে থেকে লাভ কি? এত কথা শুনি, কিন্তু একটা পয়সার কাজও তাতে হয় না।" সাধু হাসলেন। বালক চলে গেল।

কিছুদিন যায়, একদিন বালক এলো। সাধু বললেন, তাকে একটি লাল পাথর 'চুনী' দিয়ে—"তুমি এইটে দিয়ে আমার জন্যে দু'পয়সার ঘুঁটে কিনে আনতো, বেটা।"

চমৎকার—লাল সুন্দর পাথরটুকু। বালক হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল আশ্রম থেকে। ঘুঁটেওয়ালীর বাড়ী এসে ঘুঁটে কিনলে। ঘুঁটেওয়ালী বললে, "দুটা পয়সা দাও।" বালক চুনীটি দিয়ে বললে, "পয়সা নেই, এইটা নাও।" ঘুঁটেওয়ালী সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে, চমৎকার উজ্জ্বল পাথর। লুব্ধ ভাবে দেখতে লাগল। যদি কোনোখানে একটা ফুটো বা ছিদ্র থাকে গলায় পরতে পারবে। নাঃ ফুটো নেই। সে ফিরিয়ে দিল পাথরটা। বললে, "এ নিয়ে কি করব? তুই পয়সা দিয়ে ঘুঁটে নিয়ে যা। এতে একটা ছিদ্র থাকলে তা না হয় গলার হারে পরতাম। শুধু পাথরটি আর কি কাজে লাগবে। নিয়ে আয় পয়সা, তারপর ঘুঁটে নিস্।"

বালক ফিরে গেল সাধুর কাছে। বললে, "একি পাথর দিয়েছেন ঘুঁটেওয়ালী ঘুঁটে দিলনা এতে।" সাধু বললেন, "আচ্ছা ঘুঁটে আর থাক্। তুমি কিছু 'সবজি' কিনে আন ঐ পাথর দিয়ে। বেগুন হোক, লাউ হোক, যা হোক। তরকারিওয়ালী দেবে বোধহয় পাথর নিয়ে।'

বালক আবার গেল তরকারির বাজারে। তরকারিওয়ালা ও তার স্ত্রী তাকে লাউ না বেগুন দিল ওজন করে, যতটা চাইল। তারপর বললে, "দু আনা পয়সা দে।" বালক বললে, "পয়সা তো নেই। আমাকে বলে দিয়েছেন এক মহারাজ এই পাথরটা দিয়ে 'সবজি' নিতে, দেখতো?"

পাথরের রূপ ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হ'ল, তারাও। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তারাও তরকারি ফিরিয়ে নিল। বললে, "না ভাই, এতে আমাদের কোন দরকার নেই। কিছু কাজেও লাগবে না। একটা ছিদ্র থাকলেও বা নিতাম, বৌ গলাতে

হারে গেঁথে পরত। তুমি পয়সা দিয়ে তরকারি নাও তো নাও, নইলে যাও।"

শূন্যহাতে বালক ফিরে এলো দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে। সাধু বললেন, "বেটা, তোমার বড় কষ্ট হয়েছে, দুবার চলা ফেরা করেছ। তা এবার একবার তুমি শহরের এক দোকানে যাও। দোকানদার তোমাকে এর জন্য টাকা দিতে পারবেন বোধহয়। তাতে আমাদের রাত্রের আহার্য কেনা যাবে। তুমি খাবারও নিয়ে এসো, আমার কাছে খাবে।" সাধু ঠিকানা দিলেন লিখে।

বালক সন্তুষ্ট কৌতূহলী মনে শহরের দিকে গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখল, সোনারূপার এক প্রকাণ্ড দোকান আলোয় ঝলমল করছে, ঠিকানাটা সেই দোকানেরই ছিল।

অতিশয় দ্বিধাভরে সে দোকানে ঢুকল। মুনীমজী (কর্মচারী) জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি, কি চাই ?" সে সাধুর লেখা ঠিকানা আর চুনীটি দিল তাঁর হাতে। চুনী কর্মচারীর হাত থেকে গেল ছোট মনিবের হাতে, তারপর বড় মনিবের হাতে, খোদ কর্তার হাতে।

বালকের ডাক পড়ল, গদির ওপরে কর্তাদের কাছে।

ধুলোমাখা পা, শুকনো মুখে সে গিয়ে দাঁড়াল। কর্তা জহুরী জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তোমায় এটা দিলেন, এ কি করে পেয়েছ ? কি চাই তোমার ?" সে সাধুর কাছে পেয়েছে বললে। কর্তা তাকে বসিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তুমি বোসো। একটু খাবার আনিয়ে দিই, খাও। আর এখন এই পাঁচটা টাকা নাও, কি দরকার কিনে নাও। তারপর আমার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে সেখানে যাব। সেখানে এর দামের কথা বলব তোমার মহারাজজীকে।"

বালক আশ্চর্য হয়ে বসে রইল, খাবার খেল। তারপর জহুরীর সময় হলে তিনি তাকে নিয়ে সাধুর আশ্রমে গেলেন। তিনি সাধুকে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ, এর দাম দেবার মত টাকা আমার কাছে এখন নেই। এতো আসল চুনী। আমরাও দেখতে পাই না সব সময়ে, অতি দুর্লভ জিনিস। আপনি অনুমতি করলে আমি অন্যত্র এর দরদাম করি।"……

কথকের গল্প বলা শেষ হয়ে যায়। বাকি যা, ভাববার সকলে ভেবে নিল। সরল লজ্জিত স্মিত আনন্দে অনেকেরই মনে হ'ল জহুরী না হলে জহর কে চিনতে পারে! অনেকের মনে হল, "বিনা সৎসঙ্গ ভাব নেহী"। যেন খানিকক্ষণের জন্য সকলেই ঐ বালকের মত হয়ে গেছে!

আর ছোটদের মনে কোন্‌খানে একটু জের টানা রইল, কবেকার জন্য দীর্ঘকাল পরে যখন সময় আসবে। হয়তো সহসা মনে পড়বে একদিন—কৈলাসের রম্য শিখরে বসে গৌরীর প্রশ্নের কথা··· কি কথা সে? মনে পড়বে ছেলেবেলার কবে শোনা গান,—

"কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চনকায়া
আর তো রবে না।

দিন যাবে দিন রবে না তো, কি হবে তোর তবে ?
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে !
সাধ কখনো মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ।
বেলাবেলি চলরে চলি সাধি আপন কাজ।

* * * *

আপন রতন বেছে নে চল্ হরি বলে ডাকি।"

(—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

রামেশ্বরম্‌" তীর্থ-সৈকতে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

স্রোতের শীর্ষে শ্বেত পরী নাচে নীল অঞ্চল তুলে,
সাগরের ডাকে কার মিলনের মালাখানি নিল হাতে ?
ছুটে আসে হেথা শীকরসিক্ত নৈশ সুরভি বায়ে
বালু-বলয়িত পাষাণেতে গাঁথা প্রাচীন বটের গায়ে !
জ্যোছনার ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে রামেশ্বরের কূলে।
পূর্ণিমারাতে খেলা করে চাঁদ নীল আকাশের সাথে !
অদূরে দেউলে রামনাথস্বামী শৃঙ্গার বেশ পরি
দীপ জেলে চলে অভিসারে হোথা দেবদাসী বিভাবরী।

পাতাল-প্রান্তে মণিকুট্টিমে রত্নপ্রদীপ-শিখা
অহরহ রাজে ঃ মন্ত্রমুখর অর্চনা সুমধুর।
করে নীরাজন নাগকন্যারা আলোকের শতদলে,
মুক্তা-বিছানো আয়তনে কার কৌস্তুভমণি জ্বলে !
অনন্তদেব হয়তো এখনো সেথায় তন্দ্রাতুর,
সিন্ধুগর্ভে প্রবালশয্যা পেতেছে কি সাগরিকা ?
ভূমি ও ভূমার রসচেতনায় মায়াতীত মন মাঝে,
ওঠে অবিরাম ওঙ্কারধ্বনি, সুরসপ্তক বাজে।

জলের দোলায় ঝিনুকের তরী দুলে দুলে চলে দূরে,
ঝিক্‌মিক্‌ করে পালগুলি, আর ফেনার ফুলেরা হাসে।
স্বপন-সরণী হোতে বাঁশী বাজে সীমাহীন পারাবারে,
এক হয়ে যায় সিন্ধু আকাশ—বাহু তুলে ডাকে কারে?
শীতকিরণের পরিক্রমায় তারা যায় ঘুরে ঘুরে !
আলোকবর্ষ পথ দিয়ে মহাজ্যোতি-তরঙ্গ আসে।
গগনগুহায় অলকানন্দা কার তপস্যা করে ?
রূপের ঘরের দ্বার খুলে কে গো গেল অরূপের ঘরে ?

শ্যামঘনরূপে ভগবান নেমে এসেছিল বেলাভূমে !
সীতার বিরহ-বেদনামথিত বিলাপের ধ্বনি লয়ে,
বঙ্গসাগর করে গর্জন গন্ধমাদন সনে।
রামনাথস্বামী দিল দেখা তারে অশ্রুবাদল ক্ষণে,
জীবনদেবতা যুগদেবতারে কত কথা গেল ক'য়ে !
হাজার হাজার বছর হেথায় পড়ে আছে মহাঘুমে।
যে লীলালোকের প্রাণযাত্রায় হোলো সেতুবন্ধন,
কালের আঘাতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়,—কেন
ওঠে ক্রন্দন !

সোনার লঙ্কা-সমাধিক্ষেত্র সিন্ধু লুকায়ে রেখে
রামায়ণীধারা বহিতেছে সদা রামনাদ দ্বীপে বুঝি !
শিবসুন্দর ভাব-বিহ্বল ভস্ম ললাটে এঁকে ;
কার চরণের চিহ্নগুলিরে উপলখণ্ডে খুঁজি !
মহাকরুণার প্রবাহে গলিয়া পড়িছে শৈলশিলা,
কত না ভক্ত ভগবানে হেথা চলেছে নিত্য লীলা !

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ধারা

স্বামী জগন্নাথানন্দ

মানবজাতির যত সমস্যা আছে তাহার মধ্যে শিক্ষাসমস্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক, শিক্ষার উপরেই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, সমস্ত সমস্যারই শিক্ষাদ্বারা সমাধান হওয়া সম্ভব। জাতির মূল ভিত্তি শিক্ষা। উন্নত সমাজের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবহমানকাল হইতে ভারতে উচ্চ সংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকায় কখনও কখনও প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেও এই ভারতীয় জাতি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনকালে ঋষিরা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়, "শিক্ষাং ব্যাখ্যা-

স্থানঃ, বর্ণঃ স্বরঃ, মাত্রা বলম্ সাম-সন্তানঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, শিক্ষা দিবার সময় নির্ভুল ভাবে স্বরমাত্রার সহিত শিক্ষা দিবে।

অন্তরের চিন্তাশক্তির বিকাশ অথবা সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করাই শিক্ষা। যেমন বীজ রোপণ করিলেই হয় না, উহাতে জল, হাওয়া, সার ও আলোর প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের বাল্যাবস্থায় যে চিন্তা-শক্তি সুপ্ত বা অপ্রকাশিত থাকে, পিতা মাতা ও শিক্ষকের সহায়তায় উহা বিকশিত হয়। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উপরেই চিন্তাশক্তির বিকাশ নির্ভর করে। তাহার জন্য লালন-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তানদের যাবতীয় উন্নতি যাঁহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে, ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য পালন করা উচিত।

প্রাচীনকালে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। গৃহের অভিভাবকেরা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সন্তান-দিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেন। বংশে কেহ মূর্খ বা অশিক্ষিত হইয়া থাকে ইহা তাঁহারা কখনও সহ্য করিতেন না। হয় অভিভাবকেরা নিজে সন্তান-দিগকে শিক্ষা দিতেন অথবা তাহাদিগকে গুরুগৃহে পাঠাইতেন। পঞ্চম বর্ষ হইলেই বালকদের বিদ্যারম্ভ হইত, তাহার পরে নবম বা একাদশ বর্ষ হইলেই তাহাদিগকে গুরুগৃহে যাইতে হইত। ছান্দোগ্যো-পনিষদে বর্ণিত আছে :—শ্বেতকেতুর পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া পিতা উদ্দালক বলিলেন, বৎস! এখনও তুমি পড়ায় মন দিতেছ না, তোমার উপনয়নের সময় হইয়া গিয়াছে, তোমার এ সময় ব্রহ্মচর্য গ্রহণ ও বেদ অধ্যয়ন করা উচিত।

কিশোর বয়সেই গুরুকুলে বাস করিতে হয়, তৎ-সঙ্গে পরমাত্মার অর্চনা ও আরাধনা করিলে অন্তরের আবিলতা দুর্বলতা দূর হইয়া পূর্ণ শক্তি বিকশিত হয়। বাল্যকালই উপযুক্ত সময়, বাল্যকালে যাহারা শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে অবহেলা করে তাহাদের জীবন দুর্বহ হইয়া পড়ে। শেষ জীবনেও তাহারা শান্তি পায় না। কিশোর বয়সেই মন সম্পূর্ণ নির্মল থাকে। বাহ্যিক বিষয়েও বিক্ষিপ্ত হয় না। সেইজন্য বালক যাহা শুনে, যাহা দেখে, যাহা শিক্ষা করে তাহা হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় শক্তির অপচয় না হওয়ায় পরিপূর্ণভাবে বিকাশোন্মুখী হইয়া থাকে। কচি বাঁশকে বাঁকা করিলে বাঁকা হয় কিন্তু পাকা বাঁশকে বাঁকা করিতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়।

প্রাচীনকালে পিতা বা অভিভাবক সন্তানদের শিক্ষা-বিষয়ে কখনও অবহেলা করিতেন না। সেকালের শিক্ষা অভিনব ছিল। গুরুগৃহে থাকা-কালীন ছাত্রদের অতি কঠোরতার মধ্য দিয়া দিন কাটাইতে হইত। নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইত। এইরূপ শিক্ষার প্রচার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। স্থানে স্থানে ইহা আপনা আপনি আচার্যদের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বেদের অধিকাংশ ভাগ লুপ্ত, তথাপি বর্তমানে যাহা পাওয়া যায় উহা হইতে জানা যায় যে, আচার্যদের কি সরল ব্যবহার, কি তাহাদের পবিত্র জীবন! কি অদ্ভুত তাহাদের কর্তব্যনিষ্ঠা! কি অপূর্ব তাহাদের নিঃস্বার্থপরতা! সেইজন্য গুরুর পবিত্র চরিত্রের প্রভাব ছাত্রদের উপর প্রভাবিত না হইয়া পারিত না। সেকালে গুরুগৃহে বাসকারী ছাত্রদিগকে শিক্ষকেরা পুত্রের মত স্নেহ করিতেন এবং কঠোর শাসনও করিতেন। ছাত্রদের সহিত গুরুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইহার ফলে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ ঘটিত।

আচার্যেরা বাল্যশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শিক্ষাই দিতেন কিন্তু বিশেষভাবে ছাত্রদের উন্নতি সাধন করাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। ঋষিরা ইহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, ছাত্রদের চরিত্রের উৎকর্ষ এবং সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করাই প্রকৃত শিক্ষা। ছাত্রদের হৃদয়ের প্রসারণ, সত্যনিষ্ঠা, নিয়ম, শৃঙ্খলা, আজ্ঞা-বহতা, শ্রদ্ধা, সংযম প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ

করাই প্রকৃত শিক্ষা। আচার্যেরা সেই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় ছাত্রগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহৎ হইয়া উঠিত। গুরুর আদর্শ জীবন যাপন করা দেখিয়া তাহারা অনুপ্রাণিত হইত। ছাত্রদের সৎগুণই পরীক্ষার মূল বিষয় ছিল। যে পর্যন্ত তাহারা উচ্চ আদর্শের পরিচয় না দিত, সে পর্যন্ত গৃহে যাওয়ার অনুমতি পাইত না। উপমন্যু, সত্যকাম, উপকোশল প্রভৃতি ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধা, সত্য-নিষ্ঠা, সেবা, আজ্ঞাবহতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গুরুগৃহে উপনয়ন হইবার পর বেশভূষাও পরিবর্তন করিতে হইত। মেখলা, অজিন, এবং ছিটের কাপড় পরিতে হইত। পাঠ সমাপ্ত হইবার পরে গৃহে যাওয়ার সময় আচার্যেরা ছাত্রদিগকে কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেন—"ছাত্রবৃন্দ, তোমরা বর্তমানে গৃহস্থাশ্রমে যাইতেছ, এখানে এতকাল যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা কখনও ভুলিবে না। পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে তোমাদের উপরে গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িল। সকল আশ্রম তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরাই দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বলকারী। তোমরা কখনও অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইতে বিরত হইবে না। তোমরা যাহা এখান হইতে শিক্ষা করিয়াছ অপরকে উহা শিক্ষা দিবে। কখনও সত্যভ্রষ্ট হইবে না। সর্বদা সত্য কথা বলিবে। কখনও ধর্ম-কর্ম হইতে বিরত হইবে না। সর্বদা জনহিতকর কর্মে ব্যাপৃত থাকিবে। কখনও নিন্দনীয় কর্ম আচরণ করিবে না। পিতা, মাতা, আচার্য প্রভৃতির সেবা পূজা করিবে, ইত্যাদি।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্)

এইরূপ উচ্চাদর্শে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজকাল যেমন নানা বিদ্যার অনুশীলন হয়, তদ্রূপ সেকালেও নানা বিদ্যার অনুশীলন হইত। শত শত পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের দ্বারা সভা পরিপূর্ণ থাকিত। দেশ দেশান্তর হইতে আগত ছাত্রদের পরীক্ষা হইত। উপনিষদে বহু রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—রাজা জনক, প্রবাহণ, অজাত-শত্রু, কেকয় প্রভৃতি। ইঁহারা আর্য সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিলেন। সেকালে কুরু, পাঞ্চাল, বিদেহ প্রভৃতি দেশ বিদ্যাপীঠ ও বিদ্বন্মণ্ডলীদের বাসস্থান ছিল। পূর্বোক্ত রাজন্যবর্গ সভাসমিতি আহ্বান করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিতেন। উক্ত পরিষদে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা হইত। উচ্চ আলোচনা হইতে লোকেরা প্রেরণা লাভ করিয়া ঐ আদর্শগুলি নিজজীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন।

আজকাল আমরা তো খুব সভ্যজাতি হইয়াছি, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীও অভিনব। পুরাকালের লোকেরা এত বিজ্ঞান জানিত না ইত্যাদি বলিয়া আমরা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। ইহা সত্য কথা যে, মুহূর্তের মধ্যে নিরীহ নিরপরাধ সহস্র সহস্র লোকদিগকে বিনাশ করিবার জন্য, সংস্কৃতি শিল্প ও সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহারা এমন মারণাস্ত্র, পরমাণু-বোমা বা হাইড্রোজেন-বোমা তৈয়ার করেন নাই বা করিতে জানিতেন না। ইহাকে যদি সভ্যতা বলিয়া মনে করেন তো করুন। সেকালে কি কি বিদ্যার চর্চা হইত তাহার বিবরণ "নারদ ও সনৎকুমার সংবাদ" হইতে পাওয়া যায়। সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি কি বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছ তাহা বল।" তদুত্তরে নারদ বলিলেন—চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, খনিজশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, প্রেতবিষয়ক বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, গণিত, ফলিত জ্যোতিষ, নৃত্য, গীত, শিল্প প্রভৃতি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি।" ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পূর্বোক্ত বিদ্যা তখন পঠিত হইত।

এই আদর্শ শিক্ষার ফলে রাজ্যে কিরূপ ধর্মাচরণ করিয়া লোকে সুখী ছিলেন তাহার বর্ণনা উপনিষদ্ হইতে পাওয়া যায়।—রাজা অশ্বপতি সমাগত

সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ঋষিদিগকে বলিয়াছিলেন, —মহাত্মন্! আমার রাজ্যে কোন চোর ডাকাত নাই। এই রাজ্যে ধনবান হইয়া অদাতা বা কৃপণ কেহ নাই। এ রাজ্যে মদ্যপায়ী কেহ নাই। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না এইরূপ যজ্ঞহীন ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন না। এই রাজ্যে অশিক্ষিত কেহ নাই, সকলেই বর্ণাশ্রম-ধর্মপরায়ণ। এই রাজ্যে লম্পট বা ব্যভিচারী কেহ নাই, অতএব অসতীই বা কোথা হইতে আসিবে? "ন মে স্তেনো জনপদে, ন কদর্যো ন মদ্যপো নাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী, স্বৈরিণী কুতঃ?"

প্রাচীন বৈদিক যুগে যে কেবল পুরুষরাই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। আর্য নারীরাও সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, স্বদেশপ্রীতি, সাহস, সেবা ও ধর্ম অতুলনীয় ছিল। পতিসেবায়, ধর্মানুষ্ঠানে শিক্ষা ও দীক্ষায়, সন্তানপ্রতিপালনে, গৃহকর্মে, সর্ববিষয়ে তাঁহারা নিপুণা ছিলেন। পিতৃগৃহে থাকাকালীন কন্যা শিক্ষা লাভ করিত। সর্ব বিদ্যায় পারদর্শিনী হইবার পর অধিক বয়সে তাহাদের বিবাহ হইত। পতিগৃহে তাঁহারা শ্বশুর, শাশুড়ী, পতি প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সেবা করিয়া মুগ্ধ করিতেন এবং সকলের স্নেহভাজন হইতেন। মহীয়সী মহিলাদের রচিত অনেকগুলি বেদের সূক্ত রহিয়াছে। বিশ্ববারা, অপালা, শশ্বতী, ইন্দ্রাণী, ঘোষা, সূর্যা, বাব্, গোধা, লোপামুদ্রা, অদিতি, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে কেহ মাতাপিতার উপর ভক্তিপরায়ণা, কেহ ব্রহ্মবাদিনী, কেহ পতিপরায়ণা, কেহ বা তাপসী কেহ বা অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারিণী ছিলেন। হিন্দুদের বিবাহের মন্ত্র তাঁহারাই রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বলিতে গেলে রমণীরাই রমণীদের বিধি-নিয়মের রচয়িত্রী।

এতদ্ব্যতীত মহাভারতীয় যুগে বিখ্যাত আচার্যদের পরিচয় পাওয়া যায়। নৈমিষারণ্যে শাস্ত্র-ব্যাখ্যান-রত শৌনক—জনমেজয়-সভায় বৈশম্পায়ন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি অধ্যাপকেরা বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করিয়া লোকদিগকে প্রেরণা দিতেন। এক এক সভা দ্বাদশবর্ষব্যাপী চলিত। সেখানে যজ্ঞ, দান ও ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান হইত; সহস্র সহস্র লোক সেখানে সমবেত হইয়া ধর্মকথা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন।

বৌদ্ধযুগেও শিক্ষার প্রসারতা কম ছিল না। বুদ্ধদেব যে অহিংসা, মৈত্রী, করুণা প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন উহা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগকে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের যুগ বলা চলে। তাঁহার ধর্মে অস্পৃশ্যতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র না থাকায় এবং নীতি-মূলক হওয়ায় উহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে গৃহীত হইয়াছিল। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় উহা রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ গৃহস্থ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সমবেত চেষ্টায় সর্বত্র শিক্ষাবিস্তার হইয়াছিল। নালন্দা ও তক্ষশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ছাত্রেরা আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অধীনে বালকেরা শিক্ষালাভ করিত। বর্তমানে সিংহল ও বার্মাতে ঐরূপ প্রথা দেখা যায়। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং ভারতে আসিয়াছিলেন ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে। সেকালে কিরূপ শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন ছিল, কিরূপ প্রণালীতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত, ভারতের সর্বত্র শিক্ষার কিরূপ প্রসার ছিল তাহা তিনি তাঁহার বিবরণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পরে ইসলাম-রাষ্ট্র হইল। আকবর

প্রভৃতি উদারপন্থী ছিলেন। তিনি হিন্দুদের শিক্ষা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই পরন্তু তিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিতেন। সেজন্ত স্থানে স্থানে টোল চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত-শিক্ষা অবাধে চলিয়াছিল।

বর্তমান যুগে ইংরেজ জাতি ভারতে আসিলেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিলেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি স্কুলকলেজে শিক্ষা দিলেন। এই জড়বিজ্ঞানের চমৎকারিতা, নূতন নূতন কলকব্জা, নূতন নূতন ভোগ-উপকরণ—ইহা আশুফলপ্রদ ভাবিয়া ভারতবাসী উহাতে আকৃষ্ট হইলেন। স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও অধিকমাত্রায় উহাতে মুগ্ধ হইয়া ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিল, আর বলিল—ভারতে যাহা কিছু প্রাচীন সংস্কৃতি, ধর্ম—এ সকল কিছু নয়, এ সমস্ত কথার কথা আজগুবী মাত্র। ইহার ফলে আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ—অকপটতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আজ্ঞাবহতা, চরিত্রবত্তা, পবিত্রতা, নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলি হারাইয়া ফেলিলাম।

আজ ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু হারানো রত্নগুলি বর্তমানেও লাভ করিতে পারে নাই। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের পক্ষে প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কুসংস্কারের মধ্যে অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে। সেই অমূল্য রত্ন বাহির করিতে হইবে; অটল অধ্যবসায় দ্বারা শিক্ষা-সমস্তার সমাধান করিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন:—কয়েকটা ডিগ্রি হাসিল করিলেই বা ভাল বক্তৃতা দিতে পারিলেই লোক শিক্ষিত হইয়া যায় না। যে শিক্ষায় মনুষ্যের চরিত্রবল, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, শ্রদ্ধা আনিয়া দেয় না সেকি শিক্ষা পদবাচ্য? শিক্ষা বলিলে যদি কতগুলি বিষয়কে জানা বুঝায়, তাহা হইলে লাইব্রেরীগুলি শ্রেষ্ঠতম সাধু আর অভিধানগুলি ঋষি। যতদিন ভারতে পুনরায় বুদ্ধদেবের হৃদয়বত্তা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্মজীবনে প্রতিফলিত না হইতেছে ততদিন আমাদের আশা নাই।

স্থানে স্থানে ইহার আলোচনা হওয়া উচিত। এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া যদি মৃত্যুকে বরণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়, কারণ একদিন না একদিন মরিতেই হইবে। পোকামাকড়ের মত না মরিয়া একটা আদর্শ নিয়া মরাই ভাল। "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

['To meet life as a powerful conqueror'—Whitman]

জীবন কণ্টকাকীর্ণ? বাধায় ভয়াল?
অন্তরে বাহিরে শত্রু? পাতিয়াছে জাল
মৃত্যু তব চতুর্দিকে? পাইয়াছ ভয়?
ঐ শোনো দৈববাণী—'ক্লৈব্যের প্রশ্রয়
দিও না, দিও না কভু।' জীবন সংগ্রাম
ক্ষমাহীন, অন্তহীন; যে চাবে আরাম,
ফেলে দেবে ধনুঃশর সেই বীর্যহীন
নিশ্চয়, নিশ্চয় জেনো হ'য়ে যাবে লীন
বিনাশের ধূলিতলে। উঠিয়া দাঁড়াও!
দেহাত্মবুদ্ধির মোহ দাও, ফেলে দাও
বাতায়ন-পথে। তুমি নহ তো শরীর।
শরীর তোমার। তুমি অনন্ত শক্তির
অধিকারী। তুমি আত্মা। শত্রু করো জয়।
আপনাতে অবিশ্বাস নয়, নয়, নয়।

অমরকণ্টক

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

আজও হয়তো এমন বহু তীর্থক্ষেত্র আছে যার নাম সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। এমনই এক তীর্থ "অমরকণ্টক"—নর্মদার উৎপত্তি-স্থান। এটি বহুপ্রাচীন তীর্থ, শুনেছি এর নাম শাস্ত্রেও নাকি পাওয়া যায়। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রটি বড়ই দুর্গম, যান-বাহনের সুবিধাও বিশেষ কিছু নেই। তাই বেশীর ভাগ সাধারণ লোকের এখানে আসা কঠিন, তবে সাধু-ফকির-সন্ন্যাসীরা দলে দলে আসেন। এই তীর্থে মৃত্যু হলে মোক্ষলাভের বাধা (কণ্টক) থাকে না, তাই ঐ নাম।

প্রায় পাঁচ বৎসর আগে, মধ্য ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করে আমাদের বাড়ীতে জনৈক অতিথি আসেন—তিন দিনের জন্য। তাঁর কাছ থেকে সেই সমস্ত তীর্থের গল্প আমরা শুনি। তার মধ্যে অমরকণ্টক একটি। এর আগে অমরকণ্টক সম্বন্ধে কিছু জানা তো দূরের কথা, এই তীর্থের নামও শুনিনি। অমরকণ্টকের বর্ণনা শুনে মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে এই তীর্থ দর্শন করার, কিন্তু তখন আমরা বিন্ধ্যপ্রদেশ থেকে এতদূরে যে, ইচ্ছা থাকলেও কাজে তা সম্ভব ছিল না। এর প্রায় পাঁচ বৎসর পর কার্যোপলক্ষে আমাদের মধ্যপ্রদেশে কুরেশিয়ায় আসতে হয়। এখান থেকে অমরকণ্টকের দূরত্ব ৯০ মাইলের মত। অবশ্য আসার সঙ্গে সঙ্গেই তীর্থদর্শন সম্ভব হলো না—হলো প্রায় নয় মাস পর। বাংলাদেশ থেকে আমাদের এক আত্মীয় বেড়াতে এলেন এখানে। তাঁকে নিয়ে আমি এবং আমার স্বামী—মোট আমরা তিনজন, আমাদের এক বন্ধুর জীপ গাড়ীতে করে, ২৩শে ডিসেম্বর, (১৯৫৫) সকাল ৬টার সময় অমরকণ্টকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ইচ্ছা, সেই দিনই ফিরে আসবো। ডিসেম্বর মাস, শীতের তীব্রতা অত্যন্ত বেশী, রাত্রে বাইরে থাকার অসুবিধা অনেক।

সাবধানে, ছুটে চলল আমাদের গাড়ী। আমরা তিন জন ছাড়াও ড্রাইভার ও তার সহকারী ছিল। সকালে আমরা কিছু না খেয়েই বেরিয়েছি—ইচ্ছা, সেখানে পৌঁছে স্নান ও পূজা সেরে খাব। আমাদের সঙ্গে নিজেদের খাবার, জল এবং মন্দিরের পূজার জন্য ফল, মিষ্টি, ফুল, মালা, সুগন্ধি ধূপ ইত্যাদি ছিল। আমরা গায়ে সাধারণ জামা-কাপড়, পুরোহাতা সোয়েটার, ওভার-কোট, তার উপর একটা করে র‍্যাপার জড়িয়েও কিছুতেই শীতের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছিলাম না। শিরায় শিরায় যেন শীত ঢুকে রক্তকে জমিয়ে দিচ্ছিল। পথের দুপাশের দৃশ্য পরিবর্তন-শীল। কখনও দেখছি মাইলের পর মাইল শুধু সরষের ক্ষেত, হলদে ফুলে ভরে আছে। আবার কোথাও উঁচু-উঁচু শাল, পিয়াল, মহুয়া, বাঁশ প্রভৃতি গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট শাল গাছের চারাগুলো জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—দূর থেকে দেখলে ঝাউ-গাছ বলে ভ্রম হয়। আবার কখনও পাশে গ্রাম পড়ছে। গরু-বাছুরগুলো জীপ দেখে আগে আগে ছুটে একটা শোভাযাত্রার সৃষ্টি করছে।

ক্রমে মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে এসে পৌঁছলাম। দু'টি শালগাছের খুঁটির সাহায্যে সীমান্ত নির্দেশ করা হয়েছে। আরম্ভ হলো বিন্ধ্যপ্রদেশ। বিন্ধ্য-প্রদেশে এসে দেখলাম যে, মধ্যপ্রদেশের রাস্তা খারাপ হলেও রাস্তা ছিল, কিন্তু এখানে কোথাও কোথাও রাস্তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চারিদিকে

কেবল ঘন বন। কিন্তু ড্রাইভার অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং এপথে বহুবার এসেছে বলে ঠিক আন্দাজ করে নিয়ে চললো। আমরা প্রায় বেলা ১০॥টা নাগাদ পেণ্ড্রাতে এসে পড়লাম। এখানের উচ্চতা দুই হাজার ফিটের কিছু বেশি।

পেণ্ড্রা একটি ছোট শহর। এখানে মধ্য-প্রদেশের সবচেয়ে বড় যক্ষ্মানিবাস আছে। ক্রমশঃ পেণ্ড্রাকেও পেছনে ফেলে চললাম। এখান থেকে অমরকণ্টকের দূরত্ব ২৮ মাইলের মত। অমর-কণ্টকের পথে ১২টি নদী অতিক্রম করতে হলো; ৬টি নদীতে কিছু জল ছিল, আর ৬টি নদী প্রায় শুকনো। নদীর মধ্যে হাঁসদেও ও শোন এই দুটির নাম জানি। নদীর উপর বাঁশের চাটাই পেতে গাড়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে। অবশ্য ওই রাস্তায় জীপ ছাড়া অন্য গাড়ী অচল। পেণ্ড্রা ছাড়িয়ে কিছুদূর আসতেই পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যেতে লাগলো।

এর প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই শুরু হলো আমাদের উচ্চতর পর্বতারোহণ। 'উচ্চতর' বলছি, তার কারণ এতক্ষণ আমরা যে পথে এসেছি বা যেখান থেকে রওনা হয়েছি, তার কোনটাই সমতলভূমি নয়; তবে এখন আরও উঁচুতে উঠতে হচ্ছে। এঁকে-বেঁকে ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের গাড়ী চলেছে। একদিকে খাড়া পাহাড়, আর একদিকে গভীর খাদ, মাঝখানে একটি গাড়ী যাওয়ার মত রাস্তা। চারিদিকেই জঙ্গল; জঙ্গলের মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে দেখছি অনেক কলাগাছ, গন্ধরাজ, শিউলি, কাঞ্চন, ফণীমনসা ইত্যাদি গাছ। ফুল বহু রকমের ফুটে ছিল, তার মধ্যে কস্‌মস্ ফুল অজস্র। কলাগাছ ও কস্‌মস্ ফুল জঙ্গলে দেখে অবাক হয়ে গেলাম; এগুলি কত যত্ন করে আমরা বাগানে লাগাই। পাহাড়ের উপর এক জায়গায় একটি ডাকবাংলা দেখলাম। শুনলাম, বন-বিভাগের অফিসাররা এলে থাকেন। ক্রমাগত চড়াই-এর পথে গাড়ী চালিয়ে ১২॥টা নাগাদ গন্তব্য স্থানের কাছে এসে পড়লাম। একটি পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই কিছুদূরে কয়েকটি মন্দির দেখা গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ী মন্দিরের ফটকের সামনে এসে থামলো।

অমরকণ্টক জায়গাটি পাহাড়ের উপরে, উচ্চতা চার হাজার ফুটের কাছাকাছি। পাহাড়ের উপরে হলেও এটা অনেকটা উপত্যকার মত, উঁচু-নীচু বিশেষ নয়। আমরা যখন ওখানে পৌছলাম, তখন মন্দির বন্ধ হতে আর বেশী দেরি নেই। তবুও ওখানের পূজারী আমাদের দেখে মন্দির খোলা রাখলেন। আমরা তাড়াতাড়ি গায়ের গরম জামা-কাপড় খুলে দিয়ে মন্দিরে ছুটলাম এবং আমাদের সহযাত্রী আত্মীয়ের কথায় কুণ্ডের হিম-শীতল জলে কোনওরকমে একটা ডুব দিয়ে উঠলাম। এখানেই নর্মদা নদীর উৎসস্থল। স্নানের পর মন্দিরে পূজা করতে গেলাম। পূজারী আমাদের সাথে এত ফুল, ফল, ধূপ ইত্যাদি দেখে খুব খুশী হলেন।

মনের আনন্দে পূজায় বসলাম। এখানে যাত্রীর হৈ-চৈ নেই, পাণ্ডার উৎপাত নেই, ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার নেই। সব ঠাকুরকে স্পর্শ করে প্রাণের আবেগে অভিভূত হয়ে পূজা শেষ করলাম। এই জায়গাটি সত্যই তপস্যা ও ধ্যান-ধারণা করার জায়গা। কত যোগী, সাধু-সন্ন্যাসী যুগ যুগ ধরে এখানে তপস্যা করেছেন—এর বাতাসে আজও তার আভাস পাওয়া যায়। সংসারের কোলাহল এখনও ঠিক এখানে পৌছায়নি। এখানে যাঁরা তীর্থ করতে আসেন, তাঁরা সঙ্গে কিছুই আনতে পারেন না—অনেক দূর থেকে এখানে আসেন বলে। আর এখানেও ঠাকুরকে ভোগ দেবার জন্য শুধু নারকেল পাওয়া যায়। কেউ পূজা দিতে চাইলে সেই নারকেল কিনে নেন এবং মন্দিরের পাথরের স্তম্ভে সেটি ভেঙে ঠাকুরকে ভোগ দেন। তাই

বোধহয় পূজারী-ঠাকুর আমাদের সঙ্গে পূজার নানাবিধ জিনিস দেখে এত খুশী হলেন। প্রায় তিন বিঘা জমিকে ১০ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে একটি লোহার ফটক বসানো, জমির সমস্তটাই উঠানের মত করে পাথর দিয়ে বাঁধানো। মাঝখানে নর্মদা-কুণ্ড। কুণ্ডটির চারপাশে ও স্নানের সুবিধার জন্য ঘাট বাঁধানো। উঠানের চারদিকে ১৩।১৪টি ছোট বড় মন্দির। কুণ্ডের মাঝেও কয়েকটি মন্দির আছে। জল কম থাকলে ঐ মন্দিরের ভেতর যাওয়া যায়। প্রধান মন্দির দুটি, নর্মদা দেবী ও ভগবতী দেবীর। নর্মদা-দেবীর মূর্তি কালো পাথরের ও ভগবতী দেবীর মূর্তি সাদা পাথরের তৈরি। দুটি মূর্তিরই গঠন অপূর্ব। ভগবতী দেবীর মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদিতে একটি ত্রিশূল পোঁতা আছে। প্রবাদ, ঐ ত্রিশূল ভগবান আচার্য শঙ্করের, ওটির নিত্যপূজা হয়। অন্যান্য মন্দিরগুলিতে শালগ্রামশিলা, শিবলিঙ্গ, ত্রিপুরাসুন্দরী, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি আছে। দেখলাম কয়েক-জন সাধু শিবমন্দিরের দরজার কাছে মৃগচর্মে বসে স্তোত্রপাঠে মগ্ন।

নর্মদা দেবীর মন্দিরের দরজার পাশে একটি পাথরের তৈরী হাতী আছে। একে সকলে 'মায়ের হাতী' বলে। হাতীটির উচ্চতা ২ ফুটের মত, পায়ের মাঝখানে ১২ ইঞ্চির মত ফাঁক আছে। যখন মেলা বসে (পৌষসংক্রান্তি, শিবরাত্রি ও বৈশাখীপূর্ণিমাতে) এদেশেরই অধিবাসীরা নর্মদা-কুণ্ডে স্নান সমাপন করে ওই হাতীটির পায়ের ফাঁকটুকুতে উপুড় হয়ে শুয়ে নিজের শরীরটিকে কোনরকমে গলিয়ে বের করে পুণ্য সঞ্চয় করেন। কোন মোটা মানুষ যদি ওইভাবে পার হতে গিয়ে আটকে যায়, তাহলে তাকে সকলে পাপী বলে। আমরা অবশ্য এইভাবে পুণ্যসঞ্চয়ের কোন চেষ্টা করিনি।

মন্দির-কম্পাউণ্ড থেকে বেরুলেই নজরে পড়ে 'গান্ধীকুণ্ড'—মাত্র ৫০ গজ দূরে অবস্থিত। এখানে নর্মদা-কুণ্ড থেকে জল ঝরে ঝরে একটি নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এখানেই গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। নালাটির পারে সিমেন্ট দিয়ে বেঁধে তার উপর একটি বেদি তৈরি করে মহাত্মাজীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। অপর পারে ছোট একটি ফুল বাগান। নালাটির উপর একটি সাঁকো তৈরি করে দুই পারেই যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে বসেই বেলা প্রায় ২টার সময় সেদিনের আহার সমাধা করলাম সকলে মিলে। একটু দূরে দক্ষিণ দিকে মন্দির-কম্পাউণ্ডের বাইরে কয়েকটি পুরাতন মন্দির দেখা যায়। যদিও ওগুলি জীর্ণ ও ভগ্ন কিন্তু শিল্পনৈপুণ্যে বর্তমান মন্দিরের চেয়েও সুন্দর। আগে এই মন্দিরগুলিতেই নাকি সব ঠাকুরের মূর্তি রাখা ছিল, এখানেই পূজা হতো। কালের করালগ্রাসে এই মন্দির নষ্ট হয়ে যাওয়াতে নূতন মন্দিরে ঠাকুরদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শুনতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরগুলি একাদশ শতাব্দীতে 'কাকচুরি' বংশের রাজারা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

উত্তর দিকে সদ্য-নির্মিত সুন্দর একটি ডাকবাংলো আছে। এখানে থাকতে হলে, নগর-উন্নয়ন বোর্ডের সেক্রেটারীর অনুমতি নিতে হয়। মন্দির থেকে অল্প দূরে, পূর্বদিকে "মায়ী-কী বাগিয়া" (মায়ের বাগান)। এখানে আপনা থেকেই এক রকমের ফুলের গাছ জন্মাতো। এই ফুল দিয়েই মায়ের নিত্যপূজা হতো। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ, যে এখানে আসতো সে-ই এই ফুলগাছ তুলে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। যাতে এই গাছের বংশ লুপ্ত না হয়ে যায় তার জন্য নগর-উন্নয়ন-বোর্ডের সেক্রেটারীর পরামর্শে এই সব গাছ 'গান্ধীকুণ্ডে'র বাগানে লাগানো হয়েছে। এ গাছ দেখতে ক্যানা গাছের মত, ফুল সাদা ক্যানা ফুলেরই মত কিন্তু খুব সুগন্ধি। সুমিষ্ট গন্ধে ভরা মায়ের পূজার

উপযুক্ত ফুলই বটে। এখানের লোকের বিশ্বাস, এই গাছ অমরকণ্টক ছাড়া অন্য কোথাও জন্মাতে পারে না। অমরকণ্টকের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার জন্য ও যথেষ্ট উর্বর সমতল ভূমি থাকার জন্য বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকার এখানে একটি ছোটখাটো শৈলনিবাস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন। এইজন্য সরকার থেকে নগর-উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই বোর্ড এখন মন্দির-পরিচালনার ভারও নিয়েছেন। বোর্ড থেকে রাস্তা-ঘাটের উন্নতিসাধন, নদীর উপর সেতুনির্মাণ ইত্যাদির চেষ্টা চলছে। ভাল রাস্তাঘাট হলে অমরকণ্টকের জনপ্রিয়তা হয়তো একদিন খুবই বাড়বে। বর্তমানে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সেন্ডল ও অনুপপুর ষ্টেশন হতে অমরকণ্টক পর্যন্ত বাস চলাচল করে, কিন্তু তা বড় অনিয়মিত।

এরপর আমরা মন্দির থেকে মাইলখানেক দূরে 'শোনমুড়া' দেখতে গেলাম (শোণের উৎপত্তিস্থল)। একটি উঁচু পাহাড়ের কোল বেয়ে ২ হাত চওড়া শোণ, পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছল্ ছল্, খল্ খল্ ঝঙ্কার দিতে দিতে ৮।১০ হাত দূরে আর একটি পাহাড়ের গা বেয়ে ৪০০ ফুট নীচে ঝরে পড়ছে। ঝরনার ধারে সাধুর একটি ছোট্ট কুটির—বনের ঘাসে পাতায় ছাওয়া, মাটি-গোবর দিয়ে ঝরঝরে করে নিকানো; সঙ্গে একটু বাগান, ২।৪টি বন-গোলাপ, গাঁদা, কয়েকটি লতানো ফুলের গাছ। কুটিরের কাছে যেতেই সাধু বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে আলাপ করলেন। একটি কৌপীন মাত্র পরা আছে। দেখে মনে হলো, এই শীতে খালি গায়ে তাঁর কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমরা একটি উঁচু পাহাড়ের উপর উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কি অপূর্ব-সুন্দর চোখ-জুড়ানো মন-মাতানো দৃশ্য! দূরে সুউচ্চ পাহাড় নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে কার ধ্যানে মগ্ন! মাঝখানে উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো ছোট ছোট পাহাড় গাছে-পাতায় ফুলে-ফুলে ভরা, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শোণ। এই শোণ নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে; পুরাণে শোণ 'হিরণ্যবাহু' নামে পরিচিত। শোণমুড়ায় বসে তপস্যা করলে হত্যাকারীরও নাকি স্বর্গলাভ হয়, কবে কে নাকি সোনালী বালি দেখে এই নদীর নাম শোণ দিয়েছিল ইত্যাদি। নিস্তব্ধ বনানীর সৌন্দর্য-সুধা পান করে আমরা অভিভূত হয়ে গেছি। যতই দেখছি, দেখার ইচ্ছা বেড়ে যাচ্ছে, মন চাইছে না এই অপরূপের রাজ্য ছেড়ে যেতে, তবুও যেতে হবে।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা সুমিষ্ট গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কি ফুলের গন্ধ অনুসন্ধান করে এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছি, হঠাৎ নজর পড়ল পিছনের নালাটির দিকে। নালার একপাশ জুড়ে অজস্র চেরী ফুলের গাছ, তারই সুগন্ধে স্থানটি ভরপুর। একটি শুকনো গাছের ডাল ভেঙে তারই সাহায্যে চেরীর একটি চারা বহুকষ্টে তুলে নিলাম, বিরাটের বাগান থেকে আমার ক্ষুদ্র বাগানের জন্য। ক্যামেরা হাতে নিয়ে কয়েকটি ছবি তোলার কাজে মন দিলাম। সুমুখে ঝুঁকে, পেছনে সরে, এপাশে ঘুরে, ওপাশে ফিরে, চঞ্চল হয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করছি; নজর পড়লো সাধুটির দিকে। দেখি, তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন, হয়তো ভাবছেন, মানুষের তৈরী যন্ত্রে কেন বৃথা চেষ্টা করছি এই বিরাট রূপের ছবি নেবার! সহযাত্রী আত্মীয় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই নির্জনে একা একা কি ক'রে সাধুটি আছেন? কোথাও জনপ্রাণী নেই, রাত্রিবেলা ভয় করে না? বললাম, সংসারে কোলাহল-শূন্য এই তো ধ্যান-ভজনের উপযুক্ত জায়গা। আর যিনি সব ত্যাগ করে অভয়দাতা ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁর আর ভয় কি? পাহাড়ের উপর থেকে আর একবার মুগ্ধ চোখে চারিদিক চেয়ে দেখে নিলাম; তারপর কবিগুরুর—

তোমার বিশাল বিপুল ভুবন
করেছে আমার নয়ন-লোভন,
নদী, গিরি, বন সরস শোভন
তুমিই ধন্য ধন্য হে।—

গানটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে গাড়ীতে এসে বসলাম।

এবার আমাদের 'কপিলধারা' যেতে হবে। মন্দিরের পাশ দিয়েই রাস্তা। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী মন্দিরের কাছে থেমে গেল। স্মিতমুখে পূজারী আমাদের আহ্বান জানালেন এবং মন্দির খুলে দিলেন। মন্দিরে ঢুকে মায়ের পায়ে গড়াগড়ি দিয়ে শেষবারের মত প্রণাম করলাম। আর কখনও আসা হবে না। কত দিনের ইচ্ছা আজ পূর্ণ হয়ে গেল। মন্দিরে প্রণামী ও পূজারীকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। গাড়ী চললো কপিলধারার দিকে। এখান থেকে কপিলধারা ৬ মাইল। আমাদের বাঁ পাশ দিয়ে নর্মদা নীল জলে পরিপূর্ণ হয়ে ছুটে চলেছে কপিলধারায়। ছু'জায়গায় আমাদের পার হতে হল নর্মদাজীকে। গাড়ী এসে থামলো ঝরনা থেকে একটু দূরে। এখান থেকেই গর্জন শোনা যাচ্ছে ঝরনার। আমরা এগিয়ে গেলাম। দুপাশে খাড়া পাহাড় প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে গিরিখাত। ছু'ধারায় ভাগ হয়ে সগর্জনে দেড়শ' ফুট উঁচু থেকে গিরিখাতে ঝরে পড়ছে নর্মদা। আর জলকণা ছিটিয়ে সমস্ত জায়গাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। কস্‌মস্‌, গাঁদা আরও নানারকমের মরশুমী ফুলের সমারোহ। শুষ্ক বনস্থলী সবুজের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা। অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলোয় ঝরনার জলে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে। গাছে পাতায় আকাশে সর্বত্রই রঙের খেলা। কি অপরূপ শোভা, তুলনাহীন রূপ, বর্ণনা দিয়ে বোঝাবার নয়!

চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখি, আর মনে ছবি এঁকে নিই। খাড়া পাহাড়, আঁধার গিরিখাত, নিবিড় বনস্থলী, ক্রুদ্ধ ঝরনা সব মিলিয়ে যেন গুরু-গম্ভীর রূপ। এখানেও পাহাড়ের গায়ে সাধুর একটি কুটির, গোটা তিনেক বেল গাছ, প্রচুর বেল ধরে রয়েছে। তারই নীচে মাটির বেদীর উপর পাঁচজন সাধু বসে আছেন। একজন প্রবীণ সাধু বোধহয় কোনও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। অপেক্ষা-কৃত অল্পবয়স্ক চারজন সাধু বসে শুনছেন। আর একটি সাধু ঝরনায় জল নিতে এসেছেন। আমাদের সহযাত্রী এই সাধুটির সাথে আলাপ জমিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাধুদের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, অন্যান্য সাধুরাও উঠে দাঁড়িয়ে তা'কে ঘিরে আলাপ জমিয়েছেন। আমার কারোও সাথে কথা কইবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। 'কপিলধারা'র রূপ মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখছিলাম, আর এক অপার্থিব আনন্দে মন ভরে উঠছিল। শোনা যায়, মহামুনি কপিল এখানে বহুদিন তপস্যা করেছিলেন, তাই এর নাম 'কপিলধারা'। সমস্ত পাহাড় জুড়ে যেন একটি তপোভূমি। আমার মনে শত সহস্র বৎসরের ছবি ভেসে উঠছিল, জনকোলাহলশূন্য নির্জন আরণ্য প্রকৃতি, পুণ্যতোয়া পবিত্র নর্মদা, তারই মাঝে মাঝে প্রাচীন যোগী, ঋষি, তপস্বীর দল, কেউ বা গাছ-তলায় পাহাড়ের গুহায়, কুটিরে বা কেউ ভগবানের ধ্যানে-উপাসনায় মগ্ন। চারিদিকে অপূর্ব প্রশান্তি; চাইবার কিছু নাই, পাবারও নাই কিছু। সব ত্যাগ করে সব পাওয়া—ভগবানই সর্বস্ব। হঠাৎ সহযাত্রীর ডাকে চমকে উঠলাম,—"যাবে না এবার?" "হ্যাঁ চলুন"।

ধীরে ধীরে সকলে মিলে গাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম। আমার সহযাত্রী নর্মদা থেকে একঘটি জল ডুবিয়ে নিলেন। এইটুকু সঙ্গে নিয়ে যাব, আর যা কিছু তা' মনে মনে সঞ্চিত থাকবে। তীর্থক্ষেত্রের পরশে পরিপূর্ণ হয়ে চলেছি, অব্যক্ত

আনন্দ সকলেরই প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে। গাড়ীর কাছে এসে আবার আমরা পূর্বসাজে সজ্জিত হয়ে নিলাম। ওভার কোট, তার উপর র‍্যাপার জড়িয়ে কান, গলা, হাত ভালভাবে ঢেকে নিলাম। গাড়ী চললো, পিছনে ফেলে যাচ্ছি অমরকণ্টককে। দুর্গম যাত্রা একদিন হয়তো সহজ হয়ে যাবে, শহর হবে অমরকণ্টক, শত শত বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করবে, রেডিওর গানে মুখরিত হবে দশদিক, নর্মদার উপর বাঁধ বেঁধে কলের জলের ব্যবস্থা হবে; কিন্তু সেদিন কি এমনি করে ভক্তপ্রাণে সাড়া জাগাবে অমরকণ্টকের ডাক? কপিলধারা থেকে মাইল তিনেক এসে রাস্তার উপর আমাদের গাড়ী থেমে গেল। এখান থেকে উৎরাই পথে বনের ভিতর দিয়ে মাইল খানেক গেলে "কবীর চবুতারা।" প্রবাদ আছে, মহাত্মা কবীর নাকি তাঁর প্রধান শিষ্য ধর্মদাস ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে সাধন-ভজনে বহুদিন অতিবাহিত করেছিলেন এখানে। তারই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গভীর বনের মাঝে প'ড়ে আছে এই চত্বরটি। গাড়ী আমাদের নিয়ে ছুটে চলেছে, পথ পূর্ববর্ণিত। পেণ্ড্রাকে ছাড়িয়ে গেলাম। ক্রমশঃ রাত্রি হয়ে এল। রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে প্রায়ই আমাদের পথ ভুল হতে লাগলো। পথ হারিয়ে গভীর বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকে যায়, আবার বহু পরিশ্রমে যত্নে তাকে বের করা হয়। সমস্ত শরীর ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। শীতে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছি। হঠাৎ রাত্রি ৯টার সময় বনের মাঝে 'ক্যাঁচ' শব্দ করে গাড়ী থেমে গেল। কিছুতেই আর নড়ানো গেলো না তাকে। ড্রাইভার বললো, "বিগড় গয়া।" আমরা তো শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। বেচারা ড্রাইভার ও তার সহকারী এই শীতের রাত্রে গাড়ী থেকে নেমে, কলকব্জা মেরামত করতে লেগে গেল টর্চ জেলে। আকাশে দশমীর চাঁদ, তারই আলোয় নিস্তব্ধ বনভূমি আলোকিত। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক নূপুর-ধ্বনির মত শোনাচ্ছে। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজে, বিকট একটি গর্জনে বনস্থল কেঁপে উঠল। বাঘের ডাক মনে হল। ড্রাইভার ও তার সহকারী নীচে বসে কাজ করছিল। পরস্পর ভয় বিহ্বল চোখে তাকাচ্ছে। আমার স্বামী এবং আত্মীয়টি, একজন রিভলভার ও অন্যজন লাঠি নিয়ে তৈরী হলেন। সৌভাগ্যক্রমে গর্জন দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে গেল। আবার গাড়ী ঠিক হল। চলতে শুরু করলো। চলার যেন শেষ হচ্ছে না। একঘণ্টা সময় মনে হয় যেন কতদিন ধরে চলেছি। উঁচু-নীচু, চড়াই-উৎরাই, নালা, নদী, কাঁটাঝোপ তারই মধ্য দিয়ে গাড়ী ঝাঁকানি দিতে দিতে কোনওরকমে চলেছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা ধরে গেছে, ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। রাত ১২॥টার সময় আমরা নিজেদের আস্তানায় এসে পৌঁছলাম। অজ্ঞাতে স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। প্রণাম জানালাম নর্মদা মায়ের উদ্দেশ্যে।

কৈলাসের দীক্ষা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

সংসারী কৈলাস,
ইষ্টগুরু অনুরোধে স্তোক-বাক্যে করে অভিলাষ,
দীক্ষা লবে একদিন।
বলে, "প্রভু, পদধূলি দিন,—
কেটে যাক্ সংসারের যেটুকু ঝঞ্চাট;
আরম্ভিব জীবনের পরমার্থ-পাঠ।
জমি-জমা কিছু আছে,
কি গোপন তব কাছে?—

যাতে এ সংসার চলে কোনোক্রমে অতি কায়-ক্লেশে,
সেগুলি দেখিতে হয়, নতুবা যে শেষে
শিকায় উঠিবে হাঁড়ি ! সে তো ঠিক নয়
দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষা-বৃত্তি, হইলে সময়
করিব একান্ত চিত্তে দীক্ষা-মন্ত্র-পাঠ।"
গুরু কন,—"তবে তাই, মিটাও ঝঞ্চাট।"
কৈলাস হাসিয়া কহে,—"বেশী দিন নয়,
শুধু হ'লে হয়,
বড় ছেলে সাবালক,—
একটু সে মাথা-ধরা হোক,
জমি-জমা বুঝে নিক্, রবে না জঞ্জাল,
খানিকটা কেটে যাবে সংসারের জাল।"

কালে ছেলে বড় হয়। গুরুদেব আসি,
কৈলাসেরে দীক্ষা নিতে ক'ন মৃদু হাসি।
কৈলাস কহিল,—"প্রভু, আছে মোর হুঁশ—
কিন্তু হায়, বড় ছেলে বড় হ'ল, হ'ল না মানুষ,
কাজেই মধ্যম পুত্রে করেছি নির্ভর,
সে যদি মানুষ হয়, ছেড়ে দিয়ে সবি তার'পর
চ'লে যাব, সংসারের ছেদিয়া বন্ধন,
দীক্ষা নিয়ে আরম্ভিব ইষ্ট-আরাধন।
আর—দিন ব'য়ে যায়,—
পড়িয়াছি শৈশবেলায়,
'আয়ু যেন পদ্মপত্র-নীর'—
তাই প্রভু, করিয়াছি স্থির,—
একটু গুছায়ে নিয়ে, শুরু করি ইষ্ট-মন্ত্র পাঠ।"
হাসি গুরু যান কহি,—"আচ্ছা তবে মিটুক ঝঞ্চাট।"

এইরূপে কৈলাসের চারি পুত্র আর কন্যা চারি
নাবালক-নাবালিকা সীমা দিয়ে পাড়ি,
বাড়াইল বিবাট সংসার।
তবু তার পিপাসার
নাহি অন্ত কভু হ'ল। জমি-জমা সংসারের পাট
না হইতে অবশেষ, শেষ হ'ল জীবনের নাট।

একদা গুরুর দেখা। জ্যেষ্ঠপুত্র আসি কাঁদি কয়,—
"পিতার হয়েছে কাল—এই বর্ষ কয়।"
গুরু ক'ন, "জানি তাহা—পিতার সে জমি-জমা
ঠিক রেখো, যেন নাহি হয় হাজা-কমা।"
পুত্র কয়, "বিলক্ষণ, কিনিয়াছি যে বলদ-জোড়া,
একটি তাহার প্রভু, গরু নয়, যেন টাট্টু ঘোড়া।"
"কেমন ?" —কহেন প্রভু। পুত্র কহে,—"কি
কহিব আর—
লাঙ্গুলটা মলিবার
দেয় নাক অবসর, উচ্চ-পুচ্ছ ছুটে যায় ক্ষেতে,
অশ্রান্ত লাঙ্গল টানে,—পেট পুরে না দিলেও খেতে।
ওই থেকে ফলিতেছে সোনার ফসল,
আপনার আশীর্বাদে।" গুরুদেব রহি অচঞ্চল,
বলদের কাছে যান। উঠে শিঙ নাড়ি
তেজীয়ান্ সে বলদ। প্রভু মন্ত্র ঝাড়ি
ক'ন "তিষ্ঠ।" —গায়ে দিতে হাত
বলদ কৈলাস-কণ্ঠে কহে,—"প্রণিপাত
করি গুরুদেব ! ছেলেগুলো সব
নেহাৎ আনাড়ী, তাই হ'ল না সম্ভব
গত জন্মে দীক্ষা-লাভ। গো-জন্ম নিয়েছি তাই,
নিজে করি চাষাবাদ, মনোমত ফসল ফলাই।
এ জন্ম করিয়া শেষ, মিটাইয়া আকাঙ্ক্ষা ঝঞ্চাট,
ঠিক তব পদপ্রান্তে শান্ত মনে ল'ব মন্ত্র-পাঠ।"
গুরু ক'ন,—"আচ্ছা বেশ, ততদিন রব প্রতীক্ষায়।"
এই ভাবে দীর্ঘ দিন যায়।

প্রায় দশ বর্ষ পরে,—
কৈলাসের ঘরে
আসিয়া শুনেন গুরু,—সে বলদ নাই ;
কি হ'তে মরিয়া যেতে, আসিয়া কুকুর এক যেন
তার ঠাঁই
করিয়াছে অধিকার !
বাড়ীর সবাই তার
চীৎকারে হুহুকারে অতিষ্ঠ অস্থির।

গুরু তার কাছে যেতে নত করি শির,
লেজ নাড়ি কহে সেই কৈলাসিত সুরে—
"ছেলেগুলি চাকরিতে রহে দূরে দূরে,
তাদের সে ছেলে-পুলে কে করিবে রক্ষণাবেক্ষণ ?
আমিই পাহারা দিই, নিদ্রা নাই, যাহা পাই
করিয়া ভক্ষণ।
ক'টা দিন আর ?—বড় ছেলে পেন্‌সান্ নিয়ে
বাড়ী এলে, এই হীন জন্ম তেয়াগিয়ে
যা'ব তব সন্নিধানে।　শেষ প্রায় করেছি ঝঞ্ঝাট ;
আর নয়,—অনাহারে অনিদ্রায় দুর্বহ এ হাটের
বিভ্রাট।"
গুরু ক'ন, "তাই হোক, ফিরিছে সংবিৎ,
যথাকালে দীক্ষা হবে, ক্রমে শক্ত হয় শিক্ষা-ভিত।"

আরো নয় বর্ষ পরে,
গুরু আসি দেখা দেন শাবী শিষ্য কৈলাসের ঘরে।
কোথায় কৈলাস ?　—সে কুক্কুরও নাই।
ধ্যান নেত্রে চাহি
হেরিলেন গুরু,—চোর কুঠরির মাঝে
তীব্র বিষধর-সাজে কৈলাস বিরাজে।
গুরুদেব ক'ন,—"ত্বরা নিয়ে চল মোরে চোর-
কুঠরিতে।"
ত্রস্তভাবে সবে কয়, —"সদা তার ভিতে
কী ভীষণ গরজন !—
চামচিকা চমকায় ; ভয়ে তাই সবে কক্ষ
করেছে বর্জন।
বিষ-বাষ্প পূতিগন্ধী স্যাঁতানে সে ঘর।"
গুরু ক'ন,—"হোক্, তবু দেখিবারে চাহিছে অন্তর।"
কক্ষ-দ্বার মুক্ত যেই,—ফোঁস্ করি ছুটে আসে
সাপ,—
পলাইয়া যায় সবে বলি "বাপ—বাপ্।"
প্রকাণ্ড লগুড় আনি সহসাই কৈলাসের পুত্র একজন
মাথায় আঘাত হানি করি দিল সর্পরাজ-দর্প-
বিভঞ্জন।

মাথায় মারিতে চায়,—গুরু ক'ন,—"থাক্ থাক্,
আর কাজ নাই,
জাত-সাপ মারিও না,—দূরে কোনো ঠাঁই,—
ওই মাঠে দিয়ে এস ফেলি ওরে ত্বরা।"
গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য,—তাই হ'ল করা।

গুরু আসি মৃদু হাসি কহেন,—"কৈলাস,
মিটিল কি সংসারের আশ ?"
ভগ্ন-উরু দুর্যোধন,—কহে অজগর,—
"ওগো প্রভু করুণাসাগর,
হইয়াছে শিক্ষা শেষ।　এই কক্ষে মোর যত
গুপ্তধন আছে
লৌহ-পেটিকায় পূর্ণ, যদি কেহ পাছে
দেয় হাত,—বহু কষ্টলব্ধ সেই ধন
যদি কেহ করে আত্মসাৎ, করিবে কি অনর্থ সাধন।
আমার যে সংসারের সর্বনাশ হবে !
তাই তথা থাকি নিত্য ফোঁস্-ফোঁস্ রবে
আতঙ্কিয়া সবে, বেষ্টিয়া সে পেটিকায় করেছি রক্ষণ,
অনুদিন অনুক্ষণ তন্দ্রাহীন, বায়ুমাত্র করিয়া ভক্ষণ।
শুধু মোর সংসারের, শুধু মোর তাহাদেরি তরে
সর্পরূপে যক্ষবৃত্তি পাপচিত্তে পোষি ভ্রান্তি-ভরে।
ভাঙিল সে ভুল প্রভু, আজি বুঝিলাম—
আমার—আমার করি মিছা মজিলাম।
হায় রে, যাদের তরে জন্মে-জন্মে এত সাজ সাজা,—
তারাই　তারাই কিনা দিল সাজা— ভাঙি দিল
মাজা !
ধিক্কার এসেছে প্রাণে,—কর্মফল এখনো কি শেষ
হয় নাই ?—গুরুদেব !　কৃপালেশ
পাব কি এবার ? বাঁচিবার - জন্মিবার সাধ নাই আর।"
অতি বৃদ্ধ গুরুদেব অগ্নি জ্বালি করিলেন সর্পের
সৎকার।
কহিলেন,—"এইবার মুক্তি তব, ছিন্ন আজি
সংসারের ফাঁস,
এই জন্মে দীক্ষা তব দানিব কৈলাস !"

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব

শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা

পিতা যতই শক্তিমান্ অথবা যশস্বীই হউন না কেন, পুত্রের পক্ষে তাহার ইঙ্গিতদানও অত্যন্ত সঙ্কোচের বিষয়। একথা সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইয়াও "ইচ্ছাশক্তির প্রভাব" তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণা ব্যক্ত করিতে সসঙ্কোচে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার জীবনের কয়েকটি ঘটনার পুনরুল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি পাঠকপাঠিকাগণ ইহাতে আমার কোন অভিসন্ধি আছে বলিয়া সন্দেহ করিবেন না।

১৮৯২ সালে পিতৃদেব যখন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন তখন তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় থাকিতেন। সেই বৎসর ১৩ই মাঘ তারিখটি ব্রাহ্মসমাজের নগরসংকীর্তনের জন্য নির্ধারিত হইয়াছিল। সকালে সামাজিক উপাসনার পরে সকলে নগর সংকীর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, বেলা ১টার সময়ে কীর্তন বাহির হইবে। প্রায় বেলা ১১টার সময়ে ৩।৪টি অপরিচিত যুবক পিতৃদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, গেণ্ডারিয়া আশ্রম হইতে গোঁসাইজীর (শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর) নির্দেশানুসারে তাঁহারা পিতৃদেবের নিকট আসিয়াছেন। ব্যাপারটি এই যে, একটি নব্য উকীল আজ কয়েকদিন একটা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবলই ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিনি শয়ন করিয়া পড়িয়া আছেন, কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছেন না। এমন করিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া আছেন যে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পান করাইবার উপায় নাই। ২।৩ দিন এইরূপ নিরম্বু উপবাসে থাকায় তাঁহার শরীর এমন দুর্বল হইয়াছে যে এখন প্রকৃতপক্ষে উত্থানশক্তি আছে কিনা সন্দেহ। ডাক্তার-কবিরাজগণ কিছুই প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। কোনও দৈব প্রতিকার আছে কিনা জানিবার জন্য যুবকগণ শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিতে গিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু পিতৃদেবের নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে যুবকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। উক্ত উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত উকীলের বিধবা মাতা ও বালিকা বধূর দুঃখের দোহাই দিয়া এই সকল কথা তাঁহারা পিতৃদেবকে বলিলেন।

তখন মাঘোৎসব তাঁহার মাথার ষোল আনা অধিকার করিয়া আছে। এই নূতন ব্যাপারটি তাঁহার মস্তিষ্করাজ্যে সহসা একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহার প্রতি কেন এইরূপ আদেশ হইল এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বা তিনি ঐ উকীলটিকে আরোগ্য দান করিবেন। যাহা হউক তিনি যুবকদিগের সঙ্গে রোগীর বাড়ীতে গেলেন। শাঁখারীবাজারে একটি বাড়ীতে দোতলার ঘরে রোগীটি মাটিতে পড়িয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে জীবিত কি মৃত ঠিক বুঝা যায় না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে রোগীর মাতা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ঢাকার বিখ্যাত পালোয়ান—ধীরচরিত্র, পার্শ্বনাথ (পরেশ বাবু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উকীল বাবুর বিশেষ বন্ধু। পিতৃদেব কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন যে চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিবেন এবং সে অবস্থায় যাহা মনে উদিত হইবে তাহাই গুরুদেবের ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লইবেন। তিনি পরেশবাবু এবং তাঁহার সঙ্গের

যুবকগণকে বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই বাহিরে গেলেন। পিতৃদেব তখন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া রোগীর নিকটে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নিজের শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় একটা শক্তি তিনি অনুভব করিলেন। উহা তাঁহার শরীর ও মনে এমনই বলের সঞ্চার করিল যে, তাঁহার মনে হইতেছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলেই এই রোগীকে নীরোগ করিতে পারিবেন। তৎক্ষণাৎ তিনি রোগীর একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলেন। রোগী চক্ষু মেলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে তিনি সজোরে বলিলেন, "উঠিয়া বসুন।" অমনি উকীল বাবু উঠিয়া বসিলেন। পিতৃদেব রোগীর হাত দুটি তাঁহার উভয় হস্ত দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "শান্তি, শান্তি, শান্তি।" অমনি রোগীও বলিয়া উঠিলেন, "শান্তি, শান্তি, শান্তি।" ক্রমশঃ পিতৃদেবের মনে বল অধিক হইতে অধিকতর হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "এখনই আপনাকে কিছু খাইতে হইবে।"

রোগী বলিলেন, "আপনি বলিলেই খাইব।"

পিতৃদেব দরজা খুলিয়া সকলকে ডাকিলেন। অন্তরাল হইতে ইঁহারা তাঁহাদের পরস্পরের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। দরজা খোলা হইলে পরেশবাবু ও রোগীর মাতা সবেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের তখনকার মনের কৌতূহল, বিস্ময় ও মুগ্ধতা তাঁহাদের বাক্যে ও মুখশ্রীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। পিতৃদেবের আদেশক্রমে এক পোয়া হালুয়া আনান হইল এবং তাঁহার অনুরোধে রোগী এতই ব্যস্ততার সহিত উহা খাইতেছিলেন যে হালুয়া গলায় ঠেকিয়া যাইতেছিল। ভোক্তার কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি রাখার শক্তি ছিল না। তিনি জলপান করিতে বসিলেন এবং জলপান করিয়া দুই মিনিটের মধ্যে খাদ্য নিঃশেষ করিলেন। পিতৃদেবের রোগীর ঘরে প্রবেশ হইতে রোগীর আরোগ্যলাভ ও হালুয়া ভক্ষণ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হইতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে নাই। রোগীর হাতে একখানি গীতা দিয়া পিতা বলিলেন, "উহা পাঠ করিতে থাকুন। নিয়মিত রূপে আহার করুন, কথা বলুন, এবং মনে রাখুন যে আপনি আরোগ্য লাভ করিলেন।" রোগী বলিলেন, "তাহাই করিব।"

সেই হইতে পিতৃদেব এই অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি লাভ করিলেন। এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মধ্যে এই শক্তি প্রদান করিবেন বলিয়াই কৌশল করিয়া যুবকদের তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পরে পিতৃদেব ঢাকা হইতে বরিশাল যাইবার পথে তাঁহার দিদির দেশ নরোত্তমপুর গ্রামে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানেও এক অদ্ভুত ঘটনা হইল। নরোত্তমপুরের নিকটবর্তী বাগপুর গ্রামে ঈশানচন্দ্র সরকার নামক একটি ব্রাহ্মণ যুবক তিন মাসের অধিক হইতে অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। গত তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন বিশেষ চেষ্টায় অতি অল্প খাদ্যই তাহার উদরস্থ হইয়াছে, সুতরাং শরীর একেবারে কঙ্কাল। তিন মাস তাহার নিদ্রা নাই। আজ তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা জানিয়া গ্রামের স্ত্রীপুরুষ দলে দলে তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র পিতৃদেবের মধ্যে একটা তীব্র শক্তি অনুভূত হইল। উক্ত যুবকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। ঈশানকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতেন না, তথাপি তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। গিয়া দেখিলেন ঘরের দাওয়ায় একখানা তক্তাপোশের উপর রোগী পড়িয়া আছে, তাহার মুখ দিয়া গেঁজলা উঠিতেছে। বৃদ্ধা মাতা এবং অন্যান্য সকলে সজলনয়নে বসিয়া আছেন। পিতৃদেব রোগীর কাছে একখানি ছোট টুলে বসিলেন। রোগীর দিকে যতই তাকাইতেছেন ততই একটা অসাধারণ শক্তির আবির্ভাবে তাঁহার শরীর ও মন

পূর্ণ হইতেছে। ক্রমে ক্রমে সেই শক্তি ধারণ করা যেন অসম্ভব হইল, তখন তিনি রোগীর একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলেন। মনে হইতে লাগিল বাঁধ কাটিয়া দিলে নদীর জল যেমন প্রবল বেগে খালে প্রবেশ করে সেইরূপ তাঁহার শরীর হইতে অনাহূত দৈবশক্তি রোগীর শরীরে ছুটিয়া যাইতেছে এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি রোগীর ইচ্ছাকে পরাভূত ও অবসন্ন করিয়া তাঁহারই অনুগত করিতেছে। এই সময়ে তিনি তাহার কঙ্কালসার ডান হাতখানা সজোরে নাড়িয়া দিলেন। রোগী চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশান, আমাকে চিনিতে পারিতেছ?" রোগী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ"। তিন মাসের পরে হঠাৎ কথা শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইল। পিতৃদেব সজোরে রোগীকে আদেশ করিলেন, "ঈশান উঠে বসো।" তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া বসিল। পুনরায় তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।" তখনই সে দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া কাপড়টা পরিল এবং তাঁহার সঙ্গে চলিল। তাঁহার মনে হঠাৎ আশঙ্কার উদয় হইল যে এইরূপ কঙ্কালসার মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে, চলিতে গেলে হয়তো পড়িয়া যাইতে পারে, সুতরাং তিনি তাহার হাত ধরিলেন। সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে (প্রায় ২০০ হাত দূরে) গেল। সেখানে পুকুরের ঘাটে তাহাকে বসাইয়া তিনি কয়েক গণ্ডুষ জল তাহার চক্ষে সজোরে ছিটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তুমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলে, তোমার কিছুমাত্র ব্যাধি নাই।"

ঈশান বলিল যে তাহার কিছু অসুখ নাই, সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। পিতা রোগীকে বাহির বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গেলেন। তখন সে স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিল। পিতৃদেবের আদেশক্রমে অল্পক্ষণের মধ্যে ভাত ও মুসুরির ডাল রান্না হইল এবং ঈশান আসনে বসিয়া সুস্থ মানুষের মত নিজের হাতে তৃপ্তির সহিত ডালভাত আহার করিল। পিতা যখন বলিতেছিলেন যে খাদ্য খুব চমৎকার লাগিতেছে, ঈশানও তখন মাথা নাড়িয়া তাঁহার বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিতে দিতে গো-গ্রাসে ডাল ভাত উদরস্থ করিতেছিল। সকলে দেখিয়া অবাক্। স্ত্রীলোকেরা পিতৃদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন "ইনি মানুষ, না দেবতা", কিন্তু তিনি দেখিতেছিলেন যে এইসকল কার্যের উপর তাঁহার নিজের কিছুই কর্তৃত্ব নাই। গুরুশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া এই সব কার্য করিতেছে, তিনি সাক্ষী-গোপাল মাত্র।

পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া ঈশান তক্তা-পোশে বসিল। তিনি তাহাকে শুইতে অনুরোধ করিলেন। সে শয়ন করিলে মাথায় হাত দিয়া তিনি বলিলেন, "দুই মিনিটের মধ্যে তুমি ঘুমাইবে, তোমার গাঢ় নিদ্রা হইবে। আগামী কল্য ৭টার সময় তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বেলা ৮টার সময়ে তুমি নরোত্তমপুরের রায় মহাশয়দের চার বাড়ী বেড়াইয়া আসিবে।" তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে ঈশান গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। তিন মাসের পরে প্রথম নিদ্রা। পরের দিন পিতৃদেব ঈশানের জন্য তাঁহার দিদির বাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন; ঠিক ৮টার কিছু পরে ঈশান তাঁহাদের নিকট হাজির হইল। তাহার পশ্চাতে অনেক বালক, যুবক ও বৃদ্ধ। সকলের মুখেই এক কথা—"কি আশ্চর্য ব্যাপার।" ঈশান সরকার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ২০ বৎসরের অধিককাল বিষয়কার্য করিয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া উন্মাদ এবং অন্যান্য কতকগুলি রোগীকে অচিরে আরোগ্য দান করেন। পিতৃ-দেবের বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীচরণ চক্রবর্তী উহা হইতে কয়েকটি ঘটনা "মিরার" নামক দৈনিক ইংরেজী

পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া নানাস্থান হইতে রোগী আসিতে লাগিল। তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, সপ্তাহের মধ্যে একমাত্র বুধবারে রোগী দেখিবেন। কোন কোন দিন শতাধিক রোগী উপস্থিত হইত। ইহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকও আসিতেন। রোগীদের নিকট হইতে পিতৃদেব কোন পারিশ্রমিক লইতেন না, গুরুদেবের নিষেধ ছিল।

একদিন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি চক্ষু খুলিবার অনুমতি দিবার পূর্বে ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই চক্ষু খুলিতে পারিলেন না। ইহা হইতে তাঁহার বিশ্বাস হইল পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত করিতে পারিবেন।

একদিন বরিশালে স্বনামধন্য স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্ত, অধ্যাপক স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলিতেছেলেন, এমন সময়ে ব্রজমোহন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক স্বর্গীয় কামিনীকুমার ভট্টাচার্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃদেবের ইচ্ছা হইল যে তাঁহাকে বোবা করিয়া রাখিবেন। সত্য সত্যই তাঁহাকে বোবা হইতে হইল। পণ্ডিত মহাশয় কথা বলিতে না পারায় অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং একটা পেন্সিল দিয়া একটু কাগজে লিখিয়া অশ্বিনীবাবুকে জানাইলেন যে তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে, তিনি কথা বলিতে পারিতেছেন না, কিরূপে শিক্ষকতা করিবেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহারা আমোদ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যখন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন তখন অশ্বিনীবাবু পিতৃদেবকে তাঁহার মুখ খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পিতৃদেব বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, কথা বলুন।" অমনি তিনি হাঁ করিয়া মুখ খুলিয়া কথা বলিতে লাগিলেন এবং নিজেকে বিপদ্মুক্ত মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

গয়াধামে বাসকালে একদিন ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গিয়া পিতৃদেব দেখিলেন, একটি যুবক বসিয়া কথা বলিতেছে। সে পোষ্টাফিসে চাকরি করে। যুবকের চিবুকখানা অত্যন্ত বাঁকা দেখিয়া তিনি ঐরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবকটি বলিলেন যে, একবার জ্বর হইয়া ঐ অঙ্গটি বিকৃত হইয়াছে। পিতৃদেবের মনের মধ্যে শক্তি আসিল। তিনি চিবুকখানা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া দিলেন। উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইলেন।

সুবিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্বনামধন্য চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কার্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এমন একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি কোন ডাকাত তাঁহাকে কাটিবার জন্য তরোয়াল উত্তোলন করে তবে তিনি সজোরে "থামো" বলিলে তৎক্ষণাৎ ডাকাতের হস্ত অর্ধ পথে থামিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক শ্রদ্ধাস্পদ ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডাক নাম গণু) পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুকাল চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছিলেন। একস্থান হইতে সরিতে হইলে কচ্ছপের মতন চার হাত পায়ের উপর ভর দিয়া তাঁহাকে সরিতে হইত। তাঁহার বয়স তখন ২৫।২৬ বৎসর। বিখ্যাত ভক্ত গায়ক স্বর্গীয় রেবতীমোহন সেন ও পিতৃদেব একদিন গোয়াবাগানে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনজনে ঘরে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে গণু

কচ্ছপের ন্যায় থপ্ থপ্ করিয়া তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইল এবং হাতজোড় করিয়া পিতৃদেবকে বলিল, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছি।" তৎক্ষণাৎ তর্ তর্ বেগে পিতৃদেবের মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং গণুর মাকে (যিনি ছেলের সঙ্গে আসিয়াছিলেন) ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিলেন। রেবতীবাবু (তাঁহার গুরু ভ্রাতা) তাঁহার কাছেই রহিলেন। পিতা গণুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। যুবক তখনই তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহার হাতে এক খানি লাঠি দিয়া বলিলেন, "এই লাঠি ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাও।" সে তখনই লাঠি ভর করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রচারক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "এইরূপ অদ্ভুত মিরাকেল (miracle) আমি কখনও দেখি নাই—"। সেই দিন হইতে গণু যতকাল বাঁচিয়া ছিল সর্বদাই লাঠি ভর করিয়া ভ্রমণ করিত। এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই জানেন।

বিখ্যাত ডাক্তার শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের আঙুলে ছুরির আঘাত লাগিয়া বিষাক্ত ঘা হইয়াছিল। উহার যন্ত্রণায় তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। মরফিয়া ইনজেকসন্ দিয়াও কোন ফল হইত না। সেই অবস্থায় পিতৃদেব ডাক্তার বাবুর সুকীয়া স্ট্রীটের বাড়ী যাইয়া ঝাড়িয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিতেন।

হাজারিবাগের বিখ্যাত উকিল স্বর্গীয় গিরীন্দ্র কুমার গুপ্ত মহাশয়ের শালীপতি ভাই ব্রজেন্দ্র বসু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। একরূপ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গিরীন্দ্রবাবুর এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিবেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি রোগীকে দেখিতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃদেবের মনে হইল তিনি এক মুমূর্ষুর নিকট আসিয়াছেন। মুখে, হাতে, নাকে আরও অনেক স্থানে কুষ্ঠক্ষত অতিশয় গভীর হইয়া পড়িয়াছে। রোগীর উঠিবার কিংবা নড়িবার শক্তি নাই। পিতৃদেব কিছুক্ষণ তাঁহার গুরুদত্ত নাম জপ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইল। তখন হাতে করিয়া জল লইয়া কয়েকবার রোগীর সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন। তিনি বলেন যে হয়তো একটা মলমও দিয়াছিলেন। যাহা হউক পরের দিন হইতে রোগী অনেকটা আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং ২।৪ দিনের মধ্যেই হাঁটিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে কলিকাতায় একটা বাড়ীতে পিতৃদেব গিরীন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে সেইদিন কোন বিবাহের বরযাত্রী অনেকে জুটিয়াছিলেন। সেই সকল লোকের মধ্য হইতে একজন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিয়া পরিচয় দিলেন যে তিনি সেই কুষ্ঠরোগী ব্রজেন্দ্র বসু, বরযাত্রীরূপে আসিয়াছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপে এইরূপ আরোগ্য লাভ করিলেন?" তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "আপনিই আমার জীবন-দাতা।" পিতৃদেবও অবাক হইলেন।

পিতৃদেব-লিখিত "মনোরমার জীবনচিত্র" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে, নবম পৃষ্ঠায় ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিলাম।

"এইরূপ কত শত শত ঘটনা হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিতাম, সহস্র সহস্র লোককে শিষ্য করিতে পারিতাম। আমার এরূপ ক্ষমতা দেখিয়া কত বড় বড় লোক আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন শ্রীগুরুদেব আমাকে কি কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন। যদি গোস্বামী মহাশয় আমার গুরু এবং মনোরমা আমার গৃহিণী না হইতেন তাহা হইলে এই অর্থোপার্জনের সুযোগ থাকিতে বিষম দরিদ্রতার মধ্যে এই বিষম পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম কি না ঘোর সন্দেহের বিষয়।"

একতাই বল

শ্রীমতী শোভা হুই

আজকাল এক একটি ফ্ল্যাটের দু' তিনটি ঘর আর দু'চারটি ছেলেমেয়ে সমেত শতকরা নিরানব্বই জনের সংসার। শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, ননদ, জা অধিকাংশ সংসারেই দেখা যায় না। চার ভাই। একই শহরে থাকেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বাসা। একত্র থাকতে এঁরা অনিচ্ছুক। কেন এ অনিচ্ছা? কারণ এখন সকলে মনে করেন একা থাকাই শান্তি, বিশেষ করে মেয়েরা। কিন্তু একা থাকাই কি শান্তি? নানা উৎপাত, নানা ঝঞ্ঝাট কি নেই একার সংসারে?

স্বামী-স্ত্রীর সংসার। ছেলেটির হল টাইফয়েড। সেবার বিশেষ দরকার। আয়ের জোর থাকলে অবশ্য সেবিকা আনা যায়, কিন্তু সকলের আর্থিক ক্ষমতা সেরকম থাকে না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কেবল মুখের হৃদ্যতা, মনের নয়! কাজেই তাঁদের কাছে কিছু আশা করা যায় না। রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে দম্পতি বিব্রত হয়ে পড়েন। নিরুপায় স্বামী আফিসে ছুটি নেন, কিংবা স্ত্রী বাপের বাড়ী থেকে মা, ভাই যাকে হোক আনাতে বাধ্য হন, সংসারে আরও পাঁচজন থাকলে রোগীর সেবার কোন ত্রুটি হত না, আর মা-বাপকেও বিব্রত হতে হত না।

শুধু কি রোগ, একা থাকার বিপদ অনেক। স্বামী গেছেন অফিসে, তরুণী স্ত্রী আছেন বাড়ীতে। ছোট্ট সংসার, একটা চাকরই যথেষ্ট। নির্জন দুপুরে তরুণীকে মেরেধরে কিংবা খুন করে সর্বস্ব নিয়ে চাকরটি পালালো। কোলের শিশুটি কেঁদে উঠতে তাকেও গলা টিপে শেষ করলো। যথাসময়ে অফিস-ফেরত স্বামী এসে ব্যাপার দেখে চক্ষু-স্থির!

অথবা কোন প্রতারক নানারকম ধোঁকা লাগিয়ে বের করে নিয়ে গেল কোন মূল্যবান জিনিস কিংবা স্বয়ং তাঁকেই। কিংবা হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বাড়ীতে কেউ নেই, কে আনবে ডাক্তার? কে দেবে খবর স্বামীকে?

এরূপ কত রকমের আপদবিপদ নিয়তই ঘটতে পারে। এর জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। এদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করেই আমাদের চলতে হয় সংসার-পথ। একার শক্তি কতটুকু? একতার শক্তি অনেক বেশি। একতাই বল।

এখন প্রায়ই নববিবাহিতাদের মুখে শোনা যায় একত্র থাকলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। ইচ্ছামত স্বামীর সঙ্গে বেড়ান, গল্প কিংবা সিনেমা যাওয়া যায় না, পদে পদে গুরুজনদের মত নিতে হয়। এসব কি ভালো লাগে? একা থাকাই ভালো। বাধা-নিষেধ আর গুরুজনের চোখের অন্তরালে মিলনের মাধুর্য অবাধ মিলনের চেয়ে কি অনেক বেশি নয়? সংযম, ধৈর্য, আর সহিষ্ণুতা—এই তিনটি গুণ প্রত্যেকেরই থাকা দরকার। এ তিনটি গুণের অভাবে সংসার-পথ-যাত্রীকে জীবনে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। কাম্যকে পেতে হলে ধৈর্য ও সংযমের সহিত প্রতীক্ষা করতে হয়। পাঁচ জনের সঙ্গে থাকলে কোন বিষয়েই অধৈর্য হলে চলে না। তাছাড়া আমাদের আরও কতকগুলি বিশেষ গুণের দরকার। সর্বপ্রথম চাই সহিষ্ণুতা, চাই ত্যাগ, চাই প্রেম, চাই সমদৃষ্টি।

আমার স্বামী বেশী উপায় করেন, অতএব আমার ছেলেমেয়ে খাবে ভালো, পরবে ভালো, তাদের জন্য মাষ্টার থাকবে—আর দেওরের তেমন আয় নেই, অতএব তার ছেলেমেয়ে মাছের মুড়ো, দুধের বাটি পাবে না, তাদের জন্যে মাষ্টার থাকবে না, পোষাকও ভালো পরবে না। এ রকম

মনোভাব থাকলে একা থাকাই ভালো। কিন্তু এখানে যদি ভাবি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গেই ওরা সমান খেয়ে পরে একস্কুলে পড়ে মানুষ হোক, ভাসুর কিংবা দেওর-পো আমারই সন্তান। দেওর কিংবা ভাসুর-ঝি আমারই মেয়ে, তাহলেই একসঙ্গে থাকা সম্ভব। আমার আমার করলে একসঙ্গে থাকা চলে না।

আজকাল অধিকাংশ ছেলেমেয়েই দেখা যায় আড্ডাধারী, অবাধ্য, লেখাপড়ায় অমনোযোগী এবং আত্মকেন্দ্রিক, এর কারণ কি? কারণ আমাদের একা থাকার ফল। ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ থেকে এসে বাড়ীতে লোক পায় না। বাপ অফিসে, মা ঘরের কাজে ব্যস্ত, নির্জন ঘরে একা একা কি ভালো লাগে? সহোদর কিংবা সহোদরা ঠিক সম-বয়সী হয় না। কাজেই খাওয়া-দাওয়া সেরে তাদের ছুটতে হয় বন্ধুর উদ্দেশ্যে কিংবা স্কুলকলেজ থেকে ফিরতে হয় আড্ডা দিয়ে। বাড়ীতে খুড়তুত, জেঠতুত, মাসতুত, পিসতুত, ভাইবোনেরা থাকলে সঙ্গীর অভাব হয় না। বাইরে যাবার জন্যে মনও ছুটাছুটি করে না, খেলা-ধুলা হুল্লোড় বাড়ীতেই করতে পায়। অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার আনন্দই অন্যরকম।

আধুনিক অধিকাংশ মায়ের ধারণা, ছেলে-মেয়েকে মনের মত মানুষ করতে হলে একা থাকাই বাঞ্ছনীয়। আত্মীয়স্বজন এমনকি শ্বশুরশাশুড়ীকেও বাদ দিতে এঁরা কুণ্ঠিতা নন। কিন্তু এর ফলে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা অলস, স্বার্থপর, উদ্ধত, অবাধ্য এবং বিলাসী হয়ে ওঠে। কারণ একা থাকার ফলে ছেলেমেয়ে যখন যা আবদার করে তখনই পায়। যা পায় তা নিজেই ভোগ করে। অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ তাদের যা খুশি করতে দেওয়া হয়, কোন কাজেই বাধা দেওয়া হয় না। মা ভাবেন বড় হলে শুধরে যাবে। কিন্তু তা আর হয় না। ছেলেকে মনের মত মানুষ করতে গিয়ে মা নিজের অজ্ঞাতেই তাকে অমানুষ করে তোলেন। এক পরিবারে সকলে মিলেমিশে থাকলে ছেলে-মেয়েকে অতিরিক্ত আদর দেবার সুযোগ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জিনিসই ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতে হয়। একা ভোগ করার সুবিধা ছেলেমেয়ে পায় না। কাজেই এরা প্রথম থেকেই সহিষ্ণু ও নিঃস্বার্থ হয়ে গড়ে ওঠে। বড় সংসারে নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়, হাতের কাছে সব জুগিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ছেলেমেয়েরা অলস হতে পারে না।

ছোট থেকে শিশুরা যদি দেখে তাদের মা বাবা, বৃদ্ধা ঠাকুমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন না, গরীব কাকা-কাকীর দিন চলে না, খুড়তুত ভাইবোন-গুলির পয়সা অভাবে পড়া হয় না, গরীব পিসীর অনাহারে দিন কাটে, অথচ তারা নিজের দিব্যি আরামে আছে, কিন্তু ওই সব আত্মীয়দের দুঃখ-কষ্টের দিকে মা-বাবা ফিরেও তাকান না, তাহলে এই সব শিশুরা বড় হয়ে মা-বাবাকে শ্রদ্ধা কি করে করবে? ছোট থেকে তারা যেমন দেখবে বড় হয়ে ঠিক তেমনি করবে। ওরাও নিজেরটিই বুঝবে আর কোন দিকে চাইবে না! এমনকি বৃদ্ধ মা-বাবাকেও দেখবে না, কারণ এরা এ রকমই দেখে এসেছে।

এখনও দু একটা একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায়। এঁরা হিসেব করে খাওয়ার খরচ কর্তার হাতে দিয়ে দেন। বাদবাকি সব খরচ নিজের হাতেই রাখেন। এক বাড়ীতে থাকেন, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে মনের মিল একটুও নেই। যার যেমন আয় সে তেমন ব্যয় করেন। ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, আর লম্বা ঝোল এই হয় সকলের জন্যে। এর ওপর আয় অনুযায়ী ব্যবস্থা। বড় ভাইয়ের আয় বেশি, তিনি খাবেন মাছের ক্রাই, মাছের ঝাল, মেজো ভাইয়ের চলবে মাংস, সেজোর রাবড়ী, ছোট ভাই বেচারা গরীব, কাজেই সে সরকারী

ডাল চচ্চড়ী খেয়েই কাটাবে। পোষাকেও ঠিক ঐরকমই বৈষম্য এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার। এ রকম একত্র থাকার চেয়ে পৃথক থাকা অনেক ভালো। এ রকম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কুটিল, স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হয়। যে পরিবারে মা-বাপ, জেঠা-জেঠী ও কাকা-কাকীর মনে বিদ্বেষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের মন কি করে উদার হবে?

তখনকার দিনে একত্র সবাই যে থাকতে পারতেন তার প্রধান কারণ তাঁদের সমদৃষ্টি। গিন্নিরা ভাবতেন ভাসুরপো, দেওরপো, ভাসুরঝি সবাই আমার সন্তান, সবই একসূত্রে গাঁথা। এক ভাই যদি হঠাৎ মারা যান জেঠী-মা কিংবা খুড়ী-মা তাঁর নাবালক সন্তানটিকে বুকে তুলে নিতেন। তাঁদের বুকে আশ্রয় পেয়ে মাতৃহারা শিশুটি মানুষ হয়ে উঠতো, মায়ের অভাব জানতেই পারতো না। কুমারী মেয়ে রেখে কোন ভাই মারা গেলেন, কোন ভাবনা করতে হোল না তাঁর বিধবা স্ত্রীকে। অন্য সব ভাইয়েরা দেখে শুনে মেয়েটিকে সংপাত্রে বিবাহ দিলেন। একা সংসার এসব দুর্ঘটনা হলে স্ত্রীকে চলে যেতে হয় বাপের বাড়ীতে। মা-বাপ চিরকাল বাঁচেন না, ভাই-ভাজের সংসার-গঞ্জনা সহ্য করে পড়ে থাকতে হয়।

অনেকে হয়তো বলবেন একসঙ্গে থাকলে কি অশান্তি নেই? সকলেই কি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়? একটু আধটু অশান্তি, একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি কিংবা বিদ্বেষ পরস্পরের ভিতর হওয়া অসম্ভব নয়, বরং সম্ভবই। কিন্তু একসঙ্গে থাকার সুবিধে একা থাকার চেয়ে অনেক বেশি। অসুবিধা শতাংশের একাংশও নয়। আমরা এসেছি এ পৃথিবীতে চিরকালের জন্য নয়। কাজ ফুরোলে চলে যেতে হবে। সবাই আমরা একই পিতার সন্তান। যাবার সময় কিছুই সঙ্গে যাবে না। সব থাকবে পড়ে। মা, বাপ, ভাই, বোন, কারুর দিকে না চেয়ে কোন কর্তব্য না করে যে টাকা সঞ্চয় হল, সে টাকাও থাকবে পড়ে। যাদের জন্য দিবা-রাত্র পরিশ্রম তারাও থাকবে পড়ে। সংসারের এক চুলও সঙ্গে যাবে না। এসেছি একাকী যেতেও হবে একাকী। কাজেই দু'দিনের জন্যে কেন এত ঝগড়া, বিদ্বেষ আর স্বার্থপরতা? এই ভাব মনে রেখে চললে সংসারে অনেক অশান্তি কমে যায়। সুখে, দুঃখে, বেদনায় পরস্পর সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, আর ব্যথার ব্যথী হয়ে যদি থাকতে পারা যায় তাহলে সংসারপথ অতিক্রম অনেক সুগম হয়, আর জীবনও হয় শান্তিপূর্ণ।

আমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক। আমরা যেন সর্বাংশে একমত হতে পারি। জীবনভোর এই একত্বের বাঁধনে যেন বাঁধা থাকতে পারি। তাহলেই পরিবারের, সমাজের এবং দেশের মঙ্গল।

সমালোচনা

বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য—শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী কর্তৃক প্রণীত ও ২৫।১ ঘোষাল বাগান লেন, সালখিয়া, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭২; মূল্য—এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার শ্রীযুত রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রীর "জাতিভেদ" জাতিভেদের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া হিন্দু সমাজের ঐক্যসাধনে সাহায্য করিয়াছে, এবং সুধীগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার বেদের ধর্ম ও কোরাণের ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক, কেননা সকল ধর্মেই সত্য আছে; এবং মুসলমান ধর্মে যে সত্যের এক রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। দুই এক স্থানের সাদৃশ্য এত অধিক যে তাহার মূলে অনুকরণ

আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" গীতার এই বচনের সহিত কোরাণের "সৎকর্মশীল লোকদিগের পুণ্য কর্মগুলিকে আল্লাহ্ কখনই ব্যর্থ করিয়া দেন না" এই বচনের সাদৃশ্য এই প্রকারের। কিন্তু বিভিন্ন দেশের ভক্তদিগের মনে এই সত্য স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে। একটিকে আর একটির অনুকরণ মনে করিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থকার বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এইরূপ বহু সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুসলমান শাস্ত্রকারগণ হিন্দুশাস্ত্র হইতে এইগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। দুই এক স্থলে হিন্দুমতের সহিত মুসলমান মতের ভেদ প্রদর্শন করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কোরাণে আছে, "যাহারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, শেষ বিচারের দিনে তাহারা ঐ সকল দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিবে, 'হে প্রভো, আমরা তোমার পরিবর্তে এই সকল দেবতার উপাসনা করিয়াছি'।" ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় মুসলমান শাস্ত্রে অন্য দেবতার যে অস্তিত্ব আছে তাহা স্বীকৃত, কিন্তু তাহাদের উপাসনা নিষিদ্ধ। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতার অস্তিত্ব যে ধর্মে স্বীকৃত তাহাকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ Monotheism বলেন না, যদিও উক্ত দেবতা উক্ত ধর্মে উপাস্য নহে। ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষের সহিত প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া। কিন্তু কার্যতঃ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ভেদের ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থপাঠে যদি হিন্দু ও মুসলমান পাঠকের মনে পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

গ্রন্থখানি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য।

পরিশেষে গ্রন্থে উদ্ধৃত "জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ" ইত্যাদি শ্লোক সম্বন্ধে বলিতে চাই যে, আমার মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে "ধর্ম কি, অধর্ম কি, তাহা জানিয়াও ধর্মে আমার প্রবৃত্তি এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্তি নাই।" আমি ধর্ম জানি, তাহাতে আমার প্রবৃত্তিও আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রবৃত্তি ও সে নিবৃত্তি আমার নহে (প্রবৃত্তিঃ ন মে, নিবৃত্তিঃ ন মে)। তুমি যাহা করাও তাহাই আমি করি। ইহাই উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বলিয়া আমার মনে হয়। সৎকর্মে প্রবৃত্তি ও অসৎকর্ম হইতে নিবৃত্তিতে আমার গৌরব কিছু নাই, তাহা তোমারই দেওয়া। কেননা শ্রুতি বলেন, যাহাকে তুমি ঊর্ধ্বে তুলিতে চাও, তাহাকে দিয়া সৎকর্ম করাও, আর যাহাকে অধোগামী করিতে চাও, তাহাকে দিয়া অসৎ কর্ম করাও।

—শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাধক—শ্রীশ্রীরাধারমণ দেব প্রণীত। প্রকাশক —শঙ্কর মহাবীর চৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীরাধারমণ সাধনাশ্রম, বিবেকানন্দপুর, পোঃ কৃষ্ণনপুর (নদীয়া)। পৃষ্ঠা ১৭৮; মূল্য ২॥০ টাকা।

প্রকৃত সাধকের জীবন তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়—প্রবৃত্তি-পথ, সাধন-পথ ও সিদ্ধি-পথ। 'সাধক' বইখানিতে ১৪৮টি গানের সমাবেশে এই পথত্রয়ের একটি ধারাবাহিক পরিক্রমণ দৃষ্ট হইল। সুখপাঠ্য গানগুলির রচয়িতা একজন উচ্চ কোটির সাধক ছিলেন। বইটি পড়িবার সময় মনে হয়—ছলনাময়ী আশার মায়ামোহকে দূরে রাখিতে চাহিয়া প্রবৃত্তি-পথে সাধকের চিত্ত বৈরাগ্যের সুরে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে :

> "আজিও ভুলিতে নারিনু রে হায়
> কুহকিনী আশা-ছলনা!"

তাই প্রতীক্ষারত সাধক আকুল প্রাণে কাঁদিতে-ছেন—অভিমানভরে প্রাণের আকুতি নিবেদন করিতেছেন :

> "ডাকিয়া কাঁদাও প্রাণ, হে চতুর হে পাষাণ!
> অথচ যাবার পথ রেখেছ কণ্টক ভ'রে।"

সাধন-পথে আগাইয়া চলিতে চলিতে সাধকের কী সুন্দর অনুভূতি !

"অনন্ত সিন্ধুর কূলে বিন্দু লয়ে কর খেলা
অখণ্ডে রচিয়া খণ্ড, তাহে বসায়েছ মেলা।"

আবার সিদ্ধি-পথে আনন্দে তাঁহার হৃদয়বীণা ঝঙ্কার তুলিতেছে :

"কতকালের আবাহন তোর
সুসার্থক হ'ল আজ,
কোথা রে তুই ও ভিখারী,
এসেছে রাজ অধিরাজ।"

পুস্তকের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনাভাস পাঠকচিত্তে একটি আদর্শ সাধকের ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—জীবানন্দ

(১) Truth Revealed—By Syamananda Brahmachary.

পৃষ্ঠা—২১৬ ; মূল্য—২৲ টাকা

(২) The Soul Problem and Maya—By Syamananda Brahmachary.

পৃষ্ঠা—১৫২ ; মূল্য —১৷৷০ আনা

প্রকাশক—শ্যামানন্দ অদ্বৈত আশ্রম

বি ৫।১৫৫, আউধ গাবি, বারাণসী—১

প্রথম গ্রন্থ ১৯২৬ সালে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত। উভয় গ্রন্থেই ধর্ম ও দর্শন আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথম গ্রন্থের আরম্ভেই বলিয়াছেন যে সকল ধর্মেই বলে যে শূন্য হইতে এই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্মের অর্থ শূন্য কেননা গুণহীন, নামহীন, রূপহীন, উদ্দেশ্যহীন যাহা, তাহা অবস্তু এবং এই অবস্তুই ব্রহ্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তু কখনও সদৃশ গুণান্বিত হইতে পারে না। এই সৃষ্ট বিশ্ব যখন বস্তু তখন তাহার স্রষ্টা নিশ্চয়ই অবস্তু। বিশ্বের স্রষ্টা স্বয়ম্ভু, কেননা তিনি অবস্তু। কোনও বস্তুই কারণহীন নহে। যাহা কারণহীন স্বয়ম্ভু, তাহা বস্তু নহে, তাহা অবস্তু, তাহা শূন্য, একমাত্র শূন্যেরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। বেদান্ত-দর্শনে এই শূন্যকে "চিদাকাশ" এবং যোগবাশিষ্ঠে "চিৎশূন্য" বলা হইয়াছে। ইহার পরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুদর্শন (উপনিষৎ) উভয়ের মতেই বিশ্বস্রষ্টা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ (Personal God) নহেন। নানা যুক্তি দ্বারা গ্রন্থকার তাঁহার এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এই সকল যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপনিষদের ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত, কিন্তু তিনি 'চিৎ'-পদার্থ। 'চিৎ' অবস্তু নহে। বৈশেষিক দর্শনে, আত্মা 'দ্রব্যের' মধ্যে পরিগণিত, তাহা অবস্তু নহে। উপনিষদে ইহা আছে বটে যে, কেহ কেহ বলেন পূর্বে 'অসৎই' কেবল ছিল, তাহা হইতে 'সত্তের' উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহা উপনিষদের মত নহে। উপনিষদের মতে 'সৎ' হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে হিন্দুদিগের নিম্নস্তরের দর্শনেই ব্রহ্মকে—আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মে আনন্দ নাই !! উপনিষৎ তাহা হইলে হিন্দুদিগের নিম্নস্তরের দর্শন (Lower Philosophy) ?

গ্রন্থকারের মতে 'মন' বিভিন্ন রূপের সংস্পর্শ-জাত কামনা (desires) এবং অনুভূতি (feelings) সকলের সমবায় এবং বুদ্ধি বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ ও বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শলব্ধ অভিজ্ঞতার সমষ্টিমাত্র। মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়াই হিন্দুদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মানুষের স্বরূপ বর্ণনা করিতে লিখিয়াছেন, "আত্মা (soul) অদৃশ্য বলিয়া তাহার (মানুষের) মনোযোগ, অথবা প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে মানুষ তাহার আত্মার জন্য ক্রন্দন করে না, তাহার ইন্দ্রিয়সুখ যে আর ভোগ করিতে পারিবে না, এইজন্য ক্রন্দন করে" কিন্তু

বুদ্ধি ও মন যদি অভিজ্ঞতা ও কামনার সমষ্টিমাত্র হয় তাহা হইলে কাঁদে কে? দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমষ্টিই হইল গ্রন্থকারের মতে মানুষ। দেহ অচেতন; মন ও বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সমষ্টি। আত্মা কাহারও মনোযোগ ও প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে না? ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে কে? তাহার জন্য কাঁদেই বা কে?

গ্রন্থকার বলেন আত্মবিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে তোমার অস্তিত্বই নাই, তোমার আমিত্বের বোধ মিথ্যা মরীচিকার ন্যায় কষ্টদায়ক। তোমার 'আমিত্ব' কতকগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানের সমষ্টিমাত্র। তোমার আত্মা তো সকল সময়ই অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং তোমার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহার তৃপ্তির জন্য তোমার চেষ্টা করিতে হইবে! এখানে বৌদ্ধ 'স্কন্ধ'বাদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতে আত্মা বলিয়া কিছু নাই। গ্রন্থকার আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে অস্বীকার না করিলেও, বৌদ্ধমতের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য নাই। তাঁহার মতে বৌদ্ধনির্বাণ অর্থ ঐকান্তিক বিনাশ। অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষাই বন্ধ, অস্তিত্বের নাশই মোক্ষ। নির্বাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। কিন্তু গ্রন্থকার ঐকান্তিক বিনাশ অর্থেই নির্বাণ বুঝিয়াছেন এবং তাহাই প্রকৃত মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাওয়ার অর্থই তাঁহার মতে অস্তিত্বের বিনাশ, কেননা ব্রহ্ম অবস্তু বা শূন্য। শূন্যে মিলিয়া যাওয়ার অর্থ সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া।

গ্রন্থকার বলেন ব্রহ্ম (শূন্য) নির্গুণ। সুতরাং ঈশ্বরের দয়া বলিয়া কিছু নাই, এবং তাহা ভিক্ষা করা অনুচিত। ঈশ্বরকে পূজার সময় অর্ঘ্য নৈবেদ্যাদি নিবেদন করাও অনুচিত। তাঁহারই তো সব, তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দেওয়ার কোন মূল্য নাই। উপাসনার কোনও ফল নাই। টাইটানিক জাহাজ যখন ডুবিয়া যায়, তখন আরোহী সকলেই তো আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিল; কেহই তো সে প্রার্থনা শোনে নাই। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন, কিন্তু গুরুকে ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত নহে। তাহা করিলে শিষ্যের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হইবে। শিষ্য ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করিবে। জীবের স্বাধীনতা নাই, তাহারা ঈশ্বরের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, সুতরাং কেহই তাহাদের কর্মের জন্য দায়ী নহে। যৌবনে ব্রহ্মচর্য কর্তব্য নহে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ভাল। প্রাণায়াম ফুসফুসের পক্ষে অপকারী ও বিপজ্জনক। লয় যোগ দ্বারা মনের শক্তি বর্ধিত হয়। ধ্যান-কালে মন হইতে সমস্ত চিন্তা বহিষ্কৃত করিতে হয়, করিতে পারিলে সুষুপ্তের শান্তির অনুভব হয়। নানাভাবে গ্রন্থকার তাঁহার মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার বচন তিনি অনেকস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু গীতার যাহা গৌরব—জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় তাহাই তিনি গ্রহণ করেন নাই। কর্মকে তিনি মোক্ষের বাধা বলিয়া মনে করেন। ভক্তিকে তিনি কোনও মূল্য দেন নাই। ঈশ্বরের সৃষ্ট দ্রব্য ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরকে নিবেদনের মধ্যে তিনি ভ্রান্তিই দেখিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। বহু স্থানে তিনি বিশ্বাত্মার (universal soul) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সহিত মানবাত্মার যে প্রেমের সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা তিনি বলেন নাই।

দ্বিতীয় গ্রন্থে গ্রন্থকার 'মায়ার' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা বাদে প্রথম গ্রন্থে বর্ণিত যোগ, মোক্ষ আরও অনেক বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মায়াকে বিশ্বাত্মার (Universal consciousness) ইচ্ছা বলিয়াছেন। বিশ্বাত্মা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা অস্তিত্বহীন বিশ্বের অস্তিত্বের ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছেন। এই ভ্রান্তিউৎপাদক ইচ্ছাশক্তিই মায়া। কিন্তু মায়া যদি ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি হয়,

এবং এই জগৎ সেই ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক সৃষ্ট যদি বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকে ভ্রান্তি বলিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায় না, অন্তত্র গ্রন্থকার মনকে মায়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন কামনা ও অনুভূতির সমষ্টিই মন। মনের নিজের কোনও শক্তি নাই, এবং তাহা একটি স্বতন্ত্র বস্তুও নহে। মনই মায়া, ইহার অর্থ, তাহা হইলে মনের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। বলিতে গেলে মনে যাহা নাই—কোনও মনে যাহার অস্তিত্ব নাই—এরূপ কোনও বস্তুই নাই। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে মনোগ্রাহ্য কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। তাহাদের অস্তিত্বের বোধ ভ্রান্তিমূলক। অন্যত্র গ্রন্থকার বলিয়াছেন "চিৎই জড়রূপে প্রকাশিত (matter is the manifestation of চিৎ)। কিন্তু চিৎ জড়ের উপর প্রতিফলিত না হইলে জড়ের প্রকাশ হইতে পারে না। চিৎএর এই প্রতিফলন তাহার ইচ্ছার প্রতিফলন। এই ইচ্ছা 'মায়া' (illusion)।" ইহার অর্থগ্রহণ দুঃসাধ্য। ঈশ্বরের ইচ্ছা মায়া (illusion)। তাহার প্রতিফলন হইতে জড়ের আবির্ভাব। কিন্তু কিসের উপর ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিফলিত হইবে? উত্তর—জড়ের উপর। কিন্তু এই প্রতিফলনের পূর্বে তো জড়ের আবির্ভাবই হয় নাই। আবার এই ইচ্ছাও যদি 'মায়া' হয় তাহা হইলে তাহারও তো বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্বই নাই তাহা প্রতিফলিত হইবে কিরূপে? গ্রন্থের সর্বত্রই এইরূপ অসামঞ্জস্য পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। মায়া অনির্বচনীয়। কিন্তু তাহার অস্তিত্ব আছে। ভ্রান্ত জ্ঞানই মায়া। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু যেরূপে আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় তাহা তাহাদের সত্যরূপে নহে। প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু সামান্য অল্প কয়েকটি বস্তুর সহিত সম্বন্ধরূপেই তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার সকল সম্বন্ধ যদি দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা হইলে তাহার রূপই বদলিয়া যাইত। প্রত্যেক বস্তু তাহার সকল সম্বন্ধের সহিত দৃষ্টিগোচর হইলে বিশ্বের প্রতীয়মান রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইত। সুতরাং বিশ্বের প্রতীয়মান রূপ মায়া। কিন্তু বিশ্বের অস্তিত্ব আছে তাহার সত্যরূপও আছে। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ। তাই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু ও সমগ্র বিশ্বের সত্যরূপ তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না। এই অপূর্ণতাই মায়া। বিশ্বের ও তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুর প্রতীয়মান রূপ মায়িক। এই মায়িক রূপ যাহার নিকট আবির্ভূত হয় সেই মানুষের সত্যরূপও তাহার নিকট প্রকাশিত হয় না। সুতরাং মানুষের নিজের প্রতীয়মান রূপও মায়িক। জীবাত্মা যে পরমাত্মারই অংশ, পরমাত্মাই যে আংশিক ভাবে জীবাত্মারূপে প্রকাশিত, তাহা জীবাত্মা জানিতে পারে না। জ্ঞানের এই অল্পতা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের এই সীমাবদ্ধ রূপকে মায়া বলা যায়। এই সীমাবদ্ধ অবস্থা জীবের পক্ষে কখনও অতিক্রম করা সম্ভবপর কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। হয়তো ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের মধ্যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান জুট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো ভাসমান আছে। জ্ঞানসমুদ্রের ভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের আয়তন ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে পারে, কিন্তু কখনও তাহারা সমুদ্রের আয়তন প্রাপ্ত হইবে না, হয়তো বা প্রত্যেক দ্বীপ ও সমুদ্রের মধ্যে সীমারেখা একদিন বিদূরিত হয়, তখন জীব অখণ্ডে মিশিয়া যায়, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি সত্য কে বলিবে? উভয় মতই প্রচলিত আছে, তাহাদের সমর্থকেরও অভাব নাই।

—শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা আরোগ্য-ভবন—এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চমবার্ষিকী (১৯৫৫) মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বর্তমানে আরোগ্য-ভবনে মোট ১০১টি রোগি-শয্যা আছে; তন্মধ্যে সাধারণ ওয়ার্ডে ৫০, বিশেষ ওয়ার্ডে ৯, অস্ত্রোপচার ওয়ার্ডে ১০, ক্যাবিন-শয্যা ১৮ এবং কটেজ-শয্যা ১৪। আলোচ্য বর্ষে মোট ১৭৮ জন যক্ষ্মারোগী (পুরাতন ৮৬, নূতন ৯২) আরোগ্য-ভবনে চিকিৎসা লাভ করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসার পর হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইয়াছেন ৮৬ জন (পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার পর যক্ষ্মা নয় বলিয়া স্থিরীকৃত ৭, সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত (arrested) ৩৫, উপশমিত (quiescent) ১২, উন্নত (improved) ২৫, একইভাবে স্থিত (stationary) ৭; হাসপাতাল হইতে মুক্তিকালে কাহাকেও অবনততর স্বাস্থ্য লইয়া যাইতে হয় নাই) যক্ষ্মারোগসংক্রান্ত অত্যন্ত কঠিন কয়েকটি অস্ত্রোপচার আশাতীত সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়া এই আরোগ্য-ভবন যক্ষ্মা-চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। প্রতিষ্ঠানের ক্লিনিকাল লেবরেটরী এবং রেডিওলজি বিভাগও সুপরিচালিত। আলোচ্য বর্ষে উপর্যুল্লিখিত শয্যাশ্রয়ী রোগিগণ ছাড়া ৫৩টি রোগী বহির্বিভাগে আসিয়া চিকিৎসার নির্দেশ, পরামর্শ ও সহায়তা লাভ করিয়াছেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ দরিদ্র গ্রামবাসীদিগের সেবাকল্পে প্রতিষ্ঠানে একটি অবৈতনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ও আছে। আলোচ্যবর্ষে এখানে মোট ১০,২৮৩ ব্যক্তি ঔষধ লইয়াছেন (পুরুষ···৩২৩৪, স্ত্রীলোক···২৯৪৭, শিশু···৪১০২)।

সাধারণ ওয়ার্ডের শয্যাসমূহের অন্ততঃ অর্ধেক-গুলি যাহাতে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা চলে প্রতিষ্ঠানের ইহাই সঙ্কল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে এখনই ইহা সম্ভবপর হইতেছে না। আলোচ্য বৎসরে সম্পূর্ণ অবৈতনিক রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪, আংশিক খরচ বহন-করিয়া-থাকা রোগীর সংখ্যা ছিল ১০।

এই স্যানাটোরিয়ামটি রাঁচি শহর হইতে দশ মাইল দূরে পাহাড় এবং শালবনবেষ্টিত একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে (উচ্চতা ২,১০০ ফুট, পরিমাপ—প্রায় ২৭০ একর) স্বাস্থ্যকর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। এই স্থান হইতে কলিকাতার দূরত্ব ২৬০ মাইল এবং পাটনার ২২০ মাইল। উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশেও যাতায়াত সহজসাধ্য। সারা বৎসরই আবহাওয়া জলীয়বাষ্পমুক্ত এবং নাতি-শীতোষ্ণ থাকে। এই আরোগ্যভবনটি দেখিয়া গিয়া বহু যক্ষ্মা-চিকিৎসাভিজ্ঞ বলিয়াছেন যে, স্থানটি যক্ষ্মারোগের স্যানাটোরিয়ামের পক্ষে আশ্চর্যরকমে উপযোগী।

মাত্র পাঁচ বৎসর এই আরোগ্যভবনটি চালু করা হইয়াছে। চিকিৎসা, সংগঠন এবং কর্মকুশলতার দিক দিয়া এই স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু ইহার সমগ্র পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য এখনও বহু কাজ বাকী। এজন্য চাই সহৃদয় দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য। আরোগ্যভবনের প্রধানতম অভাব পর্যাপ্ত জল-সরবরাহের অসুবিধা। রাঁচি এলাকায় জলকষ্ট সর্বজনবিদিত। বহু অর্থব্যয়ে কয়েকটি কূয়া খনন করিয়া বর্তমানে স্যানাটোরিয়ামের কাজ চলিতেছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই জলসরবরাহ খুবই অনিশ্চিত এবং মোটেই যথেষ্ট নয়। নলকূপ খননও এই দিকে কার্যকরী হয় না। জলসরবরাহ পরিকল্পনাদক্ষগণের পরামর্শানুযায়ী গত বৎসর দামোদর উপত্যকা

করপোরেশনের সহযোগিতায় প্রায় সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে সমীপবর্তী একটি পার্বত্য তটিনীকে বাঁধ দিয়া জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ কৃত্রিম হ্রদ হইতে জলপরিশোধন এবং সমগ্র স্যানাটোরিয়ামে জলপরিবহনের ব্যবস্থার জন্য আরও এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। স্যানাটোরিয়ামের জলাভাবের কথা শুনিয়া যে সকল বদান্য বন্ধু জল সরবরাহের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রদত্ত টাকা বাঁধ নির্মাণেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আরোগ্যভবনের কর্তৃপক্ষ এই আশুপ্রয়োজনীয় কাজটির জন্য সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

পাটনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৪ই মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব এবং তদনুষঙ্গী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন দিবাভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভজন ও প্রসাদবিতরণাদি হয়। রাত্রে শ্রীমদ্‌ভাগবত অবলম্বনে একটি হৃদয়গ্রাহী হিন্দী কীর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরবর্তী তিন দিন বৈকালে অধ্যাপক সুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন, রাত্রে কীর্তন হয়। ১৮ই মার্চের কর্মসূচী ছিল দরিদ্রনারায়ণসেবা। ৩০০০ নারায়ণ বসিয়া পরিতোষপূর্বক খেচরান্ন, ব্যঞ্জন, দধি ও মিষ্টান্ন ভোজন করেন।

২১শে মার্চ একটি সাধারণ সভায় ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ আশ্রমের নবনির্মিত লাইব্রেরী গৃহের উদ্বোধন করেন। বিহারের রাজ্যপাল সহ প্রায় চার হাজার বিশিষ্ট নাগরিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন—

"আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে অধোগতি ঘটিয়াছে ইহার কারণ হইল ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি হইতে আমাদিগের ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা। ধর্মের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তো কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল বরং চরম দেবভাবের অনুভূতির জন্য ধর্মের উপর গভীরতম নিষ্ঠা-বিকাশের। আমাদের ধর্ম যাহা ঘোষণা করে তাহা আমরা যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়াই আমরা আজ অবসন্ন ও বিভ্রান্ত। আমাদের একান্ত প্রয়োজন ধর্মের যাহা মুখ্যভাব উহা হৃদয়ঙ্গম করা এবং ব্যক্তি-মানুষকে পূত বলিয়া শ্রদ্ধা করা।

"লাইব্রেরীগুলি হইল একনিষ্ঠ অধ্যয়ন এবং একাগ্র মননের স্থান। পাঠকবর্গ যদি ভাসাভাসা, গ্রন্থবদ্ধ পড়া বা শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন লইয়া থাকেন তো উহা নিষ্ফল। প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে আমাদের চাই লাইব্রেরীগুলিকে তীর্থস্থানের মত মনে করা ; তবেই তো আমরা আমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণের জ্ঞানভাণ্ডারের সম্যক সমাদর ও উপলব্ধি করিতে পারিব। * * * লাইব্রেরীগুলিতে বসিয়া আমরা অকপট ও নিবিষ্টভাবে বেদ, উপনিষদ, ত্রিপিটক, পুরাণ, কোরান ও বাইবেল অধ্যয়ন দ্বারা ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে পারি, আর তাহার ফলে পরম সত্যের অনুভব আমাদের পক্ষে সুখকর হয়।

"এই পরম সত্যের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার মানসে মানুষ মহেন্-জো-দারো এবং হারাপ্পার যুগ হইতে ইদানীং কাল পর্যন্ত ধ্যানসাধনায় ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থসমূহের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যও মানুষের পুনর্বার কঠোর প্রযত্ন স্বীকার দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

"কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্ম লইয়া কলহ করা উচিত নয়। পরম সত্যের সাক্ষাৎকারলাভের শত শত পথ রহিয়াছে। কানুনবদ্ধ অচল কোন একটি মাত্র পন্থা থাকিতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মানুসারিগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আবশ্যক। আমাদের লক্ষ্য থাকিবে পরম সত্যকে দর্শন ও অনুভব করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজের অনুভূতি দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যের

গরিমা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক আর স্বামী বিবেকানন্দ দেখাইয়া গেলেন ধর্মের হাতে-কলমে প্রয়োগ। মানুষকে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে বিদ্বেষ, ধর্মধ্বজিতা এবং সঙ্কীর্ণ মনোভাবরূপ মারাত্মক সঙ্কটগুলির বিরুদ্ধে। অস্পৃশ্যতা আমাদের একটি বহুদিনকার কলঙ্ক; এই দোষ আমাদিগকে হীন এবং নিন্দিত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্মকর্মে পশুবলিও নিন্দনীয়। এইরূপ নিষ্ঠুরতার দ্বারা ভগবানের প্রীতিসম্পাদন হইতে পারে না।

"যথার্থ ধর্মানুশীলনের জন্য মানুষকে কর্মত্যাগ করিতে হয় না। বুদ্ধ এবং শঙ্কর কখনও কর্মত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা ছিলেন গভীর প্রশান্তি এবং বিপুল উত্তমের মূর্ত বিগ্রহ। বাস্তবিকই যদি কেহ ধর্মশীল হইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে যাহা কিছু মহৎ এবং দিব্য তাহার অধ্যয়ন, মর্মবোধ এবং জীবনে অনুসরণ করিতে হইবে। ধর্মকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করিয়া ফেলা চাই।"

সভায় দিল্লী শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্থানীয় আশ্রমসচীব স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ এবং শ্রীরাজেশ্বরী প্রসাদও বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

২২শে এবং ২৩শে যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জয়ন্তী-সভায় তাঁহাদের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন বিচারপতি এস্ সি মিশ্র ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং বিহার রাজ্যের গ্রন্থাগার-তত্ত্বাবধায়ক শ্রী এন্ কে গৌর ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ।

কয়েকটি শাখাকেন্দ্রের উৎসব—ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এই বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে ৭ দিনকার কর্মসূচি অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পরিপালন করিয়াছেন। প্রথম দিন 'নারায়ণ সেবা', দ্বিতীয় দিন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, এবং তৃতীয় দিন ছিল 'বিবেকানন্দ বালকসঙ্ঘ' কর্তৃক পরিচালিত বালকদিগের উৎসব। চতুর্থ দিন 'মহিলা দিবসে' জননী সারদা দেবীর জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা-সভার নেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী রুক্মিণী আম্মা নরসিম্মিয়া। ভজন করেন 'শ্রীসারদা সেবিকা মণ্ডলী' এবং শ্রীমতী সি সরস্বতী ও শ্রীমতী সি নাগমণি। বক্ত্রী ছিলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাদ্বয়—শ্রীমতী শারদাম্মা ও শ্রীমতী এন্ এন্ কমলা। স্বামী বিবেকানন্দের জয়ন্তী-সভা (পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান) মহীশূর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে হনুমন্তাইয়ার পরিচালনায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী সম্মেলন (৬ষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান) মহীশূর হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এন্ শ্রীনিবাসরাওয়ের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। বক্তা ছিলেন মহীশূর এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। সপ্তম দিবস ছিল বালিকাদিগের উৎসবের জন্য।

কাঁথি শাখাকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র, '৬২। এই উপলক্ষ্যে আহূত একটি ধর্ম-সভায় এবং একটি ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেন মহকুমাশাসক শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২৪শে চৈত্র (১৩৬২) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ প্রধান বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরের দিন হয় প্রসাদ বিতরণ ও কীর্তন।

সরিষা (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ঠাকুরের জন্মোৎসব পরিপালন করেন ২৫শে চৈত্র। বৈকালে একটি জনসভায় স্বামী মহানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অভীত্ব'—এই বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা দেন।

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৪ই চৈত্র, ১৩৬২ (২৮।৩।৫৬) হইতে ৬ দিনব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দুই দিন সন্ধ্যায় শ্রীসুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'রামায়ণ'-গান হয়। তৃতীয় দিন সকালে হস্তীপৃষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদা দেবীর প্রতিকৃতি এবং চতুর্দোলায় স্বামীজীর ছবি সাজাইয়া শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন

রাস্তায় পরিক্রমা করে। ঐ দিন সকালে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। চতুর্থ দিন আর একটি সভায় শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনী আলোচনা করেন অধ্যক্ষা শান্তিসুধা ঘোষ (সভানেত্রী), অধ্যাপিকা প্রণতি দাম, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী অচিন্ত্যানন্দ। পঞ্চম দিন সকালে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নাম প্রচার সংঘ' সুমধুর কীর্তন করেন। দ্বিপ্রহরে কয়েক সহস্র নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের খিচুড়ীপ্রসাদ বসিয়া গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ওজস্বিনী ভাষায় স্বামীজীর বাণীর ব্যাখ্যা করেন। শেষদিনকার অনুষ্ঠান ছিল আশ্রমপরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ।

নারায়ণগঞ্জ (পূর্ব পাকিস্তান) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৭ই চৈত্র, (২১।৩।৫৬) হইতে ১৮ই চৈত্র (১।৪।৫৬) এই বারো দিন ধর্ম ও সংস্কৃতি-মূলক নানা কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণজন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সহস্রাধিক শ্রোতার একটি ধর্ম-সভা পরিচালনা করেন ভিক্ষু বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির। বক্তা ছিলেন স্বামী সত্যকামানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনার জন্য একটি মহিলাসভার নির্বাহ-নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ, এম্‌-এ, বি টি। আর একটি ছাত্রসম্মেলনে বক্তৃতা দেন ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিট্যুশনের প্রধান শিক্ষক শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত এবং স্বামী সত্যকামানন্দ। পাঁচ দিন রামায়ণ গানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 'বিবেকানন্দ বালক সংঘ' কর্তৃক 'বিচিত্র কাহিনী' অভিনয় দেড় সহস্র নরনারীকে আনন্দ দান করিয়াছিল। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ দুই দিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা আলোচনা করেন। উৎসবের শেষ দিন দশ হাজার নরনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক বসাইয়া প্রসাদ খাওয়ানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শাখাকেন্দ্রগুলি হইতে অনেক সাধুব্রহ্মচারী এই উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এই বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভজনাদি সহ সুসমারোহে সম্পন্ন হয়। একটি মহিলাসভার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্তা দক্ষিণাকালী মজুমদার। মহাকালী পাঠ-শালার ও ঈশান বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ ভজন, আবৃত্তি ও প্রবন্ধপাঠ করে। শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা কিরণবালা বসু, শ্রীযুক্তা মিনতি কর চৌধুরী এবং প্রধান শিক্ষক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে সমবেত দুই সহস্র মহিলার মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সোনারগাঁ (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় গত ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৬।১৭ই মে, ১৯৫৬)। প্রথম দিনের জনসভায় বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী অসিমানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী সত্য-কামানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও স্বদেশপ্রীতির কথা মনোরম ভাষায় বিবৃত করেন। তৎপরে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী জ্বালাময়ী ভাষায় স্বামীজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ মধুর ভাষায় তাঁহার বক্তৃতা দেন। রাত্রে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে স্বামীজীর জীবনকথা বর্ণনা করেন। পরের দিন সকাল হইতেই দলে দলে লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমে উপস্থিত হয়। যদিও সোনারগাঁর সেই গৌরবময়

যুগ নাই, বহু জনাকীর্ণ পথ আজ জনবিরল, বহুকণ্ঠ-নিনাদিত আকাশবাতাস আজ প্রায় নীরব তথাপি জাতিধর্মনির্বিশেষে সমাগত জনগণের আগমনে আশ্রমভূমি আলোড়িত হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমের পর চার হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে একটি বৃহৎ জনসভার অনুষ্ঠান করা হয়। এই দিন ঢাকার শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, এম্-এল্-এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীঅঘোরময় সেন মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ওজস্বিনী ভাষায় ঠাকুরের জীবনকথা ও জীবনে এবং সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই বৈশাখ পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের স্মৃতি-বার্ষিকী ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে একটি জনসভায় স্বামী প্রেমেশানন্দজী, স্বামী স্বানুভবানন্দ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের জীবন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের প্রচার বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। প্রায় ২০০০ নর-নারী তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরলোকে মিসেস্ ডেভিড্সন—নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার কার্যের একনিষ্ঠ সেবিকা মিসেস এলিজাবেথ ডেভিড্সন গত ১৪ই এপ্রিল তাঁহার নিউইয়র্কের বাসগৃহে ক্যান্সার রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার পরলোকগত স্বামী ২৫ বৎসর পূর্বে স্বামী নিখিলানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার কাজে সর্বভাবে সহায়তা করিতে থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ডেভিডসনের সারা মনঃপ্রাণ বেদান্তের অনুশীলন ও প্রচারে নিয়োজিত হয়। গত ১৫ বৎসর যাবৎ তিনিই ছিলেন নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের জনপ্রিয় কর্মসচিব। মৃত্যুর চার দিন পূর্বেও তিনি ঐ কেন্দ্রে আসিয়া কাজকর্ম করিয়া গিয়াছেন। মিসেস ডেভিডসন ভারতের ধর্মসংস্কৃতির একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন এবং দুইবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আমরা এই ভারত-প্রাণা বিদেশিনী ভক্তের লোকান্তরিত আত্মার পরমাশান্তি কামনা করি।

দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বেদান্ত সমিতিতে স্বামী মাধবানন্দজী—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী এবং বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি স্বামী নির্বাণানন্দজী তাঁহাদের সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরের প্রথম তিন সপ্তাহ হলিউড্স্থিত 'দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বেদান্ত সমিতি'তে অবস্থান করেন। এই সমিতির পরি-চালনাধীন স্যান্টা বারবারা শ্রীসারদা মঠে বেদান্ত মন্দিরের শুভ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে (১৩ই ও ১৯শে ফেব্রুআরি) তাঁহাদিগের যোগদানের সংবাদ আমরা উদ্বোধনের বৈশাখ সংখ্যায় পরিবেশন করিয়াছি।

২৪শে ফেব্রুআরি তাঁহারা দক্ষিণ প্যাসাডেনায় (South Pasadena) যে গৃহটিতে খ্রীঃ ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মীড ভগিনীত্রয়ের (Mead Sisters) অতিথিরূপে তিন সপ্তাহ বাস করিয়া-ছিলেন—ঐ গৃহটিকে একটি উপাসনাগারে পরিণতির উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্যাসাডেনা শহরের ৩০৯নং মণ্টেরি রোডে অবস্থিত এই গৃহটি সম্প্রতি দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বেদান্ত সমিতির অধিকারে আসিয়াছে। গৃহের দ্বিতলে স্বামীজী যে কক্ষে শয়ন করিতেন উহাই এখন পূজাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইবে। স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী নির্বাণানন্দজী, দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বেদান্ত সমিতির পরিচালক স্বামী প্রভবানন্দজী এবং তাঁহার সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ এই ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিবার পর সমাগত পঞ্চাশ জন ভক্ত বেদিতে

পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে সকলে বসিবার ঘরে আসিলে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের প্রসঙ্গ হয়। নবসমারব্ধ উপাসনাগারের জন্য মাধবানন্দজী স্বামীজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।

স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী তাঁহাদের দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বেদান্ত সমিতিতে অবস্থানকালে ইহার তিনটি কেন্দ্রের (হলিউড, স্যাণ্টাবারবারা এবং ট্রাবুকো) নিয়মিত দৈনন্দিন কর্মসূচিতে যোগদান করিয়াছিলেন। হলিউড কেন্দ্রে স্বামী মাধবানন্দজী দুটি রবিবাসরীয় বক্তৃতা দেন ; বিষয় ছিল—'বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী', এবং 'কর্মজীবনে বেদান্ত'। একদিন তিনি একটি গীতা ক্লাশও লইয়াছিলেন এবং অপর এক সন্ধ্যায় 'Gospel of Sri Ramakrishna' পাঠের পর শ্রোতৃবৃন্দের ধর্মবিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। অন্য একদিন একটি ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসু দলের নিকট তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা বর্ণনা করেন। স্বামী নির্বাণানন্দজী একদিন একটি বৃহৎ ভক্ত-সম্মেলনে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবনের প্রসঙ্গ দ্বারা সকলকে গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ দিয়াছিলেন।

বোস্টন ও প্রভিডেন্স বেদান্ত কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সংবাদ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ও প্রভিডেন্স বেদান্ত কেন্দ্রদ্বয়ের কর্মী, বন্ধু এবং ভক্তবৃন্দ স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজীকে সাতদিন (৭ই এপ্রিল হইতে ১৪ই এপ্রিল) তাঁহাদের মধ্যে পাইয়া বিশেষ আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। স্বামী মাধবানন্দজী ৮ই এপ্রিল, রবিবার সকালে বোস্টন বেদান্ত সমিতিতে এবং সন্ধ্যায় প্রভিডেন্স বেদান্ত সমিতিতে বক্তৃতা দেন। ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রভিডেন্সে এবং ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বোস্টনে ভক্তবৃন্দ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা স্বামী নির্বাণানন্দজীর মুখে শুনিতে পাইয়া প্রভূত পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

১০ই এপ্রিল প্রভিডেন্স কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবার্ষিকী পরিপালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে স্বামী মাধবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ, তাঁহার সহকারী স্বামী সর্বগতানন্দ, ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডুকাস্ (Prof. Ducasse) প্রেস্‌বিটেরিয়ান ধর্মযাজক ডক্টর রিচার্ড ইভান্‌স্ এবং স্বামী নির্বাণানন্দজী বক্তৃতা, অভ্যর্থনা এবং স্বস্তিবাচনাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত, ধর্মযাজক, আইনজীবী, চিকিৎসক এবং ভক্তগণ এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

১২ই এপ্রিল অনুরূপ একটি উৎসব বোস্টন বেদান্ত কেন্দ্রেও আয়োজিত হয়। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিশিষ্ট অধ্যাপক ওয়ালটার ম্যুলডার (Dean Walter Muelder) শ্রীরামকৃষ্ণ-ঋণী ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যে উহার কল্যাণকর প্রভাবের বিষয় গভীর আবেগের সহিত বর্ণনা করিয়া স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। স্বামী মাধবানন্দজী ছিলেন এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা। স্বামী নির্বাণানন্দজীও একটি সংক্ষিপ্ত উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন। উভয়েরই বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর একতান সমাদর লাভ করিয়াছিল। নিউইয়র্কের জনৈক প্রখ্যাত মেথডিস্ট ধর্মযাজক ডক্টর অ্যালেন ই ক্ল্যাক্সটন্ এবং পূর্বোল্লিখিত ডক্টর রিচার্ড ইভান্‌স্ আমেরিকান জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ-ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যমণ্ডলীর পূত প্রভাব তাঁহাদের ভাষণে উল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে স্বামী অখিলানন্দের প্রচারকার্যসমূহেরও তাঁহারা ভূয়সী প্রশংসা করেন। উৎসবান্তীভূত প্রীতিভোজে স্বামী অখিলানন্দ ছিলেন সভাপতি। স্বামী সর্বগতানন্দ মঙ্গলাচরণ করেন।

এই প্রীতিভোজে নিউটন থিয়লজিকাল সেমিনারীর প্রেসিডেণ্ট হেরিক, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ কেসের (Mr. Case) পক্ষে তদীয় পত্নী মিসেস কেস্‌, হার্ভার্ড ডিভিনিটি স্কুলের ডক্টর ও মিসেস জর্জ উইলিয়াম্‌স্‌ এবং সমিতির ভক্তগণ ব্যতীত আরও অনেক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মযাজক, চিকিৎসক ও বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মচারী মুকুন্দ চৈতন্যের দেহত্যাগ—গভীর দুঃখের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম তরুণকর্মী ব্রহ্মচারী মুকুন্দ চৈতন্য (পূর্ব-নাম—বামন বালিগা) গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮।৫।৫৬) মাদ্রাজ ক্যান্সার ইনষ্টিট্যুটে সকাল ৫।১০ মিনিটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে তিনি পেটে ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।

পশ্চিম ভারতের কোংকোন অঞ্চলের অধিবাসী যুবক বামন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯৪৭ সালে মিশনের করাচি কেন্দ্রে যোগদান করেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রদীক্ষাগুরু। বর্তমান মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ যুবককে ১৯৫২ সালে 'ব্রহ্মচর্য ব্রত' দান করেন। কনখল সেবাশ্রমে এবং কলিকাতা কালচার ইনষ্টিট্যুটে কর্মীরূপে থাকাকালীন তাঁহার অনলস উদ্যম ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। দুরারোগ্য ব্যাধির বিষম যন্ত্রণা এই তরুণ ব্রহ্মচারী যে ভাবে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। দেহভারমুক্ত ত্যাগী ভক্তের আত্মা ইষ্টপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

বিবিধ সংবাদ

শ্রীসারদা সঙ্ঘের প্রথম বাৎসরিক সম্মেলন—বিগত ৩০শে মার্চ, ১৯৫৬ হইতে ৩রা এপ্রিল, এই পাঁচদিন কলিকাতায় মহিলা ভক্তগণের ধর্ম ও সমাজমূলক প্রতিষ্ঠান 'শ্রীসারদা সঙ্ঘের' বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতিনিধি মহিলাগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রথম দিন বৈকালে রামমোহন লাইব্রেরীর সুসজ্জিত সভামণ্ডপে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুইখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতির সম্মুখে ছাত্রীগণ কর্তৃক বেদমন্ত্র পাঠ, বেদগান প্রভৃতি সহ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভার কার্য পরিচালনা করেন দিল্লী হইতে আগত প্রতিনিধি শ্রীমতী সীতাবাঈ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর নিম্নোক্ত আশীর্বাণী পাঠ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী।

"বিশ্বজীবনে প্রত্যেক জাতির পালনীয় এক একটা বিশিষ্ট ব্রত আছে। পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজী বলেছেন যে জগৎসভ্যতায় ভারতের দান আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে, ধর্মে। মানব-সভ্যতার প্রথম উষাগম থেকে ভারতবর্ষ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, পরমসত্যের উপলব্ধিতে নিহিত আছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। যুগ যুগান্তর ধরে এই সত্যের অনুধাবনই ভারতের শাশ্বত প্রচেষ্টা। এই সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত। বারংবার যুগে যুগে মহাপুরুষগণ, অবতার, আচার্য বা ঋষিগণ আবির্ভূত হয়ে আমাদের মাতৃভূমিকে পবিত্র ও ধন্য করেছেন এবং জাতির সম্মুখে এই আদর্শকেই রূপায়িত করেছেন।

বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর পুণ্যজীবনে এই আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ

প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছে। সমগ্র জাতি যখন এই প্রাচীন সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে তার কল্যাণ আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হল তখন তার সঙ্কীর্ণ অবরুদ্ধ পঙ্কিল জীবনকে মুক্তিদান করলেন তাঁরা তাঁদের পূত আবির্ভাবে। শত শত বৎসরের অন্ধ তমিস্রার পরে সূচনা হলো এক আলোকময় নবযুগের। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিকে যেমন ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত সারসমুচ্চয়,—তেমনি অন্যদিকে জননী সারদামণিও নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, পবিত্রতম মাতৃত্বের পূর্ণতম প্রতীক, জাতির শাশ্বত স্বপ্ন ও সাধনার লীলাবিগ্রহ। তিনি ছিলেন নারীজনোচিত সকল শ্রেষ্ঠ গুণের অপূর্ব সমন্বয়, যে গুণেরই বিকাশ দেখে আমরা ধন্য হয়েছি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মহীয়সী নারীদের মধ্যে যুগে যুগে। শুভ্র সমুজ্জ্বল অতীত এবং অনাগত গৌরবমণ্ডিত ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমান মিলনসূত্র হলেন তিনিই।

জাতির সম্মুখে এই মহান আদর্শকে সমুপস্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমার শুভ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্থাপিত এই শ্রীশ্রীসারদাসঙ্ঘের উপর তাঁর পুণ্য আশীর্বাদ নিরন্তর অজস্রধারে বর্ষিত হোক। তোমাদের এই মহতী প্রচেষ্টা সর্বথা জয়যুক্ত হোক্, এই আমার কামনা।"

(মূল ইংরেজী হইতে ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত)

এদিন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ডাঃ রমা চৌধুরী প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার। 'শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের' বাণী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন শ্রীমতী সীতাবাঈ। পরিশেষে শ্রীমতী শিবানী চক্রবর্তী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবস প্রতিনিধিবর্গকে বাগবাজারে শ্রীমায়ের বাড়ী, কাশীপুর উদ্যানবাটী, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, শ্রীসারদা মঠ ও বেলুড় মঠ পরিদর্শনে লইয়া যাওয়া হয়। ঐদিন প্রতিনিধি-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন (১লা এপ্রিল) বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় মহাবোধি সোসাইটি হলে সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ঐদিন আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল "আমাদের ঐতিহ্য।" সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী। এইদিন বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী গোমতী শ্রীনিবাসন (মাদ্রাজ), অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত (কলিকাতা), লীলাগোপাল পিল্লাই (ত্রিবেন্দ্রাম), ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী (কলিকাতা)।

সম্মেলনের চতুর্থ দিবস (২রা এপ্রিল) মহাবোধি সোসাইটি হলে পরবর্তী অধিবেশন হয়। সভানেত্রী ছিলেন রেঙ্গুনের প্রতিনিধি শ্রীমতী চিথ্ যঙ্। ঐদিন আলোচ্য বিষয় ছিল "শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর ধারাবাহিক জীবনী।" বাল্যজীবন আলোচনা করেন শ্রীমতী সরোজিনী মেনন (ত্রিবেন্দ্রম্) দক্ষিণেশ্বরের জীবন আলোচনা করেন শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী (নাগপুর), শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পরবর্তী কাল সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী (মাদ্রাজ) ও শ্রীমতী রঞ্জিতা দাস (পাটনা) এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অন্ত্যভাগ আলোচনা করেন অধ্যাপিকা বেলারাণী দে (কলিকাতা)।

সম্মেলনের পঞ্চম দিন (৩রা এপ্রিল) ছাত্র-দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জয়ন্তী চক্রবর্তী সভা পরিচালিকার ভার গ্রহণ করেন ও আলোচনায় অংশ লইয়াছিলেন শ্রীমতী রেবা রায় (বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণী), শ্রীমান কিশোরমোহন চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বয়েজ স্কুল), শ্রীমতী স্বস্তি চক্রবর্তী (মথুরানাথ বালিকা বিদ্যালয়) শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তী (লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ)। ঐদিন আলোচ্য বিষয় ছিল "শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী।"

পরলোকে অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন বহু পুরাতন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এবং আলিপুর দেওয়ানী আদালতের প্রবীণ

ব্যবহারজীবী শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ দত্ত গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে, ১৯৫৬) বেলা ৪॥টায় তাঁহার ১নং উমেশ দত্ত লেনস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর ৬ মাস হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করেন। অপূর্ববাবুর যে দুইজন কনিষ্ঠ সহোদর পরে মঠে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে (যিনি পরে মঠের অন্যতম প্রাচীন সাধু ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন) তিনিই স্বামীজীর নিকট লইয়া যান। অকৃতদার, পরদুঃখকাতর অপূর্ববাবু অপরের অজ্ঞাতে বহু সৎকাজ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নানা সময়ে তাঁহার নিকট অনেক সহায়তা পাইয়াছে। আমরা এই অনাড়ম্বর উদারহৃদয় মানবসেবকের পরলোকগত আত্মার উর্ধ্বগতি প্রার্থনা করি।

হুগলী বাবুগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—পূর্বের কয়েক বৎসরের ন্যায় এবারও হুগলী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৩০শে ফাল্গুন, '৬২ হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্যন্ত পাঁচদিন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব হুগলী বাবুগঞ্জ রথতলায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ পার্কে' অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, গীতা চণ্ডী কথামৃত এবং রামকৃষ্ণ-পুঁথিপাঠ, তথা আরতি ও ভজন হয়। প্রথম দিবস সন্ধ্যায় আলোকচিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রদর্শন ও পরে হাওড়া অভয় সঙ্গীত পরিষদ্ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকীর্তন হয়। দ্বিতীয় দিবস ডি, ভি, সির ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন অফিসার শ্রীঅজিতকুমার সেন মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা আলোচনা করেন। রাত্রে স্থানীয় অপেরা পার্টি কর্তৃক 'রাজলক্ষ্মী' যাত্রাভিনয় হয়।

তৃতীয় দিবস বেলা ৪টায় হুগলী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের শ্রীদুর্গাপুরী দেবী প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীহরিপদ গোস্বামী ভাগবতভূষণ ও তাঁহার সম্প্রদায় কর্তৃক লীলা-কীর্তন হয়। চতুর্থ দিবস ছাত্রছাত্রীদের শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামিজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় হুগলীর জেলা জজ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কর্তৃক পুরস্কার বিতরিত হয়। এই সভায় অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয়ের মহাভারতের কথা ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দের শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলীর সারার্থ-বর্ণনা সকলের মনোরঞ্জন করে।

শেষ দিন (৪ঠা চৈত্র, রবিবার) মধ্যাহ্নে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলা ৪টায় শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামায়ণ-গান এবং ৫॥ টায় সাধারণ সভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার সুললিত ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় চুঁচুড়া কামারপাড়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কালীকীর্তন সকলকে মুগ্ধ করে।

সিন্দ্রীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—সিন্দ্রী শহর-পুরায় অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক ৮ই এপ্রিল আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব এই কারখানা-শহরের অধিবাসিবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা দিয়াছে। উষাকীর্তন, চণ্ডীপাঠ, পূজা ও প্রসাদ বিতরণের পর বৈকালে একটি জনসভা পরিচালনা করেন সিন্দ্রী সারের কারখানার উৎপাদন-পরিচালক ডক্টর কে এল রামস্বামী। প্রধান অতিথিরূপে বক্তৃতা করেন রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা আরোগ্যভবনের সহকারী কর্মসচিব স্বামী আত্মস্থানন্দ। এই উপলক্ষ্যে একটি রচনা-প্রতিযোগিতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনী অবলম্বনে একটি চিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

জীবন-নাট্য

আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্ধং গতং
তস্যার্ধস্য পরস্য চার্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্॥

ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণবিভবঃ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলীমণ্ডিততনু-
র্নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্॥

ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্—৪৯, ৫০

মানুষের আয়ু তো পরিমিত হইয়াছে একশত বৎসর। তাহার মধ্যে অর্ধেক কাটিয়া যায় রাত্রিতে—রাত্রির তামস নিশ্চেষ্টতায়, সংজ্ঞাহীনতায়। বাকী অর্ধেক পরমায়ুর অর্ধভাগ চলিয়া যায় বাল্য এবং বার্ধক্যের গ্রাসে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে আছে ব্যাধি, শোক তাপ এবং আরও কত প্রকারের বিপর্যয়। এই বহুবাধাদুঃখবিড়ম্বিত স্বল্প সময়টুকুতেও কাজের কাজ কিছু হয় না, উহা ব্যয়িত হয় অপরের মন যোগাইতে, গর্দভের ন্যায় বোঝা বহিতে। ইহারই নাম জীবন, তাহাও আবার জলের তরঙ্গের অপেক্ষাও অস্থির। এমন জীবনে দেহীর আর সুখ কোথায় ?

[জীবন-নাট্যের দৃশ্যগুলি পর পর কিরূপ অভিনীত হইয়া যায় তাহাও কৌতুককর।] কিছুক্ষণ বালক, কিছুক্ষণ কামরসিক যুবা। কোন সময়ে বিত্তহীন, সহায়সম্বলহীন দুঃখী; আবার কিছুকাল প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক, জাঁকজমকে ঘেরা বিরাট ধনী। তাহার পর শেষ অঙ্ক। সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। নটুয়া দাঁড়াইয়াছে বৃদ্ধের ভূমিকায়; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জরাজীর্ণ, ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ, সারা দেহের চামড়া কুঞ্চিত। অবশেষে নাটক ভাঙে, সংসারের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়ে, অভিনেতা মানুষ চলিয়া যায় যবনিকার অন্তরালে—যমরাজের গৃহে।

কথাপ্রসঙ্গে

নূতন তীর্থ

ছয় লাইনের সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধার্ঘ,* কিন্তু তাহারই মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের অন্যতম মহৎ কীর্তির কথা কবির অভিনব কয়েকটি শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে—"নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।" এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে মানুষ দেশে দেশে কত না তীর্থ গড়িয়া তুলিয়াছে—ভগবানের দিব্যমহিমা ও ভগবদ্ভক্তগণের জন্মকর্মের সহিত জড়িত কত শত পবিত্র স্থান। যুগের পর যুগ ধরিয়া নরনারী এই সকল মঠ মন্দির-গির্জা-মসজিদ-কুণ্ড-দরগাকে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, উহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া নিজদিগকে পবিত্র মনে করিয়াছে। মানুষের ধর্মজীবনে তীর্থ একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে, সন্দেহ নাই।

মানুষের অন্তরশায়ী দেবতাকে তীর্থ বাহিরে ধরিয়া রাখে। সেই 'বাহির' ধরিয়াই তো মানুষ ক্রমে ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। একেবারেই অন্তর্লোকে প্রবেশের ক্ষমতা থাকে আর কয়জনের? মন্ত্র-তন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান মূর্তি-প্রতীক প্রভৃতির মতো তীর্থেরও অপরিহার্য প্রয়োজন রহিয়াছে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে। অসাধারণ মানুষ আর কয়টি হয়? যুগে যুগে সাধু-মহাপুরুষেরা তীর্থকে মানিয়া গিয়াছেন, তীর্থবাস করিয়া তীর্থের গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ তীর্থের সংস্কার করিয়াছেন, তীর্থকে কিন্তু নিন্দা কেহই করেন নাই।

ধর্মের সম্পর্ক ব্যতীতও আর এক রকমের তীর্থ গড়িয়া উঠে। মানুষের মহত্ত্বের স্মৃতি লইয়া, মানুষের ভালবাসা, পবিত্রতা, শৌর্যকে পরবর্তীকালের মানুষের কাছে বহন করিয়া কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান, পরিবেশ, হয়তো বা কোন সৌধ কিংবা শুধু লতাবিতান-ঘেরা সামান্য একটি ভূমিখণ্ড মানুষের মনোলোকে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কেহ ভগবানকে হয় তো বিশ্বাস করে না কিন্তু রক্তমাংসের ক্ষয়িষ্ণু দেহের মধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় মানুষ তাহার হৃদয়ের বিভিন্ন আবেগকে দেশকালের সীমার ঊর্ধ্বে স্পন্দিত করে। রক্তমাংসের দেহ চলিয়া গেলেও সেই অতীন্দ্রিয় মানুষটি মানুষের নিকট থাকিয়া যায়, থাকিয়া 'তীর্থ' রচনা করে। সে তীর্থ হয় তো 'লৌকিক' তীর্থ, কিন্তু উহারও প্রভাব মানুষের উপর কম নয়। সেই তীর্থের সম্মুখে আসিয়া ক্ষণিকের জন্যও মানুষ শুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, তাহার সঙ্কীর্ণতা, অহমিকা, অপবিত্রতা, স্বার্থপরতা ভুলিয়া যায়। মানুষের নিকট কোন কোন চলিয়া-যাওয়া মানুষ একটি পাবন শক্তি, আনন্দের প্রেরণা। 'আধ্যাত্মিক' তীর্থ যদি আমাদিগকে ভগবানের উপর ভালবাসা পরিপুষ্ট করিতে সহায়তা করে, তো 'লৌকিক' তীর্থ শিখায় মানবতাকে সম্মান করিতে।

ধর্মসম্পর্কিত তীর্থ এবং 'লৌকিক' তীর্থ, দুই তীর্থই প্রাচীন। নূতন তীর্থ তবে কি? শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশ্বকবির শ্রদ্ধাঞ্জলিতে যে নূতন তীর্থের বাহকরূপে বর্ণিত দেখিলাম উহা কোথায় গড়িয়া উঠিতেছে? কি ভাবে? কোন্ রূপে?

নূতন তীর্থ লৌকিক এবং অতি-লৌকিকের সমন্বিত তীর্থ—চরাচর অখিল ভুবন যে জ্ঞান-সত্তায় বিধৃত হইয়া আছে সেই সর্বাত্মক চৈতন্য-তীর্থ। 'জড়' দেখি বলিয়া আমরা 'আত্মা'কে আলাদা করি, 'লৌকিক' লইয়া মাতিয়া যাই বলিয়া সেই মত্ততার প্রতিষেধক হিসাবে 'অতিলৌকিক'কে খুঁজি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করিতে বসিয়া দেখিলেন দেওয়াল, কোশাকুশিও চৈতন্যময়, দেখিলেন বিড়ালের মুখে

* উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৪২ সংখ্যায় (শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা) প্রকাশিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব' সংজ্ঞক কবিতা। আরম্ভ—"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা।"

জগদম্বাই নৈবেদ্য খাইতেছেন, ছাদে উঠিয়া দেখিলেন ছাদও যে ইটসুরকিতে তৈরি সিঁড়িও তাহাই; জড় কিছুই নাই, সবই চৈতন্য। ভাবী বিবেকানন্দকে তিনি শিখাইলেন, "জীব-শিব"। উত্তরকালের বিবেকানন্দ তদনুযায়ী ঘোষণা করিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, সবই যখন চৈতন্য তখন মানুষে মানুষে ভেদ করিও না, জীবে-জগতে, জগতে-ব্রহ্মে সীমারেখা টানিও না। ছাদ হইতে নামিয়া সিঁড়িতেও ছাদের জ্ঞান প্রয়োগ কর, বহু উর্ধ্ব হইতে নীচে তাকাইয়া ঘর-বাড়ী মানুষ-জানোয়ার স্থাবর-জঙ্গম যে এক মহা-বিস্তৃতিতে বিলীন দেখিতে পাইয়াছিলে সেই একতার স্মৃতি নীচে নামিয়া অব্যাহত রাখ। বল, সব ব্রহ্ম, প্রাচীন উপনিষদের মন্ত্র নূতন করিয়া আবৃত্তি কর—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি
বিশ্বতোমুখঃ॥
—(শ্বেতাশ্বতর উঃ, ৪।৩)

"তুমি নারী, তুমিই পুরুষ; তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী; তুমি জরা-ভার বহন করিয়া দণ্ডহস্তে স্খলিতপদে চলিতেছ বৃদ্ধের সাজে, আবার তুমিই নবীন জীবনের ভূয়িষ্ঠ সম্ভাবনা লইয়া নবজাতক রূপে পৃথিবীর বুকে দেখা দিতেছ নানা দেহে, নানা আকৃতিতে।"

এই দৃষ্টি হইতেই গড়িয়া উঠে চৈতন্যতীর্থ—সারা-জগৎ জুড়িয়া গড়িয়া উঠে; নিভৃত মন্দিরে আবার জনাকীর্ণ সংসারে, সম্পদে আবার বিপদে, মাধুর্যে আবার ভয়ঙ্করে, জীবনে আবার মৃত্যুতে। অন্তরে বাহিরে সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্র সর্বাবস্থায় পরমাত্ম সত্তাকে লইয়া তখন চলা ফেরা, কাজ করা। ধরিত্রী পুণ্য, ধরিত্রীপৃষ্ঠের সব কিছু পবিত্র—মানুষ জীবজন্তু তরুলতা, মানুষের সমাজ সংসার আশা আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা। কিছুই ক্ষুদ্র নয়, কিছুই ব্যর্থ নয়, হেয় নয়। তীর্থময় জগৎ, সমগ্র জীবন এক মহাতীর্থ—চৈতন্য-মহাতীর্থ। যাহা কিছু আছে এক হইয়া আছে—স্বপ্রকাশ, চিরপ্রকাশ, সর্বব্যাপী, সর্বাবগাহী চৈতন্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে—এক লক্ষ্যে, এক উদ্দেশ্যে, এক অনুভূতিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের কী মহাসমন্বয়! ধর্মসমন্বয় ইহার তো একটি দিক মাত্র।

এই মহাতীর্থের সন্ধান দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কি মানুষকে নিশ্চল সমাধিতে কর্মহীন করিয়া রাখিলেন? না তো। কুঠীর ছাদ হইতে "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়"—ডাক শুরু করিয়া দিনের পর দিন তিনি নিজে তো জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর পাগল হইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইলেন, কত লোককে একত্রিত করিলেন, কানে চৈতন্যমন্ত্র শুনাইয়া আউল করিলেন, বাউল সাজাইয়া নিজের মতো ছুটাইতে লাগিলেন। কেহ তো চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিল না। ছুটিয়া, খাটিয়া কেহ তো অভিযোগ আনিল না, আফশোষ করিল না। সকলেই বলিল, আমরা ধন্য; বিরাটের সেবায় 'খুন' (রক্ত) দিয়া, 'পসীনা' (ঘাম) বাহির করিয়া আমরা তীর্থযাত্রার সার্থকতা লাভ করিয়াছি।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভারতবর্ষে নূতন কথা নয়, কিন্তু এই কথা অরণ্যেই শোনা যাইত, গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের মুখেই উচ্চারিত হইত। এই শব্দকে যে হাটে বাটে ধ্বনিত করিয়া তোলা যায়, বনের বেদান্তকে যে ঘরে আনা যায় তাহাই দেখাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তো নূতন তীর্থ গড়িয়া উঠিল—ভাগবত চেতনার পটভূমিকায় মানবের মর্যাদা, নারীর মর্যাদা, সংসারের কর্মক্ষেত্রের মর্যাদা, জীবনের মর্যাদা। ঐ মর্যাদার বনিয়াদ অগস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) এবং তদনুসারিগণের ঈশ্বর-বিযুক্ত সমাজ-কেন্দ্রিক মানবিকতা (Humanism) নয় অথবা জগৎ ও জীবনকে প্রত্যাখ্যানকারী কোন অতিলৌকিক আধ্যাত্মিকতাও নয়, ইহা বিশ্বচৈতন্যাত্মকতা, লৌকিক এবং অতিলৌকিক দুই-ই এখানে

সমন্বিত। উপনিষদের ইহাই মর্মবাণী। উপনিষদের ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর বর্ণনা করিতেছেন—

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি॥

—(ধন্যাষ্টকম্)

"যিনি পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ নন্দনবন হইয়া যায়, সকল বৃক্ষই কল্প-বৃক্ষের ন্যায় শোভা পায়, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত সকল বাক্যই বেদবাণীর তুল্য পবিত্র মনে হয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে সারা পৃথিবী তখন বারাণসী সমান, সকল জল গঙ্গোদক, সকল কর্মই পুণ্যকর্ম। তিনি যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ব্রহ্ম হইতে কখনও বিযুক্ত হন না।"

মানুষের মূল অন্বেষণ না করিয়া আমরা যখন মানবিকতার কথা বলি তখন সেই মানবিকতা আমাদিগকে বেশী দূর লইয়া যায় না—উহা মানব-সমাজকে স্বার্থসংঘর্ষ, ঘৃণা, সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা করিতে পারে না, বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ উহাতে নিহিত নাই। পক্ষান্তরে, মানুষকে যখন আমরা বুঝিতে পারি আত্মিক সত্তারূপে তখনই মানবিকতার শ্রেষ্ঠ মূল্য নির্ণীত হয়। মানুষ তখন তীর্থ—সেই তীর্থের সম্মুখে মানুষের কোন নীচতা মাথা তুলিতে পারে না, মানুষ তখন মানুষকে অপমান করিতে পারে না। সেইরূপ, জগতের মূল অনুসন্ধান না করিয়া আমরা যদি জাগতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে যাই তাহা হইলে আমাদের প্রতি-পদে 'জাগতিকতা'র কবলে পড়িবার সম্ভাবনা। ঐ জাগতিকতা হইতে আসিবে বিদ্বেষ, দম্ভ, প্রভুত্ব-স্পৃহা। যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীতে শুরু হইবে নরকের তাণ্ডব বীভৎসতা। সেই বিপদ হইতে যদি রক্ষা পাইতে হয় তাহা হইলে সংসারের মূলে চৈতন্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে। তবেই সংসারে স্বর্গ নামিয়া আসিবে।

হ্যাঁ, জগতে নূতন তীর্থ রূপ লইয়াছে। জগৎ ও জীবনের মূলে যে পরম সত্য আছে সেই সত্যের অবিসম্বাদিত উদার নির্ণয় এবং উহার বাস্তব উপলব্ধির জন্য গভীর প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আমরা পাইয়াছি। ঐ নির্ণয়কে যদি আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি, ঐ প্রেরণাকে যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি তাহা হইলে আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই পুণ্য তীর্থে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রসাদ লাভ করিব। কোন মানুষকেই, কোন কর্মক্ষেত্রকেই আমরা আর ছোট করিয়া দেখিব না, মানুষের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষায় সত্যশিব সুন্দরের সুর শুনিতে পাইব। বুঝিব জীবনের সত্য ভূমা—জীবনের লক্ষ্য, সাধনা এবং সিদ্ধিও ভূমা। *সমগ্র জীবনে সেই ভূমাকে এই* ব্যাপকভাবে পাওয়ার নামই "নূতন তীর্থের রূপ নেওয়া।"

ব্রহ্মচর্যের পরিধি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারিগণ যে ব্রহ্মচর্য পালন করেন উহার চরম লক্ষ্য হইল ব্রহ্মকে লাভ করা—"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি।" কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্মলাভ লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামান না তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্যের কোন উপযোগিতা নাই। ব্রহ্মচর্য মানবজীবনের সর্বস্তরেই একটি কল্যাণকর শক্তি। সেইজন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতির বনিয়াদ ছিল ব্রহ্মচর্য। গুরুগৃহে বাসকালে বিদ্যার্থিগণের এই বনিয়াদ পাকা হইয়া গড়িয়া উঠিত এবং উত্তরজীবনে কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই উহা মানুষের চরিত্র এবং কর্মশক্তিকে দৃঢ় রাখিত। সম্প্রতি আচার্য বিনোবা ভাবে ব্রহ্মচর্যের পরিধি এবং প্রভাব সম্বন্ধে একটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করিয়াছেন। (ভূদানযজ্ঞ পত্রিকা, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, '৬৩)। আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"'ব্রহ্মচর্য' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে ব্রহ্মের খোঁজে নিজের

জীবন-ক্রম রাখা ; এতে আমরা কোন 'নেগেটিভ' (অভাবাত্মক) নয়, বরং 'পজিটিভ' (ভাবাত্মক) জিনিসই রাখি। 'ব্রহ্মচর্যের' অর্থ হল সর্বাপেক্ষা বিশাল ধ্যেয় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করা। এর থেকে একটু কম কিছু এতে নেই।

"যে কোন বড় ধ্যেয়ের জন্যে ব্রহ্মচর্যের সাধনা করা যেতে পারে—ভীষ্ম যেমন তাঁর পিতার জন্যে ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছিলেন এবং সারা জীবন তা ভাল ভাবে পালন করেছিলেন। এভাবে চলতে গিয়ে তিনি পরে এর আধ্যাত্মিক গভীরতায় পৌঁছে গেলেন। ভীষ্ম আত্মনিষ্ঠ বিরাট পুরুষদের একজন। কিন্তু তিনি প্রথমে যা আরম্ভ করেছিলেন তা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যে আরম্ভ করেন নি। * * * গান্ধীজীও প্রথমে ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করেন সমাজের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ করার সময় তিনি বুঝেছিলেন সেবার কাজ কঠিন। সেবাও চলতে থাকবে, পরিবারবৃদ্ধিও হতে থাকবে—তা হয় না। তাই তিনি ঠিক করলেন, সমাজসেবার জন্যে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। কিন্তু তাঁর বিচার পরে এর গভীরতায় পৌঁছায়। * * * এভাবে কোন ব্যাপক ও বড় লক্ষ্যের জন্যে কাজ শুরু করলে ক্রমে তা আরও এগিয়ে যেতে থাকে।

"অন্য সব কাজের জন্যেও ব্রহ্মচর্য পালন করা যেতে পারে। কিছু লোক বিজ্ঞানচর্চার জন্যেও ব্রহ্মচর্য পালন করেন। বিজ্ঞানচর্চার জন্যে এত একনিষ্ঠ হয়ে যান যে, সে অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে না-পড়া উচিত বলে মনে করেন। * * * তন্ময়তার এক বিরাট শক্তি রয়েছে। কোনও এক ধ্যেয়েতে তন্ময় হয়ে যাও, রাতদিন তারই চিন্তা কর, তো ব্রহ্মচর্যও এসে যাবে। এ ঠিক যে, পুরা ব্রহ্মচর্য এ নয়। * কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠা না এলে তাকে ব্রহ্মচর্য বলা যাবে না।"

বিনোবাজী প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যপ্রথার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উহা ছিল মানুষের সামগ্রিক জীবনের একটি নিষ্ঠা, যদিও জীবনের এক এক ক্ষেত্রে উহার রূপ ও প্রয়োগ ছিল পৃথক।

"আজকাল 'বুনিয়াদী শিক্ষা'র কথা বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ যা জীবনভর কাজে লাগবে, যেমন উদ্যোগ ইত্যাদি, তার বুনিয়াদ পাকা করা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য এসব থেকে অনেক বড় গুণ। এ এমন গুণ, যা থেকে নিয়ত সাহায্য মেলে এবং জীবনের সর্বপ্রকার বিপদে সহায়তা পাওয়া যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় এ জন্যই এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে ছোট বয়স থেকেই ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা আসে।"

"দ্বিতীয় আশ্রম গৃহস্থাশ্রম। এতে স্বামী-স্ত্রীর একের অন্যের জন্য নিষ্ঠা আসবে। ব্রহ্মচর্যকে এখানেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। * * * গৃহস্থাশ্রমের আধারও ব্রহ্মচর্য। তারপর বাণপ্রস্থাশ্রম। এখানে ব্রহ্মচর্য চলবে সমাজনিষ্ঠার সঙ্গে। তারপর অন্তিম আশ্রম সন্ন্যাস-আশ্রম। সন্ন্যাস-আশ্রমে ব্রহ্ম-নিষ্ঠা আসে। এখানেও ব্রহ্মচর্য রয়েছে। এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের বিচার রাখা হয়েছে।"

বিনোবাজী কয়েকটি ধর্মের ব্রহ্মচর্য-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন :—

"ইসলাম বিচার রেখেছেন যে, গৃহধর্মই পূর্ণ আদর্শ। ব্রহ্মচারীর আদর্শ গৌণ আদর্শ। ভগবান ঈশা আদরণীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর জীবনকে পূর্ণ-জীবন বলা যায় না। মহম্মদের আদর্শ পূর্ণ। তিনি গৃহস্থ ছিলেন। মুসলমানদের চিন্তন এভাবে চলে।

"* * * প্রটেষ্টাণ্টরা এ বিষয়ে অনেকটা মুসলমানদের মতো। তাঁদের কাছে ব্রহ্মচর্য এক অসম্ভব বস্তু এবং গৃহস্থাশ্রমই আদর্শ। অন্যদিকে ক্যাথলিকদের মধ্যে ভাই-বোনেরা সকলেই ব্রহ্মচারী হতে পারেন।

"বৈদিক ধর্মে অন্য কথা রয়েছে। এখানে ব্রহ্মচারীকেই আদর্শ মানা হয়েছে। মাঝখানে যে গৃহস্থাশ্রম আসে, তা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এভাবে নিয়ন্ত্রণের এক সামাজিক যোজনা করা হয়েছিল, যাতে মানুষ উপরের সিঁড়িতে সহজেই উঠতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মচর্যই ছিল সর্বোত্তম আদর্শ।"

ব্রহ্মচর্য-সাধনে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও সমান প্রয়োজনীয়তা ও অধিকার থাকা উচিত। প্রাচীন ভারতে এইরূপই ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির প্রতিধ্বনি* করিয়া বিনোবাজী বলিতেছেন—

---

* স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

"সত্যের সর্বোচ্চ শিখরে, পরব্রহ্মে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। * * * পুরুষ ও নারীর মধ্যে বাহ্যতঃ পার্থক্য থাকিলেও তত্ত্বতঃ উহার অস্তিত্ব নাই। পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, নারীও পারিবে না কেন? * * * অবনতির যুগে যখন পুরোহিতরা ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে বেদপাঠে অনধিকারী বলিয়া নির্দেশ দিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকেও সর্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। * * * দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রের মত বৈদিক ক্রিয়াতেও গৃহস্থের সহধর্মিণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল, অথচ পৌরাণিক যুগে প্রচলিত শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার স্ত্রীলোকের নাই। * * * মহীয়সী রমণীদের যখন প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে অধিকার ছিল তখন বর্তমান যুগেই বা নারীদের কেন তাহা থাকিবে না?"

"স্ত্রী-পুরুষে ভেদ টানা হয় মধ্যবর্তীকালে, যখন থেকে হিন্দু ধর্মের দুর্দশা হয়েছে। ব্রহ্মচর্যে অধিকার কেবল ছেলেদের থাকল, মেয়েদের নয়। মেয়েদের গৃহস্থাশ্রমী হতেই হবে এরূপ মেনে নেওয়া হল। কেউ যদি গৃহস্থাশ্রমী না হত তবে তা অধর্ম হত। অধর্মের আরোপ সহ্য করেও কিছু এমন মেয়ে বেরুলেন যাঁরা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচারিণী হলেন। যেমন মীরাবাঈ, মহারাষ্ট্রের মুক্তাবাঈ। * * * ব্রহ্মচর্যে মেয়েদের অধিকারই থাকবে না এ ভুল। এতে আধ্যাত্মিক 'ডিসেবিলিটি' (disability)—অপাত্রতার সৃষ্টি হয়। * * * ভারতে মাঝখানে যে তেজহীনতা দেখা দিয়েছিল তার এও এক কারণ যে ব্রহ্মচর্যে মেয়েদের অধিকার ছিল না।"

এক ধরনের সাহিত্য—যাহা জৈবিক বাসনা হইতে নিষ্কৃতি ও ব্রহ্মচর্যরক্ষার প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়, বিনোবাজীর মতে পাঠকের চিত্তে সদ্ভাব অপেক্ষা কুভাবই সঞ্চার করে। উহা অমৃতের নামে বিষ।

"আমি দেখেছি, শৃংগারিক সাহিত্য থেকে মানুষ যত অধঃপাতে যেতে পারে তার চেয়েও বেশীদূর যেতে পারে ঐ সাহিত্য পড়লে।"

ব্রহ্মচর্য-প্রসঙ্গে বিনোবাজী এই বিষয়টি জোর করিয়া বলিয়া খুব ভাল করিয়াছেন। বাংলাদেশে এই ধরনের 'অমৃতের নামে বিষ' বাজারে দেখা যাইতেছে। এ সকল পুস্তকের নামই এমন উত্তেজনাময় যে যুবক-যুবতীরা অত্যন্ত আগ্রহে উহা লুকাইয়া পড়িতে চায়, সদ্ভাবের প্রেরণা পাইবার জন্য নয়, যৌন সাহিত্যের বিকৃত আবেদন খুঁজিবার জন্য।

যে বলিষ্ঠ ইতিবাচক চারিত্রিক শীল রূপে ব্রহ্মচর্য-সাধনা প্রাচীন ভারতীয় জীবনকে ব্যাপকভাবে অধিকার করিয়া থাকিত উহা আবার আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী—ইঁহারা সকলেই ইহা বার বার বলিয়া গিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য যাঁহারা ভাবেন এবং চেষ্টা করিতেছেন এই বিষয়ে আচার্য বিনোবা ভাবের সুচিন্তিত মতও তাঁহাদিগের অনুধাবনযোগ্য।

গান্ধী না গীতা?

গত ২৯শে মে, কাঞ্চি সর্বোদয় সম্মেলনের অন্তিম অধিবেশনে আচার্য বিনোবা ভাবের একটি মন্তব্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার।* কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের আগে গান্ধীজীর সম্মতি ও আশীর্বাদ লওয়া হইয়াছিল নেতারা আজকাল অনেক সময়েই ইহা বলিয়া কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতীয় পক্ষের ন্যায্যতার সমর্থন করেন।

বিনোবাজীর মতে ইহা তাঁহার কাছে আশ্চর্য লাগে। গান্ধীজীর নাম না করিয়া নেতারা গীতার নাম করেন না কেন? ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে গীতার নির্দেশ নাই কি? মহাত্মা গান্ধী নিজে গীতা কত উদ্ধৃত করিতেন। নেতাদের বুঝি ভয় গীতা 'সেকেলে' গ্রন্থ। তাহা হইলে তো গান্ধীজী তখন যাহা বলিয়াছিলেন উহাকেও বর্তমানকালে 'সেকেলে' বলিতে পারা যায়। গান্ধীজী নূতন নূতন পরিবেশে তাঁহার পুরাতন মত বদলাইতেন। সত্যের সন্ধানে তিনি ছিলেন অনবরত ক্রমবিকাশশীল। ১৯১৮ সালে গান্ধীজী সর্বপ্রযত্নে ব্রিটিশের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—কিন্তু ১৯৩৯ সালে তাঁহার ভূমিকা কি দাঁড়াইল? একটি পয়সা বা একজন লোক দিয়াও তিনি সরকারকে সাহায্য করিতে চাহিলেন না। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিয়া আলাদা হইলেন, এমন কি তাঁহারা কতকগুলি সর্তে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতাও করিতে চাহিলেন। গভর্ণমেণ্ট ঐ সর্তগুলি মানিতে স্বীকার না করাতে তাঁহাদিগকে অবশ্য আবার গান্ধীজীর নিকট ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। বিনোবাজীর ভাষা—

"তাই বলিতেছিলাম নূতন পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর নামের দোহাই দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। জীবনের প্রতি মুহূর্তে

* "Conjeevaram Sarvodaya Conference"—By Suresh Ramabhai (Hindusthan Standard 19th June, 1956).

তিনি সত্যের নব নবতর দৃষ্টিলাভে উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর শিখরে আরোহণ করিয়া চলিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁর গোঁড়ামি ছিল না এবং পুরাতন সিদ্ধান্ত আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতেন না।"

বিনোবাজীর মতে গান্ধীজীকে যখন তখন উদ্ধৃত করিলে তাঁহার উপর অবিচার করা হয়। আমাদের এখন প্রয়োজন শান্তি অব্যাহত রাখিয়া বর্তমানের বহুতর সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা।

আমাদের শিক্ষণীয়

দক্ষিণপূর্ব ইওরোপের কিঞ্চিন্যূন ৪৩ হাজার বর্গমাইলের ক্ষুদ্র দেশ বুলগেরিয়া, অধিবাসি-সংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষ ২২ হাজার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৬এর সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর হইতে আজ দশ বৎসরে এই ক্ষুদ্র দেশটি শিল্প বিজ্ঞান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে এবং করিয়া চলিতেছে তাহার পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত 'Hindusthan Standard' পত্রিকার 'বুলগেরিয়া ক্রোড়পত্রে' পাঠ করিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

বুলগেরিয়ার নূতন সংবিধানে শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত। জনগণের সরকার শাসনভার লইয়া সর্বপ্রথম শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উপরই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। শত শত নৈশবিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কগণ কাজের অবসরে শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিল; ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদল, আলোচনা-আসর, কারখানা-গ্রন্থালয় প্রভৃতির দ্বারাও শ্রমিক, মজুর ও কৃষকগণ নানাপ্রকার কারিগরী শিক্ষালাভ করিয়াছিল। বর্তমান বুলগেরিয়ায় ১৫ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাগণ সরকারী ব্যয়ে আবশ্যিক (Compulsory) শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। একটিও শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক যাহাতে অশিক্ষিত না থাকে সরকারের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। বুলগেরিয়ার প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে বিদ্যালয় আছে। দূরে কোন পার্বত্য গ্রামে হয়তো মাত্র ১০টি পড়ুয়া লইয়াও একটি স্কুল খোলা হইয়াছে। ছোট ছোট গ্রামের স্কুলগুলিতে (গ্রেড স্কুল) ৪ বৎসর পড়িবার ব্যবস্থা। তাহার চেয়ে বড় স্কুল—প্রাথমিক বিদ্যালয়; এখানে ৭ বৎসরের শিক্ষা-তালিকা। গ্রেড স্কুলের পড়া শেষ করিয়া ছাত্রেরা অন্য গ্রামে গিয়া প্রাইমারী স্কুলে পড়ে; সেখানে তাহাদের বিশেষ বোর্ডিংএর ব্যবস্থা রহিয়াছে। রুগ্ন বালক-বালিকাগণের জন্য মুক্ত বায়ুতে পরিচালিত পৃথক বিদ্যালয় আছে। কতকগুলি ডাক্তারখানার সংলগ্ন বিদ্যালয়েও এই ধরনের রুগ্ন শিশুরা লেখাপড়া করিতে পারে। শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া হইয়া থাকে। (বুলগেরিয়ার অধিবাসিবৃন্দ ৮৮% বুলগার। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আছে তুর্কী, ইহুদী, রুমানীয়, জিপসি ইত্যাদি)।

মাধ্যমিক শিক্ষা-তালিকা শেষ হয় ৪ বৎসরে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া বালক-বালিকারা সংযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারে। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক লইয়া মোট ১১টি শ্রেণী। ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ৬৫·৭১% ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, ২৭·২০% ভাগ গিয়াছিল শিল্প-বিদ্যালয়ে, অবশিষ্ট ৭·০৯% ভাগ শিক্ষার্থীকে সরকার অন্যপ্রকার কোর্স ও নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়াছিলেন।

৭ বৎসর বয়সে আবশ্যিক শিক্ষার আরম্ভ। কিন্তু তাহার আগেও সরকারী পরিচালনায় ২,০০০ কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের মাধ্যমে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এখানে ৮০,০০০ শিশু খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষকশিশুদের জন্য আছে ৪,০০০ সাময়িক নার্সারী স্কুল।

গণসরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য মাত্র ৭টি প্রতিষ্ঠান ছিল;

শিক্ষার্থী-সংখ্যা ছিল ৭,০০০। এখন ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০, ছাত্রসংখ্যা ৩০,০০০। বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা দিবার জন্ম বুলগেরিয়ায় নানা পাঠচক্র আছে। ইহাদের মাধ্যমে ১৯৫৪-৫৫ সালে ২ লক্ষেরও উপর শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিয়াছে।

গত দশ বৎসরে বুলগেরিয়ার শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজেদের দেশের সকল চাহিদা মিটাইয়া এই ক্ষুদ্র দেশ এখন বাহিরে কারখানা- ও যন্ত্রশিল্পজাত নানা দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারে। গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৫৬) ভারত ও বুলগেরিয়ার মধ্যে এক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। তদনুসারে বুলগেরিয়া আমাদিগকে পাঠাইবে ডিসেল এঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক সামগ্রী (কারবাইড, কার্বামাইড প্রভৃতি) এবং ঔষধপত্র ; আমরা দিব চা, মশলা, তুলা, শেলাক, মোম, রঞ্জন, রবার, চামড়া প্রভৃতি—অর্থাৎ সবই কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল।

ক্ষুদ্র দেশ বুলগেরিয়ার দশ বৎসরে আশ্চর্য বৈষয়িক উন্নতি সাধনের মূলে তাহাদের জাতীয় একতা, ব্যাপক শিক্ষা-প্রসার এবং স্বদেশপ্রেম যে প্রধান স্থান জুড়িয়া আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বোল্লিখিত 'বুলগারিয়া ক্রোড়পত্রটির' সমস্ত প্রবন্ধগুলি পড়িলে এই ধারণাই হয়। রাজনৈতিক দলাদলিতে শক্তিক্ষয় না করিয়া সমগ্র জাতি নানাবিধ গঠনমূলক কাজে লাগিয়া গিয়াছে, সরকার সংখ্যালঘুদের অসন্তোষের কোন কারণ রাখেন নাই, ব্যাপক শিক্ষার ফলে গণমানসে জাতীয় কল্যাণবোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের নিকট জাতির বৃহৎ স্বার্থ বলিদানের কথা সেখানে কেহ ভাবিতেও পারে না।

অসতো মা সদ্গময়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অনিত্য হইতে মোরে নিত্যে ল'য়ে যাও!
ছায়া দিয়ে, মায়া দিয়ে কেন গো ভুলাও?
প্রিয় ব'লে যাহা কিছু আঁকড়িয়া ধরি—
আজ আছে, কাল তারা কোথা যায় সরি!
অন্ধকার হ'তে লও তোমার আলোতে!
সর্বব্যাপী হে চৈতন্য! এ বিশ্বজগতে
যা-কিছু রয়েছে তুচ্ছ অথবা বিপুল
সবারে জানিছ তুমি। অরণ্যের ফুল
ক্ষুদ্রতম—তারও পিছে তোমার যতন!
সীমাহীন মহাশূন্যে অসংখ্য তপন—
তাদেরও জানিছ তুমি! সর্বজ্ঞ ঈশ্বর,
পার ক'রে দাও এই সংশয়-সাগর!
কাঁদিতেছি মৃত্যুময় সংসারের তীরে;
ডুবাও আমারে তব সুধাসিন্ধুনীরে!

ভক্তি

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

আজকের প্রসঙ্গ হলো, ভক্তি।

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

"ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে অবিবেকী ব্যক্তিগণের যে প্রগাঢ় প্রীতি বর্তমান, তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও অন্তর্হিত না হয়।" স্বামী বিবেকানন্দ 'ভক্তি-রহস্য' গ্রন্থে বলেছেন, প্রহ্লাদের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা। সাধারণ লোকের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে ঘোর প্রীতি ও আসক্তি, সেই প্রীতি ও আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হলেই তাকে 'ভক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়।

গীতামুখে ভগবান বলেছেন,—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥
(৮।২২)

শ্লোকটির ভাব হলো, একমাত্র ভক্তির দ্বারাতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে অনন্যা ভক্তির কথাই বলছেন; একটি পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁকে লাভ করার, সেটি হলো ভক্তি বা ভালবাসার দ্বারা। যিনি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন এবং ভূতসকল যাঁর অভ্যন্তরে স্থিত, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। এই ভক্তির কথাই শাণ্ডিল্য এবং নারদ তাঁদের উপদেশে বলে গেছেন। গীতায় "অনন্যা" শব্দটির কয়েক বার ব্যবহার দেখা যায়। আর একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (৮।১৪)

"অনন্যচেতা হয়ে, অন্য দিকে মন না দিয়ে, একমাত্র আমাকেই যে অবলম্বন ও স্মরণ করে সেই নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি অনায়াসলভ্য হই। সেই ভক্ত আমাকে সহজেই পায়।" এই ভক্তির মূলে রয়েছে প্রাণঢালা ভালবাসা। এই অনন্যা ভক্তিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া চাই। গীতায় আরও একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
(৯।২২)

"যে অনন্যচিত্ত হয়ে আমার উপাসনা করে সেই নিত্যযুক্ত ভক্তের অন্নবস্ত্রাদি যা কিছু প্রয়োজন (যোগ) আমি স্বয়ং মাথায় করে বয়ে দিয়ে থাকি, কারুর দ্বারা পাঠিয়ে দিই না। ভক্তের সেই সমস্ত দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণও (ক্ষেম) আমি নিজেই করি।" সেই ভক্ত সকল সময় তাঁকে চিন্তা করছে, তার ষোল আনা মনই যে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত। ভক্ত হতে পারলে ভগবানেরই বিপদ! এই ভক্তিটাই অনন্যা ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে মানবকল্যাণের জন্য অধিকারী ভেদে শ্রেয়োলাভের তিনটি পথ নির্দেশ করেছেন—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ। ঠাকুর ছোট্ট কথায় বলেছেন,— "বাড়ীতে মাছ এলে মা নানা রকম তরকারি করে ছেলেদের খাওয়ান, যার যেমন পেটে সয়।" কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াসক্ত অর্জুনকে কর্মের

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজ্যপাদ সহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের ৯।৪।৫৪ তারিখের একটি ধর্মপ্রসঙ্গ। শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক শ্রুতলিখিত।

ভিতর দিয়ে ভক্তির উপদেশ দিলেন। বললেন,—"তুমি কর্মযোগের অধিকারী, অন্য পথ তোমার নয়। আমাকে আশ্রয় করে কর্ম করো।" যাদের রাজসিক প্রকৃতি তাদের জন্য এই-ই পথ অনন্যা ভক্তি লাভ করবার। অর্জুনের রাজসিক প্রকৃতি। হিংসার ভিতর দিয়ে তিনি নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর উপযোগী পথ নির্দেশ করলেন। যারা ভগবানকে আশ্রয় না করে কর্ম করে তারা নিজের আমিত্বেরই সেবা করে, ভগবানের সেবা করে না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদাশ্রিত কর্ম করতে বললেন। "মামনুস্মর যুধ্য চ।" আবার বৃন্দাবনের গোপীদের তিনি নিছক ভক্তির উপদেশ দিয়েছিলেন। গোপীরা বিষয় চান আবার সেই সঙ্গে ভগবানকেও চান। ভিন্ন ক্ষেত্রে, অধিকারী ভেদে, ভিন্ন পথ। যাদের রাজসিক প্রকৃতি, তারা যদি সাত্ত্বিক সাধন করতে যায় তাদের হবে না। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পথ দেখালেন কর্মের ভিতর দিয়ে, আর গোপীদের পথ নির্দেশ করলেন নিছক ভক্তির ভিতর দিয়ে। শ্রেয়োলাভের তৃতীয় পথটি হলো জ্ঞানের পথ, জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ তাদেরই জন্য যাদের সংসারবাসনা, ভোগবাসনা একেবারে চলে গেছে। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানের পথ আশ্রয় করতে বলেছিলেন। উদ্ধবকে তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি আর কিছু নয়, ত্যাগের কথা।

* * *

ঠাকুর নানাভাবে ভক্তির কথা বলেছেন। জ্ঞানভক্তি: অর্থাৎ বিচার করা ভক্তি। ভগবান আছেন, আমি তাঁর সন্তান বা দাস,—এইভাবে এই বিশ্বাসে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর আরাধনা। অনেকে বলে, বিশ্বাস অন্ধ। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস বলে কোন জিনিস নেই। বিলেতে রাজাকে দর্শন করে এসে একজন বললে,—"রাজাকে দর্শন করেছি।" তার কাছে শুনে বিশ্বাস করলাম, এই হলো জ্ঞান। দুধ থেকে মাখন তুলে একজন বললে,—"দুধে মাখন আছে।" তার কথায় বিশ্বাস করলাম। মা ছেলেকে বললে,—"এই তোর বাবা।" ছেলে মার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে। এই হলো বিশ্বাস। এতে আবার অন্ধ বিশ্বাস কোথায়? বিশ্বাস আছে বলেই নাপিতের কাছে গলা বাড়িয়ে দিই। পাচক ব্রাহ্মণ অন্নে বিষ মিশিয়ে দেবে না, এ বিশ্বাসটা অন্ধ বিশ্বাস নয়। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে গুরুবাক্যে বা শাস্ত্রে এইরূপ বিশ্বাস করতে হবে।

বৈধী বা বিধিবাদীয় ভক্তি: যেমন এত হাজার জপ করতে হবে, তীর্থযাত্রা করতে হবে, এত পুরশ্চরণ করতে হবে, এত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে ইত্যাদি। এই বৈধীভক্তি আচরণ করতে করতে ক্রমে ভগবানের উপর ভালবাসা আসে।

প্রেমা ভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি: এই ভক্তিতেই ভগবান লাভ হয়। বৈধী ভক্তির গণ্ডী পার না হলে প্রেমা ভক্তিতে প্রবেশ হয় না। যেমন, হাওয়া চললে আর পাখার দরকার নেই। "হাওয়া চলা" মানে রাগাত্মিকা ভক্তি লাভ করা। উঠতে হবে সেই অনন্যা ভক্তিতে, লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। লক্ষ্যহারা হয়েই আমাদের এই অবস্থা। বিষয়ের প্রতি ভালবাসা, আমি আমার ভাব, কোটি জন্মের সংস্কার আমাদের। এই সংস্কার আমাদের টেনে রেখেছে, এ বড় কঠিন। ভগবান যে বাঁধা পড়ে যাবেন, সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তি লাভ করা বড় কঠিন! "জমীন জরু আর টাকা"—মহাত্মা তুলসীদাসের কথা। এই তিন রজ্জুতে সংসারী জীব আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। একেই ঠাকুর বলেছেন,—"কামিনী কাঞ্চন"।

"কামিনী কাঞ্চন,
এক মায়া দুই সূত্রে করে আকর্ষণ।"

সাধনার পথে বসে পড়ায় কে? সংস্কার, আসক্তি।

তবু সাধন করে যেতে হবে। যারা রাগাত্মিকা ভক্তি, অনন্যা ভক্তি চায়, তাদের ছাড়লে চলবে না।

ঠাকুর বিজ্ঞানী ভক্তের কথা বলেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার পরও এঁরা 'বিদ্যার আমি' রেখে ভগবল্লীলা আস্বাদন করেন, লোকশিক্ষার্থ কাজ করেন। যেমন নারদাদি আচার্য। ভগবান লাভের পর যে কর্ম হলো, "বুড়ী ছুঁয়ে" যে কাজ করা, তাতে কত আনন্দ। তখন ভগবান লাভ হয়ে গেছে, ভক্ত ভগবানে রয়েছে।

শুদ্ধা বা নিষ্কাম ভক্তি : ঠাকুর গাইতেন,—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই!

সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য শুদ্ধা বা নিষ্কাম ভক্তি, যেমন গোপীদের। শুদ্ধা ভক্তি দুর্লভ। রাসলীলায় এই ভক্তিতেই প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ এক হয়ে গেল। আলু, পটোল, কাঁচকলার কারবার এ নয়।

অহৈতুকী ভক্তি : কোনো কামনা নেই, টাকা কড়ি মান সম্ভ্রম কিছুই চাই না, তাঁকে ভালবাসি—এর নাম অহৈতুকী ভক্তি, যেমন প্রহ্লাদের। ঠাকুর জগদম্বার কাছে এই শুদ্ধা অমলা নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি চেয়েছিলেন লোকশিক্ষার জন্য, এই ভক্তিতেই তিনি জগদম্বাকে বেঁধেছিলেন।

উর্জিতা ভক্তি : এ হল আরও খুব উচ্চস্তরের। এতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। চৈতন্যদেবের এইরূপ হয়েছিল। ঠাকুরেরও এই অবস্থা হয়েছিল। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" প্রেমোন্মাদের সময় মহাপ্রভু বন দেখে শ্রীবৃন্দাবন, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভেবেছিলেন। ঠাকুর বলেছেন,—"যদি কারুর উর্জিতা ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তমান।"

* * *

রাগাত্মিকা ভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬

এ ভক্তিতে কোন আড়ম্বর নেই, পঞ্চোপচার নেই, ষোড়শোপচার নেই। ভগবান পত্র, পুষ্প, ফল ও জল চাইছেন ভক্তের কাছে। এই চারটি জিনিসই সহজলভ্য। তুলসীদল, বিল্বপত্রাদি গাছ থেকে ছিঁড়ে আনলেই হয়। এই শ্লোকের মধ্যে "ভক্ত্যা" শব্দটি লক্ষ্য করতে হবে, এর অর্থ—অনুরাগের সহিত, ভালবাসার সহিত। অনুরাগ ভালবাসাই আসল জিনিস। আলু পটোল চাওয়ার ভক্তি এ নয়। শ্লোকটিতে ভগবান বলছেন,—"যে শুদ্ধচিত্ত ভক্ত আমাকে পত্র পুষ্প ফল ও জল রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত অর্পণ করে, সানুরাগে প্রদত্ত তার সেই উপহার আমি প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করি।" কত লোকেই তো উৎসবে পার্বণে পত্র পুষ্প ফল মন্দিরে দিয়ে আসছে, কিন্তু সে যন্ত্রের মতো। এই শ্লোকে ভগবান যে দুইবার "ভক্তি" শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি অর্থপূর্ণ। ঠাকুরের একটি ছোট্ট উপদেশে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। ঠাকুর বলেছেন,—"খোলমাখানো জাব গরুর প্রিয়।" খোল মাখিয়ে জাব দিলে গরুর কত আনন্দ, যে দিয়েছে সে-ও আনন্দ পায়। শুধু জাব দিলে গরু তেমন করে খায় না। সেইরূপ পত্রপুষ্পাদি অনুরাগের সহিত দিতে পারলে ভগবান প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করেন। এই কথাটি স্মরণ রাখতে হবে : ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করবে তা অনুরাগের সহিত করা চাই। পত্রপুষ্পাদি সবই তো তাঁর জিনিস, আমার কি রইলো তার সঙ্গে? তাঁকে যা কিছু অর্পণ করবো তার সহিত আমাদের অনুরাগ ভালবাসা মিশিয়ে দিতে হবে। ভগবান সেইটিই দেখেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা সুদামা দ্বারকার রাজপ্রাসাদে শুকনো চিঁড়ে লুকোচ্ছেন। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখে তিনি ভয় পেলেন। এদিকে অন্তর্যামী

ছটফট করছেন। বলছেন,—"সুদামা, কি এনেছ দাও, দাও। আমাকে কিছু খেতে দাও। বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আমি আর থাকতে পারছি না।" দ্বারকাধীশ যত চান সুদামা ততই চিঁড়ে লুকোতে থাকেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণ কেড়ে খেলেন। ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্যের ভাব করলে ভালবাসা চাপা পড়ে থাকবে। ঐশ্বর্যের মধ্যে মাধুর্য খোলে না।

মীরা বলেছেন,—"প্রেম লগানা চাহিয়ে মন্থুয়া (মন্থুয়া মানে মন) প্রীত করনা চাহি।" তিনি যে প্রেমে ও প্রীতির দ্বারাই গিরিধারীলালকে বেঁধেছিলেন।

এই প্রীতি ভালবাসা আমাদের মধ্যেই রয়েছে, কেবল "আমি আমার" বস্তুতে সব ছড়িয়ে দিয়ে আমরা দেউলে হয়ে পড়েছি। অনেক দুঃখেই রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন,—"আমি সেই খেদে খেদ করি শ্যামা। তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা!" ছেলের প্রতি প্রীতি, টাকার প্রতি আকর্ষণ, নেই আমাদের? আমাদের অবস্থা যেন নোঙর ফেলে দাঁড় টানা। চার মাতালে সমস্ত রাত দাঁড় টেনে সকালে হুঁস হতে দেখলে নৌকো এতটুকুও চলে নি, একই জায়গায় রয়েছে, কারণ নোঙর তোলা হয় নি যে!

* * *

প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি। হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নৃসিংহদেব হুঙ্কার করছেন, জগৎ কাঁপছে। দেবতারা পর্যন্ত ত্রস্ত, ভাবছেন কি করে ভগবানকে শান্ত করা যায়; কেউ নৃসিংহের কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছেন না। শেষে তাঁরা প্রহ্লাদকে ভগবানের সামনে পাঠালেন। প্রহ্লাদকে দেখেই বাৎসল্য ভাবের উদয়ে নৃসিংহদেবের ক্রোধ শান্ত হলো। আহা! প্রহ্লাদ যে তাঁর জন্য কত নির্যাতন সহ্য করেছেন। নৃসিংহ স্নেহভরে প্রহ্লাদের গা চাটতে লাগলেন।

পুত্রকে নির্যাতন করলেও হিরণ্যকশিপু মাঝে মাঝে বড় কষ্ট পেতেন। তখন বলতেন,—"বাছা, তুই হরিনামটা ছাড়্। তোকে এভাবে আঘাত করে আমি প্রাণে বড় ব্যথা পাই।" প্রহ্লাদ বলতেন,—"বাবা, হরিকে না ভালবেসে যে থাকতে পারি না।" হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করে, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। অথচ সেই সৌন্দর্য আমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না। এই হলো অহৈতুকী ভালবাসা।

নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বললেন,—"বৎস, বর চাও।" প্রহ্লাদ বললেন,—"প্রভু, আপনার দর্শন পেয়েছি। আমার আর কিছু চাইবার নেই।" ভগবানও ছাড়বেন না। বললেন,—"ভগবদ্দর্শন কখনও বিফলে যায় না। কিছু চাইতেই হবে তোমাকে।" তখন প্রহ্লাদ বললেন,—"যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের যেন পাপ না হয়।"

বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর যে প্রগাঢ় প্রীতি ও আসক্তি সেইরূপ প্রীতি ও আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত করতে হবে। একমাত্র ভগবানকে প্রাণের সহিত ভালবাসা চাই, অন্য কাউকে বা কিছুকে নয়। এই প্রাণঢালা ভালবাসা একেবারে আসে না, সাধন ভজন বিনা উপস্থিত হয় না। মন হাতে থাকলে এখুনি ভগবান লাভ হয়ে যায়। আমাদের মন যে বিষয়ে বন্ধক পড়েছে। উপায় সাধনা।

অনন্যা ভক্তি যেন ছাদ। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, বৈধী ভক্তি, এসব সোপান। বেলুড় মঠের কাছে গঙ্গায় একটা গাধাবোট নোঙর ফেলে দিন পনের ছিল। বিস্তর পলিমাটি এসে পড়েছিল নোঙরের উপর। তারপর দেখা গেল আট জন মাঝি সমস্ত দিন পরিশ্রম করে সেই নোঙর তুললে। কোটি জন্মের সংস্কাররূপ মাটি মনের উপর জমে রয়েছে। সেই মনকে তুলে ভগবানের পাদপদ্মে দিতে হলে চাই সাধন এবং সেই সঙ্গে কৃপা।

গীতার একটি শ্লোক মনে আসছে। সেটিতে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন,—"তুমি আমার ভক্ত।

তোমাকে চারটি উপদেশ দিচ্ছি। প্রথম, আমাতে মন সমাহিত কর। দ্বিতীয়, আমার ভক্ত হও। আমাকে ভালবাসো, বিষয়কে ভালবেসো না। তৃতীয়, আমাকে পূজা কর। চতুর্থ, আমাকে নমস্কার কর। এইভাবে আমার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত যদি থাকতে পার তো তুমি আমাকে লাভ করবে।"

কর্ম্মময় উপাসনা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অদ্ভুত পূজা তব হেরিনু হেথায়!
ফুল চন্দন ধূপ দেখা নাহি যায়।
লাগেনাক রূপা-সোনা
চলে তবু উপাসনা,
চাষীরা লাঙ্গল ঠেলে পূজিছে তোমায়?
চামড়া সেলাই করে পূজে কি চামার?
লোহা বাজাইয়া বুঝি পূজিছে কামার?
দিনরাত ঘুরে টাকু,
তাঁতে তাঁতী ছুড়ে মাকু,
এ কেমন পূজা চলে বুঝা বড় দায়।
কুমোর গড়িছে ঘট, মানে বুঝি তার।
হাঁড়ী গড়া সে কেমন ধারা পূজিবার?
বোনে ডোম বুড়াবুড়ী
কুলো ডালা ঝোড়া ঝুড়ি
তারাও কি আরাধনা করিছে তোমার?
যত সব নীচ জাত চাঁড়াল চোয়াড়,
পেটের ভাতের শুধু করিছে যোগাড়।
নাইক ভজন গীত
মন্দির পুরোহিত
হীন শূদ্রের কোথা পূজা অধিকার?
শুনি নাকি এ পূজাই ভালো লাগে তব,
যাই হোক এ পূজাই খুবই অভিনব।
বাজেনাক ঢাক ঢোল,
কাঁসি বাঁশী শাঁখ খোল,
তোমার কথার পর কি কথা বা কব?

অভী

৺কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(অপ্রকাশিত রচনা)

[স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় লেখক মৃত্যুর কিছু পূর্বে কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তদানীন্তন কর্মসচিব স্বামী চণ্ডিকানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া 'অভী' সম্বন্ধে নিজের এই চিন্তাধারাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।—উঃ সঃ]

অভী শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। আমাদের বাংলা ভাষায় পূর্বে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হতে দেখতে পাচ্ছি। অর্থ—ভীতিশূন্য, নির্ভয়। কথাটির আমরা সুষ্ঠুপ্রয়োগ সর্বত্র করতে পারছি কি না সন্দেহ। আমি সংস্কৃতজ্ঞও নই, পণ্ডিতও নই। এ সম্বন্ধে আমার মতামতের তেমন কোনো মূল্য না থাকাই সঙ্গত।

ব্যবহারিক জগতে বা বস্তু জগতে আমরা এক প্রকার ভয়ের বাহন বললেই হয়। আমার একটি উচ্চশিক্ষিত স্বধর্মনিষ্ঠ, সাত্ত্বিকপ্রকৃতিশীল বন্ধুর কিশোর বয়স্ক একটি পুত্রের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পরে দেখা করতে যাই। দেখা হতেই তিনি বলেন—"দেখ ভাই—জীবনটা ভয় ছাড়া আর কিছু নয়, ভয় নিয়েই চলা-ফেরা, ভয় নিয়েই থাকা। ছেলেটা অতিরিক্ত প্রিয় ছিল, আমিও তার জন্যে অতিরিক্ত ভয়-ভাবনা, সর্বক্ষণই বহন করতুম। অকারণ কত রকম বিপদ আপদ মনে মনে নিজে সৃষ্টি করে, নিজেই দুর্ভাবনা ভোগ করতুম। কেবল ভয়—আর ভয়; সে গিয়েছে, তার জন্যে ভাবনাও গিয়েছে! কিন্তু আর সব তো আছে—এন্তোক—বাড়ি, বাগান, রোগ, চাকরি,—কোনটা গৃহীর ভয়ের বা চিন্তার বস্তু নয়? আরো কত কি। তাই বলছিলুম—জীবনটাই ভয়। নয় কি?" —বলে বন্ধু হাসলেন। আমি সঙ্কুচিতভাবেই গিয়েছিলুম, সে ভাব কেটে গেল। যাক্—।

সংসারী সাধারণের ভয়—ঐ সব নিয়েই। অভাবের ত' আছেই, তদ্ভিন্ন ভূতের ভয়, সাপের ভয় প্রভৃতিও বাদ যায় না। 'অভী' শব্দটির ব্যবহার আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেখানে আছে সেখানে বোধ করি ও কথাটির আভিজাত্যও বেশী—আমাদের ভয়ের সংস্কারের উচ্চ স্তরের বলেই মনে হয়। আবার মৃত্যুভয় হ'তেও বড় কেউ মুক্ত নন। বোধ হয় সাধন-ভজনের প্রথম উদ্ভবের মূল ভয় হতেই। পরে ভাগ্যবান জীবনমুক্ত সিদ্ধ সাধু পরমার্থে পৌঁছে ভয়শূন্য 'অভী'র অধিকারী হন। এ আমার মন-গড়া ধারণা। আমি এ আলোচনার অধিকারী নই। দ্বিত্বজ্ঞানমুক্ত ব্রহ্মবিদেরাই—ভয়মুক্ত। দুই থাকলেই ভয়।

আমাদের দেখা শোনা দু একটা কথা নিয়ে কথা কওয়াই ভালো। অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, সখা, এক আত্মাই। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের রথচক্র ধরিত্রী-বদ্ধ হলে অর্জুনকে কর্ণ বললেন—"তুমি ক্ষত্রিয় বীর, আমি অকস্মাৎ বিপন্ন, একটু নিরস্ত হও, আমাকে রথচক্র তুলতে দাও, পরে যুদ্ধ চলবে—বীরধর্ম রক্ষা করো,"—ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—"ও সব কথা শুনো না, ওকে এখনি বধ করো।"

অর্জুন মহা বিপদে পড়লেন। বীরধর্মবিরুদ্ধ কাজ করতে তাঁর মন চাচ্ছে না। তাঁর ইতস্ততঃ ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"করছো কি! আমার কথা শুনছ না কেন, কাল-বিলম্ব ক'র না, এখনি মারো।" শুনে কর্ণ বললেন—"তুমি না ভগবান। এই অধর্ম কর্মে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছ!"

অর্জুন তখন সমস্যায় পড়ে গেছেন—ধর্মভয়ে ভীত। আবার শ্রীকৃষ্ণের আদেশ! তিনি কিং-কর্তব্যবিমূঢ়। বিচলিত।

শ্রীকৃষ্ণ তখন সরোষে বললেন—"তুমি কার কাছে ধর্মকথা শুনছো—ধর্মের ও কি জানে? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সভায় ও উপস্থিত ছিল, কোন্ ধর্ম রক্ষা করেছিল? একটি কথাও কয় নাই। ওর মুখে ধর্মকথা শোভা পায় না, এখন বিপদে পড়ে মুখস্থ শাস্ত্রকথা আওড়াচ্ছে—ওকে এখনি অবাধে বধ করো। স্ত্রীলোকের আসন্ন বিপদের সময় ও ক্ষত্রিয় হয়ে নীরব ছিল। নির্লজ্জ এখন ধর্মকথা কয়। তুমি ক্ষত্রিয় রাজকুমার, দুষ্টের দমন তোমার ধর্ম। দুষ্টকে এখনি বধ করো।" ইত্যাদি

মুহ্যমান অর্জুন আর দ্বিরুক্তি না করে তৎক্ষণাৎ কর্ণকে বধ করেন। এতক্ষণ ধর্মভয় তাঁকে বিচলিত করে রেখেছিল। যে মুহূর্তে শ্রীভগবান তাঁর ভয়টাকে তাঁর পক্ষে মিথ্যা ও অনুচিত ভয় বলে বুঝিয়ে দিলেন, অর্জুনের কাছে তখুনি সেটা অলীক হয়ে গেল। অর্জুন তখন ভয়-ভাবনার পারে পৌঁছে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে 'অভী'র কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। ভগবান যাঁর সঙ্গী ও সহায় তাঁর 'অভী' হ'তে আর কতক্ষণ। উপযুক্ত সময়েই তিনি মোহের পর্দা টেনে নেন। তখনো সময় আসেনি।

মানুষের মৃত্যুভয় স্বাভাবিক। গ্রীস দেশে মহাজ্ঞানী দেশপূজ্য 'সক্রেটিস্' থাকতেন! তাঁর ভক্ত শিষ্যসেবকও দেশময় ছিল। সে অবস্থায় অহঙ্কার-উন্মত্ত পদস্থ শত্রুরও অভাব হয় না, বিশেষ রাজভক্তদের। বাইরের লোকের সম্মান ও প্রভাব তাঁরা সইতে পারেন না। একটা অছিলা নিয়ে ষড়যন্ত্র করে সক্রেটিসকে রাজদ্বারে অপরাধী প্রমাণ করা হয় ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি বিষ-পানে দেহ ত্যাগ করেন। শিষ্যরা বহু চেষ্টা পেয়েছিল ও সকল ব্যবস্থাই করেছিল—তাঁকে গ্রীস থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন—"দেশের আইন ধরে' যখন কাজ হচ্ছে, সে আইনের মর্যাদা নষ্ট করতে নেই। তাতে রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা আসে। যে অজুহাতে আমাকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সেটা সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্—রাজ-আজ্ঞা ও দেশের আইন অনুমোদিত, সেটি মেনে নেওয়া উচিত। নিজের প্রাণের ভয়ে তার অপমান করলে তখন আমার সত্যিকার অপরাধই করা হবে।" তিনি সহজেই মৃত্যু বরণ করেন, প্রাণের ভয় করেন নি। তাঁর এই ভয়শূন্যতাও কিন্তু রাষ্ট্রের আইন রক্ষাকল্পে। সুতরাং গুণযুক্ত—qualified. এতেও, আমার ধারণায় 'অভী' বলা চলে না। তিনি রাষ্ট্রের আইন রক্ষার্থেই এ কাজ করেছিলেন, আইনের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ, তিনিও মহৎ। এ ধারণা পাশ্চাত্য দেশের অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক দেশের, যেখানে দেশ বা nation, পরমার্থের স্থান নিয়েছে।

আমাদের ভারতের কথাই কই। এখানকার কথা বস্তুসাপেক্ষ নয়,—খণ্ড নিয়ে নয়, অখণ্ড লাভে 'অভী'। সেটা পরমার্থ প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। জীবনের পরম উদ্দেশ্য নাকি তাই। তাতেই ভয় ভাবনা হতে পরম নিষ্কৃতি। তখন আর দুই বলে কিছু থাকে না—কিসের ভয় আর কার ভয়! সেটা ব্রহ্মবিদের এলাকা। সে অবস্থার কিছুই জানি না। শুনেছি যিনি জানেন, তিনিও অন্যকে বলতে পারেন না।

গত শতাব্দীর ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪র সময়ের কথা। অনেকেই দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে আসতেন,—রাম দত্ত, মাষ্টার মশাই, কেশব সেন, কোন্নগরের মনোমোহন বাবু প্রভৃতি অনেক ভক্তই। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আসতে আরম্ভ করেছিলেন। রাখাল মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমার বিশেষ মনে পড়ে না, তার উল্লেখ করলুম

না,—পরে দেখেছি। আরো কত সব কুমার ভক্ত। নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে দেখা দিতেন, নিয়মিত নয়।

উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করেছেন এবং 'কথামৃতেও' উল্লেখ আছে,—নরেন্দ্রনাথ এলে, ঠাকুরের আনন্দ যেন চোখে মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত;—বিদেশাগত পুত্রকে সহসা দেখলে, পিতার যেমন হয়। সে এক অপার্থিব ভাব। নরেন্দ্রনাথের মন যেন কোথায় রয়েছে, না ডাকলে কাছে গিয়ে বড় একটা বসতেন না,—এ দিক ও দিক, এর কাছে ওর কাছে, দু একটা কথা কয়ে বেড়াতেন, বাইরেও ঘুরতেন, কোথাও স্থির নয়। দেখে ঠাকুর হাসতেন, উপভোগ করতেন। ডাকতেন, গাইতে বলতেন, প্রায়ই সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। সম্পূর্ণ একটা গান কখনো শোনা হয়েছে কিনা জানি না। লোকে তাঁকে বলতে শুনেছে—"কত বড় আধার! কত বড় আধার! বেড়াচ্ছে যেন খাপখোলা তলোয়ার।" অর্থ বোধ হয়—"কিছুতে দৃষ্টি নাই—এক লক্ষ্য নিয়ে আছে।" দিনের বেলা উভয়ের সঙ্গ বড় জমতে কেউ দেখেছিলেন কি না জানি না। এখনো ভাবি—তাঁদের যা কথাবার্তা, কাজকর্ম হোত, তা নিশ্চয়ই রাত্রে। হ'তে পারে ২।৩টি অন্তরঙ্গও থাকতেন।

ক্রমে নরেন্দ্রনাথকে সমাধির উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দ্রুত পেয়ে বসে। বোধ হয় কাশীপুরে তখন জমায়েৎ। তিনি আর বিলম্ব সইতে পারছিলেন না, আসন করে বসে' সমাধিস্থ হয়ে যান! সমাধি ভাঙছেনা দেখে, ভক্ত সঙ্গীরা ভয় পান ও ঠাকুরকে সংবাদ দেন। পরে তিনি নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতিস্থ হ'লে, তিরস্কারচ্ছলে বলেন—"এ তো খেলার জন্তে নয়, এত তাড়া কিসের? এই আমি চাবি নিয়ে চললুম—এখন নয়, সময় হ'লে পাবে।"

আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই ভাবটা নিজের কথায় দিলাম। 'কথামৃতে' পাবেন। নির্বিকল্প সমাধিতে ২১ দিনের পর নাকি দেহ ছেড়ে জীব চলে যায়।—নরেন্দ্রনাথের মনোভাব তিনি জানতেন, তাই সতর্কও থাকতেন, অন্তরঙ্গদের সাবধানও করতেন, দৃষ্টি রাখতে বলতেন,—"নিত্য-সিদ্ধ পরিপক্ক ফল, বৈরাগ্যে বিভোর থাকে, কিছু ভাল লাগে না,—ইচ্ছা হলেই দেহ ছেড়ে দেবে। বিশ্বহিতে ওর অনেক কাজ রয়েছে,—ও না হলে হবে না।" ইত্যাদিই ছিল ঠাকুরের উদ্দেশ্য ও চিন্তা বলেই মনে হয়।

ইহার কয়েক মাস পরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে সেই চাবিকাটি বা সোনার কাটিটি দিয়ে, নিজে ফতুর হয়ে, দেহরক্ষা করেন। তার পরের কথা বা বিবেকানন্দ স্বামীর কঠোর সাধনা, ভ্রমণ ও দিগ্বিজয়ের কথা, লিপিবদ্ধ হয়েছে, অনেকেই পড়েছেন। কার্য শেষে স্বামীজী ক্লান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফেরেন ও প্রায় দুই বৎসরকাল, তাঁর স্থাপিত বেলুড় মঠেই থাকেন। যাঁরা কোনো 'মিশন' নিয়ে আসেন, কার্যান্তে জড়ের মত বেঁচে থাকা তাঁদের আর ভাল লাগে না।—"আর কেন, আর কিসের জন্তে থাকা।" এই ভাবই তাঁদের আসা স্বাভাবিক। তাঁরও এসেছিল বোধ হয়। চলে যাবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেটা বুঝেছিলেন। মঠের সঙ্গীদের সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু যিনি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী তাঁকে আটকাবে কে?

স্বামীজী নিত্য বৈকালে একটু বেড়াতে বেরুতেন। সে দিনও স্বামী প্রেমানন্দকে নিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন। যখন তখন প্রিয় সেবকদের বলতেন—'অভী' হবি, ভয় আবার কি? একটা কাল্পনিক কথা,—অন্তরায় মাত্র, 'অভী' হওয়া চাই—ইত্যাদি।

বেড়িয়ে আসার পর—সকলের সঙ্গে কিছু আলাপাদি করে ধ্যানে বসেন। সেদিন সকালেও

৮টা থেকে ১১টা বেশীক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজলে নিজের ঘরে গিয়ে গঙ্গার দিকে মুখ করে ঠাকুরঘরের দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যানে বসেন। প্রায় একঘণ্টা মালায় জপ করে স্বামীজী ভূমিতলে শয়ন করেন। একটি শিষ্য বাতাস করতে থাকেন। স্বামীজীর চোখ মুদ্রিত, যেন ধ্যান করছেন। রাত ৯টার সময় পাশ ফিরে শুলেন, একটু অস্ফুট ধ্বনি, কয়েকটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস—তারপর সব স্থির। স্বামী বিবেকানন্দ স্বধামে চলে গেছেন। সব শেষ। জগতের দেহ জগতে পড়ে আছে। নির্ভীক বীরের বদনে 'অভীর' অর্থ অনেকে পেয়ে থাকবেন।

তার পরের কথা তিনিই জানেন আর ঠাকুরই জানেন।—স্বভাব-সিদ্ধ বীর-সাধক, তারও একটু আভাসে আমাদের বঞ্চিত করে যাননি। ঠাকুরের অক্লান্ত সেবক ও একনিষ্ঠ সাধক—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি তখন মাদ্রাজ আশ্রমে। দেহরক্ষার পরই স্বামীজীর মুক্ত আনন্দ-মূর্তি তাঁর কক্ষে উপস্থিত। মধুর হাস্যে কেবলমাত্র—"শশী, দেহটাকে থুতুর মত ফেলে দিয়ে চললুম" বলেই অন্তর্ধান।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

তীর্থত্রয়

স্বামী মহানন্দ

তীর্থসম্রাট ভারতবর্ষে অগণিত তীর্থের পুণ্য সমাবেশ। ৺কাশী-কাঞ্চি, পুরী-গয়া, দ্বারকা-প্রয়াগ, মথুরা-বৃন্দাবন, কেদার-কৈলাস, অমরনাথ-বদ্রীনাথ, পঞ্চবটী-অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র-পুষ্কর, রামেশ্বর-কন্যাকুমারী এমনি কত কি! প্রত্যেকেই স্বস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকেই শতস্মৃতির প্রস্ফুটিত কুসুমের প্রাণস্পর্শী-গন্ধে সৌরভিত। প্রত্যেকেই তপ্ত-প্রাণ মানবকে আহ্বান জানাচ্ছে—'আয়, আয়, আমার কাছে আয়; শান্তির সমাহিত মৌনতায় তোকে ঢেকেদি।'

ঐ সব তীর্থরাজের প্রত্যেকটিই আবার কোন না-কোন মহাপুরুষের অথবা পুরাণোক্ত দেবদেবীর ইতিকথার সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সে সব ইতিকথার সহিত ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীমাত্রেরই কেমন-যেন-একটা নাড়ীর টান আছে। ছুটী পেলেই তাই ছুটতে চায়, দুঃখ পেলেই তাই এগিয়ে আসে, আনন্দ পেলেই তাই অভিসারে চলে ঐ সব তীর্থের দুঃখহরা আপনকরা নিবিড়তর মাতৃস্নেহের মাঝে। প্রবন্ধোক্ত স্বল্প পরিচিত তীর্থত্রয়ও অনুরূপ-স্মৃতির রঙে-রেখায় প্রাণপ্রদ হয়ে আছে। বাংলার হৃদয়-নিঙ্ড়ান সবুজতায় ঢাকা এই তীর্থত্রয়ও কী এক অপরাজিত আনন্দে সঞ্জীবীত। তাই এই তিন ক্ষুদ্র তীর্থ-মুক্তাবিন্দুর—বংশবাটী, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের—স্বরূপোদ্ঘাটনের প্রয়াস করা যাক্।

বংশবাটী হুগলী জেলার একটি গণ্ডগ্রাম। ভাগীরথী তীরের এই তীর্থ তার পূর্বতন সৌন্দর্য-সম্ভার হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর সেই নৌকায় পাল তুলে আসা তীর্থযাত্রীর দল ঘাটে এসে কলরব তোলে না। সুন্দর প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত বাঁধান ঘাট আজ শ্রীহীন ভগ্নপঞ্জর নিয়ে পড়ে আছে। ঘাটের পাশে আগেকার মত দোকানীদের ভিড় নেই। বর্তমান সভ্যতার নরবাহক রেলগাড়ীর ষ্টেশনটিকে ঘিরেই যা কিছু জনতা জমাট বেঁধেছে। সেই খানেই এখন গড়ে উঠেছে জনপদ। বংশবাটী ষ্টেশন থেকে তাই ঐ

স্থানের জাগ্রতা কালীমন্দির—অর্থাৎ ৺হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রায় একমাইল পথ। সাইকেল-রিক্সা বা পায়ে হেঁটে আসা চলে। ওখানে এলেই ৺হংসেশ্বরী দেবীর সুঠাম মন্দির সকলেরই দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করে। পুরাতন রাজবাটীর ভাঙ্গা দেউলের মাঝে এই বহু-চূড় মন্দির আপন বৈশিষ্ট্যে, ভাস্কর্যের স্বকীয়তায়, নিবিড়-সাধনার নিগূঢ়তর কেমন-যেন-এক ভাস্বর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা তুলে রয়েছে। ইহার প্রথম-গড়া ভাস্কর্যলীলা যদিও আজ কালের করাল আঘাতে স্তব্ধীকৃত তবুও তার প্রস্তর ও অদ্ভুত ইষ্টকসন্নিবেশ, সূক্ষ্ম কারুকার্যের মনোরম রূপায়ণের সঞ্জীবতায় এমন এক অনন্ত সৌন্দর্যমাধুরী লীলায়িত হয়ে উঠেছে যে মানব মাত্রই তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এই মন্দিরের জন্য অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ রাজা নৃসিংহ দেবরায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মন্দির-গাত্রে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে :

"আশা চলেন্দু সম্পূর্ণশাকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেব দগুতঃ॥"

অবশ্য এই মন্দিরের কার্য শেষ হবার পূর্বেই ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নৃসিংহদেবের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর স্ত্রী শঙ্করী দেবী এই অসমাপ্ত মন্দির শেষ করে যথাবিহিত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। বাংলা-দেশের আর কোন মন্দিরে এই প্রকার স্থাপত্য-কৌশল দেখা যায় না। সাধন ইঙ্গিতের রঙে-রেখায় প্রোজ্জ্বল এই মন্দিরের স্বকীয়তা সার্থক হয়ে ফুটে রয়েছে। তান্ত্রিক রূপ-সাধনার সাঙ্কেতিক পরি-কল্পনা দিয়েই এই মন্দির গড়া। তাই এর মাঝে পরাশক্তির বিকাশস্বরূপ এই স্বয়ম্ভবা মন্দির ষট্‌চক্র ভেদরীতির স্মারক হিসাবে নির্মিত। মন্দিরের কিয়দংশ প্রস্তরে ও কিয়দংশ ইষ্টকে গঠিত। শোনা যায় এই মন্দির নির্মাণ করতে তখনকার দিনেও প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই স্থানের পূর্ব সমৃদ্ধি এখন গতায়ু। আগে যেখানে শ্রুতি-স্মৃতি, বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চা হ'ত এখন সেখানে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে স্থবিরত্বের রেখা ফুটে উঠেছে। এই মন্দিরস্থিত নয়নাভিরাম মাতা ৺হংসেশ্বরীর বিগ্রহ প্রস্তরে খোদিত নয়। নিমকাঠে তৈরী মনোহর দারুমূর্তি। মূর্তি এখনও অক্ষত, এখনও প্রাণবন্ত। হঠাৎ মন্দিরে প্রবেশ করে ঐ মূর্তির চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এক সদা হাস্যরতা শান্ত মাতৃ-ভাবময় বালিকা বসে রয়েছে, আমাদের দেখে লজ্জায় এক্ষুণি ছুটে পালিয়ে যাবে।

বংশবাটী রাজ-বংশের ইনি কুলদেবী। শ্রীরাম-কৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) এই মূর্তিকে সম্পূর্ণ জাগ্রতা দেখতেন। তাঁর শয়নকক্ষে সব সময়েই মাতা হংসেশ্বরীর একটি প্রতিকৃতি থাকত। এই প্রতি-কৃতি নিয়েই তাঁর সেই আত্মহারা উন্মাদনা দেখে ভক্তমাত্রই এক অপার্থিব আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। শবাকার শিবের নাভিমণ্ডল থেকে এক সহস্রদল পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠেছে, আর তার উপরে এই চতুর্ভুজা বালিকা মূর্তির অনবদ্য উপবেশন ভঙ্গী ও হাস্যোজ্জ্বল রূপমাধুরী স্বতঃই এক স্বর্গীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন : "এই হংসেশ্বরী মূর্তি আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতীক।" পাঁচতলা ও ১৩টি চূড়াযুক্ত এই মন্দির তন্ত্রোক্ত গুহ্য সাধনার ইঙ্গিতে পূর্ণ। এই সম্বন্ধে মহাপুরুষজী আরো বল্‌তেন : "শিবের নাভিকমলে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তকে মাতৃভাবে অনুপ্রাণিত করতে।" এই দেবীর দুইখানি ছোট ফটো (প্রতিকৃতি) তাঁর টেবিলের উপর রাখা থাকত, সকালে সাধুরা তাঁকে প্রণাম করতে গেলে দেখতে পেতেন তিনি ঐ ফটো একবার বুকে একবার মাথায় ঠেকাচ্ছেন আবার কখন বা অপলক নেত্রে ঐ

মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে কি-যেন এক অনাস্বাদিত রসে বিভোর হয়ে উঠছেন। রাতে শোবার আগেও তিনি কয়েকবার ঐ ফটো বুকে ও মাথায় না ঠেকিয়ে ঘুমুতে পারতেন না। তা ছাড়া কিছুদিন এমনও হয়েছিল যে প্রায় প্রতি অমাবস্যায় বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার দিয়ে সাধু ব্রহ্মচারীদের মায়ের পূজার জন্য বংশবাটীতে পাঠাতেন এবং যতক্ষণ না তাঁরা মায়ের পূজা দিয়ে ফিরতেন ততক্ষণ মহাপুরুষ মহারাজের কোন শান্তি ছিল না। বারবার সেবককে জিজ্ঞাসা করতেন, "আসার সময় কি হ'ল?" অবশেষে পূজারীরা যখন ফিরতেন তখন মহারাজের চিন্তান্বিত হৃদয় আনন্দোল্লাসে ভরে যেত। তিনি তারপর পূজারীদের নিকট মায়ের পূজার খুঁটিনাটি সমস্ত খবর নিয়ে মায়ের প্রসাদী সিঁদুর কপালে পরতেন। আর সেই সঙ্গে মায়ের টেবিলে রাখা ছোট ফটোটা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে গদ্‌গদ স্বরে বলতেন, "মা, মা, জগদীশ্বরী! আমি ত তোমার কাছে যেতে পারছি না। তুমি সব দেখছ। তুমি সব জানো। সব ছেলেদের কল্যাণ কর। আমাদের সকলের মঙ্গল কর।" সেই আকুলকরা আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক অপূর্ব সুর-মূর্ছনা সকল দিক ভরে দিত। পূজ্যপাদ শিবানন্দজী মহারাজের পূজিতা এই জাগ্রতা মূর্তিকে সকলেরই একবার দর্শন করা উচিত।

* * *

হুগলী জেলার আর একটি প্রাচীন তীর্থের নাম ত্রিবেণী। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীত্রয়ের সম্মিলনে এই পুণ্য মিলনস্থানের উৎপত্তি। স্নেহাসিক্ত এই ত্রিবেণীরই বা কত নাম। যাঁর যে নামে ডাকতে আনন্দ তিনি সেই নামেই ডাকতে পারেন—ত্রিপাণি, তারবানি, ত্রিভেণী, তিরপূর্ণী ও ত্রিপিণী। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীতে এই ত্রিবেণীর নাম উল্লিখিত আছে। তখনকার জনবহুল, আনন্দঘন এই তীর্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এর পূর্বসমৃদ্ধির একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর কথাচিত্র অঙ্কিত করেছেন:

> বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
> যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
> লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
> বাস, হেম, তিল, ধেনু দ্বিজে দেন দান॥"

কিছুটা অতিশয়োক্তি হলেও, তখনকার দিনে ত্রিবেণী জনাকীর্ণ ছিল নিশ্চয়ই। কত দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসত ঐ ত্রিবেণীর ঘাটে। কেউ বা আসত পণ্য বোঝাই করা নৌকা নিয়ে নিজের পণ্য বিক্রয় করে অর্থলাভের আশায় আবার কেউ বা আসত এই ত্রিবেণীর পবিত্র সঙ্গমে অবগাহন করে, পিতৃপিতামহের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান করে পুণ্যার্জন করতে। নিকটস্থ দেবালয়েও তখন যাত্রীদের ভিড় জমত। নানান ভাবের সাধক, নানান মতের লোক এসে জটলা করত এই অধুনা শ্রীহীন প্রাচীন দেবায়তনগুলির আশেপাশে। বৃন্দাবন দাসের বিখ্যাত পুস্তক চৈতন্যভাগবতেও ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে:

> "কতদিনে নিত্যানন্দ থাকি খড়দহেঁ।
> সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বগণ সহে॥
> সেই সপ্তগ্রাম আছে সপ্ত ঋষি স্থান।
> জগতে বিদিত সে ত্রিবেণীঘাট নাম॥"

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুণ্যলীলাভূমি এই ত্রিবেণী তখন প্রাচীন সপ্তগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কত না মহাত্মা, কত না সাধু সন্ত, কত না সাধক ও উপাসক তখন এসেছেন এই লীলাভূমি স্পর্শ করে ধন্য হতে। চৈতন্যসত্তার দিব্যানুভূতিতে তখন এ স্থান দেদীপ্যমান। জীবনের পারের কড়ি সংগ্রহার্থে কত শত যাত্রী তখন এই ত্রিবেণীর ঘাটে ভিড় জমাত। শুধু যে ধর্মের দিক থেকেই এ স্থানের নাম দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়। প্রাচীন সংস্কৃত-শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবেও—নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়ার সঙ্গে—ত্রিবেণীরও একটা

নির্দিষ্ট ঐতিহ্য ছিল। ঐ ব্যাপারে তখন বহু পণ্ডিত ওখানে বসবাস করতেন। তাঁদের স্মৃতি-জড়িত উপাখ্যাননিচয় আজও অনেকের মুখে মুখে ঘোরে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই এই সপ্তগ্রামের প্রাচীন জনপদটি মুসলমান শাসক জাফরখাঁর অধীনে আসে। জাফরখাঁ হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর সময়েই এবং পরবর্তীকালেও হিন্দুদের অনেক প্রাচীন দেবমন্দির গির্জা ও দরগায় পর্যবসিত হয়। ত্রিবেণীর ঐ মর্মন্তুদ মহাপরিবর্তনের দিনগুলি ঘিরেও কতনা দুঃখের কাহিনী, কতনা ব্যথার ইতিহাস রচিত হয়েছে। সেই সব ব্যথাহত করুণ কাহিনী নিয়ে বহু বিয়োগান্ত নাটক লেখা চলে। শুধু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নয়, জনপদের জীবনেও দুঃখ-দ্বন্দ্বের, ক্ষয়-ক্ষতির, আশা-নিরাশার বেদনাময় ইতিকথা হৃদয়বিদারক হয়ে ফুটে ওঠে। ত্রিবেণীতে জাফরখাঁ ও তাঁর পুত্রদের সমাধি-মন্দির গড়ে তোলা হয়। ঐ সমাধি-মন্দিরগুলি হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে প্রস্তরাদি দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। ঐ সব অধুনা-বিলুপ্তপ্রায় সমাধি-মন্দিরগুলির গায়ে এখনও রামায়ণের বিভিন্ন উপাখ্যান প্রস্তরে খোদিত রয়েছে দেখা যায়। এমনকি দরগার গায়েও সংস্কৃত শিলালিপি ও গদাধারী বিষ্ণুমূর্তির সমাবেশ রয়েছে।

ইতিহাস রয়েছে—আকবরের শাসনকালে পাঠান-রাজত্বের সমাপ্তি হয় এবং ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে একজন হিন্দুরাজা—হরিচরণ মুকুন্দদেব—পাঠান-গণকে যুদ্ধে পরাজিত করে ত্রিবেণী অধিকার করেন। পরে মুকুন্দদেব তাঁর এই বিজয়াভিযানের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেণীর পবিত্র ত্রিসঙ্গমের স্থানে একটি মনোরম ঘাট তৈরী করেছিলেন।

তখনকার দিনে ত্রিবেণীতে অনেক পণ্ডিত বাস করতেন। স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একসময় এই ত্রিবেণীতেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। ত্রিবেণীর সেই সুসমৃদ্ধ প্রাচীন দিনগুলি আর নেই। এখন তার সকল সমৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীর মনন-ধ্বংসী কলকারখানার মাঝে মুমূর্ষু। মহাকালের কুক্ষিগত সকল মন্দিরের মাঝে বিখ্যাত বেণীমাধবের মন্দির তার ভগ্ন-পঞ্জর নিয়ে ব্যথায় শায়িত দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ও ভয়াল মহাশ্মশান আজও মানুষকে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তীর খোরাক যোগায়।

* * *

তীর্থত্রয়ের শেষেরটির নাম—সপ্তগ্রাম। পূর্বে অধুনালুপ্ত সরস্বতীর তীরে অবস্থিত ছিল। আজ সেই খর-স্রোতা নদীর স্বল্পক্ষীণ স্মৃতিরেখা ইতিহাসে-বর্ণিত সত্যকে বিশ্বাস করতে দেয় না। যে বন্দর-গ্রাম একদিন ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলে পরিগণিত হ'ত, যার পাদমূলে একদিন বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত তাদের শত-পালের পাখা মেলে এসে নোঙর করত, যার বাণিজ্যকেন্দ্র শত শত বণিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত ছিল, তার আজকের এই স্থবির, শ্লথ, পঙ্গু ও বিগতশ্রী অবয়ব দেখলে মন বেদনায় কাতর হয়, পৃথিবীস্থ সকল বস্তুর নশ্বরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জঙ্গলাকীর্ণ ও মাঝে মাঝে সুদূর-প্রসারী ধানক্ষেতের আদিগন্ত বিস্তার দেখলে কিছুতেই মনে হয় না যে এই জনপদের ও একদিন অগণিত মানব-কণ্ঠের উতরোল-কলকাকলি বহু শ্রেষ্ঠ নগরীরও ঈর্ষার বস্তু ছিল।

ইতিহাসের এক সুদূর অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই সপ্তগ্রামের নাম কান্যকুব্জরাজ প্রিয়বন্তের সপ্তপুত্রের সঙ্গে জড়িত। এমন কি খ্রীঃ পূর্ব ৩২৬ অব্দেও যখন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারত-অভিযানে আসেন সেই সময়েও তিনি এই সপ্তগ্রামের সুখ্যাতির কথা জেনেছিলেন। সপ্তগ্রামের সেই আনন্দ-মুখর দিনগুলি আজ কেবল ইতিহাসের পাতাতেই খুঁজে পাওয়া যায়। সর্বধ্বংসী কালের এ এক চরম অভিব্যক্তি। পার্থিব নশ্বরতার এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পরবর্তী যুগেও এই সপ্তগ্রাম মুখরিত করে শ্রীমৎ নিত্যানন্দপ্রভু কীর্তনানন্দে মেতেছিলেন। সেই অপার্থিব কীর্তনরোল ও তৎসহ বহুলোকের মাতোয়ারা নর্তনের কথা চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়:

"সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে কৈল কীর্তন বিহার।
শতবৎসরেও তাহা নহে বলিবার॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহরে॥
পূর্বে যেমন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেইমত সুখ হইল সপ্তগ্রামপুরে॥"

এ ছাড়া চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত ভক্তবীর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্মৃতির সঙ্গেও এই স্থান বিশেষভাবে জড়িত। এই স্থানেই একদিন ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক শ্রীউদ্ধারণ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু স্বহস্তে একটি মাধবীলতা রোপণ করে দেন। জানিনা সেই মাধবীলতা কিনা, তবে এখনও তথাকার একটি মাধবীলতাকে উদ্দেশ্য করে লোকে বলে নিত্যানন্দপ্রভুর স্বহস্তে রোপিত মাধবীলতা।

এই সপ্তগ্রামের নিকটস্থ বর্তমান আদি সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তঠাকুরের শ্রীপাঠ রয়েছে। উহা এত দিন জীর্ণ জরাগ্রস্ত ও সংস্কার-বিহীন ছিল—সম্প্রতি সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ইহার সংস্কার করেছেন। ইহার চারিদিকের বনানীর মর্মর-মুখর শ্যামলতা শ্যামকানাইয়ার কথা এখনও স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রাণমাতান কীর্তনরোল এখনও এর আকাশে বাতাসে শুদ্ধীভূত হয়ে রয়েছে। চৈতন্য-সত্তার এই মহামহিম বিকাশ কি কখন চিরতরে মুছে যেতে পারে? সাধনার অনুকূল এই সব স্থানের স্থানমাহাত্ম্য সাধক মাত্রকেই আকর্ষণ করে।

খ্রীঃ ১৫৪০ সালে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় সরস্বতী নদী বালুকাস্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং সপ্তগ্রামের এই শ্রীহীন অবস্থার আরম্ভও তখন থেকেই প্রকট হয়। তখনকার বহু প্রাচীন দেবমূর্তির ও সুন্দর ইষ্টকখণ্ডের সংগ্রহ বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত হয়েছে। বর্তমান সপ্তগ্রামের শ্রীহীনতার কথাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালী কবি কালিদাস রায়ের কয়েকটি কবিতা-স্তবক মনে পড়ে:—

"রাঢ়বঙ্গের রাজধানী তুমি, প্রাচীন লক্ষ্মীর সিংহদ্বার,
বিজয়-ধ্বজা বহে নাকো আজ তব গৌরবশৃঙ্গ আর।
আজি ইতিহাসে তুমি স্মৃতিসার, ক্ষিতিতলে আজ ধ্বংসশেষ,
ধরে না তরণী কেলিকুতূহলে তোমা লাগি রাজহংস বেশ।
সিংহল, চীন, রোম কার্থেজ বহে নাকো পোত পণ্যভার
বিশাল স্বর্ণভাণ্ডার আজি শূন্য হয়েছে অন্নদার।
লুপ্ত তোমার কীর্তি-গরিমা শ্মশান হয়েছে সপ্তগ্রাম
ছিলে মর্তের বৈজয়ন্ত, আজি তুমি অভিশপ্ত ধাম।"

কবি-বর্ণিত ঐ পুণ্য-শ্লোক সপ্তগ্রাম ও পূর্বোক্ত তীর্থদ্বয়ের উদ্দেশ্যে আমরাও আজ ভক্তি প্রণতি জানাই।

"তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। * * * যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখবামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ল। উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম, 'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই' এই বল্‌তে বল্‌তে।"

(শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৩।৩।২)

এমন কাজল রাতে কে দিল রে মায়ার বন্ধন ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বৈশাখের তপোনিষ্ঠ যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দিয়ে
বাষ্পের বিভূতি রচি 'কে এসেছে' মেঘজাল নিয়ে
কোন্ পথ হোতে ? আজি তার উৎসবের উন্মাদনা—
দিকে দিকে। সিক্ত হোল রৌদ্রতপ্ত পৃথ্বী-ধূলিকণা।

শ্যামশষ্প সঞ্জীবিত : ছুটিতেছে নবরূপে নদী
যৌবন-প্রবাহ লয়ে সিন্ধুপানে প্রেমে নিরবধি।
পল্লী-গোষ্ঠ হোতে বুঝি মাতৃকার বাজিছে কঙ্কণ,
এমন কাজল রাতে কে দিলরে মায়ার বন্ধন ?

বিহঙ্গেরা গেল কোথা ? কোন্ বনে ভগ্ন পক্ষ রেখে !
নুয়ে-পড়া শাখা হোতে মৃত্তিকায় মৃত নীড় দেখে
বিষণ্ণ কুসুমতরু রচিল কি শোকের গীতিকা ?
অজানা লোকের ডাকে শিহরে কি জীবন-বীথিকা !
রঙ্গ-নৃত্য করে কেকা, আর্তহৃদি আর্দ্র হোল তার,
কোথা জাগে নবাঙ্কুর ? বৃষ্টিধারা নাচে অনিবার।

মেঘের ডমরু বাজে, কার কথা কহিছে আকাশ ?
নিখিল মনের সুরে বিরহের বহিছে বাতাস,
ধরণীর দীর্ঘশ্বাস অন্ধকারে সঘন ব্যথায়
হানে রুদ্রাঘাত। ক্ষিপ্ত করি দিগম্বর দেবতায়
কোথা কন্যা-কুমারিকা নিরালায় ব্যর্থ অভিসারে !
মেঘময়ী বেণী তার খুলে পড়ে বেদনার ভারে
সাগর-সৈকতে। রাত্রি কাঁদে মল্লারের সুরে সুরে,
চমকে বিজলী যেন আলো করে দিগন্ত-বধূরে।

মরণের পারাবারে উঠিল কি শত শত ঢেউ
বক্র হয়ে ফণা তুলে সর্প সম !—দেখেছে কি কেউ
মরণের ছায়াসম দুলিতেছে কালো যবনিকা
অন্তরে বাহিরে দৈবদুর্বিপাক আর বিভীষিকা
দুর্যোগ ঘনায়। নির্দয় উল্লাসে কেগো পথ চলে
মহামিলনের অন্তরালে প্রকৃতির অশ্রুজলে ?

জননী ভগবতী দেবী

শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

উনিশ শতকের যে ভাববিপ্লব বাংলাদেশের চিন্তাশীল অংশকে উদ্দীপ্ত করেছিল, তার সাধারণ লক্ষণ ছিল মানবপ্রীতি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশঃ সাম্যমূলক মৈত্রীধর্ম দেশের অধিনায়কদের হৃদয় অধিকার ক'রে চলেছিল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তখন যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের নূতন ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। তাই এ যুগের মহাপুরুষবৃন্দ সকলেই মানবজীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সাধনা ব্যষ্টিগত নয়, সমষ্টিগত। সমগ্র দেশ ও সমাজ তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণ-কামনা তাঁদের হৃদয়ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করে তুলেছিল। উনিশ শতকের এই নব-প্রচারিত মানবধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ ছিলেন বিদ্যাসাগর। মনীষার সংগে হৃদয়বত্তার এমন আশ্চর্য সংমিশ্রণ উনিশ শতকেও দুর্লভ।

ইতিহাস-পাঠকের কাছে একথা অজানা নয় যে, ইতিহাসের কোন ব্যক্তি, ঘটনা বা আন্দোলনই বিচ্ছিন্ন নয়। এর প্রত্যেকটি সূত্রের পেছনে রয়েছে পরম্পরাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাধনার কাহিনী। তাই ইতিহাসের ছবি তার পটভূমিকে নিয়েই সম্পূর্ণ —কোনো একক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টি সেখানে শুধু খণ্ডিত নয়, আংশিক অসত্যও বটে। বিদ্যাসাগরের

ব্যক্তিজীবনের পটভূমিতে রয়েছে উনিশ শতকের ভাববিপ্লবের ইতিহাস। সে ইতিহাসে বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দান রয়েছে। ফরাসী-বিপ্লব, রুশোর মতবাদ, বেন্থামের হিতবাদ—এমনি নানা-কারণে শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মানসলোকে মানবপ্রীতির একটি ধারা সেদিন বইতে শুরু করেছিল। কিন্তু এ মানবপ্রীতি যদি আমাদের জাতির অন্তরের ধর্ম না হ'তো তাহলে বাইরের শিক্ষায় তার ফসল ফলানো সম্ভব হ'তো না। আমাদের প্রবহমান জীবনধারার অন্তরালে নিশ্চয় কোথাও জাতির জীবনদর্শনের এই আপাতনবীন দিকটির সম্ভাবনা নিহিত ছিল। বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় আদর্শে 'জীবে দয়া' কথাটি পাঁচশো বছরের, তারও আগে থেকে উপনিষদের ধর্ম আমাদের বলেছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' কিন্তু উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মানবপ্রীতি মানুষের ভোগসাম্যের কথাটাই বেশি করে ভেবেছে। আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সাম্যের এই পার্থক্যকে এক-মাত্র জীবসেবার সেতুবন্ধনেই বাঁধা যেতে পারে। মানুষ হিসাবে মানুষকে ভালোবাস্‌বার, নিজের কল্যাণের উর্ধ্বে প্রতিবেশীর কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে তুলে ধরবার, এমন কি প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আচার-বিচারের উর্ধ্বে যথার্থ মানবকল্যাণকে উপলব্ধি কর্‌বার সহজবুদ্ধি ও স্থিরসংকল্প আমরা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখ্‌তে পাই। তবু, লোকলোচনের অন্তরালে অনেক মহৎপ্রাণ এই একটি আদর্শের হোমাগ্নি চিরকাল জ্বালিয়ে রেখেছেন। সত্যকে তাঁরা নিঃসংশয়ে নিজেদের মর্মস্থলেই অনুভব করেন, মতামত তর্কবিতর্ক এসবের চেয়ে অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের স্বচ্ছদৃষ্টিই তাঁদের সাহায্য করে বেশী। সেই দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা যখন জীবনক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন, তখন অলস বাক্‌-বিতণ্ডার ধূলিজাল নিঃশেষে অপসারিত হয়ে সত্যসঙ্কল্পের পথে নিশ্চিন্ত যাত্রা শুরু হয়। এমনি একটি ব্যক্তিত্বের প্রেরণা ছিল বিদ্যাসাগরের গতিশীল ব্যক্তিত্বের অন্তরালে। তিনি বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বিদ্যাসাগর"—জীবনীটিতে লিখেছেন—"সেই দয়াবতী সাধ্বীর কোমল হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু ক্ষরণে বিদ্যাসাগররূপ মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল।" এই বিন্দু বিন্দু অমৃতসুধার স্মরণে আমরাও কৃতার্থ হ'তে চাই।

স্নেহের লাবণ্য অন্তরের সৌন্দর্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করে বলা কঠিন, কিন্তু অন্তরের দীপ্তি যে সমগ্র মুখমণ্ডলে লাবণ্য সঞ্চার করে তার অনেক দৃষ্টান্তই দেখানো যায়। ভগবতী দেবীর পবিত্র মুখশ্রীর অতি সুন্দর বাণীচিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ "উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়তনেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংহত সৌন্দর্য···" (চরিত্রপূজা)। এই বর্ণনার সঙ্গে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি কথা যোগ কর্‌লেই ছবিটি সম্পূর্ণ হয়—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর শান্ত মূর্তি লাবণ্যে ঢল ঢল করিত।" ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসেও দেখি দেহলাবণ্যকে অতিক্রম করেছে ভাবের লাবণ্য। ভগবতী-দেবীর এই রূপ ও ভাবের সম্মিলিত মূর্তি আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ভগবতী দেবীর সমগ্র জীবনটি ত্যাগ ও সেবার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ত্যাগ ও সেবা যাদের চরিত্রের অঙ্গস্বরূপ, তারা চিরদিনই কঠোর পরিশ্রমী। প্রয়োজন উপস্থিত হওয়া মাত্র সমস্ত সুখ ও আলস্য ত্যাগ কর্‌তে তাদের দ্বিধা হয় না। ভগবতী দেবী তাঁর নিজের সংসারে গৃহকর্ত্রী ছিলেন। দুপুরবেলা সকলের খাওয়াদাওয়া হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তবে তিনি খেতে বসতেন। অপেক্ষা কর্‌তেন অতিথির জন্য। যদি অভুক্ত কেউ এসে উপস্থিত হ'তো তাহ'লে তার জন্যে নিজের অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে দিতে তাঁর দ্বিধা হ'তো না। সকলের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর তিনি বাড়ীর দরজায় এসে

দাঁড়িয়ে থাকতেন। হয়তো গ্রামের বাজার থেকে অস্নাত অভুক্ত কেউ বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে চলেছে, অমনি তাকে ডেকে স্নান করতে বলতেন। তারপর হয় তাকে বাড়ীতে বসিয়েই খাওয়াতেন, নইলে অন্তত সঙ্গে করে চারটি জলপান দিতেন।

বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের উঁচু-নীচু সব বর্ণের লোক তাদের বিপদের সময় তাঁর সেবা ও সহায়তা লাভ করে ধন্য হ'তো। সেকালে অস্পৃশ্যতার বাড়াবাড়ি ছিল। তেমন দিনেও কেবলমাত্র হৃদয়ধর্মের নির্দেশে ভগবতী দেবী হাড়ি ডোম নির্বিশেষে সকলের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতেন। অসুখ-বিসুখের সময় তাদের দরজায় বসে থেকে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। যাদের বাড়ীতে রান্না করার লোক থাকত না, তাদের জন্য নিজের বাড়ী থেকে পথ্য রান্না করে পাঠিয়ে দিতেন।

অনেক সময়েই দেখতে পাই, আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবটি আছে, আচার-আচরণে, অনেক আপাত-তুচ্ছ আকারে-ইঙ্গিতে সেই ভাবটির প্রকাশ ঘটে; তাই মহাপুরুষদের জীবনেও মহৎ কীর্তির চেয়ে তুচ্ছ ঘটনার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। এমনি একটি তুচ্ছ ঘটনা। বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কড়ামেজাজের লোক। এক-পক্ষ গরম এবং আর একপক্ষ নরম হলে অবশ্য কাজ চলে যায়। কিন্তু ঠাকুরদাসের সংসারে মাঝে মাঝে অচলভাব দেখা দিত। ভগবতী দেবী ঠাকুরদাসের এই মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন না। নিজেও ঝগড়া বাধিয়ে বসতেন। তারপরেই চিরন্তন অভিমানের পালা। শোবার ঘরে ঢুকেই ভগবতী দেবী দরজা বন্ধ করে দিতেন। ঠাকুরদাসও অমনি বাড়ীর বাইরে পা দিতেন—অবশ্য মানভঞ্জনের উদ্দেশ্যে। সারা গাঁ খুঁজে খুঁজে বড় দেখে একটি রুই কি কাতলা এনে বন্ধ দরজার সামনে ফেলে দিতেন। ভগবতী দেবীর জীবনের অন্যতম আনন্দ ছিল বড় মাছ পেলে সেটি রান্না করে লোকজনকে খাওয়ানো। মাছের শব্দ পাওয়ামাত্র তাঁর সমস্ত রাগ কোথায় মিলিয়ে যেতো। অমনি দরজা খুলে মাছ নিয়ে তিনি আঁশবটির দিকে এগিয়ে যেতেন। ঠাকুরদাস জানতেন মানভাঙানোর এমন ভালো ওষুধ আর কিছু নেই।

একবার শীতের সময় বাড়ীর জন্য বিদ্যাসাগর ছ'খানি লেপ কলকাতা থেকে তৈরী করে পাঠালেন। লেপ পেয়ে তাঁর মায়ের মনে স্বাভাবিক আনন্দ হয়েছিল নিশ্চয়ই কিন্তু রোজকার অভ্যাস মতো পাড়া-প্রতিবেশীর সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলেন যে একজন প্রতিবেশী বড়ো নিঃসম্বল—এমন শীতেও কোন কিছু তৈরী করবার ক্ষমতা নেই। পাড়ায় পাড়ায় আরো নিঃসম্বল মানুষকে লেপ পাঠিয়ে সব ক'টিই শেষ হয়ে গেল। মা তখন ছেলেকে লিখলেন, ঈশ্বর, তুমি যে লেপ পাঠিয়েছিলে, সেগুলি যারা শীতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের দিয়ে ফেলেছি। আমাদের ব্যবহারের জন্য তুমি খানকয় লেপ পাঠিয়ে দিও। ছেলে উত্তর দিলেন, "ঐ ধরনের বিপন্ন লোকদের এবং বাড়ীর সকলকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একটি লেপ রাখিতে হইলে সবশুদ্ধ কয়খানি লেপ পাঠাইতে হইবে লিখিও। তোমার চিঠি পাইলে আবশ্যকমত লেপ পাঠাইব।"

ভগবতী দেবীর মাতৃসত্তার বিস্তার শুধু এদেশের মানুষকেই নয়, বিদেশের মানুষকেও স্নেহবন্ধনে বাঁধতে সক্ষম হয়েছিল। সেদিক থেকে তার ভিতরকার সহজ ও স্বাভাবিক স্থিরবুদ্ধি এবং গ্রহণশক্তি আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। মেদিনীপুরের আয়কর-সংক্রান্ত কাজের ভার পেয়ে অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব একবার বীরসিংহ গ্রামের কাছাকাছি এসেছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন বাড়ীতে। কথায় কথায় মাকে তিনি ওই তরুণ সাহেব অফিসারটির কথা বললেন। ভগবতী দেবীর মাতৃহৃদয় অমনি সেই ছেলেটিকে

বাড়ীতে এনে খাওয়ানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সে যেন একজন উচ্চপদস্থ বিদেশী এ কথা তাঁর মনেই পড়লো না—সে যে অল্পবয়সী তরুণ এই কথাটি ভেবেই তিনি বললেন, "ঐ ছেলেটিকে একবার আমাদের বাড়ীতে ডেকে এনে কিছু খাওয়ালে ভালো হত।" বিদ্যাসাগর মায়ের কথামত সাহেবকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সাহেব বললেন, "আপনার মা নিজে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যেতে পারি না।" ভগবতী দেবী নিজের হাতে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

সাহেব বাংলা বুঝতে পারতেন। নিজের হাতে রান্না করে তিনি তাঁর এই পুত্রতুল্য স্নেহভাজনটিকে খাওয়াতে বসলেন। সাহেবও মাতৃহৃদয়ের স্নেহ উপলব্ধি করতে পেরে ঠিক এদেশের মত নত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালেন। ভগবতী দেবী তাঁকে আশীর্বাদ করে কোন্‌টির পর কোন্‌টি খেতে হয় দেখিয়ে দিতে লাগলেন। কথায় কথায় হ্যারিসন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কত টাকা?" সলজ্জ গৌরবে দীপ্তাননা ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন, "কেন, আমার চার ঘড়া ধন। সামনে ঈশ্বরচন্দ্র এবং আর দুই ছেলে দাঁড়িয়েছিলেন। সবার ছোট ঈশানচন্দ্র তখন বাড়ীতে ছিলেন না।[১] সাহেব বুঝলেন এই চার ছেলেই তাঁর চারঘড়া ধন। বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে বললেন, "ইনি তো সাধারণ স্ত্রীলোক ন'ন। এমন মা না হ'লে কি এমন ছেলে হয়?"

খাওয়াদাওয়ার শেষে ঠিক আপন মায়ের মত সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ভগবতী দেবী বললেন—"দেখ বাছা! তুমি যে কাজ নিয়ে এসেছ—এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধানে কাজ করো, যেন গরীব দুঃখী লোক প্রাণে মারা না যায়, তারা যেন তোমাকে আপনার লোক মনে করে সুখী হয়।" স্নেহরসসিঞ্চিত এই উপদেশ হ্যারিসনের মর্মে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল। কর্মজীবনে তাঁর জনপ্রিয়তার এইটিই ছিল মূলসূত্র। বিদ্যাসাগরকে তিনি বলেছিলেন, "চিরদিন এই স্মৃতি আমার মন প্রাণ ভরে থাকবে।" বিদেশী ছেলের মায়ের স্থান ভগবতী দেবী যে এত সহজে পূরণ করতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর নিজের জীবনের সাম্যদৃষ্টি ছিল সহজাত এবং সুগভীর।

সব শাস্ত্রের সেরা শাস্ত্র মানব-হৃদয়। আবার সব হৃদয়ের সেরা হৃদয় মায়ের হৃদয়। বিচারবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যের বলে যে সব সিদ্ধান্ত আমরা করে থাকি, অনেক সময়েই সে সিদ্ধান্তে ফাঁক থেকে যায়। কিন্তু পবিত্র হৃদয়ের সিদ্ধান্ত কখনো ভুল করে না। ভগবতী দেবীর অনুভূতি-প্রণোদিত বুদ্ধি ও বিচারশক্তি জীবনের গভীরতম সত্যকেও সহজে উপলব্ধি করতে পারতো। শুধু তাই নয়, আচারে-আচরণে সে সত্যকে বিকশিত করে তুলতো।

কিন্তু ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পূজা-পার্বণ নিত্যক্রিয়া। সম্ভবক্ষেত্রে দুর্গাপূজা সকলেই করবার চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর একবার দুর্গাপূজার ব্যাপারে মায়ের মতামত জানবার জন্য মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বছরের মধ্যে একদিন পুজো করে ছয় সাত শ' টাকা মিছিমিছি খরচ করা ভালো, কি গাঁয়ের গরীব অনাথদের অবস্থা অনুসারে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করা ভালো?" বিদ্যাসাগরের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলনামূলকভাবে প্রথম খরচটি "মিছিমিছি" সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবতী দেবীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্য রকমের ছিল। কারণ বিদ্যাসাগরের "জননীদেবী মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য দেবতার পূজা দিতেন এবং বিদেশস্থ ছেলেদের উদ্দেশে শুভচুনীর পূজা মানসিক করিতেন এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিতেন। তাঁহারি আগ্রহাতিশয়ে বাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা হইত; তিনি ভক্তিপূর্বক

[১] "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত"—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

পূজার আয়োজন করিতেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। এতদ্ভিন্ন কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থপর্যটনে যাইতেন।"[২] কিন্তু এক্ষেত্রে ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন, "গাঁয়ের গরীব অনাথেরা যদি দু'বেলা খেতে পায়, তাহ'লে পূজো করার দরকার নেই।"

শাস্ত্রবিচার ও দেশাচারের বিশেষ কোন পার্থক্য এদেশে অনেককাল থেকেই মানা হয় না। ভগবতী দেবীর জীবনে দেশাচারের প্রশ্ন আরো দেখা দিয়েছে। সব সময়েই তিনি সে প্রশ্নের সরল ও শ্রেষ্ঠ সমাধান করেছেন। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রগত যুক্তি সংগৃহীত হওয়ার পর বিদ্যাসাগর একদিন পিতা ঠাকুরদাসকে একের পর এক সব যুক্তি পাঠ করে শোনালেন। সব শুনে বাবা বললেন, "তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা কর, আমার কোন আপত্তি নেই।" বাবার কাছ থেকে এ আদেশ পেয়ে বিদ্যাসাগর মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, "মা, তুমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝবে না। আমি বিধবা-বিবাহ নিয়ে এই বইটি লিখেছি, কিন্তু তোমার মত না পেলে ত এ বই ছাপাতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কথা আছে।" ভগবতী দেবী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কিছু আপত্তি নেই। সারা জীবন যাদের চক্ষুঃশূল, মঙ্গলকাজে অমঙ্গলের চিহ্ন, আর ঘরের বালাই হয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দিন কাটছে, তাদের সংসারে সুখী করবে—এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।" শুধু মত দেওয়া নয়, বিধবাবিবাহের পরে যখন সমাজে সংসারে গ্লানি ও নিন্দায় চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেই দুঃসময়েও কোন ভয়, কোন শঙ্কা ভগবতী দেবীর সিদ্ধান্তকে বিচলিত করতে পাবে নি। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় যখন একের পর এক বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, আর সমগ্র দেশময় সেই সংবাদ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার খোরাক হয়ে উঠছে, সেই সময়েই ভগবতী দেবী তাঁর বীরসিংহের বাড়ীতে পুনর্বিবাহিতা ব্রাহ্মণ বিধবাদের সঙ্গে একত্র এক পাত্রে খেয়েছেন। সমাজের ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচাবার জন্যে বিদ্যাসাগর এই ধরনের দম্পতিদের মাঝে মাঝে বীরসিংহে পাঠিয়ে দিতেন। ভগবতী দেবী তাঁর অপার ভালোবাসার দ্বারা তাদের আপন করে নিয়ে আনন্দে ভরে দিতেন। সমাজসংস্কার এমনি হৃদয় স্পর্শেই সত্য হয়ে ওঠে।

সংসারের সব দুঃখী-দরিদ্র আর্ত ও ব্যথিত মানুষকে আপন করে নেবার মন্ত্রদীক্ষা বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। বীরসিংহের বসতবাটী একবার আগুন লেগে সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর গ্রামে এসে মাকে কলিকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। মা রাজী হলেন না। কারণ, যে সব গরীব ছেলে তাঁর কাছে থেকে ইস্কুলে লেখাপড়া করে, তিনি চলে গেলে যে তাদের বেঁধে খাওয়াবার লোক থাকবে না।

১৮৬৬ সালের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের অনুপ্রেরণায় বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলেছিলেন। সেই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকা উল্লেখ করেছিল, "বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা প্রত্যহ চার পাঁচশত লোক খাওয়াইয়া থাকেন।" উত্তরকালে ভগবতীদেবীর কাশীবাসকালে বিখ্যাত হিন্দী কবি হরিশ্চন্দ্র একদিন রহস্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রূপার খাড়ু?" বাস্তবিক, ভগবতীদেবীর হাতে রূপার গহনাই ছিল। ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন, "সোনারূপায় কি করে? দুর্ভিক্ষের সময় এই হাত হাজার হাজার লোককে বেঁধে খাইয়েছে। তাতেই বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোভা।"[৩]

ফরাসী দেশে নিতান্ত অর্থকষ্টে পড়ে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানান।

২ "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত"—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৩ বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার।

এই আবেদনের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother." এই বাঙালী মায়ের পরিচয় মধুসূদন তাঁর নিজের মায়ের মধ্য দিয়েই পেয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঙালী মায়ের মধ্যেও ভগবতী দেবী অনন্যা। তাঁর সন্তানগৌরবের চেয়ে বোধ করি এই কারণেই বিদ্যাসাগরের মাতৃ-গৌরব বেশী ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণায়*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ আপনারা হরিকৃষ্ণমন্দিরে এসেছেন এক পরম শুভদিনে—সংস্কৃতে যাকে বলে "পুণ্যাহ"। আজ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—কত শত ধর্মার্থীই না আজ সেখানে আসবেন সেই পরম পুরুষের বিদেহী আশীর্বাদের স্পর্শ পেতে। আমি আপনাদের কাছে আজ এই মহান যুগাবতার সম্বন্ধে মাত্র দুচারটি কথা বলব—বলতে আনন্দ হয় বলে। তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আমার ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন না ক'রে যদি ব্যক্তিগত ভাবে বলি কী ভাবে তিনি আমার জীবনে এসেছিলেন "নিশার ঘন তিমির দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে"—তাহ'লে আশা করি কারুরি আপত্তি হবে না—আরো এই জন্মে যে এতে ক'রে তাঁর পুণ্য প্রভাবের একটা দিক উজ্জ্বল করে দেখানো হবে—যাকে বলা যেতে পারে জিজ্ঞাসুর কাছে আপ্তকামের পথনির্দেশ। কীভাবে শত শত অন্বেষুর আঁধার জীবন এই মহা-পুরুষ তাঁর আলোর দানে ধন্য করেছিলেন তার খানিকটা পরিচয় মিলবে যদি আমাকে আপনারা সাধারণ জিজ্ঞাসুদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করেন।

আমার বয়স তখন হবে তের কি চোদ্দ। আমার এক পিসতুত ভাই নির্মলেন্দু লাহিড়ি (যিনি পরে অভিনেতা হ'য়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন) ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত। তাঁর সঙ্গে আমি প্রায়ই তর্ক করতাম ঈশ্বর যে আছেন তা না জেনে মেনে নেওয়ার মানে হ'ল অন্ধ বিশ্বাস। নির্মলদা উত্তরে উদ্ধৃত করতেন ঠাকুরের কথা "ওরে পাকা ছেলে! বিশ্বাসের আবার কবে চোখ থাকে? হয় বল্ জ্ঞান—যে দেখেছে, নয় বিশ্বাস—যে দেখে নি কিন্তু জ্ঞানীর এজাহারে যার আস্থা আছে। বিশ্বাস মাত্রেই তো অন্ধ।"

"কিন্তু নির্মলদা, তেমন জ্ঞানী কোথায় যাঁর এজাহার মানব? অন্ততঃ এযুগে তো চোখে পড়ে না—"

"থাম্ থাম্ পাকা ছেলে! না জেনে ডেঁপোমি করিস নে, পড়"—ব'লেই আমার হাতে গুঁজে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথমভাগ।

বইটি পড়তে না পড়তে কেন জানি না বুকের মধ্যে যাকে বলে "অশ্রুসাগর উঠল দুলে কূলে কূলে কূলে কূলে।" কী ভাবে—তার কেমন ক'রে বর্ণনা করি? খানিকটা বলা যেতে পারে উপমা দিয়ে। বিলেতে একটি রঙ্গমঞ্চে একবার দেখেছিলাম

* গত ১৮ই মার্চ সকালে শ্রীদিলীপকুমার রায় সমবেত শতাধিক শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের মধ্যে এই ভাষণটি দিয়েছিলেন—পুনায় হরিকৃষ্ণমন্দিরে। তিনি ভাষণটি দিয়েছিলেন ইংরেজীতে, এখানে তার সারাংশ তিনি নিজেই বাংলায় লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। —উঃ সঃ

একটি মরুভূমির দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের বাতি গেল নিভে—বাতি জ্বলতে না জ্বলতে দেখি কি—ওমা! ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের কল্যাণে সুন্দর বাগান বাড়ি—নদীতীরে!! এক মুহূর্তে জাদুকরের জাদুদণ্ডের ছোঁওয়ায় সব কিছু যেমন ওলট পালট হ'য়ে যায় 'কথামৃত' আমার কিশোর মনে ঠিক তেমনি ওলটপালট এনে দিল।

কিন্তু হ'লে হবে কি, অবিশ্বাস হ'ল সেই জাতের তৈরী যার বিশেষণ হচ্ছে—"মরিয়া না মরে রাম"। নির্মলদাকে বললাম; "শ্রীম লিখেছেন বটে, কিন্তু শুধু স্মৃতিশক্তির উপর ভর ক'রে তো। রিপোর্ট ভুল—"

"ফের, পাকা ছেলে? শ্রীম মহাযোগী, মহাভক্ত—অসামান্য তাঁর স্মৃতিশক্তি। তিনি ঠাকুরের কথা যা যা শুনতেন রোজ ফিরে এসেই লিখে রাখতেন তাঁর দিনপঞ্জিকায়। দেখবি?"

"দেখব না?" ব'লে মহাউৎসাহে নির্মলদার সঙ্গে গেলাম শ্রীম-র ওখানে। গিয়ে যা দেখলাম আমার 'তীর্থংকর' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছি; 'Among the Great' বইটিতেও আছে। কাজেই সেসবের পুনরুক্তি করব না, কেননা আপনাদের মধ্যে অনেকেই সে-বিবৃতি পড়েছেন, কিম্বা ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন। শুধু একটি কথা বলব এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের সম্বন্ধে যাঁর লেখা প'ড়ে লক্ষ লক্ষ জিজ্ঞাসুর মন ঝুঁকেছে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যোজ্জ্বল ব্যক্তিরূপের দিকে।

শ্রীম আমার মুখে যেই শুনলেন যে, আমি তাঁর কাছে এসেছি ঠাকুরের কথা শুনতে—সেই তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন: "ওরে প্রভাস! আয় আয়—দেখে যা একটি ছোট ছেলে এসেছে আমার কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে রে, ঠাকুরের কথা শুনতে!" ব'লেই আমার দিকে চেয়ে: "দেখ বাবা! দেখ—আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে।" আমি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই রোমহর্ষণ যাকে বলে। মনে হ'ল শুরুভক্তি বটে!

সেই থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে করতাম রোজ ধ্যান, ডাকতাম তাঁকে: "ঠাকুর! তোমার উপদেশ মেনে যেন চলতে পারি—সব ছেড়ে যেন ভগবানকে চাইতে পারি।" যেতাম বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণা পেতে। সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেতাম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ছোট ঘরটিতে। পরে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ প্রায় সবই দেখেছি, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ছোট শয়নকক্ষটিতে ঢুকতে না ঢুকতে মনে যেভাবে জেগে উঠত ভক্তির জোয়ার তেমনটি আর কোনো তীর্থে ওঠে নি—কেবল হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে ছাড়া। কিন্তু হরিদ্বারের গঙ্গা জীবন্ত করুণাধারা হ'লেও শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর যেমন আমার কাছে চিরদিনই হ'য়ে এসেছে তীর্থের তীর্থ—তেমনি আজও তাঁর 'কথামৃত' হ'য়ে রইল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বেদ বা গীতা। কতবারই যে পড়েছি এ অপূর্ব বইটি—সারা জগতে যার জুড়ি নেই। আর পড়তে না পড়তে হৃদয় হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। এখনো প্রায় রোজই কয়েক পাতা পড়ি এ-বইটি থেকে। আপনারা সবাই পড়বেন এই বইটি বাংলায় কিম্বা ইংরাজিতে—'Gospel of Sri Ramkrishna' নিখিলানন্দের লেখা! আমি মাঝে মাঝে ব'লে থাকি যে যদি আমাদের "সেকুলার" গভর্ণমেণ্ট কোনোদিন আমার হিন্দু ভক্তিপ্রিয়তায় রুষ্ট হ'য়ে আমাকে পুলিপোলাও চালান দেন আর কৃপাভরে বলেন সে-দ্বীপান্তরে মাত্র একটি বই সঙ্গে নিতে পারব, তবে আমি শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঁচখণ্ড বাঁধিয়ে পুরে নেব আমার নির্বাসিত জীবনের উপজীব্য স্বরূপ।

শেষে কেবল আর একটি কথা বলব। এযুগে অনেকের মুখেই শুনতে পাই—"সবই তো বিজ্ঞানের হাতে, আধ্যাত্মিকতার দৌড় কতটুকুই বা।"

উত্তরে শুধু বলব : "যিনি জেগে না ঘুমোতে চান, চোখ চেয়ে পথ চলতে চান তিনি যেন শুধু একটিবার ভাবেন কী বিপ্লব জগতে ঘটে গেছে শুধু একটি পূজারী ব্রাহ্মণের তপস্যায়—যাঁর না ছিল পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্য, না লেকচারের হাঁকডাক বা লেখার মুন্সিয়ানা। অথচ এই একটি মানুষ তাঁর অশোক শিষ্য অগ্নিপুরুষ বিবেকানন্দের মাধ্যমে সমস্ত জগতে আজ প্রণম্য বলে গণ্য হয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের লোকসেবা এমনকি নাস্তিকেরাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ "সেকুলার" নীতিবাদ প্রচার না করা সত্ত্বেও। জগতে ধর্মের বহু ব্যভিচার হয়েছে সব দেশেই। ফলে অনেক চিন্তাশীল মানুষই মনে আঘাত পেয়ে আজকের দিনে কান্না শুরু করেছেন যে ধর্ম অসহিষ্ণুতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে জগতের বহু অহিতসাধন করেছে। অভিযোগটা মিথ্যা, কারণ ধর্মের স্বভাব ধারণ করা—"ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুঃ"—বলা উচিত ছিল ধর্মের নামে গোঁড়ামি করেছে অনিষ্ট। সিন্ধুউদার ঠাকুর তাই পই পই ক'রে মানা করতেন—"মতুয়ার বুদ্ধি করিস্ নি রে! নিজের পথে চল্ কিন্তু আর সবাইয়ের পথই ভুল এমন কথা বলিস্ নি।"

জগতে অসহিষ্ণুতার সব চেয়ে বড় প্রতিষেধক—খাঁটি ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই খাঁটি ধর্মের অনন্যসাধারণ উদ্গাতা, উদারতার মূর্তিমান বিগ্রহ। গোঁড়ামিকে তাই তিনি চাবুক মেরেছেন বারবারই তাঁর সহজ সরল কিন্তু তীব্র চলতি ভাষায়। আর তাঁর কথায় যে "পাহাড় ট'লে যেত" তার কারণ তিনি পেয়েছিলেন ভগবতীর "চাপরাশ"। ফলে তিনি আজ সর্বদেশেই অর্থার্থীর না হোক—আর্ত জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রণাম পেয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে তাই গুঞ্জন গাই আজ তাঁর পুণ্য চরণে প্রণাম ক'রে :

একলা পথের পান্থ হ'য়ে সব পথিকের সঙ্গ নিলে।
"বাসলে ভালো মিলবে আলো সব পথেই—" এ-মন্ত্র দিলে।

কাটলে বাঁধন পরতে রাখী,
তোমায় বলে কি বৈরাগী—
প্রাণমৃণালে যার ফলে নীলকমল প্রেমের মন্দানিলে!
ছাড়লে নিখিল আনতে টেনে নিখিলনাথে এ নিখিলে॥

অঢেল মেলে মোহের মুনি, যশের যোগী শক্তি-অধীর।
কোটির মাঝে গোটিক মেলে আত্মভোলা প্রেমের ফকির।

তাই তো হ'য়ে সর্বহারা
ভাঙলে কালোর পাষাণ-কারা,
অহংকারের মরণ সেধে অমরণীর গান গাহিলে।
সবার তরে আপন-পরের সীমারেখার দাগ মুছিলে॥

সংস্কৃত-শিক্ষা প্রসঙ্গে

স্বামী জীবানন্দ

আজকাল প্রায়ই অনেকের মুখে একটা কথা শোনা যায়, যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থের সন্ধান দেয় না তা শিখে কোন লাভ নেই। অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যাই প্রয়োজনীয়, অন্য বিদ্যা বর্জনীয়। ইদানীং বিদ্যার লাভালাভ বিচার করা হয় অর্থোপার্জনের মাধ্যমেই। মা সরস্বতীর স্থান মা লক্ষ্মীই প্রকারান্তরে অধিকার করে নিচ্ছেন! বিদ্যা যে জ্ঞান অর্জনের জন্য তা আমরা ভুলতেই বসেছি।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিষয়ে ছাত্রদের বেশ পরিশ্রম করতে হয়, অথচ ইহা এমন একটি জিনিস

যা এত কষ্ট করে শেখা হবে—কিন্তু জীবনে টাকা রোজগারের উপায় তা বাংলাতে পারবে না। এটি নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়। তথাপি টাকাই জীবনের সব নয় এবং অর্থোপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না আর হওয়া উচিতও নয়। আংশিক প্রয়োজন হয়তো অর্থের দ্বারা মিটতে পারে। এ দিকটি ছাড়া জীবনের আরও বহু দিক রয়েছে, সংস্কৃতের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক অতীব নিগূঢ়। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা ধরা যাক। আজ পৃথিবীর নানা দেশ ভারতের কাছ থেকে শান্তির বাণী শোনবার জন্যে ঐকান্তিক আগ্রহে উৎকণ্ঠিত কেন? এর কারণ ভারতের যুগযুগ-বাহিত সভ্যতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত জীবন-দর্শন রয়েছে যার মূলকথা হচ্ছে বিশ্বমৈত্রী, প্রেম, কল্যাণ। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎস আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ। এগুলি তো সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃতের সঙ্গে ভাল পরিচয় না থাকলে ভারতীয় ঐতিহ্যের নিগূঢ় মর্মগ্রহণ কঠিন। আর এই মর্মগ্রহণ কি কম প্রয়োজনীয় জিনিস?

আবার ভারতের প্রধান ভাষাগুলির বেশির ভাগই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, তেলেগু, মালয়লম্ প্রভৃতি ভাষার শব্দসম্ভার নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না কি, যে সংস্কৃতই অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার আদি-জননী? বিরাট হিমাদ্রির বরফপুষ্ট জলধারায় গঙ্গা যমুনা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের মতো এরা সংস্কৃতের অমৃতনিস্যন্দিনী শক্তিতে সঞ্জীবিত। বাংলা ভাষার যে কোনও একখানা বই নিয়ে লক্ষ্য করলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শতকরা ৮০% ভাগেরও বেশী তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দে পুস্তকখানি পূর্ণ, তা ছাড়া রূপান্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ তদ্ভব শব্দসংখ্যাও নগণ্য নয়।

অনেকে হয়তো বলবেন সংস্কৃত থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়নি, হয়েছে প্রাকৃত থেকে। তাহলেও প্রাকৃতের আলোচনায় ঐ একই জিনিস এসে পড়ে। আর সংস্কৃতের শব্দসম্পদে বাংলা যদি পরিপুষ্টি লাভ করে থাকে তাতেই বা হয়েছে কি, সেগুলি তো এখন বাংলার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। চিরদিন কি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়ে থাকতে হবে? বাংলা ভাষার স্বাধীন সত্তা এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে না? প্রাচীনা সালঙ্করা পিতামহীর মতোই কি নবীনা পৌত্রী বিভূষিতা হবে? না তা নয়—নবীনা নব্যভাবেই সুসজ্জিতা হবেন। ভাষার ক্ষেত্রেও গতানুগতিকতা ছেড়ে নবনব রূপে নবনব ভাবে ছুটে চলবে প্রগতির দিকে। বদ্ধ জলের মতো নয়, খরস্রোতা তটিনীর মতো নানা তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত হবে ভাষার গতি। তা নইলে অচল পঙ্গু ভাষার কোন মূল্য নেই। জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দৈশ্বর্য পরিপাক করবার শক্তি যে ভাষায় বর্তমান সেই-ই তো প্রাণবন্ত। সঙ্কীর্ণতা যত নাশ হবে ভাষার পরিধিও হবে তত বিস্তৃত। নবীন ভাব গ্রহণ করতে হবে বলেই কি জননীর জননীত্ব অস্বীকার ক'রে তাঁকে নির্বাসিতা করতে হবে? জননীকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা করে পরম শ্রদ্ধায় পূজা করলে গৌরব বাড়বে বই কমবে না। যে নবীন প্রাচীনকে ধ্বংস ক'রে নবীনত্বের বড়াই করে সে মূর্খ; কিন্তু যে প্রাচীনকে যোগ্যস্থান দিয়ে তার ভাবটিকে নবীনতার রঙে রাঙিয়ে তোলে সেই-ই বিজ্ঞ। তার সৌধ হয় দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বালির বাঁধের মতো তা সহজেই ভেঙে পড়ে না।

ইয়োরোপে গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে ইংরেজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার যে সম্পর্ক তা তার চেয়ে বেশী গভীর ও ব্যাপক। শুধু ভাষা কেন, আমাদের অস্থিমজ্জায় এর প্রভাব বিদ্যমান। কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সব

জায়গাতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট। সংস্কৃতের অনুপ্রেরণা যুগ যুগ ধরে আমাদের জাতীয় প্রাণ সঞ্জীবিত করেছে। এখন যদি এই প্রভাব ও অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বিচ্যুত হই, তবে আমাদের প্রাণের রস যে বিশুষ্ক হয়ে যাবে তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। জাতির সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড, সমাজের ভিত্তি ভূমিসাৎ হবে। ধর্মময় ভারতীয় জীবনের স্রোত ভিন্নমুখে প্রধাবিত হলে পতন অবশ্যম্ভাবী—সমস্ত চিন্তাশীল এবং কল্যাণকামী ব্যক্তিই এ বিষয়ে একমত। বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ ভারতের অধিকাংশ ভাষার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ সেইরূপই। স্বাধীন হওয়ার পর বিদেশে আমাদের মর্যাদা বেড়েছে এবং দেশে বিদেশে সকলেই আমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করছে। এ সময়ে আমাদের কৃষ্টি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন প্রয়োজন, সেইজন্য অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মনঃসংযোগ সহকারে সংস্কৃত-শিক্ষা আবশ্যক।

আইন, গণিত, বিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি সমস্তই সংস্কৃত থেকে গ্রহণ অথবা সংস্কৃতের সাহায্যে তৈরী করা হচ্ছে। পারিভাষিক শব্দগুলি বুঝতে গেলেও সংস্কৃতশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার্য।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বেদবেদান্তকে মঠ মন্দির থেকে বের করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত ভাষা সকলকে পরম যত্নে ও আগ্রহে শিখতে ও সংস্কৃতের অমূল্য রত্নরাজি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে বলতেন। সংস্কৃত ভাষাকে সহজ, সরল, যুগোপযোগী করার বাসনাও তাঁর অন্তরে ছিল। জাতিকে তুলতে গেলে সংস্কৃতের ব্যাপক প্রসার যে চাই তা তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষা শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। যে ভাষার মাধ্যমে ব্যাস-বাল্মীকি-মনু, ভাস-ভবভূতি-কালিদাস, চাণক্য-শংকরাচার্য রামানুজ তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার পরিবেশন করেছেন সে ভাষা কত গৌরবের তা ভাববার নয় কি? প্রাচ্যের ষড়্‌দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ এ সবের তুলনা কোথায়? রামায়ণ-মহাভারতের অপূর্ব চরিত্রগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের জাতীয় চরিত্রগঠনে সাহায্য করে আসছে। গীতা উপনিষদের সার্বভৌম উদারভাব সর্বজনগ্রাহ্য। বেদান্তই একমাত্র প্রকৃত সমন্বয়সাধক। এসমস্ত অমূল্য সম্পদ যদি অনাদর করে দূরে ফেলে রাখি তবে বেগুনওয়ালার মতো হীরকখণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করতে কোনদিনই পারব না। পাশ্চাত্ত্যের জার্মাণী প্রভৃতি দেশে সংস্কৃতের চর্চা খুব বেশী। আমাদের সংস্কৃতের প্রতি অনাদর স্থায়িরূপ ধারণ করলে এমন দিন আসতে বিলম্ব হবে না যখন বেদবেদান্তের একটা কথা শোনবার জন্যে পাশ্চাত্ত্য মনীষীর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত দৃষ্টিপাত করতে হবে। তখন ভারতের উত্তরকালীনরা হয়তো শুনবেন বেদের উৎপত্তি ইয়োরোপেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন পাশ্চাত্ত্যের আমরা বিজ্ঞান রাজনীতি প্রভৃতি গ্রহণ করব কিন্তু ভিক্ষুকের মতো নয়, বিনিময়ে আমরা দেব মানুষের অমূল্য সম্পদ্ আধ্যাত্মিকতার সন্ধান। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা যতই থাক্ তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু অন্যদেশের আধুনিক সাহিত্য ও সভ্যতার পল্লবগ্রাহিতা থাকলেই আমরা বিজ্ঞ আখ্যা লাভ করি। তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ভারতীয় আদর্শকে ধরতে না পেরেও বিজ্ঞ ব'লেই পরিচিত ও সম্মানিত!

আজকাল প্রাদেশিকতার বিষ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র যেন দিন দিন পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। একটি রাজ্য তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ভাষাকে

দমিয়ে রাখবার জন্যে যে সব জঘন্য কাজ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের অধিবাসী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও একটি বিষয়ে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির পরম ঐক্য রয়েছে তা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। অতএব সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচারে প্রাদেশিকতার জ্বালাময় বিষ থেকে ভারতবাসী অনেকটা মুক্ত হতে পারবে এবং ঐক্যও বাড়বে সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত মৃত ভাষা নয়—এ ভাষা মরতে পারে না। এর নাম অমরভাষা—দেবভাষা। অমৃতের সন্ধান দেয় তাই অমর ভাষা। দৈবী সম্পদ, সাত্ত্বিকী বৃত্তি জাগায় বলে দেবভাষা। যাঁরা এই পরম পবিত্র ভাষাকে মৃত বলে উপেক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যেই মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। সংস্কৃতে কথা বলা যায় না খুব কঠিন বলে এইরূপ একটা অভিযোগ আছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রভাষার উন্নতির যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক সেই রকমই যদি চেষ্টার ত্রুটি না থাকে তবে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর দ্বারা এই কঠিন ভাষাকেই সহজ সরল কথ্য ভাষার উপযোগী করে তৈরী করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ে আদর্শস্থল। রাষ্ট্র ও পণ্ডিতসমাজের সমবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এ সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হবে এবং সংস্কৃত বিদ্যাদ্বারা অর্থোপার্জনের পথও উন্মুক্ত করা যাবে।

সমস্ত দিক বিচার করে মনে হয় ভারতবর্ষে সংস্কৃত-শিক্ষা ব্যতীত আদর্শ শিক্ষা হতেই পারে না এবং উন্নতিও হবে ব্যাহত। যে সমস্ত শিক্ষাসংস্কারক সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে শিক্ষাসংস্কারের চিন্তা করেন তাঁরা ভুলে যান গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে গাছ বাঁচে না। মূলো নাস্তি কুতঃ শাখা?

অপ্রকাশিত লোকসঙ্গীত

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র, এম্-এ

[উদ্বোধনের ফাল্গুন, ১৩৬২ সংখ্যায় কতকগুলি অপ্রকাশিত লোকসঙ্গীত পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিয়েছিলাম এই সংখ্যায় আরও কয়েকটি পরিবেশিত হল।]

দীনরঞ্জনের পদ—

নিম্নলিখিত কালী-সঙ্গীতগুলি "রতন লাইব্রেরীতে" পাওয়া গিয়েছে। কবিপরিচয় জানতে পারা যায় না। এঁর পদ বা গান পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জ্ঞাত নই।

(১)

একতালা

অশান্ত পরাণে শ্যামা মা আমার কর শক্তি দান,
সঙ্কটেতে পড়ি, ডাকিমা শঙ্করী, সঙ্কটনাশিনী কর পরিত্রাণ।
ভ্রান্তিবশে দিন গেল ভবদারা, পুঁজি নাই শ্রীপদ হয়ে জ্ঞানহারা,
কুজন দুজন রিপু বাধা দেয় মা তারা, হৃদয়জ্বালা তারা কর গো নির্বাণ।
ঘুচাও নিরানন্দ, আনন্দদায়িনী দুর্লভ রাঙাপদ কর মা প্রদান।
ওমা দক্ষবালা, ঈশ্বর-ঈশানী, বিশ্বরূপধরা গিরিশগৃহিণী
তুমি পরমাপ্রকৃতি ভবপ্রসবিনি, পরমাণুমূল চেতনারূপিণী,
দাও মা চৈতন্য শিবসোহাগিনি, শঙ্করবন্দিত-পদে দাও মা স্থান।

বৃথা কাজে দিন গেল মা বিমলা, নাশ দীনরঞ্জনের ভীষণ ভবজ্বালা,
সাঙ্গ হবে যেদিন কর্মভূমের খেলা (সেদিন) পাষাণের মেয়ে হয়ো না পাষাণ॥

(২)

ঝাঁপতাল

হৃদয়ে রেখেছি শ্যামা যত দুখ দিয়েছ মোরে,
পাষাণ হলেও যেতে গ'লে, বুকভাঙ্গা দুখ আছি ধরে।
সন্তানের সনে সর্বদা কেন কর মা প্রবঞ্চনা,
দুখ দিয়ে কি সুখে থাক, মুখ দেখে কি মন গলে না,
মার মায়া কি এমনি ধারা ডাকলে ছেলে, পায়না সাড়া,
সদাই কি বয় দুখের ভারা, প্রাণ কাঁদে কি এমনি করে?
কুলহারা হইয়ে কালী, পাথারে ভাসি নিশিদিন,
নিতান্ত নিদয়া হয়ে নাশিবে না কি এ দুর্দিন,
কামদা কাঁদে কিঙ্কর, ভেসে যায় মা ধর ধর
আসিয়ে দুর্গতি হর মা, হররমা হয়অন্তরে।
বাসে আর বাসনা নাই মা, রেখ না আর মায়াঘোরে
সাধিলে বাদ, মিটলা সাধ, থাকব কেন ফাঁদে পড়ে,
কেন মা যাতনা সব, বুক ভাঙ্গা দুখ হৃদে বব,
চরণ দুটি ধরে রব, ছাড়ব না আর মা তোমারে।
সুখ তরে এল সংসারে সন্তাপে দিন কেটে গেল,
মা হয়ে সন্তানে শ্যামা এত দুখ কি দেওয়া ভাল,
ভজনহীন রঞ্জনের ভালে, সুখ দিলে না কোন কালে
(এবার) থাকব তোমার চরণতলে, দেখব শমন লয় কি করে॥

(৩)

ঝাঁপতাল

এসেছ কদিনের তরে, জান না কিরে যেতে হবে
মনে ভেব না, এ ভবনে চিরদিন থাকিতে পাবে।
মোহিত হয়ে মায়াকুহকে ভাব কি রবে চিরকাল,
হরষে সদা মররে ঘুরে, ভাব না পিছে আছে কাল
কামিনীকাঞ্চনরসে নিয়ত তাহে আছ ভেসে,
জান না কিরে অবশেষে, পাতান হাট ভেঙ্গে যাবে।
অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে কওনা কথা কারো সনে,
দীন ভিখারী নিকটে গেলে চাওনা ফিরে তার পানে,
নিজ শুভকামনা কর সদা গরবে ফেটে মর
মনে ভাব হায় * * * *
গত হয়েছে কতকাল কত যে ছিল মহীতলে
কত কাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ডে হয়ে গেছে রে কালে কালে,
দুর্যোধন যে মানীশ্রেষ্ঠ, সেই গেছে পেয়ে কষ্ট,
সময় থাকতে ভাব ইষ্ট, নইলে কষ্ট পেতে হবে।
ত্যজিয়ে তনু যেদিনে যাবে ত্যজিয়ে এ ধরাধাম
অনায়াসে তরিতে পার, যদি কয়বে হরিনাম,
ডাকিলে সেই কর্ণধারে, অবোধে যায় ভবপারে,
রঞ্জন অন্তরে তারে, ভাবে নাই কি হবে তবে॥

ভবতারিণীবন্দনম্

শ্রীশ্রীনিবাসকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সিদ্ধান্তরত্ন

(১)

যস্যাঃ পাদরজঃকণাভিরমরৈ রুক্ষীকৃতা মূর্দ্ধজা
লব্ধুং যৎকরুণাকণানপি চিরং ধ্যায়ন্তি যাং যোগিনঃ।
রাজ্ঞী রাসমণির্যকাং সুরধুনীতীরে সমস্থাপয়দ্
বন্দে তাং ভবতারিণীং ভবভয়াচ্ছ্রীরামকৃষ্ণার্চিতাম্।

(২)

ব্রহ্মাদীনমরান্ কৃশানুমরুতো জ্যোতিস্তমস্তারকাঃ
সূর্যাচন্দ্রমসৌ নভোদিননিশা বর্ষর্তুমাসগ্রহান্।
দৈতেয়ান্ মনুজান্ পশূংস্তরুলতায়ন্যানি সর্বাণি চ
সূতে সংহরতে প্রশাস্ত্যবতি যা তস্মৈ নমঃ কোটিশঃ॥

বঙ্গানুবাদ

যাঁহার চরণ ধূলি মাখিয়ে মস্তকে
করিয়াছে দেবগণ রুক্ষ কেশচয়,
যাঁহার করুণাকণা লভিবার তরে
করে ধ্যান যোগিগণ জীবন ভরিয়া—
যাঁহাকে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব
পূজিয়ে লভিলা সিদ্ধি, রাণী রাসমণি
করেন প্রতিষ্ঠা যাঁর সুরধুনী তীরে,
বন্দি ভবভয়ে সেই ভবতারিণীকে। ১॥

বিরিঞ্চি মহেশ হরি যত দেবগণ
আলোক আঁধার তারা অনল অনিল,
রবিশশী নবগ্রহ আকাশ বৎসর
ষড় ঋতু বার মাস দিবা বিভাবরী,
দানব মানব আর পশু তরুলতা
অন্য যত কিছু ভবে করিছে বিরাজ
তা সবে করেন যিনি সৃজন পালন
শাসন সংহার, আমি কোটি কোটি বার
সেই ভবতারিণীকে করি নমস্কার। ২॥

লোয়ন-লাখা*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম্-এ

সৌরাষ্ট্রের সন্তসমাজে লাখা-লোয়নকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কথিত আছে এঁরা বিক্রম সংবতের ১৩০০।১৪০০ সনের লোক, সৌরাষ্ট্র-স্থিত হালার প্রান্তের জামখম্ভালিয়া গ্রাম ছিল এঁদের বাসভূমি। লোয়ন কামারের মেয়ে। লাখা গোয়ালা যুবক। লোয়ন ছিল পরমাসুন্দরী; তার সারা

* 'কল্যাণ' পত্রিকার জুলাই, ১৯৫৫ সংখ্যায় শ্রীআনন্দজী কালিদাস বাঘেলালিখিত 'ভক্ত-গাথা—সন্ত লোয়নলাখা' অবলম্বনে।

অঙ্গ দিয়ে যেন সৌন্দর্য ঝরে পড়ত। নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে তার সচেতনতা কম ছিল না। সর্বদাই সে যেন গর্বোন্মত্ত হয়ে থাকত। লাখাও ছিল সুন্দর শক্তিশালী যুবক। সমস্ত গ্রাম তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকত। এই যুবক-যুবতীদ্বয়ের আচরণ অনৈতিক ও সমাজ-ধর্ম বিরোধী হলেও মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলত না।

চৈত্র মাস। সৈলনসী নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধুর জাম্থঙালিয়া গ্রামে পদার্পণ হয়েছে। লোক দলে দলে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে চলল। গ্রামের মহিলারা ঘড়া করে নদী হতে জল আনার সময় পথের নানা স্থানে একজোট হয়ে উক্ত মহাত্মার বিষয়ে আলাপ করছিল। লোয়নও ঘড়া নিয়ে জল ভরতে যাচ্ছিল। মাঝপথে থেমে সেও তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। এক নারী ব্যঙ্গভরে লোয়নকে জিজ্ঞাসা করল,—"লোয়ন বোন! তুমি মহাত্মাকে দর্শন করতে যাবে না?"

লোয়ন কটাক্ষভরা ব্যঙ্গের অর্থ বুঝে বলল— "যাই যদি তবে আটকায় কে?"

অপর নারী উত্তর করল,—"কেন? লাখা ভাই আর কে?"

এই কথায় লোয়নের হৃদয় যেন তীরবিদ্ধ হল। জীবনে এই প্রথম নিজের চরিত্র-হীনতার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। আচরণের প্রতি মনে মনে ঘৃণা জন্মাল। তাকে অত্যন্ত সংকুচিতা হতে দেখে এক বৃদ্ধা অতি স্নেহপূর্ণ ভাষায় বললেন,—"লক্ষ্মী লোয়ন! দোষ নিস্ নি মা! ভগবান তোকে রূপ ও সৌন্দর্য দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করেন নি। এই গ্রামের সমস্ত নারীর তুই শোভা। মা! যৌবন মত্ততা আনে। জীবনের এই সময়টা খুব হুঁসিয়ারির সময়, খুব বুঝে সুঝে চলতে হয়। ভগবান তোকে কি সুন্দর শরীর দিয়েছেন। একে খারাপ পথে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করিস নি। জীবনকে প্রভুর প্রেমের দিকে ঘুরিয়ে দে। তুই উদ্ধার হয়ে যাবি। মা! ভগবান বড়ই দয়ালু!"

লোয়নের দৃষ্টি খুলে গেল। মাথায় ঘড়া বসিয়ে সে সোজা সাধু-গোষ্ঠীর দিকে চলতে লাগল। বাড়ী ফেরার কথা মনেই রইল না। জনৈক সাধুর কাছে সাধু সৈলনসীর পরিচয় জেনে নিয়ে সে জনতা ভেদ করে নিঃসঙ্কোচে তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হল। এখন সে সাধুর চরণধূলিরূপী গঙ্গাতে স্নান করে পবিত্র হতে চলেছে। সাধু সৈলনসী তখন রথ থেকে নামছিলেন। এক তরুণীকে আসতে দেখে সম্বর্ধনার্থ আগত গ্রাম-বাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন,—"এ বোনটি কে?" গ্রামবাসী লোয়নকে দেখে সংকুচিত হল ও মহাত্মার সামনে লোয়নের জীবনের চিত্র অংকিত করতে লাগলো। ইতিমধ্যে লোয়ন সেখানে উপস্থিত। সাধু মহাত্মাকে কিভাবে প্রণাম-নমস্কার করতে হয় তাও তার জানা ছিল না। সাধু সৈলনসী যোগসিদ্ধিবলে লোয়নের মনের উথলিত ভাব বেশ করে বুঝে নিলেন ও তাকে উদ্ধার করতে কৃতনিশ্চয় হয়ে বললেন,—'আয় মা! তুই বাবাকে জল খাওয়াতে এসেছিস তো?"

লোয়ন অত্যন্ত করুণভাবে বলল,—"বাবা, আপনি এই পাপিনীর হাতের জল পান করবেন?"

সাধু মুক্তকণ্ঠে বললেন,—"হাঁ, হাঁ নিশ্চয়ই খাবো। মেয়ে ঘড়া ভরে জল খাওয়াতে এসেছে আর আমি খাবো না মা! ঘড়া নামা আর আমায় জল খাওয়া। তোর নামটি কি মা?" সে খুব ধীরে ও সংকুচিত ভাবে বলল,—"লো-য়-ন। আমি কামারের মেয়ে বাবা।" সাধু বললেন,— "বাঃ বাঃ তুই তো দেখছি আমাদের মহাত্মা দেবায়নের জাত।"

জীবনে সে এই প্রথম সাধুর চরণে নিজের মাথা নত করল। মহাত্মাকে জল পান করিয়ে সে বলল,—"এই অভাগী মেয়েকে পবিত্র করো

বাবা।" লোয়নের চোখ হতে জল ঝরতে লাগল। কণ্ঠ গদ্‌গদ হয়ে উঠল। আর কণ্ঠের স্বরে মূর্তিমতী দীনতা প্রকটিত হল। লোয়ন আবার বলল,—"বাবা, আপনি কি এই অপরাধিনীর কুটীরকে চরণধূলি দিয়ে পবিত্র করবেন?" সাধু বললেন,—"ওখানে যাবার তো অবসর হবে না, মা। যেখানে আমার থাকবার স্থান হয়েছে সেখানে অবশ্যই যাবি।"

"ওখানে কি করে যাবো বাবা? গাঁয়ের সকলের চোখে আমি পতিতা, তিরস্কারের পাত্রী। আমার তো ভীষণ বদনাম। লোকে আমায় দেখলে ঘৃণা প্রকাশ করে।"

"মা, ভাবিস্ নি। ভগবানের শরণাপন্ন হলে কি কেউ পাপী থাকতে পারে? জীবনে ভুল কার না হয়? বড় বড় ঋষি মুনিদেরও ভুল হয়েছে। তুই তো অজ্ঞান বালিকা মাত্র। মানুষ কৃতকর্মের জন্য যখন পশ্চাত্তাপ করে, আর অমন কাজ করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করে, তাঁর চরণে পতিত হয়, তখন দয়াময় ভগবান তাঁর পূর্বকৃত সব অপরাধ ভুলে যা[illegible] মার্জনা করেন। তুই বিচলিত হ'স্ নি। ওখানে অবশ্যই আসবি। ভগবন্নামকীর্তনের পুণ্য গঙ্গাধারা তোকে পবিত্র করে দেবে। তুই নিজেই শুধু যে ত্রাণ পাবি তা নয়, অপরকেও ত্রাণ করতে পারবি।"

সাধুর আদেশে লোয়ন আবার ঘড়া পূর্ণ করে স্বগৃহে ফিরে এল।

* * *

ভগবান ভাস্কর অস্তাচলে গেছেন। সাধু-শিবিরে ভগবানের আরতি হতে লাগল। ঘণ্টা ঘড়ি, শাঁখ ইত্যাদির ধ্বনিতে সারা গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল। লোয়ন আজ আর রূপগর্বিতা নয়, সাধ্বী সে। সাদা কাপড় প'রে নামকীর্তনের সময় সে মহাত্মা সৈলনসীর চরণপ্রান্তে শান্তভাবে উপবিষ্টা। লোয়ন পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে নাম শুনে যাচ্ছিল। বয়োবৃদ্ধ মহাত্মা সৈলনসী কৃপা-পরবশ হয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন,—"দেখ্, ভগবানের সামনে অনন্ত দীপ জ্বলছে। এই সময় দীপের শিখা ঊর্ধ্বগামী। এইভাবে তুইও মনকে নিরন্তর অতি উঁচুতে ভগবানের দিকে তুলে রাখ্। দীপের জ্যোতি উচ্চ-নীচ, শত্রু-মিত্র, আপন-পর ভেদ না করে সকলকেই সমানভাবে আলো দিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তুইও হৃদয়ে সম-ভাব বজায় রাখ্‌বি।"

"বাবা, আমি অবলা জাতি ...."

"মা, তুই অবলা নোস্। তুই তো অনেক পথভ্রষ্টকে সত্যপথ দেখিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবি। তুই দেবী। তুই ভগবানের অভয় শরণ নিয়েছিস্। সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতিকে তোর মত দেবীরাই তো ভগবানের পথে নিয়ে গিয়েছিল। আজ থেকে তুই ভগবানের দাসী হয়ে গেলি। মা, সত্যে দৃঢ় থাকবি। এই কায়া-মায়ার মোহকে নাশ করবি। এই মায়াকে দূরে থেকে নমস্কার করা চাই। 'আমি' ও 'আমার' নেশাতে সত্যকে যেন ভুলিস্ না। শরীরের সৌন্দর্য বিদ্যুৎচমকের মতই অনিত্য। এর এতটুকুও বড়াই করিস্ নি।"

—"ভগবান ও আপনার দয়ায় আমি তাইই করবো।"—লোয়ন বললে।

—"আচ্ছা মা, বাপের এই তুচ্ছ দান তুই গ্রহণ কর।" এই বলে মহাত্মা সৈলনসী নিজের ভজন করবার তানপুরাটি লোয়নের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, "মা, একে লজ্জা দিস্ নি। এর শোভা বাড়াতে থাক্‌বি। এর সাহায্যে নিত্য ভগবানের নাম কীর্তন করবি ও করাবি। জগৎ তোর সাথী হবে।"

কম্পিত হস্তে লোয়ন তানপুরাটি গ্রহণ করলো। অতি দীনভাবে বলল, "বাবা, আমি তো এর যোগ্য নই।"

মহাত্মা বললেন, "এই দুর্বলতা ত্যাগ কর্ মা।

এটিকে নিয়ে তুই নিদ্রিত সৌরাষ্ট্রকে জাগিয়ে তোল্। এই তানপুরা বাজাতে বাজাতে যখন নামকীর্তনে তুই মত্ত হয়ে যাবি তখন কত শত শত নরনারী সেই ধ্বনি শুনে পবিত্র হয়ে যাবে।"

সেখানে উপস্থিত সাধুরা তখন লোয়নের মধ্যে সাক্ষাৎ জগদম্বার দর্শন পাচ্ছিলেন ও মহাত্মা সৈলনসীর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহাত্মা বললেন, "ভগবানের সিংহাসনের সামনে প্রজ্বলিত অখণ্ড জ্যোতির তেজে লোয়নের এতকালের সঞ্চিত পাপ ভস্মীভূত হয়ে গেল।" কীর্তনান্তে সকলে ঘরে ফিরলেন।

আরও কয়েক দিন সেখানে থেকে স্থানত্যাগের পূর্বে মহাত্মা লোয়নকে বললেন, "মা, আমি চললাম। সাবধানে থাকিস্। প্রভুর নামের মহিমা বাড়াবি।" উত্তরে লোয়ন বলল, "বাবা, ভগবান ও আপনার দয়ায়, আমি, যেমন বলেছেন সেইভাবেই চলবো।"

সাধুদের বিদায় দেবার সময় লোয়ন কেঁদে ফেলল। লাখার প্রেমপাশ থেকে তাকে মুক্ত করতে না পারায় তার বাপ মা তাকে ফেলে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। এখন ঘরে একলা থেকে সেই তানপুরায় ঝংকার তুলে প্রভুর গুণ গাইতে গাইতে লোয়ন প্রেমাশ্রুতে তানপুরার প্রত্যেকটি তার সিক্ত করতে লাগল।

লাখা এদিকে চুরি করার উদ্দেশ্যে বাহিরে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে সে ঘরে ফিরে এল। লোয়নের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে এখন অত্যন্ত অধীর। গৃহপ্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করতেই সে বিস্মিত হয়ে গেল। দেখল লোয়নের কোলে তানপুরা, হাতে খঞ্জনী, চোখে অবিরাম জলধারা। ভগবন্নাম-কীর্তনে সে মত্ত। তার কণ্ঠে শত কোকিলের স্বরের মধুরতা। অর্ধবিকশিত কমল-কোরকের মত তার অক্ষিপল্লব কম্পিত। প্রভু-প্রেমে বিগলিত হৃদয়ের অমৃতধারা অশ্রুবিন্দুরূপে গণ্ডদেশে প্রবাহিত। ভাব-সমাধিতে শরীর দোদুল্যমান। লোয়নের এই নবীন রূপ দর্শনে লাখা নিস্তব্ধ। সে নিঃশব্দে সেখানে বসে পড়ল। কিছু পরে চোখ খুলে লোয়ন দেখল সামনে লাখা বসে আছে। লোয়ন গম্ভীরস্বরে বলল, "এসো লাখা ভাই! কতক্ষণ এসেছ?………"

লোয়নের এই নির্বিকার শব্দ লাখার কাছে বড় ভাসাভাসা ঠেকল। সে বলল, "লোয়ন, আমি এখনই বাহিরে থেকে ফিরছি। কিন্তু এখন তোমাকে ছাড়া তো আমার জীবনে আর কিছুই ভাল লাগে না; যেখানেই যাই তোমার মোহিনী-মূর্তি সর্বদাই মনের মধ্যে নাচতে থাকে; একটু-খানিও তোমায় ভুলে থাকতে পারি না। সাধুনীর মত হাতে এসব নিয়ে কি করছ? এ সব ঢং কেন?"

"সাধু হওয়া সহজ নয় লাখা ভাই! এই কুমারী শরীর আমি পরের হাতে বেচে দিচ্ছিলাম। আমার মত অধম নারীর পক্ষে সাধু হয়ে যাওয়া কম বিস্ময়ের কথা নয়! আমি কি নিয়ে কি করছি তাতো নিজের চোখেই দেখছো। সাধুর আদেশ মত ভগবানের গুণগান করে জীবনের মল ধুয়ে ফেলছি, জীবনের মহার্ঘ মূল্য চুকিয়ে চলেছি।"

—"তোমার এই সব কথা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। সাদা কাপড় প'রে তুমি নিজের সোনার শরীরকে লজ্জা দিচ্ছ। এ ভারী অন্যায়।"

—"লাখা ভাই! ভগবানের কৃপায় আমার মধ্যে যা বিষ ছিল তা এখন আর নেই। এতদিন প্রভুর অমূল্য দান এই মানবদেহকে কলঙ্কিত করে এসেছি। এখন একে আরও কলঙ্কিত করলে প্রভুর কৃপাকে অবহেলা করা হবে। এসো, এখন প্রভুর নাম-কীর্তনে তুমিও আমার অংশীদার হও। এখন আমাদের উভয়ের জীবন প্রভুর কৃপায় একসাথে প্রভুর নামে মেতে উঠুক।"

—"লোয়ন! পাগলের মত কি বকছ? হৃদয়

খোলো। প্রীতির প্রবাহ বহাও। লাখা এসব দেখতে শুনতে পারে না।"

এর পর লোয়ন তাকে তানপুরা সহযোগে গান গেয়ে শোনাল। বলল, "প্রভুর নাম কর। সৎসঙ্গের গঙ্গায় ডুব দাও, অনেক চুরি করেছ। কত প্রাণী বধ করেছ। গরীব দুঃখীর হৃদয়ের শাপ কুড়িয়েছ। মলমূত্র-ভরা হাড়মাসের খাঁচাকে খুব ভালবেসেছ। নরককে স্বর্গ মনে করেছ। এবার জাগো। সত্যপথে চলে ভগবানের স্মরণ নাও। তোমার আগের লোয়ন মরে গেছে। সাধুর কৃপায় সে নবজন্ম পেয়েছে। আমার সঙ্গে আর সেই পূর্বের ব্যবহার করো না। তা যদি না পার তবে নিজের বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে প্রেম কর। আমাকে নিজের বোন মনে কর।"

লোয়নের কথায় লাখার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হল। সে বলতে লাগল, "লোয়ন তোমার জন্যে মা-বাপ, ঘরদুয়ার, স্ত্রী ও জাতি, লজ্জা-সরম সব ছেড়েছি, তোমার দাস হয়েছি আর আজ সেই তুমি আমায় উপদেশ দিতে আসছ! এই জেদ ছাড়, নয় তো এইটার সময় তোমায় হত্যা করব আর নিজের ওপর স্ত্রী-হত্যার পাপ নেব।"

—"তাতে আর কি? অনেক পাপ করেছো, না হয় তাতে আর একটি যোগ হবে। তাই হোক্।"

—"কি, তোমার মরণেও ভয় নেই?"

—"ভয় তয় পাপীর। মৃত্যু তো প্রভুর নিমন্ত্রণ। তুমি আমি ও সকলেই সে নিমন্ত্রণ পাব একদিন না একদিন, তা সে আজই হোক বা কয়েক বছর পরেই হোক! এ তো আনন্দের! এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে প্রভুর পরমানন্দময় পাদপদ্মে পৌঁছাবার এই সাধন তো আনন্দেরই। এতে ভয় পাবার কি আছে? সেই দিনকে তো সদা স্বাগত করছি যেদিন হরির লোককে হরির ধামে পৌঁছে দেবে। সে মৃত্যু তো সদা অভিনন্দনীয়।"

লোয়নের কথায় লাখার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। তার কোন যুক্তিই লাখা শুনল না। কামকলুষিত হৃদয়ে সে লোয়নের ফুলের মত দেহকে নিজের বাহুপাশে আবদ্ধ করল। পরিস্থিতি বুঝে লোয়ন ধীরে বলতে লাগল, "ভুলে যাচ্ছ। একলা অসহায় অবলাকে নিজের বাহুবলে পরাজিত করায় বাহাদুরী কি! মনের দোষ উৎখাত করাতেই তো বাহাদুরী। তুমি শূরবীর! নিজের মনকে জয় করে পুরুষত্ব দেখাও। আমাকে তো সর্ববলশালী প্রভুই রক্ষা করবেন।" "প্রভু! বাঁ—চা—ও" বলতে বলতে লোয়নের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। এদিকে লাখার শরীরে আগুনের হল্‌কা বয়ে যেতে লাগল। সারা শরীর জ্বলতে লাগল। ভয়ে লোয়নকে ছেড়ে দিয়ে সে মূর্ছিত হয়ে গেল। এই অবসরে লোয়ন ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মূর্ছা থেকে জেগে লাখা দেখল তার সারা অঙ্গে কুষ্ঠ ফুটে উঠছে। দুঃখিতচিত্তে ঘরে গিয়ে সে শয্যাগ্রহণ করল। এই রোগ-শয্যায় লাখার বারটি কেটে গেল। লোয়ন এখন আর সাধারণ কামারের সুন্দরী মেয়ে নয়। সৌরাষ্ট্রের সাধুসমাজে সম্মানিত একজন। মহাত্মা সৈলনদী দেশ পর্যটন করতে করতে আবার জামথম্ভালিয়া গ্রামে উপস্থিত হলেন। পিতা-পুত্রীর হৃদয়স্পর্শী মিলন হ'ল। সাধুহৃদয়া লোয়ন নির্লিপ্তভাবে মহাত্মার কাছে লাখার রোগা-রোগ্য ও ঈশ্বরভক্তির প্রার্থনা জানাল। তিনি লোয়নের প্রার্থনা স্বীকার করে বললেন, "লোয়ন! ঈশ্বরেচ্ছায় লাখা ভাল হয়ে যাবে। শুধু লাখা কেন, মিথ্যারূপসাগরে ডুবেছে এমন পথভ্রষ্ট যে কোন মানুষই যদি ভগবন্নাম কীর্তন ও ভজন অবলম্বন ক'রে প্রভুর শরণ নেয়, তবে সে নিজের কুকর্ম ধ্বংস ক'রে ভগবানের জন হয়ে যায়।"

বার বছর বাদ আজ অকস্মাৎ লোয়ন, লাখার ঘরে উপস্থিত। পরিবারের লোকেরা লোয়নের পদার্পণে নিজেদের ধন্য মনে করল। লাখা একটি খাটে শুয়ে মহাব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করছিল।

লোয়ন কাছে গিয়ে বলল,—"লাখা ভাই, বড় কষ্ট হচ্ছে ?" পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে লাখা চোখ উঁচু করে দেখল যে লোয়ন সামনে দাঁড়িয়ে। তার চোখ জলে ভরে গেল। ভরা গলায় সে বলল—"দেবী লোয়ন! তুমি সাধ্বী। আমি অতি নীচ। তোমার সত্য ও মঙ্গলময় কথাগুলি অবজ্ঞা করে আমি তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তারই ফল এখন ভুগছি।····· অনেক তো হল। দেবী, দুঃখীকে দয়া কর। এই মহারোগের মহাকষ্ট হতে আমি যেন রেহাই পাই।"

লোয়ন স্নেহার্দ্রস্বরে বিনীতভাবে বলল, "লাখা, প্রভু বড়ই দয়ালু। তিনি পুরনো কথা মনে রাখেন না। বর্তমান দেখেন। তাঁর শরণাপন্ন হয়ে যাও। প্রভুর কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। তোমাকে এক শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।" এইটুকু বলে লোয়ন লাখার পূতিগন্ধপূর্ণ খাটিয়ার পাশে মাটিতে বসে পড়ল আর মাতৃভাবে লাখার মাথায় হাত রেখে বলল, "লাখা, সাধু শ্রীসৈলনসী মহারাজ এসেছেন। ওঁর কীর্তন শুনতে আসবে ?"

লাখা উত্তর দিল, "আমার পরম ভাগ্য ; আমার মত অভাগার দ্বারা অত বড় মহাত্মার দর্শন হবে। তুমি বড় কৃপা করেছ। আমি অবশ্যই যাবো।"

লোয়ন বলল, "সাধুর কৃপায় তোমার অবশ্যই মঙ্গল হবে। ভগবন্নাম-কীর্তনে অবশ্যই আসবে। আমি জায়গার বন্দোবস্ত করে রাখবো।"

লাখা ঠিক সময়েই হাজির হল। কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। চার প্রহর রাত্রি কীর্তন শ্রবণ ও কীর্তন করার পর সাধু লাখাকে নিজের কাছে ডেকে স্নেহভরে বললেন, "লাখা, শারীরিক পশু বল অপেক্ষা সত্যের বল কত প্রবল তা তো নিজের চোখে দেখলে। বাবা! আজ থেকে সত্যপথে চলবে। অসত্য, অন্যায়, অনাচার কখনও করো না। ভগবানের পবিত্র ও মধুর নাম কখনও ভুলো না। নাও, ভগবানের পুণ্য চরণামৃত পান করে শুদ্ধ হও।" এই বলে মহাত্মা সৈলনসী লাখার দেহের উপর ভগবানের নাম জপ করতে করতে নিজের হাত বুলিয়ে দিলেন ও তাকে চরণামৃত পান করালেন। দেখতে দেখতে লাখার দেহ হতে সেই মহাব্যাধি এমন ভাবে দূর হয়ে গেল যে কখনও যে সেখানে রোগ ছিল তার কোন চিহ্নই রইল না। শরীর দিব্যকান্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। নিজের পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে লাখা প্রথমে মহাত্মার চরণে ও পরে লোয়নের চরণে প্রণাম করল। এরপর সমস্ত সাধু-মণ্ডলীকে প্রণাম করে নিজের জীবনকে প্রভুর ভজনে লাগিয়ে রেখে প্রভুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করল। ধন্য লোয়ন, ধন্য লাখা।

অভয় কবচ

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য

আমার　ভেঙেছে ভীতির বাঁধ,
আমি　অভয় কবচ বক্ষে বেঁধেছি, ভেঙেছে ভীতির বাঁধ!
　মাভৈঃ, মাভৈঃ, মাভৈঃ।
আমি　ন্যায়ের দণ্ড উচ্চে তুলিয়া লক্ষ্যে যাবই যাবই—
আমি　আলোক পাবই পাবই।
আমার　উদ্যম হৃদে উথলি উঠিছে, ফুকারি উঠিছে সাধ—
　গুমরি গুমরি রুদ্ধ এ প্রাণ ভেঙেছে সকল বাঁধ॥

পিশাচের মুখচুন—
এই জাগরণে লাগে যেন তার কাটা ঘায়ে আজ নুন।
অত্যাচারীর বুক ধুয়ে ছোটে তাজা টক্‌টকে খুন।
পিশাচ পায়না ভাবিয়া সে কি যে করিবে
মরিবে বুঝিবা এখনি মরিবে—
হিংসার বিষে হয়েছে সে আজ দিশাহারা উন্মাদ।
তার দম্ভের কুয়াশা ভেদিয়া ওঠে মোর আশাচাঁদ।
আমার ভেঙেছে ভীতির বাঁধ,
আমি অভয় কবচ বক্ষে বেঁধেছি, ভেঙেছে ভীতির বাঁধ॥

ওরে ভীরু অসহায় নিপীড়িত তোরা চল্ চল্ ছুটে চল্,
বুক বেঁধে নিয়ে অক্ষয় বলে "মাভৈঃ, মাভৈঃ" বল্।
কাল চলিয়া গিয়াছে যাহা
পাবনা ফিরিয়া তাহা।
স্থাণুর মতন পড়িয়া রহিব ? আরনা, আরনা, আরনা।
আমি দর্পিত পদে ছুটিয়া চলিব ধারিব বাধার ধার না।
আমি জীর্ণ করিব দীর্ণ করিব যত ধ্বংসের ফাঁদ,
আমি ধুলায় মিশাব যত অন্যায় বাঁধা নিয়মের বাঁধ॥

সকল বিবাদ বাধা লঙ্ঘিয়া দুর্বারে দু'পা ছোটে,
আমার শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত ফোটে টগ্‌বগি ফোটে।
মোর মর্ম-গোমুখী ঘর্মধারায়
উলসি ভাসাব পাষাণ কারায়,
নৃত্যের তালে হর্ষে মাতিয়া চিত্ত উদ্দাম ছোটে।
আমি নব প্রভাতের শুনি আহ্বান
তাই "জাগৃহি" গাহি জয় গান—
জড়তা টুটিয়া চলেছি ছুটিয়া কে করিবে গতিরোধ ?
সকল বাধার রক্ত শুষিয়া নিব তার প্রতিশোধ॥

আমার বক্ষে অভয় কবচ দেখেছিস তোরা কেউ ?
এরি বলে আমি জাগাই নিত্য নব জীবনের ঢেউ।
আমার অভয় কবচ, অভয় কবচ মাতার আশীর্বাদ
রক্ষা করিছে অভয় কবচ ঘুচাইয়া পরমাদ।
আমার বক্ষে অভয় কবচ মাতার আশীর্বাদ
আমারে রক্ষা করিছে, করিবে এখনো টুটাবে সকল বাঁধ।
ভেঙেছে ভীতির বাঁধ !
আমার ভেঙেছে ভীতির বাঁধ !!

স্মৃতির অঞ্জলি

শ্রীমতী শীলা সেন

সে আজ আঠাশ বৎসরের কথা। আমার একটি আত্মীয় রাজকার্য উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় বদলি হন এবং সেখানে আর একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া উঠেন। ঐ সময়ে বেলুড় মঠের অধুনা লোকান্তরিত স্বামী জগদানন্দ মহারাজ এবং নিখিলানন্দজী (বর্তমানে নিউইয়র্ক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পরিচালক) প্রভৃতি কয়েকটি সাধু সেখানে তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার আত্মীয়টি জগদানন্দ মহারাজের সৌম্য মূর্তি ও নিখিলানন্দ মহারাজের পাণ্ডিত্য দেখিয়া উভয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অল্পদিনেই খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বৈকালে মধ্যে মধ্যে জগদানন্দ মহারাজের সঙ্গে তিনি সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। একদিন শহরের বাহিরে খোলা মাঠে দুইজনে বেড়াইতে যান। সান্ধ্য গগনে সূর্যদেব অস্তাচলোন্মুখ, প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে; মাঠ হইতে গরুগুলি রাখাল বালকদের সঙ্গে ধীরে ধীরে শ্রান্ত দেহে আলয়ে ফিরিতেছে। জগদানন্দ মহারাজ এই শুব্ধ পরিবেশের মধ্যে মাঠের ধারে বসিয়া পড়িলেন। আমার আত্মীয়টিও বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদানন্দ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "বি—বাবু, আপনার সময় হয়েছে, শীঘ্রই গুরুলাভ হবে।" এইকথা শুনিয়া আমার আত্মীয়টি কতকটা অবিশ্বাসের ও উপহাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, সময় তো আমার রোজই হচ্ছে।"

আমার আত্মীয়টির পিতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, যোগবাশিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্মপুস্তক ছিল। ছেলেবেলায় মধ্যে মধ্যে আত্মীয়টি, যখন কিছু করিবার না থাকিত উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। ঐ পুস্তকগুলির কোনও একস্থানে পাঠ করিয়াছিলেন যে শ্রীভগবান বলিতেছেন, "সময় হইলে আমি গুরু প্রেরণ করি।" বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হওয়ায় ছেলেবেলা হইতেই তিনি তাঁহার পিতার ধর্মভাবে সংক্রামিত হন। মনে করিতেন যে যখন সময় হইবে তখন গুরুলাভ হইবে, চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। আন্তরিক মুক্তিলাভের ইচ্ছা যেন অজ্ঞাতে তাঁহার মনে উঁকি মারিত। ইহাই ছিল তাঁহার মানসিক অবস্থা।

জগদানন্দ মহারাজের এই কথাগুলি শুনিতেই যেন শৈশবের ধর্মপুস্তকের "যখন সময় হইবে গুরু আসিবেন"—এই স্মৃতি অলক্ষ্যে উদয় হইল। যাহা হউক কয়েকদিন পরে হঠাৎ কুমিল্লা হইতে তাঁহাকে ছুটিতে যাইতে হইল ও তিনি কলিকাতায় আসিয়া রহিলেন। নিখিলানন্দ মহারাজ আসিবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বেলুড় মঠে শীঘ্রই ফিরিবেন, অবসর পাইলে তথায় গিয়া যেন তিনি তাঁহার (নিখিলানন্দজীর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

যে উদ্দেশ্যে ছুটি লওয়া তাহা শেষ হইল। অবসর প্রচুর। কোনদিন বৈকালে কোন আত্মীয়ের বাটী, কোনদিন সিনেমা ইত্যাদি দেখিয়া সেই অবসর কাটিতে লাগিল। হঠাৎ (অজ্ঞাতেই বলিতে হইবে) একদিন শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইল। সেদিন বৈকালে আর কোথাও যাইবার নাই, আত্মীয়টি ভাবিলেন আজ বৈকালটা বেলুড়মঠে নিখিলানন্দ মহারাজের কাছেই বেড়াইয়া কাটাইয়া আসি। তিনি তো আমাকে যাইতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে আত্মীয়টি অপরাহ্নে বেলুড় মঠে আসিয়া

নিখিল মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ ও চা খাইয়া কলিকাতা ফিরিবেন মনে করিতেছিলেন এমন সময় নিখিলানন্দজী বলিলেন, "মহাপুরুষ মাহারাজের সঙ্গে দেখা করবেন?"

মহাপুরুষ মহারাজ কে? কেমন লোক? কেন দেখা করিবেন?—ইত্যাদি চিন্তা না করিয়াই আত্মীয়টি বলিলেন, "হাঁ, মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করব।" নিখিলানন্দজী চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।" তাঁহাকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে লইয়া যাইতে যাইতে নিখিল মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বি—বাবু, দীক্ষা নেবেন?" দীক্ষা কি, কেন লইবেন এসব চিন্তা করিবার কোন অবসর না পাইয়াই যন্ত্রচালিতের ন্যায় আমার আত্মীয়টি বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, নেবো।"

মহাপুরুষ মহারাজকে আমার আত্মীয়টি দর্শন করিলেন,—প্রথম দর্শন। নিখিলানন্দজী তাঁহার দীক্ষার কথা তুলিলেন। শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ খানিকক্ষণ আমার আত্মীয়টির মুখের দিকে কিছু না বলিয়া, চাহিয়া রহিলেন। এ চাওয়ার অর্থ কি? আত্মীয়টি তখন কিছুই বুঝিলেন না। তিনি যে অহেতুক কৃপাসিন্ধু তখন সে ভাব আসিল না। এমনই তাঁহার অশুভ সংস্কার সে সময় কার্য করিতেছিল, তিনি ভাবিলেন যে তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলিয়াই তাঁহাকে মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দিতে রাজী হইলেন! মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আগামী মঙ্গলবার স্নান করে দশটার সময় এস।" এ বিষয়, আত্মীয়টির মনের ভিতর বিশেষ কোন রেখাপাত করিল না। যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে স্নান করিয়া বালকদের যেমন নূতন কিছু আসিলে কৌতুক হয়, সেইভাবে আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ সকাল সন্ধ্যায় যে ন্যূনতম সংখ্যা জপ করিতে বলিয়াছিলেন তাহা আত্মীয়টি করিয়া চলিলেন। মাঝে মাঝে মনে হইত এত কম জপ করিয়া কি আর এমন উন্নতি হইবে, কিন্তু বেশী করিবার তাঁহার সময়ও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। এমনি করিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল। তিনি মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইতেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে স্নেহভরে কত আদরযত্ন করিতেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ক্রমে তাঁহার চাকরি হইতে অবসর হইল। হঠাৎ শরীরও ভাঙ্গিল। তখন তাঁহার চৈতন্যের উদ্রেক হইল। যে অমোঘ বীজ সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার ভিতর বপন করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নিজের কাজ করিতে আরম্ভ করিতেছে। সময় না হইলে কিছু হয় না। যতই আমরা ব্যস্ত হই না কেন, কালের জন্য প্রতীক্ষা অনিবার্য। ইতোমধ্যে সৌভাগ্যক্রমেই বলিতে হইবে সংসারের কিছু কিছু আঘাতও আসিয়া পড়িতে লাগিল। আত্মীয়টি বুঝিতে পারিলেন সংসারে সকলের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলা অসম্ভব। ঝঞ্ঝাবাতে বিক্ষিপ্ত তরণীর ন্যায় আমার আত্মীয়টি নিজেকে অসহায় মনে করিতে লাগিলেন এবং উপলব্ধি করিলেন যে শ্রীগুরুই একমাত্র রক্ষাকর্তা। সংসারের সুখ আলুনি বোধ হইতে লাগিল, শ্রীগুরু নানাভাবে কখনও ধ্যানে, কখনও স্বপ্নে তাঁহাকে অহেতুক কৃপা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কে যেন কিছুদিনের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া নির্জনবাস করাইতে লাগিল। নির্জনবাসে শ্রীগুরুচরণে নির্ভরতা ক্রমে ক্রমে ফুটিল। অপ্রত্যাশিতভাবে সকল অভাব নিজের বা স্বজনগণের বিনা সাহায্যে অপসারিত হইতে লাগিল। কোন মধুময় স্বপ্নরাজ্যের আলোক কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া অন্তরে জলজল করিয়া সর্বসংশয়ের অবসান

করিতেছিল। শ্রীগুরুদেব যে ন্যূনতম সংখ্যা বীজ-মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন, এখন তাহা বাড়িয়া অনেক বেশী সংখ্যা জপ চলিতে লাগিল। আজ জীবনের নিভৃত সন্ধ্যায় আমার আত্মীয়টি মহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় অভিভূত। এই 'গুরুশক্তি' কি প্রকৃতির 'স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের নিয়ম' (Law of Spontaneous Variation) দ্বারা এই রূপান্তর আনিল ?

অদ্ভুত এই শক্তি ! আমার বৃদ্ধ আত্মীয়টি এখন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাকে এরূপ করিল ? কে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার সূর্যরশ্মির ন্যায় ধীরে ধীরে আলোকিত করিতেছে ? আশ্চর্যের বিষয়, কোন সংশয় উপস্থিত হইলে অপ্রত্যাশিতভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা কি করিয়া সমাধান হইতেছে ? তবে অন্তরে এখন সর্বদাই অনুতাপের বহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে। সর্বদাই মনে হইতেছে, কেন প্রথম হইতে সদ্‌গুরুর সঙ্গ অধিক করি নাই। উত্তর কে দিবে ? কাল না প্রারব্ধ ?

একবার কোন কারণে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কার্যগতিকে দেখা করিতে পারেন নাই। ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখায় মহাপুরুষজী যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, কত আপনার জন তখন কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ? কত তাঁহার স্নেহ, কত কৃপা ! তিনি (মহাপুরুষ মহারাজ) ৮ই অক্টোবর, ১৯৩০ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

* * * আসিতে পার নাই, তা কি হইয়াছে ? অন্যসময় সুবিধামত আসিবে। * * * ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন।

সতত শুভানুধ্যায়ী—শিবানন্দ"

আত্মীয়টি ভাবিয়াছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে না পারায় হয়ত তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু কি স্নেহপূর্ণ উত্তর আসিল !

এখন ঐ আত্মীয়টি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে লোকান্তরিত শ্রীগুরুর প্রতিকৃতি সমক্ষে ভক্তি-অশ্রু নিবেদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। যখন তাঁহাকে সশরীরে পাইয়াছিলেন, তখন যদি এই আবেগ ও ব্যাকুলতা আসিত ! যাহা হউক সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শান্তিময় শ্রীপাদ-পদ্মে মিলিত হইবার জন্য তিনি সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতেছেন। ধন্য শ্রীগুরুর দয়া ; ধন্য মহাত্মা শ্রীমৎ জগদানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী !

জীবন-জিজ্ঞাসা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবনের পায় হাঁটা পথে হলো অনেক সৃজন
কোন রাঙা কোন বা সবুজ বুঝে এ অবুঝ মন।
প্রলেপ লেগেছে আঁতে তারি কত রঙের বর্ণালী,
জীবনের ফুল ফল পাতারূপে এঁকেছে সোনালী
মনছোঁয়া আকাশের সূর্যমণি চোখের তারায় ;—
মাঝে মাঝে পথ ছেড়ে যায় যেন কোন ছলনায়।

জীবনের প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রজ্বলিত জানি দ্যুতি-দীপ
আনে পথ প্রদর্শন করে করে যেথা কুঞ্জ-নীপ।
জানি দূর বনান্তের বাণী মেঘে ও মলয়ে আসে
নিত্যকার জীবনখেলায় যারা শুধু মধু হাসে,
তাদেরই বুকের পাঁজরে আলো যদি থাকে জ্বালা
সত্য ও শাশ্বত হবে ধর্ম-ফুলে মাধবীর মালা।

কিছু দুঃখ কিছু সুখ জীবনের নিয়ে পথ চলা
দেখে দেখে পৃথিবীর প্রান্তলীন শুচির শ্যামলা।
তাই ছন্দ পদে পদে উঠি বাজে নূপুর-নিক্বণে
অন্তরের অস্থির যন্ত্রণা পুষে কর্দম-কাঞ্চনে ?
দিনে রাতে কালো আলো বিচিত্রের তীরে বসে ভাসা,
চলন্ত পথের মাঝে তাই জাগে জীবন-জিজ্ঞাসা।

পাঠকের পত্র

(১)

গত চৈত্র (১৩৭২) মাসের উদ্বোধনে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী 'বাংলার কথকতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমাদের জনৈক অধ্যাপক-পাঠক এই সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"সুরেনবাবুর কথকতা সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধটা সময়োপযোগী সন্দেহ নেই কিন্তু কথকতাকে "আধুনিক" করার যে প্রস্তাব তিনি করেছেন সেটা আমার আদৌ সমর্থনীয় বলে মনে হয় না। মাইক, স্লাইড ও সমবেত কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে যে অনুষ্ঠান হবে তাকে 'শিক্ষাপ্রদ' 'মনোজ্ঞ' সব কিছুই বলা যায় কিন্তু নিশ্চয়ই কথকতা নয়। কথকতা একান্তই গ্রাম্য সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠান, তার পুনরুজ্জীবন করতে হবে সেই সমাজজীবন ও তার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা। বেতারে 'কথকতা'র কৃত্রিমতা একেবারে হাস্যাস্পদ নয় কি? 'কথক ঠাকুর' একা বেতারকেন্দ্রে পুঁথি নিয়ে গেলেন কাল্পনিক শ্রোতাদের অবসরবিনোদনের খানিকটা কৌতুক সরবরাহের জন্য, তাকেও বলতে হবে 'কথকতা', যার বৈশিষ্ট্য হ'ল Contagious cordiality, Warmth of feeling !! কাজে কাজেই বলতে হয় "ভাগবত পুরাণের কথা-কাহিনী-গুলিকে শুধু একঘেয়ে আজগুবী গল্প বা রূপকথা না করিয়া উহাদের পটভূমিতে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের যুক্তি দেখানো প্রয়োজন।" (পৃঃ ১৪০) একবারও মনে হ'ল না যে এই প্রয়াস কী মর্মান্তিক পরিহাস!

আমি নিজে শুধু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নই, আধুনিকতম ভাবধারার অনুশীলন আমার উপজীবিকা, অথচ প্রতিবাদ করতে হ'ল আমাকে! 'আধুনিক' হওয়া আমি বুঝি, কিন্তু সব কিছুকেই যাদুঘরের পশুপাখীর মত নির্জীব, প্রাণহীন অবস্থায় সাজিয়ে রাখা জাতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ বা নব-কলেবর গ্রহণ—এটা বহুজনবিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার। এই সব নকল লোকসংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব মনকে পীড়া দেয়, তাই মত ব্যক্ত করা প্রয়োজন বোধ করলাম।"

পত্রলেখক কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ খাঁটি কথা বলিয়াছেন। কথকতা এবং অনুরূপ পুরাতন অনুষ্ঠানগুলির রূপান্তরীকরণের সময় ঐ সকল অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি যাহ'তে অব্যাহত থাকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

—উঃ সঃ

(২)

জগতাই (মুর্শিদাবাদ) হইতে শ্রীহিরন্ময় মুন্সী লিখিতেছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সাধন" সম্বন্ধে গত চৈত্রের উদ্বোধনের 'কথাপ্রসঙ্গে' যা' বলা হয়েছে সেটার গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমেই বলা দরকার যে ঘটনাটা সম্বন্ধে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে'র সঙ্গে অক্ষয়কুমার সেন রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র মিল নেই। ব্রাহ্মণ পাচক দ্বারা মুসলমানী খানা তৈরী করবার ব্যবস্থা মথুরবাবুর নির্দেশিত হলেও "কাছা খোলার" কথাটা লীলাপ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেন নি। এটা শুধু পুঁথিকারের 'পুঁথি'তে উল্লিখিত হয়েছে—'কথাপ্রসঙ্গে' এই কথাই স্বীকৃত।

যদি তাই হয়, তবে তার গূঢ় উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই আছে। মহাপুরুষের কার্যকলাপ অনেক সময়েই সাধারণের কাছে রহস্যময়, যদিও অতি সরল সহজলীলায় মহাপুরুষগণ জন-মানসে এক অচিন্ত্য শক্তিতে প্রকাশিত হন। "মহাপুরুষের কোন বিশেষ আচরণের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক অনেক সময়েই পৃথক পৃথক অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন"—কথাটা অতীব সত্য। তাই বলে তাঁদের বিশেষ আচরণের যে বিশেষ উদ্দেশ্য নাই একথাও বলা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুব্রাহ্মণ-কুলে জন্মেছিলেন—সে ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের সংস্কারের সঙ্গে ইসলামী সংস্কারের সংঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন দুটি সংস্কারের সংঘাত কাটিয়ে 'সিনথেটিকালি' এক পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়াই মহাপুরুষের মহাপূরণকারী লীলা! খ্রীষ্ট বলেছেন, I come not to destroy, but to fulfil. শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এই পরিপূরণের আদর্শটি সুস্পষ্ট! সত্যিকারের ইসলামের মর্মকথা ঈশ্বর ও ঈশ্বরপ্রেরিতে আত্ম-নিবেদন। খাদ্য ও সাজ পোষাক "এহো বাহ্য" মাত্র। ওটা দেশকালিক ব্যাপার। আরবের খাদ্য খানা ও পোষাক বাংলা দেশে না মানলেও ইসলাম সাধনার কোন ক্ষতি হয় না। বহু ইসলাম সাধক মৎস মাংস পেঁয়াজ রশুন প্রভৃতি বর্জন করেছেন এখনও দেখা যায়। বরং ইসলামের তরিকা অনুযায়ী

আল্লা ও রসুলে অটুট টানই যে ইসলামের আসল চেহারা—এটা স্বীকার না করে পারা যায় না। বস্তুতঃ যে সংস্কার অন্য সংস্কারকে আঘাত করে না বরং মিলিয়ে চলে এমন সংস্কারকে স্বীকার করা দোষের নয়। তাই মথুরবাবু হিন্দুসংস্কারে আঘাত লাগবে বলেই ঠাকুরকে গোমাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন ও ব্রাহ্মণ পাচক দ্বারা মুসলমানী খাদ্য পাকের যথাবিহিত নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুরও সেটা মেনে নিয়েছিলেন এইজন্য যে এটা মেনে চললেও ইসলামী সাধনায় পরিপূর্ণতার কোন ত্রুটি হয় না। কারণ এটা তো ইসলামে ধর্মান্তর বা 'কনভারসন' নয়। এটা যে সত্যিকারের ইসলাম গ্রহণ। কনভারসন্ হলে ঠাকুরের রামকৃষ্ণ নাম বদলিয়ে হয়তো রহিমতুল্লা রাখতে হতো। এই গেল এক দিকের কথা।

অপর দিকে দেখা যায় মহাপুরুষগণ যুগে যুগে এত সরল হয়ে আসেন যে তাঁদের বুঝতে হলে সরলতা ছাড়া বোঝা যায় না। ঠাকুরের জীবনে এরূপ সরলতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যা বলে সব কথাই তিনি মেনে নিতেন অকপটে। তাঁর অসুখের সময় যে যা বলেছে তাই তিনি মেনে নিয়েছেন—ও সেরূপ চলতে চেষ্টা করেছেন। চাতক পাখীর ব্যাপারে, নরেনের কথায় শরতের হিমলাগানো প্রভৃতি ঘটনায় তিনি একেবারে সরল শিশুটির মতো বিশ্বাস করেছেন। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নন, অবতারকল্প মহাপুরুষকে তিনটি লক্ষণে ধরা যায় যথা—Abnormally normal, Wisely foolish, Gorgeously simple. এই Wisely foolish ভাবটিই এই প্রকার আচরণের গূঢ় তাৎপর্য বলে মনে করি। যেন মনে হয় এঁই সমস্ত মহাপুরুষ অসাধারণ সাধারণ—একেবারে বোকা রকমের—কতকটা অসহায়। যে যা বলে এঁরা নির্বিবাদে তাই মেনে নেন। ঠাকুরের বেলাতেও এটা ঘটেছিল বললে ভুল হয় না। এইটাই তাঁর এবম্প্রকার আচরণের গূঢ় তাৎপর্য মনে হয়।

পত্রলেখকের চিঠির প্রথমাংশ পূর্বোক্ত 'কথাপ্রসঙ্গে' আমাদেরই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি। শেষার্ধে লেখক একটি নূতন চিন্তা উপস্থাপিত করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। —উঃ সঃ

সমালোচনা

বুদ্ধ-প্রসঙ্গ —মহেশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। প্রকাশক — শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ ; পৃষ্ঠা—৫৮+৮ ; মূল্য ॥০ আনা।

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ১১৯তম প্রকাশন বর্তমান পুস্তকটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্গীয় দার্শনিক-লেখক মহেশচন্দ্র ঘোষের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের সংকলন: প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'গৌতম বুদ্ধের আত্মচরিত'। ইহাতে মূল পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে স্বীয় চরিত সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে সব উক্তি আছে তাহাদের অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া লেখক বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে বুদ্ধদেবের জীবনের কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা দূরীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'গৌতমের সাধনা ও সিদ্ধি' তথাগতের সাধনা ও বোধিলাভের পর তৎপ্রচারিত সত্যের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ দিগ্দর্শন। 'নির্বাণতত্ত্ব'-নামক তৃতীয় প্রবন্ধটিতে সুপণ্ডিত লেখক মূল্যবান গবেষণা ও প্রখর মননের পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিপিটকের নানা গ্রন্থ হইতে নির্বাণের বহুবিধ উপমা, ব্যাখ্যা, প্রতিশব্দ ও বিশেষণ আহরণ করিয়া এবং উপনিষদের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা লেখক নির্বাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি—

"এই সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অবয় বিষয়ে তাহা নহে; মৌলিক তত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।"

সাম্প্রদায়িক মতবাদের ঊর্ধ্বে বুদ্ধজীবন ও বুদ্ধশিক্ষার সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আবেদন 'বুদ্ধ-প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধত্রয়ে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট। বইখানির বহুল সমাদর কামনা করি।

—স্বামী হিতানন্দ

বুদ্ধদেব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। ৭৭ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১।॰ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধকে "অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া উপলব্ধি" করিতেন। কবিতায়, গানে ও ধর্মতত্ত্বালোচনায় তাঁহার বিষয়ে তিনি প্রাণ ঢালিয়া যে সকল প্রশস্তি করিতেন সেইগুলি বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের সার্ধদ্বিসাহস্রিক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আলোচ্য পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের 'বুদ্ধদেব', 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ,' ও 'মৈত্রীসাধন' ইতিপূর্বে কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। উপোদ্‌ঘাত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' শীর্ষক কবিতাটি তাঁহার হস্তলিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেব আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া দেখা দিয়াছিলেন—এই কথা রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে 'বুদ্ধদেব' নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধ যাহাকে ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন তাহা শূন্যতার পন্থা নয়। অমিত মনকে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মবিহার। 'ব্রহ্মবিহার' শীর্ষক প্রবন্ধে কবিগুরু বলিয়াছেন,

"এ পদ্ধতিকে তো কোনো ক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।"

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ শুনিয়া অনেকে হয়ত চমকিত হইবেন। অশ্বঘোষের রচিত মূল সংস্কৃত একখানি গ্রন্থ ছিল, উহার নাম 'শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র'। উহা লুপ্ত হইয়াছে, কেবল চীনভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্তমান আছে। উক্ত গ্রন্থে ভক্তিবাদের কথা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' রচনাতে উচ্ছ্বসিতভাবে দেখাইয়াছেন যে, অবতারবাদ ও ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে। অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস-আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মিলন-সভায় যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দিয়াছেন,—

"অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি। এই অমিত, সুখাবতী নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইনি সর্বশক্তিমান, করুণাময়, মুক্তিদাতা। যে কেহ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্ষদমণ্ডলীসহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায় ; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।"

এই গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গভীরতত্ত্বপূর্ণ। ইহাতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আপাতবিরুদ্ধ মতগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া ঐক্য দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত চিন্তাশূন্য মতগুলিকে খণ্ডন করিয়া রবীন্দ্রনাথ উহার মর্মবাণী এইভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন যে, সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্যপদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ—ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

ভারতে শিক্ষাধারার ইতিহাস—শ্রীমতী শান্তিময়ী সিংহ, এম্-এ, বি-টি প্রণীত। প্রকাশক : নিউ এডুকেশনাল পাবলিশার্স, ১২৭এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ১১১ পৃষ্ঠা ; মূল্য তিন টাকা।

ভারতের ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত নব্য শিক্ষাধারার সম্পূর্ণ এবং ক্রমিক ইতিবৃত্তের বাংলা ভাষায় কোনো বই না থাকায় গ্রন্থকর্ত্রী সেই অভাব দূর করিবার জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন

করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ও শিক্ষণ-শিক্ষা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা এই পুস্তক পড়িয়া শিখিবার মত অনেক কথা পাইবেন।

সূচনাতে গ্রন্থকর্ত্রী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ব্রিটিশ জাতির ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত নব্যশিক্ষার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। ব্রিটিশ আগমনের প্রারম্ভে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার কথা প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহার আভাস। নব্যশিক্ষার প্রবর্তনে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার কথা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত। ভারত সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষাভার গ্রহণ এবং লর্ড কার্জনের অবদান সম্বন্ধে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট ও দ্বৈতশাসনকালে এ দেশের শিক্ষা সংস্কারের কথা লেখিকা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। কংগ্রেসী আমলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা নবম ও দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল। ইহাতে পাঠক-পাঠিকাবর্গ ভারতে নব্যশিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় লাভ করিবেন।

—স্বামী মৈথিল্যানন্দ

Yogiraj Gambhirnath—By Sri Akshaya Kumar Banerjea—M. A., Retired Principal, Maharana Pratap Degree College, Gorokhpur. Published by Sadhu Avedyanath, Gorakhnath Temple, Gorakhpur , pp. 181+xxxiv ; Price—Rs. 3/8/-

গোরখপুর মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত 'যোগিরাজ গম্ভীরনাথ' পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সুদীর্ঘ ৩৪ পৃষ্ঠার ভূমিকায় দার্শনিক-লেখক ভারতীয় সাধনায় যোগরহস্যপ্রসঙ্গে নাথযোগী সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ণীত করিয়াছেন। অতঃপর তেরটি অধ্যায়ে যোগিবর গম্ভীরনাথের যোগ-সাধনার আরম্ভ, তপস্যা, সাধনা ও সিদ্ধি সুন্দরভাবে পর পর বর্ণিত হইয়াছে। সংসার-বিরক্ত কাশ্মীরী যুবকের, শান্তি লাভের আশায় গোরখপুর মঠে আগমন ও সদ্গুরু-লাভ, বারাণসী ও প্রয়াগের ঝুঁসিতে যোগসাধনা, পরিব্রাজকভাবে নর্মদা পরিক্রমা, গয়ায় কপিল-ধারার গুহায় কঠোর নির্জন সাধনা ও সিদ্ধিলাভ, পরে শান্ত সমাহিত জীবন্মুক্ত অবস্থায় মঠে প্রত্যা-বর্তন এবং যোগ ও বেদান্তের ভিত্তিতে আধুনিক সমাজে ধর্মশিক্ষা-প্রচার প্রভৃতির আলোচনা পর পর বইখানিতে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহাপুরুষদের জীবনের অধিকাংশই কাটে লোক-চক্ষুর অন্তরালে, তাই অনিচ্ছাবশতও লেখককে কয়েকস্থলে বাধ্য হইয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। যোগীর মন বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে, এ জন্য দুএক জায়গায় যোগিরাজের কর্ম বা ব্যবহারের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মনে হয়, লেখকের নিজের মতই ব্যক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি যোগিরাজ গম্ভীরনাথের জীবনের মহাবাণী শত শত পাঠকের মর্মস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

—স্বামী নিরাময়ানন্দ

বৌদ্ধ দর্শন—শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীমা প্রকাশনী,

১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫ ; পৃষ্ঠা—৭১ ; মূল্য—দেড় টাকা।

বৌদ্ধ দর্শন এমনই বিপুল যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহার সম্যক পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, তথাপি লেখক আলোচ্য পুস্তকটিতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সাবলীল। কেবল বৌদ্ধ দর্শনই পুস্তকে আলোচিত হয় নাই, ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের উপর এই দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধেও বহু কথা লেখক বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য ইহার নাম 'বৌদ্ধ-দর্শন' না হইয়া 'বৌদ্ধ-দর্শন ও সংস্কৃতি' হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীর প্রাসঙ্গিক কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধ দর্শনের একটি তুলনামূলক মূল্যনির্ণয়ের প্রয়াস বইখানির একটি প্রশংসনীয় দিক। কয়েকটি উৎকট বানানভুল চোখে পড়িল।

ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমৃণালকান্তি দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমা প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ১ রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫ ; পৃষ্ঠা—৭২ ; মূল্য এক টাকা চার আনা মাত্র।

লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকাহিনী ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। ছেলেমেয়েরা বইটি পড়িয়া আনন্দ পাইবে কিন্তু ইহাতে বহু বানান ভুল দৃষ্ট হইল যাহা শিশুসাহিত্যে বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম ছিল গদাধর, আদর করিয়া অনেকে 'গদাই' বলিতেন ; কই, 'গদা' নামের উল্লেখ তো কোন নির্ভরযোগ্য পুস্তকে দেখা যায় না।

রামামৃত সাধন-বিজ্ঞান—শ্রীচিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীনরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২৭ নং বিধান পল্লী, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২। পৃষ্ঠা—২২০ ; মূল্য ৫৲ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে মূলতঃ শ্রীশ্রীরামঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ পূর্ববঙ্গের সাধুপ্রবর কর্তৃক তাঁহার শিষ্যগণকে লিখিত পত্রাবলীর সারসঙ্কলন শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্বত্রই যে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতাশ্লোকের সঙ্গে পত্রসারাংশ যথাযোগ্যভাবে সাজানো হইয়াছে একথা বলা যায় না। বইটিতে একটি অলৌকিক জিনিস সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—"জয়ন্তী মা"র চিঠি। "মেরুপৃষ্ঠ-ঋষি সূক্ষ্মদেহধারিণী" বলিয়া লেখক শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার পরিচয় দিয়াছেন। সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্টা জয়ন্তী মা রক্তমাংসের শরীরধারী মানুষের মত কিভাবে লিপি পাঠাইতে পারেন তাহা পাঠক-সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। যদিও অজ্ঞানান্ধ অবিশ্বাসী লোক-সমাজে ইহার প্রচার নিষিদ্ধ—এইরূপ উক্তি পুস্তকের মধ্যেই রহিয়াছে তথাপি কেন ইহা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সর্বজনসমক্ষে বাহির হইল ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কয়েকটি অত্যাশ্চর্য ছবিও কৌতূহল সৃষ্টি করে, যথা : উড্ডীয়মান গরুড়ের উপরে সত্যনারায়ণরূপী শ্রীশ্রীরামঠাকুর, হংসারূঢ 'গুরু-দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর।' গ্রন্থের শেষাংশে আয়ুর্বেদশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া "দীর্ঘজীবন লাভের উপায়" এবং অথর্ববেদীয় শ্রীশ্রীরামোপনিষদের পদ্যে বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হইয়াছে।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৫৬)—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের এই সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত ষষ্ঠ বার্ষিক সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। স্বামী বিমুক্তানন্দজীর "পৌরাণিকী" এবং অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর "জননী সারদামণি" ও "ভক্ত হরিদাস" (হিন্দীতে) পত্রিকাটির মর্যাদা

বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীমান করুণাময় নন্দীর "ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙালীর অবদান", শ্রীমান অমিতাভ দাশগুপ্তের "রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তববোধ", শ্রীমান শংকর সেনগুপ্তের "বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর" এবং শ্রীমান সমীররঞ্জন মজুমদারের "বৈষ্ণব সাধনায় বাঙালী" প্রশংসনীয় প্রবন্ধ। ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, সঙ্গীত ও রাজনীতি সম্বন্ধে লেখা আছে; ভ্রমণ কাহিনী ও শরীরচর্চা বিষয়ক একটিও রচনা না থাকিবার ত্রুটি দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল।

বিদ্যাপীঠ (চতুর্দশ বর্ষ)—দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এই পত্রিকাখানিতে ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালকগণের লেখা আছে। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দীতে রচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাবলীর মোট সংখ্যা ৩৬। শ্রীমান প্রণবকুমার লাহিড়ীর "ভারতীয় নারীর আদর্শ ও শ্রীশ্রীসারদা দেবী" প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমান প্রশান্ত পালের "পুরানো ঘর" ছবিটি শিল্পী-হস্তের পরিচায়ক।

—স্বামী জীবানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৬; পৃষ্ঠা—১৯০+১৪; মূল্য—২॥০ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ মধ্যম সহোদর পুণ্যচরিত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত একজন স্বাধীন চিন্তানায়ক এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক বলিয়া অনেকের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য এবং আরও বহুতর বিষয়ে রচিত শ্রীমহেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি তাঁহার বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু গ্রন্থই গ্রন্থকর্তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না, প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ দ্বারাই ভিতরের মানুষের প্রকৃত সন্ধান মিলে। প্রচারভিত্তিম এবং মান-যশ-লোকখ্যাতির উত্তেজনা হইতে দূরে অবস্থিত সমসাময়িক ভারতের আত্ম-সমাহিত এই মহামনীষীর একটি আন্তর পরিচিতি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যলাভে ধন্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক বর্তমান গ্রন্থে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার উপজীব্য হইল দিনের পর দিন শ্রীমহেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া তিনি যে সকল কথোপকথন শুনিয়াছেন এবং যে সব ভাব ও আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন সেইগুলি। বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর সহিত আলোচিত মহেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গগুলি একাধারে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এবং উহাদের উপর একটি শক্তিশালী মনের স্বকীয় আলোক-সম্পাতও বটে। মাঝে মাঝে লিপিকার প্রসঙ্গগুলির বিষয় বিভাগ করিয়া পাঠকের বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সুধীসমাজে বইটি সমাদরণীয়।

সাধনার আলো—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া-প্রণীত; 'সত্য-সাথী' কার্যালয়, ৯৭।১কে, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১১০+১৪০+২৬; মূল্য—২৲ টাকা।

চট্টগ্রাম জেলার গুজরা নামক পল্লীতে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে তারাচরণ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি তাঁহার ভিতর অনন্যসাধারণ ধর্মানুরাগ লক্ষিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উত্তরকালে তাঁহাকে একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষরূপে পরিণত করিয়া শ্রীতারাচরণ পরমহংস নামে বিখ্যাত করে। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণ অর্থে কখনও সংসার করেন নাই। সত্য, ব্রহ্মচর্য, ঈশ্বরপ্রেম, মানবসেবা এবং ধর্মীয় উদারতা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। শত শত নরনারী তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভে ধন্য হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে সাধকপ্রবর কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁহার উপদেশ-সংগ্রহ। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার ধর্মজীবনের বহু কথাও ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্মানুরাগী পাঠক-পাঠিকা এই মহাপুরুষের জীবন-কথা এবং উপদেশগুলি পড়িয়া প্রচুর অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব—গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের ক্যাক্স্‌টন্ হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হলটি জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভার পরিচালনা করেন লণ্ডনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তিনি তাঁহার মনোরম ভাষণে বলেন,—

"বর্তমানে আমরা একটি ভীষণ দিশাহারা অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছি। মানুষের অন্তরে শান্তি নাই এবং চিন্তা করিয়া দেখিবারও অবসর নাই কোথায় কিসের অভাব রহিয়াছে। মানুষের অন্তরে ভাব-বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে বলিয়াই তো বাহিরে এত বিশৃঙ্খলা। * * * এখন যেরূপ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মর্ম উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে ইতঃপূর্বে সেরূপ আর কখনও হয় নাই। তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ উপদেশ এই—যদি ভগবানের সেবা করিতে চাও, তবে তোমাকে উহা করিতে হইবে মানুষ ভাইএর মধ্য দিয়া। বস্তুতঃ মানবজাতির সেবার মধ্য দিয়াই আমরা নিজেদের এবং জগতের শান্তি আনিতে পারি। আমার মতে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সব চেয়ে বড় জিনিস যাহা দিয়াছেন তাহা হইতেছে ভয়শূন্যতা। * * * যদি আমরা ভীত হই তবে মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে আর মনুষ্যত্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মানুষকে ভয় হইতে মুক্তি দেয়। উহা তাহাকে এমন একটি পথে লইয়া চলে যেখানে ভয় নাই, কেননা সে জানে, সে অগ্রসর হইতেছে সত্যের দিকে—মানবজাতির একতা, ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের দিকে।"

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উপরোক্ত কথাগুলি ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চ হর্ষধ্বনি উদ্রিক্ত করে।

এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীকে (যিনি স্বামী নির্বাণানন্দজীর সহিত আমেরিকার বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনান্তে ভারতে ফিরিবার পথে লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্রে আগমন করেন) ইংলণ্ডের বেদান্তানুরাগী বন্ধুগণ কর্তৃক একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। শিল্পী মিঃ ফ্রেডরিক অস্টিন উহা পার্চমেণ্ট কাগজে লিখিয়াছেন। লণ্ডন বেদান্তকেন্দ্রের সহকারী অধ্যক্ষ মিঃ জন হজ্ (John Hodge) উহা পাঠ করেন।

স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার ভাষণে বলেন,—

"ভারতীয়দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান অবদান হইল তাঁহার সেবাধর্মের উপদেশ। এই মহান্ ঋষি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, অখিল সৃষ্টি হইল ঈশ্বরেরই বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ। দরিদ্র এবং পীড়িতকে আমরা 'সাহায্য' করিতে পারি এইরূপ মনে করা অর্থহীন, কেননা তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকেই 'সাহায্য' করিতে বসিয়াছি। তবে আমরা মানুষরূপী ভগবানকে সেবা করিতে পারি। এইরূপে জীবনের যে কোন কর্মক্ষেত্রে আমরা যাহাই করি না কেন, সবই ভগবানের পূজা বা উপাসনার ভাবে করা উচিত। অবশেষে আমরা দেখিতে পাইব এইভাবে ভগবানের সেবা করিয়া আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়াছি।"

প্রখ্যাত লেখক ও অস্ত্রচিকিৎসক মিঃ কেনেথ ওয়াকার শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন। সর্বশেষ বক্তা শ্রীতারাপদ বসু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উল্লেখ করেন। ভারতের নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের দানের সম্বন্ধেও তিনি বর্ণনা করেন। লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী সভানেত্রী এবং বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা পরিসমাপ্ত হয়।

বাত্যা ও বন্যা সেবা—কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম গত ৭ই জুন হইতে সদর থানায় সাম্প্রতিক বাত্যা-পীড়িতগণের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। তমলুক শাখাকেন্দ্র সুতাহাটা থানায় অনুরূপ সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন। শিলচর শাখাকেন্দ্র হইতে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি

অঞ্চলে বন্যাসেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত বৎসর (১৯৫৫) ডিসেম্বর মাস হইতে মাদ্রাজ রাজ্যের তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলায় বাত্যা এবং বন্যায় দুর্দশাগ্রস্তদিগের মধ্যে মিশন যে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এখনও চলিতেছে। বর্তমানের কর্মসূচী হইল গৃহহীনদিগের পুনর্বাসন।

শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন) হইতে চারি দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে অতি সুন্দর সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে উৎসাহ ও শান্তি দিয়াছিলেন। মালদহ মিশন পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকগণের স্বহস্তনির্মিত নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যাদি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমূলক পোষ্টারে সজ্জিত একটি প্রদর্শনী উৎসবের চারিদিনই খোলা ছিল। প্রতিদিন রাত্রিতে শ্রীরামরসায়ন-কীর্তন ও ভজনাদির ব্যবস্থা ছিল। কাটিহার আশ্রমের স্বামী অনুপমানন্দজী *শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।* ৪র্থ দিন (রবিবার) ভোরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বৃহৎ তৈলচিত্র লইয়া প্রভাতী কীর্তন শহরবাসীকে আনন্দ দান করিয়াছিল। ঐ দিন আশ্রমে বিশেষ পূজা, হোম, ও ভোগারতির পর বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্র নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশ হইতেও বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মালদহ শহর হইতে ২২ মাইল দূরবর্তী মথুরাপুর গ্রামে পরদিন বিকালে স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বালিয়াটি (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১১ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়াছে। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নে সমাগত প্রায় দেড় সহস্র নরনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্বামী প্রণবাত্মানন্দের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ আবৃত্তি এবং শ্রীমতী হেনা রায় চৌধুরী সারদামণি দেবীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর জীবনী আলোচনা করেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে আর একটি সভায় স্বামী সত্যকামানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন, সাধনা ও বাণী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সায়াহ্নে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সম্মুখে ছায়াচিত্রযোগে স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা, ত্যাগ ও সেবা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীঅজিতকুমার দত্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। বক্তা ছিলেন মাণিকগঞ্জ মহকুমার এস-ডি-ও বাহাদুর, উকীল মসিউদ্দিন আহম্মদ (রাজা মিঞা), মণীন্দ্র নিয়োগী, এম-এল-এ শ্রীমুনীন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বামী সত্যকামানন্দ, স্থানীয় হাই স্কুলের হেড্‌মাস্টার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। তৎপর রাত্রি ৯ ঘটিকায় স্থানীয় শিল্পী কুটেশ্বর শীল তাঁহার চিত্তাকর্ষক পুতুল নাচ দ্বারা রাবণবধ অভিনয় দেখাইয়া সমাগত সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

রাঁচি মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন) শ্রীরামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় দুর্গা-মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ সভা হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দজী উহার পরিচালনা করেন। অপর বক্তা ছিলেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ এবং স্বামী বেদান্তানন্দ। শ্রীদুঃখহরণ নায়েক, কুমারী মীরা বিশ্বাস ও শ্রীমতী রেণুকা সেন ভজন গান করেন। আশ্রম কর্তৃক ব্যবস্থাপিত সঙ্গীত ও রচনা প্রতি-যোগিতার কৃতীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয়।

চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৩-৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই মঠে অবতার ও মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-তিথিতে ও দুর্গাপূজাদি পর্বোপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা হয়। প্রতিমাতে শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৫৩ ও '৫৪ সালে আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৬ (বালিকা-৫২) এবং ১২৬ (বালিকা-৫২)। গ্রন্থাগারে ৮ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হইয়াছিল। ৫৬৫ খানি পুস্তকের মধ্যে পাঠকগণকে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা ৫৫০। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৩,৬৬১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করেন। দৈনিক রোগীসংখ্যা গড়ে ৮৪। চণ্ডীপুরের নিকটবর্তী বামুন-আড়া গ্রামের বিরাট মেলায় প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও জলসত্রদান ও সাময়িক সেবাকার্য করা হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আশ্রমে এবং গোপীনাথপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, ঈশ্বরপুর, হাঁসচড়া, ভীমেশ্বরী, ভগবানপুর ও কাজলাগড়ে সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

(১) **Women Saints of East & West**—লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার (৬৮ ডিউকস্ এভিনিউ, মুস্‌ওয়েল হিল, লণ্ডন, এন্-১০) হইতে প্রকাশিত শ্রীসারদাদেবী শতবর্ষ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। স্বামী ঘনানন্দ এবং স্যর জন্ স্টুয়ার্ট ওয়ালেস্ সি-বি কর্তৃক সম্পাদিত। ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত; প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন কেনেথ ওয়াকার, এম্-এ, এফ্-আর-সি-এস, ও-বি-ই। পৃষ্ঠা (সাইজ—৮$\frac{3}{4}$ × ৫$\frac{3}{4}$) —২৭৪ + ১৮; মূল্য—১০৲ টাকা।

বইটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম Women Saints of Hinduism বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তের প্রসিদ্ধা নারী সাধিকাদের বিশদ কাহিনী পৃথক পৃথক প্রবন্ধে মনোজ্ঞভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অংশের ১৪টি প্রবন্ধের তিনটি লিখিয়াছেন লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্রের পরিচালক এবং গ্রন্থ-সম্পাদক স্বামী ঘনানন্দ নিজে। অপর লেখক-লেখিকাদের নাম টি এস্ অবিনাশীলিঙ্গম্, এস্ সচ্চিদানন্দ পিল্লাই, স্বামী পরমাত্মানন্দ, টি এন্ শ্রীকান্তাইয়া, শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাণ্ডু, মিসেস লাজওয়ান্তী মদন, শ্রী বি বি খের, শ্রী পিরোজ আনন্দকার, শ্রীমতী সরোজিনী মেহতা, শ্রী পি শেষাদ্রি, মহোপাধ্যায় কে এস্ নীলকণ্ঠন্ এবং স্বামী চিরন্তনানন্দ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের তিনটি প্রবন্ধে বৌদ্ধ এবং জৈন সাধিকাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। একটি রচনার নাম 'মি চাও বু—ব্রহ্মদেশের একজন মহা-সাধিকা', লেখিকা—মিসেস্ চিট্ থুঙ্।

তৃতীয় ভাগের নিবন্ধ-সংখ্যা—৯; ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড এবং আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং লেখক এই অংশে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী নারী-সাধিকাদের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের চতুর্থভাগের বিষয়—'জুদীয় এবং সুফীধর্মের

মহিলা সাধিকাগণ' ; প্রবন্ধ-সংখ্যা—২ ; প্রথমটির লেখক আইজাক চেট্ [Isaac chait, M. A (Oxon), Rabbi : Sheffield, England]; দ্বিতীয়টি লিখিয়াছেন ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী।

দেশকালের গণ্ডীর বাহিরে বিশ্ব-নারীর ভাগবত-চরিত্রমহিমার উপলব্ধি করিবার সুযোগ উপস্থাপিত করিয়া এই গ্রন্থটি একটি সার্থক কীর্তিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

(২) **Footfalls of Indian History**—By Sister Nivedita. ভগিনী নিবেদিতার সুবিখ্যাত পুস্তকের নূতন সংস্করণ। মায়াবতী (আলমোড়া) অদ্বৈত আশ্রম (কলিকাতা শাখা) : ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩) হইতে স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। (পূর্বে এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন লঙম্যান কোম্পানী)। পৃষ্ঠা (ক্রাউন অক্টেভো)—২১৬ ; মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৩৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৪৲ টাকা।

সূচীপত্র—

The History of Man as Determined by Place ; The History of India and its Study ; The Cities of Buddhism ; Rajgir : An Ancient Babylon ; Bihar ; The Ancient Abbey of Ajanta ; The Chinese Pilgrim ; The Relation Between Buddhism and Hinduism ; Elephanta—The Synthesis of Hinduism ; Some Problems of Indian Research ; The Final Recension of the Mahabharata ; The Rise of Vaishnavism under the Guptas ; The Historical Significance of the Northern Pilgrimage ; The Old Brahmanical Learning ; The City in Classical Europe ; A Visit to Pompeii ; A Study of Banaras.

সারনাথ, অজন্তা এবং এলিফ্যাণ্টার তিনখানি সুন্দর ঐতিহাসিক চিত্র সম্বলিত।

(৩) **Cradle Tales of Hinduism**—By Sister Nivedita

প্রকাশক—স্বামী গম্ভীরানন্দ, অধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী (আলমোড়া) পৃষ্ঠা (ক্রাউন অক্টেভো)—৩০০+৮ ; মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৩৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৪৲ টাকা।

ভগিনী নিবেদিতার এই বইখানি পূর্বে লঙম্যান কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হইত। প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৯০৭ সালে। সম্প্রতি অদ্বৈত আশ্রম পুস্তকটি প্রকাশের ভার লইয়া বর্তমান নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

সূচীর প্রধান অংশ—

The Cycle of Snake Tales ; The Story of Shiva, the Great God ; The Cycle of Indian Wifehood ; The Cycle of Krishna ; Tales of the devotees ; A Cycle of great kings ; A Cycle from the Mahabharata.

মলাটে 'দুর্গার বজ্র' এবং আরম্ভে 'সন্ধ্যার কথক ঠাকুর' শিল্পগুরু অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের এই দুটি ছবি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া ভগিনী নিবেদিতার ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর এই বর্ণনা ও মূল্যনির্ণয় যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই শিক্ষাবহ।

The Ramakrishna Movement—Its Ideal and Activities—(Second Edition)—By Swami Tejasananda. Published by Swami Vimuktananda, Secretary, Ramakrishna Mission Saradapitha, Belur math, Howrah. পৃষ্ঠা—ডিমাই অক্টেভো ৪২+৪ ; মূল্য—১।৹ আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ ও কার্যাবলী সম্পর্কিত এই পরিচিতি-পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ যে ব্যাপক সমাদর লাভ করিয়াছিল এক বৎসরের মধ্যে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশই ইহার প্রমাণ।

পুস্তকটির বিষয়-সূচী—

1. Sri Ramkrishna, 2. Sri Sarada

Devi—the Holy Mother, 3. Swami Vivekananda, 4. Origin of the Ramakrishna Math and Mission, 5. Belur Math—a Symbol of Unity, 6. Expansion of Work in India and Abroad, 7. Worshipful Service, 8. Orientation in Monastic Ideal, 9. Need of a Cultural Synthesis, 10. India's Message of Peace, 11. India to Conquer the World. ইহা ছাড়া চারটি পরিশিষ্টে যথাক্রমে দেওয়া হইয়াছে—(১) Extracts from the Memorandum of Association of the Ramakrishna Mission, (২) Extracts from the Rules and Regulations of the Ramakrisnna Mission, (৩) Activities of the Ramakrishna Math & Mission in India and Abroad as in 1953, (৪) Centres in India and Abroad.

পুস্তকে ২৮টি ছবি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করিয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মসংঘ এই যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, লক্ষ্য ও প্রসার-ক্রমকে সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিতে এই বইখানি প্রচুর সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ

দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডারের কার্যবিবরণী—কলিকাতার ৬৫।২ বি বিডন ষ্ট্রীটস্থ দরিদ্রবান্ধব-ভাণ্ডার একটি জনসেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান। আমরা ইহার দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষের (১৯৫৪) কার্যবিবরণী পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। নিম্নে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পাঁচটি বিভাগের আলোচ্যবর্ষের কার্যাবলী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :—

(১) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়—এই বিভাগে ৪টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। মোট ৯১,৮৮৫ জনকে (অ্যালোপ্যাথিক মতে ৪৯,৯৭১ এবং হোমিওপ্যাথিক মতে ৪১,৯১৪) ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ২৭,১৮১ ; দৈনিক উপস্থিতির গড়-সংখ্যা ২৯৮.৩।

(২) দরিদ্রবান্ধবভাণ্ডার চেস্ট ক্লিনিক—সপ্তাহে তিন দিন—রবি, বুধ ও শুক্রবারে বেলা ১১টা হইতে ১২৷টা অবধি এই বিভাগে হৃদ্‌রোগী এবং বিশেষ করিয়া যক্ষা রোগীদের আধুনিক পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্য-বর্ষে ১৩,৩২৭ রোগীর মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ১,৮৩৯। ক্লিনিকে একটি এক্‌স্‌রে যন্ত্র ও লেবরেটরী আছে।

(৩) শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন (১০৫।২' রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)—১৪টি শয্যা-সমন্বিত এই বিভাগে ফুসফুসের যক্ষারোগী-গণকে প্রথম অবস্থায় ৩।৪ মাস রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৪১ জন (পুরুষ ২২, স্ত্রীলোক ১৯) যক্ষারোগাক্রান্তকে ভর্তি করিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল, ৩৬ জনের উল্লেখযোগ্য ভাবে চিকিৎসা-সাফল্য ঘটে।

(৪) সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার—একটি অবৈতনিক পাঠাগারসংলগ্ন এই লাইব্রেরীটি বৃহস্পতিবার ব্যতীত সন্ধ্যা ৬॥ হইতে ৮॥টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে বালকবালিকাদিগকে মাসিক মাত্র ৵০ আনা এবং

প্রাপ্তবয়স্কগণকে ।০ আনা চাঁদায় পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। আলোচ্যবর্ষে পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৩৮৮৬ (ইংরেজী ৭২৪); সভ্যসংখ্যা ১০৪।

(৫) সেবা বিভাগ—আলোচ্য বৎসরে দুর্গত পরিবারসমূহকে ১৭৮৯৷৶১৫ সাহায্য করা হইয়াছিল। নিয়মিত দুঃস্থ প্রার্থীগণকে দেওয়া হয় ৯৬০৲ টাকা এবং সাময়িক সাহায্য বাবদ খরচ হয় ৮২৯৶০ আনা।

কলিকাতার কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে ২২এ ও ২২ই, শিবকৃষ্ট দাঁ লেনে ১০ বিঘা ১৪ ছটাক জমির উপর শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন নামে ৫০টি শয্যাযুক্ত একটি প্রসূতিসদন ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। এখানে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও থাকিবে।

ইম্ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী — ইম্ফল (মণিপুর) শ্রীরামকৃষ্ণসমিতির উদ্যোগে গত ২৬শে ও ২৭শে মে (১৯৫৬) বাবুপাড়া পূজামন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১ তম জন্মোৎসব সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন মণিপুর রাজ্যের জুডিসিয়াল কমিশনার শ্রীব্রজনারায়ণ এই উপলক্ষ্যে আহূত একটি সাধারণ সভা পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় দিন পূজা হোম ও প্রসাদবিতরণ হয়। শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পুরুষাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চিত্তস্পর্শী আলোচনা করেন।

ময়াল গ্রামে অনুষ্ঠান—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান ময়াল গ্রামে (পোঃ ময়ালবন্দীপুর, জেলা হুগলী) গত ২৯শে বৈশাখ (১২ই মে '৫৬) পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তিবিনম্রচিত্তে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। বেলুড় মঠের স্বামী সংশুদ্ধানন্দ মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করেন। হাওড়া ও কলিকাতার অনেকগুলি ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্যামপাহাড়ী (বীরভূম) শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ—এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির ১৯৫৫ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ২০ বিঘা জমির উপর মনোরম স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ১৯৫১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাপীঠের ঈপ্সিত কার্যাবলীর মধ্যে বিগত বর্ষগুলিতে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল (ছাত্রসংখ্যা—৮০) এবং মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি আবাসিক জুনিয়র হাই স্কুল (ছাত্রসংখ্যা—১১২)। একটি শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় ১৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি রামপুরহাট হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে, দুমকা রোডের উপর অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি অতিথি ভবনও আছে।

পল্লীবঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণজয়ন্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আশ্রমসমূহ ব্যতীত বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার বহু প্রতিষ্ঠান হইতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব পরিনির্বাহের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে এই সকল উৎসবের বিশদ বিবরণ ছাপিতে পারা গেল না। কোন কোন স্থলে বেলুড় মঠ বা উহার কোন শাখাকেন্দ্র হইতে মঠের সাধুরা উৎসবে যোগদান ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। পূজা, পাঠ, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ, বক্তৃতা, কথকতা, ভজন, কীর্তন, রামায়ণ-গান, যাত্রা প্রভৃতি ধর্মমূলক নানা অনুষ্ঠান এই উৎসবগুলির সুপরিকল্পিত কর্মসূচি ছিল। কোন কোন প্রতিষ্ঠান রচনা-প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন। আমরা নিম্নে স্থান এবং প্রতিষ্ঠানগুলির নাম লিপিবদ্ধ করিলাম :—

২৪ পরগণা জেলায়—মথুরাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সাউথ বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পরিচালকমণ্ডলী, বেলঘরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, ভাটপাড়া বান্ধব সমিতি, ইছাপুর প্রবুদ্ধ-ভারত সঙ্ঘ, বারদ্রোণ রামকৃষ্ণ আশ্রম, আমতলা (পোঃ কল্যানগর) রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, নৌনা-চন্দনপুর (ব্যারাকপুর) রামকৃষ্ণসেবা সঙ্ঘ, ইছাপুর রামকৃষ্ণ-সাধন সমিতি, নব-ব্যারাকপুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতি।

হাওড়া জেলায়—হরিশপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, বেলানগর (পোঃ অভয়নগর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কদমতলা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধন সঙ্ঘ, মাজু শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব সমিতি।

হুগলী জেলায়—নীরদগড় (পোঃ পাণ্ডুয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতি, জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকসম্মিলনী, ভাঙ্গামোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, ভদ্রকালী রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য বালিকাশ্রম, ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লী উন্নয়ন পরিষদ্।

মেদিনীপুর জেলায়—আরিট শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

নদীয়া জেলায়—রাণাঘাট রামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী কমিটি, নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, কলাইঘাট (রাণাঘাট) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

বাঁকুড়া জেলায়—সোনামুখী শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সমিতি।

বর্ধমান জেলায় — অণ্ডাল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব কমিটি, কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণসেবাশ্রম, দোমড়া (পোঃ ত্রিলোকচন্দ্রপুর—বর্ধমান) শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর।

কোচবিহার জেলায়—চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

কুলহাণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অনুষ্ঠান—কুলহাণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে গত ২৩শে বৈশাখ (৬ই মে) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সকালে শোভাযাত্রা ও সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পূজা, হোম এবং দরিদ্রনারায়ণগণকে প্রসাদবিতরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈকালে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুশান্তানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। ২৪শে হইতে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির কর্তৃক যথাক্রমে বৈষ্ণবচক উচ্চ বিদ্যালয়, সুলনী উচ্চ-বিদ্যালয় ও গোপালনগর, খাদিনান, রাইন ও কল্যাণপুরে পূজা, ধর্মসভা ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যজীবনী আলোচিত হয়।

বিহারের কয়েকটি উৎসব-সংবাদ

ধানবাদ—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি গত ২১শে ও ২২শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করেন। বিশেষপূজা-হোম-ভজন-দরিদ্রনারায়ণসেবা ও যাত্রা গান-বক্তৃতাদি উৎসবের কর্মসূচি ছিল। কোল মাইন-ওয়েলফেয়ার কমিশনার শ্রী এস পি সিং-এর পরিচালিত একটি জনসভায় বেলুড়মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, সাহেবগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশিব-বালক রায়, সুপ্রীমকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীএন্ এল্ ভাগানিয়া এবং স্থানীয় আশ্রমসেবক ভাষণ দেন।

লাহেরিয়া সরাই—বীণাপাণি ক্লাবে ১৪ই মার্চ হইতে ৫ দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজার্চনা, বক্তৃতা, কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং অখণ্ড শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম নামমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

আরেরিয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৪ই মার্চ হইতে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত তিনদিন উৎসব পরিপালন করেন। বালকবালিকাদিগের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা এবং উদয়াস্ত নাম সংকীর্তন ছিল কর্মসূচির নানাবিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দ উৎসবে যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৃথা

দৃষ্টা নানা চারুদেশাস্ততঃ কিং
পুষ্টাশ্চেষ্টা বন্ধুবর্গাস্ততঃ কিম্।
নষ্টং দারিদ্র্যাদিদুঃখং ততঃ কিং
যেন স্বাত্মা নৈব সাক্ষাৎকৃতোঽভূৎ॥
স্নাতস্তীর্থে জহ্নুজাদৌ ততঃ কিং
দানং দত্তং দ্ব্যষ্টসংখ্যং ততঃ কিম্।
জপ্তা মন্ত্রাঃ কোটিশো বা ততঃ কিং
যেন স্বাত্মা নৈব সাক্ষাৎকৃতোঽভূৎ॥

—আচার্য শঙ্কর, অনাত্মশ্রীবিগর্হণপ্রকরণম্, ৩, ৪

যাঁহার সত্তায় সকল বৈচিত্র্য রূপ পাইতেছে, সকল ভালবাসা, সকল প্রাপ্তি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে সেই অন্তরস্থিত পরমাত্মাকে যদি সাক্ষাৎ করিতে না পারা গেল তাহা হইলে নানা রমণীয় দেশ দর্শন করিয়াই বা কি ফল, প্রিয় বন্ধুবর্গের পোষণেই বা কি গৌরব আর দারিদ্র্যাদি যাবতীয় কষ্ট যদি দূর হয় তাহাতেই বা কি সার্থকতা? আত্মাকে ছাড়িয়া যত কিছু ভ্রমণ তাহা শুধু শারীর শ্রম, আত্মদর্শন-বিযুক্ত যত কিছু দেখা তাহা শুধুই চক্ষুর ক্লান্তি। প্রিয়জনের মধ্যে যদি নিখিল-প্রীতির উৎসকে ধরিতে না পারা যায় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়া কেবল মোহেরই সঞ্চার। আত্মা রূপ পরমধনকে বাদ দিয়া যদি পার্থিব সম্পদকে বড় করিয়া দেখিতে যাও তাহা হইলে উহা সম্পদ নয়—বিপদ, সুখ নয়—পুঞ্জিত দুঃখ-ভার।

জাহ্নবী প্রভৃতি কত পবিত্র তীর্থে স্নান করিলাম, কিন্তু হইল কি? পুণ্যলাভের আশায় ষোড়শ দান করিলাম, কি পাইলাম? কোটিবার মন্ত্র জপ করিয়াও দেখিয়াছি, কই, হৃদয় তো ভরিল না। না, কিছুতেই কিছু হইবার নয়, পাইবার নয়, ভরিবার নয়। আত্মার সাক্ষাৎকার বিনা সবই বৃথা।

কথাপ্রসঙ্গে

শিশু

"এই দেহের অভ্যন্তরে একটি শিশু বসিয়া আছে, তাহাকে যদি জানিতে পার তো সাতটি উগ্র শত্রুকে জয় করিতে পারিবে।" —বলিয়াছেন, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। শিশুটি কে? সারা শরীরে অবিশ্রান্ত সঞ্চরণশীল প্রাণ; প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, প্রতি শিরায় উপশিরায় স্নায়ুতন্ত্রীতে, প্রতি জীবকোশে আলস্যহীন কুণ্ঠাহীন তাহার নর্তন, ক্রিয়া—কিন্তু বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, পক্ষপাত নাই; সত্যই সে শিশু—শিশুর মত এই দেহের খেলা-ঘরে খেলিতে বসিয়াছে, যে কোন মুহূর্তে যদি খেলাঘর ভাঙিয়া যায় হাততালি দিয়া চলিয়া যাইবে, অপর জায়গায় আর একটি খেলার আসর জমাইবে। চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি একটু কাজ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আবার ঐটুকু কাজের মধ্যেই কত তাহাদের ভালমন্দ বিচার, কত আসক্তি-বিরাগ! প্রাণের কিন্তু ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই—আমাদের জাগ্রতাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়নিচয় যখন সক্রিয়, প্রাণ তখন তাহাদের পিছনে থাকিয়া উৎসাহ দিতেছে; আবার চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি নিদ্রায় যখন অচেতন, প্রাণ তখনও জাগিয়া। জাগিয়া জাগিয়া ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়-মনের নৈষ্কর্ম্য দেখিতেছে—যেন সঙ্গীবিহীন শিশু নিঝুম দ্বিপ্রহরে আপনার মনে পল্লীপথে গান গাহিয়া ফিরিতেছে! ইহাও যে শিশুর এক খেলা।

শতবাসনা-ব্যাকুল সদাক্ষুব্ধ নিত্য-অতৃপ্ত এই রক্তমাংসের দেহের মধ্যে এমন একটি নিরাকাঙ্ক্ষ, আত্মতৃপ্ত শিশু বসিয়া আছে—এই অনুভূতি নিশ্চিতই মূল্যবান। তাই উপনিষদের উপদেশ—প্রাণরূপ শিশুকে জানো, জানিয়া দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক ও মুখ—মস্তকস্থ বিষয়োপলব্ধির এই সাতটি ক্ষেত্রকে জয় কর। ঐ সাতটি ক্ষেত্র যখন উচ্ছৃঙ্খল থাকে তখন তাহারা মানুষকে মোহাবর্তে ফেলিয়া অনবরত নাকাল করিয়া মারে। উহাদিগকে সংযত করিতে পারিলেই মানুষ জীবনের নিগূঢ় সত্যকে ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করে। উহাদিগকে সংযত করিবার উপায় প্রাণ-বিজ্ঞান।

দেহাভ্যন্তরচারী প্রাণ শিশু বটে, কিন্তু পরম-শিশু নয়। পরম-শিশু হইলেন চৈতন্যস্বরূপ ভগবান—যিনি প্রাণেরও প্রাণ, প্রাণকেও যিনি খেলায় লাগাইয়া খেলা করিতেছেন, চরাচর অখিল বিশ্ব-জগৎকে যিনি নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে বার বার বাহির করিয়া আবার টানিয়া লইয়া প্রকাশ-বিলয়ের লীলায় মত্ত রহিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে প্রাণ-শিশুও ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু পরম-শিশু ভগবানের ঘুম নাই। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—তিনগুণের উর্ধ্বে তিনি, জাগরণ-স্বপ্ন-নিদ্রা তিন অবস্থার অতীত তিনি। কিছুরই তিনি বশ নন, কোথাও তিনি বাঁধা নন, কোন বেড়াই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, কোন বিশেষণই তাঁহাকে সংজ্ঞিত করিতে পারে না। স্বতন্ত্র, চিরমুক্ত, নিরাভরণ, নির্লক্ষণ, উলঙ্গ শিশু। উপনিষদের প্রাণশিশুর দিগ্‌দর্শন লইয়া পরবর্তী স্মৃতিপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র শিশুর উপমাতেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। যুগে যুগে ভাবুক ও কবিগণ বিশ্বনিয়ন্তার শিশুত্বকে তাঁহাদের রচনার ও সঙ্গীতের একটি অনবদ্য শ্রেষ্ঠ উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবান মানুষদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, মনুষ্যজন্মে কত অদ্ভুত কীর্তি দেখাইয়া যান, কিন্তু ভক্ত সেই সকল কীর্তির অপেক্ষা তাঁহার শৈশব-কালের ছুটাছুটি খেলাধূলাটাই বেশী করিয়া মনে রাখে। ভগবানের যে তখনও অবতারত্ব-স্বীকারের দায়িত্ব দেখা দেয় নাই, কর্তব্যের জোয়াল কাঁধে চাপে নাই—এই মায়িক জগতের ভালমন্দ হইতে তখনও তিনি দূরে, অতিদূরে—সরযূতীরের খেলার

মাঠে, যমুনাতটের ঝাড়ে জঙ্গলে। তখনই তো তিনি ত্রিগুণাতীত ভগবান, নির্মায়িক, নিষ্কিঞ্চন নিরভিমান, আত্মারাম শিশু।

ভক্তশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গলের বর্ণনা—

শিশুর বাঁশী বাজিতেছে। কি আশ্চর্য শক্তি সেই বাঁশীর! স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—তিন লোক পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আবাঙমনসোগোচর গম্ভীর প্রশান্ত বেদসত্য কথা কহিতে চাহিতেছে। নিশ্চল মহীরুহের গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছে। কঠিন শৈলশ্রেণী বিগলিত, মৃগকুল বিবশভাবে দাঁড়াইয়া, মূক গাভীদলের মুখে আনন্দধ্বনি। বাঁশীর সুরে গোপগণের প্রাণ, বংশীবাদক শিশুর সহিত মিলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যোগি-ঋষিগণের চিত্তমঞ্জরীতে দেখা দিয়াছে অহৈতুকী ভক্তির মুকুল। সপ্তস্বর প্রকাশ করিয়া, মহা ওঁকার নাদ বিশ্বভুবনে প্রকট করিয়া যে বাঁশী বাজিতেছে—শাশ্বত শিশুর সেই দিব্য মুরলীধ্বনির জয় হউক!

দুঃসহ প্রেষ্ঠ-বিরহ

অসহ্য হৃদয়-বেদনা—যিনি প্রিয়ের প্রিয়, এই নিখিল সংসারে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিবার বস্তু, তাঁহার সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবার মর্মান্তিক ব্যথা! কিন্তু সেই দুর্বিষহ বিরহের দাহ আবার ভক্তের নিকট আকাঙ্ক্ষিতও বটে। কেননা—

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

কৃষ্ণবিদ্বেষী কর্তৃক অর্গলাবদ্ধা কৃষ্ণদর্শনে অপারগ গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্র জ্বালায় সকল অশুভ কর্ম পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বাকী যে রহিল সকল শুভ কর্মের স্বর্ণশৃঙ্খল—সেই শৃঙ্খল হইতেও তাঁহারা মুক্ত হইলেন। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারিয়া ধ্যানযোগে তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া যে পরমানন্দের বন্যা নামিল সেই বন্যায় তাঁহাদের শুভকর্মসঞ্চয় ভাসিয়া গেল। এইরূপে শুভ এবং অশুভ দুইই দূর হওয়ায় তাঁহারা গুণময়ী মায়া হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। (ভাঃ, ১০।২৯।১০)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাগণের বিরহ একটি নিত্যকালের আধ্যাত্মিক সত্যের পরিজ্ঞাপক। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তগণকে বলিতেন, "সাকার না মানো রাধাকৃষ্ণের ঐ টানটুকু নেবে।" কোন্ সুদূর উত্তুঙ্গ পর্বতশৈলে তটিনী জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু মহাসমুদ্রের আকর্ষণ সে কি অবহেলা করিতে পারে? যতদিনই লাগুক, যত বাধাই আসুক, সমুদ্রে না মিলিয়া তাহার কি শান্তি আছে? মহাসাগরকে পাইবার আশায় তাহার দুর্গম চলার পথের সকল কণ্টক কুসুমের সৌরভই বহন করিয়া আনে। কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়া মানে না। বিচ্ছেদ তাহার তপস্যা—আনন্দ। সেইরূপ মানুষেরও জীবনের লক্ষ্য ভগবান। চিরদিন মানুষ খেলাঘর লইয়া মত্ত থাকিতে পারে না—ভগবানকে চাহিবার, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিবার, তাঁহার জন্য তীব্র অভাববোধ করিবার শুভলগ্ন তাহার জীবনে একদিন আসিতে বাধ্য। যেমন করিয়া পৃথিবীর রসে, সূর্যের আলোতে তাহার দেহ পরিপুষ্ট হয়, প্রাণরক্ষার জন্য মুহূর্তে মুহূর্তে তাহাকে বাতাস টানিতে হয়, দিনের পর দিন জল পান করিতে হয়—যেমন করিয়া সে ভাবিতে শিখে, তাহার বুদ্ধিবিচারের উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, দশটা দেখিয়া শুনিয়া পুঁথি পড়িয়া সে মনোলোকের ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে ঠিক তেমনি করিয়াই, সময় হইলে ভগবদ্-বিরহের আগুন একদিন তাহার ভিতর জ্বলিয়া উঠে—মানব-প্রকৃতির স্বভাববশেই জ্বলিয়া উঠে। দেহের আকাঙ্ক্ষা, জৈবিকপ্রাণের তৃষ্ণা, মনের বিকাশশীলতা যেমন কল্পনা নয়, অপ্রত্যাখ্যেয় সর্বজনীন সত্য, অনন্ত প্রেমস্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার ইচ্ছা সেইরূপই মানুষের জীবনের একটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ব্যাকুলতা হলেই অরুণ-

উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।" অতএব ব্যাকুলতা দুর্লভ ধন, বিরহ সাধকের চির-আকাঙ্ক্ষিত সম্বল—যে সম্বলে সংসারের ভাল-মন্দ সকল প্রকার মোহ চুরমার করিয়া সাধক একদিন সংসার-সার ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

যুগ যুগ ধরিয়া দেশ-দেশান্তরের কতশত বিরহীর দিব্য চরিত্র ধর্মসাধনার ইতিহাস আলোকিত করিয়া আছে। আরও কত শত সহস্র অজ্ঞাত অশ্রুত আউল-আউলী মানুষের পর্যবেক্ষণের অন্তরালে ভগবানের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া পৃথিবীর মাটি ভিজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব কে রাখিয়াছে? ইঁহাদের সেই অশ্রুই তো স্বার্থ-দ্বেষ-হিংসাজর্জরিত এই কঠিন পৃথিবীতে চিরকালের জন্য শান্তির অমৃত হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের বিরহ-সঙ্গীতই তো চিরকালের জন্য দুঃখ-বিপদ-নিরাশার মধ্যে মানুষের হৃদয়ে তুলিতেছে লোকাতীত অভয়, আশা ও আনন্দের সুর।

দুঃসহ প্রেষ্ঠ-বিরহ! কবি বিদ্যাপতির বর্ণনায়, যেন ভরা ভাদ্রের তিমিরময়ী কৃষ্ণা রাত্রি জীবনে নামিয়া আসিয়াছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে লেশমাত্র আলো নাই, মেঘ গর্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, শত শত বজ্র ভীম রবে ফাটিয়া পড়িতেছে। তথাপি ভয় পাইলে চলিবে না, আশা ছাড়িলে চলিবে না। হয়তো এই দুর্যোগ ঠেলিয়াই মধ্যরাত্রে চিরবাঞ্ছিত অতিথি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবেন। তাই নির্নিমেষ নয়নে অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহারই পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে, শূন্য মন্দিরে তাঁহারই প্রতীক্ষায় রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হইবে—সে রাত্রি যত দীর্ঘই হউক, যত ভয়ঙ্করই হউক, যত নিঃসঙ্গই হউক।

আবার সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ ভগবদ্-বিরহীর* মুখেও বিদ্যাপতি-মীরাবাইএর গান শুনিতে পাইতেছি—

"হে আমার ভগবান, আমি যেন সেই প্রেমের পথ ধরিয়া চলিতে পারি যেখানে অন্য কিছুর উপর স্বার্থবুদ্ধি নাই। কত ভালবাসা তোমায় ঢালিয়া দিব তাহা যে আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম; আমার সকল কল্পনা, সকল কামনা যে এখানে হার মানিয়াছে। হে আমার প্রিয়তম, তুমিই ঠিক করিয়া দিও এই ভালবাসার সীমা কোথায় টানিব। আমি তো জানি, ইহার সীমা নাই। যত তোমায় ভালবাসি, আমার অন্তরাত্মার অভীপ্সা তোমার জন্য ততই উদ্বেল হইয়া উঠে, ততই আমি চাই তোমার জন্য কাঁদিতে, তোমার জন্য দুঃখবরণ করিয়া লইতে।"

"বিভক্ত সত্তা"

'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পুস্তকে ("Four Phases of Culture"—By R. D. Sinha Dinkar) শ্রীজওহরলাল নেহরু একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীদেরই উদ্দেশ্যে তাঁহার কিছু প্রাণের বেদনা ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভূমিকাটির অনেক অংশ 'লেখা' না বলিয়া সবাক্ চিন্তা (loud thinking) বলা যাইতে পারে—একান্ত আপনার জনদের কাছে ঘরোয়া মনের ভাব প্রকাশ। কিন্তু মনের ভাব ছাপার অক্ষরে দেখা দিলে উহা আর 'ঘরোয়া' থাকে না, সর্বসাধারণ উহা পড়ে এবং পড়িয়া খুশীমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। 'নিউইয়র্ক টাইম্স্ ম্যাগাজিন' (১১ই মার্চ, ১৯৫৬) নেহরুজীর ঐ ভূমিকাটি হইতে সঙ্কলন করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন—নাম দিয়াছেন, "ভারতবর্ষের 'বিভক্ত সত্তা'র ব্যাখ্যায় নেহরু।" (Nehru explains India's 'split personality') 'Split Personality' কথাটি বর্তমান মনোবিজ্ঞানের

* Dame Gertrude More.

একটি সংজ্ঞা। কখনও কখনও নানাপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মানুষের মনের একতা নষ্ট হয়, পরস্পরবিরুদ্ধ আবেগরাশির সংঘাতে তাহার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বটি তখন যেন দুই বা ততোধিক টুকরা হইয়া যায়; এক একটি টুকরা এক এক ক্ষেত্রে কাজ করিতে থাকে। যেমন, এক টুকরা ডাকাতি করে, আর এক টুকরা অন্য সময়ে এমন সাধু আচরণ করে যে লোকে অবাক হইয়া যায়। একই ব্যক্তি এমন পরস্পর-বিরুদ্ধ আচরণ কি করিয়া করে তাহার ব্যাখ্যায় বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলেন ঐ ব্যক্তি বস্তুতঃ আর এক ব্যক্তি নয়—এক দেহ-মনে দুইটি ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—ডাকাত ও সাধু। উহার personality (ব্যক্তিত্ব) এখন আর একটি অখণ্ড শক্তি নয়—উহা বিভক্ত (split) হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের এই খণ্ডীভবন একটি চরম মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ, মানুষের জীবনে উহা একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা সন্দেহ নাই। নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ ম্যাগাজিনের দেশবিদেশের পাঠকমণ্ডলী এখন জানিবে সমগ্র ভারত-মানসে এইরূপ একটি ভীষণ বিপর্যয় আসিয়াছে, স্বয়ং ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইহাতে শঙ্কিত। নেহরুজী তাঁহার মনোবেদনা প্রকাশের জন্য বর্তমান মনোবিজ্ঞানের ঐ সংজ্ঞাটি ব্যবহার না করিলেই বোধ করি ভাল করিতেন। উহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু অপপ্রচার ঘটিতে পারে।

নেহরুজীর মনোবেদনার প্রধান বিষয় হইল ভারতবর্ষে এখনও জাতিভেদপ্রথা কেন রহিয়াছে।

"অসংখ্য বিভাগ লইয়া জাতিপ্রথা ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব সৃষ্টি। অস্পৃশ্যতা, সকলে একসঙ্গে বসিয়া ভোজনে বাছবিচার, সকলের সহিত বিবাহে বিধি-নিষেধ ইত্যাদি অন্য কোন দেশে নাই। ইহার ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান কালেও ভারতীয়েরা অপরের সহিত মিশিতে কষ্টবোধ করে। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রত্যেক জাতি অপর দেশে গিয়াও ঐ জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। ভারতবর্ষে আমাদের অধিকাংশ মানুষই এই ব্যাপারটিকে মানিয়াই নেন, বুঝিতেই পারেন না অন্যান্য দেশবাসীর কাছে ইহা কিরূপ বিস্ময়কর ও চিত্তপীড়াদায়ক।

"ভারতবর্ষে আমরা যেমন একই সঙ্গে বিপুলতম সহিষ্ণুতা এবং চিন্তা ও মতের উদারতার বিকাশ সাধন করিয়াছি তেমনিই আবার সৃষ্টি করিয়াছি সঙ্কীর্ণতম সামাজিক আচরণ। এই 'বিভক্ত সত্তা' আমরা বহন করিয়া চলিয়াছি; আজও ইহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে যুঝিতে হইতেছে। আমরা আমাদের রীতিনীতি ও অভ্যাসের দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতাগুলিতে অনেক সময়ে নজর দি না। পূর্বপুরুষগণের উচ্চ ভাবরাশির দোহাই দিয়া ওগুলিকে ঢাকিতে যাই। কিন্তু ঐ দুয়ে যে একটি বাস্তব বিরোধ রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই বিরোধের যদি সমাধান আমরা না করিতে পারি তাহা হইলে এই 'বিভক্ত সত্তা' লইয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে। * * * যে আণবিক যুগের সূচনায় আমরা দাঁড়াইয়া, তাহাতে প্রবল ঘটনাসমূহের চাপে আমাদিগকে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতেই হইবে। যদি আমরা না পারি তাহা হইলে জাতি হিসাবে আমরা ব্যর্থ হইয়া যাইব এবং যে সব গুণ আমাদের আছে তাহাও আমাদিগকে খোয়াইতে হইবে।"

বর্তমান জাতিপ্রথার কুফল সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দও অনেক কড়া কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই প্রথার পূর্বেতিহাস বিস্মৃত হন নাই। এককালে জাতিবিভাগ ভারতীয় জাতির সামগ্রিক লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক সত্যের অনুশীলনের সহায়ক ছিল এবং সমাজের অনেক কল্যাণসাধনও করিয়াছিল। যে সকল ঐতিহাসিক কারণে সেই কল্যাণকর প্রথা বর্তমান সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী আচার-পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে তাহারও বিশ্লেষণ স্বামীজী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে 'অস্পৃশ্যতা' আপোষহীন কঠিন হস্তে সর্বপ্রকারেই তুলিয়া দেওয়া উচিত কেননা উহা মানুষের কোন প্রকার সুনীতি ও বিবেকের সমর্থন পাইবার যোগ্য নয়। কোন কালেই উহা সমাজের কোন মঙ্গল করে নাই এবং করিতে পারে না। কিন্তু 'জাতিপ্রথা' কিভাবে এবং কতটা তুলিতে হইবে সে সম্বন্ধে স্বামীজী আরও ধীরতা ও বিশ্লেষণাত্মক বিচার অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন।

"মূলে জাতির অর্থ ছিল—এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই অর্থ প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই ভাব পরিহার। * * * বর্তমান বর্ণবিভাগ (caste) বাস্তবিক পক্ষে জাতি নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উহা যথার্থই প্রকৃত জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতিরোধ করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতপক্ষে জাতিকে অব্যাহত গতিতে যাইতে দেয় না, আর যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে এই বলিতে চাই যে জাতি উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। * * * জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন আছে সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব।" (স্যার এস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখিত পত্র; চিকাগো, ৩রা জানুয়ারী ১৮৯৫)

স্বামীজী নানাস্থলে লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদ ধর্মবিধান নয়, উহা একটি সামাজিক বিধান মাত্র। "উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগণকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।" মানুষের নিজের স্বত্ববুদ্ধি যত জাগ্রত হইবে ততই জাতিভেদের নাগপাশ শিথিল হইতে থাকিবে। অতএব পন্থা হইল সমাজে ব্যাপক শিক্ষাপ্রচার যাহাতে মানুষের মর্যাদাবোধ বাড়ে, তাহার চোখ খুলিয়া যায়। উচ্চবর্ণসমূহকে টানিয়া নীচে নামাইবার চেষ্টা না করিয়া নিম্নবর্ণগণকে অবাধে উচ্চবর্ণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়া উপরে উঠাইতে হইবে।

শুধু তিরস্কার করিয়া, গালিগালাজ বা দুঃখ প্রকাশ করিয়া জাতিভেদ উঠিবার নয়। সমাজে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার বৈষম্য দূর করাই ভারতবর্ষের আশু কর্তব্য—জাতিভেদের বিরুদ্ধে চিৎকার নয়। সেই চিৎকারে ভারতবর্ষ এক পাও অগ্রসর হইবে না—যাহারা ভারতের সম্বন্ধে কতকগুলি অপপ্রচারের সুযোগ খুঁজে তাহাদেরই আনন্দ বর্ধন করা হইবে মাত্র। জাতিভেদ একটি বৃহৎ সমস্যা সন্দেহ নাই কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও বড় বড় সমস্যা রহিয়াছে, যেগুলির সমাধান আমাদিগকে আগে করিতে হইবে।

যাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীনেহরু 'Split Personality' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দও বার বার উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন।

"হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মতদ্বারা সর্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।" —(আমেরিকা হইতে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত পত্র; ২০।৮।১৮৯৩)।

'আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড' যাহা করিয়াছে তাহা নিশ্চিতই সমগ্র জাতির দুষ্কৃতি নয়। ভারতমানসের সত্তা বিভক্ত হয় নাই। আদর্শ এবং আচরণের বৈষম্য ভারতীয় জাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, সুবিধাবাদী স্বার্থসেবীরাই এই কলঙ্কের জন্য দায়ী। স্বামীজীর মতে "মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা" যত দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইবে, শিক্ষার দ্বারা অত্যাচারিতগণের যত চোখ খুলিয়া যাইবে ততই জাতিভেদ বা অনুরূপ সামাজিক অমঙ্গলগুলি লঘু হইয়া আসিবে। অতএব ভাঙার জন্য ব্যস্ত না হইয়া আমরা যেন গড়ার দিকে মনোযোগ দিই।

দুইটি ছবি

সকালে সমীরবাবুকে অযোধ্যাসিং তাহার ইতিবৃত্ত শুনাইতেছিল—কলিকাতার রাস্তায় পুরাতন কাগজের কারবারী হিন্দুস্থানী যুবক অযোধ্যা সিং। কাঁধে তাহার একটি বোরা, বোরার মধ্যে ক্রীত

খবরের কাগজ, পুরাতন মাসিকপত্র ইত্যাদি এবং দাঁড়িপাল্লা ও কয়েকটি বাটখারা। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঐ কাগজ সে কেনে। আড়তদারের কাছে লাভ রাখিয়া বেচিয়া দেয়।

অযোধ্যা সিং বলিয়া গেল: তাহার বাড়ী—গয়া জিলায়। কলিকাতায় আসিয়াছে আজ পাঁচ বৎসর। সকালে স্নান সারিয়া, কিছু খাইয়া বেলা ৮টা নাগাদ সে কাজে বাহির হয়, ডেরায় ফিরিতে ১২টা/১টা বাজে। এক এক দিন এক একটি অঞ্চলে যায়, কোন দিন শ্যামবাজার-বাগবাজার, কোন দিন সিঁথি-বরাহনগর বা বহুবাজার-ইটালি। গলি গলি ঘুরিয়া প্রত্যেক দিন ৫।৬ মাইল হাঁটিতে হয়। বৈকালে আর একাজে বাহির হয় না, দাদার ছোট কাপড়ের দোকানে 'মদদ্' দেয়। সে কলিকাতায় আসিয়াছিল প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায়; কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে ২৫৲ টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ হয়। মাসে সে রোজগার করে ১০০ টাকা হইতে ১৫০ টাকার মধ্যে। জীবনযাত্রা তাহার খুবই সরল। বেশ মোটা টাকাই সে বাড়ীতে মণিঅর্ডার করে ও জমায়। তাহার মনে কোন অভিযোগ নাই, উদরান্নের কোন ভয়ও নাই।

বিকালের ডাকে সমীরবাবু মফস্বলের এক শহর হইতে একটি চিঠি পাইলেন, লেখক—১৯ বৎসর বয়স্ক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক।

"* * * আমি ভদ্রঘরের সন্তান। গত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ-মাধ্যমিক-শিক্ষাপরিষদ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাস্তুহারা হইয়া ভারতে আসি এবং গত ১৯৫৪ সালে... মহাবিদ্যালয়ে I. A. পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু ১ বৎসর পরে অর্থাভাবে পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য হই। তৎপর বাড়ীতে থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতে থাকি এবং সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করি। গত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ হইতে সারস্বত ব্যাকরণের প্রথম (আগু) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং এই বৎসর (১৯৫৬) কাব্যের প্রথম পরীক্ষা দিয়াছি।

প্রায় বৎসরাধিক কাল হইল বিভিন্ন স্থানে চাকুরির চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছি। প্রথম কারণ কোন বিভাগেই আমার বিশেষ আত্মীয়-স্বজন নাই এবং দ্বিতীয় কারণ এই জেলায় বিশেষ কোন কলকারখানা ও অফিসাদি না থাকায় চাকরি হইবার সম্ভাবনা নাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বহু দরখাস্ত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির কোন উত্তর পাই নাই এবং কতকগুলি কলিকাতায় যাইয়া নিজব্যয়ে ইণ্টারভিউ দিতে লিখিয়াছিল। আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাহাতে কলিকাতায় কেবলমাত্র ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়া অসম্ভব। হয়ত চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে বাবা, মা ভাইবোনদের মৃত্যু দেখিতে হইবে এবং আমাকেও আত্মহত্যা করিতে হইবে। বর্তমানে জীবনধারণের উপযোগী যে কোন চাকরি পাইলে সংস্কৃত পড়িতে পারিতাম এবং হয়ত বাড়ীর দুই এক জনকে বাঁচাইতে পারিতাম।"

সমীরবাবু ভাবিতে লাগিলেন সকালের ও বিকালের ছবি দুটি কত বিপরীত! একদিকে কলেজেপড়া, প্রাইভেট টিউশনি, চাকরির চেষ্টা, ইণ্টারভিউ—ভদ্র বাঙ্গালী যুবকের আত্মগ্লানি, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ; অপরদিকে স্বাবলম্বন, কায়িকশ্রমনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দ্বিধাহীন শঙ্কাহীন সাফল্যে আলোকিত অযোধ্যা-সিংএর সহজ দুনিয়া। হয়তো এই দ্বিতীয় ছবিতে কবিতা নাই, সাহিত্য নাই, 'সংস্কৃতি' নাই কিন্তু মা ভাইবোনদের মৃত্যু এবং আত্মহত্যার সঙ্কল্পও তো নাই!

সংস্কৃত ভাষার বলিষ্ঠ প্রভাব

গত ১৬ই শ্রাবণ (১লা আগস্ট, ১৯৫৬) পুণা, ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা মন্দিরে শ্রীজওহরলাল নেহরু সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীরই উপযুক্ত। উক্ত গবেষণা মন্দির হইতে মহাভারতের শান্তিপর্ব ও শল্যপর্ব সংক্রান্ত তিন খণ্ড সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হইয়াছিল এবং শ্রীনেহরু উহাতে বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন, শান্তিপর্ব সংক্রান্ত গ্রন্থটি পাঠ

করিলে আমাদের মন মহাভারতের সেই বিরাট যুগ ও পটভূমিকার দিকে ধাবিত হইয়া যায়—যখন আমাদের প্রাচীন রাজা ও রাজ্যসমূহ ছিল। সেই রাজা এবং রাজত্ব ধ্বংস হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মহাভারত একটি বিপুল মহাকাব্য হিসাবে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে এবং দেশের কোন পরিকল্পনায় রাজনীতিকদের ভূমিকার গুরুত্ব অপেক্ষাও উহার মূল্য অধিক স্বীকৃত হইবে।

ভাব ও চিন্তাজগতে ভারতের গৌরব যে সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়াই আসিয়াছে সেই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বলেন—

"সংস্কৃত ভাষা অতীত ভারতের একটি বিশিষ্ট রূপই নয়, ভারতের হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। * * * বিশ্বে ধ্যান ধারণা অপেক্ষা শক্তিশালী আর কিছু নাই। কখনও কখনও কাজের প্রয়োজন, কিন্তু চিন্তাই অধিকতর প্রয়োজন। মানুষের চিন্তাধারাকে যে ভাষা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল এবং মানুষকে জ্ঞান বিতরণ করিল একমাত্র সেই ভাষাই শক্তিশালী। সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতীয় জনগণের সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশী বিকাশ হইয়াছে। ভারতকে রাজনৈতিক সত্তার দিক হইতে সম্প্রসারিত করা কিংবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু এই মৌলিক ভাষাটি সমগ্রভাবে ভারতের উপর প্রভাব চালাইয়া যাইবে। * * * যুগ যুগ ধরিয়া শুধু ভারতই নহে, সমগ্র পণ্ডিত ও মনীষীরা সংস্কৃতকে শ্রদ্ধার আসন দিয়া আসিয়াছেন।"

সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী আশাবাদী। সংস্কৃত তথাকথিতভাবে আজ একটি কথ্য ভাষা না হইলেও এতকাল ইহা যে মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে ভবিষ্যতেও যে ঐ মর্যাদা পাইয়া চলিবে এই বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। ইহা অতীতের ন্যায় আগামী দিনেও ভারতের একটি অমূল্য ভাষা থাকিবে।

পাঠকের পত্র

হাওড়া হইতে জনৈক পাঠক লিখিতেছেন—

"আষাঢ় মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'ইচ্ছাশক্তির প্রভাব' প্রবন্ধে তাঁহার পিতৃদেবের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবকে নিঃসন্দেহ মনে গ্রহণ করিয়াও আমরা বিস্মিত হইয়াছি এইরূপ একটি 'Mystic' প্রবন্ধ কেমন করিয়া 'উদ্বোধনে' স্থান পাইল!

সিদ্ধাই যে ঈশ্বর লাভের অন্তরায় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে নিঃস্ব করিয়া দিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের নিকট। ইচ্ছাশক্তির অভাব হইলে কোনও মহৎ কার্যই সম্পন্ন হয় না কিন্তু ইহার প্রভাব সিদ্ধাইরূপে আসিয়া পড়ার লোভ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ অনেক সময় ধ্যানজপ পর্যন্ত বন্ধ রাখিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'ইচ্ছাশক্তির প্রভাব' অনেকের নিকট সিদ্ধাইয়ের নামান্তর বলিয়া বোধ হইবে। * * *"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহাকে 'সিদ্ধাই' বলিতেন এবং সাধককে যাহা হইতে সতর্ক থাকিতে বলিতেন উহারই মহিমা প্রচারের জন্য আলোচ্য প্রবন্ধটি আমরা ছাপি নাই। রজস্তম দ্বারা আচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত মনকে সাত্ত্বিক চিন্তা ও অভ্যাস দ্বারা যদি শান্ত ও সংযত করা যায় তাহা হইলে উহার শক্তি কত বৃদ্ধি পায় মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে এই বিষয়ের বিস্তারিত দিগ্‌দর্শন আছে। মনঃশক্তির এই দূরপ্রসারী সম্ভাবনা নিশ্চিতই বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনার যোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিরই নির্ণায়ক হিসাবে আমরা নিত্যরঞ্জনবাবুর প্রামাণিক তথ্য-সম্বলিত লেখাটি প্রকাশ করিয়াছি।

৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সাত্ত্বিক প্রকৃতির জন্যই তাঁহার গুরু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাকে অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিলাভের আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, মনোরঞ্জন বাবু কখনও এই শক্তির অপপ্রয়োগ করিবেন না, শুধু নিঃস্বার্থ আর্তসেবার জন্যই প্রয়োগ করিবেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পড়িলে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আমাদের বিচারে লেখাটির মধ্যে 'ইচ্ছাশক্তির প্রভাব' যেমন প্রকাশ পাইয়াছে তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে সাধন-জীবনে ঈশ্বরনির্ভরতা, গুরূপদেশনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ ও নিরভিমান লোকসেবাব্রতের আদর্শ।

শিলাব্রহ্ম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ব্রহ্মজ্ঞানীরা জেনেছেন শুনি
বর্ণিতে তোমা পাননি বাণী।
মূঢ় অভাজন আমিও তোমারে কিছু ত জানি।

আমার অন্তু ভাব হতে রূপে
ধাপে ধাপে তুমি এসেছ নামি
শেষে মোর ঘরে গিয়েছ থামি।

ঋষিরা হেরিল তোমা "আদিত্য-
বর্ণোজ্জ্বল তামস পারে
অজ অমূর্ত অমনা দিব্য
অপ্রাণ সিত পুরুষাকারে।

দশ দিক তব কর্ণযুগল
শীর্ষ তোমার স্বর্গলোক,
বেদ তব বাক্, বায়ু তব প্রাণ
তপন চন্দ্র তোমার চোখ,
সর্বভূতের অন্তরাত্মা
মহীতল তব পদোদ্ভব,
নিখিল বিশ্ব হৃদয় তব।"

এই ঘোর রূপ সংবরি তুমি
হোতার হোত্রে লভিলে হবি,
দেব হিরণ্যগর্ভের রূপে
বন্দিল তোমা বেদের কবি।

পার্থেরে তুমি দেখালে যেরূপ
কুরুক্ষেত্র-রথের 'পরে,
সে রূপ হেরিয়া শতরণজয়ী
সে বীর তরাসে কাঁপিয়া মরে।

পুরাণ হেরিল শেষ শয্যায়
প্রলয়সাগরে, পদ্মনাভ!
তাহাতে মূঢ়ের কি হ'লো লাভ?

চক্র-শঙ্খ-গদা-পঙ্কজ
ধরিয়া তোমার চতুর্ভুজে,
ভক্তের ধ্যানে উদিলে একদা
হেরিল তাহারা চক্ষু বুজে।

ধ্যান হতে তুমি নামিলে রূপে
পূজিত হইলে ফুলচন্দনে প্রদীপে ধূপে
বিরাট দেউলে রত্নবেদীতে
ঐশ্বর্যের আবেষ্টনে।
কৃপা ত হলো না মূঢ় দীন হীন এ অভাজনে।

হাসিয়া তখন দ্বিভুজে ধরিলে
মুরলী, তাহার শুনিনু তান
আরো কাছে পেতে চাহিল প্রাণ।

বুঝেছি মহতো মহীয়ান তুমি
অণোরণীয়ান তাও যে প্রভু,
যত বড় হও ছোট হতে তুমি পারো যে তবু।
বেদ-বেদান্তে একলা থাকিবে কেমন ক'রে?
আমি তোমা চাই, আরো বেশি তুমি চাও যে মোরে।

শালগ্রামের রূপ ধরি শেষে
আসিলে আমার খড়ের ঘরে।
বিরাজ করিছ তুলসীপত্র শয্যা'পরে।

ঋষিরা তোমারে জেনেছেন ভালো
আমি রই হয়ে কৃতাঞ্জলি।
একেবারে তোমা চিনিনা এখন কি ক'রে বলি।

"নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা হ'লে সংসার-রূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, দুধ জলে মিশিয়ে যাবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

কৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্বে অপ্রকাশিত)

[স্বামিজী এই বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে। বক্তৃতাকালে আইডা আনসেল (Ida Ansell) নাম্নী জনৈকা শ্রোত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অনুধ্যানের জন্য ইহার সাঙ্কেতিক লিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি ভাষণটি প্রকাশের জন্য ইহার সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করেন। মূল ইংরেজী বক্তৃতাটি Vedanta and the West (হলিউড, বেদান্ত সোসাইটির মুখপত্র) পত্রিকায় জানুআরি-ফেব্রুআরি, ১৯৫৬ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর ভাষণের কথাগুলি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই সেখানে ...... চিহ্ন দেওয়া আছে। ( ) প্রথম বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ স্বামীজীর ভাব পরিস্ফুটনের জন্য লিপিকার কর্তৃক সন্নিবেশিত।]

যে কারণ-পরম্পরার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান, প্রায় সেইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুধু ইহাই নয়, তদানীন্তন ঘটনাবলী বর্তমানেও আমরা ঘটিতে দেখি।

কোন নির্দিষ্ট আদর্শ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, মানবজাতির একটি বৃহৎ অংশ এই আদর্শে পৌঁছিতে পারে না, উহা ধারণাতেও আনিতে পারে না।······ যাঁহারা শক্তিমান তাঁহারা ঐ আদর্শ অনুযায়ী চলেন, অনেক সময়েই অক্ষমদিগের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশ পায় না। শক্তিমানের নিকট দুর্বল তো শুধু কৃপারই পাত্র! শক্তিমানরাই আগাইয়া যান।··· অবশ্য ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সাহায্যপরায়ণ হওয়াই উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিকগণ আমাদের হৃদয়বান্ হওয়ার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ান। এখানকার এই কয়েক বৎসরের অস্তিত্ব দ্বারা এখনই সমুদয় অনন্ত জীবনটি নির্দিষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে—এই মতের যদি অনুসরণ করিতে হয়······তবে ইহা আমাদের কাছে বিশেষ নৈরাশ্যসূচকই হইবে······এবং দুর্বল-গণের দিকে আমাদের ফিরিয়া তাকাইবার অবসরই থাকিবে না। কিন্তু এই মত স্বীকার যদি অবশ্যম্ভাবী না হয়—পূর্ণতালাভের জন্য আমাদের অবশ্য-অতিক্রমণীয় বহু অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রের মধ্যে এই জগৎ যদি একটিমাত্র শিক্ষালয়ই হয়, অনন্ত জীবন যদি শাশ্বত নিয়ম অনুযায়ীই গঠিত, রূপায়িত এবং পরিচালিত হইতে থাকে আর শাশ্বত নিয়ম ও অপরিমিত সুযোগ যদি প্রত্যেকের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহা হইলে তো আমাদের তাড়াহুড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমবেদনা জানাইবার, চারিদিকে চাহিবার এবং দুর্বলকে সহায়তা দিয়া তুলিয়া ধরিবার সময় সেক্ষেত্রে আমাদের তো প্রচুরই রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে সংস্কৃতে আমরা দুইটি শব্দ পাই; একটির অনুবাদ—'ধর্ম', অপরটির—'সম্প্রদায়'। ইহা খুবই বিস্ময়কর যে, শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বংশধরগণের অবলম্বিত ধর্মের কোন নাম নাই, (যদিও) বিদেশীরা ইহাকে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বলিয়া অভিহিত করেন। 'ধর্ম' বস্তুটি একই, তবে 'সম্প্রদায়' অনেক। যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের একটি নাম দিতে যাও, ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া অন্যান্য হইতে আলাদা করিয়া ফেল, তৎক্ষণাৎ উহা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, উহা তখন আর ধর্ম থাকে না। সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই (প্রচার করে) এবং ইহাও ঘোষণা করিতে ছাড়ে না যে উহাই একমাত্র সত্য, অন্যত্র কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে ধর্ম বলে যে, জগতে একটিমাত্র ধর্মই হইয়াছে এবং একটিই আছে। দুইটি ধর্ম কখনও ছিল না। একই ধর্ম বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন

দিক (উদ্‌ঘাটিত করিতেছে)। আমাদের কাজ হইল মানবজাতির লক্ষ্য এবং তাহার বিকাশের সুযোগ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা।

ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মহৎ কীর্তি : আমাদের চক্ষুকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখানো। যে বৃহৎ হৃদয় সর্বপ্রথম সকলের মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল সে তো তাঁহারই, প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কথা তো তাঁহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল।

এই যে কৃষ্ণ—ইনি বুদ্ধের কয়েক সহস্রবর্ষের পূর্ববর্তী। এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাসবান্ নন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস—প্রাচীন সূর্যোপাসনা হইতেই (শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলিত হইয়াছে।) সম্ভবতঃ কৃষ্ণ নামের বহু ব্যক্তি ছিলেন। এক কৃষ্ণের বিষয় উপনিষদে উল্লেখ আছে, একজন কৃষ্ণ ছিলেন রাজা, আর একজন সেনাপতি। সবগুলি এক কৃষ্ণে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। ব্যাপার এই যে, যখন এমন কেহ একজন আবির্ভূত হন যিনি আধ্যাত্মিকতায় অনুপম তখন নানাপ্রকার পৌরাণিক কাহিনী তাঁহাকে ঘিরিয়া রচিত হয়। কিন্তু বাইবেল প্রভৃতি যত ধর্মগ্রন্থ এবং উপাখ্যান-সমূহ যাহা এইরূপ এক ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়—ঐগুলিকে তাঁহার চরিত্রের (ছাঁচে) নূতন করিয়া ঢালা প্রয়োজন। বাইবেলের নিউ টেস্টা-মেণ্টের গল্পগুলি খ্রীষ্টের জীবন (এবং) চরিত্রের আলোকেই রূপায়িত করা উচিত। বুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় সমস্ত কাহিনীতেই পরের জন্য ত্যাগ—তাঁহার সমগ্র জীবনের এই প্রধান সুরটি বজায় রাখা হইয়াছে।·····

কৃষ্ণের মধ্যে আমরা পাই······তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাব : প্রথম—বিভিন্ন মতের সমন্বয়; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও পূর্ণতায় অর্থাৎ চরমলক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। ফলতঃ কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাচীন পুরোহিতকুলের ঢংঢাং, আড়ম্বর ও ক্রিয়াকলাপাদির অসারতা কৃষ্ণের সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল, তথাপি এই সমস্তের মধ্যে তিনি কিছু ভালও দেখিয়াছিলেন।

তুমি যদি শক্তিধর হও, উত্তম। কিন্তু তাই বলিয়া, যে তোমার মত বলবান নয় তাহাকে অভিশাপ দিও না।······ প্রত্যেকে এই কথাই বলিয়া থাকে, "হতভাগ্য লোক তোমরা!" কে আর বলে, "আহা আমি কী হতভাগ্য যে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেছি না?" লোকেরা নিজ নিজ সামর্থ্য, সঙ্গতি ও জ্ঞান অনুযায়ী যতদূর করিবার ঠিকই করিতেছে, কিন্তু কী আফশোষ, "আমি তো তাহাদিগকে নিজের স্তরে টানিয়া তুলিতে পারিতেছি না!

তাই কৃষ্ণ বলিলেন, আচার-অনুষ্ঠান, দেবার্চনা, পুরাণকথা এ সকল ঠিকই।······ কেন? কারণ তাহারা একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। ক্রিয়া-কলাপ, শাস্ত্র, প্রতীক—এ সবই সমগ্র শিকলটির এক একটি কড়া। উহা শক্ত করিয়া ধর। দরকার ইহাই। যদি তুমি অকপট হও আর যদি শিকলের একটি কড়াও ধরিতে পারিয়া থাক তবে ছাড়িয়া দিও না, শিকলের বাকী অংশটুকুও তোমার কাছে আসিতে বাধ্য। (কিন্তু লোকে) ধরিতে চায় না। তাহারা কেবল ঝগড়া-বিবাদে এবং কোন্‌টি ধরিব এই বিচারেই সময় কাটায়, ফলে কোন কিছুই ধরা আর হয় না।······সর্বদা আমরা সত্যকে 'খুঁজিয়াই' বেড়াই, কিন্তু উহা 'লাভ' করিতে চাই না। আমরা চাই শুধু ঘুরিয়া বেড়ানো ও খোঁজখবর করার মজা। আমাদের প্রচুর শক্তি

এইভাবেই ব্যয়িত হইতেছে। সেইজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন,—একই কেন্দ্র হইতে প্রসারিত শৃঙ্খল-গুলির যে কোন একটি ধরিয়া ফেল। কোন একটি পদক্ষেপ অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ নয়।...... কোন ধর্মমতকে নিন্দা করিও না, যতক্ষণ ইহাতে আন্তরিকতা থাকে। যে কোন একটি কড়া জোর করিয়া ধর, তাহা হইলে উহা তোমাকে কেন্দ্রে টানিয়া লইয়া যাইবে।...... তোমার নিজের হৃদয়ই বাকী যাহা কিছু সব বলিয়া দিবে। অন্তরের গুরুই সকল মত, সমস্ত দর্শন উদ্ঘাটন করিবেন।

খ্রীষ্টের মতো কৃষ্ণও নিজেকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। নিজের মধ্যে তিনি দেবতাকে দর্শন করিয়াছিলেন। বলিলেন,—"এক দিনের জন্যও আমার পন্থার বাহিরে যাইবার কাহারও সাধ্য নাই। সকলকেই আমার কাছে আসিতে হইবে। যে কোন আকৃতির উপাসনা করুক না কেন আমি উপাসকের সেই উপাস্যের উপর বিশ্বাস দিই এবং ঐ আকৃতির মধ্য দিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত হই।......" শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

কৃষ্ণ নিজের স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই নির্ভীক ভঙ্গীতে আমরা ভয় পাইয়া যাই। আমরা তো সব কিছুর উপর নির্ভরশীল......কতক-গুলি মিষ্ট কথা, অনুকূল অবস্থা! যখন আত্মা কিছুরই উপর নির্ভর করিতে চায় না, এমনকি জীবনের উপরও নয়—তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, মনুষ্যত্বের উচ্চতম ভূমি। উপাসনাও এই একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। উপাসনা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ খুব জোর দিয়াছেন—ঈশ্বরের ভজনা।

আমরা জগতে নানাপ্রকার উপাসনা দেখিতে পাই। রুগ্ন ব্যক্তি ভগবানকে খুব ডাকে।...... যাহার ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে সেও ধনলাভের আশায় খুব প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের জন্যই যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। (প্রশ্ন হইতে পারে:) "যদি ঈশ্বর থাকেন তবে এত দুঃখকষ্ট কেন?" ভক্ত বলেন—"......জগতে দুঃখ আছে; (কিন্তু) তাই বলিয়া আমি ভগবানকে ভালবাসিতে ছাড়িব না। আমার (দুঃখ) দূর করিবার জন্য আমি তাঁহার উপাসনা করি না। তাঁহাকে আমি ভালবাসি কেননা তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ।" অন্য (প্রকারের) উপাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের: কিন্তু কৃষ্ণ এইগুলির উপর কোনও দোষারোপ করেন নাই। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা কিছু করা ভাল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে সে একটু একটু করিয়া উন্নত হইতে থাকিবে, ক্রমশঃ তাঁহাকে নিষ্কামভাবে ভালবাসিতে পারিবে।......

সংসারের এই জীবনে কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিব? আমাদের সকলকে কি অরণ্য-গুহায় যাইতে হইবে?...... না, তাহাতে লাভ কিছু নাই? মন যদি বশীভূত না থাকে তবে গুহায় বাস করিলেও কোন ফল হইবে না, কারণ এই একই মন সেখানেও নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। আমরা গুহাতেও দেখিব বিশজন শয়তান, কেননা যত সব শয়তান উহারা তো মনেই। মন বশে থাকিলে আমরা যেখানেই বাস করি না কেন উহা গুহার সমান।

আমাদের নিজেদের মানসিক সংস্কারই আমরা যে জগৎকে দেখিতেছি উহা সৃষ্টি করে। আমাদেরই চিন্তাধারা বস্তুনিচয়কে সুন্দর বা কুৎসিত করে। সমস্ত সংসারটাই রহিয়াছে আমাদের মনের মধ্যে। যথাযথ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে শিখ। প্রথমতঃ এইটি বিশ্বাস কর যে, জগতে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি অর্থ আছে। জগতের প্রতিটি দ্রব্যই সৎ, পবিত্র ও সুন্দর। যদি তোমার চোখে কোন কিছু মন্দ ঠেকে তবে মনে করিয়ো যে সত্যের আলোকে তোমার উহা বুঝা হইতেছে না। সব দোষ নিজের উপর লও। ......যখন আমরা এইরূপ বলিতে প্রলুব্ধ হই যে, জগৎ অধঃপাতে যাইতেছে, তখন

আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত; তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে বস্তুসমূহকে যথাযথ ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দিবারাত্র কর্ম কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"দেখ, আমি জগদীশ্বর, আমার তো কোন কর্তব্য নাই। প্রত্যেক কর্তব্যই বন্ধন। কিন্তু আমি কর্মের জন্যই কর্ম করি। যদি ক্ষণমাত্রও আমি কর্ম হইতে বিরত হই, (সব কিছু বিশৃঙ্খল হইবে)।" অতএব কর্তব্যভাব মাথায় না রাখিয়া কেবল কাজ করিয়া যাও।

এই সংসার যেন একটি খেলা। তোমরা তাঁহার খেলার সাথী। কোন দুঃখ, কোন দুর্গতির কথা না ভাবিয়া কাজ করিয়া চল। কদর্য বস্তিতে এবং সুসজ্জিত বৈঠকখানায় তাঁহারই লীলা দেখ। লোককে উঠাইবার জন্য কর্ম কর। তাহারা যে পাপী বা হীন তাহা বলিয়া নয়; শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলেন না।

জান কি সৎকাজ এত কম হয় কেন? কোন ভদ্রমহিলা একটি বস্তিতে গেলেন। ......তিনি কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন, "আহা, গরীব বেচারীরা, ইহা লইয়া সুখী হও।" ......আবার কোনও সুন্দরী হয়তো রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একজন দরিদ্রকে দেখিলেন এবং কয়েকটি পয়সা তাহার সামনে ছুড়িয়া দিলেন। ইহা কিরূপ অন্যায় ভাব দেখি! আমরা ধন্য যে এই বিষয়ে বাইবেলে ভগবান আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যীশু বলিতেছেন, "যেহেতু তোমরা আমার এই ভ্রাতৃগণের দীনতমের জন্য ইহা করিলে সেজন্য উহা আমারই জন্য করা হইল।" তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার এইরূপ ভাবা নিন্দার কথা। সাহায্য করার ভাবটি মন হইতে দূর করিয়া দাও, তারপর উপাসনা করিতে যাও। ঈশ্বরের সন্তানসন্ততি যে তোমার প্রভুরই পুত্রকন্যা। (সন্তান তো পিতারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি।) তুমি তো তাঁহার সেবক। ......জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা কর! ঈশ্বর তোমার নিকটে অন্ধরূপে, খঞ্জরূপে, দরিদ্ররূপে, দুর্বল বা পাপীর মূর্তিতে আসেন। তোমার উপাসনার কী চমৎকার সুযোগ! যে মুহূর্তে ভাবিলে যে তুমি "সাহায্য" করিতেছ তৎক্ষণাৎ সমস্ত আদর্শটি নষ্ট করিয়া নিজেকে অবনত করিয়া ফেলিলে। এইটি জানিয়া কাজ কর। প্রশ্ন করিবে, "তার পর?" তোমাকে আর হৃদয়-ভেদী ভয়ানক দুঃখে পড়িতে হইবে না।...... তখন আর কর্মবন্ধন থাকিবে না। সব কিছু খেলা হইয়া যাইবে, আনন্দে পরিণত হইবে। কর্ম কর। অনাসক্ত হও। ইহাই সম্পূর্ণ কর্মরহস্য। যদি আসক্ত হও, দুঃখ আসিবে।......

জীবনে আমরা যাহাই করিতে যাই উহার সঙ্গে নিজেদের এক করিয়া ফেলি। একটি লোক কটু কথা শুনাইল, আমার মনে হইতে লাগিল যে ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ক্রোধ এবং আমি এক হইয়া গেলাম—ইহার পরই দুঃখ! • নিজেকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত কর, আর কিছুর সঙ্গে নয়; কারণ আর সব কিছুই অসত্য। যাহা সত্য নয় তাহার প্রতি আসক্তিই দুঃখ আনে। একমাত্র সত্তা বর্তমান যাহা সত্য, একমাত্র জীবন রহিয়াছে যাহাতে গ্রাহ্য নাই (গ্রাহকও) নাই।......

কিন্তু অনাসক্ত ভালবাসায় তোমাকে আঘাত পাইতে হইবে না। যাহা কিছু কর, ক্ষতি নাই। বিবাহ করিতে পার, সন্তান হউক ··· তোমার যাহা খুশি তাহা করিতে বাধা নাই—কিছুই তোমাকে আঘাত দিবে না। "আমার" এই বোধে কিছুই করিও না। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন; কর্মের জন্যই কর্ম। তাহাতে তোমার কি? তুমি নির্লিপ্তভাবে পাশে দাঁড়াইয়া থাক।

যখন আমরা ঐরূপ অনাসক্তি লাভ করি তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। বুঝিতে পারি—কিরূপে এখানে

প্রখর কর্মচাঞ্চল্য ও স্পন্দন, আবার সঙ্গে সঙ্গে চরম শান্তি ও নিস্তব্ধতা; কিভাবে প্রতিক্ষণে কর্ম আবার প্রতিক্ষণে বিশ্রাম। ইহাই সংসারের রহস্য —একই সত্তায় নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তি, একই আধারে অনন্ত এবং সান্ত। তখনই আমরা রহস্যটি আবিষ্কার করিব। "যিনি অনন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে অপার শান্তি দেখিতে পান এবং নিঃসীম নিস্তব্ধতার ভিতর চরমকর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করেন তিনিই যোগী হইয়াছেন।" কেবল তিনিই প্রকৃত কর্মী, আর কেহই নন্। আমরা একটু কাজ করিয়াই ভাঙিয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? আমরা কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া ফেলি বলিয়া। যদি আমরা আসক্ত না হই তাহা হইলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পূর্ণ বিশ্রাম পাইতে পারি।······

এইরূপ অনাসক্তিতে পৌছানো কত কঠিন! সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ ও উপায়গুলির নির্দেশ দিতেছেন। (পুরুষ বা স্ত্রীলোক) প্রত্যেকের পক্ষে সহজতম রাস্তা হইতেছে ফলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন না হইয়া কর্ম করা। বাসনাই বন্ধন সৃষ্টি করে। আমরা যদি কর্মের ফল চাই, তবে শুভ হউক আর অশুভই হউক উহার ফল ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কর্ম না করিয়া ঈশ্বরের মহিমার জন্যই করি তাহা হইলে ফল আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। "কর্মেই তোমার অধিকার কিন্তু ফলে নহে।" সৈনিক ফলের আশা না করিয়া যুদ্ধ করে। সে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। যদি পরাজয় হয় তাহা সেনাপতির,—সৈনিকের নয়। ভালবাসার জন্যই আমরা কর্তব্য পালন করিব—অধ্যক্ষের উপর ভালবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা।······

যদি শক্তি থাকে, বেদান্তদর্শন আলোচনা দ্বারা স্বাধীন হও। তাহা যদি না পার তো ঈশ্বরের ভজনা কর। তাহাও যদি না পার কোন প্রতীকের উপাসনায় ব্রতী হও। ইহাও সামর্থ্যে না কুলাইলে লাভের বিষয় না ভাবিয়া কিছু সৎ কাজ কর। তোমার যাহা কিছু আছে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দাও। যুদ্ধ কর—আগে চল। "যে কেহ ভক্তিভরে আমার পূজাবেদিতে পত্র, জল, এবং একটি পুষ্প অর্পণ করে আমি তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।" যদি তুমি কিছুই না করিতে পার, একটি সৎ কাজও যদি তোমার দ্বারা না হয়, তবে তাঁহার (প্রভুর) শরণ লও। "ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালাইতেছেন। তুমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও ·····।"

শ্রীকৃষ্ণ (গীতায়) ভক্তির আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে যে সব আলোচনা করিয়াছেন এইগুলি উহাদের কয়েকটি। বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের ন্যায় কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রচিত ভক্তিবিষয়ক আরও মহাগ্রন্থ আছে।······

শ্রীকৃষ্ণের জীবন-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। যিশু এবং কৃষ্ণের জীবনে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোন্ চরিত্রটিকে অপরটি হইতে ধার করা হইয়াছে এইরূপ একটি আলোচনা চলিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই পটভূমিতে একজন অত্যাচারী রাজা ছিলেন। উভয়েরই জন্ম হইয়াছিল একই অবস্থায়। দুই-জনেরই মাতাপিতাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। দুইজনকেই দেবদূতেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। উভয়-ক্ষেত্রেই তাঁহাদের জন্মবৎসরে যে শিশুগুলি ভূমিষ্ঠ হয় তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। শৈশবাবস্থাও একই প্রকার।······ আবার পরিণামে উভয়েই অপর কর্তৃক নিহত হন। কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়; তিনি তাঁহার হত্যাকারীকে স্বর্গে পুণ্যগতি লাভের বর দেন। খ্রীষ্টকে যখন হত্যা করা হয় তিনি আততায়ীর মঙ্গল কামনা করেন এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

নিউ টেস্টামেন্ট এবং গীতার উপদেশসমূহে

বহু মিল আছে। মানুষের চিন্তাধারা একই পথে অগ্রসর হয়। ……কৃষ্ণের নিজের কথায় আমি তোমাদিগকে ইহার উত্তর দেখাইতেছি: "যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই আমি অবতীর্ণ হই। বার বার আমি আসি। অতএব যখনই দেখিবে কোন মহাত্মা মানবজাতির উন্নয়নে সচেষ্ট, বুঝিবে আমার আবির্ভাব হইয়াছে এবং পূজা করিবে।……"

কিন্তু তিনি যদি বুদ্ধ বা যিশুরূপে অবতীর্ণ হন তবে ধর্মে ধর্মে কেন এত মতভেদ? তাঁহাদের উপদেশাবলী তো পালন করা উচিত! হিন্দুভক্ত বলিবেন, ঈশ্বর স্বয়ং খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং অন্যান্য আচার্য (লোকগুরু) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক বলিবেন: ইঁহারা মহাপুরুষ এবং নিত্যমুক্ত। সমস্ত জগৎ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া ইঁহারা মুক্ত হইয়াও নিজেদের মুক্তি গ্রহণ করেন না। বার বার তাঁহারা আসেন, নরশরীর ধারণ করেন এবং মানবজাতিকে সাহায্য করেন। শৈশব হইতেই তাঁহাদের স্বরূপের জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকে এবং কি উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অবতরণ সেবিষয়েও তাঁহারা সচেতন থাকেন।…… আমাদের মত বন্ধনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।……নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাঁহারা আসেন। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি স্বতই তাঁহাদিগের ভিতর সঞ্চিত হয়। আমরা ঐ শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারি না। সেই আধ্যাত্মিকতার ঘূর্ণিপ্রবাহ অগণিত নরনারীকে টানিয়া আনে এবং ইহার গতি চলিতেই থাকে কেননা ঐরূপ মহাপুরুষের শক্তি পিছনে রহিয়াছে। তাই যতদিন না সমগ্র মানবজাতির মুক্তি এবং এই পৃথিবী-গ্রহের খেলার পরিসমাপ্তি হয় ততদিন পর্যন্ত ইহা চলিতেই থাকে।

যাঁহাদের জীবন আমরা অনুধ্যান করিতেছি সেই মহাপুরুষগণের নাম মহিমান্বিত হউক! তাঁহারাই তো জগতের জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁহারাই তো আমাদের উপাস্য। ভগবান যদি মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার কাছে উপস্থিত হন তাহা হইলেই কেবল আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি। তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি কই? নরশরীরে সীমান্বিত হইলেই আমাদের পক্ষে তাঁহাকে দেখা সম্ভবপর।…… যদি মানুষ এবং……জীবসমুদয়কে ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া মানি, তাহা হইলে মানবজাতির এই সমস্ত আচার্যকে বলা উচিত নেতা এবং গুরু। অতএব, হে দেববন্দিতচরণ মহাপুরুষগণ, তোমাদিগকে নমস্কার! হে মানুষের পথপ্রদর্শকগণ, তোমাদিগকে নমস্কার! হে মহাশিক্ষকগণ, তোমাদের প্রণাম! হে পরমনায়কগণ, চিরকালের জন্য তোমাদের উদ্দেশে আমাদের প্রণতি!

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগীতা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ

ব্যাসের আশিস্ পেয়ে সঞ্জয় সে দিব্য চক্ষুষ্মান,—
যুগের যজ্ঞাগ্নি-পাশে বসি' একা নিশিদিনমান
অন্ধ নরপতি-কাছে বলিবেন যুদ্ধের বারতা
হ'য়ে আছে স্থিরীকৃত। প্রভাতের আলোময় কথা
সর্ব রণ-ক্ষেত্র ব্যাপী প্রসারিত বিপুল ব্যাপ্তিতে,—
ধ্বংসের ভূমিকা ল'য়ে জাগে যুগ-দেবতার চিতে
সৃষ্টির নূতন ছন্দ;—রণবাদ্য ওই বুঝি বাজে,
কালের সমুদ্রতটে প্রলয়ের ঘন মেঘ সাজে।

সরে গেল যবনিকা সঞ্জয়ের আঁখির সম্মুখে
একটি পলকে যেন, হেরিলেন অদূরের বুকে
অসংখ্য শিবির রাজি,—ধনুর্ধর শত লক্ষ বীর
উন্নত বিশাল বক্ষ, সারি সারি সমুন্নত শির।
দেখিলেন,—দুর্যোধন গিয়া গুরু দ্রোণাচার্য পাশে
রণ-সম্ভারের কথা কহিছেন বিপুল উচ্ছ্বাসে।
বুকে তাঁর বিজয়ের বহু আশা, গতিতে দৃপ্ততা,—
জীবনের আয়োজন বুঝি আজ লভে সার্থকতা
সমর-তরঙ্গ-দোলে প্রান্তরের বীর্যের বন্যায়!
ব্যূহের আকারে ওই পাণ্ডবের সৈন্য দেখা যায়!

সহসা দেখেন চাহি' বিষাদ-ব্যাকুল পার্থ বীর,
শরীরে রোমাঞ্চ তাঁর,...শুষ্ক মুখ, কেমন অস্থির!
জানু পেতে রথ'পরে বসে আছে,—কাতর জিজ্ঞাসা
নয়নের কোণে তাঁর: ফুটে' ওঠে বেদনার ভাষা;—
'হত্যা করি' স্বজনেরে এই যুদ্ধে কি মোর মঙ্গল?'
গাণ্ডীব পড়িছে খসি,'—আঁখি-পদ্ম জলে টলমল!
'হে কৃষ্ণ, চাহিনা জয়, রাজ্যসুখ? সেও তো না চাই,
আচার্য ও পিতামহে বধ করি,' কোন লাভ নাই
বেঁচে এই বিশ্বমাঝে;—হে মাধব, স্বজনের বধে
কি সুখ লভিব আমি? ইহাতে যে বিপুল জগতে
কুলনাশকারী রূপে কলুষিত হ'বে মোর নাম।"
এই বলে' সব্যসাচী বসিলেন ত্যজি' ধনুর্বাণ!

কেশব দাঁড়ায়ে তাঁর সম্মুখেতে,—আয়ত নয়নে
যুগ-চেতনার দৃষ্টি, কি দেখেন দিগন্তের কোণে?
জানু স্পর্শি বাম বাহু ধরে' আছে পাঞ্চজন্যখানি,
অভয়ের ভঙ্গী নিয়ে ডান হাত,—স্বর্গলোক ছানি'
কী যেন অমৃত-বার্তা দিয়ে যায় সম্মুখে তাঁহার!
নব-দূর্বাদলশ্যাম দেহ হ'তে জ্যোতির বিথার
কেবল ছড়া'য়ে যায় শাশ্বতের বিপুল মহিমা!
অনন্তের অন্তহীন সত্যবোধ পার হয়ে সীমা
অসীমের রূপলোকে সে-ইংগিতে পায় অধিষ্ঠান!
তামস সে দূরে যায়, রজঃ লভে সত্ত্বের সম্মান!

নাই সেথা দুর্বলতা, পৌরুষ-হীনতা কিছু নাই—
সেথা মৃত্যু স্বর্গ আনে, যুদ্ধ জয় আহ্বান জানায়
সসাগরা ধরণীরে!—নশ্বরত্ব নাহিক আত্মার,
এ-অমৃত বার্তা আসে, সে-অমৃত রূপ হ'তে তাঁর!
সর্বশাস্ত্র-সমাহৃত আনন্দের স্বরূপ সুন্দর;
সাংখ্য আর পাতঞ্জল সমন্বয় লভে পর পর!
সে-বালক নচিকেতা,—মৃত্যুর অন্বেষা তাঁর এসে
এ-রূপের পদপ্রান্তে এক সুর নিয়ে যেন মেশে!
কর্ম আসে কামহীন, ভক্তির আলোকে মধুময়—
জ্ঞান মিলে রচে হেথা মুক্তির সে ত্রিবেণী অক্ষয়;
যখন অধর্ম আসে, এ-রূপের ঘটে আবির্ভাব
দুষ্কৃতের শাস্তি দিতে,—এ-অভয় জীবনের লাভ।

এ-রূপ অক্ষর কভু, অব্যক্ত, ব্যক্ত বা কভু জাগে,
অধ্যাত্মের জ্যোতি তাই আলিঙ্গনে নিত্য বেঁধে রাখে!
হৃষীকেশ বলে তাই—'সব্যসাচি, বধিছ কাহারে?'
অর্জুন চমকি' জাগে,—দেখে তাঁর জাগে চারিধারে
অসংখ্য বদন নেত্র, সংখ্যাহীন দিব্য আভরণ,
দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যমাল্যে মূর্তি সুশোভন,
সহস্র সূর্যের প্রভা সে-রূপেরে করে দীপ্তিমান,
সমগ্র জগৎ ভাসে,—সে-রূপের লীলা অফুরান্।
সে-দেহে দেবর্ষি জাগে, ব্রহ্মার যে সেথা পদ্মাসন,
অব্যয় পরম বেদ্য, সে-পুরুষ নিত্য সনাতন!
মুখে জ্বলে হুতাশন, বিশ্বভূমি তেজে তপ্ত তাঁর,
আদি মধ্য অবসান, নাই নাই কোথা নাই আর!
সে-রূপের দেহ হ'তে বিশ্বে হয় তাপ সঞ্চারিত,
এ-বিশ্বেরে গ্রাস করি' পুনর্বার করে আলোকিত!

এ-রূপ দেখিল পার্থ,—জানিল সে নিজ পরিচয়,
যুগের সন্ধ্যায় জাগা অভয়ের কান্তি মধুময়!
গেল ভীষ্ম, গেল দ্রোণ, গেল কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন,—
ধ্বংসের হোমাগ্নি কুণ্ডে, সৃষ্টির সে বীজ উচ্চারণ!
পাঞ্চজন্য শংখ বাজে, সুর জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিতা,—
কুরুক্ষেত্র হতে জাগে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীগীতা।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম

স্বামী জীবানন্দ

জগৎপালক ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং নরশরীরে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন করে চলেছি; যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে, যতদিন মানব-সভ্যতা সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে মহান্ ঐক্য রাখবে ততদিন এই পুণ্য তিথিটি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হবে না।

দানবরাজ কংসের অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত। এই উৎপীড়ন আর দীর্ঘকালের অনাচারে সাধারণের মধ্য থেকে ধর্মভাব নষ্ট হতে চলেছে। ধর্মপরায়ণতার অভাবে ভোগবাসনার বৃদ্ধি ও অজ্ঞানতার রাজত্ব! তাই প্রয়োজন হয়েছে নতুন করে শাস্ত্রব্যাখ্যার, নিজের মহাব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবনের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির তাৎপর্য নির্ণয়ের। আবশ্যক হয়েছে ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও অহিংসা, কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস—এই সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ ভাব ও আদর্শের সমন্বয়সাধনের। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পরস্পর-বিবদমান রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠাও তো চাই!

নিষ্ঠুর কংসের কারাগারে মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেব শৃঙ্খলিত। সেখানে সেই লৌহময় কঠিন কারাকক্ষে জন্ম হবে ভগবানের! জগতে কত সুন্দর সুন্দর স্থান রয়েছে তবে কারাগারে জন্ম কেন? সমস্ত বন্ধনের মোচনকর্তা যিনি, যাঁকে পেলে সব চাওয়া-পাওয়ার অবসান হয়ে যায়, তিনি কি জগতের কঠিনতম বন্ধনস্থান বন্দিশালাকে পবিত্র করার জন্যই এখানে জন্ম নিচ্ছেন?

সাধারণ মানুষের চেয়ে যখন কোন পুণ্যবান পুরুষের জন্ম হয় তখনই প্রকৃতির মধ্যে নানা শুভ লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর যখন স্বয়ং শ্রীভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন তখন যে কত অলৌকিক শুভ সূচনা দেখা যাবে তা আর আশ্চর্য কি? মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধির বিচারে এগুলি হয়তো অবিশ্বাস্য। তবু যেন কারুর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই যখন এ সব ঘটে থাকে তখন মুগ্ধ মানব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী* তিথি। নিশীথ রাত্রি। ঘোর অন্ধকারে ধরণী সমাচ্ছন্ন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি, উর্ধ্ব, অধঃ দশ দিকই হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সর্বত্রই আনন্দের তরঙ্গ। ভাদ্র মাস। ভরা বর্ষা। কানায় কানায় পূর্ণ নদীগুলি তাই আবিল, কিন্তু সে আবিলতা ক্ষণমধ্যেই যেন কোথায় অন্তর্হিত হল—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী স্বচ্ছতোয়া। সরোবরগুলিতে শত শত পদ্ম ফুটতে লাগল। বনের বৃক্ষলতায় অসংখ্য ফুল। ফুলে ফুলে মধুমক্ষিকা মধুপানরত। ভ্রমরের গুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত। পবিত্র সমীরণ কী সুখস্পর্শ! ব্রাহ্মণগণের নির্বাপিতপ্রায় যজ্ঞাগ্নি সহসা প্রদীপ্ত হয়ে গেল।

শুধু বহির্জগতেই কি আনন্দের পরিপ্লাবন? সাধু-মহাত্মাদের অন্তরেও অভূতপূর্ব আনন্দ! জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ত্রিলোকেই অপ্রত্যাশিত আনন্দানুভূতি। স্বর্গে দুন্দুভিনিনাদ হল। দেবতা ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

"মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি।"

ভাগবত, ১০।৫

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

* রোহিণ্যামথ রাত্রে চ যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
তস্যামভ্যর্চনং শৌরেহন্তি পাপং ত্রিজন্মকম্॥ (ভবিষ্যপুরাণ)
রোহিণীনক্ষত্রের সঙ্গে অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মিলন-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মগত পাপ বিনাশ করে।

মুহুর্মুহু মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছে। সর্বান্তর্যামী বিষ্ণুভগবান্ জন্ম গ্রহণ করলেন দেবরূপিণী জননীর গর্ভ থেকে।

বসুদেব দেখলেন এক অপূর্ব শিশু। কমলনেত্র, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলায় কৌস্তুভমণি, পীতাম্বর, নবীন মেঘের মত শ্যামবর্ণ। মাথায় মণিখচিত মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল। অলকরাজির কী শোভা! উজ্জ্বল চন্দ্রহার, কেয়ূরকঙ্কণ—কত অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ সুশোভিত।

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং
শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং
সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব
ঐক্ষত॥"

ভাগবত, ১০।৩, ১০

কে এই শিশু? বসুদেব দীর্ঘকাল যাঁর ধ্যান করেছেন, যাঁর স্মরণ-মননে দিবারাত্র কাটাচ্ছেন, যাঁর চিন্তায় কঠিন বন্দিদশাতেও তিনি ধীর স্থির অচঞ্চল—এই তো সেই! এ যে স্বয়ং বিষ্ণু শিশুরূপে অবতীর্ণ! কারাগার আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। এমন তো কখনও দেখা যায় না। বসুদেব ভুলে গেলেন অপত্যস্নেহ—তিনি ভগবৎভাবে বিভোর হয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন।

"হে ভগবান, আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি যে আপনি আনন্দস্বরূপ, চিদ্ঘনমূর্তি, আবরণশূন্য সকলের আত্মা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনুস্যূত থাকলেও আপনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অবিকারী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ রজোগুণে আপনারই মায়াবলে সৃষ্ট, সত্ত্বগুণে বিশ্বপালন আপনিই করছেন আর তমোগুণে লয়কার্য আপনার দ্বারাই হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তো আপনারই বিভিন্ন রূপ।

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু
বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা
জনাত্যয়ে॥

ভাগবত, ১০।২০

আপনি সকল লোককে রক্ষা করতে ইচ্ছা করে এখানে জন্ম নিয়েছেন। দুষ্ট কংস আমার গৃহে আপনার জন্ম হবে এই কথা শুনে আপনার অগ্রজগণকে নিধন করেছে। আপনি জন্মেছেন জানলেই সে এখনই ছুটে আসবে অস্ত্র উদ্যত করে।"

বিশুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিতা জননী দেবকীও নবজাতকে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখে বুঝলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণুই তাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, "হে সর্বেশ্বর, প্রলয়কালে সমুদয় চরাচর বিনষ্ট হলে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। মরণশীল মানুষের মৃত্যুভয় স্বাভাবিক, সকলের আশ্রয় আপনি ছাড়া তার আর কোন নির্ভয় স্থান নেই। ক্রূরস্বভাব উগ্রসেনপুত্র কংসের ভয়ে আমরা ভীত। আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হচ্ছে। পাপিষ্ঠ কংস যেন জানতে না পারে যে আপনি আমার গর্ভজাত। আপনি ভয়হারী, আপনার শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত চতুর্ভুজান্বিত ধ্যানাস্পদ অলৌকিক ঐশ্বর রূপ উপসংহার করুন।"

দেবকী কংসরোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্তে প্রার্থনা জানিয়েছেন, অন্তর্যামী হরি তাই জননীকে আশ্বাস দিতে চান পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে।

অপূর্ব শিশুর মুখ হতে অপূর্ব বাণী নির্গত হল। "মা, এই জন্মেই আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছি তা নয়, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর যখন বর্তমান ছিল, সেই সময়ও আমি তোমার পুত্র হয়েছিলাম। জন্ম জন্মান্তরে আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার জননী। তুমি নিজেকে অত দীনহীন মনে করো না, তুমি তো সাধারণ মানবী নও। ব্রহ্মার আদেশে প্রজা-সৃষ্টির জন্তে তোমরা কঠোর তপস্যা করেছিলে।

সায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমি ছিলে পৃশ্নি, বসুদেব ছিলেন সুতপা প্রজাপতি। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় সমভাবে চলেছিল তোমাদের সুকঠিন তপস্যা, প্রাণায়ামে তোমাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অভীষ্ট লাভের জন্যে গলিত পত্র ও বায়ুমাত্র আহার করে তোমরা আমার আরাধনায় রত ছিলে। এইরূপ কঠোর তপস্যায় তোমাদের বহুবর্ষ অতীত হয়েছিল। প্রতিনিয়ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ে আমাকে ধ্যান করায় আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলে তোমরা 'আমার মত' সন্তান প্রার্থনা করেছিলে। এই সংসারে আমার ন্যায় গুণসম্পন্ন আর কে আছে? তাই আমিই তোমাদের পুত্র হয়ে পৃশ্নিপুত্রনামে পরিচিত হই। দ্বিতীয় জন্মে তোমরা কশ্যপ ও অদিতিরূপে আমাকেই পুত্ররূপে কামনা করায় আমি আবার তোমাদের পুত্র হয়ে জন্মাই। উপেন্দ্র নামে তখন বিখ্যাত হয়েছিলাম, অত্যন্ত খর্বাকৃতি হওয়ায় 'বামন' নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করি। ইহাই আমার বামন অবতার। এই আমার তৃতীয় জন্ম, এবারেও আমি তোমাদের কাছেই এসেছি, কারণ তোমাদের মতো সুকৃতিপরায়ণ আর কোথায়? আমার কথা সত্য ব'লে জেনো। আমার পূর্ব পূর্ব জন্ম স্মরণ করাবার জন্যে আমি আমার চতুর্ভুজ মূর্তি তোমাদের দেখালাম, দ্বিভুজ প্রাকৃত মানুষের মত আকার দেখে তোমরা আমাকে চিনতে পারতে না। তোমরা দুজনে আমার উপর স্নেহবশতঃ পুত্রভাবেই হোক আর ব্রহ্মভাবেই হোক একবার মাত্র চিন্তা করলেই পরমা গতি প্রাপ্ত হবে।"

"যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্‌॥"

ভাগবত, ১০।৪৫

এই কথা বলে শিশুরূপী ভগবান নীরব হয়ে আত্মমায়া দ্বারা দ্বিভুজ বালকে পরিণত হলেন। যেন অতি সাধারণ অসহায় মানবশিশু! মাতাপিতার সামনেই এই অলৌকিক দৃশ্য সংঘটিত হল।

'আমাকে নন্দগোপগৃহে নিয়ে চল'।—এইরূপ ভগবৎপ্রেরণায় বসুদেব সযত্নে শিশুকে কোলে নিয়ে কারাগারগৃহ-সূতিকাগার থেকে নির্গমনের ইচ্ছা করলেন।

অচিন্ত্য যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপালগণের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত, তারা জাগ্রত থেকেও অচেতন-প্রায়। পুরবাসীরাও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত।

কারাকক্ষের বৃহৎ কপাট লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। বসুদেব পুত্রহস্তে দরজার কাছে এলেন। আপনা হতেই দরজা খুলে গেল। এ কী দৈবী মায়া!

বসুদেব নিঃশব্দে অগ্রসর হতে লাগলেন। আকাশে গুরুগুরু মেঘগর্জন হচ্ছে—অবিশ্রান্ত বর্ষণ। মহাপ্রলয় হবে নাকি? অনন্তদেব শেষনাগ নিজের ফণা বিস্তারে জল নিবারণ করতে করতে পিছনে যেতে লাগল। পথে যমুনা। ভীষণ বারিপাতে গভীর জলরাশির বেগে যমুনা আরও তরঙ্গিত হয়ে উঠল। তরঙ্গসঙ্কুল নদীও বসুদেবের যাওয়ার পথ করে দিতে চায়! সবাই যে আজ ভগবানের স্পর্শব্যাকুল!

শৃগালরূপধারিণী মায়ার নির্দেশিত পথে বসুদেব অক্লেশে দুস্তর যমুনা পার হয়ে নন্দব্রজে উপনীত হলেন। সেখানে দেখলেন সকলেই সুষুপ্তিতে মগ্ন। তখন তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে নিজের পুত্রকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁর নবজাত কন্যাটিকে নিয়ে অন্ধকার লৌহময় কারাকক্ষে ফিরে গেলেন। তারপর দেবকীর শয্যায় শিশুকন্যাটিকে দিয়ে নিজের পদদ্বয়ে লৌহশৃঙ্খল বদ্ধ করে পূর্ববৎ অবস্থান করতে লাগলেন।

নন্দরাণী যশোদা পরিশ্রান্তা, নিদ্রাভিভূতা ও অপগতস্মৃতি হওয়ায় তাঁর নবজাত সন্তানটি পুত্র কি কন্যা তা জানতে পারেন নি।

রজনীপ্রভাতে সূর্যের আলোয় পৃথিবী ঝলমল করে উঠল। সুকুমার পুত্রের চন্দ্রমুখ দর্শনে এসে ব্রজবাসীরা নন্দগৃহকে আনন্দমুখর করে তুলল।

পাঞ্চজন্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোথায় কৃষ্ণ লুকায়ে রয়েছ—আত্মনির্বাসনে
কুরুক্ষেত্রে শেষ কি তোমার জীবনের লীলাখেলা,
অর্জুন-সখা, কোন মথুরায় কিসের আকর্ষণে ?
হিংসাদগ্ধ পৃথিবীর বুঝি শেষ হয়ে আসে বেলা।

ভয়রাশি মনে আকাশে জমিছে কাল-বৈশাখী ঝড়
থম থম করে মহাঅরণ্য আবেগ-রুদ্ধ প্রাণ
আথাল-পাথাল মেঘে মেঘে ডাকে বিদ্যুৎ কড় কড়
ঘূর্ণি হাওয়ার অন্ধ খেয়ালে নাহিক পরিত্রাণ।

সাগরের জলে চেতাইয়া উঠে তরঙ্গ শত শত
ধারা-নিবদ্ধ কলঙ্করেখা দিগন্তে উঠে জাগি'
বালুবেলাভূমে অলস-বিলাস আজিকে তন্দ্রাহত
শ্মশানে বুকে মৃত্যুর শিখা জ্বলিছে আহুতি লাগি।

এর মাঝে তুমি রহিবে শয়ানে আলসে দৃষ্টিহীন
নয়নে তোমার মোহ-অঞ্জন এখনো রয়েছে মাখা,
হে সারথি তব রথের চক্র হয়েছে কি গতিহীন
পাঞ্চজন্য শিয়রে তোমার আছে উপাধানে ঢাকা ?

অলস-শয়ন পরিহরি হরি, দাঁড়াও বাহিরে আসি
পাঞ্চজন্য দক্ষিণ করে তুলে ধর একবার
বাজাও বাজাও চলুক সে ধ্বনি দিক্‌দিগন্তে ভাসি
নিদ্রিত দেশ জাগিয়া উঠুক খুলিয়া রুদ্ধদ্বার।

ইঙ্গিতে তব আসিয়া দাঁড়াক অন্তর নির্ভয়
শিরায় শিরায় রক্তের ধারা উঠুক চঞ্চলিয়া
দৃঢ় বাহুমূলে অমোঘ শক্তি উৎসাহে দুর্জয়
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন উঠুক প্রজ্জ্বলিয়া।

তুমি চল আগে পশ্চাতে তব কোটি কোটি নরনারী
নূতন কুরুক্ষেত্র রচিয়া শুনাও নবীন গীতা,
সুদর্শনের শাণিত শক্তি অলক্ষে সঞ্চারি'
শেষ করে দাও সমুখে শত্রু পিছনে ভণ্ড মিতা!

বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য বাজাও বাজাও হরি
ভয় ভেঙ্গে যাক, দুর্বল মনে আসুক কঠিন পণ
শ্রীকৃষ্ণ তুমি জাগ্রত হও, পাঞ্চজন্য ধরি'
দক্ষিণ হাতে তুলে ধর তুমি শাণিত সুদর্শন।

শ্রীরাধা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসাধনায় ঠাকুরাণী শ্রীরাধা সর্বাগ্রগণ্য তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হয়ে আছেন। দার্শনিক যুক্তি অনুসরণ করে ভক্তগণ শ্রীরাধার প্রামাণ্য নিরূপণে অগ্রসর হয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতা প্রভৃতি নানাবিধ শুরাবলম্বনেই রাধা-কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন করেছেন। এই সমুদয় দার্শনিক যুক্তি ও প্রমাণের অবসরে নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক লীলাকাহিনীও এই রসময়ী শ্রীরাধার প্রতি প্রেমিক ভক্তমাত্রকে একান্ত আকৃষ্ট করেছে।

এর মূলানুসন্ধানের তথ্য থেকে অনুভব করা যায়, ভারতের সর্বস্তরের সাধনপদ্ধতিতেই শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিতত্ত্বও নিঃসংশয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি বেদান্তের কঠোর জ্ঞানসাধনায় ও একক কূটস্থ ব্রহ্মের পক্ষেও অঘটন ঘটান সম্ভব হয়নি—মায়ারূপিণী স্বশক্তিকে অবহেলা করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, সাংখ্যাদিদর্শন বা তন্ত্রাদিতে তো তা সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুর সর্বথা নির্ভরক্ষেত্র সর্বপ্রাচীন বেদশাস্ত্রেই তার স্পষ্ট প্রকাশ বিদ্যমান। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌রূপিণীর ব্রহ্মানুভূতিজনিত দেবীসূক্তে, রাত্রিসূক্তে, অথর্ববেদে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ এবং কেনোপনিষদ্ প্রভৃতিতে শক্তিতত্ত্বের রূপপরিচয় সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে এবং এভাবে মায়া বা ব্রহ্মশক্তিরূপে পৃথক্ প্রকাশসত্ত্বেও তাঁকে ব্রহ্মেরই জ্ঞানবলক্রিয়ারূপা স্বাভাবিকী শক্তির পরিচয়ে উভয়ের অভিন্নতাই উপনিষদে দেখান হয়েছে। অথচ এই অদ্বয় ব্রহ্মেরই একটা কল্পিত ভেদ অনুসরণ করে মায়া ও মায়ী বা শক্তি ও শক্তিমানরূপেই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলকারণতার পরিচয় দেওয়া হয় অর্থাৎ অদ্বয়াবস্থার যে বিভিন্ন প্রকাশ তা' মায়াদ্বারেই সম্ভব—একথা উপনিষদ্‌সিদ্ধ তত্ত্ব।

তা'তে বলা হয়, ব্রহ্মের যে অমোঘ সঙ্কল্প—"স ঐচ্ছৎ", "সোঽকাময়ত" প্রভৃতি,—এই ব্রহ্ম-সঙ্কল্প বা শক্তি একই তত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে সাধকগণ তপস্যাদ্বারা জান্‌তে পেরেছিলেন যে, এই শক্তি আত্মগুণে নিগূঢ়।—"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"। এর প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা জেনেছিলেন—এক অদ্বয়ব্রহ্ম একক অবস্থায় স্বাত্মভূত, তরঙ্গবৎ অনন্ত আনন্দরসময়ত্ব উপলব্ধি বা আস্বাদন করতে পারছিলেন না, সে জন্যেই অর্থাৎ আত্মস্বরূপোপলব্ধির প্রয়োজনেই তিনি স্বয়ংই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন।

তারপর ক্রমধারায় শক্তির অবস্থান্তর দ্বারা অনন্ত-ভাবের মধ্যে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করে সর্বরসাস্বাদন করলেন। নারদপঞ্চরাত্র একথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন—

"একাকী স তদা নৈব রমতে স্ম সনাতনঃ।
স লীলার্থং পুনশ্চেদমসৃজৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥"

* * *

লীলোপকরণাং দেবঃ প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মকাম্।
মায়াসংজ্ঞাং পুনঃ সৃষ্ট্বা তয়া রেমে জনার্দনঃ॥"

সুতরাং এ শক্তিতত্ত্বটিকে আর পৃথক তত্ত্ব বলা চলে না। যদি তদীয় শক্তি আর তিনি অভিন্ন তবে তাঁর সে স্বরূপ যে সার্বদানন্দময়তা, শক্তিরও তা'হলে তদ্রূপতাই এসে গেল। তন্ত্র এজন্যে চিন্ময়ী বা আনন্দময়ী কথা বহুভাবে উল্লেখও করে থাকেন।

এখন কথা হ'ল এই চিন্ময়ী বা আনন্দময়ীই যদি শক্তির স্বরূপ, তবে তাঁরই পরিণামভূত এই জগৎপ্রপঞ্চেরও চিন্ময়তা ও আনন্দময়তাই হওয়া সঙ্গত, দুঃখাদি বা জাড্য কখনো হ'তে পারে না; অথচ তা-ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে দেখা যায়, শক্তিরও আবার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে,—স্বরূপ-শক্তি, মায়াশক্তি প্রভৃতি। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হলেন, তেমনি ব্রহ্ম-বিভাগজা শক্তিও সৃষ্টিপ্রেরণায় পুনরায় ত্রিধা বিভক্তা হ'য়েছেন। তন্মধ্যে স্বরূপ-শক্তি ভিন্ন অপর দু'টিও এসে গেল—মায়াশক্তি ও তটস্থা। মায়াশক্তিই 'সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা, পরিণামিনী, তা' থেকেই' লীলাবিলাস ক্রমে হ'ল জগৎপ্রপঞ্চ। বিষ্ণুপুরাণ তাই বলেছেন—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি বা স্বরূপশক্তি হ'ল পরা। ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি যা' জীবভূতা তা' হ'ল দ্বিতীয়া, তাই তটস্থা শক্তি। তৃতীয় হ'ল অবিদ্যা বা প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াশক্তি। স্বরূপভূতা বিষ্ণুশক্তিকে আবার ত্রিধা ভাগ করা হয়েছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। অর্থাৎ ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিন তত্ত্বে তিন ভাব—ত্রিভাবে ত্রিশক্তি। তাই স্বরূপভূতা শক্তিই সচ্চিদানন্দতত্ত্বের ত্রিভাবে সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনীময়ী। বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন—"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ"। তাতেও ভগবানের সৎ-চিৎ ও আনন্দতত্ত্বের মধ্যে প্রথম দু'টি হ'ল অস্তিত্বেরই পরিপূরক, আনন্দ বা হ্লাদিনীতেই হয়ে থাকে সর্বতত্ত্বের পূর্ণতা। অর্থাৎ লৌকিক জগতেও যেমন সকল বৃত্তিরই পরিণামে আনন্দ-প্রাপ্তিই চরম সার্থকতা, তেমনি লোকাতীত ক্ষেত্রেও আনন্দপর্যবসায়িতাতেই তাদের সার্থকতা। সুতরাং হ্লাদিনীতে গিয়েই সর্বতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।

এই স্বরূপ-শক্তিকেই বলা হয় যোগমায়া। ভগবানের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে বলে, ইনি কখনো ভগবৎস্বরূপকে আচ্ছন্ন করেন না; কারণ ইনিও ত চিদ্রূপিণী, বরং ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশিত করেই দেন। ব্রহ্মা চণ্ডীতে এই আত্মমায়া যোগমায়ারই আরাধনা করেছিলেন, বাহ্যমায়ার নয়। বাহ্যমায়াই সত্ত্বাদিগুণময়ী ও জগদ্রূপে পরিণামশীলা এবং ব্রহ্মের স্বরূপাবরণী। পুরাণে বা ভক্তিশাস্ত্রে এভাবে শক্তির বিভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। দার্শনিক-সিদ্ধান্তে এভাবে মায়ার বিভেদ প্রতীয়মান না হলেও একেবারে বিভেদবিহীন—তা'ও বলা যায় না। সেক্ষেত্রেও মায়া ও অবিদ্যা মূলতঃ অভিন্ন হ'লেও একটা বিভেদ প্রদর্শনের চেষ্টাও আছে। শুদ্ধসত্ত্ব ও অশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়তাদ্বারা মায়া ও অবিদ্যা—দু'টি সংজ্ঞার কথা দর্শনশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে। "সত্ত্বশুদ্ধ্য-বিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে"—ইতি পঞ্চদশী।

আর এভাবে শক্তিদ্বারে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতির লীলায় ভগবান্ নিজে আপন শক্তিতে অনুপ্রবেশ করে আছেন বলে এই বিশ্বপরিণাম মূলতঃ ভগবৎ-

পরিণামই হ'য়ে দাঁড়াল। কারণ, যদিও এই প্রাকৃত-শক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ তিনি যেন আত্মবিভাগ করে প্রকৃতিসৃষ্টিদ্বারা তা'তেই সর্বকর্মভার ন্যস্ত করে কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, যেহেতু তিনি কেবলানন্দানুভবস্বরূপ, আত্মারাম; তথাপি নিজেরই প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি সম্ভাবিত করে নিজেই তা'তে লীলাস্বাদন করেন বলে তাঁরই সৃষ্ট তদভিন্ন শক্তির পরিণামে তাঁর পরিণাম হ'তে আর অবশিষ্ট কি রইল? অথচ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় বিকারী পরিণাম নয় বলে এইটি অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের বহির্ভূত বিষয়।

তা'হলে দেখা গেল ভগবন্নিহিত অনন্ত ভাবতরঙ্গ একক ব্রহ্মে অব্যক্তরূপে স্তিমিত ছিল, শক্তিদ্বারেই তাদের প্রকাশ সম্ভব হ'ল। অর্থাৎ ভগবানের সকল ঐশ্বর্য ও মাধুর্য নানাভাবে প্রকটিত হ'ল। ব্রহ্মের ঐশ্বর্যবত্তা "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে" প্রভৃতি শ্রুতিতেই প্রমাণিত হয়। তাঁর মাধুর্যবত্তা ও "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্ট প্রমাণিত আছে। ভগবানের এই দু'টি রূপের সন্ধান শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা জানা গেলেও তাঁকে লাভ করে তাঁর উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত তা না জানারই তুল্য। এজন্য চরম জানার আকর্ষণেই ভগবল্লাভ বা ব্রহ্মসিদ্ধি জীবের ঈপ্সিত। কিন্তু দণ্ডধর রাজরূপে রাজার পরিচয় জানলেও দণ্ডদাতা ও দণ্ডার্হ ব্যক্তিতে যেমন ভীতি-সঙ্কোচ, বিভেদ-ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী, তেমনি ঐশ্বর্যময় ভগবানের স্বরূপোপলব্ধিতেও ভয়-সঙ্কোচ বিনাশের আশা কোথায়? ভয়ে ভক্তি আর নির্ভয়ের প্রেম কখনো এক কথা নয়। অথচ শ্রুতি বলেছেন তিনি অভয়-স্বরূপ। তাই প্রকৃত ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের ঐশ্বর্যরূপের অপেক্ষা ভগবানকে চান আত্মজনরূপে, বিবিধ সঙ্কোচ ব্যবধানের বিলয় করে আপনরূপে। এই আত্মজন হওয়া বা অপরকে আত্মজন করা—উভয়ক্ষেত্রেই লৌকিকজগতেও দেখা যায় প্রীতি-ভালবাসাই অবলম্বনীয় পথ। তেমনি প্রীতি-প্রেমের মধ্য দিয়ে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে আত্মজন করে নেওয়ার সাধনাই রসময় ভগবানের মধুর সাধনা।

কথা হ'ল ক্ষুদ্র জীব এই বিশেষ শক্তি পাবে কোথায়?—দার্শনিক ব্যাখ্যায় দেখা যায় জীব বলে পৃথক কোন সত্তাই নেই। ব্রহ্মই প্রকৃতিপরিণত বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত, তা-ই হয়েছে জীব—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"। অথবা যদি ভিন্নরূপতাও স্বীকার করে অংশ-কলা প্রভৃতি বলে সিদ্ধান্ত করা যায়, তা'তেও জীবের মধ্যে ব্রহ্মের স্ব-ভাব প্রকারান্তরে মলিনভাবেও থাকতে বাধ্য। অর্থাৎ জীব যদি ব্রহ্ম বা ভগবানের অংশও হয় তথাপি তদীয় আত্মশক্তির সন্ধিনীসম্বিৎ ও হ্লাদিনীর একটা রূপ জীবের মধ্যে স্ফুট হোক কি অস্ফুট হোক, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হোক তা' রয়েছে। তা'তে বলা যায় জীবের মধ্যে অবস্থিত ঐ হ্লাদিনী শক্তিই প্রেমরূপে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। এই হ্লাদিনীর প্রকৃতস্বরূপ বা মূল অবস্থিতি হ'ল সন্ধিনী ও সম্বিৎ-এরও পূর্ণতা প্রাপ্তিতে, ব্রহ্মের রসরূপতায় যা "আনন্দম্ ব্রহ্ম ইতি ব্যজনাৎ"—আনন্দ। পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্র সকলেই একবাক্যে বলেছেন এই পরিপূর্ণ হ্লাদিনীই রসময়ী শ্রীরাধা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তাই বলেছেন—"পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষবর্ষিণী"। এই স্বকীয় আহ্লাদ বা হর্ষ-আনন্দ বা রসরূপতা উপলব্ধির জন্যেই অদ্বিতীয় ভগবান্ নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন, তাই বলা হয় রসময়ের রাসমণ্ডলে শ্রীরাধার সৃষ্টি।—

"রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥" (ব্রহ্ম বৈঃ পুঃ)

আপত্তি হ'তে পারে, এ যেন হ'ল তত্ত্ব,—ভাবময় অবস্থা বিশ্লেষণ; তাতে বৃন্দাবনের গোপকন্যা বৃষভানুদুহিতা শ্রীমতী রাধার আবির্ভাবে এর সামঞ্জস্য কোথায়? দার্শনিক যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মেরই শক্তি বা মায়া (ব্রাহ্মমায়া) যদি বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডরূপে বাস্তবে পরিণত হ'তে পারেন এবং স্বয়ং ভগবানও যদি লীলার জন্যে মানবরূপে অবতীর্ণ হ'তে পারেন, তবে সে-ই দার্শনিক যুক্তিক্রমে ভগবানের সূক্ষ্মতম হ্লাদিনী শক্তিই বা স্থূলে এসে কেন বিগ্রহবতী হ'য়ে লীলানুচরী হ'তে পারেন না? বিশেষতঃ লীলাই যেখানে জগতের মূলে—"তত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্,"—সেখানে শক্তি ভিন্ন লীলাই ত অস্বাভাবিক। মায়াশক্তিতে লীলা প্রদর্শন সম্ভব হ'ল, কিন্তু স্বরূপশক্তিতে তা' অসম্ভাবিত—এর সদুত্তর কি? বরঞ্চ বলা যায় ভগবানের এ রহস্যময় পরম ভক্তিযোগ, যা' দীর্ঘকাল জীবের অগোচর ছিল, সে পরম যোগতত্ত্ব জগতে ব্যক্ত ক'রবার জন্যেই ভগবান্ ও ভগবতী মহাশক্তিকে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল গোপ-গোপিকারূপে।

এ ভাবে দেখা যাচ্ছে পরমহ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার সত্তা যেমন ভগবৎস্বরূপ ভগবদভিন্ন শুদ্ধানন্দরূপে, রসরূপে; তেমনি জীবের মধ্যেও রয়েছে প্রেম-ভালবাসারূপে মানব-মানবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের আকারে সর্বজীবের আনন্দরসানুভূতি-রূপে। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ভগবানের ন্যায় তো মায়াধীশ নয়, তাই মায়াবশ্যতা নিবন্ধন এ প্রেম কলুষিত, স্বার্থদ্বন্দ্বান্বিত, আত্মবাঞ্ছাপ্রবণ। তাই এ প্রেম প্রকৃত প্রেম নয়, একে বলা যায়, কামনা বাসনায় হেতু কাম। সুতরাং তা' যতই গভীর ও উন্মাদনাকর হোক্ প্রেমের পর্যায়ে কিছুতেই পরিচিত হ'তে পারে না। তথাপি এই বীজটি মূল সত্তার কোরক। একে শুদ্ধ শান্ত আত্মবাঞ্ছাহীন পরম তত্ত্বে উন্নীত ক'রে নিতে পারলে সন্ধিনী, সম্বিতের পূর্ণতার ন্যায় এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তিতেও তা' হ্লাদিনীরূপে স্বরূপে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। অর্থাৎ পরম প্রীতি বা বৈষ্ণবের ভাষায় "পি-রী-তি" ভাবের সাধনায় আত্মসুখলিপ্সা তিরোহিত হ'লে প্রিয়তমের প্রীতিমাত্র সম্বলে সর্বত্র প্রিয়তমের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধানুভবের তন্ময়তায় গোপীভাবের সিদ্ধিতে ঘটতে পারে এই অন্তরস্থিত কলুষিত কামেরও নবরূপান্তর, প্রেমরূপা হ্লাদিনীর রূপায়ণে শ্রীরাধার স্বরূপ প্রকাশ। জীবের মধ্যেও এই হ্লাদিনী বা শ্রীরাধার স্বরূপ প্রকটিত হ'লেই—এই রাধার সঙ্গে শ্রীভগবানের হবে মিলন-লীলা, জীবাত্মা পরমাত্মার রসসঙ্গ। চিরমধুর ভগবানের মাধুর্যময় স্বরূপের এ ভাবে সম্ভাবিত হয় আনন্দরতি, ঐ শ্রীরাধার স্বরূপ-অনুভূতিতে। বৃষভানুনন্দিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার তাই বৃন্দাবনভূমিতে মানবী তনুতে মহাপ্রকাশ। এ ভাবেই এসেছে জীবেরও জীবনে পরম সার্থকতা, তাঁর মহাবির্ভাবে ফল-সংসিদ্ধি।

প্রেম

"Love—What a volume in a word,
an ocean in a tear."—Tupper.

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সে যে গভীর হইতে গভীরতর
পরাণের টানাটানি,
সে যে বোঝার অতীত, মৌন ভাষায়
সুদূরের কানাকানি!
সে যে অসীম সাগরে শুক্তি-মুক্তা—
দাম তার নেই কভু;
সে যে গঙ্গার জল, জাত তার নেই
জাত দিতে পারে তবু!

সে যে হোমের আগুন—পুড়াইয়া দেয়
মঙ্গল যাহা নহে;
সে যে ব্রাহ্মণবেশী, যজ্ঞোপবীত
আপন শরীরে বহে!
সে যে অসীম মরুতে খাল কেটে আনে
বিগলিত রসধারে।
সে যে একটি স্বর্গ গড়ে রেখে দেয়
জীবনেরও পরপারে॥

দ্বারকায় কয়েকদিন

শ্রীবিজনকুমার গোস্বামী

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের স্মৃতি-সম্বলিত আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া, অমর অজ্ঞাত ভাস্করদের, যাঁহারা সম্রাট শাহজাহানের কল্পনাকে অতি নিপুণভাবে বাস্তব রূপ দিয়াছেন, মনে মনে প্রণাম করিয়া—আমরা দ্বারকার পথে রওনা হইলাম।

১৯৫৫ সালের অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় আমরা আগ্রা ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিলাম। ছোট গাড়ি রাত্রি দেড়টায় মেশানা জংশন পৌঁছিল। সেখান হইতে গাড়ি বদল করিয়া ভেরাবেল পৌঁছিলাম সকাল সাড়ে সাতটায়। এইবার দ্বারকার গাড়ি; অতি মন্থরগতি এবং এক এক স্টেশনে এত অধিক সময় অপেক্ষা করিতেছিল যে গাড়ির সকলেই ক্রমে বিরক্ত হইতেছিল, ধৈর্য রাখিতে পারিতেছিল না। ছোট ছোট স্টেশন, খাবার জিনিস পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহার উপর স্টেশনের কর্মচারীরা পর্যন্ত গাড়ির সকল খবর দিতে পারেন না, ছাপান সময়ের তালিকা (পশ্চিম রেলপথের) সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাহাতেও সকল খবর মেলে না। প্রথমে শুনিলাম সকাল ১১টায় পৌঁছিব, তাহার পর শুনিলাম রাত্রি আটটা, তাহার পর শুনিলাম পাকা খবর রাত্রি দেড়টা! এই পাকা খবর শুনিয়া মন অধৈর্য হইয়া উঠিল। কখন সকলে নিদ্রাভিভূত হইয়াছি জানিতে পারি নাই, হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখি গাড়ি স্থির হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখি জানালার সম্মুখে প্ল্যাটফরমের উপর পরিষ্কার অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা দেবনাগরী অক্ষরে 'দ্বারকা'।

তবে দ্বারকায় আসিয়াছি! উঠ, উঠ, উঠ—তাড়াহুড়া করিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া নামিয়া পড়িলাম। স্থির করিয়াছিলাম এত রাত্রে কোথাও না যাইয়া স্টেশনেই বিশ্রাম করিব এবং রজনী প্রভাত হইলে শহরের ভিতর আশ্রয় লইব।

"তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ মন উচাটন হয়ো না রে,
তুমি ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হওনা
অন্তঃপুরে।"

সাধক প্রসাদ গাহিয়াছেন, কিন্তু এবার দেখিলাম সব সময়ে তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ নয়, ভগবৎকৃপা থাকিলে, শ্রীভগবানের আশীর্বাদ থাকিলে অভাবনীয় ভাবে সমস্ত যোগাযোগ হইয়া যায় এবং ভগবানের আহ্বান সত্যসত্য উপলব্ধি করা যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ওরে অনেকদিন ধরে যেখানে লোকে বসে ঈশ্বরকে ডেকেছে সেইস্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ জানবি; অনায়াসেই উদ্দীপনা হয় সেই সকল স্থানের মাহাত্ম্যে।* যেমন জল সব স্থানে থাকলেও যে সকল স্থানে কূয়া বা পুষ্করিণী আছে সেখান হতে জল গ্রহণ করতে কোন পরিশ্রম করতে হয় না।

স্টেশনে আমাদের রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয় নাই, কারণ অবতরণ করিবামাত্র কুলিয়া এবং টাঙ্গাওয়ালা বলিল, "চলিয়ে সাহেব, বাঙ্গালী ধরমশালা আভি খোলা হ্যায়, তোতাদ্রী মঠ।" এত রাত্রেও ধর্মশালা খোলা আছে শুনিয়া আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম, কারণ এত পথ অতিক্রম করিয়া মন বিশ্রামের জন্য আনচান করিতেছিল। 'বহুত আচ্ছা, চলো' বলিয়া আমরা টাঙ্গায় আসিয়া বসিলাম। দুইখানি টাঙ্গা একটাকা করিয়া ভাড়া।

চতুর্দিকের জ্যোৎস্নালোক যেন প্রভুর অনুচরের ন্যায় স্নিগ্ধ হাসিতে আমাদের স্বাগত জানাইতেছিল। আনন্দপরিপ্লুত অন্তরে সেই নিস্তব্ধ রাত্রে আমরা চলিতে লাগিলাম দ্বারকানাথজীর দুর্গের

সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তোতাদ্রী মঠে আসিয়া পড়িলাম। মোহান্তজী তীর্থযাত্রীদের পরমাত্মীয়জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকেন; সেই কারণে অত রাত্রেও তিনি আমাদের সহিত রীতিমতভাবে গল্প আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুবিৎ স্বামিজী শ্রীগুরুর নির্দেশে ধর্মপ্রচার ও তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য এই মঠ স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে অত্যন্ত জলকষ্ট, কিন্তু তোতাদ্রী মঠে যাঁহারা উঠেন তাঁহাদের সে কষ্ট থাকে না, কারণ মঠাধ্যক্ষরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ৫টি কূপ আশ্রমের ভিতরেই খনন করিয়াছেন। আশ্রমটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈদ্যুতিক আলো আছে।

পরদিবস প্রাতে পূর্ণিমার দিন আমরা মঠ হইতে আধ মাইল দূরে দ্বারকানাথজীর মন্দিরে যাই। প্রকাণ্ড দুটি তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। প্রথমে উদ্যান, দক্ষিণপার্শ্বে বলরামজীর বিগ্রহ, এবং উদ্যান অতিক্রম করিয়া সম্মুখে নাটমন্দির ও তাহার বামপার্শ্বে প্রধান মন্দিরে দ্বারকানাথজী অপূর্ব রাজবেশে দণ্ডায়মান, নানাভাবে ভজনরত অগণিত ভক্তবৃন্দকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতেছেন এবং আশীর্বাদ করিতেছেন।

ইহাই হইল ভগবানের আদি বাড়ি; পুরাণে কথিত আছে যে একমাত্র ভগবানের বাড়ি ছাড়া তাঁহার লীলাস্থল দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। দ্বারকানাথজীর মন্দিরের পার্শ্বে সত্যভামা, জাম্ববতী, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি অষ্ট মহিষীর মন্দির। মন্দিরের নিকটেই গোমতী নদী। তীর্থযাত্রীরা সকলেই এই নদীতে পুণ্যস্নান করেন। অত্যধিক লবণাক্ত জল। স্নান করিবার পূর্বে সরকারি ট্যাক্স জনপ্রতি ৵০ আনা করিয়া দিতে হয়। স্নান করিবার পর আমরা নদীসংলগ্ন গোপালজীর মন্দিরে যাইলাম। ঐ মন্দিরে গোপালজী, গোমতী দেবী এবং তদীয় পিতা বশিষ্ঠদেব—এই তিন বিগ্রহ আছে।

ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দ্রৌপদীদেবী যখন বিশেষভাবে লাঞ্ছিতা হইতেছিলেন তাঁহার পঞ্চ স্বামী, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে, সেই সময়ে তিনি এই দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। দ্বারকানাথজীকে সেই সময়ে রুক্মিণীদেবী আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া নিবেদন করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল প্রভু চঞ্চল হইয়াছেন—কি হইল, কি হইল। রুক্মিণীদেবী মহা চিন্তায় পড়িলেন; তবে কি প্রভুর সেবার কোন ত্রুটি হইল! দ্বারকানাথজী তখন দেবীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—না দেবী তোমার সেবার কোন ত্রুটি হয় নাই, আমি অন্য কারণে চঞ্চল হইয়াছি; আমাকে এই মুহূর্তে দ্বারকা পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমার ভক্ত দ্রৌপদী দেবীর মহাবিপদ। এই বলিয়া দ্রৌপদী দেবীর নিকট তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—হে দেবী, তুমি আমায় দ্বারকানাথ বলিয়া শরণ করিয়াছিলে বলিয়া এই সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তুমি যদি অন্তঃকৃষ্ণকে শরণ করিতে ত সেই মুহূর্তেই আমাকে পাইতে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

এই প্রকার শ্রীভগবানের লীলা ও অপার করুণার নানা কথা স্মরণ করিতে করিতে অগণিত ভক্তবৃন্দ মন্দির পরিক্রমা করিতেছিল, কেহ দুই করে তালি দিতে দিতে নামগুণগান করিতেছিল, কেহ বা ধ্যানমগ্ন ছিল।

রুক্মিণীদেবীর মন্দির পৃথকভাবে এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। মহামুনি দুর্বাসার আদেশে তাঁহার রথ অশ্বের পরিবর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেবী নিজেরাই টানিতেছিলেন। কোমলাঙ্গ রুক্মিণী দেবী এই কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পিপাসার্ত হইয়াছিলেন।

দুর্বাসা মুনির আদেশ পালন না করিয়া তিনি পথিমধ্যে রথ থামাইয়া জল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনি ইহার জন্য দেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন হইবে না, উভয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করিবেন।

দ্বারকানাথজীর মন্দিরের কিয়দ্দূরে মহামায়ার মন্দির আছে। কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেহের এক অংশ এখানে পড়িয়াছিল এবং ইহা বাহান্নপীঠের এক পীঠ। ইহারই নিকটে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও আমরা দর্শন করিলাম। মহাদেবের মূর্তির সম্মুখে নাটমন্দিরে প্রকাণ্ড একটি পাথরের ষাঁড়ের মূর্তি আছে।

দ্বারকানাথজীকে নানা সময়ে নানাভাবে দর্শন করিতে পাইয়াছিলাম। দ্বারকানাথজীর সম্মুখে নাটমন্দিরে একটি দীর্ঘ মুকুর আছে, অত্যধিক ভিড়ের সময় পশ্চাৎ ফিরিয়াও উহার মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ বিগ্রহ দেখা যায়। পুনঃ পুনঃ দ্বারকানাথজী দর্শন করিয়াছি এবং প্রতিবারই মনে হইয়াছে, 'আর যাহা নিতান্ত বাস্তব দুদিন পরে তাহা স্বপ্ন', কারণ এখান হইতে বহুদূরে, দেড়সহস্র মাইলেরও অধিক দূরে আমার নিবাস। স্মরণ নাই কোন্ সুদূর অতীতে কবে, কোথায় দ্বারকানাথজীর কথা শ্রবণ করি এবং ক্রমে ক্রমে দর্শনবাসনা জাগরিত হয় এবং পরিণামে দ্বারকানাথজীর কৃপা সত্য সত্য লাভ করি। কয়েকদিন এই পুণ্যধামে বাস করিয়া দ্বারকানাথজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় প্রার্থনা করিলাম। ষ্টেশনে আসিলাম। গাড়ি ছাড়িল, আমরা জানালার ধারে বসিয়া আছি করজোড়ে এবং দ্বারকানাথজীর দণ্ডায়মান মূর্তি মনে মনে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ি বহুদূর অগ্রসর হইল এবং মন্দিরচূড়াটি অদৃশ্য হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম, ওরে দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখে এসেই কি সে সব মন থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়, না সেইভাব নিয়ে কিছুকাল থাক্‌তে হয়। তীর্থদর্শন ক'রে এসে জাবর কাটতে হয় বুঝলি।

শ্রীমধ্বাচার্য

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

আবির্ভাব

যাঁহাদের জীবনের দীপ্তিতে ভারতভূমি উজ্জ্বল হইয়াছে শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি মাধব বা মধ্বাচারি—সম্প্রদায় প্রবর্তক দ্বৈতবাদী বেদান্তী। ইঁহার জীবনীর উপাদান হইতেছে নারায়ণ পণ্ডিতাচার্য লিখিত মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়। শ্রীসুব্বারাও, এম্-এ, শ্রীসি এন্ কৃষ্ণস্বামী আয়ার, শ্রীসি এম্ পদ্মনাভ আচারী এবং শ্রীসি আর কৃষ্ণ রাও প্রভৃতি মহোদয়গণও সম্ভবতঃ 'মধ্ববিজয়' গ্রন্থ এবং কোন শিলালিপি বা কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া ইংরেজী ভাষায় মধ্বাচার্যের জীবনী লিখিয়াছেন।

দক্ষিণ কানাড়া জেলায় 'উডিপির' প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—আট মাইল দক্ষিণপূর্বদিকে বেলিগ্রাম নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম মধিজী ভট্ট। ইনিই মধ্বাচার্যের পিতা। তাঁহার আর একটি নাম মধ্যগেহ। ব্রাহ্মণের সহধর্মিণীর নাম ছিল বেদবতী। সংসারযাত্রা নির্বাহের পথে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক না হইলেও ব্রাহ্মণের বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রসম্মত আচারনিষ্ঠা ছিল গভীর। ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদম্পতির একটি পুত্র ও এক কন্যা-সন্তান অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করে। বহুদিন যাবৎ সন্তানের অভাবে তাঁহাদের মনঃকষ্টের সীমা ছিল না।

অবশেষে মধিজী ভট্ট ও বেদবতী 'উডিপি'র নারায়ণের নিকট পুত্র-সন্তান প্রার্থনা করেন। নারায়ণ তাঁহাদের কামনা পূরণ করিলেন। ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দের শুভদশমীতে বেদবতীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য আবির্ভূত হইলেন। সি, এন্ কৃষ্ণস্বামী আয়ারের মতে আচার্যের জন্ম-বৎসর ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ; পদ্মনাভ আচারীর মতে খ্রীঃ ১২৩৮ সাল। পিতা শাস্ত্রবিধানানুসারে জাতকের নাম রাখিলেন বাসুদেব।

বাল্যকাল

বালক ক্রমে পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মধ্যগেহ পুত্রকে পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই মুখে মুখে বহু সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করাইয়াছিলেন। সপ্তম বৎসরের উপনয়নের পর অধ্যয়নের নিমিত্ত বালককে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, তিনি শৈশবে অনন্তেশ্বর মঠে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে বাসুদেব ক্রীড়াকৌতুক ব্যায়াম, সন্তরণ প্রভৃতিতে দিবসের অধিককাল অতিবাহিত করিতেন। সেই সময় তাঁহার পাঠে বিশেষ মনোযোগ ছিল না। তবে বালকের মেধা এবং প্রতিভা ছিল অসাধারণ। একটি ঘটনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "বাসুদেব, তুমি পড়াশুনা কর না কেন?" বাসুদেব উত্তর দিল "আমি রোজ রোজ এক রকম পড়া পড়িতে পারিব না।" শিক্ষক মহাশয় তখন পাঠ্যপুস্তকের কতকগুলি কঠিন কঠিন অংশ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুদেব তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিল। ইহার পর হইতে শিক্ষক মহাশয় বালককে তাহার নিজ ইচ্ছামত চলিতে বাধা দিতেন না। এইভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাসুদেব নিজ গৃহে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে বীতস্পৃহ ছিলেন, শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলে অধিকতর বৈরাগ্যের উদয় হইল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তদনুযায়ী একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া অচ্যুত প্রকাশাচার্য (অন্য নাম পুরুষোত্তম তীর্থ) নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা কোনরূপে সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রকে স্বগৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন।

সন্ন্যাস

কিছুকাল গৃহে বাস করিয়া পরে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাসুদেব অচ্যুতপ্রকাশের নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইলেন। গুরুদত্ত নাম হইল মধ্বাচার্য। অচ্যুতপ্রকাশ ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তাঁহার নিকট নবীন সন্ন্যাসীর বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন চলিতে লাগিল, কিন্তু প্রায়ই গুরুশিষ্যে তর্ক হইত। তর্কে মধ্ব সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদই খণ্ডন করিতেন। কথিত আছে, অচ্যুতপ্রকাশ প্রথমে মধ্বাচার্যকে ইষ্টসিদ্ধি গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর অচ্যুতপ্রকাশ মধ্বের আর একটি নাম দিলেন—পূর্ণপ্রভাত। এতদ্ব্যতীত মধ্বাচার্য আনন্দতীর্থ, আনন্দজ্ঞান, জ্ঞানানন্দ এবং আনন্দগিরি* নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর গুরু তাঁহাকে অনন্তেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহারই উপর অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিলেন। এখন হইতে তিনি অনেক সময় সাধন-ভজনে নিরত থাকিতেন, কখন কখনও বা পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র বিচার করিতেন।

দিগ্বিজয়

এইভাবে কিছুকাল কাটিলে কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মধ্বাচার্য গুরুর সহিত দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বহির্গত হন। প্রথমে তাঁহারা বিষ্ণুমঙ্গল হইয়া ত্রিবেন্দ্রমে যাত্রা করিলেন।

* শঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

ত্রিবেন্দ্রমের রাজসভায় শৃঙ্গেরীমঠের তদানীন্তন শঙ্করাচার্য বিদ্যাশঙ্করের সহিত বিচার হয়। বিচারে কেহই পরাজিত হইলেন না। 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন, "মধ্বাচার্যই পরাজিত হইয়াছিলেন।" এই ঘটনার পর হইতেই অদ্বৈতমতের সহিত মধ্বমতের বিরোধ প্রচারিত হইতে থাকে। ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে তাঁহারা শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন।

শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতবাদিগণের সংখ্যা অল্প ছিল, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাবলম্বীরই ছিল প্রাধান্য। সেইজন্য সেখানে তিনি সহজেই নিজ মত প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। এই বৎসর মধ্বাচার্য রামেশ্বরে গুরুর সহিত চাতুর্মাস্য-ব্রতানুষ্ঠান করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যখন মধ্বাচার্য বিদ্যাশঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলেন না অথচ অদ্বৈত মতও গ্রহণ করিলেন না তখন বিদ্যাশঙ্কর বলেন,—তুমি যতদিন প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিতে না পারিবে ততদিন তোমার মত গৃহীত হইবে না। এই কথা স্মরণ করিয়া মধ্বাচার্য দাক্ষিণাত্যবিজয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উডিপিতে প্রথমে গীতাভাষ্য রচনা করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। উত্তর ভারতে তাঁহার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সত্য তীর্থ—নামে এক বিদ্বান সন্ন্যাসী এই সময়ে তাঁহার মতে আকৃষ্ট হন। পরিব্রজ্যাকালে মধ্বাচার্য উপবাস, তপস্যা প্রভৃতি অবলম্বনে অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কখনও তিনি বন্যপশু ও দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত আবার কখনও বা বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবৃন্দ কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে বদ্রিনারায়ণে ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। ব্যাসের আদেশে নাকি তিনি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। বদ্রিনারায়ণ হইতে হরিদ্বার, হৃষীকেশ পর্যন্ত পর্যটন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তনের পথে বঙ্গ, বিহার, পুরী ও অন্ধ্র প্রদেশ ভ্রমণ করেন। এই সময় রাজমাহেন্দ্রীতে অশেষশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, গজপতিরাজের মন্ত্রী শমীশাস্ত্রী ও শোভন ভট্ট নামক দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পর শমীশাস্ত্রীর নাম হয় নরহরি তীর্থ। শোভন ভট্ট পরিচিত হন পদ্মনাভতীর্থ এই নামে। উভয়ে বহু টীকাদি রচনা করিয়া মধ্ব-সম্প্রদায় প্রবর্তনে সাহায্য করেন। একদা মধ্বাচার্য স্বকৃত-ভাষ্যসম্বলিত একখানি ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ অচ্যুত প্রকাশকে প্রেরণ করেন। গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া তিনি এত সন্তুষ্ট হন যে, অবশেষে অদ্বৈত মত পরিত্যাগ করিয়া মধ্বমত গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অচ্যুত প্রকাশ প্রত্যহ সমগ্র ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। একাদশীর পরদিন সমগ্র ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া জলগ্রহণ করায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। তাঁহার এই কষ্ট লাঘবার্থ মধ্বাচার্য ৩২টি শ্লোকে 'অণুভাষ্য' নামক এক সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

মতপ্রচার

ইহার পর ক্রমশঃ বহুলোক মধ্বাচার্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, যুক্তিকৌশল, প্রতিভা ও মেধায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কথোপকথন শুনিতে উপস্থিত হইত ও অনেকে তাঁহার মত গ্রহণ করিত। তিনি সম্প্রদায়রক্ষার জন্য, উডিপি, সুব্রহ্মণ্য, মধ্যতল প্রভৃতি কয়েকস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েকজন সন্ন্যাসীকে ঐ সকল মঠের ভার দিয়া স্বীয় মত প্রচার করাইতে লাগিলেন। উডিপিতে মধ্বাচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উডিপি মাধ্বগণের অতি পবিত্র তীর্থ। জীবনে অন্ততঃ একবার সেখানে তাঁহাদের যাওয়া চাই। এই স্থানেই মাধ্বাচার্য তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার পর আচার্য দ্বিতীয়বার উত্তর ভারতে যাত্রা

করিয়া দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রবিচারে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় বহুলোক কাশীতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এইবার তিনি প্রায়ই দক্ষিণ কানাড়া জেলায় অবস্থান করিতেন, কখনও কখনও বিষ্ণুমঙ্গলে গিয়া কিছুকাল থাকিতেন। এই সময়েও তাঁহার অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। কথিত আছে এই সময় পুণ্ডরীকপুরী ও পদ্মনাভ নামে দুইজন পণ্ডিত মধ্বের সহিত বিচারের জন্যও উপস্থিত হন। বিচারে পদ্মনাভ পরাজিত হন; আর পুণ্ডরীকের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়।

ক্রমে অদ্বৈতমতের সহিত মাধ্বমতের এত বিরোধ উপস্থিত হইল যে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্করের আজ্ঞায় দুস্যুদল কর্তৃক মধ্বের পুস্তকালয় বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ঐ দেশের রাজা জয়সিংহের সাহায্যে পুস্তকগুলির উদ্ধার করা হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে মধ্বাচার্য যখন বিষ্ণুমঙ্গলে সেই সময় এক রাজসভায় ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিত পনর দিন যাবৎ মধ্বাচার্যের সহিত বিচার করিয়া পরাস্ত হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহারই অনুরোধে মধ্বাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'অনুব্যাখ্যান' নামে আর একটি পদ্যভাষ্য রচনা করেন। ত্রিবিক্রমাচার্যও সূত্রভাষ্যের উপর 'তত্ত্বদীপন' টীকা রচনা এবং 'বায়ুপুত্র' নামে মধ্বের মাহাত্ম্যপ্রকাশক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে মধ্বকে বায়ুর তৃতীয় অবতার বলা হইয়াছে। এই ত্রিবিক্রমের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিতই 'মধ্ববিজয়' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা।

ইহার পর বহুলোক মধ্বাচার্যের শিষ্য হইল। মধ্বের কনিষ্ঠ সহোদর এবং অপর সাতজন এই সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পর মধ্বসহোদর নাম হয় বিষ্ণুতীর্থ। ইনি 'সদি' মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে মধ্বাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'ন্যায়বিবরণ', 'কৃষ্ণামৃত মহার্ণব', 'কর্মনির্ণয়' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইবার যেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইহার কিছুকাল পরে আনুমানিক ৮০ বৎসর বয়সে আচার্য মাঘ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করেন। এই দিবসটি মাধ্বগণের নিকট বিশেষ স্মরণীয়।

উপসংহার

মধ্বাচার্য (স্থূল) শরীর পরিত্যাগ করিলেও যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চন্দ্রসূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত নষ্ট হইবার নয়। তাঁহার শরীর দৃঢ়, বলিষ্ঠ, মুখ সুন্দর ও উজ্জ্বল, শরীরের গঠন পালোয়ানের মত ছিল। তাঁহার মনের ক্ষমতা ছিল ততোধিক। বিচারে যে কোন লোককে অভিভূত করিতে পারিতেন। তাঁহার অনেক যোগবিভূতি ছিল বলিয়া মধ্ববিজয়ে বর্ণিত আছে। মধ্বাচার্যের কণ্ঠ খুব সুমিষ্ট ছিল এবং তিনি সুগায়ক ছিলেন। একবার গানে একব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা ছিল সরল, গ্রাম্যতাদোষবর্জিত ও অলঙ্কারবিহীন। মধ্বাচার্য নারায়ণকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। একাদশী তিথিতে সকলকে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা দিতেন ও ঐ দিবস যাহাতে হরিস্মরণ ও শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলিতেন। জীবহিংসা নিষেধ করিতেন। তিনি ভস্ম ও রুদ্রাক্ষের পরিবর্তে চন্দন ও তুলসীর মালা ব্যবহারপ্রথা প্রবর্তন করেন। মধ্বের দর্শন অতি প্রবল ও যুক্তিপূর্ণ। এই প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ও গীতা ভাষ্য সমধিক প্রসিদ্ধ। দশখানি উপনিষদের ভাষ্য, কৌষীতকী উপনিষৎ ভাষ্য, নারায়ণ উপনিষৎ ভাষ্য, কৈবল্যোপনিষৎ ভাষ্য ইঁহার রচিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত ১০।১৫ খানি গ্রন্থও আছে, অনেকগুলি ভাষ্য, টীকা ও বার্তিক, কতকগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক।

অর্জুনের প্রার্থনা

(গীতা ১১শ অধ্যায় হইতে অনূদিত)

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

১

তব মাহাত্ম্য কীর্তন শুনি,
এ মহাজগতে হে হৃষীকেশ।
যত নরনারী ভাসে আনন্দে,
তব অনুরাগে ওগো দেবেশ।
রাক্ষসকুল ত্রস্ত-ব্যাকুল
পলায় যে পারে যেদিক পানে।
সিদ্ধ যাঁহারা বন্দিবে তোমা—
মুক্তিযুক্ত সবে এ জানে।

২

তোমারে কেননা বন্দিবে সবে,
ওহে অনন্ত দেবাদিদেব।
ব্যক্ত বা অব্যক্ত অতীত
যে ব্রহ্ম,—তুমি তাহাই দেব।
তুমি ব্রহ্মার আদিগুরু প্রভু—
এই জগতের পরমাধার।
হে শংখপাণি চরণে তোমার
শত শত বার নমস্কার।

৩

হে অনন্ত-রূপ তুমি আদিদেব,
যেহেতু অনাদি পুরুষ তুমি।
জানি নিশ্চয় তোমা মাঝে লয়
পায় সুবিশাল পৃথ্বীভূমি।
সকলি তো তব জ্ঞানের গোচর,
এ বিশ্বে জ্ঞেয় তুমিই জানি।
হে বিশ্বব্যাপী অনন্তরূপ—
তব পদাশ্রয়ে নিখিল প্রাণী।

৪

বায়ু যম আর অগ্নি বরুণ,
সবই তব রূপ জগন্নাথ।
প্রজাপতি তুমি—তুমি শশাংক,
প্রপিতামহ লহ প্রণিপাত।
এ প্রণতি মোর চরণে তোমার
শতদল হয়ে উঠুক ফুটে।
সহস্রধারে প্রণাম আমার—
চরণে তোমার পড়ুক লুটে।

৫

অজ্ঞান আমি প্রণয়ের বশে,
তোমার মহিমা না বুঝি কিছু।
"কৃষ্ণ" "যাদব" "সখা" সম্ভাষি—
অবজ্ঞাভরে ক'রেছি নীচু।
পরিহাসছলে বান্ধবমাঝে,
আহার বিহার শয়নকালে।
অনাদরে তোমা বলেছি যা কিছু,
অনুশোচনার আগুন জ্বলে।
ওগো অচ্যুত এ ত্রুটি আমার,
আপনার গুণে ক্ষম হে ক্ষম।
হে অমিত-তেজ সর্বস্বরূপ—
হে বিশ্বরূপ নম হে নম॥

ধর্মজীবন ও নারী

শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী

ধর্মজীবন অর্থে সাধারণতঃ আমরা বুঝি সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন। সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপনের সবচেয়ে বেশী প্রচলন হিন্দুজাতির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যথাসর্বস্ব বিশ্বনিয়ন্তার চরণে উৎসর্গ করে অতি কঠোর সংযম ও একনিষ্ঠা নিয়ে তপশ্চর্যা শুধু ভারতবাসীরই সাধ্যায়ত্ত। এখনও আমাদের অগোচরে কত গুহাকন্দরে, কত নিভৃত নির্জন স্থানে কত শত মহাপুরুষ ঈশ্বরচিন্তায় তদ্‌গত হয়ে আছেন তার হিসাব কে রাখে?

ধর্মপ্রাণ ভগবদ্ভক্তগণের মায়া-মোহমুক্ত পবিত্র জীবন দেখলে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও মনপ্রাণকে যেন উর্ধ্বে তুলে ধরে, তখন কেবল মনে হয় কি নিয়ে কিসের মধ্যে আমরা এমন করে জড়িত হয়ে আছি! এত দেখেশুনেও কি আমাদের এতটুকু চৈতন্য হয় না যে, ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমরা মানুষ—'মান্ হুঁস' অর্থাৎ সব কিছুতে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করে আমাদের সত্যিই হুঁসিয়ার হতে হবে, মানুষ নামের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে? কিন্তু এমনই মায়ার কুহকে, এমনই খেলা নিয়ে আমরা ভুলে থাকি যে, পর মুহূর্তেই আবার সবকিছু ভুলে 'আমার আমার' করে অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের অনিত্য মায়ামোহে আচ্ছন্ন করে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ভুলিয়ে রাখার এ অপূর্ব কৌশলও ভগবানেরই বিচিত্র লীলা।

শাস্ত্র বলেন, যে শক্তির প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে, যা নাকি ধরাছোঁয়ার অতীত মনে হয়—"অবাঙ্‌মনসোগোচরম্" সেই অনন্ত শক্তি এবং তাঁর দ্বারা চালিত জগৎ, এই দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। পার্থক্য শুধু আমাদের মনে। আমরা এমন করে অনিত্য বস্তুতে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছি, আমাদের শক্তিকে এমন সীমাবদ্ধ করে রেখেছি, যে মানুষও যে কোনওদিন দেবতা হতে পারে, তার এতখানি ক্ষমতা, এতখানি জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এ আমাদের ধারণাতীত। সেই অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে কর্মের দ্বারা ও বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত করে ক্রমশঃ সেই পরম সত্তায় পৌঁছাবার পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই হল ধর্মজীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য শুধু পুরুষের নয়, নারীরও।

মানুষ যখন ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠে যায় তখন আর তাকে কোনও জাগতিক বস্তু প্রলুব্ধ করিতে পারে না, সে তখন ভগবদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক স্বর্গীয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তখন আর তার কামনা বাসনার কিছুই থাকে না, থাকে শুধু একটা সব-পাওয়ার অপূর্ব পরিতৃপ্তি। হৃদয়-তন্ত্রীতে তখন একই সুর ধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু সেই ভাবকে মনের মধ্যে বিকশিত করতে হলে, কিছু পরিশ্রম করতে হবে। নিজের অজস্র ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপূরণে সর্বদা ব্যস্ত যে জীবন এতদিন কাটিয়ে এসেছি সে জীবনে কখনো ঐ ভাব আসতে পারে না। নতুন জীবন চাই—সাত্ত্বিক জীবন—ধর্মজীবন। পুরুষেরও চাই, মেয়েদেরও চাই।

ভগবান্, তুমি কে, কেমন তোমার রূপ, কোথায় তোমার অস্তিত্ব, কি ভাবে আমি তোমায় ধারণায় আনবো, আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করব, কিছুই জানি না। কিন্তু এটা ঠিকই জানি, সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে এক দিব্যশক্তি আমাদের প্রতিক্ষণ চালিত করছে। কোনও একটা দিব্য প্রেরণা না পেলে, পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথের নির্দেশ না পেলে, কেমন করে আমরা তোমাতে পৌঁছাব এবং তুমিই যে আমি সে জ্ঞান, সে যোগ্যতা তুমি কৃপা করে না দিলে কেমন করে আমি তোমায়

চিনব, বল ? তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; আমি সমস্যা, তুমি সমাধান ; আমি তোমার, তুমি একান্ত আমারই, এ ধারণা, এ বিশ্বাস আমার মনে তুমিই তো জাগাবে, তবেই তো আমি তোমায় চিনবো এবং তবেই তো ক্রমশঃ আমি তোমার সাথে এক হয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব ? সে অপূর্ব তেজ ও শক্তির বিন্দুমাত্র পেতে হলেও আমায় তোমার উদ্দেশ্যে কর্ম করে যেতে হবে আজীবন। তোমায় অর্পিত কর্ম করতে করতে তবেই তো একদিন আমার সকল কর্মের ফল—তোমাকে আমি পাব।

মানুষের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন, ক'দিন তার মেয়াদ কেউ বলতে পারে না। তাই এই আসা যাওয়ার মাঝখানের দিন ক'টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা চাই। অর্থাৎ সৎ চিন্তা, সৎকর্মের মধ্যে সর্বদা নিজেকে সমাহিত করতে হবে অনন্যশরণ হয়ে, তাঁরই চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে, তবেই আমরা ধর্মজীবন যাপন করতে সক্ষম হবো। ধর্মজীবনের সঙ্গে নারীর কি বা কতখানি সম্বন্ধ এর উত্তরে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যে নারীত্বের মধ্যেই জগতের মাতৃত্বের পরিচয়। সে রকম শুদ্ধসত্ত্ব নারী দেখলে 'মা' শব্দ স্বতঃই মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। 'মা' ডাকের মত মধুর ডাক আর কিছুই নাই। মা ডাকে সমস্ত দুঃখ গ্লানি, মনের সব রকম অবসাদ দূরীভূত হয়। সন্তানের যত বিপদই আসুক না কেন একবার মা'র কোলে আশ্রয় পেলে কোনও বিপদই তাকে স্পর্শ করতে পারে না, মাতৃশক্তির এমনই অপূর্ব মহিমা।

তাই মাতৃজ্ঞানে যদি সেই পরমশক্তির চিন্তা আমরা করতে পারি, সন্তান যেমন মা বই কিছু জানে না, সেই মহাশক্তিকে যদি আমরা মা'র মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাঁকে সেইভাবে যদি আমরা ধ্যানে, জ্ঞানে উপলব্ধি করতে পারি তবেই আমাদের সবকিছু সাধনা, সব কর্ম, গন্তব্য স্থলে পৌঁছাবার সবকিছু প্রচেষ্টা অতি সুন্দর সহজ, সরল ও সার্থক হয়ে ওঠে।

শিব ও শক্তি যেমন অভেদ, একক ছেড়ে দিলে অন্যের কিছুই থাকে না, সেরকম পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ। পুরুষ বাঁচতে পারে না, নারী বিনা। দুজনের জীবনে দুজনের ঠিক ঠিক সাহচর্য পেলে তবেই দুজনে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। সকল কাজে দুজনেরই সমান অধিকার। দুজনেরই পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার একই পথ, একই উপায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" "ওঠ, জাগ, আশীর্বাদ লাভ করে নিজের যোগ্যতাকে প্রবুদ্ধ করে তোল।" তোমার যে কি শক্তি, কি সামর্থ্য আছে তাকে জাগিয়ে তোল, তোমার হৃদয়স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর, মহাশক্তির অংশস্বরূপ নারীশক্তির মহিমা প্রকটিত কর। কত মহীয়সী নারী এযাবৎ ভারতবর্ষে নিজেদের সুকৃতির ফলে জীবনের নানাক্ষেত্রে অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। পুরাকালে সর্বংসহা সীতা, পতিব্রতা বেহুলা ও সাবিত্রী, বিদুষী মৈত্রেয়ী, গার্গী, গিরিধারীর চরণে সম্পূর্ণ সমাহিতা চিতোরের মহারাণী মীরাবাঈ— এরকম আরও কত মহীয়সী নারীর অপূর্ব দৃষ্টান্ত তাঁদের চিরস্মরণীয় করেছে।

এ যুগের জলন্ত আদর্শ আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীমা সারদা দেবী কত বুভুক্ষুর মুখে অন্ন তুলে দিতে, কত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, কত দুঃখীর চোখের জল মোছাতে যে মর্ত্যে এসেছিলেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি ছিলেন যেন নারীরূপে সারা বিশ্বের মা। কোনও দিন কোনও সন্তান তাঁর কাছ থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফেরেনি। যে ভাবে যখন যে যা চেয়েছে তাই তিনি মুক্তহস্তে সবাইকে দিয়েছেন। তাঁর বরাভয় হস্ত সন্তানের জন্য সর্বদাই প্রসারিত থাকত।

ধর্মজীবনের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে হলে

পুরুষকে যেমন কঠোর সাধনা অবলম্বন করতে হয়, নারীকেও ঠিক তাই করতে হয়। তবে পুরুষের চেয়ে মেয়েকে সবরকমে সংযত করে রেখে পরম-লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক বেশী বাধা-বিঘ্ন, মান-অপমান, অত্যাচার সহ্য করতে হয়। মীরাবাঈ তাঁর গিরিধারীলালকে পাওয়ার জন্ম সংসারে কত উৎপীড়ন সয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি এতটুকু বিচলিত হননি।

আবহমান কাল থেকে এই চিরন্তনী প্রথা চলে আসছে যে নারী চিরদিনই পুরুষের অধীন। পুরুষ যদি ধর্মপ্রাণ, সংযত ও উন্নত-চরিত্রের হয় তবেই সে সংসারে নারীর আদর, নারীর সম্মান, নারীর স্থান থাকে—সংসার শান্তিপূর্ণ হয়, নারীকেও তখন পুরুষের সত্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে হয়। দুজনের সম্মিলিত সংযম ও পবিত্রতায় সংসার স্বর্গাদপি গরীয়সী হয়ে ওঠে, আদর্শ জীবনে পরিণত হয়। আর যদি কোনও সংসারে, কোনও কথায়, কোনও কাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে মনের মিল না থাকে, পুরুষ যে সৎকাজে হস্তক্ষেপ করে নারী যদি তাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং নারীর কাজে পুরুষ বাধা দেয়, সে স্থলে কোনও কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, উপরন্তু ঝগড়া ও অশান্তির আগুন প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে, নির্বাপিত হওয়ার কোনও উপায়ই থাকে না। দুজনের শক্তিতে দুজনে সহায়ক হয়ে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারলেই কালে সেই দিব্য শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তাই নারীকে উপাধি দেওয়া হয়েছে পুরুষের সহধর্মিণী।

সংসারে থেকে, স্বাভাবিক মানুষের মত সব কিছু আচার-ব্যবহার করেও, মানুষ কত মহান্, কত শ্রেষ্ঠ হতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে তা তিনি প্রতি কার্যে দেখিয়ে গিয়েছেন। আমরা ভেবে ভেবে আত্মহারা হয়ে পড়ি যে মানুষে *এ কি করে সম্ভব হয়? কিন্তু একবারও ভেবে* দেখিনা যে এই অপূর্ব সংযম, অপূর্ব ভক্তিবিশ্বাস, অপূর্ব নিষ্ঠা—এর পিছনে কত বড় নারীশক্তির প্রেরণা রয়েছে। শ্রীশ্রীমা যদি অমনটি না হতেন তবে কি ঠাকুরেরই সাধ্য ছিল এমন হওয়া? মাকে ঠাকুরই প্রচার করেছেন, ভবতারিণী জ্ঞানে সর্বস্ব তাঁর পায়ে অর্পণ করে। আর মাও এসেছিলেন তাঁরই এ অলৌকিক কার্যকলাপে তাঁর একমাত্র সহকারিণীরূপে। কেউ কারুর চেয়ে এতটুকু কম নন। তবু ঠাকুর বারবার বলে গেছেন, "ও যদি এমন না হত, তবে আমিই কি পারতাম এমন হতে?" ঠাকুরের জীবনে নারীর আসন অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি প্রত্যেক নারীকেই (কি ইতর, কি ভদ্র) 'মা' সম্বোধন করতেন। সাধক রামপ্রসাদও তাঁর প্রতি গানে তাঁর ভুবনমোহিনী মাকেই মূর্ত করে তুলেছেন। মনু বলেছেন "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—এমন যে সীতা সাবিত্রীর দেশ আমাদের, মহীয়সী নারীদের জন্ম তা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

পাশ্চাত্ত্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে এলেন সঙ্গে করে আইরিশ মহিলা ভগিনী মার্গারেট নোবলকে। আমাদের দেশের জন্ম তিনি দেহ মন প্রাণ নিবেদন করলেন, তাই তো তাঁর নাম স্বামীজী দিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আপ্রাণ পরিশ্রম করে স্বামীজীর নির্দেশমত মেয়েদের সুশিক্ষার জন্ম স্কুল তৈরী করলেন। ভগিনী নিবেদিতার এতবড় ত্যাগ, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি প্রত্যেক নারীর জীবনে আদর্শস্বরূপ। আমাদের দেশের মেয়েদের যতটুকু ক্ষমতা আপ্রাণ যত্নে নিজেকে উন্নত করতে ও দেশকে ভালবাসতে চেষ্টা করতে হবে। দেশের কল্যাণের জন্ম দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা মেটাবার জন্ম, পুরুষদের ন্যায় মেয়েদেরও যত্নবান হতে হবে। এটা ধর্মজীবনেরই অঙ্গ। এইরূপেই আমরা আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মহিমা অটুট অক্ষয় করে রাখতে পারব।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে, সদ্ভাবে জীবন-যাপন করতে হলে প্রথমেই দরকার জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার ও সত্যনিষ্ঠা ও সেই প্রেমময় জগৎকারণের চরণে অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে হয় না, সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী-গুরুগ্রহণ, নারীভাবে সাধন, সেজন্যই মাতৃভাব প্রচার ও নারীমঠ স্থাপনের সংকল্প। চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়।

একের প্রকাশ

শ্রীশক্তিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক কথা বলার মাঝে
　　না-বলা এক কথা,
আজকে আমার মরম মাঝে
　　জাগায় করুণ ব্যথা।
অনেক তারার মাঝে শুধু
　　একটি তারার চাওয়া,
আমার মনে জাগিয়ে দিলে
　　না পাওয়া আর পাওয়া।
আঁচলভরা ফুলের মাঝে
　　একটি ফুলের বাস,
করলে মনে বেদন-মধুর
　　অতীত পরকাশ।
অনেক পাখীর কুজন মাঝে
　　একটি 'কুহু' ধ্বনি,
স্বচ্ছ মনে আনলে টেনে
　　চিন্তা চিরন্তনী।
শালুক পাতা ছাপিয়ে জলে
　　একটি সরোজ ভাসে,
শ্যামকিশলয় ঢাকা দিয়ে
　　একটি কুসুম হাসে।

দৃষ্টি

শান্তশীল দাশ

তোমারে খুঁজেছি আমি দূরে বহু দূরে,
তীর্থে তীর্থে দেবালয়ে ; বহু পথ ঘুরে,
গিয়েছি দুর্গম দেশে ক্লান্ত দেহ বহি,
দর্শন পাবার আশে শত দুঃখ সহি।
তোমার মেলেনি দেখা—ব্যর্থ পর্যটন ;
অবিশ্রান্ত দিবানিশি অন্ধ অন্বেষণ।

প্রশ্ন জাগে বারে বারে বিক্ষুব্ধ অন্তরে :
একি শুধু অকারণ মিথ্যা কল্পনার
পিছে ছুটে মরে সব যুগ যুগ ধরে
যাত্রীদল—নেই কোন অস্তিত্ব তোমার ?
তুমি নেই, মিথ্যা সব তীর্থ দেবালয়,
কল্পনাবিলাসী মনে তোমার আশ্রয়।

সংশয়ের মাঝে শুনি অস্ফুট গুঞ্জন :
আমি তো রয়েছি, কোথা তোর দু'নয়ন !

জাতিভেদের মূলকথা ও ক্রমপরিণতি

[শাস্ত্র হইতে যে প্রকার প্রতিভাত হয়]

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

যাঁহারা সর্বভূতে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ও তাহা স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, সেই হিন্দুগণের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইল, এই বিষয়ে ইদানীন্তনকালে শিক্ষিতসমাজে নানা মতভেদ দেখা যায়। সেই সকল বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়া আমাদের সুপ্রাচীন শাস্ত্র—শ্রুতি ও স্মৃতি এই বিষয়ে কি বলেন, তাহাই প্রস্তাবিত প্রবন্ধে আলোচনা করিব। শ্রুতি ও তদনুগামিনী স্মৃতিতে এই বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে দুইপ্রকার অভিমত পরিদৃষ্ট হয়—নব কল্পারম্ভে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই জন্মগত জাতিভেদ এবং মানবসৃষ্টির পরবর্তিকালে গুণ ও কর্মানুসারে জাতিভেদ। ঐতিহাসিক ঘটনা ও বস্তুর স্বরূপ উভয় প্রকার হইতে পারে না, এজন্য জাতিভেদপ্রথার প্রারম্ভ বিষয়ে উক্ত উভয়প্রকার অভিমতই বস্তুগতিতে সত্য মনে করা কঠিন। সুতরাং জাতিভেদবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকলের তাৎপর্য কি, কি তাহাদের প্রতিপাদ্য, তাহা পূর্ব ও উত্তরমীমাংসাসম্মত যুক্তিসহযোগে বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে শাস্ত্রবাক্যের অর্থনিরূপণই শাস্ত্রের তাৎপর্যাবধারণের অভ্রান্ত উপায়। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—"আর্ষ (ঋষিদৃষ্ট বেদ) ও ধর্মোপদেশকে (বেদমূলক স্মৃতি ইত্যাদিতে বর্ণিত উপদেশ সকলকে) যিনি বেদের অবিরোধী তর্কের দ্বারা (পূর্ব ও উত্তরমীমাংসাসম্মত যুক্তির দ্বারা) বিচার করেন, তিনিই ধর্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে।" (মনুসংহিতা, ১২।১০৬) ইত্যাদি।[১] এই মহাজনবাক্য অনুসরণ করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে জাতিভেদের উৎপত্তিবোধক শাস্ত্রবাক্যসকলের বিচার করিয়া তদ্বিষয়ক একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। জাতিভেদের উৎপত্তি প্রতিপাদক উক্ত উভয়প্রকার শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যগুলি এই—

জন্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য

জন্মগত জাতিভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য এই—

(১) "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩।১২।১৩, ঋগ্বেদ সং ১০।৯০।১২)। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য-অনুসারে ইহার অর্থ এই—"ইঁহার (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।" (২) "প্রজাপতিঃ অকাময়ত প্রজায়েয় ইতি, সঃ মুখত স্ত্রিবৃতং নিরমিমীত * * ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশুনাম্" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪)—"প্রজাপতি কামনা করিয়াছিলেন, উৎপন্ন হইব, তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎস্তোমকে উৎপাদন করিয়াছিলেন * * মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে এবং পশুগণের মধ্যে ছাগকে উৎপাদন করিয়াছিলেন," ইত্যাদি। "মধ্যতঃ সপ্তদশঃ"

১ প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে প্রধান প্রধান কয়েকটি স্থল ব্যতিরেকে মূল শাস্ত্রবাক্যসকল আমরা উদ্ধৃত করিতেছি না। তবে সেই বাক্যসকলের টীকাদি অবলম্বনে যথার্থ অনুবাদ প্রবন্ধমধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তত্তৎস্থলে উল্লিখিত সংখ্যানুসারে আকরগ্রন্থে মূল শ্লোকগুলি দেখিয়া লইবেন। মহাভারতের উদ্ধৃতি-সংখ্যাসকল বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নীলকণ্ঠের টীকাসহ মূল মহাভারত হইতে প্রদত্ত হইতেছে।

(তৈঃ সং ৭।১।১।৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে উদর হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি পঠিত হইয়াছে।

উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের অনুকূল স্মৃতিবাক্য এই—

"ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ॥
বর্ণানাং পরিচর্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ।
বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ"॥

(মহাভাঃ শান্তিঃ ৭২।৪—৫)। ইহার অর্থ—"হে রাজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছেন এবং উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য সৃষ্ট হইয়াছেন। আর বর্ণত্রয়ের পরিচর্যার জন্য চতুর্থ বর্ণ শূদ্র তাঁহার পাদযুগল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।" শান্তিপর্বে ৩১৮।৯০ শ্লোকে ব্রহ্মার নাভি হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্য হইতে প্রতিভাত হয়—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তত্তৎ অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি তত্তৎ জাতির পৃথক্ পৃথগ্ভাবে উৎপত্তি হওয়ায় জাতি জন্মগতই। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই তাঁহার বিভিন্ন অবয়ব হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হইয়াছে।

গুণকর্মগত জাতিভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য

এইবার গুণকর্মগত জাতিভেদের প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি দেখা যাক—

(১) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ একমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, কাণ্ব, ১।৪।১১); (২) "স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত" (ঐ, ১।৪।১২); (৩) "স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত" (ঐ, ১।৪।১৩)। ভগবান শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্য এবং আনন্দগিরি-কৃত টীকানুসারে এই শ্রুতিবাক্যসকলের অর্থ এই—"অগ্রে (ক্ষত্রিয়াদি জাতির উৎপত্তির পূর্বে) ইহা (এই ক্ষত্রিয়াদি জাতি) একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিরূপেই বর্তমান ছিল। তিনি (ব্রাহ্মণ জাতিতে 'আমি' এই প্রকার অভিমানসম্পন্ন প্রজাপতি) একা ছিলেন বলিয়া (জগতের পরিপালক ক্ষত্রিয়াদি ছিল না বলিয়া) ব্রাহ্মণ জাতির যাহা কর্তব্যকর্ম, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি (সেই ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী প্রজাপতি, ব্রাহ্মণ) প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয় জাতিকে সৃষ্টি করিলেন।" "তিনি (ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তিকর্তা ব্রাহ্মণ, বিত্ত উপার্জনকারীর অভাবে) কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তিনি বৈশ্য জাতিকে সৃষ্টি করিলেন।" "তিনি (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির উৎপত্তিকর্তা ব্রাহ্মণ, পরিচারকের অভাববশতঃ) কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তিনি শূদ্রজাতির সৃষ্টি করিলেন, ইত্যাদি।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের অনুকূল স্মৃতিবাক্য এই—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনা প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

* * *

"ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।
তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যা তত্র তত্র হি জাতয়ঃ॥
পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ॥

(মহাভাঃ শান্তিঃ ১৮৮।১০—১৪, ১৭—১৮)

পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত টীকাবলম্বনে ইহাদের অর্থ এই—"বর্ণ (জাতি) সকলের মধ্যে প্রভেদ নাই, কারণ এই সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিযুক্ত)। ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্ব সৃষ্টই (ব্রাহ্মণই) কর্মসকলের দ্বারা বর্ণতা (বিভিন্ন জাতিভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা

কামভোগপ্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধপরায়ণ, সাহসী এবং রক্তবর্ণ (রজোগুণপ্রধান), স্বধর্মত্যাগী (ব্রাহ্মণের ধর্মত্যাগী) সেই ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা গোসকল হইতে ও কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, পীতবর্ণ (রজঃ ও তমোগুণযুক্ত) এবং স্বধর্মের (ব্রাহ্মণ্যধর্মের) অনুষ্ঠান করিতেন না, সেই ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা হিংসা ও মিথ্যাপ্রিয়, লোভী, সকল প্রকার কর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, কৃষ্ণবর্ণ (তমোগুণযুক্ত) শৌচাচারবিহীন সেই ব্রাহ্মণগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" * * * "যাঁহারা সৃষ্ট সমস্ত পদার্থকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন রূপে জানেন না [অথবা অন্য ব্যাখ্যা—সৃষ্ট (হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক প্রকাশিত) এই পরব্রহ্মকে (উৎকৃষ্ট বেদকে) যাঁহারা জানেন না],[২] তাঁহারাই অব্রাহ্মণ। নানাদেশে তাঁহাদের বহুবিধ জাতিসকল আছে। তাঁহারাই পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও নানাবিধ ম্লেচ্ছজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছেন"[৩] ইত্যাদি।

পূর্বমীমাংসা ৩।২।২ অধিকরণন্যায়বলে গুণকর্মগত জাতিভেদপক্ষই গ্রহণীয়।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে পরস্পর-বিরুদ্ধ এই উভয়বিধ শ্রুতিবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যসকলের তাৎপর্য কি? উভয় প্রকার বাক্যই শাস্ত্রবাক্য, তাহাদের কোনটিকেই অপ্রমাণ বলা চলিবে না, সুতরাং অগ্রাহ্যও করা চলিবে না। সেইহেতু মীমাংসান্যায় প্রয়োগ দ্বারা উক্ত বাক্যসকলের প্রতিপাদ্য কি, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—জন্মগত জাতি প্রতিপাদক "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৩) এবং "প্রজাপতিঃ অকাময়ত" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪ ইত্যাদি—এইগুলি মন্ত্রবাক্য।[৪] [শেষোক্ত শ্রুতিবাক্যসকলও যে মন্ত্রবাক্য, ইহা "বর্ণ্যন্তে সপ্তমে কাণ্ডে মন্ত্রাঃ কেঽপ্যশ্বমেধগাঃ" (তৈঃ সং ৭।১ সায়ণভাষ্য, উপোদ্‌ঘাত ২৯)—"সপ্তম কাণ্ডে অশ্বমেধযজ্ঞে বিনিয়োগের উপযুক্ত কতকগুলি মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে", ইত্যাদি ভাষ্যবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়]। আর গুণকর্মানুসারে জাতিভেদ প্রতিপাদক "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।১১) ইত্যাদি—এইগুলি ব্রাহ্মণবাক্য। পূর্ব মীমাংসাতে ৫।১।৯ "ব্রাহ্মণপাঠাৎ মন্ত্রপাঠস্য বলীয়স্ত্বাধিকরণে" প্রয়োগ সামর্থ্য থাকায় (কর্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রের দ্বারা কর্মাঙ্গকলাপের স্মরণ করিয়া সেই অঙ্গসকল ক্রমশঃ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া) ব্রাহ্মণ-পাঠাপেক্ষা মন্ত্রপাঠের বলবত্তা নিরূপিত হইয়াছে; তদনুযায়ী প্রস্তাবিতস্থলে মন্ত্রপাঠের প্রাবল্য স্বীকার করিয়া জন্মগতজাতিবিভাগই স্বীকার করিতে হয়। তাহা কিন্তু সম্ভব হইতেছে না। কারণ পূর্ব মীমাংসাতেই ৩।২।২ "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যে বিনিয়োগাধিকরণে" অনুষ্ঠেয় কর্মের ক্রমনিরূপণ ব্যতিরিক্তস্থলে মন্ত্রপাঠাপেক্ষা ব্রাহ্মণপাঠেরই বলবত্তা নিরূপিত হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মণপাঠ অপ্রাপ্ত বিষয়ের বোধ উৎপাদন করে। প্রস্তাবিতস্থলে "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।১১) ইত্যাদি এই ব্রাহ্মণবাক্য-সকল কোন প্রকার অনুষ্ঠেয় বিষয় প্রকাশিত করিতেছে না, আর মন্ত্রের ন্যায় তাহার প্রয়োগ-সামর্থ্যও নাই। অবিস্তার কার্য বর্ণনা করিতে

২ এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট সঙ্গত মনে হয়। ইহার সমর্থন পরে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

৩ এই বিষয়টিতে পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

৪ বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রে অনুষ্ঠেয় বিষয়সকল বর্ণিত হইয়াছে। কর্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সেই অনুষ্ঠেয় বিষয়সকলের স্মরণ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রাহ্মণ মধ্যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, কর্মবোধক বিধি, কর্মের দ্রব্য ও দেবতা ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে।

প্রবৃত্ত হইয়া অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতি উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যসকলে অবিদ্যার কার্যভূত চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন। এই প্রকারে উক্ত ব্রাহ্মণবাক্যসকলে অন্য প্রমাণ দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের বোধ উৎপাদিত হইতেছে বলিয়া পূঃ মীঃ ৩।২।২ অধিকরণন্যায়বলে এই ব্রাহ্মণ-বাক্যসকলই হইবে পূর্বোক্ত মন্ত্রবাক্য সকল অপেক্ষা প্রবল। লোকমধ্যে সকলে প্রবলেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইহেতু প্রস্তাবিত স্থলে প্রবল ব্রাহ্মণ পাঠানুসারে তৎপ্রতিপাদ্য গুণ ও কর্মগত জাতিভেদ পক্ষই যে শ্রুতি ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য, সুতরাং তাহাই গ্রহণীয়, মন্ত্রবাক্যপ্রতিপাদ্য জন্মগতজাতিভেদপক্ষ নহে, ইহাই নির্ণীত হয়।[৫]

বিশেষ ফলপ্রদ উপাসনা প্রতিপাদক হওয়ায় "ব্রাহ্মণোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠও ব্যর্থ নহে।

কিন্তু ব্রাহ্মণপাঠই এইস্থলে প্রবল হইলে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য তো ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর তাহা যদি ব্যর্থ হয়, কোন বিষয় প্রতিপাদনে যদি তাহার অবকাশ না থাকে, তাহা হইলে "সাবকাশনিরবকাশয়োর্মধ্যে নিরবকাশস্য বলীয়স্ত্বম্"—"সাবকাশ ও নিরবকাশের মধ্যে নিরবকাশই বলবান্ হইয়া থাকে", [যেমন নির্ধন ব্যক্তি বলপূর্বক ধনীর ধন অপহরণ করে], এই মীমাংসাসম্মতন্যায় বলে নিরবকাশ (কোন প্রকার প্রতিপাদ্যবিহীন) মন্ত্রপাঠই হইবে প্রবল। সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে তদনুসারে জন্মগত জাতিই স্বীকরণীয় হইবে। তাহাও কিন্তু সম্ভব হইতেছে না। কেন? কারণ—"তাৎপর্যগ্রাহক ষড়্‌বিধলিঙ্গ প্রমাণের" প্রয়োগ দ্বারা "বিরাট্‌প্রাপ্তিরূপ স্বর্গাত্মক ফললাভের" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৮ সায়ণভাষ্য) জন্য অর্থাৎ প্রজাপতিলোক লাভের জন্য মানসযজ্ঞ-রূপ এক প্রকার উপাসনা উক্ত মন্ত্রসকলে প্রকাশিত হইয়াছে। (১) উপক্রম ও উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি, এই ছয়টির নাম 'তাৎপর্যগ্রাহক লিঙ্গপ্রমাণ।'

লিঙ্গ শব্দের অর্থ—জ্ঞাপক চিহ্ন। বেদের কোন্ প্রকরণে কি বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে অর্থাৎ সেই প্রকরণের তাৎপর্য কি, তাহা নিরূপণের জন্য এই লিঙ্গ ছয়টির প্রয়োগ হয়। বেদবাক্যসকলের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত নানা প্রকার উপায় আছে, এই তাৎপর্যগ্রাহক লিঙ্গসকলের প্রয়োগ তাহাদের অন্যতম। কোন প্রকরণের উপক্রমে (প্রারম্ভে) যদি কোন বিষয় উল্লিখিত হয়, উপসংহারেও (শেষেও) যদি সেই বিষয়টিই বর্ণিত হয়, মধ্যস্থলেও যদি সেই বিষয়টির অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ কথন) থাকে, সেই বিষয়টি যদি অপূর্ব হয় (শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞাত হয়), সেই বিষয়টির অনুশীলন বা জ্ঞান হইতে যদি অনুশীলনকারীর বা জ্ঞাতার কোন বিশেষ ফল লব্ধ হয়, সেই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য যদি আখ্যানাদিরূপ কোন প্রকার অর্থবাদবাক্য থাকে এবং সেই প্রকরণে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ের নিরাকরণের জন্য যদি উপপত্তি (যুক্তি) থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয়টিই যে শ্রুতির সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য, তৎপ্রতিপাদনেই যে শ্রুতির তাৎপর্য, ইহাই নির্ণীত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে উক্ত লিঙ্গ ছয়টির প্রয়োগ এইরূপ—

"ব্রাহ্মণোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রসকল শ্রুতির যে প্রকরণে পঠিত হইয়াছে, সেই প্রকরণে "দেবা

৫ এইস্থলে মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত যে ন্যায়সমূহ প্রদর্শিত হইল এবং পরেও যে ন্যায়সকল প্রদর্শিত হইবে, সাধারণ পাঠক যে সেই সকলের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন প্রবন্ধলেখক এই প্রকার দুরাশা পোষণ করেন না। তবে, শাস্ত্রার্থনিরূপণের জন্য এই প্রকার শাস্ত্রসম্মত উপায়সকল আছে এবং তাহাদের প্রয়োগ দ্বারা গুণকর্মগতজাতিবিভাগই সিদ্ধ হয়, এইটুকুমাত্র তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলেই লেখক সফলকাম হইবেন।

যজ্ঞমতন্বত" (ঐঃ আঃ ৩।১৬)—"দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন" এই প্রকারে 'উপক্রম' (আরম্ভ) করিয়া "যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" (ঐঃ ৩।১২।১৮)—"দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন"—এই প্রকারে 'উপসংহার' (বর্ণনার শেষ) করা হইয়াছে। সেই মানসযজ্ঞের অঙ্গকলাপ কি তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে বিরাট পুরুষ সেই মানসযজ্ঞে হবনীয় পশুরূপে কল্পিত হইয়াছেন, সেই পুরুষের হস্তপদাদি অবয়ব সকল কি, সেই যজ্ঞে অপেক্ষিত ঘৃত, কাষ্ঠ ইত্যাদি বস্তু সকলই বা কি, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ"—"ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন" (ব্রাহ্মণজাতি তাঁহার মুখ), "বসন্ত ঋতু এই যজ্ঞে ঘৃত" (ঐঃ আঃ ৩।১২।৬) "গ্রীষ্ম ঋতু যজ্ঞকাষ্ঠ" (ঐ) ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাঙ্গ-সকলের বর্ণনা-দ্বারে এবং "যজ্ঞং তন্বানাঃ" (ঐঃ আঃ ৩।১২।৭)—"মানসযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গী মানস যজ্ঞের 'অভ্যাস' (পুনঃ পুনঃ বর্ণনা) ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রকার যে মানসযজ্ঞ, তাহাকে শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না বলিয়া ইহার 'অপূর্বতা' (অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের বিষয় না হওয়া) সিদ্ধ হয়। "তে নাকং মহিমানং সচন্তে" (ঐঃ আঃ ৩।১২।১৮)—"সেই উপাসকগণ বিরাট-প্রাপ্তিরূপ স্বর্গাত্মক মহিমাকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি প্রকারে সেই মানসযজ্ঞের 'ফল' বর্ণিত হইয়াছে। "প্রজাপতির প্রাণরূপ দেবতাগণ যখন সঙ্কল্প প্রভাবে পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১২) "পুরাকালে প্রজাপতি উপাসকগণের উপকারের জন্য ইহা বলিয়াছিলেন" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৭), ইত্যাদি 'অর্থবাদ'বাক্যও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণাদিজাতি সেই যজ্ঞীয় পশুরূপ বিরাট পুরুষের মুখাদি হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে, বসন্ত ইত্যাদি ঋতুই বা কি প্রকারে ঘৃত প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য হইবে, ইত্যাদি প্রকার সংশয়ের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—"কতিধা ব্যকল্পয়ন্" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১২)—"কত প্রকারে কল্পনা করিয়াছিলেন" এবং "কুতোঽকল্পয়ন্" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৮) ইত্যাদি এই প্রকারে যে সন্দংশ-ন্যায়[৬] প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে 'উপপত্তি' (যুক্তি)। তাহাতে ইহাই বলা হইল যে, এই সকলই কল্পনা মাত্র, শ্রুতির নির্দেশানুসারে বিশেষ ফললাভের জন্য এইপ্রকার কল্পনা পূর্বক উপাসনা করিতে হইবে, ইত্যাদি। এইপ্রকারে তাৎপর্যগ্রাহক এই ষড়বিধ লিঙ্গপ্রমাণবলে নির্ণীত হইল যে—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি বাক্যসকলে একপ্রকার উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপ্রতিপাদনই উক্ত স্থলে শ্রুতির তাৎপর্য; ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি প্রতিপাদনে নহে। আর উপাসনাও এক প্রকার ক্রিয়া, এই মন্ত্র সকলে সেই উপাসনার ক্রম বর্ণিত হইতেছে বলিয়া পূঃ মীঃ ৫।১।৯ অধিকরণ ন্যায় এইস্থলে সার্থক হয়। ব্রাহ্মণপাঠ ইহাকে

[৬] 'সন্দংশন্যায়—(সাঁড়াশী ন্যায়)—"অন্তরালে (মধ্যস্থলে) বিহিত হওয়াই সন্দংশ।" ভাব এই—সাঁড়াশীর দুইটি অবয়ব; এই অবয়বদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গারাদি বস্তুকে গ্রহণ করা হয়। এই প্রকারে সাঁড়াশীর মধ্যে যে বস্তুটি গৃহীত হয়, তাহা যেমন অন্যান্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয়—তদ্রূপ এই সন্দংশ-ন্যায় বলে সাঁড়াশীর দুইটি অবয়বের মধ্যে যে বাক্যগুলি পঠিত হয়, তাহারা তৎপ্রকরণে পঠিত অন্যান্য বাক্যাপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদন করে। প্রস্তাবিতস্থলে "কতিধা ব্যকল্পয়ন্" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১২) এই বাক্যটি হইল সাঁড়াশীর একটি অবয়ব, আর "কুতোঽকল্পয়ন্" (ঐ ৩।১২।১৮) এই বাক্যটি হইল অপর একটি অবয়ব। এই অবয়বদ্বয়ে কল্পনা করিবার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত অবয়বদ্বয়ের মধ্যে পঠিত যাবতীয় বস্তুই যে উপাসনার্থে কল্পনার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই নির্ণীত হয়। এই কল্পিত পদার্থসকলের সাদৃশ্যবশতঃ উপমান প্রমাণ বলে সন্দংশের বহির্ভূত 'পুরুষরূপ পশু', 'বসন্তঋতুরূপ ঘৃত' (তৈঃ আঃ ৩।১২।৬) ইত্যাদি পদার্থসকলও যে উপাসনার জন্য কল্পিত—ইহাও নির্ণীত হয়। অভিজ্ঞ পাঠক সায়ণভাষ্যসহ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্ত প্রকরণ আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বাধা দান করিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রপাঠের প্রাবল্যবলে উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলে উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহারা ব্যর্থ নহে, ইহাই নির্ণীত হইল। আর "সঃ মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত··· ব্রাহ্মণো মনুষ্যানাম্" (তৈঃ সং ৭।১।১।৪) ইত্যাদি মন্ত্রসকলও ব্যর্থ হইয়া পড়ে না, কারণ উক্ত মন্ত্রসকলে সোমযজ্ঞের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা সোমযজ্ঞের উক্ত প্রকার মহিমা জানেন, তাঁহারা অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের (সোমযজ্ঞের) অনুষ্ঠান করিতে ও তাহার ফল প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন" (তৈঃ সং ৭।১।১।৬) ইত্যাদি স্পষ্ট বাক্যসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। অতএব 'নিরবকাশের বলীয়স্ত্ব ন্যায়ের' প্রবৃত্তি এইস্থলেও হইতে পারে না।

শ্রুতিবাক্যের উভয় প্রকার তাৎপর্য স্বীকারে শ্রুতির ব্যর্থতা

কিন্তু লোকমধ্যে তো দেখা যায়—"সৈন্ধব আনয়ন কর" ইত্যাদি এই প্রকার বাক্যসকলের দুই প্রকার অর্থ হয়, যথা—'সৈন্ধব লবণ আনয়ন কর' ও 'সিন্ধুদেশজাত ঘোটক আনয়ন কর'। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলের অর্থ উভয় প্রকার হউক, তাহারা যথাক্রমে উপাসনা ও সোমযজ্ঞের মহিমা প্রতিপাদন করুক এবং ব্রহ্মার মুখাদি অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি, প্রতিপাদন করুক। তদুত্তরে বলা যায়—লোকমধ্যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ে শব্দের এই প্রকার অর্থদ্বৈবিধ্য স্বীকৃত হইলেও অতীন্দ্রিয় বিষয়ক শ্রুতিবাক্যে তাহা স্বীকার করা যায় না। শ্রুতি অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রতিপাদন করেন; সুতরাং শ্রুতিবাক্যের দুই প্রকার তাৎপর্য স্বীকার করিলে, কোন্ তাৎপর্যটি শ্রুতির অভিপ্রেত তাহা নির্ণীত হইবার কোন উপায় না থাকায়, লোকের শ্রুতির উপর আস্থা থাকিবে না; ফলে লোককল্যাণকামিনী শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। কিন্তু 'আম্রবৃক্ষ রোপিত হইলে আম্রফল লাভই হয় তাহার মুখ্য প্রয়োজন, তথাপি ছায়া ও জ্বালানি কাষ্ঠলাভ ইত্যাদি হয় তাহার অবান্তর প্রয়োজন। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ উপাসনা ও স্তুতি প্রতিপাদনে উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলের মুখ্য তাৎপর্য থাকিলেও 'ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি' প্রতিপাদনে উক্ত বাক্যসকলের অবান্তর তাৎপর্য স্বীকার করিতেছ না কেন? বলিতেছি;—সত্য বটে বিচারকালে শ্রুতিবাক্যের অবান্তর তাৎপর্য কোন কোন স্থলে স্বীকৃত হয় (উত্তর মীমাংসা ১।৩।২ ভূমাধিকরণ দ্রষ্টব্য), কিন্তু সন্দংশন্যায় দ্বারা নিয়মিত 'অবান্তর প্রকরণ প্রমাণ' তাদৃশ অবান্তর তাৎপর্যের নিয়ামক হয়। প্রস্তাবিত স্থলে সন্দংশন্যায় উপাসনার জন্য কল্পিত অঙ্গপ্রতিপাদনেই বিনিযুক্ত, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইহেতু ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তিতে উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলের অবান্তর তাৎপর্যও স্বীকার করা যায় না। এই প্রকারে এতাবৎ পর্যন্ত বিচারে ইহাই নির্ণীত হইল যে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।১১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যের বলে ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ গুণকর্মগত, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ", ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য ও তদনুগামী স্মৃতিবাক্যবলে জন্মগত নহে।

জন্মগত জাতি প্রতিপাদক স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য কি?

এইরূপে দেখা গেল—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" (তৈঃ আঃ ৩।১২।১৩) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য জন্মগত জাতিবিভাগ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইল না। সেইহেতু তদনুগামী "ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টঃ" (মহাভাঃ শান্তিঃ ৭২।৪) ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও তাহা প্রতিপাদন করিতে পারিল না। এক্ষণে সংশয় হয়—উক্ত স্মৃতিবাক্যসকল তো তাহাদের মূলভূত শ্রুতিবাক্যের ন্যায় উপাসনাদি কোনকিছুও প্রতিপাদন করিতে পারে না, কারণ স্মৃতির যে প্রকরণে তাহারা পঠিত হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ উপাসনা প্রভৃতির কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং

কোন্ বিষয়ে উক্ত স্মৃতিবাক্যসকল সাবকাশ হইবে (তাহারা কি প্রতিপাদন করিবে)? তদুত্তরে বলা যায়—ইহার মীমাংসা খুবই দুরূহ, 'বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানে লাঙ্গুল যোজনার' ন্যায়' বহু পুরাণ বাক্যেরই কোন প্রকার সুষ্ঠু সমাধান অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে মনে হয়, ক্রমবিবর্তনের ফলে সমাজ তৎকালে যে অবস্থাতে উপনীত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই সাধারণ মনুষ্যের শ্রদ্ধোৎপাদন, সমাজে বিশৃঙ্খলা-নিরাকরণ ও ধর্ম-ব্যবস্থাপনের জন্য পুরাণকারগণ হয়তো শ্রুতির ছায়াবলম্বনে উক্ত শ্লোকসকল পুরাণে প্রবেশ করাইয়া থাকিবেন—যেমন ধর্মব্যবস্থা প্রদর্শনের জন্য পরবর্তিকালে বহু দার্শনিক গ্রন্থেও জন্মগতজাতি প্রতিপাদনের জন্য নানা যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

গুণকর্মগত জাতিভেদের সমর্থক অন্যান্য যুক্তি ও স্মৃতিবাক্য

এইরূপে দেখা গেল, সুপ্রাচীনকালে একই আর্যজাতি জীবিকার্জনের ও দেশরক্ষাদি প্রয়োজনের তাগিদে তত্তৎ ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (গুণ) ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি শূদ্রান্ত জাতিচতুষ্টয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যথা সমাজব্যবস্থা চলে না। সর্বদেশেই নামে না হইলেও, ব্যবহারে এইপ্রকার স্বাভাবিক জাতিবিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানও গীতামুখে বলিয়াছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' (গীতা ১৪।১৩)। সুতরাং চাতুর্বর্ণ্যের এই বিভাগকে ভগবৎকৃত স্বাভাবিক বিভাগই বলিতে হইবে। এই প্রকারে বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সুপ্রাচীন কালে তাহা ইদানীন্তন কালের ন্যায় বংশগত হইয়া পড়ে নাই, গুণ ও কর্মানুসারে তখনও জাতি ছিল পরিবর্তনশীল। শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণ পরিদৃষ্ট হইলে তৎকালে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রহণ করা হইত। ব্রাহ্মণে তাদৃশ গুণ না থাকিলে তিনিও শূদ্ররূপে পরিগণিত হইতেন। নিম্নোক্ত শাস্ত্রবচনসকল সেই বিষয়ে প্রমাণ—

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র বলিতেছেন,—"জাতকর্মাদি দ্বারা যাঁহারা সংস্কৃত, বেদাধ্যয়নশীল, শুচি, সন্ধ্যা-বন্দনা-জপ-হোম-দেবতাপূজন ও অতিথিসৎকারাদি ষট্‌কর্মে নিরত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। সত্যকথন, দান, অদ্রোহ, অনিষ্ঠুরতা, লজ্জা, ঘৃণা ও তপস্যা—ইহারা যে ব্যক্তিতে পরিদৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করেন, দেশরক্ষাদি কার্যে যুদ্ধাদি কর্ম করেন, ব্রাহ্মণগণকে দান করেন ও প্রজাগণের নিকট করগ্রহণ করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, কৃষি-বাণিজ্য ও গোপালন করেন, তাঁহারা বৈশ্য। যাঁহারা বেদত্যাগ করেন, অশুচি, সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠানকারী ও সকল প্রকার দ্রব্য ভক্ষণকারী, অনাচারী তাঁহারা শূদ্র। কিন্তু শূদ্রে যদি উক্ত সত্য কথন, দান ইত্যাদি গুণসমূহ পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। আর ব্রাহ্মণে যদি উক্ত গুণসকল দেখা না যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।১—৮)। এইস্থলে টীকাকার পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এই সত্যাদি গুণসমূহই বর্ণবিভাগের কারণ, জাতি (জন্ম) নহে। সমাজের যখন এই প্রকার পরিস্থিতি ছিল, তখন এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের জন্য কোন প্রকার বিধিনিষেধ ছিল না ইহা কল্পনা করা চলিতে পারে। পরবর্তী কালে জাতিভেদ জন্মগত হইয়া পড়িলে যে প্রকারে অনুলোম ও বিলোম বিবাহপদ্ধতি সমাজে নানা সঙ্করজাতি স্বীকৃতির প্রতি হেতু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরিশঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* বাল্মীকি রামায়ণ (শ্রীরামদাস মহাপণ্ডিত) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩।১৮)।

গুণকর্মগত জাতির মাত্র কর্মগত জাতিতে ক্রমপরিণতি

সমাজে লোকসংখ্যা যখন পরিমিত ছিল, তখন বর্ণ ও আশ্রম সকলের রক্ষক নৃপতিবৃন্দই গুণ-কর্মানুসারে বর্ণসকলকে নিয়মিত করিতেন এবং উচ্চাবচ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিতেন—ইহা স্বীকার করিলে অসঙ্গতি হইবে না, কারণ "কামং তান্ ধার্মিকো রাজা শূদ্রকর্মসু যোজয়েৎ" (বোধায়ন স্মৃতি ২।৪।১০) ইত্যাদি স্মৃতিবচনসকল হইতে সেই প্রকার পরিস্থিতিই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের কর্ম যে প্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ সেই প্রকার নহে। তাদৃশ গুণহীন ব্যক্তিও রাজকোশে নিজেতে তাদৃশ গুণের অস্তিত্ব প্রদর্শনদ্বারা স্বীয় বর্ণের পরিবর্তন করিতে পারেন, মনুষ্য-চরিত্র পর্যালোচনা করিলে এই প্রকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবতঃ ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র জাতকের বর্ণ নির্দেশ করিয়া তাহার জাতিনিরূপণে এই সময়ে নৃপতিগণকে সহায়তা করিত। [অদ্যাপিও আমাদের কোষ্ঠীতে বর্ণের নির্দেশ পরিদৃষ্ট হয়]। সুতরাং গুণানুযায়ী জাতি নিরূপণ করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িতে লাগিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তখন কর্মানুসারে জাতি-নিরূপণের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে। অন্যান্য কর্মের ন্যায় বেদপাঠরূপ কর্ম তখন হইয়া দাঁড়াইল জাতিনিরূপণের একটি প্রধান পরিমাপক। নিম্নোদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যসকল সেই বিষয়ে প্রমাণ—"যতদিন বেদাধ্যয়ন না করে ততদিন তাহার জীবন শূদ্রের সমান" (বাশিষ্ঠ সং ২)। "বেদত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেইহেতু বেদত্যাগ করিবে না" (বাশিষ্ঠ সং ১০)। "যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সেই ব্যক্তি ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়" (মনু সং ২।১৬৮, বাশিষ্ঠ সং ৩)। "বেদত্যাগী অনাচারী ব্যক্তিই শূদ্র" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৯।৭) ইত্যাদি। এইভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে—যাঁহারা বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত কর্মসকল অবলম্বনেই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতিই রহিয়া গেলেন। যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বেদাধ্যয়ন সহ অন্যান্য তত্তৎবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারা হইলেন 'ক্ষত্রিয়' বা 'বৈশ্য'। আর যে আর্যগণ বেদাধ্যয়ন একেবারে ত্যাগ করিলেন এবং অপরের পরিচর্যাদি দ্বারা নানাভাবে জীবিকার্জন করিতে লাগিলেন তাঁহারা হইলেন 'শূদ্র'। অপরের পরিচর্যাদি দ্বারা যাঁহারা জীবিকানির্বাহ করেন তাঁহাদের ও তাঁহাদের পুত্রদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন একেবারে ত্যাগ ব্যতীত উপায়ান্তরও ছিল না; কারণ নানাপ্রকার ব্রতবহুল বেদাধ্যয়ন তো দূরের কথা, সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ সুযোগও যে সেইরূপ লোকেরা প্রাপ্ত হন না, ইহা বর্তমানকালেও দেখিতে পাই।

সমদর্শিনী শ্রুতি শূদ্রের উপর অবিচার করেন নাই।

উপনয়নসংস্কার না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার হয় না। "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যম্" (তৈঃ ব্রাহ্মণ ১।১।২।৬)—বসন্তকালে ব্রাহ্মণের, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়ের এবং শরৎকালে বৈশ্যের উপনয়নসংস্কার করাইবে"—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের জন্য উপনয়নসংস্কারের বিধান করিয়াছেন, শূদ্রের জন্য তাহা করেন নাই। সেইহেতু অনেকে বলেন—"হিন্দুগণের ধর্মশাস্ত্রই এই বিষয়ে শূদ্রগণকে বঞ্চিত করিয়াছে।" এই প্রকার আক্ষেপ কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ গুণ ও কর্মানুসারে জাতির নির্দেশকারিণী অনাদি শ্রুতি প্রত্যেক সৃষ্টিতে "হিংসাদি গুণযুক্ত সর্বকর্মোপজীবী শৌচাচার-পরিভ্রষ্ট বেদত্যাগী" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮।১৪) এতাদৃশ জনসমষ্টি যে বর্তমান থাকে, তাহা জানেন। সেইহেতু তাদৃশ জনসমষ্টির জন্য

উপনয়নসংস্কারের বিধান শ্রুতি করেন নাই। অনধিকারীর জন্ত কোন বিষয় বিহিত না হইলে, বিধানকর্তাকে তজ্জন্ত পক্ষপাতী বলা যায় না। যেমন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে কি পক্ষপাতদুষ্ট বলা চলে? জন্মগত জাতি স্বীকার করিলেই বরং শ্রুতির উপর উক্ত দোষ আসিতে পারিত। অনাচারীর জন্ত বেদপাঠ নিষিদ্ধ হওয়াও গুণকর্মগতজাতি-স্বীকৃতিরই সমর্থক, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। [শূদ্রের যে বেদশ্রবণে অধিকার আছে, ইহা "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯) ইত্যাদি বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়।]

গুণকর্মগত জাতিচতুষ্টয়ের জন্মগত জাতিতে পরিণতি

এই প্রকারে দেখা গেল—একই আর্যজাতি গুণ ও কর্ম এবং বেদাধ্যয়ন ও তৎত্যাগ, প্রধানতঃ এই কারণসকলবশতঃ ব্রাহ্মণাদি চারিটি জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ এই জাতি-বিভাগ গুণকর্মগত থাকিলেও কালক্রমে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক সার্বভৌম নৃপতির অভাব, গুণকর্মানুসারে জাতিব্যবস্থাপনের দুঃসম্পাদ্যতা, মনুষ্যজাতির স্বীয় সন্তানসন্ততি বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব ইত্যাদি নানাকারণে উহা জন্মগত জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থালোচনা হইতে জানা যায় তাৎকালিক নৃপতিগণ বহুকাল পর্যন্ত এই চারিটি জাতির ধর্মসাঙ্কর্য হইতে দেন নাই। কিন্তু ধর্মসাঙ্কর্য নৃপতিগণের চেষ্টায় নিরাকৃত হইলেও বর্ণসাঙ্কর্য অর্থাৎ উক্ত জাতি-চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ যে নিরাকৃত হয় নাই,' ইহা অবগত হওয়া যায়। যেমন ক্ষত্রিয় গাধিরাজ-তনয়া (বিশ্বামিত্রের ভগিনী) সত্যবতীর সহিত ঋষি ঋচীকের বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের সন্তান ঋষি জমদগ্নি ও তাঁহার পুত্র ভগবদবতার শ্রীশ্রীপরশুরাম কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিরূপেই পরিগৃহীত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে—তৎকালে এই বর্ণচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণ হইত এবং সন্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীরামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক। রাজা দশরথের রাজ্যে সঙ্করজাতি ছিল না, ইহা "ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ" (বাল্মীকি রা, আদি ৬।১২) ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিলে চলিবে না যে—তৎকালে জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ হইত না; তাহা রোধ করিবার সামর্থ্য নৃপতিগণের তো দূরের কথা স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তারও আছে কিনা সন্দেহ; এমনই মনুষ্যজাতির স্বভাব। সুতরাং "দশরথের রাজ্যে সঙ্করজাতি ছিল না; ইহার তাৎপর্য—সন্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হইত, নূতন কোন জাতিরূপে পরিগণিত হইত না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ঋচীকপুত্র জমদগ্নি "বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র মূর্ধাবসিক্ত নামক জাতিতে পরিগণিত হয়" (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।৯১) ইত্যাদি বচনবলে 'মূর্ধাবসিক্ত' জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতেন, ব্রাহ্মণজাতিরূপে নহে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্র তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন (বাল্মীঃ রামা, উত্তঃ ৮৯।৪) বর্ণসঙ্করের ধর্মসাঙ্কর্য নিরাকরণের প্রয়াস মাত্র।

যাহা হউক মনুষ্য সমাজ কিন্তু গতিশীল পদার্থ। মহাভারতের যুগে দেখা যায়—উক্ত মূলজাতি-চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে আর্যসমাজ নানা সঙ্কর-জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে (মহাভাঃ শাঃ ২৯৬।৭—৯, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।৯০—৯৬)। যাজ্ঞবল্ক্য (ইনি বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয়) ও পরাশর (ইনি সুপ্রসিদ্ধ বেদব্যাসের পিতা) প্রভৃতি তাৎকালিক সমাজ-ব্যবস্থাপক ঋষিগণ কীদৃশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে নানাপ্রকার সঙ্করজাতি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাদৃশ সন্তান পিতার [যেমন জমদগ্নির বেলায় হইয়াছে], অথবা মাতার [যেমন

ইদানীন্তনকালেও কেরল দেশে (মালাবারে) কথঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট হয়] জাতি অনুসারে কেন ভগবৎসৃষ্ট মূল চারিটি জাতিতেই নিবদ্ধ থাকে নাই, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। যদি আর্যসমাজ উক্ত মূল জাতিচতুষ্টয়ে নিবদ্ধ থাকিত, মনুষ্যকৃত এত শাখা উপশাখাতে বিভক্ত না হইয়া পড়িত, তাহা হইলে সমাজ এতটা বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িত না, যাহার ফলে এই সুপ্রাচীন জাতিকে এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে।

জন্মগত জাতিও ছিল পরিবর্তনশীল; কালক্রমে বর্তমানাবস্থা

যাহা হউক, সমাজ কিন্তু অল্পকালের মধ্যে এই জন্মগত জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করিয়া লয় নাই। নানাপ্রকার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্ত্যনুসারে জাতির পরিবর্তন চলিতেই ছিল। নিম্নোক্ত স্মৃতিবচনসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। যথা—"ঋষিগণ যেখানে সেখানে পুত্রোৎপাদন করিয়া তপস্যার প্রভাবে তাহাদের ঋষিত্ব (ব্রাহ্মণত্ব) বিধান করিয়াছিলেন, (মহাভাঃ শাঃ ২৯৬।১৩)। বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, শূদ্রাতে উৎপন্ন কাক্ষীবান্ পুত্র এবং কৃপ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত (ঐ ২৫৬।১৪)। সুপ্রসিদ্ধ বেদব্যাস ইহার অপর দৃষ্টান্ত। তপস্যা প্রভাবে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আবার অন্যপ্রকারেও যে জাতিপরিবর্তন তাৎকালিক সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা। ব্যত্যয়ে কর্মণাং সাম্যং পূর্ববচ্চাধরোত্তরম্॥" (যাজ্ঞঃ স্মৃতি ১।৯৬)। মীতাক্ষরাটীকানুযায়ী ইহার অর্থ এই—"জাতির উৎকর্ষ পঞ্চম ষষ্ঠ অথবা সপ্তম জন্মে হয়। বৃত্তির (জীবিকার জন্য অনুষ্ঠেয় কর্মের) ব্যতিক্রম হইলেও সেই প্রকারই হইবে। প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ সঙ্করজাতিস্থলেও পূর্ববৎ হইবে।" ইহার দৃষ্টান্ত এই—ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্না কন্যা (নিষাদী) কন্যাবংশ পরম্পরাতে যদি ব্রাহ্মণেরই সহিত পরিণীতা হয়, তাহা হইলে তাদৃশী ষষ্ঠবংশোৎপন্না কন্যা যে পুত্রসন্তান প্রসব করিবে সেই সন্তান হইবে ব্রাহ্মণ। এই প্রকারে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবিকার্জন করে এবং এইভাবেই পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে, তাহা হইলে সপ্তম পুরুষে সেই ব্রাহ্মণবংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা ষষ্ঠ পুরুষে বৈশ্যত্ব এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বর্ণসঙ্কর অন্যান্য জাতিস্থলেও এই প্রকার ব্যবস্থা মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। তাৎকালিক সমাজে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিলেও দ্রোণাচার্য এবং শিশুহন্তা শূদ্রবৃত্তি-অবলম্বী অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণরূপেই পরিগণিত হইতেন। কিন্তু কালক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত এই প্রথাও বিলুপ্ত হইয়া আর্যসমাজ বর্তমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে। শাস্ত্রালোচনা দ্বারা গুণকর্মগত ভগবৎসৃষ্ট জাতির এই প্রকার ক্রম-পরিণতিই নির্ণীত হয়। পরবর্তী যুগেও নিজেদের শৌর্যবীর্য ও বিত্তের প্রভাবে বহু ব্যক্তি উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন, যথা—মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। ইদানীন্তন কালেও এতাদৃশ ঘটনা একেবারে বিরল নহে।

সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দ্বারা প্রাচীন কৃষ্টির সহিত পরিচয়ই শতধা বিভক্ত হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপায়

এই প্রকারে ইহাই নির্ণীত হইল যে, বর্তমানে যে আর্যজাতি হিন্দুনামে শতধা বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তাহারা বস্তুতঃ একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। একই রক্ত সকলেরই ধমনীতে প্রবাহিত। বৈদিক কৃষ্টি ও বিদ্যার অভাবপ্রযুক্ত, একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত হইলেও ইহাদের মধ্যে এতটা বিভেদ প্রতিভাত

হইতেছে। অবশ্য পরবর্তিকালে বিভিন্ন আর্য ও আর্যেতর জাতির সহিত ইহাদের সংমিশ্রণ আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু গঙ্গাসাগরে দাঁড়াইয়া যেমন কতটা বারি গঙ্গাবারি, আর কতটাই বা যমুনা ইত্যাদি অন্যান্য নদী হইতে আগত, ইহা যেমন নির্ণয় করা যায় না; তদ্রূপ এই সুপ্রাচীন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রক্তধারাকে আর পৃথক করা যায় না। সেই সমস্ত ধারা মিলিত হইয়া এক সুপ্রাচীন কৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা কিছু গৌরবের বিষয়, সমস্তই সংস্কৃত ভাষাতে লিপিবদ্ধ আছে, আর সেই ভাষাতে অনভিজ্ঞতাই হইয়াছে আমাদের সমাজে এতটা বিভেদ প্রতীতির অন্যতম হেতু। প্রাচীনগণও যে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বচনটি হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—"ইহাই চারিটি বর্ণ, যাঁহাদের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্বে ব্রাহ্মী সরস্বতী (বেদময়ী সংস্কৃতভাষা) বিহিত হইয়াছিল। 'লোভবশতঃ অন্যান্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া [বহু ব্যক্তি উক্ত ভাষাতে] অজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছে" (মহাভাঃ শাঃ ১৮৮।১৫)। সুতরাং যে ভাষাজ্ঞান ও তজ্জাত কৃষ্টির প্রভাবে ব্রাহ্মণ এখনও সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই জ্ঞান যদি সেই ভাষাধারে সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্ত করা যায়, তাহা হইলে সমাজে উচ্চাবচ ভেদ স্বতঃই ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণকে যদি নিম্নস্তরে অবতরণ করাইয়া জাতিগঠন করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতে এক মনুষ্যজাতি বাস করিবে বটে, তাহা আর ভারতীয় আর্যজাতি থাকিবে না। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ভাষার প্রসার দ্বারা যদি সমাজের নিম্নস্তরের জাতিগুলিকে ব্রাহ্মণত্বের স্তরে উন্নীত করা যায়, তাহা হইলেই ভারতীয় সৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে ভারতীয় আর্য জাতির বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। মাতৃভাষা সহ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক ইংরেজী ভাষা আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয়, এই বিষয়ে কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। তৎসহ সংস্কৃতভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় হইলে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ যেমন জাগরিত হইবে, তদ্রূপ হইবে পূর্বজগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত পরিচয়। এইভাবেই বলিষ্ঠ জাতিগঠন হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী সংস্কৃত ভাষা ও জাতিগঠন বিষয়ে এই প্রকার অভিমতই পোষণ করিতেন। তাঁহার অভিপ্রেত "ইস্‌লামীয় শরীর ও বৈদান্তিকের মস্তিষ্ক-লাভ" এই প্রকারেই সম্ভব!

দ্বয়ী

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

আমি ও আমার

একা আসে জীব হেথা; একা যায় চলে,
আমার আমার তবু কতই না বলে!
কোন্ "আমি" সাথে আসে যাবার সময়
কয়টি "আমার" সঙ্গে অনুগামী হয়?

একের মূল্য

রাশি রাশি শূন্য যদি বসে আরপার
অঙ্ক হিসাবে দাম কতটুকু তা'র?
যেমন বাঁয়েতে মাত্র এক এসে জুটে,
সাথে সাথে সংখ্যাটির মূল্য ঊর্ধ্বে উঠে।

এখানে—ওখানে

আবদুল গণি খান

হেথা! আগুনে যখন হল্কা—
মেঘে বিদ্যুৎ রণ ঝন্ ঝন্
হোথা জোছনা শান্তি জলসা
ছোটে উছলি উছলি শন্ শন্!

হেথা হিংসার ছুরি হস্তে—
ঘোষে বন্দী মনের দ্বন্দ্ব
হোথা সুষমা শেফালি গন্ধে
হাসে আলো-চাঁদ ঘেরা ছন্দ!

হেথা মানুষ পেল না কোন দাম—
পেল বিক্ষোভ আর অনশন
হোথা তারায় তারায় ফুল ডোর
শুধু ভ্রমরার মহা-গুঞ্জন!

হেথা ঈগল-শকুন কলরব—
জরা মৃত্যুর সনে পরিচয়
হোথা ক্রীতদাসী ক্ষীণ 'রাবেয়া'
হাসে উল্লসি, তার নাহি ভয়!

হেথা রোগ-শয্যায় মৃত্যু—
হোথা মৃত্যুঞ্জয় সারথি
হেথা বন্ধন-গিঁঠা হতাশার
হোথা চীৎকার নয়: মুক্তি!

হেথা শত ধরমের পূজারী—
ফুঁকে বিভেদের নয়া তূর্য
হোথা সত্য-প্রেমের ইশারায়
ওঠে আকাশে স্নিগ্ধ সূর্য!

হেথা চুপচাপ আর ফুস-ফাস—
হোথা ফোয়ারা খুশির বৃষ্টি—
ঝরে পরিমল মহানন্দ
রহে শাশ্বতরূপ সৃষ্টি!!

ভজনের উৎস

শ্রীতড়িৎকুমার বসাক

ভজন বলতে আমরা বুঝি ভক্তিমূলক গান। মানুষ আর দেবতা, নর আর অমর, ভৃত্য আর প্রভু, প্রেমিক আর প্রেমাস্পদ—কত না মধুর এই ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক। স্রষ্টা আর সৃষ্ট—এইতো সম্পর্ক দেবতা আর মানুষের মাঝে। সৃষ্ট চিরকালই জানতে চায় স্রষ্টার পরিচিতি—জিজ্ঞাসা ভরে জানতে চায় তার উৎস কোথায়? স্রষ্টার সন্ধান সে পায় নি, অথবা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তাহ'লে সে চেষ্টা করে স্রষ্টার একটা বর্ণনা দিতে; তাই নানাভাবে ছন্দে সুরে হয় তার বন্দনা। আবার সব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তো সমান নয়; তাই ওই দেবতার বর্ণনাও সব সময় সমান হয় না। ভারতের জনসংখ্যা ৩৩ কোটীর ওপর; তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ৩৩ কোটি রকম ফের। তাই একই অখণ্ড অদ্বয় ভগবৎসত্তাকে ভারতবাসী ৩৩ কোটি রূপে দেখেছে এবং ৩৩ কোটি ভজন গানে দেবতার বর্ণনা দিয়েছে।

আর যদি সে দেবতার দর্শন না পেয়ে থাকে তাহ'লে সে চেষ্টা করে দেবতার একটা কাল্পনিক প্রতিকৃতির বর্ণনা দিতে। মানুষের মনের গহনে দেবসত্তার প্রতি যে সহজাত ভাবপ্রবৃত্তি রয়েছে তারই বাইরের অভিব্যক্তি হচ্ছে ভজন।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ যখন চোখের সমুখে দেখল সূর্যকে তখন সে সূর্যের বিজ্ঞানতত্ত্ব

জানতে পারল না; তাই সে শুধু বিমুগ্ধের মত সূর্যকে দেবতা বলে মেনে নিয়ে একটি প্রণাম জানাল তার উদ্দেশ্যে। এই সময়ই তার অন্তরের সুপ্তভক্তি-সায়রে উঠল একটা তরঙ্গ। আবার মানুষের অন্তরের সম্পদ যেমন সবার সমান নয়, তেমনি ভক্তিস্রোতের অনুভূতি-ক্ষমতাও সবার সমান নয়। যাই হোক, সেই ভক্তির স্রোতটা তার শুক্নো হৃদয়ে গড়িয়ে পড়ে সেখানে গজিয়ে তুলল নানা ভাবের ফসল। কারো হৃদয়ে জাগল শান্ত ভাব, কারো দাস্য, কারো সখ্য, কারো বাৎসল্য, আবার কারো বা মধুর ভাব। কিন্তু এ সব ক'টির মূলেই রয়েছে একমাত্র প্রেমের ভাব; আবার সেই প্রেমটা জন্মায় ভক্তির ক্ষেত হতে। এই ভক্তি বা তথাকথিত প্রেম নিবেদনের জন্যেই মানুষ প্রথম গেয়ে উঠল ভজন।

অহংকারী মানুষ চিরকাল নিজকে বড় করে দেখে, সে মনে করে 'আমিই সব'। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'আমি' সেই অখণ্ড চৈতন্যঘন সৃষ্টিকারণরূপী সত্তার একটা ক্ষুদ্র অংশ নয়; কিন্তু এই 'আমি'টিই তো Eternal pulse-এর সমগ্র denotationটা দখল করে নেই। কাজেই আমিই সব বা "C'est moi" এর থিওরি খাটল না। তাই ক্ষুদ্র 'আমি' সেই বৃহৎ অখণ্ড অদ্বয় 'আমি'র কাছে যে প্রণতি জানায় তাকেই বলে ভজন। তাই দেখি, মানুষের ঐকান্তিক প্রার্থনা: আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।

ভোরের পাখীর ডাকে ঘুম-ভাঙা মানুষ যখন একটা প্রশান্তি, একটা 'প্রবাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতি' ভাব দেখে তখন তার মনের অন্তরতম প্রদেশ থেকেই বেরিয়ে আসে অস্ফুট গুঞ্জরণ। বাইরের নিসর্গের মত তার অন্তরেও ভক্তিস্রোত তার মনে দোলা লাগায়, মনের পাপগুলোও তখন মানুষ পুণ্যের দাঁড়িপাল্লায় ঝুলায়। তখন সে একটা অনুভূতি, একটা তীক্ষ্ণ রসচেতনা লাভ করে—যেটার ব্যাপ্তি বড় সূক্ষ্ম। সেই রসচেতনাটাই ভজনগীতির হরফে ছাপা হয়। প্রতীচীর কবি জন কীটস্ ও কথাটা অনুভব করেছেন। তাই তিনি গেয়েছেন:

'Tis very sweet to look into the fair
And open face of heaven,—
to breathe a prayer
Full in the smile of the blue
firmament

এই হল ভজনের উৎসের পরিচিতি। প্রবন্ধ-কারের পক্ষে অবৈধ হলেও এই প্রবন্ধের গণ্ডীর বাইরের একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য আমি জানি যে সেজন্যে পাঠকবর্গ মার্জনা করতে পারবেন না আমায়; fastidious সমা-লোচক তো মাফ করতেই জানেন না। যাই হোক, ভজনগানের একটা সুফল আমি বলছি।

ভজনগান গাইলে মনের সংযমশক্তিটা বাড়ে। কারণ, ভজনগানের প্রতিটি কলি গায়কের অন্তরের অন্তরতম কোণ হতে বেরিয়ে আসে। আবার, অন্যদিকে হাল্কা গানগুলো শুধু যে মনঃসংযমের শক্তিকে বাড়াতে পারে না, তা নয়; পক্ষান্তরে মনঃসংযমের শক্তিকে কমিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে। ভজনগানকে মনঃসংযমের আতস-কাঁচ বলে অভিহিত করা যেতে পারে; একটা আতস-কাঁচ যেমন সাতটা সূর্যরশ্মিকে একত্রিত করে এক পথে চালিত করে, একখানা ভজনগানও সেরূপ সাতশত দিকে বিক্ষিপ্ত মনকে একাগ্র করে তুলতে পারে।

ভজনগানের সাথে সাধারণ হাল্‌কা গানের তফাৎটা হলো এই যে, ভজনগীতি মনঃসংযমের আতস-কাঁচ; আর অন্যান্য গানগুলি ঘষা রঙীন কাঁচ। সে কাঁচটা রঙীন বটে; কিন্তু ঘষা। তাই তাকে দর্পণের মতো ব্যবহার করে আন্তরিক মানসিক বৃত্তিগুলির স্বরূপ ধরা পড়ে না।

সমালোচনা

উপনিষদের মর্মবাণী (দ্বিতীয় খণ্ড)—লেখক: শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট; প্রকাশক—শ্রীরণজিৎ রায়, মণ্টু স্মৃতি ভাণ্ডার, পোঃ জলসুখ (শ্রীহট্ট) পৃষ্ঠা—১০৮+॥/০ ; মূল্য—।৶০ আনা।

এই পুস্তকের প্রণেতা কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠ উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রথমে সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করিয়া, পরে সেই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া পাঠকের কাছে উপহার দিয়াছেন। অনেক স্থলে যে সকল মন্ত্রের অর্থ সহজে মূল শ্লোক হইতে বুঝা যায় না সেই সকল মন্ত্র তিনি নিজের গভীর পর্যালোচনা দ্বারা এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে পাঠকের বহু সন্দেহ নিরসন হইয়া যায়। কঠ উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য, তাহার সূচনা করিয়া প্রত্যেক বল্লীর অবান্তর বিষয়গুলিও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক সাংখ্যমত ও তাহার কোন কোন অংশের অযৌক্তিকতা এবং বৈষ্ণব দর্শনের কোন কোন পদার্থের সহিত কঠ উপনিষদের অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে মনের বিশুদ্ধতা, শান্ত সমাহিতভাব থাকা প্রয়োজন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত ভূমিতে আরোহণ করা প্রয়োজন, তাহার পর পরমাত্মার কৃপার অধিকারী হওয়া চাই; চাই ত্যাগ, চাই বৈরাগ্য, চাই সন্ন্যাস, চাই সংযম, চাই তপস্যা। সর্বোপরি উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ আচার্যের কাছে এই তত্ত্ব শিখিতে হয়। উপযুক্ত আচার্য ছাড়া এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় নাই। যুক্তি তর্ক বা কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। আলোচ্য পুস্তকে এই সমস্ত বিষয় শাস্ত্রসম্মত ও সুন্দর, সরল ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই উপনিষদে যে নাচিকেত অগ্নির কথা আছে, 'তাহা ব্রহ্মের প্রতীক; পরব্রহ্ম সেই অগ্নির মধ্যে এমনকি সকল জাগতিক বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত'—এই কথাটি বুঝাইয়া গ্রন্থকার সমস্ত উপনিষৎ পদার্থগুলি যে আত্মতত্ত্বে পর্যবসিত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানলাভের সাধনার ধারাটি যেরূপে উক্ত উপনিষদে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান তাহা তিনি বিশদ করিয়া বলিয়াছেন (৩৯ পৃঃ ২৩ পং—৪৫ পৃঃ ৩ পং)। তাহার সারমর্ম এই যে সাধনার পথে সংযম, পবিত্রতা, একাগ্রতা, সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতা, বিবেক, চিন্তাশীলতা এইগুলি অপরিহার্য।

পরলোক সম্বন্ধে লেখক নিজের অভিমত যুক্তি দিয়াছেন (৭৭ পৃঃ) যে ব্যক্তি ইহজীবনে পশুর মত কার্য করে, সে পশুর মত বা বৃক্ষলতার মত জীবন যাপন করে, পরজন্মে ঐরূপ ব্যক্তির পশু বা বৃক্ষজন্ম সম্ভব। পক্ষান্তরে যিনি যোগ-সাধনাদি অভ্যাস করেন তাঁহার ইহ জীবনের সুখাদি অনুমান করিয়া পরজন্ম উন্নততর জন্মের অনুমান হয়। এই যুক্তিটি শাস্ত্রানুসারী। কয়েকটি স্থলে বর্ণিত পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে।

—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রগীতি (৪র্থ সংস্করণ) —শ্রীমৎ স্বামী যোগবিলাস মহারাজ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃমন্দির, শিমুলতলা (ই, আর) শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২৬; মূল্য ৵০ আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত কতকগুলি সুন্দর স্তোত্র ও গানের সমাবেশ হইয়াছে। ইহাতে প্রদত্ত বীরভক্ত মহাকবি গিরিশচন্দ্র-রচিত বিখ্যাত "শ্রীরামকৃষ্ণ" কবিতা, নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু,

ভক্তপ্রবর মহাত্মা রামচন্দ্র এবং স্বামী যোগেশ্বরানন্দের স্তোত্র ও গানগুলি সকলের প্রাণে ভক্তিভাব বৃদ্ধির সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

লালু—শ্রীসুধেন্দুশেখর সরকার প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধীরকুমার সরকার, ১০৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ; পৃষ্ঠা—১০১, মূল্য ১৸০ আনা।

আলোচ্য পুস্তকটি 'লালু' নামক একটি দরিদ্র যুবকের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একটি বড় গল্পের রূপায়ণ। বর্তমান বাঙলার কত ছেলে দারিদ্র্যের কঠোর নিস্পেষণের মধ্যে থাকিয়া কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইতেছে এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দুর্বহ জীবন যাপন করিতেছে পুস্তকটিতে তাহার একখানি নিখুঁত চিত্র সংবেদনশীল মনোভাব লইয়া তরুণ লেখক চিত্রণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। লেখকের প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে।

গৌরব ও সমৃদ্ধি-সমুজ্জল পূর্বপুরুষগণের শুধু ঐতিহ্য লইয়াই লালুর জীবন শুরু হয়। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর অতিকষ্টে গৃহশিক্ষকতা যোগাড় করিয়া আই-এস্-সি পাশ করা—কোন কোন দিন অর্ধাহারে থাকিয়া দিবারাত্র পরিশ্রমে বি-এস্‌সি পড়িবার সময় লালু যে অতি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহা পাঠ করিয়া পাঠকের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। সর্বত্রই ব্যথা বেদনা ও নৈরাশ্যের সুর—কোথাও আশার আলো নাই! কিন্তু ইহাই তো বর্তমান বাংলার বাস্তব চিত্র।

পুস্তকটিতে প্রাইভেট টিউটারকে পরমগুরু বলা হইয়াছে, ইহা অসমীচীন বোধ হইল ; কারণ পরম-গুরু তিনিই যিনি জীবনে আধ্যাত্মিকতার আলোক-সম্পাত করেন। মাতা-পিতাকেও পরমগুরু বলা হইয়া থাকে। শিক্ষাদাতা গৃহশিক্ষক গুরু হইতে পারেন—পরমগুরু নয়। প্রারম্ভে "কৃতজ্ঞতা" শিরোনামায় লিখিত অংশে একান্ত ব্যক্তিগত সুরটি আমাদের ভাল লাগে নাই।

—জীবানন্দ

Mean You !—By Swami Pratyagatmananda Saraswati, Published by P. Ghosh ; P. Ghosh & Co, 20, College Street Market, Calcutta-12. Pages—32+8 ; Price Re 1-4 As.

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত-সন্ন্যাসী, লেখক ও মনীষী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর রচিত ১২টি ইংরেজী কবিতা বর্তমান পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু অধ্যাত্মপথযাত্রী মানুষের বিভিন্ন স্তরের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া। মানুষ স্বরূপতঃ অমৃতের সন্তান—সচ্চিদানন্দময় আত্মা, কিন্তু শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময়ী ব্যবহারিক জগতের বিচিত্র প্রহেলিকা তাহার নিকট এই আত্মসত্য আবৃত করিয়া রাখে। তাই সম্রাট হইয়াও মানুষকে দীনের ন্যায় চোখের জল ফেলিতে হয়—(প্রথম কবিতা—'The Angel in Tears') অনন্ত গগনে অফুরন্ত আলোকের অধিকারী হইয়াও অন্ধকার কোণে পড়িয়া থাকিতে হয় (The Angel in Veil and on Wings)। কিন্তু চিরকাল নয়। অকূল পাথারে একদিন কাণ্ডারীর দেখা পাওয়া যায় (The Oarman's Pilot), অনন্ত প্রেম-সৌন্দর্য ও আলোর জীবনকে বরণ করে। (Everlasting Love, Loveliness & Light)। সে আলোক ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ববস্তু ব্যাপিয়া। জীবনের পরম স্বামীর দেখা পাইয়া মানুষ ধন্য হয়, তাঁহারই দিব্য সঙ্গীতের সুরে তাহার জীবনের সকল তন্ত্রী অনুরণিত হয়, গভীর প্রশান্তির ভিতর হইতে প্রেমময় নিত্যকৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠে (The Flute of Silence)। কবিতাগুলি একাধারে অনবদ্য সাহিত্য-কীর্তি,

প্রখর দার্শনিক মনন এবং মরমীয়া সাধকের অজানা পথের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)—শ্রীগুণদাচরণ সেন প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা—৩২০; মূল্য—পাঁচ টাকা।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা উদ্বোধনের ১৩৬০ সালের আষাঢ় সংখ্যায় সমালোচনা-স্তম্ভে উহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। সুলিখিত এবং পাঠক-সাধারণের সমাদরণীয় এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমাদের আনন্দ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রসঙ্গগুলি বাদ দিয়া প্রত্যেক আখ্যানাংশ পর পর অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া গ্রন্থকার ভাগবত-কাহিনী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই কাহিনী-গুলির সার্থকতা তো শুধু চিত্তবিনোদন নয়, হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের উন্মেষ করিতে উহাদের শক্তি অসীম। মাঝে মাঝে মূল সংস্কৃত শ্লোক নিবদ্ধ হওয়াতে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১ম পৃষ্ঠার প্রারম্ভিক নিবেদনে লেখক শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা এবং শ্রীভাগবতের ভক্তিবাদ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন।

মাষ্টার মঙ্গল ও কবিতা বিতান—অক্রুর চন্দ্র ধর প্রণীত; প্রকাশক—মুজাফ্‌ফর হোসেন আহম্মদ, এল্‌-এল্‌-বি; ৩, জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৩০; মূল্য—৷৷০ আনা।

পূর্ববঙ্গের বহুসমাদৃত প্রবীণ কবি এবং শিক্ষাব্রতী শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধরের ৮টি কবিতার এই ক্ষুদ্র সংকলনটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কবিতাগুলির নাম—মাষ্টার মঙ্গল, আমার সঞ্চয়, গুরুজী, কবির জীবনী, আমি কবি, আমরা মানুষ জাত, এ পৃথিবী আমাদের, ভয় নাই আর ভয় নাই। 'মাষ্টার মঙ্গল' কবিতাটিতে শিক্ষক-জীবনের মহান আদর্শ করুণ-বিদ্রূপ রসের সাহায্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অপর কবিতাগুলিতে জীবনের দীর্ঘপথভ্রমণে ধর্ম, সমাজ ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে কবি যে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহারই দিগ্‌দর্শন ব্যঞ্জিত। ভাব, ভাষা, ছন্দ সব দিক দিয়াই রচনাগুলি অনবদ্য।

CHETANA—ইংরেজী মাসিক পত্র। সম্পাদক—এস্‌ দীক্ষিত; ৩৪, র‍্যাম্পার্ট রো, বোম্বাই-১ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য—২৲ টাকা।

১৯৫৬ সালের জানুআরি হইতে এই নূতন পত্রিকাখানির প্রথম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। পর পর সংখ্যাগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শ পুরো-ভাগে রাখিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যান ও প্রচার পত্রিকাটির লক্ষ্য। পরিচালকমণ্ডলীর সাধু উদ্যম জয়যুক্ত হউক।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা—(অষ্টাবিংশতি বর্ষ, ১৩৬২)—হাওড়া, ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোডে অবস্থিত বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে সুনাম অর্জন করিয়াছে। বিদ্যালয়ের এই বার্ষিকীটির রচনাগুলির মধ্যে ছাত্রগণের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুনীতি ও সদাচারের পরিচয় পাইয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। পত্রিকার এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। বিদ্যালয়ের নানামুখী কর্মধারার পরিচয়বাহী অনেকগুলি আলোকচিত্র পত্রিকাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (নবম বর্ষ, ১৩৬২)—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইতেছে (ঠিকানা—১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া; ফোন—হাওড়া,

১৩৯১)। প্রতিষ্ঠানের এই নবম বার্ষিকী পত্রিকাটি পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। 'বাণী', 'কবিতা', 'আলোচনা', 'জীবনী ও প্রবন্ধ', 'বিজ্ঞান', 'ইতিহাস', 'ভ্রমণ', 'গল্প' ও 'পরিক্রমা'—এই নয়টি স্তম্ভে ২৬টি রচনা স্থান পাইয়াছে। প্রাক্তন ও বর্তমান—উভয় ছাত্রেরাই লিখিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার পরিচালকগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

উদয়াচল (ওড়িয়া সাময়িকী-শ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা)—কলিকাতা, ২০ নং যদুলাল মল্লিক রোড-স্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের ওড়িয়া *বিদ্যার্থিগণ এই সাময়িকীটি প্রকাশ* করিয়াছেন। শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত রচনা ওড়িয়া পাঠকমণ্ডলীকে এই মহীয়সী নর-দেবীকে জানিতে ও বুঝিতে সহায়তা করিবে। ছাত্রবন্ধুগণের উদ্যমকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর প্রচার-সফর—বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম-সচিব স্বামী সৌম্যানন্দের সহিত গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হইতে মে মাসের দশ দিন পর্যন্ত আসাম রাজ্যের নানাস্থানে একটি ব্যাপক প্রচার-সফর করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও আলোচনাগুলির বিষয়বস্তু সাধারণতঃ কেন্দ্রীভূত থাকিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন বেদান্তিক ধর্মের আদর্শ ও সাধনা লইয়া। অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আলোকে শিক্ষার আদর্শ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার *ভ্রমণ স্থান ও ভাষণ-সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইল*:—ডিব্রুগড় (বাংলা বক্তৃতা ২, আলোচনা ১), তিনসুকিয়া (বঃ ১), ডিগবয় (বাং বঃ ৪, ইংরেজী বঃ ১, আলোচনা ১), নহেলকাটিয়া (১), ডুমডুমা (১), হোজাই (১), লামডিং (ইং বঃ ১), পাণ্ডু (১), ধুবড়ী (২), বগরিবাড়ী (১), গৌহাটি (১), নওগাঁ (২), শিলং (বাং বঃ ১, ইং বঃ ১), চেরাপুঞ্জি (ইং বঃ ১)।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী পূর্ববঙ্গের কয়েকটি শহরে ভ্রমণব্যপদেশে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের বিষয় ছিল যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনবত্ব'। ৯ই জ্যৈষ্ঠ মৈমনসিং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনি 'ধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে বলেন। পরের দিন (২৪শে মে) ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত বুদ্ধজয়ন্তীতে তিনি যোগ দেন এবং ভগবান বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বজনমর্মস্পর্শী আলোচনা করেন। ১৪ই হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামে তাঁহার ভাষণত্রয়ের বিষয় ছিল 'মানবসভ্যতায় বেদান্তের দান', 'আত্মার পরিচর্যা' এবং 'যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ'। ১৭ই হইতে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ সম্বুদ্ধানন্দজী কুমিল্লায় তিনটি *বক্তৃতা দেন: স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে* ('মনঃ-সংযম'), মহেশ প্রাঙ্গণে ('বর্তমান বিশ্বে ধর্মের স্থান'), এবং ঈশ্বর পাঠশালায় ('বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী')। চাঁদপুর শহরের কালীবাড়ীতে এবং পুরাণবাজারে তিনি বলেন ২০শে ও ২১শে জ্যৈষ্ঠ (বিষয়—যথাক্রমে 'ধর্মসমন্বয়' ও 'সনাতন ধর্ম')। ফরিদপুরে তাঁহার দুটি বক্তৃতা হয় (২২শে জ্যৈষ্ঠ অম্বিকা হলে—'সকল ধর্ম কোথায় মিলিয়াছে ?'; ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, মহাকালী পাঠশালায় 'নারীশিক্ষা')। ২৪শে

জ্যৈষ্ঠ সম্বুদ্ধানন্দজী নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে 'কর্মবাদ ও কর্মাভ্যাস' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার অন্তিম বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে। নির্বাচিত বিষয় ছিল— 'আদর্শ শিক্ষা'।

উত্তর কালিফর্নিয়ায় স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী—উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির কর্মসচিব মিসেস স্থলে (Mrs. H. D. B. Soule) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর এবং মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাস্টি স্বামী নির্বাণানন্দজীর গত মার্চ মাসে উত্তর কালিফর্নিয়া সফরের একটি মনোজ্ঞ বিবরণী পাঠাইয়াছেন। উহা হইতে কিছু সঙ্কলন আমরা পাঠক-পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতেছি।

২৯শে ফেব্রুআরি (১৯৫৬) বেলা ১টার সময় স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী সান্ ফ্রান্সিস্কো আন্তর্জাতীয় বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির নেতা স্বামী অশোকানন্দজী, তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী এবং সান্ফ্রান্সিস্কো ও বার্কলে কেন্দ্রদ্বয়ের ৭৫ জন সভ্য শ্রদ্ধেয় অতিথিদ্বয়কে সম্বর্ধনা করিবার জন্য বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজন এবং স্বল্প বিশ্রামের পর স্বামী অশোকানন্দজী তাঁহাদিগকে সান্ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের নব-নির্মীয়মাণ মন্দির দেখাইতে লইয়া যান। মন্দিরটি যতদূর তৈরি হইয়াছে তাহা হইতেই অতিথিদ্বয় উহার সৌন্দর্য এবং সৌধের আভ্যন্তরীণ প্রশস্ততার একটি ধারণা লাভ করেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা সোসাইটি-পরিচালিত মহিলা আশ্রমে যান এবং তথাকার ঠাকুরঘর দর্শন করেন। সন্ধ্যায় সান্ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের বর্তমান বক্তৃতা-হলে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজীর নিয়মিত বুধবাসরীয় ভাষণের পর শ্রদ্ধাস্পদ অতিথিদ্বয় সমবেত ভক্তগণের সহিত পরিচয় ও আলাপাদি করেন।

পরের দিন, ১লা মার্চ মিসেস স্থলে স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী নির্বাণানন্দজী এবং স্বামী অশোকানন্দজীকে মোটরে বার্কলে শহরে লইয়া যান। এখানে উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির একটি শাখাকেন্দ্র আছে। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজীর উপর উহার দেখাশুনা করিবার ভার। মধ্যাহ্নভোজনের পর সকলে কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তথায় অধ্যাপক উইল্সন পাওয়েল তাঁহাদিগকে প্রসিদ্ধ সাইক্লোট্রন যন্ত্র (পরমাণু-বিশ্লেষের জন্য ব্যবহৃত) দেখান। ঐ দিন সন্ধ্যায় পূর্বোক্ত সান্ফ্রান্সিস্কো মহিলা-আশ্রমে ভারতীয় প্রথায় একটি ভোজের ব্যবস্থা হয়। প্রায় ত্রিশ জন স্ত্রী-ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী তাঁহাদিগের ধর্মবিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

২রা মার্চ অতিবাহিত হয় সান্ফ্রান্সিসকো হইতে ৩৫ মাইল দূরে ওলেমা নামক স্থানে। বনানীর পরিবেশে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় এখানে একটি আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছে। ১১ জন আমেরিকান ব্রহ্মচারী এখানে রহিয়াছেন।

৩রা মার্চ অতিথিদ্বয় উত্তর কালিফর্নিয়ার প্রাচীন 'মুর বনানী' (Muir woods) দেখিতে যান। এখানে বিখ্যাত রেড্উড্ বৃক্ষ আছে। কতকগুলির বয়স সহস্র বৎসরেরও অধিক। তৎপরে তাঁহারা সান্ফ্রান্সিসকোর প্রসিদ্ধ গোল্ডেন গেট পার্কে অবস্থিত স্টীনহার্ট মৎস্য-সংরক্ষণশালা (Steinhart Aquarium) এবং বিজ্ঞান শিক্ষালয় (Academy of Sciences) পরিদর্শন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় বার্কলে কেন্দ্রে শ্রদ্ধেয় অতিথিদ্বয়কে উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত কেন্দ্রের সব শাখাগুলির তরফ হইতে ২২০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বামী অশোকানন্দজী।

সোসাইটির ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও পুরুষ ভক্তগণ কর্তৃক নর-দেব স্তোত্র (স্বামী বিবেকানন্দ কৃত "খণ্ডন ভব বন্ধন" গান) আবৃত্তি এবং আর একটি সঙ্গীতের পর সোসাইটির কর্মসচিব মিসেস স্নুলে স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজীর উদ্দেশ্যে লিখিত অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন। এই অভিনন্দন-পত্রে একদিকে যেমন ভারতবর্ষ হইতে আগত সম্মানিত সন্ন্যাসি-অতিথিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে উত্তর কালিফর্নিয়ার বেদান্তানুরাগী বন্ধুগণের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি অভিব্যঞ্জিত হইয়াছিল অপর দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের বেদান্তের সর্বজনীন উদার শিক্ষার প্রতি উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী। আমেরিকার বেদান্তানুরাগিগণ বেদান্তকে কিভাবে দেখেন সেই প্রসঙ্গে অভিনন্দন-পত্রে বলা হইয়াছে—

"আমরা স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রচারিত মানবের দেবত্ব এবং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের পূজা অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সুযুক্তির উপর স্থাপিত যে সর্বজনীন তত্ত্বের সন্ধান স্বামীজী দিয়া গিয়াছেন তাহার মাধ্যমেই ধর্মকে বুঝিতে ও রূপায়িত করিতে এবং সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল একতা কোথায় তাহা ধরিতে আমরা যত্নশীল। আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে বেদান্ত একটি মতবাদ নয়—উহা মানুষের উচ্চতম ও মহত্তম চিন্তারাশির সমন্বয়।

যে ব্যক্তিসমূহের মধ্যে আদর্শ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের ভিতর দিয়া ছাড়া আদর্শকে ঠিক ঠিক ধারণা করা যায় না; এই জন্য আমরা সকল ধর্মের মহাপুরুষ ও অবতারগণকেই শ্রদ্ধা করি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি আমাদের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে, কেননা, বেদান্তের ঔপপত্তিক ও কার্যকরী শিক্ষাগুলি তাঁহাদের জীবনে আমরা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাই।

আমরা বেশ জানি যে, সাধনার মাধ্যমে যদি আধ্যাত্মিক চেতনা ঘনীভূত না হয় তাহা হইলে বেদান্তের সমুন্নত আদর্শগুলি শুধু বাক্যবিলাসই রহিয়া যাইতে পারে। এজন্য ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সতর্ক। আমাদের মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রায়ানুযায়ী এবং পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মবাদেরও ঐতিহ্য অনুসরণে আমরা কর্মের ভিতর উপাসনা-বুদ্ধি সঞ্চার করিয়া উহাকে একটি উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা যাহারা এই সোসাইটির কাজে ব্রতী রহিয়াছি—আমাদের যে একটি বৃহৎ দায়িত্ব আছে সে বিষয়ে আমরা সচেতন। জানি যে, একদিকে আমাদিগকে যেমন বেদান্তের মূলনীতিগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে—অপরদিকে আমাদিগকে সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে বেদান্ত পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের বৃহৎ জীবন-রীতি হইতে বিযুক্ত একটি ধর্মগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়-মাত্রে না সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ঐরূপ সম্প্রদায় যতই কেন চিত্তাকর্ষক মনে হউক না কেন। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে এদেশে বেদান্তকে যদি সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হইতে হয় তাহা হইলে উহার পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যকে একেবারে হটাইয়া দিলে চলিবে না, বরং ঐ ঐতিহ্যের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই স্বামী বিবেকানন্দ যেমন চাহিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মহত্তম আদর্শ ও কীর্তির সংমিশ্রণে একটি নূতন সুসমঞ্জস সংস্কৃতির উদ্ভব হইবে।"

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী মাধবানন্দজী সোসাইটির সভ্যগণকে তাঁহাদের সৌজন্য ও আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, তিনি নিজে অপরের যেটুকু সেবা করিতে পারিয়াছেন উহা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতেই সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই দর্শনটির বিষয় বক্তা উল্লেখ করেন—যাহাতে তিনি দেখিয়াছিলেন তিনি যেন এক দূর দেশে গিয়াছেন, সেখানকার লোকগুলির চামড়া সাদা, তিনি তাহাদের এবং তাহারাও তাঁহার ভাষা জানেন না, তবুও তাঁহারা তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিতেছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ যখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মমহাসভায় দেখা দিলেন তখন যেন তাঁহার মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণই নিজে আমেরিকাবাসীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। পরে পাশ্চাত্ত্যে যে সব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তাঁহারা উঁহাদের শিক্ষাধারাই প্রচার এবং স্বামীজী যে প্রভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারই দৃঢ়ীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণোপদিষ্ট মহৎ সত্যসমূহ পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে বহু বৎসর লাগিবে তবে উন্নতি আশানুরূপ অধিক মনে না

হইলেও কেহ যেন নিরুদ্যম না হন। সোসাইটির সকল ভক্তগণেরই কর্তব্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে আধ্যাত্মিক জীবনে আগাইয়া যাইবার এবং নিজেদের উদাহরণ দ্বারা অপর ব্যক্তিগণকেও ঐ জীবন-যাপনের প্রেরণা দিবার চেষ্টা করা।

স্বামী নির্বাণানন্দজী অভিনন্দনের উত্তর দেন বাংলাতে (ইহা স্বামী অশোকানন্দজী পরে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া শুনান)। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার যে উৎসাহ, কর্মোদ্যম ও আতিথেয়তা দেখিয়াছিলেন এবং এই দেশকে বেদান্ত প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমেরিকায় আসিয়া তিনি স্বামীজীর ঐ সব উক্তি আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন। আমেরিকানদের যে সব মহৎগুণ আছে তাহার সঙ্গে বেদান্তের শিক্ষা যদি সংযুক্ত হয় তাহা হইলে একটি সম্পূর্ণ অভিনব চিন্তাধারার জন্ম হইবে, ফলে গড়িয়া উঠিবে একটি অভূতপূর্ব নূতন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে আমেরিকাবাসীর বদান্যতা, আতিথেয়তা ও কর্মোদ্যোগ আরও বিস্তৃত ও গভীর হইবে, তাঁহারা সারা পৃথিবীর মানুষকে আপনার বলিয়া দেখিতে পাইবেন। ইহাতে জগতের কল্যাণ ও শান্তি হইবে।

ইহার পরে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী এবং পরিশেষে স্বামী অশোকানন্দজী সম্মেলনে ভাষণ দেন। বিভিন্ন বক্তৃতার মাঝে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত অনুষ্ঠানটিকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। কর্মসূচীর অবসানে সমবেত সকলকে জলযোগ করানো হয়। তাহার পর সকলে ব্যক্তিগতভাবে অতিথিদ্বয়ের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন।

৪ঠা মার্চ, রবিবার সকালে সান্‌ফ্রান্সিসকো সোসাইটির বক্তৃতাগৃহে স্বামী মাধবানন্দজী 'প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত'* সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। সমস্ত সভাগৃহ উৎসাহী শ্রোতৃমণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দাঁড়াইবার পর্যন্ত স্থান না থাকায় অনেককে ফিরিয়া যাইতে হয়। প্রারম্ভে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী শ্রোতৃগণের নিকট শ্রদ্ধেয় বক্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় সান্‌ফ্রান্সিসকোর একটি বন্ধু-গৃহে একটি প্রীতি-সম্মেলনে স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী প্রশ্নোত্তরদান ও ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

৫ই মার্চ ও ৬ই মার্চের কর্মসূচী ছিল যথাক্রমে ৭০ মাইল দূরের 'শান্তি আশ্রম' ও ১০০ মাইল দূরবর্তী কালিফর্নিয়ার রাজধানী স্যাক্রামেণ্টো শহরের নূতন বেদান্তশাখাকেন্দ্র পরিদর্শন। ৭ই মার্চ প্রাতঃকাল সান্‌ফ্রান্সিসকোতে কতকগুলি দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়া দেখিতে কাটে, সায়াহ্নে সোসাইটির সান্ধ্যসম্মেলনে স্বামী নির্বাণানন্দজী বাংলায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা বলেন (স্বামী অশোকানন্দজী উহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দেন)। তৎপরে স্বামী মাধবানন্দজী এক ঘণ্টারও অধিক সময় ধরিয়া সোসাইটির সভ্যগণ কর্তৃক উপস্থাপিত ধর্ম, দর্শন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

৮ই মার্চ শ্রদ্ধাভাজন অতিথিদ্বয় বিমানযোগে পোর্টল্যাণ্ড যাত্রা করেন। বিমানঘাঁটিতে স্বামী অশোকানন্দজী, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী, মিসেস স্থলে এবং সোসাইটির অনেকগুলি ভক্ত তাঁহাদিগকে বিদায়-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত ছিলেন।

সিয়েট্‌ল্ কেন্দ্রের বিবরণ—স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজী সান্‌ফ্রান্সিসকো হইতে পোর্টল্যাণ্ড বেদান্তকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ১৩ই মার্চ সিয়েট্‌ল্ পৌছান এবং এখানকার রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটিতে ছয় দিন অবস্থান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মতিথি (১৪ই মার্চ) তাঁহারা এখানেই উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। ১৬ই মার্চ

* এই বক্তৃতাটি উদ্বোধনের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। —উঃ সঃ

সোসাইটিতে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি অভ্যর্থনা-সভায় স্বামী মাধবানন্দজী "বর্তমান ভারতের একজন দেব-মানব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

স্থানীয় একটি সংবাদপত্র (The Seattle Post-Intelligencer, Wednesday, March 14, 1956) মন্তব্য করিয়াছেন—

"ভারতবর্ষ হইতে দুইজন ধর্মনেতা মঙ্গলবারে সিয়েট্‌ল্ পৌঁছিয়াছেন—উদ্দেশ্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রটি পরিদর্শন এবং হিন্দুধর্মের 'শান্ত বাণী' প্রচার। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর হাল্কা ধূসরবর্ণ পোষাকে তাঁহাদিগকে বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বচ্ছন্দ দেখাইতেছিল। যে ধর্মান্দোলনের দ্বারা ভগবানের বাণী প্রতি-বৎসর বেশী বেশী লোকের নিকট পৌঁছিতেছে তাঁহারা উহার কথা বলিতেছিলেন। স্বামী মাধবানন্দের মতে, যে প্রবর্ধিত ধর্মভাব আমেরিকায় কাজ করিতেছে উহা ভারতেও সক্রিয়। তিনি বলেন,—"এই ধর্মীয় চেতনা হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে যে মানসিক উত্তেজনা রহিয়াছে উহা কমিয়া আসিবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত একত্ব বোধ করেন তিনি বিশ্বের কেন্দ্র-স্বরূপ—জগতের সব সমস্যারই তিনি সমাধান।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, গভীর ভগবৎ-সান্নিধ্যই তাঁহাকে সক্ষম করিয়াছিল মানুষকে বুঝিতে ও শান্তি দিতে। স্বামী মাধবানন্দ আরও বলেন, "বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু কোন দলের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে যান না। খ্রীষ্টধর্ম বেদান্তেরই একটি দিক প্রকাশ করে। ঈশ্বরের প্রতি আবেগ ময় ভালবাসার ভাব দুয়েতেই বর্তমান এবং এই ভাবসাদৃশ্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে সম্মিলিত করিবে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই ঘটিবে উভয়ের মিলন।"

বিবিধ সংবাদ

পূর্ববঙ্গ ও আসামে শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী

নিম্নোক্ত কয়েকটি স্থানে জনগণের প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইবার সংবাদ পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি এবং পরিচালকমণ্ডলীকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি :—

ধুম (চট্টগ্রাম) বিবেকানন্দ সমিতি, কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ইম্ফল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, হোজাই (নওগাঁ) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আগরতলা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

রাজকণিকায় (উড়িষ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব—অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজার দিন (৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬২) স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব আনন্দপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তনে আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দে মুখরিত হইয়াছিল। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জগন্নাথানন্দ মহারাজ উৎকল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভক্তিবাদ সভাপ্রাঙ্গণে প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সহস্রাধিক নরনারী পরিতোষ-পূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আজমীরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব—আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে ৩০শে ফাল্গুন, বুধবার দিবস আশ্রমে মঙ্গল আরতি, প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পূজাদি, শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত পাঠ ও আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকারী অন্ধ বিদ্যালয়ের অবাঙালী ছাত্রদিগের বাংলা কীর্তন ও হিন্দী ভজন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৪ঠা চৈত্র রবিবার দিবস স্থানীয় টাউন হলে এক সার্বজনীন সভার অধিবেশন হয়। সভার নেতৃত্ব করেন মসুদা ষ্টেটের রাও শ্রীনারায়ণ সিংহ, এম-এল-এ। পণ্ডিত শ্রীকিষণলাল দ্বিবেদী, শ্রীব্রহ্মদত্ত ভার্গব ও স্বামী আদিভবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিদের পারম্পর্য রক্ষা করিয়াছেন এবং পুণ্যভূমি ভারতের আধ্যাত্মিকতা পুনরুজ্জীবিত করিয়া জগতের সমক্ষে দেশের লুপ্ত গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

উদ্যদ্দীপ্রদশাস্ত্রশুভ্রমহসা দিঙ্মণ্ডলং ভাসতে,
রুদ্রোপেন্দ্রশশাঙ্কপূষমরুতো যস্যাঃ স্তুতিং কুর্বতে।
গন্ধর্বাসুরযক্ষরক্ষউরগা ভীতা দিশং ভিন্দতে,
তাং দুর্গাং বরদানমঙ্গলভুবং বন্দামহে মাতরম্ ॥১॥

বিদ্যাস্বাস্থ্যধনাদিভির্গুণগণৈরত্যন্ত-হীনা যদা,
সেয়ং ভারতমাতৃকা পরবশান্মুক্তাপ্যমুক্তা তদা।
দুর্গে ত্বং পরিপূর্ণবিশ্ববিভবে পূর্ণা যথা ভারতী,
ভূমিশ্রীর্ভবতি ব্যলীকরহিতা ন্যস্যানুকম্পাং তথা ॥২॥

বিঘ্নং ঢুণ্ঢিগণেশপাদরজসা সর্বং হরন্ত্যক্রমা,
লক্ষ্ম্যান্নং প্রদদত্যকিঞ্চনজনায়াঢ্যায় চেয়ং সদা।
জ্ঞানং জ্ঞানদয়োৎসৃজন্ত্যনুগয়া স্কন্দেন রূপং মতং,
সা দুর্গা সকলাগতেহ শরদি শ্রেয়ঃ প্রদাতুং শিবা ॥৩॥

কৈলাসালয়ভাগ্-ভবেশরমণী স্নেহাদ্রিনাথাঙ্কগা,
রামস্যোৎপলপূরণপ্রকরণে কারুণ্যবর্ষাকরী।
লৌলাপং বপুরাস্থিতস্য দিতিজস্যামর্দনাভেদিনী,
মূর্তিঃ সা বিপরীতরূপভৃদপি স্থেয়াদ্ধৃদন্তর্গতা ॥৪॥

যাঁহার উদ্গত, উজ্জ্বল দশ অস্ত্রের শুভতেজে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত—রুদ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, আদিত্য, মরুদ্গণ যাঁহার স্তুতি করিতেছেন—গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্পগণ যাঁহার ভয়ে দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, বরদানে মঙ্গলপ্রসবিনী সেই দুর্গামাতাকে বন্দনা করি।১।

মাতৃভূমি ভারত পরাধীনতাপাশ মুক্ত হইয়াও বিদ্যা, ধনবত্ত্ব, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণে অত্যন্ত অপকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় যেন অমুক্ত থাকিয়া গিয়াছেন। জননি, দুর্গে! আপনার বিভব বিশ্বে পরিপূর্ণ। যাহাতে ভারতভূমি বিদ্যাদি-মণ্ডিত ও রোগরহিত হয় সেইরূপ অনুকম্পা বিতরণ করুন।২।

সেই এই মঙ্গলময়ী দুর্গা, ঢুণ্ঢি গণেশের পদরজঃ দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন যুগপৎ বিনাশ, অনুগামিনী মহালক্ষ্মী দ্বারা ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সর্বদা অন্নপ্রদান, জ্ঞানদা (সরস্বতী) কর্তৃক জ্ঞানবিতরণ ও

কার্তিকের কর্তৃক রূপপ্রদান পূর্বক শ্রেয়ঃ বিতরণ করিবার জন্য এই শরৎকালে সর্বকলান্বিত হইয়া আসিয়াছেন।৩।

যিনি কৈলাসালয়ে মহাদেবের গৃহিণী, আবার (হিমালয়ে) স্নেহরসে অদ্রিনাথের ক্রোড়ালঙ্কারিণী (কন্যা), ১০৮টি পদ্মের পূরণকালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃপাবর্ষণকারিণী, আবার মহিষ-শরীর ধারণকারী অসুরের সম্যক্ মর্দনপূর্বক ভেদকারিণী, এইরূপ নানা বিলক্ষণ ভাবের প্রকাশক হইলেও তাঁহার সেই এক কল্যাণ-মূর্তি (আমাদের) হৃদয়মন্দিরে বিদ্যমান থাকুক।৪।

শারদা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বোধনেরই আগে এসেছে জননী শারদ-শ্রীর মাঝে,
গগনে গহনে ভুবন আলোকি' রূপটি তাঁহার রাজে।

মন্দির পানে চেয়ে—
কেন শুধু আছ ? মা যে আসিয়াছে সারা দেশখানি ছেয়ে।
হেরিছ না তাঁর আয়ুধোজ্জ্বল দশদিকে দশপাণি ?
প্রাচীদিগন্তে হেরিছ না তাঁর হৈম-মুকুটখানি ?
উদ্ধত নদী, শান্ত স্বচ্ছ হ'লো কার ইঙ্গিতে ?
কোন্ কথা বন করে আলাপন কুলায়ের সঙ্গীতে ?
কোথা পেল তরু লাক্ষা-পরশ জবায় যা আছে ফুটে ?
উত্তোলি' গ্রীবা উত্তর হ'তে 'মরালেরা' কেন জুটে ?
কাশের কেশর দুলায় কেশরী কেন জয় গৌরবে ?
কার অঞ্চল করে ঝল-মল তারকা-খচিত নভে ?

জননী আসেনি একা—
হেরি স্থলে জলে কমলে কমলে আরো কত পদরেখা।
এসেছেন বাণী সিত জ্যোৎস্নায় নভোহংসের পরে—
রমার আশিসে শ্যাম-সম্পদে গিরিপ্রান্তর ভরে।
বহি' গণবাণী সিদ্ধি-সূচনা এসেছেন গণপতি।
বৈরীজয়ের আয়োজন করে ময়ূরকেতন রথী।
মা যদি আসেনি, বঙ্গজননী তেয়াগি গেরুয়া বাস
পট্টবসনে কেন হুলু দেয় প্রচারিয়া উল্লাস ?
গঙ্গার তীরে তীরে—
শেফালির লাজ ছড়ানো হেরিয়া বুঝেছি মা এল ফিরে॥

কথাপ্রসঙ্গে

মা

মাতৃপূজা আসিতেছে। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে যখন শিখি নাই তখন হইতে যাঁহাকে প্রাণে প্রাণে চিনিয়াছিলাম, ভালবাসিয়াছিলাম, বাক্য-প্রকাশের শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাঁহার পূজা—তাঁহার শাশ্বত মহিমার নিবিড় উপলব্ধি। মাতৃপূজা আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির স্বাভাবিকতম, সুষ্ঠুতম অভিব্যক্তি, আমাদের হৃদয়াবেগের সার্থকতম সমাপ্তি। আমি ক্ষুদ্র হইতে পারি কিন্তু মা আমার নিকট বৃহৎ, আমি দুর্বল হইতে পারি, দীন হইতে পারি কিন্তু জননী আমার নিকট শক্তিময়ী, ঐশ্বর্যময়ী; কোথাও যখন ঠাঁই পাই না মাতৃ-অঙ্ক তখন আমার জন্য চির-দিন খালি রহিয়াছে; কেহ যখন ডাকে না, সাড়া দেয় না, মায়ের হৃদয় আমাকে ব্যাকুল আহ্বানে পরিতৃপ্ত করে, নিঃশঙ্ক করে। মা আমার নিকট এতই সহজ, অথচ এত বিপুল, এত দূর-প্রসারী, এত গভীর। মায়ের সহিত আমার সম্বন্ধের তুলনা নাই।

সেই মায়ের পূজা। পার্থিব মাকে দেবী মূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া পূজা—দৈবী মূর্তি গড়িয়া পার্থিব মায়েরই সকল আবেগ সকল অনুভূতি আরোপ করিয়া পূজা। মাতৃপূজায় পার্থিব ও অপার্থিব, লৌকিক ও অলৌকিক—দুয়ের অপরূপ সামঞ্জস্য। মানুষ প্রথম মানুষকে চিনে মা বলিয়া। মানুষের প্রথম আকর্ষণ, প্রথম ভালবাসা জননীকে কেন্দ্র করিয়া। সেই আকর্ষণ, সেই ভালবাসা অসীমে গিয়া পৌঁছায় যখন মানুষ ভগবানকে মা বলিয়া উপলব্ধি করে। তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা?

তিনি আরও বলিতেন, মাতৃভাব বড় শুদ্ধ ভাব। আমরা যখন প্রথম মায়ের কোলে আসিয়াছিলাম তখন প্রকৃতির কোন আবরণ আমাদিগকে আচ্ছাদিত করে নাই; উলঙ্গ দেহে স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া আমরা ছিলাম মাতৃ-অঙ্কে শিশু। কী আনন্দের দিন ছিল সেই শৈশবকাল! ভয় ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না, মোহ ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। জাগিয়া দেখিতাম মায়ের কোলে রহিয়াছি, শুইয়া পড়িতাম মায়েরই কোলে। সারাদিন ছুটা-ছুটি করিতে করিতে মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসিয়া তাঁহার হাতের স্পর্শ না পাইলে চিত্ত শান্ত হইত না। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে তেমনি মায়ের মুখখানি সারা শিশুকালকে এক দুর্নিবার কল্যাণ-শক্তিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল। শৈশব কাটিল, ধীরে ধীরে সংসারে প্রবেশ করিলাম, একের পর এক আবরণ দেহ-মনকে আচ্ছাদিত করিয়া চলিল। অনেক ধুলাকাদা মাখিলাম, অনেক স্বার্থ, অনেক বাসনা-কামনা অনেক মোহ-দম্ভ সঞ্চয় করিলাম, অনেক বন্ধনে নিজেকে বাঁধিলাম। সেই নিরাবরণ শৈশব-স্মৃতি মনে মাঝে মাঝে উঁকি দেয় বই কি! মুক্তির বাসনা জাগে বই কি! আবার কি শিশু হইতে পারিব? সংসারের সকল কালিমা মুছিয়া আবার কি নির্মল হইতে পারিব?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, পারিবে, অতি সহজে পারিবে—ঈশ্বরের মাতৃভাবকে অবলম্বন কর। সন্তান যখন মায়ের কাছে যায় তখন তাহার কোন সঙ্কোচ থাকে না, ভয় থাকে না। ঈশ্বরের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করিবার সহজতম উপায় তাঁহার প্রতি মাতৃদৃষ্টি। উহাতে বুকে আসে স্বতঃস্ফূর্ত সাহস, নির্ভরতা। মাতৃনামে, মাতৃচিন্তায় চিত্তের সকল কলুষ তিরোহিত হয়। ঈশ্বরকে যখন মা বলিয়া ডাকি ও ভাবি তখন নিজের দুষ্কৃত ভুলিয়া যাই, জানি—তাঁহার অনন্ত ক্ষমা আমার উপর কখনও বিমুখ হইবে না। ভগবান যখন জননী

তখন তাঁহার শাসন নাই, কর্মবিধান নাই, ঐশ্বর্য নাই, পরাক্রম নাই—তিনি শুধুই আমার স্নেহময়ী জননী, আমাকে অঙ্কে ধারণ করাই তাঁহার কাজ। আমার ভুল-ত্রুটি, আমার নিন্দিত আচরণ, দুষ্টপ্রবৃত্তি—সবই তাঁহার অনন্ত স্নেহসমুদ্রে গোষ্পদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। মাতৃভাব ব্যতীত এমন শুদ্ধিবিধায়ক আর কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলিয়াছিলেন, মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব।

মাতৃভাব মনুষ্যহৃদয়ের একটি বিশিষ্ট সাত্ত্বিক অনুভূতি। এই অনুভূতির মাধ্যমে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে সকল মানুষেই পারে। ধর্মের গণ্ডীর কোন প্রশ্ন উঠে না। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নাম ও মূর্তি হিন্দুদের মাতৃপূজার একটি বিশেষ অভিব্যক্তি কিন্তু জগজ্জননীর পূজা মূর্তি না গড়িয়াও করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আচার্য কেশবচন্দ্র সেনকে ঈশ্বরের মাতৃভাবে উপাসনার কথা বলিতেছেন তখন নিশ্চিতই তিনি কোন বিশিষ্ট দেবীমূর্তির চিন্তা বুঝাইতেছেন না। ভাবী বিবেকানন্দ—নরেন্দ্র কালীঘরে বসিয়া যেদিন মাতৃ-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সুখী হইয়া বলিয়াছিলেন, নরেন কালী মেনেছে। নরেন্দ্রের আধ্যাত্মিক বিকাশে মূর্তিপূজা মানিবার প্রয়োজন ও সার্থকতা ছিল। কিন্তু আচার্য কেশবচন্দ্রকে একদিন উপাসনায় সময় 'মা' 'মা' বলিয়া উঠিতে শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন উহার পটভূমি সম্পূর্ণ পৃথক। কেশব 'কালী' মানেন নাই, 'মা' অর্থাৎ ঈশ্বরে মাতৃবুদ্ধি মানিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম কেশবের সাধনজীবনে মূর্তিপূজা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও মাতৃভাবে আরাধনা ছিল সম্পূর্ণ ন্যায্য ও সার্থক। আচার্য কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহচর্যে এই মাতৃভাবের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের গুণীরা বহু অনবদ্য মাতৃসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলিতে দেবীর কোন সাকার মূর্তির বর্ণনা নাই, কিন্তু শ্রীভগবানের মহামাতৃত্বের সার্থক সমাদর রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্গীত-গুলি শুনিয়া সমাধিস্থ হইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি যুগাবতার হন, যুগের সার্বজনীন ধর্মবোধের আলোক দান যদি তাঁহার 'মিশন' হয়, তাহা হইলে তিনি শুধু হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীর সবলতা সম্পাদন করিতে আসেন নাই, সকল ধর্মের নরনারীর জন্যই তিনি কিছু সার্বজনীন শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন। "মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব"—এইরূপই একটি শিক্ষা।

আজিকার জগতের প্রধান ব্যাধি কাম ও কাঞ্চন। এই ব্যাধির প্রতীকার শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি কথায় অভিব্যঞ্জিত—"টাকা মাটি—মাটি টাকা" এবং "আমার সন্তান ভাব।" সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্য টাকা চাই, কিন্তু জাগতিক অভ্যুদয়ই জীবনের একমাত্র কাম্য মনে করিলে মনুষ্যত্বের প্রচণ্ড অবমাননা করা হয়। তাই টাকাই জীবনের সর্বস্ব নয়। টাকার উপর অনাসক্তি সাধিতে হইবে। জানিতে হইবে মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সর্বোত্তম অভিব্যক্তির তুলনায় টাকার মূল্য মাটিই। যাঁহারা এই বিচার রাখেন তাঁহারা বিত্তের দাস হন না, বিত্তসঞ্চয়ের জন্য কখনও অধর্মাচরণ করেন না। তেমনি স্ত্রীজাতির ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা বর্তমান সমাজের গৌরবের বিষয় হইলেও তাঁহাদের প্রতি শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। নারীর রূপযৌবন এবং দেহবিলাসই যেন উত্তরোত্তর আজ পুরুষের পূজার সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। ইহা নারীর পূজা নয়, অপমান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অপমান হইতে নারীকে রক্ষা করিতে চান, রক্ষা করিয়া মানব-সমাজে নারীর যথার্থ মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। প্রতিষ্ঠার মন্ত্র—"আমার সন্তান ভাব।" শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে যিনি উপাসনা করেন তিনি পৃথিবীর সকল নারীর ভিতর সেই মহাজননীর ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখেন। বলেন,—

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

মাতৃপূজা আসিতেছে—আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত একটি বৃহৎ দায়িত্বের-স্মরণের অবসর উপস্থিত। অনেকেই আমরা জগজ্জননীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করিব। যাহারা মূর্তিতে বিশ্বাস করি না তাহারা তাঁহার অনন্ত পবিত্রতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, করুণা, ক্ষমার অনুধ্যান করিব; ঐ গুলির সমষ্টির নামই তো মাতৃত্ব। দুই ভাবেই মাতৃপূজা চলে। দুই ভাবের মূলে একই তত্ত্ব—শুধু প্রণালীর পার্থক্য। জগজ্জননীর ভাবনা দ্বারা এই পৃথিবীতে আমরা একটি নূতন আলোক লইয়া আসিব—নারীর প্রতি শুদ্ধ দৃষ্টি। স্বার্থ-ঈর্ষা-কামকলুষক্লিষ্ট পৃথিবীকে সুস্থ ও সবল করিবার পক্ষে এই দৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন।

সক্রিয় বেদান্ত

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বেদান্ত প্রখর ভাবে কার্যকরী (intensely practical)। আত্মার সর্বভূতে অবস্থান-রূপ মহৎ সত্য সমাজের বিবিধ স্তরে প্রয়োগ করা চলে—করিতে পারিলে সমাজের ভিতর একটি নূতন কল্যাণশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। যে চৈতন্যশক্তি দিয়া আমরা জগতের সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করি, দৈনন্দিন সকল ব্যবহার সম্পাদন করি উহাই আত্মা। আমার ভিতর, তোমার ভিতর, সকল মানুষের ভিতর সেই একই সর্বব্যাপী চৈতন্য জল জল করিতেছেন; কবিকল্পনা নয়, সর্বজন-প্রত্যক্ষযোগ্য সত্য। এই চৈতন্যই ভগবান। মানুষের এই বৃহত্তম সত্যকে খুঁজিতে বা শুধু ধ্যানধারণার জন্য সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাকে টানিয়া আনিতে হইবে। স্বামীজী বলিতেন, রাণী মদালসার মতো শিশুর কানে এই গান শুনাইতে হইবে—'নিরঞ্জনোঽসি' —"তুমি নিষ্পাপ আত্মা।" আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-সেবা, রাষ্ট্রনীতি মানুষের বৃহৎ সত্তার উপর স্থাপন করিতে হইবে।

আচার্য বিনোবা ভাবে মাদ্রাজে কয়েকটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় এই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের এই শিখিয়েছেন যে আত্মার মধ্যে সর্বভূত এবং সর্বভূতের মধ্যে আত্মা রয়েছে, যেন আমরা আর আশেপাশের প্রাণীসমূহ একে অপরের মধ্যে মিশে রয়েছি। * * * আপনার মধ্যে আমি আর আমার মধ্যে আপনি। ইহাই বেদান্তবেদের সারাংশ। উহাই আমাদের জীবনের মূল কথা। এই ভিত্তির উপর সারা ইমারতটি তৈরী করতে হবে। শরীরের জন্য আমার খাওয়ার দরকার, কিন্তু সকলকে খাইয়ে নিজে খাব। যে আশেপাশের সকল দুঃখীর সাহায্য ক'রে তার পরে খায় তার পক্ষে খাওয়া একরকম যজ্ঞ অথবা পূজা। এইজন্য সারা সমাজকে ঐ রকম শেখাতে হবে। আমাদের সাধুসন্তেরা চমৎকার সব ভজন রচনা করে আমাদের বড় উপকার করেছেন। ঐ সব ভজন শিশুদের শেখাতে হবে। * * * শিশুদের এই শেখানো হবে যে আমরা কেবল নিজের জন্য নয়, সকলের সেবার জন্যই আমরা। * * * যে শিক্ষায় আপন ও পরের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখানো হয়, অপরের খাওয়া জুটুক না জুটুক আমার জোটা চাইই এমন শেখানো হয় সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে কোন কাজেরই নয়।"

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ক্রমশই জগৎ ও জীবনের একত্ব প্রমাণ করিবার দিকে চলিয়াছে। স্বামীজী বলিতেন, বিজ্ঞানের সহিত বেদান্ত-সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই—বরং বেদান্ত বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিবে। বিনোবাজী বলিতেছেন—

"অনেক লোক এরকম ধারণা পোষণ করেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মভাব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বলতে চাই যে এরকম যাঁদের চিন্তাধারা তাঁদের ধর্মে কোন শ্রদ্ধা নেই। প্রসারিত চিন্তাধারাকে ধর্ম আর সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারাকে অধর্ম বলা যায়। বৈজ্ঞানিক যুগে ব্যাপক ভাবনাই টিকে থাকবে, সঙ্কীর্ণ ভাবনা নয়। এই জন্যই যখন বিজ্ঞান এত বেড়ে যাচ্ছে তখন অধর্ম টিকতে পারে না, ধর্মই টিকে থাকবে।

'আমার বাড়ী' এ রকম কথা বাদ দিন। এ আমার বাড়ী, শুধু এই এক ঘরই আমার নয়। অন্য সব ঘরও আমারই। এ ছাড়া বেদান্ত আর কি হতে পারে? বিজ্ঞানও এ ছাড়া আর কি বলছে? ভবিষ্যৎ যুগ, ধর্মের প্রকৃত অর্থকে অতি ভালভাবেই মর্যাদা দিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের যে দুর্বলতার অংশ বিজ্ঞান

আছে তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে। প্রতি ধর্মে যা নির্মল আছে তা উজ্জ্বলরূপে প্রকট হবে।"

মহত্ত্বের স্মরণে

রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে বঙ্গমাতা তথা ভারতজননী একজন শ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তান হারাইলেন। যে সকল সদ্‌গুণ ভারতবর্ষের চারিত্রিক আদর্শে বরণীয় তাহাদের অনেকগুলিই আশ্চর্য সামঞ্জস্যে তাঁহার ভিতর দেখা গিয়াছিল; তাই তিনি সকল ধর্মের সকল স্তরের নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। সত্যই তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস—নিরভিমান, অনাড়ম্বর, উদারচেতা, পরদুঃখকাতর, গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী। জীবনের অধিকাংশ কাল শিক্ষাব্রত লইয়া কাটাইয়াছেন, অসাধারণ পারদর্শিতার সহিত উহা উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তিনি রাজনীতিও করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক জীবন ছিল সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত। জীবনসন্ধ্যায় তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা তিনি নিয়োগ করিয়াছিলেন নিঃস্বার্থ পরোপকারে। শ্রীভগবান এই পুণ্যাত্মার চিরশান্তি বিধান করুন, ইহাই আমাদের হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা।

ধর্মের অপব্যবহার

পনর বৎসর পূর্বে প্রকাশিত আমেরিকান লেখকের একটি বইএর উক্তিবিশেষ লইয়া সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন এক শ্রেণীর মুসলমানরা ভারতের নানা স্থানে কিছুদিন ধরিয়া যে হৈ হল্লা করিলেন তাহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। জগদ্বিখ্যাত ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে আক্রমণাত্মক উক্তি অন্যায় সন্দেহ নাই। বইটিতে পয়গম্বর মহম্মদ সম্বন্ধে আমেরিকান লেখকের বিবৃতি যে আপত্তিকর তাহা পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণের সাধারণ সম্পাদক রাজ্যপাল শ্রী কে এম মুন্সী এবং প্রধান মন্ত্রী নেহরুও স্বীকার করিয়াছেন। মুন্সীজী অনুতাপও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা অত্যন্ত অশোভনভাবে যে কার্যকলাপ করিয়াছেন তাহা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কলঙ্কপাত তো করিয়াছেই, পবিত্র ইসলাম ধর্মেরও গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ধর্মের সম্মান যাঁহারা রক্ষা করিতে ব্যগ্র তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা থাকা উচিত নয়। ঈশ্বরের দূত যখন মানবদেহ ধারণ করিয়া আসেন তখন মানুষের প্রশংসা-নিন্দা দুইই তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হয়। তাঁহারা অবিচলিত ভাবে উহা সহ্য করেন। সকল প্রেরিত পুরুষই যেমন ভক্তের স্তুতি পাইয়াছেন তেমনি সমালোচকের নিন্দাও ভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে। আমরা জানি ভারতবর্ষে এমন অনেক মুসলমান আছেন যাঁহারা স্বসম্প্রদায়ের একশ্রেণীর লোকের এই সাম্প্রতিক গুণ্ডামিতে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। ধার্মিক লোকের চরিত্রে যে পরমতসহিষ্ণুতাই প্রধানতম গুণ, কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান কি পারসীক সকলকেই সর্বদা ইহা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। তবেই এই বহুধর্মের, বহুমতের আবাসভূমি ভারতবর্ষে একতা ও শান্তি থাকিবে।

দুই পাশে

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের বিরাট চওড়া রাস্তা দক্ষিণ হইতে উত্তরে বাহির হইয়া চলিয়াছে। যেখানে একদিন ঘন-বসতি বস্তী, ছোট বড় শত শত জীর্ণ অট্টালিকা, আঁকা বাঁকা গলি উপ-গলি নানা ভঙ্গীতে ছড়াইয়া ছিল আজ সেখানে বিস্তীর্ণ ফাঁকা ময়দান। মাঝখান দিয়া প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইতেছে; দু পাশের উঁচু নীচু জমি এখনও শূন্য, যতদিন না বিত্তবানরা অগ্নিমূল্যে এক, দুই বা চার কাঠা করিয়া জমি কিনিয়া লইয়া বিরাট সৌধশ্রেণী উঠাইতেছেন ততদিন পর্যন্ত এইরূপই শূন্য থাকিবে।

সমীর বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, দুপাশের শূন্য ফাঁকা জায়গা দেখিয়া দেখিয়া চলিয়াছেন।

নির্মীয়মাণ রাস্তার দুপাশে দুটি দৃশ্য চোখে পড়িল। একদিকে ছাপড়া, জৌনপুর, বালিয়া জেলার দীর্ঘদেহ গোয়ালারা ভাঙ্গা বাড়ীগুলির ছড়ানো রাবিশ সরাইয়া, খানাখন্দর ভরাট করিয়া গরুমহিষের অস্থায়ী আস্তানা তৈরী করিয়া লইয়াছে; রাস্তার আশেপাশে আশ্রয়লাভে অভ্যস্ত যাযাবর পশুগুলি খোঁটায় দড়িবাঁধা হইয়া গভীর আরামে বিচালী চিবাইতেছে। তাহাদের অভিভাবকগণ কাছে বসিয়া খৈনি খাইতেছে, সুখদুঃখের কথা বলিতেছে, দুধের হিসাব করিতেছে।

রাস্তার অপর পার্শ্বে পাড়ার বাঙ্গালী যুবকরা দুটি ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট বসাইয়াছে। তাহাদিগকেও মেহনত করিয়া জমি সমান করিতে হইয়াছে; সতর্ক দৃষ্টিতে রাখিতে হইতেছে এই সমান-করা জমিটি তাহাদের অনুপস্থিতিতে অপর কোন দল খাটালের জন্য না দখল করিয়া বসে! খেলা চলিতেছে। খেলুড়েরা সকলেই যে স্কুল কলেজের ছেলে তাহা নয়, আফিসের চাকুরেও আছে কেহ কেহ। দর্শকও মন্দ জমে নাই।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আলোবাতাসহীন সরু নোংরা গলির একখানি বা দুখানি স্যাতস্যাতে ঘর লইয়া কলিকাতার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহ। সেই গৃহের ছেলেমেয়েরা ইমপ্রুভমেণ্টট্রাস্টের দৌলতে দুচার দিন যদি ফাঁকা জায়গায় একটু খেলাধুলার সুযোগ পায় তাহা তো আনন্দেরই বিষয়। তথাপি সমীর বাবু যুগপৎ দুটি দৃশ্য দেখিয়া একটু তাত্ত্বিক চিন্তা না করিয়া পারিলেন না। দুটি দৃশ্যের ভিতর তিনি যেন বাংলার বাসিন্দা—দুই মানবগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলেন।

এক গোষ্ঠী জীবনসংগ্রাম সম্বন্ধে শুধু সচেতন নয়, ঐ সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য যে কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে দিবারাত্র তৎপর। শুধু শরীরের শক্তি নয়, মনের অদম্য উৎসাহ লইয়া তাহারা আগাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের নিকট সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকা এবং সংসার প্রতিপালন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। আভিজাত্য, লেখাপড়া, 'সংস্কৃতি', আমোদপ্রমোদ—এসব পরের কথা। এই গোষ্ঠী কখনো অনাহারে মরিবে না, স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিক্ষা করিবে না। স্বাবলম্বন, কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্যম, অধ্যবসায় এবং গোষ্ঠীর একতা ইহাদের প্রধান মূলধন। এই সম্পদ যাহাদের নাই তাহারা জীবন-সংগ্রামে ইহাদের কাছে যে ক্রমশই হটিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, ইহা তো প্রকৃতিরই নিয়ম।

আর এক গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের গুটিকতক কৌশল মাত্র জানা। সেই পরিধির বাহিরে যুদ্ধ করিতে হইলে তাহারা শুইয়া পড়ে। তাহাদের উৎসাহ আছে কিন্তু জীবনসংগ্রামে ইহা পুরাপুরি ব্যয় করিতে তাহারা নারাজ। সামাজিক গৌরব, স্কুল কলেজের ছাপ. সাংস্কৃতিক ব্যাপৃতি, খেলাধুলা—এগুলি তাহাদের নিকট বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। এই গুলির জন্য তাহাদের বহু শক্তি ব্যয় হয়, জীবনসংগ্রামের জন্য যাহা থাকে তাহা বলবানদের সহিত প্রতিযোগিতার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ইহাদের সতেজ বলিয়া যে যাহার নিজের পথে চলিতেই ইহাদের বেশী ঝোঁক; দলগত অনৈক্য এই গোষ্ঠীর একটি বিষম দুর্বলতা—অভিশাপও বলা যাইতে পারে। জীবনধারণের দিক দিয়া এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সমীর বাবু ভাবিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ছোটরা ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট ফাঁদে ফাঁদুক, কিন্তু কবে তাহাদের বড়রা দলে দলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ফাঁকা জায়গায় দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লোকদের মতো খাটাল গড়িয়া তুলিবে?

জননীসীতাস্তুতিঃ*

(পঞ্চমাতৃকাস্তুত্যন্তর্গতা)

ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চৌধুরী-বিরচিতা

রঘুনাথ-হৃদানন্দ-চন্দন-জুষ্ট-সৌরভাম্।
নৌমি সীতাং জগদ্বন্দ্যাং মুনিমানসমোহিনীম্॥
ধরণীসম্ভবাং দেবীং ধরিত্রীপবিত্রীকরাম্।
লাবণ্যসৌভাগ্যসীমাং সর্বজনশুভংকরাম্॥
জননি কল্যাণকারিণি নৌমি ত্বাম্॥১

পতিতপাবনী ত্বং হি বিশ্বকলুষনাশিনী।
অগ্নিপরীক্ষণং কুতঃ মাতরগ্নিস্বরূপিণি॥
পাতালপ্রবেশো ন হি; সুতমানসমন্দিরে।
মাতস্তে নিত্যসংস্থানম্ আশীর্দেহি ক্ষেমংকরে॥
জননি সন্তাপহারিণি নৌমি ত্বাম্॥২

পঞ্চবটীবিহারিণীং পঞ্চক্লেশঘাতিনীম্।
অশোককাননদ্যুতিম্ অশোকামৃতদায়িনীম্?
জননি যতীন্দ্রবিমলো নৌতি ত্বাম্।
চিরমঙ্গলময়ি যতীন্দ্রো নৌতি ত্বাম্॥৩

পঞ্চ-মাতৃকা-স্তুতির অন্তর্গত জননী সীতার স্তুতি

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দচন্দনে চর্চিতা হয়ে যিনি দিগ্‌দিগন্তর নিরন্তর সুরভিত করছেন, বিশ্ববন্দ্যা মুনিগণের মনোমোহিনী সেই জননী সীতাদেবীকে (বারংবার) প্রণতি নিবেদন করি। এই দেবী বসুন্ধরাসুতা হয়েও বসুন্ধরা-পবিত্রকারিণী, অসীম সৌন্দর্য-মাধুর্যশালিনী ও সর্বজনের শুভদায়িনী। কল্যাণকারিণি জননি! তোমাকেই বারংবার প্রণাম। ১

তুমিই পতিতোদ্ধারিণী বিশ্বপাপ-বিনাশিনী। জননি! তুমিই অগ্নিস্বরূপিণী; তোমারই আবার অগ্নিপরীক্ষা! পাতাল-প্রবেশও তো তুমি করনি; প্রবেশ করেছ কেবল তোমার সন্তানদের মানসমন্দিরেই মাত্র—তুমি, মাতঃ! সেখানেই, চিরস্থায়িনী হয়ে রয়েছ। মঙ্গলকারিণি! আমাদের নিত্য আশীর্বাদ কর। সন্তাপহারিণি জননি! তোমাকেই বারংবার প্রণাম। ২

পঞ্চবটীবিহারিণী তুমিই (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ) পঞ্চক্লেশ-হারিণী। অশোক-কাননের দীপ্তি-স্বরূপা তুমিই আনন্দামৃত-দায়িনী। জননি! তোমাকেই যতীন্দ্রবিমল বারংবার প্রণতি নিবেদন করছে। চিরশুভময়ী! তোমাকেই যতীন্দ্রের বারংবার প্রণাম। ৩

* সর্বপ্রথম "মাতৃলীলা" (আগমনী) কথকথায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অব কালচারে গীত।

'শরৎকালে মহাপূজা'

স্বামী ক্ষমানন্দ

প্রকৃতির শ্যামলিমা, প্রস্ফুটিত শেফালিকার বর্ষণ-প্রাচুর্য, নির্মল নীলিমায় পুলকিত শরতের প্রতিচ্ছবি এবং ইহাদেরই মঙ্গল-সম্ভারে সুসজ্জিত পূজাপ্রাঙ্গণ জগন্মাতার আগমনবার্তায় মুখরিত। ক্ষণস্থায়ী হইলেও, দুঃখ-বেদনার স্তিমিত হৃদয়াবেগ অপূর্ব রসাবেশে পরিপূর্ণ। আনন্দময়ীর আগমনী-গীতিসঞ্জাত আশার উন্মাদনা সন্তানবৃন্দকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে।

সর্বাধিষ্ঠাত্রীরূপে তিনি নিত্যা ও অব্যক্তা, আবার জড় ও অন্তর্জগতে থাকিয়া সকলের নিয়মন-কারিণী এবং যুগে যুগে কল্যাণমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সন্তান-সংরক্ষণ ও অশুভ বিমর্দনের কথা সর্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। এই মহাশক্তির আরাধনার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—শক্তিই জগতের মূলাধার। তিনিই মহামায়া, জগৎকে মুগ্ধ করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। তিনি পথ না ছাড়িলে সচ্চিদানন্দকে লাভ করা যায় না। সেই আদ্যাশক্তির ভিতর বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে; অবিদ্যা মুগ্ধ করে এবং বিদ্যা—যাহা ঈশ্বর পথে লইয়া যায়। অবিদ্যাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাই শক্তির পূজাপদ্ধতি।

মহামায়ার স্বরূপজিজ্ঞাসু মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে মহর্ষি মেধা বলিয়াছিলেন—দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন দৃঢ়চেতাদের মন সবলে আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন, সুতরাং অবিবেকী-দের কা কথা! (চণ্ডী)। এই জন্যই নানা কিংব-দন্তীতে ও শাস্ত্রাদি মুখে সকলকে ভগবতীর উপাসনায় প্রবর্তিত হইবার উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। শরৎকালেই দেবী বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই শুভা-বির্ভাবের স্মরণে প্রতিবৎসর মহোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে এবং ইহাই বঙ্গে ও বৃহত্তর বঙ্গে শারদীয়া মহাপূজা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে নবরাত্র উৎসব নামে খ্যাত।

যে সকল পুরাণে দুর্গাপূজার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে বৃহন্নন্দিকেশ্বর (অধুনা অপ্রাপ্য), কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণ অন্যতম। সর্বত্রই শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের পরিপ্রেক্ষিতে পূজাকাল ও বিধানাদি লিখিত হইয়াছে। মূল রামায়ণে ইহার সমর্থন না থাকিলেও দেবীভাগবত, মহাপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণাদি গ্রন্থে আমরা ইহার ইতিবৃত্ত পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল নিবন্ধও প্রসিদ্ধ আছে, যথা,—রঘুনন্দনকৃত দুর্গোৎসবতত্ত্ব, শূলপাণির দুর্গোৎসব বিবেক, মৈথিল পণ্ডিত বিদ্যাপতি ও বাচস্পতিমিশ্রের যথাক্রমে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও দুর্গোৎসব প্রকরণ এবং কাম-রূপীয় (আসাম) দুর্গোৎসব প্রকরণ। এই সকল নিবন্ধকার নানা শাস্ত্রযুক্তি সহায়ে অতি কৃতিত্বের সহিত নিজ নিজ গ্রন্থে দুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্রম ও বিধি লিখিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, নতুবা কেবল পুরাণাদিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সহিত কার্যক্রম নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়িত।

দেবীর এই শরৎকালীন শুভাগমনের সহিত জননী-দুহিতার মায়িক সম্পর্ক সংযুক্ত হইয়া ইহাকে অপূর্ব ভাবসম্পদে-মণ্ডিত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। নগ-রাজরাণী স্বীয় কন্যা উমাকে শিবগেহিনীরূপে দেখিয়া অপার আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই স্নেহপুত্তলীকে সদা সন্নিকটে পাইবার প্রবল প্রেরণায় স্বতঃই মাতার অন্তর গভীর বেদনায় ভরিয়া উঠিত। স্বামিগৃহ হইতে কন্যাকে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে ফিরাইয়া আনিবার কাহিনী

মেনকার খেদোক্তিতে এবং আগমনী গানে এত সরস হইয়া উঠিয়াছে যে উহা একান্ত বাস্তববাদীর নীরস মনকেও মোহিত করে।

আমরা এবার দেবীর বিভিন্ন আবির্ভাব সংক্রান্ত পৌরাণিক কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করিব। অত্যাচারী দুর্গমাসুরের বেদবিধি অধিকারে হোমানল-প্রদীপ্ত এবং সামগানে মুখরিত তপোবনগুলিতে বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হইল এবং ইহাদের অননুশীলনের প্রতিক্রিয়া প্রতি সমাজ-শরীরে প্রকাশ করিয়া মানুষকে নীতিজ্ঞানহীন ও অলস করিয়া তুলিল, বর্ষণ-বিধুর ঋতুর কঠোর প্রভাব দৃষ্ট হইল প্রতিটি কর্ষণ-বিহীন শস্যক্ষেত্রে। শ্যামলা ধরণী ধারণ করিল ধূসর মরুর ভয়াল আকার। বুভুক্ষু নরনারীর করুণ-ক্রন্দনে এবং কল্যাণকামী ঋষিবৃন্দের সকাতর প্রার্থনায় অনন্ত চক্ষুষ্মতী দেবী শতাক্ষী আবির্ভূতা হইলেন শরতের শুভ্রাকাশে। অগণন চক্ষে নবরাত্রব্যাপী তাঁহার করুণাশ্রু বর্ষাধারায় বিগলিত হইয়া জীবধরিত্রীকে পুনরায় প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিল। যমদন্তযুত বা মৃত্যুভয়পীড়িত এই ঋতুতে মহামারীর প্রকোপ প্রতিহত করিয়া দেবীর এই অপ্রাকৃত পুণ্যদর্শন সকলকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়াই এই অকাল পূজার প্রবর্তন। কোন্ স্মরণাতীতকাল হইতে ইহার যে প্রচলন হইয়াছিল কে তাহা বলিতে পারে, তবে লিপিবদ্ধ কাহিনী অনুসারে ইহা যে বহু পরবর্তীকালের তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

মহিষমর্দিনীরূপে দেবীর তিনকল্পে তিনবার শরৎকালে আবির্ভাবের কাহিনী প্রচলিত। প্রথম কল্পে—শিবের বরে রম্ভাসুরের মহিষ নামে এক অমিতবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বড় হইয়া ক্ষমতার মত্ততায় মহিষাসুর আস্তিক্যবুদ্ধি ভুলিয়া অত্যাচারী হইল এবং দেবগণকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তাঁহাদের স্বর্গবিচ্যুতিতে লোক-সমাজে নানা বিপর্যয় দেখা দিল। সকলের সম্মিলিত প্রার্থনায় আবির্ভূতা হইলেন রণরঙ্গিণী অষ্টাদশ ভূজা, উগ্রচণ্ডা। দেবী উগ্রচণ্ডা আশ্বিনের মহানবমীতে মহিষাসুর নিধন করিলেন।

দ্বিতীয় কল্পে—অত্যাচারিতের করুণ-ক্রন্দনে জগন্মাতার পুনরাগমন হইল ষোড়শভূজা মূর্তিতে চারুশোভনা ভদ্রকালীরূপে। এই মূর্তিতে আর একবার আমরা তাঁহার দর্শন পাই দক্ষ যজ্ঞক্ষেত্রে (হিমালয়ের সানুদেশে কনখলে); উহা যেমনই মর্মস্পর্শী তেমনই ভয়ঙ্কর। শিবপ্রাণা সতী পতি-নিন্দায় গতাসু হইলেন। ধ্যানস্থ শিবের স্তিমিত-চক্ষে জ্বলিয়া উঠিল করালাগ্নি—রুদ্রবিশানের প্রলয়ছন্দে আবির্ভূতা হইলেন কোটিযোগিনী-সমাবৃতা নৃত্যপরা ভদ্রকালী (দেবী ভাগবত, ৩।২৭।৮-১০)। তাই তাঁহার অন্য নাম দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী। আজও সেই দিব্যকাহিনীর স্মরণে বহু পূজাপ্রাঙ্গণে ধ্বনিত হয়—ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীঁ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ—(যিনি) ওঁকাররূপিণী ও দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী (তিনি) কোটি যোগিনীবৃন্দের দ্বারা পরিবৃতা (হইয়া) প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে ভদ্রকালীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনিই পরব্রহ্মরূপা মহামায়া দুর্গা (তাঁহাকে) প্রণিপাত করি।

তৃতীয় কল্পের আবির্ভাব হিমালয়স্থিত মহামুনি কাত্যায়নের নিভৃত আশ্রমপ্রাঙ্গণে। আবার মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেবতাগণ তাহার অত্যাচারে জর্জরিত। মহিষাসুরের বধোপায় নির্ধারণে সম্মিলিত দেববৃন্দের সরোষ ললাটে ফুটিয়া উঠিল বহ্নিদহন। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বল প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া ধীরে ধীরে রূপান্বিত হইল এক মহামহিমময়ী দেবী মূর্তিতে। মহর্ষির তপঃশক্তিতে তিনি অমিত দীপ্তিময়ী ও সমূহ দেবতার আয়ুধাভরণে সুসজ্জিতা হইয়া আবির্ভূতা হইলেন মহিষাসুরনিধনক্ষমা দশপ্রহরণা দুর্গা মহামুনি কাত্যায়নের আশ্রমে এবং তাঁহার

দুহিতৃত্ব স্বীকারে তিনি বিশ্ববন্দিতা হইলেন কাত্যায়নী নামে। কাত্যায়নই সর্বাগ্রে নিবেদন করিলেন এই কন্যারূপিণী মাতৃমূর্তিকে তাঁহার অন্তরের পূজা ও প্রণতি। কন্যার পরাকাষ্ঠা মাতৃত্বে, তাই কন্যারূপিণী জগদম্বার আরাধনায় ইহাই মূল সূত্র। তাই বাংলার শারদীয়া মহাপূজা এই যুগ্ম ভাবাশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। মনে হয় এই বিবরণের পটভূমিকা হইতে ইহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ কুমারী পূজা ইহার অন্যতম অঙ্গরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। সৌম্যাঽসৌম্যতরা—ভক্তপরিপালিনীরূপে তিনি যেমন সৌম্যা আবার দৈত্যদিগের নিকট ততোধিক রুদ্ররূপিণী-অসৌম্যা। পূর্বতন ভীষণ রূপসমূহের সুসংস্কৃত এক অনুপম মাতৃমূর্তি—কঠোর ও কোমল ভাবের বিগলিত করুণাধারা। অসুরকে বধ করিতেছেন, হিংসার লেশমাত্র নাই, সদা সুপ্রসন্ন। শাসনে কঠোরা হইলেও অন্তর তাঁহার স্নেহশীতল।

ত্রিকালোক্তা দেবী উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও কাত্যায়নী মহাষ্টমীতে আবির্ভূতা হইয়া মহানবমীতে মহিষাসুরকে বার বার নিধন করিলেও, শেষোক্ত দশভুজা দুর্গারূপে তাঁহার পূজার সমধিক প্রচলন। কোন কোন স্থানে অন্য দুইটি মূর্তি নির্মাণ করিয়াও পূজা করিতে দেখা যায়। মহিষাসুরবধ বৃত্তান্তের ত্রিপুণ্যকৃৎ এ শুভ মহাষ্টমী অশেষ কল্যাণ ও আনন্দের উৎস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার এই অসুরবিনাশনের কীর্তি ভক্তিপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকলে নিষ্পাপ ও বিপন্মুক্ত হয় ইহা স্বয়ং তাঁহারই স্বীয়ারোক্তি।

পুরাণান্তরে (দেবীপুরাণ, ২-২০ অধ্যায়) দেখা যায় আশ্বিনেরই মহানবমীতে তিনি ঘোরাসুর নিধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্মৃতি-নিবন্ধকার রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার বিখ্যাত দুর্গোৎসব গ্রন্থে এই পুরাণের উক্তি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে—দেবী পুরাণীয়ে-নাপি ষষ্ঠীতো নবমী পর্যন্তং পূজেয়ম্। তাই মনে হয় আশ্বিনের ষষ্ঠী তিথিতেই জগদ্বাসী পুনরায় তাঁহার দর্শন পাইয়া ধন্য হইল—এবার কেন্দ্র বিন্ধ্যাচল। অসুরাধিপতি দুন্দুভির অমিত বিক্রম ও নিষ্কলঙ্ক পৌরুষের সহিত, তাহার—তপস্যাপ্রসূত আত্মবিশ্বাস সংযুক্ত হইয়া তাহাকে সমগ্র জগতে একাধিপত্য স্থাপনে সমর্থ করিয়াছিল। একদা কৈলাস ভ্রমণ কালে সে আসুরিক বৃত্তির প্রভাবে পথভ্রষ্ট হইল। শিবাবাসে উপস্থিত হইয়া দেবীর দুর্লভ দর্শন পাইয়া সে উহার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না এবং এই গর্হিত আচরণের ফলে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল। অসুরেরা সর্বদাই উন্নতিকামী ও পরিশ্রমশীল। আবার সেই কঠোর তপশ্চরণ ও ভগবদ্দর্শন এবং তাঁহার বরে সর্বলোক জয় করিয়া তাহার স্পর্ধা উচ্চ সীমা অতিক্রম করিল। বিন্ধ্য-বাসিনী ঘোরাসুর নিধনে আবির্ভূতা হইলেন অমিত সুন্দরী ক্রীড়ারতা বালিকারূপে। ভোগসামগ্রীর প্রাচুর্য ও সুপরামর্শের অভাবে আত্মবিস্মৃত অসুর দেবীকে ধরিবার জন্য লালায়িত হইলে সে অচিরে সসৈন্য নিহত হইল মহানবমীতে।

বীর্যবান কাশ্যপাত্মজ শুম্ভ, নিশুম্ভ ও নমুচি। ইন্দ্রবজ্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিধন শ্রবণে ব্যথিত ভ্রাতৃদ্বয় বৈরশুদ্ধির জন্য নিযুক্ত হইল কঠোর তপস্যায়। সেই পুরাতন কাহিনী। শক্তিমান অসুরদ্বয়ের অত্যুগ্র অত্যাচারের প্রমত্ত প্রতাপে এবং অত্যা-চারিতের ভক্তিবিনম্র স্তুতিগানে পরমপাবনীকে লীলাচঞ্চল করিল। আবার তাঁহাকে দেখিতেছি হিমালয়ের ক্রোড়ে মুনি মাতঙ্গের বল্লরীবিজড়িত আশ্রমকুটিরের স্নিগ্ধ প্রাঙ্গণে, রণাঙ্গনের কোলাহল-বিবর্জিত শান্ত পরিবেশে অনিন্দ্যশ্রী দশভুজা দেবী কৌশিকী।

পূর্বোক্ত আখ্যায়িকাসমূহের সাহায্যে আমরা দেখিয়াছি যে মহিষাসুর, ঘোরাসুর এবং শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণের সংহারের নিমিত্ত দেবী দুর্গা

দশপ্রহরণা হইয়া শরতের আশ্বিনে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। কৈলাস তাঁহার নিত্য নিবাসস্থল এবং মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন হিমালয়স্থিত কাত্যায়ন ও মাতঙ্গের আশ্রমে এবং বিন্ধ্যাচলে। তাই আজও বোধনপূজার পুণ্য প্রদোষে তাঁহাকে আহ্বান করা হয়—আবাহয়াম্যহং দেবীং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি বা, কৈলাসশিখরাদ্ দেবি বিন্ধ্যাদ্রের্হিমপর্বতাৎ—ইত্যাদি। কৈলাসশিখরে যে মূর্তিতে তুমি নিত্য বিরাজিতা, মহিষাসুর ও ঘোরসুর বধার্থ যে দশভূজারূপে কাত্যায়নাশ্রমে ও বিন্ধ্যপর্বতে আবির্ভূতা হইয়াছিলে সেই মূর্তিতে তুমি এই বিল্বশাখা ও মৃন্ময়ী মূর্তিতে আগমন কর। শরৎঋতুসম্ভবা বলিয়াই তাঁহার অন্যতম নাম শারদা। ঘটনা পরম্পরার বিচিত্র সমাবেশ দৃষ্ট হইলেও আশ্বিন মাসে যে দশভূজার জন্মাবির্ভাব হইয়াছিল উহাতে কোন মতদ্বৈধ নাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১২।১২) 'শরৎকালে মহাপূজা' এই বাক্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে শারদীয়া পূজার দ্বারা সকলেই সর্বপ্রকার ত্রিতাপনাশে সমর্থ হয় এবং কোন কোন ভাগ্যবান মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা দুর্গার আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় এই দুর্লভ ব্রহ্মানুভূতিও লাভ করিয়া থাকেন। রাজ্যহৃত রাজা সুরথ এবং স্বজনপরিত্যক্ত সমাধি মহর্ষি মেধার নিকট দেবীর মহাত্ম্য শ্রবণান্তর তাঁহারই আশ্রমসংলগ্ন নদীতীরে দেবীর মৃন্ময়মূর্তি নির্মাণ করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং ত্রিবৎসরান্তরে জগদম্বিকার দর্শনলাভে ধন্য হইয়া নৃপতি ফিরিয়া পাইলেন রাজ্য এবং মুমুক্ষু সাধক সমাধি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী হইলেন।

"শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ কলিতে"—স্বামী সারদানন্দজী বলিতেছেন, "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি মানুষ জড় ও মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে সব শক্তি আরাধনার ফলে। ...একালের উপাসকদের এ কথা প্রত্যক্ষানুভূত। তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফল লাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে।" দেশে শক্তিপূজার বহুল প্রচার সত্ত্বেও এই মর্মন্তুদ দুর্দশার মূলে পাই তাঁহার এই পূর্বোক্ত বাণী। কেহ কেহ বলেন যিনি জগজ্জননী, তাঁহাকে যে যে রূপেই ডাকিবে, তিনি কি তাহাতে সাড়া দিবেন না? —সকলে সমানভাবে ডাকিতে পারে না সত্য; কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, শিশুর অস্ফুট স্বর কাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য উত্থিত হইতেছে, সরল শিশুর মাতৃনির্ভরতাই তাহার একমাত্র সম্বল কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি ইহা বর্তমান। যদি দেবীপূজায় আমাদের নিষ্ঠা নির্ভরতা কোন একটিও না থাকে, তাহা হইলে ইহা কি করিয়াই বা সম্ভব হয়। 'বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন "সম্প্রতি 'সার্বজনীন পূজা'র প্রচলন বৃদ্ধি দেখিয়া যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি আবার জাগিতেছে, তাহা হইলে নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যেখানে কেবল আমোদ-প্রমোদ উপভোগের প্রবৃত্তি ও প্রমত্ততা সুপ্রকট, সেখানে ধর্মবুদ্ধির জাগরণ সম্পর্কে কোন কথা মনে না আনাই ভাল। যেখানে প্রতিমা প্রস্তুতির মধ্যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রকাশ ও প্রচেষ্টার পরিবর্তে তথাকথিত আর্টের বাহারবিড়ম্বনা ফুটিয়া উঠে, সেখানে যাহা হয়, তাহা পূজা নহে—পূজার বিদ্রূপাত্মক অভিনয় মাত্র।"

শারদীয়া মহাপূজা চতুরবয়বযুক্ত; মহাস্নান, পূজা, বলিদান ও হোম এই কয়টি অনুষ্ঠান (অবয়ব) সমন্বিত হইলেই হয়—মহাপূজা এবং এক দুর্গাপূজা ছাড়া এই সবগুলির একত্র সমাবেশ কোন পূজায় দৃষ্ট হয় না; সেইজন্যই পূজা করিবার সংকল্প নির্ণয়কালে 'মহাপূজা' এই কথাটি উল্লেখ করিতে হয়। পূজার সময় নির্দেশিক সাতটি কল্পারম্ভের উল্লেখ

দেখা যায় ; তন্মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভের (ষষ্ঠী—নবমী) প্রচলন সমধিক। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস ও সপ্তমীর প্রাতে নবপত্রিকাশ্রয়ে দেবীর পূজাঙ্গনে আগমন হইলে আনুষ্ঠানিক পূজা আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া আরও সপ্তমী, মহাষ্টমী, সন্ধি, মহানবমী এবং বিসর্জন পূজা বিশেষ বিশেষ লগ্নে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাস্নান: সপ্তমী হইতে নবমী পর্যন্ত প্রত্যহ দেবীর পূজারম্ভের পূর্বেই সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যাদি সহকারে বিভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আনীত বহুবিধ সুরভিত ও সুদৃশ্য দ্রব্যসম্ভার ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণসহ দেবীকে নিবেদিত হয়। বিভিন্ন পুরাণে স্নানের উপচারগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ইহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকার দ্বারা দেবীর অঙ্গমার্জনাকে মৃত্তিকাস্নান বলা হয়।

পূজন: সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনই শ্রেষ্ঠ পূজা, ধ্যানপর উপাসন মধ্যম, স্তুতি জপাদি তৃতীয় স্তরের এবং প্রতীক বা প্রতিমা অবলম্বনে আরাধনাই চতুর্থ স্তরের। বাহ্যবস্তুর অবলম্বনে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই উত্তম ব্রহ্মসদ্ভাব লাভ করে, সুতরাং বাহ্যপূজা হইলেও বিবিধ অনুষ্ঠান, ধ্যান, উপাসনা স্তবস্তুতি ইত্যাদির সহায়ে এই চারিটি ক্রমের অনুবর্তন সমস্ত পূজায় অনুসৃত হয়।

সাত্ত্বিকাদি ভেদে পূজার উপচার বিভিন্ন হইলেও ইহার বিধিতে প্রভেদ নাই। এই পূজায় সমারোহ নাই। রাজসিক পূজক ঘটা করিয়া পূজা করে। ইহাতে তাহার লোকমান্য হইবার প্রবল স্পৃহা বিদ্যমান। তামসিক সাধকের পূজা বিধিহীন।

সুস্থ দেহ ও স্থির মন আরাধনার প্রথম সোপান। ইহাকে সর্বাগ্রে শুদ্ধ এবং সংস্কৃত না করিলে ইহা ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান হইতে পারে না। পূজাস্থান, উপকরণ, প্রতিমা ও দেবতার মন্ত্র সমূহকে শোধন করিলে পূজকের চিত্ত ধ্যানযোগ্যতা লাভ করে। পূজকের নিষ্ঠা, গৃহস্থের ভক্তি এবং ধ্যানসম্মত সুগঠিত দেবমূর্তি নির্মাণের দ্বারাই প্রতিমায় দেবতার আবেশ হয় বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। দেবীর যথাযথ অঙ্গ-সংস্থান ও আয়ুধাদির সন্নিবেশ না করিয়া কেবলমাত্র উহাকে দর্শনীয় করা বাঞ্ছনীয় নহে।

দেবীর জটামণ্ডিত মস্তক অর্ধেন্দুকলায় সুশোভিত, ত্রিনয়নভূষিতা কমনীয় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখ-কান্তি, অতসীপুষ্পাভ দেহদ্যুতি, দাঁড়াইবার উন্নত ভঙ্গী এবং বিবিধাভরণে ভূষিত তাঁহার দেহ তারুণ্য ও অমল দন্তশ্রেণীর বিমল আভায় মাতৃত্বের মাধুর্য বর্ষণ করিয়া ত্রিভঙ্গিমঠামে মহিষাসুরকে মর্দন করিতেছেন। মৃণালসদৃশ দশবাহুতে দক্ষিণোর্ধ্বাধঃ ক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বামকরনিকরে নিম্ন হইতে উর্ধ্ব ক্রমে ঢাল, সচাপধনু, নাগপাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা বা পরশু—অস্ত্রশস্ত্রসমূহ। তাঁহার পাদমূলে ছিন্নগ্রীব মহিষ এবং ঐ স্থান হইতে খড়্গধারী মহিষাসুর অর্ধনিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই দেবীর ত্রিশূল তাহার হৃদয়ে আমূল প্রোথিত হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, চক্ষু দুইটি লালবর্ণ ও বিস্ফারিত এবং দেবীর নাগপাশে তাহার কটিদেশ বেষ্টিত হওয়ায় ভ্রূকুটিকুঞ্চিত মুখ অতীব ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। নাগপাশের দ্বারা তিনি কেশগুচ্ছ ধারণ করিলে সে রক্তবমন করিতে লাগিল। দেবীর পদতলে সিংহ এবং তাঁহার দক্ষিণ চরণ সরলভাবে উহার উপর ন্যস্ত এবং কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে অবস্থিত অন্যতম চরণের মাত্র অঙ্গুষ্ঠটি স্থাপিত। দেববৃন্দ-সংস্তুতা, উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তি-পরিবেষ্টিতা ধর্মার্থকামমোক্ষদাত্রী—দেবী সমগ্র জগৎকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ধ্যানান্তে দেবীকে নিবেদিত হইল হৃৎপদ্মাসন। সহস্রার হইতে ক্ষরিত সুধাধারায় তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল ধৌত করিয়া মন প্রদত্ত হইল অর্ঘ্যরূপে। এইরূপে একে একে সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়া সাধক দেখিলেন আর তাঁহার দিবার কিছুই নাই—

তাই আত্মনিবেদন করিয়া তিনি আপনাকে দেবী-ময় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইবার আত্মরূপিণী মহামায়াকে হৃদয়াষ্টদলপীঠ হইতে বাহিরে আসিয়া পূজা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইয়া যথাসাধ্য উপচারে তাঁহাকে পূজা নিবেদন করা হইলে তাঁহার আদেশ লইয়া তাঁহার সহিত আগত দেবপরিবার এবং অঙ্গ ও আবরণ দেবতাদের পূজা করা হইলে (দেবীর বিভিন্ন অঙ্গে অধিষ্ঠিত দেবতা, এবং তাঁহাকে আবৃত করিয়া যে সকল দেবদেবীগণ বিদ্যমান রহিয়াছে তাঁহারা আবরণ দেবতা) পূজা সমাপন হইল।

বলিদান : 'বলি অর্থে উপচার বুঝাইলেও ইহার দ্বারা বিশেষতঃ পশুবলি বুঝিতে হইবে।' কেন এই বিধি?—সত্যই কি ইহা দেবীর তৃপ্তি-প্রদ? ইহার দুইটি অর্থ ; একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। দেবীভাগবতের টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে দেবী পূজাতেই বলিদান সঙ্গত, অন্যত্র নহে ; কারণ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী দেবী আমাদের স্বরূপনিরোধক এই ঘোর জীববুদ্ধি নাশ করিয়া ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রতিভাত হন—তাই তিনি বলিপ্রিয়া।

কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ। সাধক মানসপূজায় দেবীর নিকট বলি দিতেছেন তাঁহার রাগ ও রোষ। অন্তর্নিহিত পশুভাবের নিরোধে দৈবশক্তির বিকাশই যথার্থ পশুবলির অর্থ। অন্য সাধকের বলি প্রদান ইহার গৌণার্থ জ্ঞাপক। যাঁহাদের বুদ্ধি মার্জিত নহে এবং যাঁহারা মাংসাশী তাঁহারা পশুবলি দিয়া পূজা করিবেন। পশুবলির মধ্যে ছাগ ও মেষ প্রভৃতি সপ্ত গ্রাম্য এবং মহিষাদি সপ্ত অরণ্যজ পশু উৎসর্গীকৃত হয়।

হোম : শারদীয়া মহাপূজা তিথি ও সময়সাধ্য, ইহা যথা সময়ে সম্পন্ন করিতে হয় এবং হোম-ক্রিয়াই ইহার শেষ অঙ্গ। মহানবমীর পূজা সম্পন্ন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে দেবীর অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া আহুতি দিতে হয় কারণ অগ্নিই সকল দেবতার মুখস্বরূপ এবং আহুত দ্রব্য যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য। আচার ভেদে বৈদিক ও তান্ত্রিক হোমের বিধান বর্তমান। প্রথমটি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ তাই অনেকেই অন্য পর্যায়ের হোম করিয়া থাকেন। বৈদিক যুগের আহিতাগ্নি উপাসনার সহিত পরবর্তী যুগের প্রতিমা পূজার শেষে এই অনুষ্ঠান করিয়া উভয় কালের আরাধনায় এক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ণাহুতি ও দেবীকে দক্ষিণান্ত করিয়া পূজা সমাপন হয়।

দশমী : রাবণনিধনের পর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় উৎসব এবং অযোধ্যাযাত্রা, দেবীর স্বগৃহে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন এবং দুর্গা যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই মহানবমী পর্যন্ত তাঁহার পূজা করার পরে বিজয়া দশমীতে রাজাগণের শত্রুজয়ের জন্য জৈত্র-যাত্রা ও বলনীরাজন, অর্থাৎ জয়লাভেচ্ছু রাজন্য-বৃন্দের সৈন্য সম্বর্ধনার ব্যবস্থা দশমী কৃত্যের অঙ্গ। বর্তমানকালেও দেখা যায় এই দিনে কাহারও অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও এই দিনে সংবৎসরের জন্য যাত্রা করিয়া রাখেন—যাহাতে পরে তাঁহারা কোন বার তিথি না দেখিয়াও যে কোন দিন যাত্রা করিতে পারেন।'

পূজা অর্চা, আদর আপ্যায়ন, লোকলৌকিকতার দিব্য উন্মাদনায় অতিবাহিত তিনটি দিন দশমীর অনাকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবে মুহ্যমান। বিচ্ছেদবেদনা কাহাকে না ব্যথিত করে ; বিশেষতঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যাঁহাকে পাওয়া যায়।

দেবীর তুষারধবল নিত্য নিলয়ে ফিরিয়া যাইবার আজ দশমীর বিসর্জন তিথি। কোথায় সে তুহিনাচল কৈলাস?—আমাদের মানসসরোবরের অতি সন্নিকটে যথায় ধ্যানমগ্ন সশক্তিক ধূর্জটির তপঃপ্রভাবে আমাদের অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা দলিত ও ছিন্ন হইয়াছে।

দর্পণ বিসর্জন হইল। উহারই প্রতিচ্ছবিতে

তাঁহার আরাধনা হইয়াছিল। এখন সেই প্রতিবিম্ব বিম্বগত হইয়া কারণে প্রবেশ করিল। সর্ব বিপদ বিনাশিনী ও শান্তিকারিণী দুর্গাকে প্রদক্ষিণ করিয়া একদা যে উৎসবাঙ্গন বিত্ত ও বিজ্ঞানলাভেচ্ছু ভক্তবৃন্দের প্রার্থনায় মুখরিত হইয়াছিল তাহা শুব্ধ হইল। সন্ধ্যাসমাগমে প্রতিমা উন্মুক্ত অম্বরতলে স্থাপিত। যে সুশোভিত বরণডালার মাঙ্গল্য সম্ভারে তাঁহার আগমনীর আবাহন-গীতি বাজিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহাই আবার প্রতি হৃদয়ে বিসর্জনের করুণ সুরে ভরিয়া উঠিল এবং মাতৃ-আগমনের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারার সুস্থির প্রতীতি লইয়া এবং পরস্পরকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি জানাইয়া আমরা পুনরায় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করিব।

মুণ্ডক উপনিষদ্

(পূর্বানুবৃত্তি)

[তৃতীয় মুণ্ডক ; দ্বিতীয় খণ্ড]

'বনফুল'

শুভ্র-ভাতি যেই ব্রহ্মে সর্ব-বিশ্ব রয়েছে নিহিত
আত্মজ্ঞ পুরুষই জানে সেই ব্রহ্ম-ধাম
জন্মপাশ মুক্ত হয় সেই ধীমানেরা
সে পুরুষে পূজা করে যাহারা নিষ্কাম ॥১॥

মজিয়া বিষয়-রসে তাহারই কামনা করে যারা
কামনারই মাঝে তারা জন্ম লভে কামনা-বশেই
কিন্তু যিনি পূর্ণকাম, যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত
সর্বকাম মুক্ত তিনি ইহ জীবনেই ॥২॥

শাস্ত্র পাঠ করিলেই আত্মারে যায় না পাওয়া
বুদ্ধি বা বিদ্যাও তার পায় না আভাস
যে সাধক আত্মাকেই ভাবে বরণীয়
তারই কাছে আত্মা করে আত্ম-প্রকাশ ॥৩॥

বল-হীন আত্মারে পায় না কখনও
সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান অথবা প্রমাদও
সে আত্মার দেয় না নির্দেশ,
এদের সহায়ে যদি কোন সুধী যত্ন করে
সেই শুধু ব্রহ্মধামে করিবে প্রবেশ ॥৪॥

জ্ঞান-তৃপ্ত ঋষিগণ এইরূপে আত্মারে জানিয়া
আত্মপ্রতিষ্ঠিত হ'ন, হ'ন শান্ত, হ'ন স্পৃহাহীন
আত্মস্থ এ ধীর-গণ সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লভি
অবশেষে ব্রহ্মে হ'ন লীন ॥৫॥

বেদান্তের শ্রেষ্ঠজ্ঞান আত্মারে জেনেছেন যাঁরা
শুদ্ধচিত্ত যাঁহারা সন্ন্যাসী, যোগী যাঁরা সদা যত্নবান,
ব্রহ্মলোকে যান তাঁরা ইহ জীবনেই,
অন্তকালে ব্রহ্মেই মহা-মুক্তি পান ॥৬॥

পঞ্চদশ অবয়ব হয় লীন আদি কারণেতে
ইন্দ্রিয়ের দেবতারা মূল দেবতাতে হয় লয়
সব কর্ম সব রূপ, আত্মার বুদ্ধিতে প্রকাশ,
সর্বোত্তম ব্রহ্মমাঝে একীভূত হয় ॥৭॥

বহমান নদীগণ সমুদ্রেতে মিশি
হয় যথা নাম-রূপ-হীন
নাম রূপ-মুক্ত হয়ে বিদ্বানেরা সেইরূপে
ব্রহ্মে হ'ন লীন ॥৮॥

ব্রহ্মকে জানেন যিনি ব্রহ্মই হন তিনি
তাঁর কুলে হয় সবে ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান
শোক পাপ পরিহরি' মায়া-গ্রন্থি ছিন্ন করি
বিমুক্ত হইয়া তিনি অমরত্ব পান ॥৯॥

ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়েতে এই মন্ত্র হয়েছে কথিত ;
কর্মপরায়ণ যাঁরা ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদ-পরায়ণ
একর্ষি অগ্নিতে যাঁরা নিয়মিত করেন হবন
হ'য়ে শ্রদ্ধান্বিত
যথাবিধি শিরোব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে যাঁদের
ব্রহ্মবিদ্যা কহিবে তাঁদের ॥১০॥

এ সত্য অঙ্গিরা ঋষি পুরাকালে বলিয়াছিলেন ;
অব্রতচারীর এতে নাহি অধিকার,
যাঁহারা পরম ঋষি তাঁহাদের নমস্কার
তাঁহাদের নমস্কার ॥১১॥

সমাপ্ত

গ্রামে দুর্গোৎসব

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

৫০।৬০ বছর আগে বেশীর ভাগ লোকদের দুর্গোৎসব গ্রামের বাড়ীতেই হ'ত এবং সেই একমাত্র ও সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল গ্রামের।

গৃহিণীদের পতিপুত্র আসবেন কর্মস্থল থেকে হয়ত বৎসরান্তেই। সেকালে মেয়েরা প্রায়ই গ্রামে থাকতেন, শহরে বা কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার প্রথা কম ছিল। যাঁরা স্বামীর কাছে থাকতেন তাঁরাও ঐ উৎসব উপলক্ষ্যেই দেশে আসতেন। বৃহৎ পরিবারের সকলের জন্য ৺পূজায় নতুন কাপড়, নানা বিদেশী ও শহুরে জিনিস নিয়ে সে আসা। সে এক পরমোৎসবময় দিন ছোটদের ও বড়দেরও। কতদিন ভাইভাইয়ে, ভাইবোনে, ছেলেমেয়েতে দেখা হয় নি, মেয়েদের বাপের বাড়ী—শ্বশুরবাড়ী আসা হয় নি, দেখা হয়নি স্বজন-বন্ধুর সঙ্গে—সে এক মধুর আনন্দ।

সেদিনের গ্রামে প্রায়ই দু'চারখানি প্রতিমা পূজা হ'ত। ব্রাহ্মণ-ঘরে জমিদার-ঘরে বর্ধিষ্ণু পরিবারে সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমিক পূজা হ'ত। কেহই সে পূজা ছাড়তে বা বাদ দিতে চাইতেন না। কুল-ক্রমাগত সে পূজা কোন সরিক কেউ না পারলে অন্য পাঁচজনে পালা করে হোক, চাঁদা করে হোক পূজাটি সম্পন্ন করতেন। চার বছর পাঁচ বছর পরে পরে সে পূজার পালা আসত। প্রতি বছরেই যাঁর পালা তিনি পূজামণ্ডপটি মেরামত করে, পরিষ্কার করে মার আগমনীর ব্যবস্থা করতেন পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে। বারোয়ারী পূজাও দু'একবার হ'ত গ্রামে।

আজকাল এই পূজার সময় বাড়ী থাকার বা দেশে যাওয়ার আনন্দ আর তেমনভাবে নেই। পূজাও অনেকের (পূর্ববঙ্গের) দেশবিভাগের পরে বাদ পড়ে গেছে। অর্থাভাব চূড়ান্ত হয়েছে। মনোভাবও আগের দিনের মত প্রসারিত নেই। আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কের হিসাবের গণ্ডি নিতান্তই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। নানা বিপর্যয়ে—দুটি মহা-যুদ্ধ, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে মানুষ ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে আছে। যাঁরা দু'চার জন সেকেলে মনোভাবের আছেন তাঁরা দেশের পূজা কর্তব্য অনুসারে করে আসেন। বেশীর ভাগ লোকই দেশকে মনে রাখেন নি। নিজের বাড়ীর পূজা না হলেও—অবস্থাপন্ন হলেও দেশে আর লোকে যান না। কিছুদিন আগে তাঁরা যেতেন। তাছাড়া রেশন যুগের কৃপায় যজ্ঞের দিনে অন্নপ্রসাদ দেওয়াও দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রথাটাও উঠে গেছে। ক্রমশঃ তারপর এ ছাড়া—প্রায় পঁচিশ বছর হ'ল কলকাতায় দু'একটি সার্বজনীন দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়েছিল। তারপর এখন আর হিসাব নেই কতগুলি পূজা হয় আর কতরকমের প্রতিমা গড়া হয়! দেখতে দেখতে সমস্ত বাংলা দেশের দুর্গোৎসবের আনন্দের ক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠ্‌ল কলকাতাতেই যেন। সঙ্গে সঙ্গে আর 'বারোয়ারী' নামও রইল না। নাম হয়ে গেল সর্বজনীন বা সার্বজনীন! এবং পূজার উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপও একেবারেই আগের মত রইল না, অনেক বদলে গেল। তখন-কার দিনে সাধারণ সকলের দুর্গোৎসবের প্রধান আনন্দ ছিল প্রতিমা দেখা, নিষ্ঠাবান লোকের ছিল পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, সারাদিন কোনো না কোন পূজার কাজে লিপ্ত হওয়া—বাড়ীর পূজা হলে; না হলে গঙ্গাস্নান, উপবাস, অঞ্জলি, আরতিদর্শন এই সব ব্যাপারেই পূজার চারটি দিন কেটে যেতো। আর যাঁর ঘরে পূজা হ'ত তাঁদের আত্মীয়-স্বজন

অতিথি-অভ্যাগতদের ছাড়াও মধ্যে একদিন অবশ্যই কাঙালী ভোজন করানোর প্রথা ছিল। এখনো বড় বড় প্রাচীন পরিবারে—যেমন শোভাবাজার রাজবাটী ও অন্যান্য সম্পন্ন ঘরে এই প্রথা চলে আস্‌ছে। অনেকে কাঙালী ভিখারীকে নতুন কাপড়ও দিতেন।

এখন সর্বজনীন উৎসবে অতিথি-অভ্যাগত ও কাঙালীদের সে স্থানটুকু আছে কি না জানি না। বরং নতুন আর এক ধরন দেখা দিয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর—মন্ত্রী বা পদস্থ লোকদের নিয়ে পূজা-মণ্ডপদ্বার (পর্দা) উন্মোচন,—প্রধান অতিথি বরণ, (বোধনের আগেই) সভাপতির ভাষণ! অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক ধরনে মা-দুর্গার আগমন ও আগমনীকে বরণ। বোধনতলায় বেলগাছ—ঘট পূজা, বোধন করা সে সব বামুনপুরুতের 'নম নম' কাজ সারা। শহরের লোকের এতেও আনন্দ অবশ্য কম নয়, যিনি যেভাবে চান তিনি সেই ভাবেই পূজা দেখেন ও করেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ বনিতা সকলে ভিন্ন প্রদেশীয়েরাও এ উৎসবে যোগ দেন, এও এক নতুনত্ব। সর্বজনীন উৎসবের আগের দিনে সকল প্রদেশীয়রা এতে এত বেশী যোগ দিতেন না। কেননা বাড়ীর পূজা ও বারোয়ারী পূজা সীমা বদ্ধ ছিল।

এখন শহরের পূজার কথা যাক।

প্রায় অনেকেরই দেশের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হয়, অথচ ঘটনাচক্রে যাওয়া হয়ে ওঠে না, এমন অনেকের মত আমারও বার বার হয়েছে। প্রবাসে ছিলাম অনেকদিন, পালার বছরে এসে পড়িনি হয়ত নানাকারণে। একালে সেকালের গুরুজনরা অনেকেই নেই। ছোটরা যাঁরা আছেন, তাঁরাই পূজাটি বজায় রেখেছেন নিষ্ঠা-ভক্তিসহকারে। সরিকী পূজা পালা করে হয়, যাঁর যে বছর পালা পড়ে।

এবারে ১৩৭২ সালে সহসা সপ্তমীর দিন সকালে গিয়ে পড়লাম দেশের গ্রামে। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া সে গ্রাম। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের রথের জন্য প্রসিদ্ধ। একসময়ে স্বাস্থ্যকর বলেও প্রসিদ্ধ ছিল! বর্ধিষ্ণুও। গঙ্গার কূলে গ্রাম, ওপারে শান্তিপুর। সপ্তমীর দুপুরের আগে বিপর্যয়—বৃষ্টি হয়ে গেছে, কোনক্রমে তো পৌঁছলাম দেশে। যতই সম্পন্ন বর্ধিষ্ণু গ্রাম হোক পথঘাট একেবারে পৌরাণিকভাবে শাশ্বত! চিরকালের পথ। দুধারে বন, মাঝে রাস্তা, তার মাঝে খানাখন্দে জল থৈ থৈ। গরুর গাড়ীর চাকার মোটা দাগ বাঁচিয়ে, জল কাদা খানা বাঁচিয়ে সাইকেল রিকশা চলতে লাগল, কখনো নেমে হাতে চালিয়ে, কখনো চড়ে পায়ে চালিয়ে।

বাড়ী পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ী, মস্ত সিংদরজা। ভিতরে ঢুকলেই প্রকাণ্ড উঠানের পূর্বদিকে পূজার দালানে প্রতিমা দর্শন হয়। দালানের পাশে নৈবেদ্যর কোঠা, গৃহদেবতা নারায়ণের ঘর। উঠানের চারদিকে সরু দালান ও তার কোলে ঘর ছোট বড়—ভাঁড়ারের ভিয়ানের ও অন্যান্য পূজার কাজের। বিশাল প্রাঙ্গণে রাত্রে যাঁরা নিজের পালায় যাত্রা গান, থিয়েটার পালা দেন তার প্রসর জায়গা হয়। গ্রামের লোক রবাহূত অনাহূত আসেন। প্রতিমা দেখেন, পূজা দেখেন, যাত্রা শোনেন—যদি হয়, না হয় তো আবার অন্ধকার বনপথে টর্চ বা হেরিকেনটি হাতে করে ফিরে যান চিরাচরিত অভ্যাসে। গ্রামে আলো নিয়ে বেরুনোই নিয়ম। পথে জমা জল আছে মাঝখানে, পাশে যদি যান বনের দিকে ব্যাঙ আছে, হয়ত সাপ আছে, মনে রাখতে হবে। শহরের লোকের মনে বেশী ভয়,—গ্রামের লোকের অত ভয় নেই। তারা একটু-আধটু অন্ধকারে হাততালি দিয়ে চলে যেতে পারে।

এবারে আমার শ্বশুরদের অন্য সরিকের পূজা ছিল। যে ক'জন আপনার লোক তাঁদের ছিলেন, প্রায় সকলে জড় হয়েছেন, সে ছাড়াও আমরা

গ্রামে দুর্গোৎসব

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

৫০।৬০ বছর আগে বেশীর ভাগ লোকদের দুর্গোৎসব গ্রামের বাড়ীতেই হ'ত এবং সেই একমাত্র ও সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল গ্রামের।

গৃহিণীদের পতিপুত্র আসবেন কর্মস্থল থেকে হয়ত বৎসরান্তেই। সেকালে মেয়েরা প্রায়ই গ্রামে থাকতেন, শহরে বা কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার প্রথা কম ছিল। যাঁরা স্বামীর কাছে থাকতেন তাঁরাও ঐ উৎসব উপলক্ষ্যেই দেশে আসতেন। বৃহৎ পরিবারের সকলের জন্য ৺পূজার নতুন কাপড়, নানা বিদেশী ও শহুরে জিনিস নিয়ে সে আসা। সে এক পরমোৎসবময় দিন ছোটদের ও বড়দেরও। কতদিন ভাইভাইয়ে, ভাইবোনে, ছেলেমেয়েতে দেখা হয় নি, মেয়েদের বাপের বাড়ী—শ্বশুরবাড়ী আসা হয় নি, দেখা হয়নি স্বজন-বন্ধুর সঙ্গে—সে এক মধুর আনন্দ।

সেদিনের গ্রামে প্রায়ই দু'চারখানি প্রতিমা পূজা হ'ত। ব্রাহ্মণ-ঘরে জমিদার-ঘরে বর্ধিষ্ণু পরিবারে সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমিক পূজা হ'ত। কেহই সে পূজা ছাড়তে বা বাদ দিতে চাইতেন না। কুল-ক্রমাগত সে পূজা কোন সরিক কেউ না পারলে অন্য পাঁচজনে পালা করে হোক, চাঁদা করে হোক পূজাটি সম্পন্ন করতেন। চার বছর পাঁচ বছর পরে পরে সে পূজার পালা আসত। প্রতি বছরেই যাঁর পালা তিনি পূজামণ্ডপটি মেরামত করে, পরিষ্কার করে মার আগমনীর ব্যবস্থা করতেন পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে। বারোয়ারী পূজাও দু'একবার হ'ত গ্রামে।

আজকাল এই পূজার সময় বাড়ী থাকার বা দেশে যাওয়ার আনন্দ আর তেমনভাবে নেই। পূজাও অনেকের (পূর্ববঙ্গের) দেশবিভাগের পরে বাদ পড়ে গেছে। অর্থাভাব চূড়ান্ত হয়েছে। মনোভাবও আগের দিনের মত প্রসারিত নেই। আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কের হিসাবের গণ্ডি নিতান্তই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। নানা বিপর্যয়ে—দুটি মহাযুদ্ধ, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে মানুষ ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে আছে। যাঁরা দু'চার জন সেকেলে মনোভাবের আছেন তাঁরা দেশের পূজা কর্তব্য অনুসারে করে আসেন। বেশীর ভাগ লোকই দেশকে মনে রাখেন নি। নিজের বাড়ীর পূজা না হলেও—অবস্থাপন্ন হলেও দেশে আর লোকে যান না। কিছুদিন আগে তাঁরা যেতেন। তাছাড়া রেশন যুগের কৃপায় যজ্ঞের দিনে অন্নপ্রসাদ দেওয়াও দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রথাটাও উঠে গেছে। ক্রমশঃ তারপর এ ছাড়া—প্রায় পঁচিশ বছর হ'ল কলকাতায় দু'একটি সার্বজনীন দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়েছিল। তারপর এখন আর হিসাব নেই কতগুলি পূজা হয় আর কতরকমের প্রতিমা গড়া হয়! দেখতে দেখতে সমস্ত বাংলা দেশের দুর্গোৎসবের আনন্দের ক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল কলকাতাতেই যেন। সঙ্গে সঙ্গে আর 'বারোয়ারী' নামও রইল না। নাম হয়ে গেল সর্বজনীন বা সার্বজনীন! এবং পূজার উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপও একেবারেই আগের মত রইল না, অনেক বদলে গেল। তখনকার দিনে সাধারণ সকলের দুর্গোৎসবের প্রধান আনন্দ ছিল প্রতিমা দেখা, নিষ্ঠাবান লোকের ছিল পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, সারাদিন কোনো না কোন পূজার কাজে লিপ্ত হওয়া—বাড়ীর পূজা হলে; না হলে গঙ্গাস্নান, উপবাস, অঞ্জলি, আরতিদর্শন এই সব ব্যাপারেই পূজার চারটি দিন কেটে যেতো। আর যাঁর ঘরে পূজা হ'ত তাঁদের আত্মীয়-স্বজন

অতিথি-অভ্যাগতদের ছাড়াও মধ্যে একদিন অবশ্যই কাঙালী ভোজন করানোর প্রথা ছিল। এখনো বড় বড় প্রাচীন পরিবারে—যেমন শোভাবাজার রাজবাটী ও অন্যান্য সম্পন্ন ঘরে এই প্রথা চলে আসছে। অনেকে কাঙালী ভিখারীকে নতুন কাপড়ও দিতেন।

এখন সর্বজনীন উৎসবে অতিথি-অভ্যাগত ও কাঙালীদের সে স্থানটুকু আছে কি না জানি না। বরং নতুন আর এক ধরন দেখা দিয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর—মন্ত্রী বা পদস্থ লোকদের নিয়ে পূজা-মণ্ডপদ্বার (পর্দা) উন্মোচন,—প্রধান অতিথি বরণ, (বোধনের আগেই) সভাপতির ভাষণ! অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক ধরনে মা-দুর্গার আগমন ও আগমনীকে বরণ। বোধনতলায় বেলগাছ—ঘট পূজা, বোধন করা সে সব বামুনপুরুতের 'নম নম' কাজ সারা। শহরের লোকের এতেও আনন্দ অবশ্য কম নয়, যিনি যেভাবে চান তিনি সেই ভাবেই পূজা দেখেন ও করেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ বনিতা সকলে ভিন্ন প্রদেশীয়েরাও এ উৎসবে যোগ দেন, এও এক নতুনত্ব। সর্বজনীন উৎসবের আগের দিনে সকল প্রদেশীয়রা এতে এত বেশী যোগ দিতেন না। কেননা বাড়ীর পূজা ও বারোয়ারী পূজা সীমা বদ্ধ ছিল।

এখন শহরের পূজার কথা যাক।

প্রায় অনেকেরই দেশের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হয়, অথচ ঘটনাচক্রে যাওয়া হয়ে ওঠে না, এমন অনেকের মত আমারও বার বার হয়েছে। প্রবাসে ছিলাম অনেকদিন, পালার বছরে এসে পড়িনি হয়ত নানাকারণে। একালে সেকালের গুরুজনরা অনেকেই নেই। ছোটরা যাঁরা আছেন, তাঁরাই পূজাটি বজায় রেখেছেন নিষ্ঠা-ভক্তিসহকারে। সরিকী পূজা পালা করে হয়, যাঁর যে বছর পালা পড়ে।

এবারে ১৩৬২ সালে সহসা সপ্তমীর দিন সকালে গিয়ে পড়লাম দেশের গ্রামে। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া সে গ্রাম। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের রথের জন্য প্রসিদ্ধ। একসময়ে স্বাস্থ্যকর বলেও প্রসিদ্ধ ছিল! বর্ধিষ্ণুও। গঙ্গার কূলে গ্রাম, ওপারে শান্তিপুর। সপ্তমীর দুপুরের আগে বিপর্যয়—বৃষ্টি হয়ে গেছে, কোনক্রমে তো পৌঁছলাম দেশে। যতই সম্পন্ন বর্ধিষ্ণু গ্রাম হোক পথঘাট একেবারে পৌরাণিকভাবে শাশ্বত! চিরকালের পথ। দুধারে বন, মাঝে রাস্তা, তার মাঝে খানাখন্দে জল থৈ থৈ। গরুর গাড়ীর চাকার মোটা দাগ বাঁচিয়ে, জল কাদা খানা বাঁচিয়ে সাইকেল রিকশা চলতে লাগল, কখনো নেমে হাতে চালিয়ে, কখনো চড়ে পায়ে চালিয়ে।

বাড়ী পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ী, মস্ত সিংদরজা। ভিতরে ঢুকলেই প্রকাণ্ড উঠানের পূর্ব-দিকে পূজার দালানে প্রতিমা দর্শন হয়। দালানের পাশে নৈবেদ্যর কোঠা, গৃহদেবতা নারায়ণের ঘর। উঠানের চারদিকে সরু দালান ও তার কোলে ঘর ছোট বড়—ভাঁড়ারের ভিয়ানের ও অন্যান্য পূজার কাজের। বিশাল প্রাঙ্গণে রাত্রে যাঁরা নিজের পালায় যাত্রা গান, থিয়েটার পালা দেন তার প্রসর জায়গা হয়। গ্রামের লোক রবাহূত অনাহূত আসেন। প্রতিমা দেখেন, পূজা দেখেন, যাত্রা শোনেন—যদি হয়, না হয় তো আবার অন্ধকার বনপথে টর্চ বা হেরিকেনটি হাতে করে ফিরে যান চিরাচরিত অভ্যাসে। গ্রামে আলো নিয়ে বেরুনোই নিয়ম। পথে জমা জল আছে মাঝখানে, পাশে যদি যান বনের দিকে ব্যাঙ আছে, হয়ত সাপ আছে, মনে রাখতে হবে। শহরের লোকের মনে বেশী ভয়,—গ্রামের লোকের অত ভয় নেই। তারা একটু-আধটু অন্ধকারে হাততালি দিয়ে চলে যেতে পারে।

এবারে আমার শ্বশুরদের অন্য সরিকের পূজা ছিল। যে ক'জন আপনার লোক তাঁদের ছিলেন, প্রায় সকলে জড় হয়েছেন, সে ছাড়াও আমরা

এলাম। বড়দের বৃদ্ধদের চিনলাম নতুন লোকদের বৌ, জামাই, ছেলেমেয়েদের চিনতে দেরি হ'ল।

আরতির একটু আগে মণ্ডপে গিয়ে দাঁড়ালাম সম্পর্কীয় ও খুড়তাত দেবর ননদ জা সব একসঙ্গে। কুলের পূজা, বাড়ীর পূজা, সকলের মধ্যেই যেমন আনন্দ, তেমনি মমত্ববোধ। মনে হয়ে যায় সকলেই স্বজন আপনার লোক, এক বাড়ীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অথচ হয়ত কলকাতায় দশ বছরেও দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। সকলের সঙ্গেই বৌমা, বৌদি, খুড়িমা, জ্যেঠিমা, ঠাকুমা বলে চেনা পরিচয় হচ্ছে, এক বৃহৎ সংসারের মত।

আরতি শেষ হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল। সকলে পূজার দালানে খানিকটা বসা হ'ল। ঘোমটার যুগ আর গ্রামেও নেই ত্রিশ বছর আগের মত। খুড়শ্বশুররা পিসশ্বশুররা সকলে একদিকে বসলেন, মেয়েরা, বৌরা শাশুড়ীরা অন্যদিকে বসলেন দালানে। যাঁরা আরতি দেখে চলে যাবার চলে গেলেন, যাঁরা বাড়ীর লোক তাঁরা মা দুর্গার সামনে সরল আনন্দে বসে রইলেন কি যেন একটা অনুভূতি নিয়ে। অন্যদিকে ভোগের ঘর থেকে চারখানি করে লুচি আর নারিকেল নাড়ু সমস্ত আগন্তুক ইতরভদ্র সকলকে দেওয়া হ'তে লাগল, ৺মায়ের প্রসাদ—মহামায়ার প্রসাদ।

সহসা গান ধরলেন গুরুবংশের এক ভট্টাচার্য মহাশয় 'শ্যামাসঙ্গীত'। পুরানোকালের সঙ্গীত। গানটি,—'জাননা'রে মন, পরম কারণ, শ্যামা মা

শুধুই রমণী নয়,

মেঘেরি বরণ করিয়া ধারণ কখনো

কখনো পুরুষ হয়।'

কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতও হ'ল—একেবারে সেকালের,

'তুমি একজন হৃদয়েরি ধন

সকলে আমার বলে সঁপে তোমায় প্রাণমন

কারো পিতা কারো মাতা কারো সখা সুহৃদ হও

ভাবে ডুবে যে যা বলে তাতেই তুমি তুষ্ট রও।'…

গুপ্তিপাড়ানিবাসী পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামীর রচিত গানও গাইলেন। খুড়শ্বশুররা তাঁর জন্মস্থানে একটি হরিমন্দির করেছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেনশাস্ত্রী মহাশয়—আর খুড়শ্বশুররা কিছু ধর্মকথা আলোচনাও করলেন। রাত্রি হবার ভয় নেই। পূজার সময়ে গ্রামে রাত্রি অনেক হলেও কিছু আসে যায় না। লোকের মনে তাড়া নেই। কলকাতার মত সকল পাড়ার সব ঠাকুর দেখা হ'ল না! প্রতিমা প্রতিযোগিতায় কোন্ কোন্ প্রতিমা প্রথমা হয়েছেন, কম বেশী ভালো এসব ভাবনা আলোচনাও নেই। এখানে মা দুর্গাকে মাতৃরূপেই—জনন্মাতা-রূপেই দেখা হয়। জননী বা মা কেমন সাজলেন, কেমন গহনা অলঙ্কার পরলেন, দেখে যেমন শিশু মাকে সুন্দর দেখে না, মাকে মা বলেই সুন্দর দেখে, যেমন জননী হোক। গ্রামের চিরকালের প্রথানুসারে গড়া প্রতিমাকে 'একমেটে', 'দোমেটে' থেকে মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রতিমা রচনা করে পঞ্চমীর রাত্রে 'চক্ষু দান' অবধি সমান আনন্দে গ্রামবৃদ্ধ গ্রামশিশুরা ঘিরে থাকেন।

ষষ্ঠীর দিন বোধন, তারপর তিন দিন পূজা—এই মহোৎসব। রূপ বা গান-বাজনা, অতিথি, অভ্যাগত, 'মাইক' সভাপতি, প্রধান অতিথির প্রশ্ন নেই। সেখানে মা দুর্গাই সব পরমা প্রধানা ঈশ্বরী মূর্তিতে বিরাজ করছেন। "সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি-সমন্বিতে"—সর্বভয়ত্রাণকারিণী, সর্ব আর্তি দূরকারিণী সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা সর্বার্থসাধিকা শরণ্যা ত্রিনয়নী গৌরী নারায়ণীকেই সব নমস্কার সব প্রণাম করে সকলে কৃতার্থ হ'ন। ক্ষণকালের জন্যও যেন শরণ গ্রহণ করেন।

তারপর অষ্টমী নবমীতে সকলে মায়ের প্রসাদ পেলাম। আর সন্ধ্যারতির পর সেই নানাবিধ গান ও কিছু আলোচনা।

বাড়ীতে এসেও শুনলাম দেবর গাইলেন,—

'এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবরঙ্গ মঞ্চ মাঝে

কি খেলা খেলিছ মাগো সাজায়ে কতনা সাজে!···

গানটি শুনলাম নীলকণ্ঠের গান। নীলকণ্ঠ, কমলা-কান্ত, রামপ্রসাদ, দাশরথি রায় এখনো গ্রামের জনসাধারণের কণ্ঠে ও সুরে বেঁচে আছেন। নতুন গান লোকে গায় শেখে, কিন্তু জীবনের দিবা অবসান হ'লে তাদের মনে পড়ে যায় 'কি কর বসিয়া মন'! তখন মনে পড়ে যায় নানা সাধকের রচিত নানা সঙ্গীত। কবে শুনেছিল যা গুরুজনের গুন গুন গানে। অথবা মেঠোসুরে চাষার গলায় কিংবা বাউল, ভিখারী, সাধু-সজ্জনের কণ্ঠে, সেই কথা সেই সুর মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে 'সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙিবে না ···।'

এসে পড়ল, বিজয়া দশমী।

সকালে পুরোহিত ৺মাকে বরণ ও দর্পণ বিসর্জন করে দধি-করমা করে বিজয়াদশমীকৃত্য করে চলে গেলেন। বিকালে মেয়েরা নানা সাজে সেজে মাকে বরণ করে পান মিষ্টি মুখে দিয়ে সিঁদুর পরিয়ে আঁচলে চরণ মুছিয়ে মায়ের কানের কাছে বললেন, 'আবার এসো মা, আবার এসো।'

পুরোহিত সিন্দূরের অক্ষরে নৈবেদ্য ও লক্ষ্মীর ঘরের দুয়ারের মাথায় লিখে গেছেন, "সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ"। গৃহিণীরা মেয়েরা ম্লান সম্ভ্রমে বার বার বলতে লাগলেন, 'আবার এসো মা, আবার এসো।' সকলের পতি পুত্র পিতা ভাল থাকবেন সকলকে নিয়ে আবার যেন পূজামণ্ডপে এসে পূজা করেন।

এখন শহরে বিজয়ার বরণ উৎসবকে বলা হয় সিঁদুর খেলা। শহরে একটি সরস্বতী পূজার ভাসানের একটি দিনের কথা বলি, বোঝা যাবে মানুষ কত লঘু ভাবে পূজা সম্বন্ধে কথা বলে। প্রতিমা তুলে নেওয়ার জন্য মুটে ডেকে এনেছে ছেলেরা এক জায়গায়। মুটেরা প্রতিমা বেদী থেকে নামাচ্ছে একজন ছেলে বললে এই 'জানানা হায় সামলে উতারো।'

এখন এখানকার কথাই বলি, প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হল। এই সময়ে বেশ মজা হয় একটা গঙ্গা সম্বন্ধে। গুপ্তিপাড়ায় গঙ্গা অনেক দূরে সরে গেছেন। ভাদ্র আশ্বিন মাসে একটি বাঁওড় বা খাল পথে মা গঙ্গা গ্রামের খুব কাছে এসে পড়েন। এইখানেই প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার পর সিদ্ধি ও মিষ্টি মুখে দেওয়ার, প্রণাম আলিঙ্গন করার প্রথা সর্বত্রই বাঙালীরা পালন করেন, প্রথমে নিজের বাড়ীতে তারপর স্বজনবন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে।

এখানে একটি চমৎকার পুরাতন প্রথা পালন করতে দেখলাম। কেননা আগে তো কখনো আমাদের সময়ে সকল মেয়েদের পূজার দালানে এসে বসা দেখিনি। হয়ত বর্ষীয়সীরা আসতেন।

দেখলাম, রাশিকৃত কলা পাতার চিল্‌তে কেটে রাখা হয়েছে, দু' একটি ছোট খুরিতে ঘন করে আলতা গুলে রাখা হয়েছে; আর অনেকগুলি মোটা খড়কে কিংবা শক্ত কোনো কাঠি জড় করা রয়েছে তার পাশে। সকলে সেখানে এসে বসেছেন। তারপর শূন্য পূজার দালানে মণ্ডপের সামনে বসে কলাপাতার চিল্‌তের উপর আলতাতে খড়কে ডুবিয়ে 'দুর্গা' নাম লিখতে লাগলেন। যাঁরা লিখতে পারেন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই লিখলেন, একবার—পাঁচবার যে যতবার ইচ্ছা। ভারি গভীর ও সুন্দর তাৎপর্যময় ভাবটি। মা চলে গেছেন নামটি মনে রাখার ঐকান্তিক মধুর আকাঙ্ক্ষা যেন দালান ভরে রয়েছে। সকলে অপেক্ষা করছেন লেখার জন্যে।

তারপর বেদীতে প্রণাম, গুরুজনদের প্রণাম করে সিদ্ধি মিষ্টি মুখে দিয়ে বিজয়া দশমী কৃত্য শেষ হ'ল। যেন সকলেরই মনে হ'ল নিরাপদে পরমানন্দে পূজা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সকলে ভাল আছে। কোনো বিপদ সঙ্কট ঘটে নি, বাধা বিপত্তি হয়নি।

আর মনে রইল জেগে, "সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।" হে জননী, হে জগন্মাতা, আবার এসো।

এখন একটি পুরাতন ঘটনা বলে কথা শেষ করি। সেকালের পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা, সেকালের গুরুজন ও কর্তৃপক্ষের কাহিনী।

যে-সেকাল অনেক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে!

সেবারো বাড়ীতে দুর্গোৎসব। ১৩২৮ সাল।

তখন বয়স কম আর আরো আগের কাল। বাইরের দিকে আসি না, সব শ্বশুর ভাসুর আছেন। ভিতর দিকে ভাঁড়ার ঘর রান্নার দেখা শোনাই করি। বিরাট আয়োজন, স্বজন আত্মীয় তো আছেনই প্রতিদিন অভ্যাগত অতিথি আর গ্রামবাসী ও বহু লোকজনের আহারের আয়োজন হ'ত। বেলা চারটা অবধি 'নগদী' পাইক, জমিদারের কর্মচারী শ্রেণীর লোক আসতো, খেয়ে যেতো। ব্রাহ্মণরা রান্না কোরে চলে গেলে আমি যারা দেরি করে আসতো, বলে যেতো তাদের খাবারটা রাখতাম এসে নিয়ে যেতো কিংবা খেয়ে যেতো।

এ ছাড়া রান্নাঘরের জল ভরানো, বাসন ডোবানো, বিকালের রান্নার যোগাড়, ভাঁড়ার দেওয়া, অনেকটা কাজের ভারই থাকত।

পূজার ষষ্ঠীর দিন। একজন ভাসুর এসে বলে গেলেন, গয়লাপাড়ার লোকেরা জল দিতে আসবে, আপনি বৌমা সব ভরিয়ে রাখবেন।

ইতিমধ্যে দেখি, যেখান দিয়ে তারা জল ভরতে যাবে ভাঁড়ারের জলের জালা, রান্নাঘরের জলের চৌবাচ্চা,--সেই পথটি মাছের আঁশ, আর শিশুদের নোংরায় ভারি অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বিকাল হয়ে গেছে—নগদীদের দু'একজনের ভাতও পড়ে আছে—রান্নাঘরে তখনো যেতে পারে নি।

এমন সময়ে চারজন ঝি যারা কাজ করে তারা এলো। ছোট পাটের কুয়ো উঠানে, সেখানে তারা বেশ নিশ্চিন্তভাবে হাত পা মেলে দাঁড়াল।

আমি তাদের বললাম, তোমরা অন্য কাজ করার আগে এই পথটি ধুয়ে দাও। নইলে রান্না ঘরে জল ভরার সুবিধে হবে না।

একবার, দু'বার, তিনবার বলার পরও তারা নির্বিকার। একটু বিরক্তভাবে বললুম, 'তোমাদের কানে কি কথা পৌছায় না? এখুনি ঐ সব অপরিষ্কার মাড়িয়ে তারা জল ভরতে ঢুকবে। তাড়াতাড়ি এসো।'

এবারে অকস্মাৎ তাদের একজন গালে হাত দিয়ে অভিনেত্রীর মত দাঁড়াল। তারপর বললে, 'তুমি কেনে বক্‌তে লেগেছ গা? যেনারা মনিব—তেনারা তো কিছু করতে বলছে না!'

আমি আশ্চর্য আর বিরক্ত হয়ে বললাম, তার মানে? তোমাদের রাখা হয়েছে কাজ করবার জন্যে—কে মনিব, কে হুকুম দিচ্ছে সে কথায় তোমাদের কি দরকার। যা বলছি করে নাও।'

তারা নিজেদের মধ্যেও আমাকে উদ্দেশ করে বলাবলি করতে লাগল, 'কেনে? কেনে করব গা? আপুনি কেনে বলবে? তুমি কেনে বলবে?'

এগিয়েও এলো না, কাজ করলে না এবং খুব কথা বলতে লাগল। আমি যেমন অপমানিত বোধ করলুম, তেমনি রাগে আবার চোখে জল এলো। কিন্তু আর কিছুই বলতে প্রবৃত্তি হ'ল না ঐ শ্রেণীর মেয়েদের।

ইতিমধ্যে গয়লাপাড়ার জলের ভারীদের নিয়ে একজন নগদী এলো। আর আমার শাশুড়ীও আমাকে খুঁজতে এলেন, বিকালে ঘাটে যাব কিনা জানতে।

তখনো ঝিয়েরা কোনকাজে হাত দেয় নি। নিজেদের মধ্যে অবজ্ঞা করে কথা বলাবলি উপহাস করছে। শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করতে এসে আমার মুখ দেখে বোধ হয় কিছু বুঝতে পারলেন। 'নগদী'ও

আমার কাছেই ভাত নেয়, সেও এসে দাঁড়াল। 'বৌমা আমার ভাত?' তারপর ঝিদের মুখর কথাবার্তা আর আমাদের শাশুড়ীবৌয়ের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে জিজ্ঞাসা করলে 'কি হয়েছে, ওরা চেঁচাচ্ছে কেন? '

শাশুড়ী আমার কাছে শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাঁর পুত্রহীনতার অসহায়তার অবস্থা তাঁকেও মর্মাহত করেছিল। তিনি শুধু বললেন, 'ওরা বৌমার কথা শুনছে না। জবাব করছে।'

নগদী রেগে গেল বললে, অ্যাঁ তোরা বৌমার কথা শুনছিস্ না—কি ভেবেছিস্? জানিস্ না সেজবাবুর বৌমা উনি?'

তারা বিপুল উৎসাহে তার সঙ্গেও বচসা আরম্ভ করল। 'কেনে শুনব? শুনব নি।'

এবারে নগদী বিনাবাক্যে যে ঝিটি গোলমাল করছিল তার ঘাড় ধরে খিড়কী দরজার পথে বার করে দিল।

তারপর নিশ্চিন্তমনে তার রাশিকৃত ভাত, ডাল, চচ্চড়ী, মাছ অম্ল নিয়ে পরম পরিতোষে খেতে বসল।

পূজাবোধন ষষ্ঠীর সন্ধ্যা বড় খারাপ কাটল। অকারণে অপমানকর কথা শুনেও বটে আর ঐ ঝিটাকে বার করে দেওয়াও ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না বছরকার দিনে। অথচ বুঝছিলাম নগদী ঠিক কাজই করেছে।

পরদিন সকালে ভাঁড়ারে আছি। সহসা এক খুড়শাশুরী ডাকলেন বললেন, 'বৌমা, একবার বাহিরে এসো'।

উঠে এলাম।

বললেন, 'কালকে মন্দা ঝিকে ভুবন নগদী বার করে দিয়েছে তোমার কথা শোনেনি বলে, তোমার ভাসুররা শুনেছেন। সে তো পূজা বাড়ীতে আর ঢুকতে পারছে না। বাবুদের কাছে কান্নাকাটি করছে। তা তাঁরা বলে পাঠিয়েছেন, যদি বৌমা মত দেন তো ভেতরে ঢুকবে, কাজ করবে। না হলে ভেতরে আসতে পাবে না। তুমি কি বল?'

আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'লাম। বললাম, 'সে কি কথা শ্বশুর ভাসুররা যা ঠিক করবেন তাই হবে, আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছেন?'

খুড়শাশুড়ী বললেন, 'না, না, ও বড় অপমান করে কথা কয়েছে তোমার সঙ্গে, ছেলেরা সব শুনেছে, তুমি রাখলে তবে ওরা রাখবে।'

আমি বললাম, 'বছরকার দিন, আপনি ওকে রাখতে বলুন, কেন গরীব মানুষের 'রোজ' আর খাওয়া আনন্দ মাটী হবে। আবার ভাসুরেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, এতেই আমার লজ্জা হচ্ছে।'

কিন্তু সেখানকার পূজাবাড়ীতে গুরুজনদের এই পরিবারের ছোট বড় সকলের সম্মানের প্রতি লক্ষ্যটুকু—বড় ভাল লেগেছিল। না লক্ষ্য করলে হয়ত ঐ ক্ষুব্ধ ভাবটুকু মনে কাঁটার মত ফুটে থাকত। এই ব্যবহার ও জিজ্ঞাসাটা আমার আর পুত্রহীন আমার শাশুড়ী শ্বশুরের মনে ক্ষোভ রাখল না।

এই প্রসঙ্গে আমার এক আত্মীয়া পরে বলেছিলেন, 'জানিস্, সোনার চুড়ী আর শাড়ীর অনেক খাতির……! ঝি চাকররা ঐটে দেখেই মান্য করে বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ে!'

একটু হাসলাম। সোনার চুড়ী আর শাড়ীর গৌরবের দিন আর তখন আমার ছিল না কিন্তু গুরুজনরা আমায় বাড়ীর বধূত্বের সম্মান দিয়েছিলেন।

আসে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সাধক জগন্মঙ্গলব্রতী, ভাবুক শিল্পিদল,
স্বপ্নে ও ধ্যানে গড়ে যে নূতন ভাবের ভূমণ্ডল,
সমুজ্জ্বল সে ভুবনই যে আসে জীর্ণ জগৎপর—
করিতে তাহারে শুচি সুন্দর এবং মহত্তর।
মহামানবেরা আজি যা ভাবেন, কাল তো তাহাই হয়।
ভাব যে জমিয়া বস্তু হইতে সময় একটু লয়।
বাল্মীকির সে রামই আসেন—করুণার নাহি সীমা,—
মেশে সত্যের অরুণ আলোকে স্বপ্নের পূর্ণিমা।

২

মনুষ্যত্বে উচ্চ করিতে গুহা-মানবের স্তর—
দেশ ও জাতির ধ্যানীর লেগেছে বহু বহু বৎসর।
সূর্য গিয়াছে ক্ষয়ে কতখানি—কমেছে তাহার জ্যোতি—
গড়িতে একটি অমিতাভ—শুধু একটি জগজ্জ্যোতি।
গরুড়ের দৃঢ় স্থির আকাঙ্ক্ষা লইয়া অহিংসাকে
গড়েছে একটি অপাপবিদ্ধ গান্ধী মহাত্মাকে।
করেছে কঠোর কত তপস্যা মধু পূর্ণিমা রাত?
কত শরতের পদ্মের ধ্যানে—এলো রবীন্দ্রনাথ?

৩

পিপীলিকা তোলে বল্মীক—তাহা অদ্ভুত কিছু নয়,
ক্ষুদ্র সে—তার স্বপ্ন যে গড়ে সুবিশাল হিমালয়।
টুনটুনি-ক্রোধ অগস্ত্য হয়ে সাগর শোষণ করে,
মন যে তাহার দর্পহারীর,—দর্পীরে নাহি ডরে।
মৃত্যু জানে না পাপও ফিরে আসে দেখি মাথা হয় হেট।
করে নিষ্পাপ যীশুর বিচার এখনো যে 'পাইলেট'।
প্রতিহিংসার কিছুই কমে না; কমে না তাহার জ্বালা
'সপ্তরথা'র ব্যূহ রচে আজও, রচে নব কারবালা।

৪

ত্যাগীর ধ্যানেতে দধীচি গঠিত—তপস্যা ধরণীর—
পেয়েছে ভীষ্ম সম সংযমী—অর্জুন সম বীর।
হতেছে সমাজ সুসভ্যতর—সূক্ষ্ম চিত্রকলা,—
ছড়া দোঁহা ভাঙি বাহিরিয়া আসে কবির শকুন্তলা।
কবির স্বপ্ন আজও পাতে নব সাম্রাজ্যের ভিত,—
জীবকে করিছে উন্নততর—তাহাদের সঙ্গীত।
ছোট চাতকের কাকুতিতে ভাঙে সুর-সরিতের বাঁধ।
চকোরের ডাকে আগায়ে আসিছে যুগ যুগ ধরে চাঁদ।

৫

সৃষ্টিকে করে শ্রেষ্ঠতর যে স্থির সংকল্পই,
উৎকর্ষ তো লভে না ভুবন—ওই উপাদান বই।
তিলোত্তমারে গড়িয়া তুলিছে রসিক শিল্পী মন
ভাবই রূপের পরিমণ্ডল বাড়ায় অনুক্ষণ।
ফুরায় বন্ধ্যা শতাব্দী কত, নির্মম বর্ষ,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে বিরাট আদর্শ।
অশোকের সাধ, ইচ্ছাশক্তি কালে যায় নাই ক্ষয়ে।
নব কলেবরে আবার আসিছে—বিপুল শক্তি লয়ে।

৬

কৃচ্ছ্র সাধনা করিতে হয়েছে জাতির গৃহশ্রীকে,—
ধরায় আনিতে দেবী ও মানবী সীতা ও সাবিত্রীকে।
মাতৃস্নেহ সাত সাগরেতে ঢেলেছে তাহার গা,
নরনারায়ণে সন্তান পেতে—হ'তে গোপালের মা।
বসুধাকে দিতে নূতন মহিমা নূতন লাবণ্য,
ধরি নর-তনু প্রেম আসে—আসে অবিনাশী পুণ্য।
যিনি সৎ চিৎ পরমানন্দ—নাহি পরিবর্তন—
বহু বহু রূপে ভাবগ্রাহী সে আসেন জনার্দন।

ধর্ম

স্বামী বিরজানন্দ

(পূর্বে অপ্রকাশিত মূল প্রবন্ধ*)

মনুষ্যজীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সকলেই নিজ নিজ অভাবমোচনের জন্য যারপর নাই যত্নবান। আমরা পানাহার করি ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য, কাজকর্ম করি গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট দূর করিবার জন্য, গৃহাদি নির্মাণ করি শীতাতপ নিবারণের জন্য, দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় করি অর্থাভাব পূরণের জন্য; এমনকি বর্তমানে বিশেষ অভাব না থাকিলেও ভাবী অভাব উপস্থিত হইবার ভয়ে বিপুল অর্থ-সঞ্চয়ও করিয়া রাখি। যেসকল অভাব পূরণ না করিলে দেহযাত্রা নির্বাহ সুকঠিন হইয়া পড়ে কেবল যে সেইগুলির জন্যই আমরা চেষ্টাশীল তাহা নহে; গীতা বলিয়াছেন,—"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্"—যাঁহাদের বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে তাঁহাদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট এবং অগণ্য দিকে ধাবিত হয়। তাঁহারা কিসে ধন হইবে, কিসে মান হইবে, কিসে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবেন, কি ভাবে জনসমাজে উচ্চপদ লাভ করিয়া সকলের গণ্যমান্য হইবেন তজ্জন্য সদা চিন্তাশীল, সদা ব্যস্ত। এমন কোন কষ্ট নাই যাহা তাঁহারা অম্লান বদনে স্বীকার না করেন, যাহার জন্য তাঁহারা প্রাণ পর্যন্ত পণ রাখিয়া তদনুরূপ কার্য না করেন। তাঁহারা মনের সাধে যেরূপ ইচ্ছা করুন তাহাতে আমাদের কটাক্ষ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই কিন্তু তাঁহাদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। তাঁহারা কি মনের সমস্ত কল্পনা অনুযায়ী ফল উপভোগ করিয়া সম্পূর্ণ সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি এই সকল তৃষ্ণা ব্যতীত অন্য কোন অভিনব তৃষ্ণা হৃদয়ে অনুভব করেন না? নিশ্চয়ই করেন, তাহা না করিলে তাঁহাদের তো ভোগ্য বস্তুর অভাব নাই, অন্য কোন অভাবেরও তাড়না নাই, তথাপি হৃদয় স্ফূর্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন দেখিতে পাই কেন? আঁধার রাত্রির বিজলির মত অধরে কখনও হাসি ফুটিতেছে কিন্তু সে হাসির কোন অর্থ নাই। তরুতলবাসী সর্বপ্রকার পরিগ্রহত্যাগী নগণ্য অকিঞ্চন পারমার্থিক লোকের মুখে যে স্বর্গীয় মধুর চিত্তমোহন-কারী হাসি দেখিয়াছি তাঁহাদের তাহা কই? কিসের অভাবে সমস্ত ভোগসুখ পাইয়াও তাঁহাদের সুখ নাই—কোথা হইতেও শান্তি নাই!

এই সকল বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যেমন বাহ্যিক জগৎ আমরা দেখিতে পাইতেছি সেইরূপ একটি অন্তর্জগৎ রহিয়াছে, মানুষ কেবলমাত্র রক্তবসা ও মাংসপেশী সমন্বিত জীব নহে, তাহার মন বুদ্ধি ও জ্ঞানের অন্তরের অন্তরে চৈতন্যরূপে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। কিরূপে মানুষ অন্নাদি ভোজন ও সামান্য ভোগবিলাস পাইলেই সুখী হইতে পারিবে, কিরূপে সামান্য জড়ের উপাসনা ও জড়বস্তুলাভে তাহার অন্তরের চৈতন্যসত্তা আত্মার তুষ্টি সাধন করিবে? তিনি যে আমাদের প্রিয় হইতে প্রিয়তর, মধুর হইতেও মধুর; জীব যে তাঁহার রস আস্বাদন করিয়াছে, তাহা না হইলে তাঁহার দিকে মন ধাবিত হয় কেন? তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় কেন? যে তৃষ্ণার জল প্রকৃতি দেবী দান করিতে সমর্থা হন না, সে তৃষা অমৃতময় ধর্মবারি দ্বারা শীতল হয়। ধর্ম হইতে সুখকর বস্তু আর নাই।

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকান্তরিত ষষ্ঠ অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়।—উঃ সঃ

যখন অশান্তিমেঘে হৃদয়গগন আচ্ছন্ন করে তখন কেবল ধর্মের প্রবল শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সেই মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, যখন নৈরাশ্য-আঁধারে চারিদিক তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন ধর্মের পবিত্র জ্যোতিই সেই ঘন তমোরাশি নাশ করিয়া ভবিষ্যৎ উজ্জল আশার আলোক জ্বালিয়া দেয়। এ সংসার যদি ধর্মের নির্মল কিরণে উদ্ভাসিত না থাকিত তাহা হইলে ইহা অরাজকতা-অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত; সকলের উদ্দেশ্য যদি এক না হইত তাহা হইলে কে কাহাকে ভাল বাসিতে পারিত? কে কাহাকে সাহায্য করিত, কে কাহার জন্য প্রাণ দিত? তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত হইব কেন? তোমার যে অবস্থা আমারও যদি সেই অবস্থা না হইত, তোমারও যে উদ্দেশ্য আমারও যদি সেই উদ্দেশ্য না হইত তাহা হইলে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া কি তিষ্ঠিতে পারিতে? এই বিপুল অনন্তকোটী জীবসঙ্ঘের বিরাট স্রোত বিরাট সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে, ইহার বিপরীত অভিমুখে যাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কিন্তু পৃথক পৃথক ভাব অনুসারে ভাব অনন্ত। যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়াই যাক না কেন পরিণামে এক স্থানে গিয়া উপনীত হইবেই হইবে, কেন না সমস্ত ভাবই সেই এক অনির্বচনীয় অভাবনীয় ভাব হইতেই আসিয়াছে এবং তাহাতেই শেষে মিশিয়া যাইবে; ইহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধ্যাত্মিক নিয়ম, ইহাই চরম সত্য, ইহাই ধর্মরাজ্যের গুহ্য রহস্য। আমাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম পরস্পর হইতে পৃথক হইতে পারে কিন্তু তাহার কোন না কোন স্থানে একতা আছেই আছে। তোমার সহিত আমার না মেলে ক্ষতি কি? দুজনের মন বুদ্ধি ও ভাব সর্বতোভাবে একপ্রকার কখনই হইতে পারে না, দু জনে এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া কেহ কখনও চরম সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই। আমার স্বভাব ও বলবীর্য অনুসারে আমি অগ্রসর হইব, তোমার সহিত আমার ভাবের কিংবা মতের অনৈক্য হইল বলিয়া আমারটি ভুল আর তোমারটিই সত্য একথা বলিতে পার না; কিংবা তুমি আমা অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়াছ, তুমি আমা অপেক্ষা উচ্চ অধিকারী, আমি নিম্ন অধিকারী বলিয়া আমার পথকে ভুল বা মিথ্যা বা মন্দ বলিবার অধিকার তোমার নাই। যে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছে সে কি যৌবন কালকে ভুল বলে? সেই চরমসীমায় উপনীত হইবার অনন্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন "মত পথ।" কালীবাটীতে আসিতে হইলে কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে, কেহ নৌকাযানে, কেহ রেলপথে, কেহ বা হাঁটিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়; সেইরূপ ভগবানের কাছে পৌঁছিবার জন্য প্রত্যেক ধর্মই এক একটি পথ দেখাইয়া দিতেছে। লোকে নিজের নিজের জমি প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিয়া লয় কিন্তু আকাশকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না, অখণ্ড আকাশ সকলেরই প্রাচীরবেষ্টিত জমির উপর সমভাবেই স্থিত রহিয়াছে। সেইরূপ লোকে সম্প্রদায় গঠন করে কিন্তু জানে না যে, তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান যেমন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমনি অবস্থিত আছেন। সম্প্রদায় শত শত হউক, ক্ষতি নাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব যেন কখনও না উৎপন্ন হয়। যদি আরও দুইশত সম্প্রদায় গঠিত হয়, যদি সেই পরমার্থ সত্যে উপনীত হইবার আরও দুইশত পথ আবিষ্কৃত হয় হউক, তাহাতে লাভ বই জগতের ক্ষতি নাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব না গজাইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক ভাবে জগতের যত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ধর্মজগতের যত উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে এমন আর কিছুতে হয় নাই। ধর্মের নামে কত সহস্রবার যে মেদিনী

লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোণিতপ্রবাহে লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ধর্মের নামে অশান্তির রাজ্য বিস্তৃত হইয়া কত ভয়ানক দ্বেষ হিংসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-অনল জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং সেই অনল যে অপরকে দগ্ধ করিয়া দ্বেষহিংসাকারীদেরই নাশের কারণ হইয়াছে তাহা অতীত ইতিহাস স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে।

পরের বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কি অধিকার তোমার আছে? বিশ্বাস দিবার কর্তা ভগবান, তুমি তাঁহার কার্যের বিরুদ্ধাচরণ কর কোন্ সাহসে? এরূপ কার্যের দ্বারা তুমি কি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছ না? নাস্তিক বরং ভাল, তাহারও একটা সরল বিশ্বাস আছে; কিন্তু হে ধার্মিকাভিমানী, তুমি মনে মনে যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছ কার্যতঃ তাঁহাকেই অবিশ্বাস করিতেছ, তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ। তুমি কি বিশ্বাস-ঘাতক নহ? নিষ্ঠা এক জিনিস, গোঁড়ামি আর এক জিনিস; অনুরাগ এক জিনিস, স্বার্থচরিতার্থতা আর এক জিনিস। নৈষ্ঠিক ভক্তের মুখ হইতে শান্তিময়ী বাণী ভিন্ন আর কিছুই নির্গত হয় না। তাঁহার জীবন একটি জ্বলন্ত ভক্তিবিশ্বাসের মূর্তি। তাঁহার হৃদয়ের কুটিলতা, নীচতা প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। নিষ্ঠাই ধর্মের দৃঢ় ভিত্তি, নিষ্ঠাতেই ধর্মের তেজ নিহিত রহিয়াছে, নিষ্ঠাই ধর্মের বল। ধর্মসাধন করিতে হইলে এই নিষ্ঠাই চাই। এই একনিষ্ঠতা মহাবীর হনুমানের ছিল। তিনি গরুড়কে বলিয়াছিলেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

"শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ দুইজনেই পরমাত্মাতে অভেদ, তাহা আমি জানি, তত্রাচ কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।"

ধর্মজীবন লাভ করিতে হইলে সাধনার একান্ত প্রয়োজন। ধর্ম মুখে বলিবার জিনিস নহে, লোককে দেখাইবার জিনিস নহে; বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই ধর্মলাভ হয় না, বহু বহু শাস্ত্র সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। তাহাতে জোর আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইতে পারে, দশজনের কাছে মান সম্ভ্রম বড় জোর পাইতে পারি। শাস্ত্র আমাদের নানা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি আমরা ঠিক ঠিক সেই অনুযায়ী কর্ম না করি, যদি আমরা সেই মত জীবন গঠন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা না পাই তাহা হইলে তাহাতে আমাদের ফলবত্তা কি? শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

"তর্কযুক্তি দ্বারা, কিংবা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি দ্বারা বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাও এই আত্মাকে লাভ করা যায় না।" ধর্ম প্রাণের জিনিস; ধর্মই জীবন, এ জীবন তাঁহারই ছায়া মাত্র। জীবন তৈয়ার করাকেই ধর্ম বলে; এক একটি জ্বলন্ত জীবন তৈয়ার করিতে হইবে—যে জীবন কোটী কোটী নরনারীর ভবসমুদ্রযাত্রার ধ্রুবতারাস্বরূপ হইবে। এক একটা জ্বলন্ত জীবন শত শত শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। শাস্ত্র যে সত্য তাহার প্রমাণ কোথায়? এই মহাপুরুষদিগের জীবনই তাহার প্রমাণ, তাহার সাক্ষাৎ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহা শত সহস্র ঝঞ্ঝাবাতেও টলিবার নহে। এই ধর্মজীবনের যত হ্রাস বা অভাব হইবে, জানিও ধর্মের আসন্নকাল ততই সন্নিকটবর্তী। আলস্যের কাজ নয়, আলস্য দূরে পরিহার করিতে হইবে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" জড়তা পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হও, জাগ এবং অভীষ্টলাভ করিয়া সেই সত্যতত্ত্ব অবগত হও। ধর্মমূলক নিত্যনৈমিত্তিক গুটিকতক নিয়ম পালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। দেখিতে হইবে দিন দিন আমাদের মানসিক বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, দেখিতে হইবে আমাদের জীবন উন্নত হইতেছে কি না। তাহা যদি না হয়

জানিবে নিশ্চয়ই আমরা ধর্মের নামে আর কিছুর আরাধনা করিতেছি। ধর্মজীবন লাভ করিতে সদসৎ বিচার ও সৎসঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয়—

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥

"মোক্ষদ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, যথা শম, বিচার, সন্তোষ, চতুর্থ সাধুসঙ্গম।" যত্নপূর্বক এই চারি দ্বারপালের সেবা করিতে হইবে, অশক্ত হইলে তিনের অথবা দুয়ের সেবা অবশ্যই করা চাই, কেন না রাজগৃহে যেরূপ দ্বারীর শরণাপন্ন হইলে সে দরজা খুলিয়া দেয়, সেইরূপ এই চারি দৌবারিককে সন্তুষ্ট করিলে মোক্ষ-প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়। বস্তুতঃ যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যথার্থ যত্নশীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অন্তরে সর্বদা তদ্বিষয়ক বিচার করিতে থাকেন তিনি অবিলম্বেই আপনার অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যাঁহার শুভ ইচ্ছা আছে, যাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিবার চেষ্টা বলবতী হয়, সদসৎ বিচার তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই স্ফূর্তি পায়। উপনিষৎ বলিয়াছেন—আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। "এই আত্ম-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়, মনে মনে বিচার আলোচনা করিতে হয় এবং নিবিষ্টচিত্তে ইহার ধ্যান করিতে হয়।" যাঁহাদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় বিচার করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য আঘাতেই নষ্ট হইয়া যায়। যিনি যথার্থ বিচার-পরায়ণ হন, তাঁহার হৃদয়ে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দুর্লভ সত্যসকল আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। বিচার কর্তব্য জানিয়া কেহ যেন কুতার্কিকতা অবলম্বন না করেন, কারণ তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত না হইয়া সমূহ অনিষ্ট সংঘটনই হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান করিয়া গিয়াছেন। সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথবা যেগুলিতে তাঁহার সন্দেহ হইবে সেগুলির মীমাংসা করণার্থে জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। এইরূপ সৎসঙ্গ ও সদালোচনায় অজ্ঞানাবরণ ছিন্ন হইয়া যায়।

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ, স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্বীত, সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥

"সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত, যদি সর্বসঙ্গ পরিত্যাগের অধিকারী না হও তবে সাধুসঙ্গ কর, সাধুসঙ্গ রুগ্ন আত্মার পক্ষে মহৌষধস্বরূপ।"

শূন্যং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে॥

"জ্ঞানবান ব্যক্তির সংস্পর্শে সুখশূন্য ব্যক্তির শূন্যতা সঙ্কীর্ণ হয় এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাও উৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হয় আর আপৎসকল সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায়।"

যঃ স্নাতঃ শীতশীকরাসাধুসঙ্গেতি গঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ
কিম ধ্বরৈঃ॥

"যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্মল সুশীতল গঙ্গাতে স্নাত হন, তাঁহার দান, তীর্থসেবা, তপস্যা অথবা যজ্ঞাদিতে কি প্রয়োজন?" সাধুসঙ্গ যেরূপ বাঞ্ছনীয় অসৎ সঙ্গ ও সেইরূপ বর্জনীয়। গাছ যখন ছোট থাকে তখন তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া না রাখিলে মেষমহিষাদি যেমন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে সেইরূপ সাধনের প্রথমাবস্থায় দুষ্কর্মকারীদিগের সংসর্গে বাস করিলে নিজের অপরিপক্ক সুভাবগুলির সমূলে উচ্ছেদ সাধিত হইয়া পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। মহাত্মা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ মহাপাপিগণের এবং তাহাদিগের সহিত যাহারা সংসর্গ করে তাহাদিগের একই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। দৈহিক সংক্রামক রোগসকল যেমন অতি সহজে

অন্য দেহে সংক্রামিত হয় আত্মার পাপরোগসকলও অতি সহজে সেইরূপে তৎসংস্পর্শী ব্যক্তির আত্মাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সৎব্যক্তির সহিত মিলনের নামই স্বর্গ এবং অত্যন্ত সংশয়াবৃত বিষয়ী ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নামই নরক। আত্মাই অন্য আত্মাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এক জীবনই অন্য জীবনের উপর কার্য করিতে পারে ; জড় শক্তি কখনই চৈতন্যের উপর কার্যকরী হয় না, ইহাই বিশ্বের নিয়ম। যখন এইরূপে এক প্রাণ অন্য প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, এক জীবন অন্য জীবনের সাহায্যে উন্নততর সোপানে আরূঢ় হয় তখনই তাহাকে গুরুকরণ বা দীক্ষা কহে। সাধনার প্রবর্তকাবস্থায় বাহ্য জগৎ হইতে সাহায্য লইতে হয়, নানারূপ প্রক্রিয়া ও প্রণালীর মধ্য দিয়া না গেলে ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের সাধনার প্রথমাবস্থায় কত অধিক বাহ্য প্রক্রিয়া ও প্রণালী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য-স্বরূপ। তিনি প্রত্যেক ধর্মের যাবতীয় মত ও বাহ্য সাধনগুলি মান্য করিয়া এবং সেইমত কার্য করিয়া তাহার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যেমন শুধু একটি চাউল বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, খোসাটি শুদ্ধ ধান্যটি বপন করিতে হয় সেইরূপ বাহ্যিক কার্য ও ক্রিয়া-কলাপ অসার ভাবিয়া ত্যাগ করিলে চলিবে না। যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার পর খোসা বীজ হইতে আপনি খসিয়া যায় সেইরূপ ধর্মপথে দৃঢ় স্থিত হইলে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপও অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে পর্যন্ত আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল না হইবে, যে পর্যন্ত ঠিক ঠিক অন্তরে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করিয়া নিত্য বস্তুর অদর্শনে ব্যাকুলতা অনুভব না করিব, যে পর্যন্ত যেমন পরমহংসদেব বলিতেন, হরিনাম শ্রবণ মাত্র নয়নে অশ্রুধারা না বহিবে, সেই পর্যন্ত বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক না ভাবিয়া চিহ্ন আচারব্যবহার ও রীতিনীতি-গুলিকেই যেন পরমধর্ম বলিয়া ভ্রমে না পড়ি, তাহারা আমাদের অভীষ্টদেবের নিকট উপনীত করিবার পথের সহায়মাত্র।

কর্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, মন শুদ্ধ ও পবিত্র না হইলে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রস্বরূপ ভগবানের দর্শনলাভ কিরূপে ঘটিবে? কায়মনোবাক্যে পবিত্রতাই ধার্মিক হইতে হইলে প্রধান দরকার। যখনই মনে কোন অপবিত্র ভাব আসিবে অমনি তাহাকে ধরিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণই মনের নিকটে আপাতমনোহর নানা প্রলোভনের সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিয়া তাহাকে তত্তদ্বিষয়ে আসক্ত করিয়া কুপথগামী করে। ইহাদিগকে ফিরাইতে হইবে, অসৎ হইতে সৎ বিষয়ে নিযুক্ত করিতে হইবে। আপাততঃ ইহা সহজ বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু সহজ নয় বলিয়া হতাশ হইবার কারণ কিছুই নাই। চাই অদম্য উদ্যম, নিরন্তর অভ্যাস—চাই বিবেক, চাই দৃঢ় অধ্যবসায়, চাই প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা। এই প্রবল আন্তরিক ইচ্ছার সম্মুখে সমস্ত বাধাবিঘ্ন পথ প্রদান করে, কার সাধ্য সে গতি রোধ করে? যদি যথার্থ প্রবল ইচ্ছা থাকে সমস্ত শক্তি আসিয়া যাইবে। এরূপ শুভ ইচ্ছা মনে উদিত হইলে ভগবান স্বয়ং বল দান করেন। গীতা বলিয়াছেন—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। "এই ধর্মের অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে মহৎ সংসার-ভয় হইতে ত্রাণ করে।" সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের শক্তি ও বীর্যের অভাব কি? আমরা কেবল অবিশ্বাস করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না বই তো আর কিছু নয়। এই অবিশ্বাসের মূল হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করা চাই। তাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া আমরা কি না করিতে পারি?

ভগবানের কৃপায় সকলই হইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি কার্য-সাধনে অকর্মণ্য বা অক্ষম বলিয়া যদি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে তাহা হইলে কি ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিতে? দেখিতেছ না—তুমি ধর্মজীবনে নিজেকে দুর্বল ও অশক্ত ধারণা করিয়া ক্রমে ক্রমে জীবন্মৃত হইয়া পড়িতেছ! তুমি সামান্য অর্থসঞ্চয়ের জন্য কত অসহ্য ক্লেশ করিতেছে আর পরমার্থধন পরমেশ্বর তোমার ঘরে আসিয়া ডাকিয়া দিয়া যাইবেন ভাবিয়া রাখিয়াছ, ইহা কি তোমার অসমসাহসিকতা নহে? তুমি জড় অপরা বিদ্যা উপার্জনে নিজের শরীর পর্যন্ত ক্ষয় করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ আর সেই পরাবিদ্যা কি বিনা আয়াসে বিনা উদ্যমে আপনা হইতে স্ফূর্তি পাইবে? যদি বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়া সরস্বতী দেবীর বরে কালিদাসের ন্যায় হঠাৎ বিদ্বান হইয়া যাইব বলিয়া বসিয়া থাকিতে তাহা হইলে কখনও কি বিদ্যাধনে ধনী হইতে পারিতে? ভগবানের উপর সে নির্ভরশীলতা তোমার কই? সে নির্ভরশীলতা যে অনেক পুরুষার্থসাধনের ফল; সে নির্ভরশীলতা যে নিজের অহংজ্ঞান বিনাশ পাইয়া 'ভগবানের আমি', 'আমি তাঁহার দাস' এই জ্ঞান দৃঢ় ধারণা হইলে তবে প্রকাশ পায়। তখন যে নিজের বলিবার কিছু থাকে না, দাসের আবার নিজের ইচ্ছা কি? নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ-ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ ব্যতীত আসিতে পারে না। স্বার্থত্যাগই ধর্মের মূলমন্ত্র। ইহা ব্যতীত কেহ কখনও ধর্মরাজ্যে উন্নত জীবন লাভ করিতে পারে না।

ধর্ম দুই ভাবে বিভক্ত হইয়াছে:—সকাম ধর্ম ও নিষ্কাম ধর্ম। কোন কাম্যবস্তু লাভের প্রত্যাশায় যে ধর্ম করা যায় তাহাকে সকাম ধর্ম বলে; এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল ধর্মার্থেই ধর্ম করাকেই নিষ্কাম ধর্মসাধন বলে। নিষ্কামধর্ম সাধনই শ্রেষ্ঠ, কেননা সকাম ধর্মের ফল বিনশ্বর; ফলে আসক্তিই বন্ধনের কারণ; ইহাই আমাদিগকে দুঃখে নিমজ্জিত করে। বিশেষতঃ একটি সৎকার্য করিয়া ভগবানের কাছে ফল আকাঙ্ক্ষা করা আর একটি দ্রব্য দিয়া তাহার মূল্য আদায় করা কি এক কথা নহে? উহা শেষে একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়, তাহাতে ভগবচ্চরণে প্রেম কখনই উদিত হইতে পারে না। যে ভগবানকে সকামভাবে পূজা ও সেবা করে, সে নিজের কামনারই সেবা করে মাত্র। নিষ্কাম সাধক ভগবানকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই ভালবাসে; কেন ভালবাসে তাহা জানে না। এই প্রকার ভক্তই এই সংসারে সুখদুঃখের হাত এড়াইয়া পরম শান্তিময় সচ্চিদানন্দসাগরে আনন্দে ভাসিতে থাকেন। তিনিই অমৃতময় হন।

অনেকের বিশ্বাস যে গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে ধর্ম সাধন করা যায় না, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় না করিলে ধর্মসাধন হয় না। গৃহস্থাশ্রম অর্থে যাঁহারা কেবল পুত্রাদি পালন ও অর্থোপার্জন করা মনে করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। গৃহস্থ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি:—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

"গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিবেন এবং যে কোন কার্য সম্পাদন করিবেন তাহার ফল পরব্রহ্মে অর্পণ করিবেন।" সংসারের মধ্যে অবস্থান করিয়াও সুন্দররূপে নিষ্কাম ধর্ম সাধন করা যায়। সংসার বা সমাজ হইতে ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু নহে। পরমেশ্বর স্বয়ং সংসারাশ্রমের মূলে অবস্থিত আছেন; সংসার সেই মহোত্তমেরই রাজ্য। প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে সংসারের প্রত্যেক কার্যই ঈশ্বরের কার্য। গৃহী সাধক এইরূপে নিষ্কামভাবে ধর্মসাধন করিয়া পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবেন। তিনি

প্রাণপণে কার্য করিবেন বটে কিন্তু কখনও তাহার ফলপ্রত্যাশী হইবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

"তোমার কেবল কর্তব্য সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার অধিকার কিছুমাত্র নাই, কর্মের ফলকামনায় তোমার যেন প্রবৃত্তি না জন্মে এবং অকর্ম করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।" সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির মন সর্বদাই ভগবানে লগ্ন রাখা একান্ত কর্তব্য ; প্রলোভন চতুর্দিকে, সাধক যদি ভগবানের দিকে আকৃষ্ট না থাকেন, প্রলোভন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে ; সংসারকে মহাকূপ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে ; আমরা যেন তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। কত সতর্কতা ও সাবধানতা আবশ্যক! সংসার আমাদের জন্য হইয়াছে, আমরা সংসারের জন্য হই নাই ; পদ্মপত্র যেমন জলে থাকে কিন্তু জল পদ্মপত্রে থাকে না সেইরূপ সংসারে থাক কিন্তু সংসার যেন তোমার ভিতর না থাকে। ইহাই প্রধান সাধন। এইরূপ নির্লিপ্ত ভাব কার্যে পরিণত করাই ধর্ম। এই ধর্মলাভ হইলে সাধক যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, বিপদে সম্পদে তাঁহার সমভাব হৃদয়ে বিরাজ করে, তিনি কোন গুণে আবদ্ধ হন না, তিনি তখন গুণাতীত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণত্রয়ের অতীত যাঁহারা তাঁহারাই সাধু এবং এই গুণত্রয়ের মধ্যে যাহারা তাহারাই অসাধু। ধর্মই আমাদের তমোগুণ হইতে রজোগুণের মধ্য দিয়া সত্ত্বে উপনীত করে। এই সত্ত্বও আমাদের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করাইতে পারে না, তবে ইহা আমাদিগকে তাঁহার অত্যন্ত নিকট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। পরে গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে তবে সাধকের ঈশ্বরলাভ হয়। সাধক সাধনার কোন বিশেষ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, তাঁহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

উমার পরীক্ষা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিত মানসে' হর-পার্বতীর চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অপূর্ব ও অতুলনীয়। তিনি পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে নূতন রূপ দিয়া তাঁহাদের চরিত্র পরিস্ফুট ও মনোজ্ঞ করিয়াছেন। শঙ্করের রামভক্তি দেখিয়া সতীর স্তম্ভিত হওয়া, সতীর দক্ষযজ্ঞে গমন, যোগাগ্নিতে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের গৃহে পার্বতীর জন্মগ্রহণ, উমার তপস্যা, ও হর-পার্বতী-বিবাহ প্রভৃতি ঘটনাবলীর ভিতরে তুলসীদাস যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

হর-পার্বতীবিবাহে তিনি উমার চরিত্র অনবদ্য, উচ্চ আদর্শে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা চিরকাল ভারতীয় সমাজে প্রেরণা আনয়ন করিবে, সন্দেহ নাই।

যখন উমা হিমালয়ের ঘরে আসিলেন, তখন হইতেই সেখানে সকল সিদ্ধি ও সম্পদ্ ভরিয়া উঠিল।

"জব তেঁ উমা শৈলগৃহ জাঈ।
সকল সিদ্ধি সংপতি তহঁ ছাঈ॥"

মুনিরা আসিয়া হিমাচলে বাস করিতে লাগিলেন।

নদীগুলি পবিত্র সলিলে বহিতে লাগিল। পশু, পক্ষী ও পতঙ্গ পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিল। সকল জীব স্বাভাবিক বৈর ত্যাগ করিতে লাগিল। প্রজারা সকলেই হিমালয়ের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। হিমালয়ের নিজের শোভা কেমন হইল? তুলসীদাস উপমা দিয়া বলিতেছেন যে রামভক্তি পাইলে ভক্তের যেমন শোভা হয়, হিমালয়ের তেমনি শোভা দেখা দিল।

"সোহ শৈল গিরিজা গৃহ আয়ে।
জিমি জন রামভগতিকে পায়ে॥"

একদিন দেবর্ষি নারদ কৌতূহলবশতঃ হিমালয়ের ভবনে আগমন করিলেন। হিমালয় তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়া অর্চনা করিলেন। তিনি ও রাণী মেনকা দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া কন্যা উমাকে প্রণাম করাইলেন। হিমালয় নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ঋষি! আপনি তিন কালের কথা জানেন, শুধু তাই নয় আপনি সর্বজ্ঞ। আপনার সব লোকেই যাতায়াত আছে। আপনি এই কন্যার দোষ ও গুণ বিচার করিয়া বলুন।'

"ত্রিকালগ্য সর্বগ্য তুম্হ গতি সর্বত্র তুম্হারি।
কহহু সুতাকে দোষগুণ মুনিবর হৃদয় বিচারি॥"

নারদ হাসিলেন এবং মৃদুবাক্যে রহস্যময় অর্থপূর্ণ কথা বলিলেন। উমা সকল গুণের খনি। সে স্বভাবতঃই সুরূপা, সুশীলা, ও বুদ্ধিমতী। তাহার নাম উমা, অম্বিকা, ও ভবানী।

"কহ মুনি বিহঁসি গূঢ় মৃদুবাণী।
সুতা তুম্হারি সকল গুণখানী॥
সুন্দর সহজ সুশীল সয়ানী।
নাম উমা অম্বিকা ভবানী॥"

দেবর্ষি আরও বলিলেন যে উমার সকল লক্ষণই সুলক্ষণ। সে পতির প্রিয়া হইবে। তাহার এয়োতি অচল থাকিবে। উমার গুণে তাহার জনক-জননীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে। আবার নারদ হিমালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইলেন যে উমা সকল গুণে ভূষিতা হইলেও দুই চারিটি দোষ আছে। সেই দোষগুলি উমার হাতের রেখায় ধরা পড়িয়াছে। তাহার পতির না থাকিবে কোন গুণ; কোন মান; পিতৃমাতৃহীন ও উদাসীন; অসংসারী ও জটাযুক্ত; অকামী ও উলঙ্গ এবং অমঙ্গল বেশপরা পতির সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

"শৈল সুলচ্ছনি সুতা তুম্হারী।
সুনহু জে অব অবগুণ দুই চারী॥
অগুণ অমান মাতুপিতুহীনা।
উদাসীন সব সংসয় হীনা॥
জোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেখ।
অস স্বামী এহি কহঁ মিলহি পরী হস্ত অসি রেখ॥"

দেবর্ষির কথা শুনিয়া হিমালয় ও মেনকা সন্তপ্ত হইলেন। কিন্তু উমার আনন্দের সীমা রহিল না। সখীরা রোমাঞ্চিত হইলেন এবং চোখে জলে ভরিয়া উঠিল। দেবর্ষি নারদের কথা মিথ্যা হইবার নহে— ইহা উমা মনে দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। কল্পিত পতির পাদপদ্মে উমা প্রেম স্থাপন করিলেন এবং মনের কথা প্রকাশ করিবার এ অবসর নয় বলিয়া ভাব গোপন করিলেন। উমা সপ্রেমে সখীদের কোলে গিয়া বসিলেন। গিরিরাজ, রাণী, ও সখীরা দুশ্চিন্তার কূল পাইলেন না। তখন ধৈর্য ধরিয়া হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে প্রভু, বলুন কি উপায় করি।'

"কহহু নাথ কা করিয় উপাউ॥"

নারদ বলিলেন, 'বিধাতা কপালে যা লিখিয়াছেন, তা দেবতাই হউক, দৈত্যই হউক আর নর কি নাগ হউক কেহই মেটাইতে পারিবে না।' হিমালয়কে একেবারে হতাশ দেখিয়া দেবর্ষি একটি উপায়ের কথা নির্দেশ করিলেন। যদি শিবের সহিত উমার বিবাহ হয় তবে ভাল, কারণ শিবের দোষগুলিও গুণেরই সমান—একথা সকলেই বলে।

বিষ্ণু সাপের শয্যায় শুইয়া থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁহার দোষ দেখেন না। সূর্য ও অগ্নি সব রসই ভক্ষণ করেন, কিন্তু কেহ তাহাদের নিন্দা করেন না। মা গঙ্গা ভাল ও মন্দ উভয় জলই বহিয়া লইয়া যান, কিন্তু তাঁহাকে কেহই অপবিত্র বলে না। যিনি শক্তি রাখেন তাঁহার কোনও দোষ নাই।

"সমরথ কহুঁ নহিঁ দোষ গোসাঈঁ।"

নারদ সর্বপ্রকারে শিবের সহিত উমার বিবাহ অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'শঙ্কর স্বভাবতঃই শক্তিমান্ ও ঐশ্বর্যবান্। এই বিবাহে সব রকম কল্যাণ হইবে। তাঁহাকে আরাধনা করা কঠিন, কিন্তু যে কষ্ট সহিতে পারে, তাহার কাছে তিনি আশুতোষ। যদি তোমার কুমারী তপস্যা করে, তবে ত্রিপুরারি ভবিতব্যতাও বদ্‌লাইতে পারেন। পৃথিবীতে ত অনেক বরই আছে, কিন্তু এই কন্যার শিব ভিন্ন আর বর নাই।'

"জদ্যপি বর অনেক জগ মাহীঁ।
এহি কহঁ সিব তজি দূসর নাহীঁ॥"

এই বলিয়া দেবর্ষি উমাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এদিকে মেনকা রাণী পতিকে একান্তে পাইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, 'হে নাথ! আমি মুনির কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি ভাল ঘর, ভাল বর, ও ভাল বংশ হয় এবং উমার অনুরূপ হয় তবেই কন্যার বিবাহ দিব। নচেৎ বরং উমা কুমারী থাকিবে, কিন্তু এমন বরকে উমা দিব না। হে নাথ! উমা আমার প্রাণের মত প্রিয়।'

"জৌঁ ঘরু বরু কুলু হোই অনূপা।
করিঅ বিবাহু সুতা অনুরূপা॥
ন ত কন্যা বরু রহউ কুআঁরী।
কন্ত উমা মম প্রানপিআরী॥"

এই বলিয়া মেনকা পতির পায়ে মাথা ঠেকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দৃঢ়চিত্ত হিমালয় নির্মম উত্তর করিলেন, 'হে রাণি! চাঁদের কিরণ শীতল না হইয়া আগুনের মত হওয়া সম্ভব, কিন্তু নারদের কথা অন্যথা হইবে না।' পরে স্নেহবিগলিত হইয়া হিমালয় বলিলেন, 'হে প্রিয়ে! শোক করিও না। শ্রীভগবানকে স্মরণ কর। উমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহার কল্যাণ করিবেন।'

"প্রিয়া সোচু পরিহরহু সব সুমিরহু শ্রীভগবান।
পারবতিহি নিরময়উ জেহি সোই করিহহি কল্যাণ॥"

তপস্যা ছাড়া দুঃখ দূর করিবার অন্য উপায় নাই। তাই হিমালয় মেনকাকে বলিলেন যে সে উমাকে যেন তপস্যা করিবার শিক্ষা দেয়। মেনকা রাণী পতির কথায় আপাততঃ সান্ত্বনা পাইলেন এবং তখনি উমার নিকট গমন করিলেন। উমাকে দেখিয়া মার চোখে জল আসিল এবং কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কিছু বলিতে গিয়া মেনকা বলিতে পারিলেন না। উমা মাকে আদর করিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, "মা! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন, 'উমা! তুমি তপস্যা কর। নারদ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। তোমার বাবা ও মার কাছে ইহা ভাল লাগিবে। তোমার তপস্যা সুখপ্রদ হইবে এবং দুঃখ ও দোষ নষ্ট করিবে।'" ইহা শুনিয়া মা মেনকার মুখে কথা সরিল না এবং পতিকে ডাকিয়া সকল কথা শুনাইলেন। মাকে ও বাবাকে বুঝাইয়া উমা তপস্যার পথে চলিলেন। উমা সুকুমারী, তাঁহার শরীর তপস্যার যোগ্য নয়। তবু তিনি ভাবী পতিকে স্মরণ করিয়া সকল ভোগ ত্যাগ করিলেন।

"অতি সুকুমার ন তনু তপ জোগূ।
পতি পদ সুমিরি তজেউ সব ভোগূ॥"

কঠিন তপস্যা করিয়া উমার দেহ যখন একেবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন আকাশবাণী হইল—'হে গিরিরাজ-কুমারী! শোন, তোমার মনোরথ সফল হইয়াছে। এখন সকল দুঃসহ কষ্ট ত্যাগ কর। তুমি শিবকে পাইবে।'

"জয়উ মনোরথ সুফল তব সুনু গিরিরাজকুমারি।
পরিহরু দুসহ কলেস সব অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি॥"
আকাশ-বাণী শুনিয়া উমার রোমাঞ্চ হইল এবং তিনি আনন্দিতা হইলেন। কৈলাসে শিবের নিকট সপ্তঋষি আসিয়া উমার তপস্যার কথা জানাইলেন। শিব বলিলেন, 'তোমরা উমাকে পরীক্ষা কর। গিরিরাজকে পাঠাইয়া উমাকে বাড়ী আনাও এবং আমার সন্দেহ দূর কর।'

সপ্ত-ঋষি নানা প্রকারের প্রলোভন দেখাইয়া উমার নিকট বিষ্ণুকে বিবাহ করিবার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবের অযোগ্যতা দেখাইয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। সপ্ত-ঋষি বলিলেন যে শিব সতীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ফাঁকি দেন এবং সতীর মৃত্যুর কারণ হন। এখন তিনি সুখে নিদ্রা যান, কোন চিন্তা নাই, সারা জগৎ ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। এখন তিনি স্বভাবতঃই একা থাকেন, এমন ব্যক্তির গৃহে কি কথনো স্ত্রী খাপ খায়?'

"অব সুখ সোচত সোচু ন হিঁ ভীখ মাঁগি ভব খাহিঁ।
সহজ একাকিন্হকে ভবন কবহুঁ কি নারী খটাহিঁ॥"

সপ্ত-ঋষি উমাকে আবার বলিলেন, 'হে উমা! তুমি এখনো আমাদের কথা রাখ, আমরা তোমার উপযুক্ত বর ঠিক করিয়াছি। তিনি অতিশয় সুন্দর, পবিত্র, আনন্দদায়ক ও সুশীল। বেদ তাঁহার যশোলীলা গান করিয়া থাকেন। নির্দোষ, সকল গুণে গুণবান্ বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীপতি বিষ্ণুকে তোমার বর করিয়া আনিব।' এই কথা শুনিয়া উমা হাসিয়া বলিলেন, 'আপনারা বলিয়াছেন মহাদেব দোষময় এবং বিষ্ণু সকল গুণের ধাম। তথাপি যাহাতে যাহার মন মুগ্ধ হয় তাহাকেই তাহার প্রয়োজন।

"মহাদেব অবগুণভবন বিষ্ণু সকল গুণধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন তেহি তেহী সন কাম॥"

সপ্ত-ঋষিকে উমা আরও বলিলেন: 'এখন এই জন্মটাই শিবের জন্য কাটাইলাম, এখন আর গুণ-দোষের বিচার কে করে? যদি আপনাদের মনে বিবাহ ঘটাইবার বিশেষ জেদ থাকে এবং ঘটকালী না করিয়া যদি আপনারা থাকিতে না পারেন, তবে কৌতুককারীদের ত আলস্য নাই, জগতে বর-কন্যা অনেক আছে তাহাদের বিবাহ দেওয়াইবেন। আমি জন্ম-জন্মান্তরের জন্য এই জেদ ধরিয়াছি যে হয় শিবকে বরণ করিব, নয়ত কুমারী থাকিব। যদি শিব নিজেও শতবার বলেন তথাপি নারদের উপদেশ আমি ছাড়িব না।'

"জনক কোটি লগি রগরি হমারী।
বরউঁ সম্ভু ন তু রহউ কুআঁরী॥
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসূ।
আপু কহহিঁ সত বার মহেসূ॥"

উমার দৃঢ় সঙ্কল্প ও শিবপ্রেম দেখিয়া সপ্ত-ঋষি আর আত্মগোপন করিলেন না এবং ভক্তি-নম্র মুখে যুগপদ্ বলিয়া উঠিলেন,

"জয় জয় জগদম্বিকে ভবানী॥"

"আমি ভাবে বলেছি,—মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

আগমনী

শ্রীচিত্ত দেব
(শান্তিনিকেতন)

মনে তোকে রেখেছি মা
তোর কি মনে আছে আমায়।
কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে
ভুলেছিস কি এই অভাগায়॥

ভালোমন্দ তোর চরণে
সঁপেছিলাম, আছে মনে
কান্নাকাটি করে যখন
ভেসেছিলাম ধরা-ধারায়॥

আজ শরতে এই আকাশে
আনন্দ-রব কেন হাওয়ায়।
'মা আসবে' 'মা আসবে' বলে
কে সাজে আর কে-বা সাজায়॥

আমি মা অভাগা তেমন
মন করে তাই কেমন কেমন
সবার মা কি আমার মা নয়
ঢাক-ঢোলক কি মিছে বাজায়॥

ছেলেমেয়ে পুরুষনারী
সবার পানে চোখ ছুটে যায়
তোকে-ত দেখিনে মাগো
গোল বাধে তাই চাওয়া-পাওয়ায়॥

মনের কোণে চলছে খালি
খোঁজাখুঁজির জোড়াতালি
তুই এসে মোর সামনে দাঁড়া
হাত বুলিয়ে চোখের তারায়॥

আকান্ ব্রহ্মবাদ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম আফ্রিকায় গোল্ড-কোস্ট রাষ্ট্র, এখন ইংরেজদের অধীনস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দেশের অধিবাসিগণ শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আশা করিতেছে। দেশের পরিমাণ প্রায় ৯০,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। ভারতবর্ষের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। দেশের অধিবাসীরা কৃষ্ণকায় নিগ্রো বা আফ্রিকান জাতির। ইহারা দুইটী মূল বিভাগে পড়ে। উত্তর গোল্ড-কোস্টের অধিবাসীরা Moshi 'মোশি' জাতির নানা উপজাতির মানুষ, ইহারা Dagomba 'দাগোম্বা', Mamprussi 'মাম্প্রুস্সি', Wala 'ওআলা' প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত, এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ গোল্ড-কোস্টে বাস করে Akan 'আকান্' জাতির লোকেরা, ও উহাদের সহিত সংপৃক্ত Guang 'গুআঙ্' জাতির লোকেরা। আকান্ জাতি সংখ্যায় ১০ লক্ষেরও অধিক হইবে, এবং ইহাদের কতকগুলি উপজাতি আছে, যথা,—Asante (Ashanti) বা Twi (Chwi) 'আসান্তে' (আশান্তি) বা 'ত্বী' (চ্বী) এবং Fante 'ফান্তে'। গোল্ড-কোস্ট দেশে সমস্ত বিষয়েই ইহারা একটী প্রগতিশীল জাতি। গোল্ডকোস্ট-এর সর্বজনপ্রিয় নেতা, দেশের নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত Kwame Nkrumah কামে ঙ্ক্রুমা, যাঁহাকে Nehru of Gold-Coast 'গোল্ড-কোস্ট-এর নেহরু' বলা হয়, এই আকান জাতির ফান্তে শাখার লোক, ইঁহারই

নেতৃত্বে গোল্ড-কোস্ট এই বৎসরই ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইতেছে।

আকান্ জাতির লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টান-ধর্ম কিছুটা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রাচীন ধর্মমতের প্রতি আস্থাশীল লোকই বেশী। অর্থাৎ প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ইহারা ত্যাগ করে নাই। দেশে জাতীয়তা-বোধ এখন বিশেষ ভাবে কার্য্যকর, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁহারা (এমন কি যাঁহারা ইউরোপে গিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন ও যাঁহারা দুই পুরুষের খ্রীষ্টান), তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন আকান্ ধর্ম ও ধর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতির সহানুভূতিপূর্ণ আলোচনা দেখা যাইতেছে। আকান্ জাতির দুই জন বিদ্বান্ ভদ্রলোকের নাম এই সম্পর্কে করা যাইতে পারে। একজন হইতেছেন Dr. Joseph Kwame Kyeretwie Boakye Danquah ডাক্তার যোসেফ কামে চেরেত্বীএ বোআচে দান্‌কোয়া। ইনি ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, বৃত্তিতে ব্যারিষ্টার, বিদ্যার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে Ghana Congress Party-র নেতা, যে রাজনীতিক দল ডাক্তার ক্যামে ডক্রুমার দ্বারা পরিচালিত Convention Peoples Party-র বিরোধী। ডাক্তার দান্‌কোয়া ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা আকান্ জাতির পূর্ব ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর পূর্বে. গোল্ড-কোস্ট-এর বহু উত্তরে, Senegal 'সেনেগাল' ও Niger 'নাইগার' নদীদ্বয়ের মধ্যে, Ghana 'গানা' নামে একটী সমৃদ্ধিশালী আফ্রিকান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল—এই সাম্রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন পাওয়া গিয়াছে। দেড় হাজার এক হাজার বছর আগে, আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে, এই বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির লোকেরা তাহাদের রাজা ও পুরোহিতদের পরিচালনায় বিশেষ উচ্চস্তরের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। পরে দ্বাদশ শতকে উত্তরের মোরোক্কো হইতে, সাহারা মরু অতিক্রম করিয়া আগত আরব ও Berber 'বের্‌বের' বা মুর জাতীয় মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, গানা-রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইভাবে রাজ্য-ভঙ্গ হওয়ায় গানা জাতির লোকেদের অনেকে দক্ষিণের দিকে চলিয়া যায়, ও মধ্য গোল্ড-কোস্টে উপনিবিষ্ট হইয়া সেখানে 'আকান্' জাতিতে পরিণত হয়, ও ইহাদের ধর্ম ও সভ্যতা ক্রমে আকান্ সভ্যতা ও ধর্ম রূপে পরিবর্তিত হয়। 'গানা' শব্দের আধুনিক বিকারে 'আ-কান্' শব্দের উৎপত্তি।

রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, ডাক্তার দানকোয়া জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া গোল্ড-কোস্ট-এ সকলের নিকটে সম্মানিত। তাঁহার লেখা একখানি উপাদেয় বই আছে—The Akan Doctrine of God—a fragment of Gold Coast Ethics and Religion (Lutterworth Press, London 1944)। ইহাতে আকান জাতীয় পুরোহিত ও ধর্মনেতাদের বিচার অনুসারে পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই আফ্রিকান জাতির ধারণা এবং সামাজিক আদর্শবাদ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের সহিত আলোচিত হইয়াছে। Dr. K. A. Busia বুসিয়া, গোল্ড-কোস্ট-এর রাজধানী Accra আক্রার নিকটে Achimota আচিমোতা গ্রামে স্থাপিত গোল্ড-কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক, —ইনি হইতেছেন গোল্ড-কোস্ট-এর আর একজন তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি, স্থানীয় ধর্ম ও সমাজ লইয়া ইনি সার্থক গবেষণা করিতেছেন। আশান্তি জাতির সম্বন্ধে ইঁহার একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়াছি। (African Worlds—Studies in the Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples, Ed. by Professor Daryll Forde, International Africa Institute, Oxford University

Press, 1954, pp. 190-209)। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণকালে আক্রা নগরীতে ডাক্তার দানকোয়ার গৃহে আহূত হই, এবং কতকগুলি আফ্রিকান পণ্ডিত সজ্জনের সহিত তাঁহার গৃহে নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত হই। তখন ডাক্তার দানকোয়ার বই পড়ি নাই, তবে তাঁহার সঙ্গে আকান্ ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। ডাক্তার বুসিয়া ঐ সময়ে আমেরিকায় ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

ইংরেজ লেখক Captain R. S. Rattray র‍্যাট্রে, যিনি গোল্ড-কোস্ট-এ বহুকাল ধরিয়া সরকারী কর্মচারী ছিলেন, আশান্তি বা আকান জাতি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং আশান্তি সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি প্রামাণিক বই আছে।

আকান্ জাতি এক সর্বশক্তিমান্ বিশ্বের আদি-কারণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি আস্থা পোষণ করে। এই পরমেশ্বরের নাম ইহাদের ভাষায় Onyan-kopon 'ওঞান্‌কোপন্' অর্থাৎ 'একক অদ্বিতীয় বিরাট্ পুরুষ'। প্রত্যেক মানুষের এই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সান্নিধ্য-লাভের শক্তি ও অধিকার আছে। ইহার জন্য মধ্যস্থ-রূপে কোনও পুরোহিতের আবশ্যকতা নাই। এই ওঞান্‌কোপন্-এর পূজার জন্য পৃথক্ পুরোহিত শ্রেণী নাই, কিন্তু ওঞান্-কোপনের প্রতিভূ বা সগুণ প্রকাশ-স্বরূপ Obosom 'অবোসোম্' অর্থাৎ মূর্তিধারী অন্য দেবতার পূজায় পুরোহিতের আবশ্যকতা আছে। অন্য সমস্ত দেবতা ওঞান্‌কোপনেরই অংশ, এবং তাঁহার মুখপাত্র। আশান্তি ধর্মে বিভিন্ন দেবতা আছে। নানা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই হইতেছেন প্রধান, নদী ও সাগর ওঞান্‌কোপন-এর সন্তান। দেবতাদের সম্বন্ধে আকান্ জাতির ধারণা, অন্য ধর্মের লোকেরা তাহাদের অর্চিত বা সম্মানিত দেবতা, দেবদূত, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতির সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে, ঠিক তাহারই অনুরূপ। পূজা (নৈবেদ্য, সম্মাননা) দিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, পরিবর্তে জীবনে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি আনন্দ মিলে। দেবতারা তাঁহাদের পুরোহিতদের মাধ্যমেই ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, পুরোহিতদের উপর দেবতাদের 'ভর' হয়। সমগ্র বিশ্বজগৎ দেবতাময়—দেবতার মত এক অদৃশ্য শক্তি পাহাড়-পর্বত নদ-নদী সাগর-ভূমি গাছ-পালা পশু-পক্ষী সমস্তকেই আবিষ্ট করিয়া আছে। মনুসংহিতার উক্তি—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে তৃণ-গুল্মলতাদয়ঃ"—সেইরূপ ধারণা আকান্ জাতির মধ্যে প্রবল-ভাবেই বিদ্যমান। এই ধারণার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আকান্ ও অনুরূপ আফ্রিকান ধর্ম-মতের একটী ইউরোপীয় সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে Animism, অর্থাৎ 'ভূতাত্মবাদ'। 'অবোসোম্' বা সগুণ দেবতাদের মধ্যে Asase Yaa "আসাসে-য়াআ" বা পৃথিবীদেবীর সম্মাননা অতি উচ্চে। পৃথিবী আমাদের ধারণ করেন, ফলমূল শস্যাদি দ্বারা আমাদের পোষণ করেন। কিন্তু অন্য দেবতাদের মত পৃথিবীদেবী ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন না।

'অবোসোম্' বা দেবতাদের নীচেই asuman 'আসুমান্' অর্থাৎ দৈবীশক্তিযুক্ত বা জাদুগুণ-সম্পন্ন নানা জড়িবুটী, মালার দানা, উপলখণ্ড, ভেড়ার শিং বা লাউয়ের খোলের মধ্যে রাখা নানা তুকতাকের জিনিস। দিব্যগুণ বা শক্তিযুক্ত এই সব ছোট-খাট বস্তুকে পোর্তুগীসরা fetiçao 'ফেতিশাউ' (বা মানুষের হাতের কাজ) এই নাম দিয়াছিল। ইংরেজী শব্দ fetish অর্থাৎ 'তুকতাকের জিনিস', এই শব্দ থেকেই হইয়াছে, এবং তদনুসারে এই ধর্মকে, ইহার স্থূল বাহিরেকার দিকের অজ্ঞ লোকের দ্বারা বিচার অনুসারে এই জন্য আবার Fetishism বলা হয়। জাদুবিদ্যায়, এবং পাপময় অপদেবতার সাহায্যে মানুষের হানি করা প্রভৃতির সম্ভাবনায় ইহাদের বিশ্বাস অত্যন্ত অধিক। বনে জঙ্গলে নানা প্রকারের বামনাকার অপদেবতা বাস

করে, ইহাদের mmoatia বা ক্ষুদে' দেবতা বলে। Abayifo 'আবায়িফো' বা ডাইনীতে বিশ্বাস আছে। এক অরণ্যচারী রাক্ষসকে ইহারা মানে, তাহার নাম হইতেছে Sasabonsam 'সাসাবোন্‌সাম্'। এই অপদেবতাটীর চেহারার কল্পনা এইরূপ—সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম, লাল লাল ভাঁটা আকারের চোখ, লম্বা লম্বা পা, এবং পায়ের চেটো সামনে পিছনে দুই দিকেই চলে। খুব উঁচু কোন গাছের ডালে এই সাসাবোন্‌সাম্ পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, এব নিশ্চিন্ত পথচারী লোককে পা দিয়া ধরিয়া টানিয়া তুলে। কখনও কখনও এইসব অপদেবতা আবার দয়াও দেখায়,—বনের শিকারীরা ইহাদের অনুগ্রহ পাইয়া অনেক সময়ে রোগ দূর করিবার জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

আশান্তিদের ধারণা, মানুষের দৈহিক সমাবেশে সে পায় মায়ের কাছ থেকে রক্তমাংস বা দেহ-পিণ্ড (এদের পারিভাষিক শব্দ mogya মোজা), আর বাপের কাছ থেকে পায় আত্মা (ntoro 'স্তোরো')। পিতার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, মাতার সঙ্গে সে সম্বন্ধ নাই। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটাকে ইহারা গভীরতর মনে করে বা করিত। সামাজিক ব্যবস্থা matriarchal বা মাতৃনিষ্ঠ, patriarchal বা পিতৃনিষ্ঠ নহে। mogya 'মোজা' বা দেহপিণ্ড বা রক্তমাংস এবং ntoro স্তোরো বা আত্মা ব্যতীত, মানুষের মধ্যে আরও দুইটী বস্তু আছে; একটী হইতেছে sunsum 'সুন্‌সুম্' বা তাহার 'অহং-ভাব বা ব্যক্তিত্ব', আর একটী হইতেছে kra বা 'জীবনী শক্তি'। 'সুন্‌সুম্' বা ব্যক্তিত্ব চিরস্থায়ী নহে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিনাশ হয়। Kra 'ক্রা' হইতেছে ঈশ্বর-দত্ত; কিন্তু sunsum সুন্‌সুম্ বা ব্যক্তিত্ব, ntoro স্তোরো বা আত্মা, ক্রা-য়ের মত পিতা হইতেই লব্ধ জীবের আধ্যাত্মিক উপাদান। আশান্তি জাতির মধ্যে, আমাদের বিভিন্ন গোত্রের মত, বিভিন্ন শ্রেণীর 'স্তোরো' ধরিয়া মানব-সমাজ গঠিত হইয়াছে।

আশান্তি (আকান) ধর্মের একটী প্রধান দিক্ হইতেছে, পিতৃপুরুষের প্রতি সম্মাননা, তাঁহাদের পূজা। ইহাকে এক প্রকার আকান সমাজের ভিত্তি বলা যায়। আকান জাতির মানুষ যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহারা এই পিতৃপুরুষের পূজা, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে, সামাজিক একতা বা একাত্মভাব রক্ষা সম্বন্ধে আকান জাতির মনে যে গভীর আস্থা বিদ্যমান, সেগুলিকে সর্বত্র বর্জন করিতে পারে নাই। ইহা আকান ধর্মের আভ্যন্তর শক্তিরই পরিচায়ক। উপরে মানুষের জ্ঞানগোচরের অতীত, অব্যক্ত সর্ব-শক্তিমান পরমেশ্বর ওঞ্চান্‌কোপন্; পরে তাঁহারই বিরাট্ দেহের অংশ, মূর্ত নানা দেবতা; তাহার পরেই আসে পিতৃপুরুষ, শ্রাদ্ধের মত নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ সামাজিক-ভাবে ও ব্যক্তিগত-ভাবে পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলে, নহিলে তাহার সামাজিক মঙ্গল অসম্ভব। এই-সব পুরাতন বিচার বা বোধ ধর্মান্তরিত আকানের মনে-ও প্রবলভাবে বিদ্যমান। পুরাতন আকান ধর্ম নবাগত খ্রীষ্টীয় ধর্মকেও আপনার রঙ্গে রঙ্গাইয়া লইতেছে, যেমন অন্যত্র সমস্ত দেশেই হইয়াছে ও হইতেছে। ইস্‌লাম সম্বন্ধেও সেই কথা। ডাক্তার বুসিয়ার উক্তি প্রণিধানযোগ্য: The ceremonialism connected with ancestor-worship has made it a resilient force which Christianity has not assailed. Many Ashanti Christians join in *Adae* celebrations with their fellow country-men and share the sentiments that the ceremonials keep alive: a sense of tribal unity and continuity, and a sense of dependence upon the

ancestors. This aspect of Ashanti life has suffered little change from the impact of European civilisation. ......The Ashanti Christian most probably still accepts the view of the universe and of man that has dominated Ashanti thought for generations. It is a part of his cultural heritage...... The Ashanti concept of man has not changed either.....Moreover, Christian teaching has confirmed the Ashanti conception of the soul......On the social level, and in certain details of conduct, Christianity is influencing Ashanti society, but in matters like birth or funernal rites, where questions of the interpretation of the universe come in, the influence of Christianity is slight······ (পূর্বোল্লিখিত Dr. Daryll কর্তৃক সম্পাদিত পুস্তকের ২০৮ ও ২০৯ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার বুসিয়ার এই উক্তিগুলিও লক্ষণীয় (পৃষ্ঠা ২০৫): The Gods are treated with respect if they deliver the goods, and with contempt if they fail; it is the Supreme Being and the ancestors that are always treated with reverence and awe, a fact which an onlooker who has seen Ashanti chiefs or elders making offerings or pouring libations to the ancestors can hardly fail to observe. The Ashanti, like all other Akan tribes, esteem the Supreme Being and the ancestors far above gods and amulets. Attitudes to the latter depend upon their success, and vary from healthy respect to sneering contempt.

বুঝা যাইতেছে যে, আকান্ জাতির মধ্যে উচ্চ চিন্তার পরিচায়ক ঈশ্বর ও মানব বিষয়ে কতকগুলি ধারণা বা বিচার এতটা ব্যাপক-ভাবে ও গভীর-ভাবে স্থান করিয়া লইয়াছে যে, তাহা দূর করা কঠিন। ধর্মান্তরিত আকানের চিন্তাপ্রণালীতে, তাহাদের গৃহীত খ্রীষ্টান (ও সম্ভবতঃ ইসলাম) ধর্ম, আকান্ ধর্মের চিন্তা ও অনুষ্ঠানের রঙ্গে যে রঞ্জিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সহজ ভাবেই, বিনা প্রশ্নে, ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে, 'ভারত ধর্মে' জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে পূর্ণ আস্থা পোষণ করে, এমন হিন্দু-বংশজ বহু খ্রীষ্টান ও মুসলমান যেমন এ দেশে দেখা যায়। ডাক্তার দানকোয়ার বইয়ে আকান্ ধর্ম-চিন্তকদের মত অনুসারে, পরমেশ্বর সম্বন্ধে ও জীব-প্রকৃতি সম্বন্ধে উঁহাদের বিচারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরমেশ্বরের নানা নাম আকান্ ভাষায় প্রচলিত। এই-সব নামের বিশ্লেষণ করিলে, আকান্ ব্রহ্মবাদের যথেষ্ট দিগ্‌দর্শন লাভ করা যায়। আকান্ ভাষায় পরমেশ্বরের তিনটী মুখ্য নাম আছে—Onyame 'ওএ্যামে' যাহার অর্থ, সাধারণ ভাবে, 'পরমেশ্বর'; Onyankopon 'ওএ্যান্‌কোপন'—যিনি হইতেছেন মানুষের পূজার পাত্র ব্যক্তি-স্বরূপ পরমেশ্বর; এবং Odomankoma 'ওদোমান্‌কোমা'—অর্থাৎ বিশ্বরূপ অক্ষর অক্ষয় পরমেশ্বর, যিনি এক হইলেও বহু এবং তাঁহার বহু রূপ সর্বত্র দৃশ্যমান; অসীম, এবং ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান; অক্ষয় প্রাচুর্য্যের স্রষ্টা এবং দাতা। ওদোমান্‌কোমা সম্বন্ধে একটী গীত—

"ওদোমান্‌কোমা, তিনিই বস্তু (the Thing = the Universe—বিশ্ব-প্রপঞ্চ, সমগ্র-ভাবে প্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়াছেন। তক্ষণকারী বিধাতা,

তিনিই বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ঋত (Esen =Order—পরিপাটী, নিয়মানুবর্তিতা, সব কিছুর আভ্যন্তর ধর্ম); তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন জ্ঞান, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু, এবং মৃত্যুর সারাৎসার।"

অন্য কয়েকটী নাম—Brekyirihunuade (ব্রেচিরিহুয়াদে)—অর্থাৎ 'যিনি সামনে অথবা পিছনে অবস্থিত সব কিছুই দেখেন ও জানেন—সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ'; Abommubuwafre (আবোম্মুবু-ওআফ্রে)—অর্থাৎ 'যাহার নিকট আমাদের দুঃখ বেদনার কথা জানাই—বিপদ্‌বারণ'; Nyaamanekose (ঞাআমানেকোসে)—'আপদ্‌-বিপদ্ আসিলে যাঁহার কাছে সান্ত্বনা চাই'; Tetekwaframua (তেতেকাফ্রামুআ)—'যুগাদি-কাল হইতে যিনি বিদ্যমান'; Oboadee (ওবোআদেএ)—'যিনি বিশ্ববস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতির স্রষ্টা'; Opanyin (ওপাঞিন্)—'প্রভু, রাজা'; Nana (নানা)—'আদি-পুরুষ'; ইত্যাদি।

পরমেশ্বরের নাম লইয়া ইহাদের মধ্যে নানা প্রবাদ আছে, সেগুলি সকলেই সময়মত প্রয়োগ করিয়া থাকে। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, ইহাদের দার্শনিক বিচার বা সমীক্ষা, আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের সূত্রের মত, প্রবাদের আকারেই বা প্রবাদের মাধ্যমেই রক্ষিত এবং পরম্পরা ধরিয়া সুরক্ষিত হইয়া-ই আছে। এইরূপ দুই-চারিটি প্রবাদ, অথবা প্রবাদের আকারে ধর্ম-চিন্তার সূত্র:

(১) সব মানুষই ওঞামের সন্তান (অর্থাৎ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ')—কেহই ভূমির পুত্র নহে।

(২) বাজ-পাখী বলে—যাহা-কিছু ওঞামে করিয়াছেন সবই ভাল।

(৩) পৃথিবী বিপুলা, রাজা কিন্তু ওঞামে।

(৪) ওঞামে যে নিয়ম (Order, ঋত) বাঁধিয়া দিয়াছেন, কোনও জীবিত মানব তাহার পরিবর্তন করিতে পারে না।

(৫) সকলে মিলিয়া যদি ওঞান্‌কোপন-এর সঙ্গে দুঃখ পাই, ব্যক্তিগত ভাবে কেহই তাহা হইলে দুঃখ পায় না।

(৬) আকাশের দিকে তাকাই, তবুও ওঞান্‌কোপন্‌কে দেখিতে পাই না; মাটিতে মুখ রগড়াইলে কি হইবে?

(৭) তোমার সুরাপাত্র আর কেহ ফেলিয়া দিক্, কি ক্ষতি? পরমেশ্বর আবার তাহা পূরণ করিয়া দিবেন।

(৮) ঈশ্বর তোমায় না মারিলে, জীবিত মানুষ আসিয়া তোমাকে মারুক, তুমি বিনষ্ট হইবে না।

(৯) যদি পরমেশ্বরের দাস হইতে চাও, কোনও শর্ত করিও না।

(১০) ওদোমান্‌কোমা ধনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, দরিদ্রকেও সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) ওদোমান্‌কোমা-ই মৃত্যুকেও বিষ পান করাইয়াছিলেন, আর কেহ নহেন

ডাক্তার দানকোয়ার মতে, আকান্ চিন্তা অনুসারে পৃথিবী বা বিশ্ব-প্রপঞ্চের অভ্যন্তরেই ঈশ্বর বিরাজমান;—পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ভারতের কথায় যেমন, "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে"—বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত প্রভু বা ঈশ্বর নহেন: The Deity does not stand over against His own creation, but is involved in it. He is "of" it. খ্রীষ্টান মতানুসারে, পৃথক্ পাপ-পুরুষ শয়তানের অবস্থান, যেন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার বিরোধী ব্যাপার। আকান মতে, Nana, the principle that makes for good, is himself or itself (এখানে নির্গুণ ব্রহ্মের উপযুক্ত নপুংসক লিঙ্গের প্রয়োগ লক্ষণীয়) participator in the life of the whole, and is not only head, but because it is head (অর্থাৎ রাজা বা শাসক মূর্তিতে),

has to strive and struggle for the place of leader as the individuals of the group do, then physical pain and evil are revealed as natural forces which the Nana, in common with the others of the group, have to master, dominate, sublimate or eliminate...The being of Nyankopon, in the ideal the pursuit of which man hopes to be good, is revealed in its greatest perfection where all evil progressively mastered. The revelation may be slow, delayed, thwarted and obstructed by man's own ignorance, or sheer unwillingness to see the light where it shines most, but until that revelation is complete, evil will continue, not as apart from life, but as apart from life, but as part of life, a condition which makes it all the more necessary to have a complete knowledge of Nyankopcn, for it is only in knowing him fully that evil is elimintated from the *Sunsum* and *Okara* (the soul) becomes complete master of his Destiny. (ডাক্তার দান্‌কোয়ার পুস্তক, পৃঃ ৮৮-৮৯)। এখানে বেদান্তের মত জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেওয়া লক্ষণীয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানবের মনে আমাদেরই মত শাশ্বত সত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিয়াছিল; এবং এই কৃষ্ণকায়, তথাকথিত অনুন্নত মানব যে বিচার ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমগ্র সভ্য জগতের কাছে আদরের সহিত আলোচনার বিষয়। ডাক্তার দানকোয়া আরও নানা খুঁটিনাটি কথার আলোচনা করিয়াছেন—যেমন আকান ধর্মনীতি, মানবের নৈতিক প্রগতি, মানবজাতির সামূহিক প্রগতি। সত্য বা সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে, জাতি ও মানব সম্বন্ধে, আদর্শ পুরুষ সম্বন্ধে আকান জাতির ধারণা, ইত্যাদি কতকগুলি গভীর বিষয়ে তিনি তাঁহার জাতির জ্ঞানী পুরুষদের বিচার বলিয়া যাহা ধরিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কতদূর পর্য্যন্ত এই-সমস্ত বিচার সত্য-সত্যই আকান জাতির, আর কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের—এ বিষয়ে হয় তো প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু তিনি ইউরোপীয় বিদ্যায়—দর্শন, ইতিহাস, ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতিতে—বিশেষ পণ্ডিত হইলেও, নিজে জাতিতে আকান তো বটে; সুতরাং টীকাকার বা ব্যাখ্যাকার-রূপে তিনি যাহা বলিতেছেন, বা বলিতে চাহেন, তাহাও প্রাচীন আকান মতবাদের আধারেই পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে এই আলোচনা প্রসঙ্গে একটী কথাই প্রমাণিত হইতেছে—বিভিন্ন চিন্তার ধারা প্রায়-ই এক-ই পথ ধরিয়া চলে, এবং এক-ই লক্ষ্যে গিয়া পঁহুছায়; এবং সমস্ত মতবাদের ভিতরে এক-ই মূল-সূত্র কাজ করিতেছে, সেই মূল-সূত্র হইতেছে—ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের জন্য অথবা শাশ্বত বস্তুর জন্য আকুল আগ্রহ সব দেশের সব যুগের সব জাতির মানুষকেই এক করিয়া দিয়াছে॥

"চলিয়াছি সেই আশা নিয়া"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আকাশের নীল আর শুভ্র চাঁদখানি,
সুন্দর দখিনা বায়, গন্ধময় ফুল—
আত্মপরিজনগণ প্রেম আর স্নেহ যত্ন দানি
ভুলায়ে রেখেছে মোরে।

বলিয়াছি কত—"ওগো, ভেঙ্গে দাও ভুল
জোয়ারের টানে নিয়ে যেয়ো না আমারে--
হে পৃথিবী, নিবেদি তোমারে।

এই পৃথিবীর মায়া সহস্র বন্ধন দিয়া
বাঁধিয়াছে মোরে—
কে আমি, কোথায় ছিনু, কে আমারে দিল পাঠাইয়া
তার কথা ভাবিবার তরে
পৃথিবী একটু ছুটি দিল না আমায়।
দিন রাত্রি কাজ—কাজ, ভুলে আমি আপনারে যাই
বিঘ্ন কে জড়ায় পায় পায়—
মিথ্যা জানি এ পৃথিবী, তবু কেন ইহারেই চাই?

করি আত্মপ্রবঞ্চনা, নিজেরে ভুলাই মিথ্যা দিয়া,
সত্যকে চাহিনি পেতে, মিথ্যা নিয়ে দিবস কাটাই
ভুলেও ভাবিনি আমি আসিবার কালে
আসিনু কি নিয়া?
আজ আমি কাহারে সুধাই—
কহ কে দিবে উত্তর
তারপর?

যৌবন আসিল কবে—
আবার কখন গেল চলে,
আমার সকল স্বপ্ন, আশা ও ভরসা
দুই পায়ে দলে?
আজ বড় ক্লান্ত আমি, আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি শুধু
কহ কোথা মিলিবে আশ্রয়?
আজ আসিয়াছে ক্ষণ শ্রান্তি ক্লান্তি বহি,
চাহি বরাভয়—
মনে হয় নাই রে সময়।

কে ডাকিয়া বলে যায়—"মিথ্যা আশা,
মিথ্যে ভালবাসা
ওরে মূর্খ, কি লইয়া আছিস ভুলিয়া?
আজ ভাব—কি যে এলি নিয়া
যাওয়ার সময় এলো
মিছে তোর বাঁধা আর বাসা।
রিক্ত এ পৃথিবী আজ; আকাশের নীল
আলোময় চাঁদ আর তারা,
ফুলসাজি, হাসি গান মিথ্যে হয়ে গেছে
আপনারে চেয়ে দেখি রিক্ত আমি,—আমি সর্বহারা।

আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরি, পেতে চাই একটু সান্ত্বনা;
কি চাহিয়া কি পেয়েছি পড়ে না তো মনে;
হারানো সত্যেরে খুঁজি,—
দেখা তার আজও মিলিল না।
হয়তো পাব সে সত্যে, চলিতে চলিতে
জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়া;
চলিয়াছি সেই আশা নিয়া।

"জগতের মধ্যে যারা সেরা ও পরমসাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি। * * * আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখযন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশী যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

(১।১১।১৮৯৯ তারিখের একটি পত্র হইতে)

কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের তাৎপর্য

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি

কালিদাসের উপমার কথা প্রসিদ্ধির ভিতর দিয়া এখন প্রায় জনপ্রবাদে পর্যবসিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার পরিধি অতিক্রম করিয়া এখন সালঙ্কার-বাক্‌চাতুর্যের প্রসঙ্গেও কথাটি শিথিল ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। কালিদাসের উপমার কথা আমরা যখন বলি তখন আমরা শুধু মাত্র তাঁহার উপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কথাই বলি না, তাঁহার অনুকরণীয় সালঙ্কার একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গির কথাই বলি। সুতরাং কালিদাস সম্বন্ধে উপমা কথাটির বাচ্য সর্ববিধ অলঙ্কার। সর্ববিধ অলঙ্কার অর্থে উপমা কথাটির ব্যবহার নিতান্ত অযৌক্তিক বা অসার্থক নয়; উপমাই সর্বপ্রকার অর্থালঙ্কারের মূলীভূত অলঙ্কার। আমরা একটু বিশ্লেষণ এবং বিচার করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, কোনও জাতীয় সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যই হইল উপমা-অলঙ্কারের মূল—অন্যান্য সকল অলঙ্কারের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই এই সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যের বিবিধ এবং বিচিত্র প্রয়োগ—হয় অন্যর্থকরূপে না হয় নঙর্থকরূপে। বিরোধ বা বৈসাদৃশ্যও সাদৃশ্য এবং সাধর্ম্যেরই অপরদিক মাত্র।

উপমা-অলঙ্কারের এই যে বহু-অলঙ্কারমূলত্ব এ-বিষয়ে প্রাচীন অলঙ্কারিকগণই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অপ্যয় দীক্ষিত তাঁহার 'চিত্রমীমাংসা' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥

অর্থাৎ—উপমা হইল একমাত্র নটী—যে বিচিত্র-ভূমিকা-ভেদ লাভ করিয়া কাব্যরূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে এবং কাব্যবিদ্‌গণের চিত্ত রঞ্জন করে।

আমরা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, কথাটি খুব গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। কাব্যের ভিতরে কাব্যরসিকগণের চিত্ত রঞ্জন করিবার জন্য যত প্রকারের কলাকৌশল তাহা মূলে ঐ একা উপমা-রূপিণী নটীরই বিচিত্র লীলাবিলাস। অপ্যয় দীক্ষিত তাঁহার নিজের কথার স্পষ্ট প্রমাণ করিবার জন্য একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া সব কথাটি বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

চন্দ্র ইব মুখমিতি সাদৃশ্যবর্ণনং তাবদুপমা। সৈবোক্তিভেদেনানেকালঙ্কারভাবং ভজতে। তথাহি। চন্দ্র ইব মুখং মুখমিব চন্দ্র ইত্যুপমেয়োপমা। মুখং মুখমিবেত্যনন্বয়ঃ। মুখমিব চন্দ্র ইতি প্রতীপম্। চন্দ্রং দৃষ্ট্বা মুখং স্মরামীতি স্মরণম্। মুখমেব চন্দ্র ইতি রূপকম্। মুখচন্দ্রেন তাপ শাম্যতীতি পরিণামঃ। কিমিদং মুখমুতাহো চন্দ্র ইতি সন্দেহঃ। চন্দ্র ইতি চকোরাস্তন্মুখমনুধাবন্তীতি ভ্রান্তিমান্। চন্দ্র ইতি চকোরাঃ কমলমিতি চঞ্চরীকাস্তন্মুখে রজ্যন্তীত্যুল্লেখঃ। চন্দ্রোঽয়ং ন মুখমিত্যপহ্নবঃ। নূনং চন্দ্র ইত্যুৎপ্রেক্ষা। চন্দ্রোঽয়মিত্যতিশয়োক্তিঃ। মুখেন চন্দ্রকমলে নির্জিতে ইতি তুল্যযোগিতা। নিশি চন্দ্রস্তন্মুখং চ হৃষ্যতীতি দীপকম্। ত্বন্মুখমেবাহং রজামি চন্দ্র এব চকোরো রজ্যত ইতি প্রতিবস্তূপমা। দিবি চন্দ্রো ভুবি তন্মুখমিতি দৃষ্টান্তঃ। মুখং চন্দ্রশ্রিয়ং বিভর্তীতি নিদর্শনা। নিষ্কলঙ্কং মুখং চন্দ্রাদতিরিচ্যতে ইতি ব্যতিরেকঃ। ত্বন্মুখেন সমং চন্দ্রো নিশাসু হৃষ্যতীতি সহোক্তিঃ। মুখং নেত্রাঙ্করুচিরং স্মিতজ্যোৎস্নোপশোভিতমিতি সমাসোক্তিঃ। অব্জেন সদৃশং বক্ত্রং হরিণাহিতশক্তিনা ইতি শ্লেষঃ। মুখস্য পুরতশ্চন্দ্রো নিষ্প্রভ ইত্যপ্রস্তুত প্রশংসা। এবমুক্তানেকালঙ্কারবিবর্তবতীয়মুপমা।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, 'চন্দ্রের মত মুখ' এই কথা বলিলে চন্দ্র এবং মুখের মধ্যে সৌন্দর্য ও

মাধুর্যের যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার বর্ণনে উপমা অলঙ্কার হইল। 'চন্দ্রের মত মুখ' এই কথাটিকেই বলিবার বিচিত্রভঙ্গিভেদে উপমা স্থলে অন্যান্য নানারূপ অলঙ্কার সম্ভব হইয়া উঠে। যেমন—যদি বলা যায়, 'চন্দ্রের মত মুখ, মুখের মত চন্দ্র' তাহা হইলে পূর্ববাক্যের উপমান (চন্দ্র) এবং উপমেয় মুখ পরবাক্যে বিপরীতভাবে বর্ণিত হইল বলিয়া এখানে 'উপমেয়োপমা' হইল। 'মুখ মুখের ন্যায়' এরূপ বলিলে একই বস্তুতে উপমান ও উপমেয় উভয় ধর্ম পর্যবসিত হইল বলিয়া 'অনন্বয়োপমা' হইল। যদি বলা যায়, 'মুখের মত চন্দ্র' তাহা হইলে প্রসিদ্ধ উপমান চন্দ্রকে উপমেয় (মুখ) রূপে নির্দেশ করাতে 'প্রতীপ' অলঙ্কার হইল। 'চন্দ্রকে দেখিয়া মুখকে স্মরণ করিতেছি' এরূপ করিয়া বলিলে 'স্মরণ' অলঙ্কার হইল। 'মুখই চন্দ্র' এইরূপ বলিলে উপমান উপমেয়ের অভেদ-সিদ্ধান্তহেতু 'রূপক' হইল। 'মুখচন্দ্রের দ্বারা তাপের উপশম হইতেছে' এরূপ বলিলে 'পরিণাম' অলঙ্কার হইল। 'ইহা কি মুখ না চন্দ্র ?'—এরূপক্ষেত্রে 'সন্দেহ' অলঙ্কার। 'চন্দ্র মনে করিয়া চকোরগণ তাহার মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে'—এরূপ ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার। 'চন্দ্র মনে করিয়া চকোরগণ এবং কমল মনে করিয়া অলিসমূহ তাহার মুখের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইতেছে'—এরূপক্ষেত্রে উল্লেখ অলঙ্কার হইল। 'ইহা চন্দ্র, মুখ নয়'—এক্ষেত্রে 'অপহ্নুতি'। 'যেন চন্দ্র'—এখানে 'উৎপ্রেক্ষা'। 'ঐ যে একটি চন্দ্র'—এক্ষেত্রে উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দেশ করাতে 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার হইল। 'মুখ দ্বারা চন্দ্র ও কমল উভয়ই নির্জিত হইল'—এখানে 'তুল্যযোগিতা'। 'রাত্রিতে চন্দ্র এবং তোমার মুখ হর্ষযুক্ত হয়'—এখানে 'দীপক'। 'তোমার মুখই—এই বলিয়া আমি আনন্দিত হই—আর চন্দ্রই—এই বলিয়া চকোর আনন্দিত হয়'—এখানে 'প্রতিবস্তূপমা' অলঙ্কার হইল। 'আকাশে চন্দ্র, পৃথিবীতে তোমার মুখ'—এখানে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার। 'মুখ চন্দ্রশ্রী ধারণ করিতেছে'—এখানে নিদর্শনা। 'নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্র হইতেও অধিক হইয়া উঠিয়াছে',—এখানে 'ব্যতিরেক'। 'তোমার মুখের সহিত চন্দ্র সমভাবে রাত্রিতে আমাকে হর্ষদান করে'—এখানে 'সহোক্তি'। 'নেত্রাঙ্করুচির মুখ স্মিতজ্যোৎস্নায় উপশোভিত'; চন্দ্রই এখানে মুখ, চন্দ্রের অন্তর্গত কালো চিহ্নসমূহ যেন নেত্রাঙ্ক, জ্যোৎস্না যেন স্মিত হাস্যচ্ছটা; এখানে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার হইল। 'অব্জেন সদৃশং বক্ত্রং হরিণাহিতশক্তিনা' বাক্যটিতে 'অব্জ' শব্দের অর্থ চন্দ্রও করা যায় (অপ্ হইতে জাত অর্থাৎ সমুদ্র হইতে জাত), কমলও করা যায়; 'হরিণাহিতশক্তিনা' শব্দের অন্বয় হরিণ+আহিত+শক্তিনা, অথবা হরিণা (হরি কর্তৃক বা চন্দ্রকর কর্তৃক) উভয় রূপেই করা যায়; সুতরাং এখানে শ্লেষ অলঙ্কার হইল। 'মুখের সামনে চন্দ্র নিষ্প্রভ'—এখানে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হইল।

এখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, এক মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাইশটি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল; এই বাইশটি অলঙ্কারের মূলে যে রহিয়াছে শুধুমাত্র মুখ এবং চন্দ্রের ভিতরকার সাদৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া একটি তুলনা—অর্থাৎ একটি উপমা-অলঙ্কার এ বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নাই। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, অপ্পয় দীক্ষিত এই বাইশটি অলঙ্কারকে বলিয়াছেন উপমারই বিবর্তমাত্র। এখানে উপমার 'বিবর্ত' কথাটি বলিবার তাৎপর্য এই যে, মূলে সবই উপমা—উক্তিভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, কালিদাসের উপমার বিচার-বিশ্লেষণ বা আস্বাদনে অর্থ কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শুধুমাত্র কালিদাসের উপমাগুলির বিচার বিশ্লেষণ

বা আস্বাদন নয়; আসলে ইহা কালিদাসের ব্যবহৃত সকল অলঙ্কারেরই বিচার বিশ্লেষণ এবং আস্বাদন। এই কাজ করিতে হইলে আমাদের আরও একটি জিনিস সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণার প্রয়োজন, তাহা হইল সংস্কৃত-সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে 'অলঙ্কার' কথাটির তাৎপর্য। এই অলঙ্কার কথাটি সংস্কৃতসাহিত্য-সমালোচকগণ কর্তৃক দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; একটি হইল ভাসা-ভাসা অর্থ, অপরটি হইল একটি গভীর অর্থ। ভাসা-ভাসা অর্থে অলঙ্কার কথাটিকে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও মূল্যের মানেই ব্যবহৃত হইতে দেখি। একটি সুপুরুষের যেমন একটি শরীর রহিয়াছে, সেই শরীরের ভিতরে আত্মা রহিয়াছে, শৌর্যবীর্য রহিয়াছে, কাণত্বাদির ন্যায় যেমন কিছু কিছু দোষও থাকিতে পারে, তাহার যেমন অবয়ব সংস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে,—তেমনই এই সকলের সহিত তাহার বিবিধ ভূষণও থাকিতে পারে যাহা তাহার শোভাকে বর্ধিত করিয়া দেয়। শব্দার্থের শরীর এবং রসের আত্মা লইয়া যে কাব্য-পুরুষ অলঙ্কার তাহার ভূষণ। অলঙ্কার সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি ধারণা-পোষণ করিয়াই বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-দর্পণে' অলঙ্কারের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ।' অলঙ্কার সম্বন্ধে এই মতবাদ কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে অলঙ্কারের স্থান অনেকখানি গৌণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভাল, না হইলেও যে কাব্য অচল এমন কথা বলা চলে না।

কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাও অলঙ্কার কথাটিকে একটি গভীর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অলঙ্কার শব্দের সেই গভীর অর্থকে অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত কাব্য-সমালোচন-শাস্ত্র অলঙ্কার-শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ব্যাপক এবং গভীর অর্থে অলঙ্কার শব্দের লক্ষ্য হইল মানুষের চিত্তের অনির্বচনীয় রসানুভূতিসমূহকে পরচিত্তে সংক্রামিত করিয়া দিবার সমগ্র কৌশলটি। আমাদের জীবনের রসানুভূতিগুলি শুধু যে সূক্ষ্ম, সুকুমার এবং অনন্তবৈচিত্র্যশীল তাহা নহে, হৃদয়ের গহনে বহুস্থলেই তাহা অনির্বচনীয় চিৎ-স্পন্দন; এই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল আমাদের সকল সাহিত্যচেষ্টা—এমনকি সকল শিল্পচেষ্টা। সাধারণ বচনের দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলিয়াই আমাদের রসোদ্দীপ্ত বা রসাপ্লুত চিৎ-স্পন্দন অনির্বচনীয়; সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাই প্রয়োজন অসাধারণ ভাষার। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে, ভাষা শব্দেরও তাৎপর্য হইল চিৎ-স্পন্দনের বহিঃপ্রকাশ-বাহনত্ব। আমাদের অনুভূতির একটি বিশেষ ধর্ম এবং, স্বরূপধর্মই হইল এই, তাহাকে জানাইতে হয়,—পরের কাছে জানাইতে হয়, না হয় অন্ততঃ নিজের কাছেও জানাইতে হয়—এই জানানোর কাজেই যেন অনুভূতির পরিপূর্ণতা। এই অনুভূতির প্রকাশই হইল ভাষা-সৃষ্টির মূল-কারণ, অথবা এ-কথা বলা যাইতে পারে যে ভাষা সাধারণতঃ অনুভূতিরই প্রকাশমাননতা—চিৎ-স্পন্দনের শব্দ-প্রতীক। আজিকার যুগে এ-কথা কেহই মনে করে না যে, জগতে আমরা যে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি, তাহারা চারিপাশের বায়ুমণ্ডলের ভিতরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, মানুষ তাহার প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে বাছিয়া লইয়াছে। মানুষ সেই আদিম যুগ হইতে নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য নিত্যই ভাষা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পশুপক্ষীর ন্যায় মানুষও হয়ত কোনদিন শুধুমাত্র ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই নিজের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিত; অন্তরের ভাবের ভিতরে যত আসিতে লাগিল সূক্ষ্মতা, জটিলতা এবং গভীরতা—ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য

এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের মধ্যেও আসিতে লাগিল ততই সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও গভীরতা, ক্রমেই সৃষ্টি হইতে লাগিল সুসমৃদ্ধ বিশেষ বিশেষ ভাষার। কোনও কোনও বৈয়াকরণ মনে করেন যে আদিতে ভাষ্‌ ধাতু (কথা বলা) ভাস্‌ ধাতুর (প্রকাশ পাওয়া) সহিতই যুক্ত ছিল।

কিন্তু একজন কবিকে এই ভাষার ভিতর দিয়া যে অন্তর্লোকের পরিচয় দিতে হয় তাহা তাঁহার একটি বিশেষ অন্তর্লোক,—এই অন্তর্লোকের স্পন্দন সর্বসাধারণের হৃৎ-স্পন্দন হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র,—সাধারণ ভাষার ভিতরে তাই তাহাকে বহন করিবারও শক্তি থাকে না। কবির সেই বিশেষ হৃৎ-স্পন্দন তখন তাই গড়িয়া লয় তাহার বাহন একটি বিশেষ ভাষাকে,—সেই 'বিশেষ' ভাষাকেই আমরা নাম দিয়াছি 'সালঙ্কার' ভাষা। আমরা কবির কাব্যের যে সকল ধর্মকে সাধারণতঃ অলঙ্কার নাম দিয়া থাকি, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, সেই অলঙ্কার কবির সেই বিশেষ ভাষারই ধর্ম। কবির কাব্যানুভূতি ঐরূপ চিত্র, ঐরূপ বর্ণ, ঐরূপ ঝঙ্কার লইয়াই বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে। যেখানেই কবির বিশেষ কাব্য-রসানুভূতি বাহিরে এই বিশেষ ভাষার ভিতরে মূর্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, সেইখানেই আর সত্যকার কাব্য রচনা হইতে পারে নাই।

রস-সমাহিত চিত্তের এই স্পন্দনকে প্রকাশ করিবার জন্য কবির যে এই 'বিশেষ' বা অসাধারণ ভাষা তাহার পরিচয় বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচক বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভামহ ইহাকে বলিয়াছেন বক্রোক্তি—'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'। ভামহের আলোচনা পড়িলে বেশ বোঝা যায়,—এই বক্রোক্তি বলিতে তিনি সোজা ভাবে কথা না বলিয়া তাহাকে খানিকটা ঘুরাইয়া বাঁকাভাবে কথা বলিবার চাতুর্যকে মনে করেন নাই,—বক্রোক্তির এখানে অর্থ হইল, কাব্যোচিত বিশেষোক্তি। অলঙ্কারাদি এই বিশেষোক্তিরই পর্যায় মাত্র। ভামহই আরও একটি সূক্ষ্ম কথার ইঙ্গিত করিলেন, তাহা হইল এই যে 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'—শব্দ ও অর্থের যে সহিতত্বই হইল কাব্যত্ব। এখানকার এই 'সহিত' কথাটি হইতে কাব্যের পরিবর্তে ব্যাপকার্থে সাহিত্য কথাটির ব্যবহার পরবর্তীকালে দেখিতে পাই। এখানে 'সহিত' শব্দের তাৎপর্য কি? ভাবগূঢ় অর্থের মধ্যে যে সম্ভাবনা ও শক্তি নিহিত আছে তাহা যদি শব্দশক্তি দ্বারা যথাযথভাবে প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হইয়া থাকে তবেই বলা যাইতে পারে যে শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব সাধিত হইয়াছে। অর্থশক্তি সম্পূর্ণরূপে যদি শব্দশক্তির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হইয়া 'চিৎ' যদি অনুরূপ 'তনু' লাভ না করিল তবে উভয়ের অ-সাহিত্যে কাব্যত্বেরই অসদ্‌ভাব ঘটিল।

এই প্রসঙ্গে ভামহ আরও একটি সূক্ষ্ম কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কাব্যোক্তি সর্বক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি। কথাটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে শিল্পকৃতি মাত্রই হইল 'বাড়াইয়া বলা'। সর্ববিধ শিল্পের প্রধান কাজই হইল একজনের ভাবকে সর্বজনের করিয়া তোলা, মুহূর্তের ভাবকে সর্বকালের করিয়া তোলা। অনেকখানি না বাড়াইয়া তুলিয়া আমরা তাহা কখনই করিতে পারি না। তাহা ছাড়া, শিল্পীর নিজের নিকটে যে রসানুভূতি প্রত্যক্ষ, পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের নিকট তাহা পরোক্ষ; তাই চিদ্‌গত রসানুভূতিকে প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়া অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিতে না পারিলে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক রসের সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে

তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

"সত্য রক্ষণপূর্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে; কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।"

এই বড় করিয়া বলিবার প্রয়োজন শুধু মাত্র প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষতার জন্য নহে; শিল্পে আমাকে নিরবধি-কাল ও বিপুলা পৃথ্বীকে যে কয়েকটি মুহূর্ত এবং স্বল্প আয়তনের ভিতরে বিধৃত করিতে হইবে। দেশ-দেশ-ব্যাপ্ত একটি সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসি-অশ্রুভরা বহুজীবনের জীবন-মহিমাকে আমাকে এক প্রহরে অভিনীত একখানি নাটকের ভিতরে প্রকাশ করিতে হইবে; কলাকৃতি দ্বারা তাই একটি রঙ্গমঞ্চের পরিধিকে বাড়াইয়া বিপুলা পৃথ্বীর প্রতিভূ করিয়া তুলিতে হইবে, এক প্রহর কালকে শুধু বহুবর্ষের নয়—নিরবধি কালেরই প্রতিভূ করিয়া তুলিতে হইবে। একজন অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যই বা কি? অনেক যুগের অনেক দেশের অনেক কথাকে নির্দিষ্ট দেশ-কালের সীমার মধ্যেই যতখানি সম্ভব আভাসিত করিয়া তোলা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমরা কথায় যে সুর লাগাই তাহা সীমাবদ্ধ এতটুকু কথাকে সীমাহীন ব্যাপ্তি এবং অতল রহস্যমহিমা দান করিবার জন্যই। অনন্ত দিগ্বলয়বিস্তৃত উদয়াচলে নিত্যকালের সূর্যোদয়ের মহিমাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয় একটি শিল্পীকে এক টুকরা কাগজের উপরে—কয়েকটি রেখা এবং কিছু রঙের সাহায্যেই; সেই রঙ-রেখার মধ্যে আনিতে হয় তাই ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে আভাসিত করিবার শক্তি—তাহাই ত যথার্থ চিত্রকলা।

আমার মনে হয় ভামহের 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ' কথার মধ্যে এবং বক্রোক্তিকে অতিশয়োক্তি বলিয়া বর্ণনা করিবার ভিতরে শিল্পক্ষেত্রে এই বড় করিয়া বলিবার আভাস রহিয়াছে। শিল্পের ভাষাকে পাশ্চাত্যেও তাই বলা হইয়াছে 'The hightened language'। ভামহের মতে অলঙ্কার প্রভৃতি আসলে আর কিছুই নয়—কাব্যার্থকে যথাসম্ভব 'অতিশয়' বা বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা। অতিশয়োক্তিকেই তাই ভামহ সর্বপ্রকার অলঙ্কারের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলঙ্কারিক দণ্ডীর মধ্যেও ভামহের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাহার মতেও প্রায় সমস্ত অলঙ্কারের কাজই লইল অর্থকে অনেকখানি বাড়াইয়া দেওয়া এবং সেইজন্যই তিনি করেন, সমস্ত অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তির বীজ নিহিত আছে। পরবর্তী কালে 'কাব্য-প্রকাশ'কার মম্মটভট্টও অতিশয়োক্তিকে সমস্ত অলঙ্কারের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ভামহ-কথিত এই 'বক্রোক্তি' কথাটিকে নানা ভাবে বিস্তার করিয়া পরবর্তী কালে (দশম বা একাদশ শতাব্দীতে) রাজানক কুন্তক তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তি-কাব্য-জীবিত' বাদ, অর্থাৎ বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভেই কুন্তক বলিয়াছেন,—সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ ত্রিভুবনের ভাব-সকলকে যথাতত্ত্ব বিবেচনা করিবার চেষ্টা করেন; অর্থাৎ ভাব যে-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে-রূপের সহিত সে প্রায় অন্বয়যোগে যুক্ত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া তত্ত্বমাত্ররূপে তাঁহারা ভাবকে বিবেচনা করিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এ চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ চেষ্টা; কারণ এ চেষ্টা দ্বারা আমরা ভাবকে যে তত্ত্বমাত্রে

লাভ করি তাহার ভিতরে ভাবের বিস্ময়কর রহস্য অনেকখানিই হয়ত আমরা হারাইয়া ফেলি। কিংশুকপুষ্পকে তাহার সকল রূপকে বাদ দিয়া যদি কেবল রক্তমাত্র করিয়া গ্রহণ করা যায়, ভাবকেও শুধু যথাতত্ত্বে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলেও সেইরূপ হইবে। এই চেষ্টা দ্বারা মানুষ স্ব স্ব মনীষাবলেই ভাবসমূহের কতগুলি তত্ত্ব যথারুচি আবিষ্কার করিয়া লয়; এই জাতীয় যথাস্মিত তত্ত্ব দর্শনের ফলে জ্ঞানদার্ঢ্যই প্রকাশিত হয়, ভাবের পরমার্থ বা যথার্থ স্বরূপ হয়ত ইহাতে লাভ হয় না; পরমার্থ হয়ত আমরা এইরূপে যেমন করিয়া কল্পনা করি মোটেই তাদৃশ নয়। সুতরাং ভাবের এই জাতীয় স্বতন্ত্র তত্ত্ব—অর্থাৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়া—রূপের ভিতর দিয়া তাহার যে প্রকাশময় সত্তা তাহাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া ভাবের একটি 'অসঙ্গ' 'কেবল' তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা ভুল। এই জন্য ভাব এবং রূপের ভিতরকার যে সাহিত্য তাহার সার-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার মান সেই কুন্তক এই সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।—

> যথাতত্ত্বং বিবেচ্যন্তে ভাবাস্ত্রৈলোক্যবর্তিনঃ।
> যদি তন্নাদ্ভুতং ন স্যাদেব রক্তা হি কিংশুকাঃ॥
> স্বমনীষকয়ৈবাথ তত্ত্বং তেষাং যথারুচি।
> স্থাপ্যতে প্রৌঢ়িমাত্রং তৎ পরমার্থো ন তাদৃশঃ॥
> ইত্যসত্তর্কসন্দর্ভে স্বতন্ত্রে হপ্যকৃতাদরঃ।
> সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধোঃ সারমুন্মীলয়াম্যহম্॥

কুন্তকের মতে কাব্য বা সাহিত্যের যে 'অদ্ভুতামোদ-চমৎকার' সারবস্তু তাহা দ্বিতয়—অর্থাৎ দ্বিবিধ-লক্ষণযুক্ত; তাহার একদিকে রহিয়াছে তত্ত্ব অন্যদিকে রহিয়াছে নির্মিতি—'যেন দ্বিতয়মিত্যেতত্তত্ত্বনির্মিতি-লক্ষণম্।'

কুন্তকের উপরি-উক্ত মতগুলি আলোচনা করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, কুন্তক কাব্যের 'সাহিত্য'-লক্ষণের উপরেই খুব জোর দিয়াছেন। এই সাহিত্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে কিসের ভিতর দিয়া? তাহা ফুটিবে 'তত্ত্ব' ও নির্মিতি'র সুষ্ঠু মিলনের মধ্য দিয়া—অর্থ ও শব্দের অটুট সংপৃক্তির ভিতর দিয়া। ইহার কোনও দিককে বাদ দিয়া কোনও দিক্ সার্থক নয়। কুন্তক বলিয়াছেন, স্পন্দিতচিত্তে যে কবি-বিবক্ষা তাহার একটি বিশেষ ধর্ম রহিয়াছে। কাব্যের ভাষা বলিব কাহাকে? কবিচিত্তের তৎ-কালধৃত যে এই চিত্তস্পন্দনজাত বিশেষ-বিবক্ষা তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতা তাহাই হইল তাহার বিশেষবাচকত্বলক্ষণ, —'কবিবিবক্ষিতবিশেষাভিধানক্ষমত্বমেব বাচকত্ব-লক্ষণম্'। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যস্মাৎ প্রতিভায়াং তৎকালোল্লিখিতেন কেনচিৎ পরিস্পন্দেন পরিস্ফুরন্তঃ পদার্থাঃ প্রকৃতপ্রস্তাব-সমুচিতেন কেনচিদুৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছাদিতস্বভাবাঃ সন্তো বিবক্ষাবিধেয়ত্বেনাভিধেয়তাপদবীমবতরন্তঃ তথাবিধ বিশেষপ্রতিপাদনসমর্থেন অভিধানেন অভি-ধীয়মানাশ্চেতশ্চমৎকারিতামাপদ্যন্তে।' যথার্থ-প্রতিভাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে যখন বাহিরের কোনও পদার্থ ধরা দেয় তখন তাহা তাহার বাহিরের রূপ লইয়াই আসিয়া দেখা দেয় না, তাহা একটা সমাচ্ছাদিতস্বভাব লইয়াই দেখা দেয়—অর্থাৎ বহির্বস্তুর উপরে কবির তৎকালোচিত একটি বিশেষ চিৎস্পন্দনের অলৌকিক মায়াস্পর্শ পতিত হইয়া তাহাকে একটি বিশেষ অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে; এই যে নবোদ্ভাস তাহার ভিতরে বহির্বস্তু তাহার প্রকৃতরূপেও মহিমান্বিত হইতে পারে—প্রকৃতরূপকে অতিক্রম করিয়া একটি উৎকর্ষবিশেষের মধ্যেও মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে পারে; এই নবোদ্ভাসিত বিষয়বস্তু তখন তাহার বস্তুরূপ পরিত্যাগ করিয়া কবিচিত্তে একটি চিন্ময়রূপ ধারণ করে,—এই চিন্ময়রূপের পরিণতিই একটি কবিবিবক্ষায়; ইহাই কবির আত্ম-প্রকাশ বা আত্মসৃষ্টির তাগিদ; এই বিবক্ষাই তখন একটি

বিশেষ অভিধেয় বা বিশেষ বাচ্য হইয়া উঠিল। এই বিশেষ বাচ্যকে ঠিক ঠিক তদনুরূপ বিশেষ বাচকের দ্বারা—অর্থাৎ একটি বিশেষ নির্মিতির দ্বারা যখন বাহিরে স্থাপন করা গেল সেই শিল্পকৃতিই তখন রসিকজনের চেতনচমৎকারিতার কারণ হয়। এই যে 'বিশেষাভিধানক্ষমত্ব' ইহাকেই কুন্তক বলিয়াছেন বক্রোক্তি। কাব্যের অলঙ্কারাদি হইল নিরন্তর এই বক্রোক্তির সাহায্যে অনুরূপ তত্তদ্রূপ বাচ্যের অনুরূপ নির্মিতি বা বাচকের সম্ভব করিয়া তুলিবার চেষ্টা। বক্রোক্তি-সাধিত এই নির্মিতি ব্যতীত জগতের কোনও সত্যের মহিমাই যথার্থ প্রকাশ লাভ করিতে পারে না।

অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি যাঁহারা রসধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারাও কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে অলঙ্কারকে মুখ্য স্থান দান করিয়াছেন। প্রতিভাশালী কবির পক্ষে কাব্যের নির্মিতি কোনও পৃথক্ যত্নকৃত বস্তু নহে। যেমন জলধারা কোনও কুম্ভে পতিত হইয়া কুম্ভটি কানায় কানায় ভরিয়া গেলে আপনিই আপনার নিজের ছন্দে ও ভঙ্গিতে উচ্ছলিত হইয়া বাহিরে উপছাইয়া পড়ে, তেমনই রসের আবেদনে চিত্ত যখন কানায় কানায় ভরিয়া যায় তখন আপনি তাহা তাহার প্রকাশের পথ সৃষ্টি করিয়া একই বেগে বাহিরে প্রকাশ-মূর্তি লাভ করে। আদি-কবি বাল্মীকি মুনি কি করিয়া প্রথম কাব্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্ত ভারী চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন,—"সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্যধ্বংসনেনোত্থিতো যঃ শোকঃ......স এব...আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপত্বাৎ লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো রসঃ পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ.........সমুচিতচ্ছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিতশ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ।" ক্রৌঞ্চের যে শোক তাহা লৌকিকশোকরূপতা পরিত্যাগ করিয়া কবিচিত্তের ভিতরে পরমাস্বাদ্যরূপ একটি অলৌকিক করুণরসের রূপ ধারণ করিল; সেই করুণরসই কবিগুরুর চিত্তকুম্ভকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া বাহিরে উচ্ছলিত হইয়া পড়িল—সেই উচ্ছলনই সমুচিত ছন্দ, বৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া শ্লোকরূপতা প্রাপ্ত হইল। অভিনব গুপ্ত তাঁহার আলঙ্কারিক ভাষায় যে-কথা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবির ভাষায় বাল্মীকির প্রথম কবিকর্ম সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন। হিমালয়ের উচ্চশিখরস্থ কন্দরে যেদিন আষাঢ়ের 'দুর্দাম দুর্বার' বেগ নামিয়া আসে তখন সে সহসা নিজেই নিজের খাত কাটিয়া নিজের ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দধারায় নামিয়া আসে; কবিগুরু বাল্মীকির হৃদ্‌গত ভাব-সম্বেগও তেমনই স্বচ্ছন্দধারায় শ্লোকরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পার্বত্য ঝর্ণা কোন্ বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিতে উপলবন্ধুর পথে খাত কাটিয়া কোথায় কলস্বনে—কোথায় উচ্ছ্রিয়মাণ গর্জনে কোথায় কূলে কূলে কোন্ পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া বাহিয়া চলিবে তাহা যেমন তাহার ভাব-সম্বেগ এবং রস-সম্পদ্ ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারে না,—এক জন যথার্থ শিল্পীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে; সেখানেও

> এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
> এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
> এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
> অন্তর বিদারণ।

অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া ধ্বনিবাদিগণ বলিয়াছেন,—

> রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
> অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥

অর্থাৎ রসের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইবার জন্যই যাহার বন্ধ বা সৃষ্টি সম্ভব এবং যাহা অপৃথক্-যত্ন দ্বারাই সাধিত হয়—তাহাই হইল অলঙ্কার; ইহাই হইল ধ্বনিবাদিগণের মত। ইহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে,—'নিষ্পত্তৌ আশ্চর্যভূতোঽপি যস্য

অলঙ্কারস্ত রসাক্ষিপ্ততয়া এব বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ'—যে অলঙ্কারের সৃষ্টি আশ্চর্যভূত হইলেও রসের আক্ষেপে অতি সহজেই যেন সম্ভব হইয়া ওঠে—এই জাতীয় অলঙ্কারই যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া গ্রাহ্য। এখানে এই রসের আক্ষেপ এবং 'অপৃথগ্-যত্ন-নির্বত্য' এই কথা দুইটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আসলে এই দুইটি কথা একই কথা।

প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত*

স্বামী মাধবানন্দ

বেদান্তের জন্ম সুদূর অতীতকালে হইলেও ইহা এখনও পর্যন্ত একটি প্রাণবন্ত দর্শন ও ধর্ম রূপে বর্তমান। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক বলিয়া আজিকার নরনারীর হৃদয়কে ইহা প্রখরভাবে স্পর্শ করিতে সক্ষম। এই যুগে বেদান্ত যে একটি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ কর্তৃক প্রাচীন বেদান্ত শাস্ত্রের আপাতবিরুদ্ধ বাক্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রের সত্যরাশির প্রতি একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিপাতের মধ্যেই ঐ বিরোধ-সমাধানের রহস্য নিহিত। ঋগ্বেদ যেমন বলিয়াছেন, ঋষিগণ বহুনামে সংজ্ঞিত করিলেও সত্য এক। মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এই সত্যের সম্মুখীন হইতে পারেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রত্যেকটি উচ্চতর স্তর সাধককে চরম একত্বানুভূতির অধিকতর নিকটে লইয়া যায় বটে, কিন্তু উহা নিম্নতর স্তরের উপলব্ধি সমূহকে খণ্ডিত করে না, বরং পরিপূর্ণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার সমগ্র জীবন ছিল বেদান্তের মূর্ত অভিব্যক্তি। অসংখ্য দিক দিয়া তিনি শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, প্রত্যেকটি উপলব্ধিই তাঁহার নিকট ছিল সত্য ও বাস্তব। প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুই প্রগতি এবং বিকাশের পথে চলিতেছে। অতএব সত্যলাভের পথ হইল আত্মার যন্ত্রস্বরূপ যে মন উহাকে নিজ সামর্থ্যের উপযোগী পথে গড়িয়া তোলা। এইরূপেই মানুষের অভিজ্ঞতা তাহাকে লইয়া যায় সত্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে।

বেদান্তের শিক্ষা—আত্মা অসীম, শাশ্বত এবং ঈশ্বরের সহিত এক। কিন্তু আমরা আত্মাকে অভিব্যক্ত দেখি প্রকৃতি-রূপ আবরণ—মায়া বা ঈশ্বরের ঐন্দ্রজালিক শক্তির মধ্য দিয়া। ইহার ফলে মানুষকে আমরা সান্ত ও সীমাবদ্ধ বলিয়া ভুল করি এবং ঈশ্বরও এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রতিভাত হন। স্বপ্নে যেমন আমরা আমাদের সত্য পরিচয় ভুলিয়া যাই এবং বাস্তব জগতের সহিত সংস্পর্শ হারাইয়া ফেলি কিন্তু জাগিয়া উঠিলে স্বপ্নজগৎ যেমন অদৃশ্য হয় ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যের অনুভূতিতে আমাদের অজ্ঞান-স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এবং আপেক্ষিক জীবনের সমুদায় কল্পনারও অবসান ঘটে। * * *

প্রশ্ন এই যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত বেদান্তকে সংযুক্ত করা যায় কিনা। বেদান্তীরা বলেন, নিশ্চিতই যায়। পদ্মপত্র যেমন জলে ভাসে কিন্তু উহার গায়ে জল লাগে না সেইরূপ মানুষ এই জীবন হইতে ঊর্ধ্বে থাকিয়া এখানে জীবন

* সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতিতে গত ৪ঠা মার্চ (১৯৫৬) তারিখে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণ হইতে সঙ্কলিত। —উঃ সঃ

যাপন করিতে পারে। ভারতে সনাতন ধারণা ছিল ঘর বাড়ী ছাড়িয়া জীবনের কিছু সময় বনে কাটানো। আজকাল ইহা সম্ভবপর নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে আনিয়াছেন। তিনি বেদান্তের একটি কর্মপরিণত প্রণালী দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুধু মানুষকে তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক অধিকার যে মুক্তি সেই সম্বন্ধে সচেতন করা—অজ্ঞানের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠিয়া আমাদের স্বকীয় মহাশক্তিকে অনুভব করা। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। যে অজ্ঞান আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে উহা দূর করিবার সাধনার মধ্য দিয়া আমাদিগের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে। আমরা নিজদিগকে যে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছি ঐ আবেশ কাটাইতে হইবে।

যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা থাকে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ যে সকল সাধারণ সাধন প্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন উহা যদি আমরা অনুসরণ করি তাহা হইলে আমরা নিজেদের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারিব। ঐ প্রণালীগুলি কি? আত্মসংযম, একাগ্রতা, বিশ্বাস, এবং নিজদিগকে মুক্ত করিবার জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা। জাগতিক জীবনের যে অবস্থায় রহিয়াছি উহাতে যদি আমরা তৃপ্ত থাকিতে না পারি, সত্য লাভের জন্য যদি আমরা মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি এবং পর্যাপ্ত সংযম এবং তন্ময়তার সহিত অনবরত যদি অগ্রসর হইয়া চলি তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিব।

পৃথিবীর সর্ব দেশেই শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাদের উপদেশের মর্মদেশে প্রবেশ করি না বলিয়া উহা বুঝিতে পারি না, তাঁহাদের বাণীর একতাকে ধরিতে পারি না। এমনকি বুদ্ধও বেদান্তেরই শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, যদিও উহার নাম করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, সৎকর্ম কর। এখানে তিনি বেদান্তের সক্রিয় দিকটি অর্থাৎ কর্মযোগের পন্থার উপর জোর দিতেছেন। যীশুখ্রীষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন বেদান্তের ভক্তির দিকটি। ভক্তেরা হৃদয়াবেগের মাধ্যমে ভগবানের সন্নিধানে যাইতে চান। যেহেতু আমরা মানুষ, সেইজন্য আমরা চাই ভালবাসিতে এবং ভালবাসা পাইতে, আর ভক্তি-শাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরই হইলেন পরম প্রিয়। তাঁহাকে যদি আমরা হৃদয়ের প্রেম অর্পণ করিতে পারি তিনিও নিশ্চিতই আকৃষ্ট হইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, আমরা যদি ঈশ্বরের অভিমুখে এক পা অগ্রসর হই তিনি আমাদের দিকে দশ পা আগাইয়া আসেন। সাধারণতঃ আমাদের এই আধ্যাত্মিক তথ্যটি জানা নাই যে, বিষয়-সুখলালসায় না মজিয়া আমরা যদি সামান্য একটু ত্যাগ করি তাহা হইলে আমরা ভগবানকে দশ পা'রও অনেক বেশী টানিয়া আনিতে পারি। আত্মসংযম এবং একাগ্রতা সকল বিশিষ্ট ধর্মেরই সার কথা—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সন্ধানে যেন মন ছুটিয়া না যায় এই জন্য উহাকে খানিকটা বশে রাখা এবং আদর্শের প্রতি অভিনিবেশ। ঈশ্বরকে কেহ ব্যক্তি বলিয়া কিংবা নৈর্ব্যক্তিক ভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন ফল একই। যাহা দরকারী তাহা হইল এই: আমরা অকপট তো? আমরা এই জীবনেই ভগবানকে পাইতে চাই তো? তাহার পর পথ চলিতে যদি আমরা প্রস্তুত থাকি তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবই।

প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল বাধা এই নয় যে আমাদিগকে সংসারে থাকিতে হইতেছে, বাধা হইল আমরা যাহা করি তাহাতে আমাদিগের আসক্ত হইয়া পড়িবার প্রবণতা। কর্ম বন্ধন আনে না, বন্ধন আসে আসক্তি হইতে। আমরা কাজ করি আমাদের পরিবারের জন্য, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু এই স্বার্থবুদ্ধি যদি ছাড়িতে পারি তাহা হইলে আমাদের

মন নির্মল হয় আর সেই বিশুদ্ধ মনে ঘটে সত্যের প্রকাশ। * * * পরিবার প্রতিপালনের জন্য কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতে হইবে কিন্তু একথা যদি মনে থাকে যে পরিবারবর্গের মধ্য দিয়া ভগবানেরই সেবা করা হইতেছে তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কাজের ধারাটিই বদলাইয়া যায়। * * * প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বরেরই মূর্তি বলিয়া দেখিতে পারিলে এবং এই ভাবে নানা মূর্তিধারী ভগবানের যথাযোগ্য সেবা করিবার চেষ্টা করিলে কর্ম এখনকার মত আর বন্ধন সৃষ্টি করিবে না—বর্তমান অজ্ঞানাবস্থা হইতে মুক্তির সহজতম রাস্তা হইয়া দাঁড়াইবে। * * * বেদান্তদর্শনের একটি মস্তবড় বাঁচোয়া জিনিস এই শিক্ষাটি যে, আমরা যাহা খুঁজিতেছি তাহা আমাদের ভিতর আগে হইতেই আছে। * * * যেমন করিয়াই হউক ঐ অনুভূতি আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। কোন সময়ে উহা হয় তো আড়ালে থাকিতে পারে কিন্তু একদিন উহা প্রকাশ পাবেই। এখানে আমরা যাহা কিছু চাই সকলই আমরা পাইতে পারি বরং আরও অনেক বেশী।

বেদান্ত বলেন,' আমরা যাহা কিছু করি আমাদিগকে জ্ঞানপুরঃসর করিতে হইবে, উহার ফল জানিয়া। অকিঞ্চিৎকর সামান্য জিনিসেরও জন্য যদি ছুট তো তাহার মূল্য জানিয়াই যেন উহাকে চাই। আমাদের না-জানার যাহা ফল হইবে তাহার জন্য যেন অপরকে দোষী না করি। কর্মযোগীরা বলেন তুমি বর্তমানে যাহা তাহা তোমার অতীত কর্মের ফল। অতএব আমরা যদি এখন বদ্ধ হইয়া থাকি তবে আমাদের উচিত কিছু সৎকর্ম করিয়া আমাদের হারানো সাম্যকে ফিরিয়া পাওয়া। কর্মযোগ সকলেরই সহায়ক। যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও প্রতিদানের দাবী না করিয়া অপরের সেবা করিতে পারেন। এই দর্শন সারা বিশ্বের উপকার সাধন করিবে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত প্রসার হইয়াছে সন্দেহ নাই। বৈষয়িক উন্নতির দিকে মার্কিন প্রতিভা যাহা সংসাধন করিয়াছে সেজন্য তাহাকে অবশ্যই অভিনন্দন করিতে হইবে—কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানরা যদি হৃদয়েরও বিস্তার করেন তাহা হইলে শুধু তাঁহারাই নয় সমগ্র মানবজাতি উপকৃত হইবে, কেননা বেদান্তের মূল বাণী এই যে সব কিছু মানুষেরই ভিতরে। মানুষকে শুধু উহা প্রকাশ করিতে হইবে। মার্কিন জাতির বুদ্ধি আছে, কর্মশক্তি আছে—বৈদান্তিক সত্যের বিকাশে অপর লোকদের অপেক্ষা তাঁহারা উত্তম ফল লাভ করিতে পারিবেন। * * * উচ্চতর বস্তুর অনুশীলনের জন্য শুভদিন সমাগত। কর্মোন্মত্ততার ভাব হইতে এখন আত্মানুভূতির ভাবের দিকে যাইতে হইবে। প্রগতির পথে সেই অবস্থা যে আসিবে ইহাতে সন্দেহ নাই—বেদান্তের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিলে প্রভূত সহায়তা পাওয়া যাইবে।

ভারতবাসী আমরা একটি জাতি, মার্কিনবাসী অপর একটি জাতি। কিন্তু আমরা যদি বেদান্তকে সামান্যও বুঝিবার চেষ্টা করি তো আমরা উভয়েই দেখিতে পাইব প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই আত্মা প্রতিবিম্বিত। এই উচ্চতর চিন্তা চিত্তে জাগরূক থাকিলে যে কোন ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজই অনেক বেশী কল্যাণপ্রসূ হইবে।

শেষ কথা এই যে, অদ্বৈতে বা দ্বৈতে যাহাতেই বিশ্বাস থাকুক, আদর্শ বাছিয়া লইয়া উহা অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের আচার্যেরা বলিয়াছেন, বেশ কিছু কাল ধরিয়া একটি সাধনে লাগিয়া থাকা চাই, তাহার পর যদি কোন ফল না পাও বরং ছাড়িয়া দিও, কিন্তু যথেষ্ট অভ্যাসের আগে নয়। এই উপদেশটি যেন আমরা মনে রাখি। বেদান্তের অনুশীলন আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর আগাইয়া যাইতে হইবে। যাহা কিছু বাধা আসুক না কেন গ্রাহ্য না করিয়া সত্যোপলব্ধির

জন্য ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। কিছু হারাইবার তো ভয় নাই। পরমাত্মাকে যাহা কিছু অর্পণ করা যায় সহস্রগুণে উহা ফিরিয়া আসে। অতএব স্বীয় অমৃত-স্বভাবের অভিমুখে সাগ্রহ যাত্রার জন্য আত্ম-সচেতন চেষ্টা উদ্দীপিত হউক। * * * কবে কখন বর্তমান অজ্ঞানাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে তাহা তো জানা নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যে শুভ মুহূর্তে সত্যের সাক্ষাৎকার হইবে তৎক্ষণাৎ ঐ দুঃখকর অবস্থা কাটিয়া যাইবে—আমরা জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছিব।

ভগবান সেই লক্ষ্যে পৌছিতে আমাদিগের সহায় হউন!

অনাদ্যন্ত

শ্রীনরেন্দ্র দেব

যদি কিছু তোর খোয়া গিয়ে থাকে, দুঃখ কেনরে করিস মিছে?
যাবার সময় যত সঞ্চয় ফেলে যেতে তোকে হবেই পিছে।
এসেছিলি যবে এই ধরণীতে সেদিন কিছু কি ছিলরে হাতে?
আজ যদি তোর নাই থাকে কিছু—দুঃখ কি আর এমন তাতে?
থাকা-খাওয়া—সেতো কলের মতন চলেছে এখানে জীবন ভোর,
যতদিন পারি জের টানি তারই; চাইনি কাটাতে ঘুমের ঘোর।
কুয়াসা ঘনায়ে আসে চারিদিকে, ঝাপসা দেখি যে দিনের আলো!
ধোঁয়ার পর্দা ঢাকে যে আকাশ, দেখাতো যায় না কিছুই ভালো।
সূর্য-কিরণ মুছে দেয় শুধু রাতের জমাট আঁধার যত;
দিনের দীপ্তি ঝল্ মল্ করে উষার সোনালী শাড়ীর মতো!

ফিরে পায় যেন জগৎ আবার অন্ধ আঁখির হারানো দ্যুতি,
খুঁজে খুঁজে কত লুপ্ত রতন, দেখে শেষে সবই নকল পুঁতি!
অধর প্রান্তে ফোটে কি সেদিন নির্বুদ্ধির বিমূঢ় হাসি?
মনে কি হয়না,—এই পৃথিবীতে শুধু নিজেকেই ভাল যে বাসি!
হারায় না কিছু জগতে কখনো, জীবনে কিছুই যায় না খোয়া।
ভুল করে ভাবি—কাকে নিয়ে গেছে ছেলের হাতের মুড়কী-মোয়া!
মৃত্যু বলে না শেষ কথা, সে তো নবজন্মের বাজায় শাঁখ!
জীবনের পথ জটিল ভেবনা; আমরাই গড়ি যা-কিছু বাঁক।
তবু যেতে পারে আপন লক্ষ্যে হুঁসিয়ার যত পথিক জেনো,
যে ছিল অচেনা এতদিন, তারে দেখে মনে হবে সেজনে চেনো!

কত অজানারে জানিবি তখন আপন মনের দৃষ্টিবলে,—
জীবনের কত রহস্য আছে—নিহিত গোপনে সৃষ্টি তলে!

চেতনার মাঝে অবচেতনার অদৃশ্য ভেলা লুকায়ে ভাসে,
আকাশের তারা ঘোমটা খসায়ে কেন যে সহসা অট্টহাসে ?
ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়—একদা আবার পূর্ণ হ'তে,
মানুষ মরেনা ; ফিরে ফিরে আসে নিত্য নবীন জীবন স্রোতে।
তুচ্ছ নহে এ পৃথিবীতে কিছু। কে বলে জগৎ মায়ার খেলা ?
সংসার নয় হপ্তার হাট—দুদিনের শুধু রথের মেলা !
আপাত দৃষ্টি দেখে কতটুকু ? দূর দৃষ্টির প্রসার চাই।
প্রতি ধূলিকণা—অণু পরমাণু—অনন্তরূপ কোথায় নাই ?

এখানেই রোজ লেখা হয় ভায়া ভবিষ্যতের নতুন খাতা,
তুমিই তোমার কাজের হিসেবে ভাগ্য-লিপির ভরাও পাতা !
নহ ক্ষণিকের খেলার পুতুল—কুমোরের হাতে মাটিতে গড়া ;
রাশিচক্রের ঘূর্ণাবর্ত—আদি ও অন্ত যায়না পড়া !
যা কিছু করিস, কর্মসচিব প্রতিদিন তার হিসাব রাখে ;
তোর ভাবী কাল শুভাশুভ সবই—তোরইতো মুঠোয় বন্ধ থাকে।
দীপ জ্বলে ওঠা, নিভে যাওয়া, আর—মৃদু হয়ে আসা স্তিমিত শিখা,
স্বয়ংক্রিয় সে কেরামতি তব, ভেবনা সে সব বিধির লিখা।
ভুল চুক্ যদি হয় ক্ষতি নেই, ওঠা পড়া সেতো আছেই ভাই,
আনন্দ মনে মেনে নিও সব ; নচেৎ জীবনে শান্তি নাই !

শিক্ষা

শ্রীমতী লীলা মজুমদার, এম্-এ

সাধারণ লোকে সংসারে সুখী হতে চায়, অথচ কি করলে যে সুখী হওয়া যায় তাই ভেবে পায় না। সুখ যেন সর্বদাই আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু সর্বদাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।

প্রায়ই শোনা যায় আমাদের দেশটি বড়ই দুঃখী। খাওয়া পরার কষ্ট, থাকবার ভালো বাড়ি নেই, লোকে চাকরিবাকরি পায় না, স্বাস্থ্য অতিশয় মন্দ। এখানকার তুলনায় অন্য দেশ কত সুখী। এখানে গুণের আদর নেই, ক্ষমতা-বিকাশের সুযোগ নেই, মনুষ্যত্বের সম্মান নেই। লোকে দুঃখ করে যে স্বাধীনতার কাছ থেকে যা আশা করা গিয়েছিল তার কিছুই পাওয়া যায় নি। আমাদের মত দুঃখী আর কোথায় আছে। তাই শুনে সারা পৃথিবীময় খুঁজে দেখি, কোথায় সেই সুখী দেশ, যার মত হ'তে পারলে আমরাও সুখী হব। কিন্তু তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। সুখ পাওয়া না—গেলেও, যদি মনের শান্তিও পাওয়া যেত তা হলেও অনেকটা হত। কিন্তু বোধ হয় এর আগে কখনো এমন

পৃথিবী-জোড়া অসন্তোষ দেখা যায় নি। মানুষের পারিবারিক জীবনেও সুখ শান্তি নেই, ছেলে-মেয়েদেরও মনের মত করে মানুষ করা কঠিন।

অথচ বেঁচে থাকার উপকরণ এবং ভালো করে বাঁচার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমস্তই কত বেড়ে গেছে। আজকাল মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের পরামর্শ মতে আমরা ছেলেমেয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করি। আগেকার সেই মারধোর কড়া শাসন একরকম উঠেই গেছে। কড়া কথা বলা, বা টিটকিরি দেওয়া, বা ছোটছেলের আত্মসম্মানে আঘাত করার যে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে বিষয় আমরা সচেতন হয়েছি। কঠিন কিছু ওদের করতে দেওয়া হয় না, বিদ্যালয়গুলিকে আনন্দের নিকেতন করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। সবই করা হয়, তবু ঘরে ঘরে অসন্তুষ্ট, উদ্ধত, স্বার্থপর, অসুখী উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়ে কেন দেখা যায়?

আমাদের আধুনিকতম শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোথায় গলদ্ থেকে যাচ্ছে? পদ্ধতি হাজার সুচিন্তিত এবং আপাত দৃষ্টিতে হাজার নিখুঁৎ হোক্, সেই ছাঁচে ঢালাই হয়ে যে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসবে তারা যদি তেমন ভালো না হয় তা হলে পদ্ধতিটার কোথাও একটা বড় গলদ আছে নিশ্চয়।

সাধারণ শীলতা-জ্ঞান, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অভিভাবকদের প্রতি বাধ্যতা, ধৈর্য্য, গুণের আদর, নীতিজ্ঞান, এগুলিকে সেকেলে বলে শুধু উড়িয়ে দিলে চলবে না। যে সব গুণকে আবহমানকাল ধরে লোকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছিল, সেগুলিকে কেবল তখনি বর্জন করা চলে, যখন তার চাইতেও উত্তম কিছু লাভ করা যায়। আমাদের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের হাতে কোন উত্তম জিনিস এনে দিতে পেরেছে? এখ—যদি না পেরে থাকে, তা হলে এত সুচিন্তা ও যত্ন সত্ত্বেও কেন পারে নি সে বিষয় চিন্তা করা দরকার।

এই সূত্রে কতকগুলি কথা মনে পড়ছে। প্রথম হল, আমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যতালিকা থেকে সর্ব প্রকার ধর্মশিক্ষা আমরা তুলে দিয়েছি। সেই কি কারণ? ধর্মশিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বোঝায় না। যেখানে নানান সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে সেখানে আনুষ্ঠানিক ধর্ম শেখানো সম্ভব বা উচিত নয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেয়েও যে বড় ধর্ম আছে, যা দিয়ে আমরা ভালোমন্দ, উচিত অনুচিত, সত্যাসত্য বিচার করি, তাকে বাদ দিলে কি চলে? অনেকে বলে থাকেন, সে শিক্ষার স্থান নিজেদের ঘরে, স্কুলে নয়। কিন্তু এখানে আরেকটি কথাও আছে, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে হলে তার কোনো অঙ্গই বাদ দেওয়া উচিত নয়, এবং সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে একটা ঐকতান থাকা দরকার। যাতে স্কুলে যা শেখে এবং বাড়িতে যা শেখে তার মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য না থাকে।

সত্যি কথা বলতে কি বাড়িতেও কেউ আজকাল ছেলেমেয়েদের নীতি-শিক্ষা দেয় না। সেকালের মত নীরস নীতি-শিক্ষাকে আজকাল কখনই গ্রহণযোগ্য বলা যাবেও না। নীতি-শিক্ষা আলাদা করে দেওয়া যায় না, প্রতিজনের প্রতি-দিনের আচরণের মধ্যে দিয়ে একটা সুনীতির সুর বাজা উচিত। সেই হল নীতি-শিক্ষার একমাত্র উপায়, কি বিদ্যালয়ে, কি ঘরে। ছোট ছোট প্রতারণা, ছোট ছোট প্রবঞ্চনা, ছোট ছোট স্বার্থ-পরতা, নিষ্ঠুরতা দিয়ে তিলে তিলে মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তার আর কিছুই থাকে না। নীতি-বিদ্যালয় কি নীতি-শিক্ষার ক্লাশের চাইতেও এই নীতি-শিক্ষা অনেক বেশী কঠিন। কিন্তু নীতি শেখানো যায় একমাত্র নৈতিক জীবন যাপন করে, অন্য কোনো উপায় নয়।

আরো কারণ থাকতে পারে। হয়তো বা আমাদের পারিবারিক জীবনের শৈথিল্যও একটা

কারণ। যৌথ-পরিবার আর চলবে না, বর্তমান অর্থনীতি আর তাকে বহন করতেও পারবে না। কিন্তু যৌথ-পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে যদি পারিবারিক দায়িত্ববোধ ও স্নেহের বন্ধনও শিথিল হয়ে যায়, তা হলে তার ফল কখনো ভালো হবে না। যেদিন পরিবার বলতে পাশ্চাত্যদেশের মত আমরাও বুঝব শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা, সেদিন আমাদের দেশের পুরাতন একটা শক্তির ভিত্তিও ধ্বংস হয়ে যাবে। ছোটবেলায় যারা মাসিপিসি খুড়ো জ্যাঠার দাবী অস্বীকার করতে শেখে, বড় হয়ে তারা যে ভাইবোন কিংবা বুড়ো বাবামার দাবীও অস্বীকার করবে তাতে আর সন্দেহ কি? পারিবারিক জীবনের পরিবারটাকে ছোট হ'তে হ'তে শেষে একটা আত্মকেন্দ্রিক বিন্দুতে এসে না পরিসমাপ্ত হয়।

তৃতীয় একটা কারণও থাকতে পারে। তার গোড়াতেই আছে আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মূলমন্ত্রটি, এবং সম্ভবতঃ এরই প্রভাব সব চাইতে বেশী। লোকে বলে যে প্রত্যেকটি মহৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনার ধ্বংসের কারণ নিহিত থাকে। শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের সর্বনাশ সাধন করে। এখানেও হয় তো তাই।

ঐ যে সব কিছু সহজ করে দাও, সুখের করে দাও, ঐ হয়তো সর্বনাশের কারণ। যা কিছু কঠিন, যা কিছু অপ্রিয় ছেলেমেয়েরা তাকেই অস্বীকার করতে চায়। অথচ দুনিয়াতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার কোনটাই সহজলভ্য নয়। এই-খানেই বোধ হয় আমাদের সমুদয় শিক্ষা-পদ্ধতির গলদ্।

বাংলার তন্ত্রসাধনা*

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

আজ বঙ্গদেশে ঘনতমিস্রার অবলেপ। দেশ ছিন্ন ভিন্ন, দিকে দিকে মরণাতুরের আর্তনাদ, দুর্ভাগ্যের এই মহাশ্মশানে বসে বাঙালী শবসাধনায় নিমগ্ন। এই শবের মধ্যেই মহাশক্তির অবতরণ ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন বীর সাধকের:

'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে॥'

(বিবেকানন্দ)

এই কথাই তন্ত্রের মর্মকথা। করালিনীর উপাসনা, ভীমার পূজা, রুদ্রাণীর আবাহন—দুর্বলের নতিস্বীকার নয়, শক্তিমানের সেই অমোঘবীর্যে প্রতিষ্ঠা যা হৃদয়ের সকল বাসনা-কামনাকে নির্মূল করে হৃদয়কে শ্মশান করে তুলবে এবং সেই হৃদয়ে শ্যামাসুন্দরীর নৃত্য হবে।

তন্ত্রের তত্ত্ব আলোচনা করার পূর্বে তন্ত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কাশিকাবৃত্তিতে 'তন্ত্র' শব্দ তন্ ধাতুর উত্তর উনাদি প্রত্যয় ষ্ট্রন্ প্রয়োগ করে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং গোবিন্দানন্দের মতে তন্ত্রি ধাতু থেকে তন্ত্র শব্দ ব্যুৎপন্ন। তন্ত্রি ধাতুর অর্থ ব্যুৎপাদন বা জ্ঞান। কিন্তু গণপাঠে দেখা যায় যে তন্ত্রি ধাতুরও অর্থ বিস্তার হতে পারে। সুতরাং তন্ত্র শব্দের দ্বারা যে কোন বিস্তারিত আলোচনা বুঝানো যায়। সেইজন্য দেখা যায় প্রাচীনকালে বাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, মতবাদ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বুঝানোর জন্য তন্ত্র শব্দের

* কলিকাতা বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মিলনের ১০।৩।৫৬ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

প্রয়োগ করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের গ্রন্থাদির নাম ছিল ষষ্টিতন্ত্রশাস্ত্র। সেইভাবে, ন্যায়তন্ত্র, ধর্ম-তন্ত্র, ব্রহ্মতন্ত্র, যোগতন্ত্র, আয়ুর্বেদতন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

কিন্তু কালক্রমে তন্ত্র শব্দের সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখা যায়। বারাহীতন্ত্রের মতে:

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরুণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম দানধর্মৌ যুগধর্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

"সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধদের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষবর্ণন, ব্রতকথা, শৌচা-শৌচাখ্যান, শিবচক্রবর্ণন, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ যাতে থাকে তাকেই তন্ত্র বলা যায়।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে তন্ত্রের চারটি অংশ: (১) জ্ঞান অর্থাৎ দার্শনিক মতবাদ, বীজাদির শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান, মন্ত্রশাস্ত্র, ও যন্ত্রশাস্ত্র (২) যোগ—ধ্যানধারণাদির বর্ণনা ও বিবিধ সিদ্ধিলাভের জন্য মায়াযোগ (৩) ক্রিয়া—মূর্তি-মন্দিরাদির নির্মাণবিষয়ক আলোচনা এবং (৪) চর্যা—আচার-ব্যবহার, উৎসব ব্রত প্রভৃতির আলোচনা।

এই আলোচনা থেকে সহজেই এই প্রতীতি হয় যে তন্ত্রশাস্ত্র একটি বিরাট সমন্বয়-প্রচেষ্টা। বহু ভাবধারার প্রবাহ ভারতের জীবনে বিভিন্ন অববাহিকাকে অবলম্বন করে এসেছিল। তারই সমী-করণের ফল তন্ত্রশাস্ত্র। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একস্থানে বলেছেন—"বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণব মতবাদ, চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সব কিছুই তন্ত্রের মতবাদের অঙ্গরূপে তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান।" শুধু তাই নয়, তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিশেষ অংশ যা বামাচার নামে প্রখ্যাত তা আর্য ও অনার্য ভাব ধারার সংমিশ্রণ।

এর পর আমরা তন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ বহু মনীষীর মতে বৌদ্ধরাই তন্ত্রের স্রষ্টা। হিন্দু সমাজ চিরদিনই বহিঃসম্পর্কব্যাবর্তক। কাজেই হিন্দু-ধর্মের বা সমাজের মধ্যে আর্যেতর মতের অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু নবীন বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রচারধর্মী। বহু নব নব জাতি তাদের আচার ব্যবহার সংস্কৃতি পরিবহন করে বৌদ্ধধর্মে অনুস্যূতি লাভ করে। এই সুযোগে তাতার মঙ্গল প্রভৃতি জাতিও বৌদ্ধধর্মের কুক্ষিগত হয়। নবদীক্ষিত এই সব অনার্যজাতির বহু আচারব্যবহার এইভাবেই বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ লাভ করে।

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা নৈতিকতার দৃঢ়ভূমির উপর। সর্বপ্রকার গুহ্যসাধন বা বিভূতি লাভাদির বিরোধী ছিল এই ধর্ম। কিন্তু বহির্ভাবধারার অনুস্যূতির ফলে নানা ক্রিয়াকলাপ, বিভূতি প্রভৃতির অনুপ্রবেশ বৌদ্ধধর্মে ঘটে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলকল্প পাঠে দেখা যায় কি ভাবে ক্রিয়া-কলাপাদি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করছিল।

ইহা ব্যতীত খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতকে বৌদ্ধসংঘের ভিতর 'একাভিপ্রায়ী' বলে একটি মতবাদের অভ্যুত্থান হয়। আনন্দের করুণ আবেদনে ভগবান্ তথাগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্ঘে নারীজাতির স্থান

দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বিধিনিষেধের দ্বারা সম্বন্ধ স্ত্রীপুরুষের মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রিতও করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও প্রকৃতির সহজপ্রবণতা বিধিনিষেধের দ্বারা অবদমিত হয়নি। এরই ফলে এবং নবদীক্ষিত জাতিসমূহের অনৈতিক প্রথার সংমিশ্রণে একান্তিপ্রায়ী প্রভৃতি মতের উদ্ভব। এই মতবাদে স্ত্রীপুরুষের সাহচর্যে নিশাকালে নানারূপ গুহ্য সাধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের বৌদ্ধগ্রন্থ গুহ্য সমাজতন্ত্রে বামাচার তন্ত্রের সকল লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়। এর অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেকের উল্লেখ আছে। এই প্রজ্ঞাভিষেকের মূলকথা শক্তিগ্রহণ। গুরু, শিষ্যের অভিলষিতা, সুন্দরী, যোগপারদর্শিনী শক্তির সঙ্গে শিষ্যকে মিলিত করবেন। এই বিদ্যাগ্রহণ বা শক্তিগ্রহণ ব্যতিরেকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। এই শক্তি অপরিত্যাজ্যা। এই শক্তিগ্রহণের নাম বিদ্যাব্রত।

যখন বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তখন পূর্বোক্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধোত্তর এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভূত তা বহু মনীষীই স্বীকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রের সৃষ্টি বৌদ্ধরাই করেছে।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই কথাই বলেছেন যে তন্ত্রের ব্যাপারে "বোধ হয় আমরাই ঋণী এবং বৌদ্ধেরা মহাজন।" শ্রীযুক্ত বিনয় ভট্টাচার্যও অনুরূপ মতের পোষক। তিনি বলেন, "হিন্দুগণ বৌদ্ধতন্ত্র হতে উপাদান গ্রহণ করেছিল এবং তাদের বহু প্রথা নিজেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই ভাবেই তন্ত্রানুশীলন চরমাবস্থা লাভ করে।"

অনেকে বলে থাকেন যে হিন্দুতন্ত্র অতি প্রাচীন। নারায়ণীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে তন্ত্রের যামল গ্রন্থ থেকেই চতুর্বেদের উৎপত্তি। এই সকল মতবাদের মধ্যে প্রাচীনতার প্রক্ষেপ দিয়ে এবং বেদের সঙ্গে সংযোগসূত্র স্থাপন করে তন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা ব্যতীত অপর কোন সত্য নেই। এ পর্যন্ত যত হিন্দু তন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে পণ্ডিত Winternitz এর মতে তার মধ্যে কোনটিই ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত নয়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "তন্ত্রসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বোধ হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই।" কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের রচিত 'গুহ্যসমাজ তন্ত্র' একখানি বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র যে হিন্দুতন্ত্র থেকে প্রাচীনতর এবং হিন্দুতন্ত্র যে বৌদ্ধতন্ত্র থেকে উদ্ভূত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ তো গেল তন্ত্রশাস্ত্রের কালিক পরিচ্ছেদের কথা। কিন্তু এর উদ্ভবস্থান কোথায়? একটি প্রবাদবাক্য আছে:

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্বচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা ॥

"এই বিদ্যা গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত, মিথিলায় প্রকটীকৃত, মহারাষ্ট্রে কোন কোন স্থানে প্রকাশিত এবং গুর্জরে বিলয়প্রাপ্ত।" মনে হয় এই প্রবাদবাক্যের অন্তরালে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কেননা, বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বেই একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। ডাক্তার রমেশ মজুমদার বলেন, "মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" আর্য সভ্যতার অভিঘাত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বাঙলা দেশে আপতিত হয়। প্রাক্তন বিরাট সভ্যতার উৎসাদন সম্ভব ছিল না বলেই দুই সংস্কৃতির একটা মিলন

প্রচেষ্টাও গুপ্তযুগে আরম্ভ হয় এবং এই প্রচেষ্টা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে পালবংশের সময়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "এই সচেতন যোগসাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত-আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল পাল-আমলে; এবং বাংলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল আর্যেতর এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান-বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহা পাল-আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। সমন্বয় ও সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না।" বাংলার এই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র, সহজিয়া মতবাদ প্রভৃতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বঙ্গদেশেই তন্ত্রের উদ্ভব। অধ্যাপক Winternitz-ও বলেন, "তন্ত্রের আদিম জন্মভূমি বঙ্গদেশ বলিয়াই মনে হয়।" ডাঃ রায়ও বলেন, "আগমশাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয়; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তী কালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।"

এই জন্যই বাংলা তন্ত্রপ্রাণ। তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব যুগ থেকেই বাংলায় তন্ত্রসাধনা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সেই জন্যই গৌড়পাদাচার্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় বেদান্তের মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব বাংলাদেশে হওয়া সত্ত্বেও এদেশে বেদান্তের বিশুদ্ধরূপের প্রচার কোন সময়েই হয় নি। এর জন্য দায়ী বাংলার সমাজ-সংস্থান এবং বাঙালীর প্রকৃতি।

অবশ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে তন্ত্র সমন্বয়-শাস্ত্র এবং এর যা পরমতত্ত্ব তা অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব থেকেই গৃহীত। তন্ত্রমতে নির্গুণ ব্রহ্মই মায়াসংযুক্ত হয়ে জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু বেদান্তের মায়া সদসদ্‌ভ্যামনির্বচনীয়া। আর তন্ত্রের মায়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সদ্রূপা। সুতরাং বেদান্তের জগৎ যে অর্থে মিথ্যা তন্ত্রের জগৎ সেই অর্থে মিথ্যা নয়।

তন্ত্র এই সঙ্গে সাংখ্যযোগের চতুর্বিংশতি তত্ত্বও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাংখ্যযোগের সঙ্গে এই খানেই সাদৃশ্যের অভাব যে তন্ত্রমতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর একই প্রকারের সত্তা এবং বহির্জগতে যা যথার্থ পরিণাম বলে মনে হয় তা ঈশ্বর-তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য পরিণামমাত্র।

তন্ত্রের দার্শনিক মত সম্যক্ আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে তন্ত্রের চরম তত্ত্ব পরাসম্বিৎ বা নিষ্কল শিব বা নির্গুণ ব্রহ্ম। এঁকে চরম তত্ত্ব বললেও ইনি কোন তত্ত্বের অন্তর্গত নন—ইনি তত্ত্বাতীত। আমাদের দ্বৈতাত্মক জগতে 'অহম্' আর 'ইদম্' এই বোধ রয়েছে। পরা সম্বিতে এই বোধ দুইটির সমবন্ধাবস্থা। এই পরাসম্বিতের স্পন্দ-প্রথম শিবতত্ত্ব। আর এরই বিপরীত দিক্ শক্তিতত্ত্ব। এই তত্ত্বদ্বয় নিত্যযুক্ত সন্তত-সমবায়িনী। এই তত্ত্বদ্বয় উৎপন্ন বস্তু নয়। প্রলয়েও এরা একই অবস্থায় থাকে। শক্তিতত্ত্ব—'নিষেধব্যাপাররূপা'—পূর্ণজ্ঞানের অভাব এতে হয়। আর শিবতত্ত্ব—প্রকাশমাত্র—অহম্ বোধমাত্র। শক্তিতত্ত্ব—বিমর্শ—অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি। এতে 'ইদম্' বীজ রয়েছে—এই 'ইদম্' বীজই জগৎরূপে পরে পরিবর্তিত হয়। শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব বস্তুগত্যা পৃথক্ নয়। সেইজন্যই শিবতত্ত্বকে বলা হয় উন্মনী শক্তি—'যত্রগত্বা তু মনসো মনস্থং নৈব বিদ্যতে'—যেখানে গিয়ে মনের মনত্ব থাকে না। যেখানে অহম্ বোধমাত্র থাকে। আর শক্তিতত্ত্বের নাম সমনীশক্তি—'মনঃসহিতত্বাৎ সমনা'—মনের সঙ্গে যা থাকে। 'সমনা নাম সা শক্তিঃ সর্বকারণকারণম্'। সমনা নামক সেই শক্তি সর্বকারণেরও কারণ। এই শিবশক্তি তত্ত্বদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয় সদাশিব বা সদাখ্য তত্ত্ব। এই তত্ত্বে

'অহম্-ইদম্'এর একত্রানুভূতি। এখানে ইদম্—অহম্এরই অঙ্গ—পৃথক্ নয়।

সদাখ্যতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় ঈশ্বরতত্ত্ব—এতে ইদম্ এবং অহম্ এর সহাবস্থান হলেও ইদম্ অহম্ এর প্রত্যয়ের বিষয়। ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় সদ্বিদ্যাতত্ত্ব বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব। এখানে অহম্-ইদম্ সমপ্রভাবসম্পন্ন এবং বিশ্লেষণোন্মুখ। এর পরেই মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তির কঞ্চুকের সাহায্যে অহম্—ইদম্ এর বিশ্লেষ ঘটে। মায়াশক্তি তাকেই বলে যার দ্বারা ব্রহ্ম থেকে জগৎকে পৃথক্ করে দেখা হয়। কঞ্চুকের অর্থ আবরণ। এর সংখ্যা ৫টি। ১। কাল—পরিচ্ছেদকারী শক্তি ২। নিয়তি—যা স্বতন্ত্রতা আনায় ৩। রাগ—যা আসক্তি আনে পূর্ণস্বরূপেরও মনে। ৪। বিদ্যা—যা সর্বজ্ঞকে অল্পজ্ঞ করে। ৫। কলা—যা সর্বময় কর্তাকে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব দেয়। এই মায়া এবং কঞ্চুক-সকলের জন্যই সদ্বিদ্যাতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয় পুরুষতত্ত্ব এবং প্রকৃতিতত্ত্ব। এখানে অহম্, ইদম্ সম্যক বিশ্লিষ্ট। পুরুষতত্ত্ব অহম্—প্রকৃতি তত্ত্ব ইদম্। পুরুষ বহু। প্রকৃতি সকল-সঙ্কুচদ্রূপা শক্তির সামান্য রূপ। প্রকৃতি তিন গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষের সাহচর্যে ত্রিগুণের বিক্ষোভে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও জগৎ সৃষ্টি ঘটে।

তন্ত্রের এই তাত্ত্বিক বিচারে এই কথাই মনে হয় যে অদ্বৈত বেদান্তে যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয়ের যে মিথুনী-করণকে 'নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' বলা হয়েছে এবং যুষ্মৎ বা ইদম্‌কে মিথ্যা বা অধ্যাস বলে অস্বীকার করা হয়েছে সেইখানে তন্ত্র জগতের দিক্ থেকে একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। এই ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিসহ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে এর উপযোগিতা খুবই আছে।

উপরে যে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তাই অবলম্বন করে শাক্তমতবাদ এবং শক্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' "সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়।" বাংলার তন্ত্রসাধক কালীকুলের সাধক। কালীর উপাসনা বাঙালীর প্রাণের উপাসনা। এই মূর্তিকল্পনায় শবরূপ মহাদেব—শিবতত্ত্ব—তিনি অহম্ বোধে মগ্ন। আর কালী—শক্তিতত্ত্ব—তিনি ক্রিয়াশক্তি—সৃষ্ট্যুন্মুখী। তাঁর মধ্যে সৃষ্টির বীজ রয়েছে। অন্যান্য দেবী-মূর্তির কল্পনাতেও এই শিব-শক্তিতত্ত্বেরই প্রকাশ।

এই যে শক্তিতত্ত্ব—এর মূল কিন্তু বেদে। ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলের দেবী-সূক্তে আছে :

'ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥'

"আমার দ্বারাই লোক জীবিত আছে। অন্ন-গ্রহণ ও শ্রবণাদিও করছে। আমাকে যে অবহেলা করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান্। এইজন্য তোমাকে বলছি।"

এই শক্তিই মানুষকে বদ্ধ করে। চণ্ডীতে আছে :

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

"সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহে নিক্ষেপ করেন।' কিন্তু 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—"তিনিই প্রসন্না হয়ে বরদা হলে মানুষের মুক্তিবিধান করেন।"

সেইজন্য দেবীর পূজা করতে হয়। এই সাধন বাহ্যিক পূজাও হতে পারে বা আন্তর ধ্যানজপাদিও হতে পারে। দেবীপূজার গূঢ় রহস্যের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয় এবং মন্ত্রাদির যে তত্ত্ব তাও এখানে ব্যাখ্যা করার সময় নাই। শুধু এইটুকুই জানাতে চাই যে বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানে এবং মন্ত্রাদির ব্যবহারে পরাবাক্, বিন্দু, নাদ ও বীজাদিকে অবলম্বন করে একটি বিরাট দার্শনিক পটভূমিকা

আছে। মন্ত্রাদি নিরর্থক শব্দমাত্রই নয়। যাঁরা জ্ঞানপিপাসু তাঁরা Sir John Woodroffe এর পুস্তকাদি এবং তন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে বহু তথ্য অবগত হবেন।

তন্ত্র বলেন যে, মানবের দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ। এই দেহে শিব-শক্তি আছেন। পরম শিব সহস্রারে এবং শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে। অবরোহক্রমে এই জগতের সৃষ্টি। আরোহক্রমে সাধক কুণ্ডলিনীর সঙ্গে পরম শিবকে মিলিত করতে পারলেই মোক্ষ লাভ হবে। এই মিলনসাধনের জন্য তন্ত্রে পূজা, ধ্যান, মন্ত্রজপ, হোম, দীক্ষা প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করছি। পূর্বেই বলেছি যে তন্ত্র আর্য ও আর্যেতর ভাবধারার সংমিশ্রণ। এর ফলে তন্ত্রের মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক আচার মিশ্রিতভাবে আছে। তন্ত্রে সাধকদের জন্য যে সকল আচার নির্দিষ্ট হয়েছে তা কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সাতটি—(১) বেদাচার (২) বৈষ্ণবাচার (৩) শৈবাচার (৪) দক্ষিণাচার (৫) বামাচার (৬) সিদ্ধান্তাচার (৭) কৌলাচার। এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি বেদপর এবং শেষ তিনটি আচার অবৈদিক ভাবপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রথম চারটি আচার হিন্দুধর্মের—বিশেষ করে বাংলা দেশের মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙ্গালীর ধর্ম-সাধনাকে প্রাণবন্ত করেছে। তন্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়ার সহযোগে একটি সাধনার সহজ পথের আবিষ্কার করেছে। বাঙ্গালী জাতির পূজা, দীক্ষা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি সকল বিষয়ই তন্ত্রের এই সকল আচারের দ্বারা পরিচালিত।

কিন্তু বামাচার প্রভৃতি—যা গোপনে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়াদির সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়—তা অনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর আস্থিত। এই সকল আচারে পঞ্চমকারের অনুষ্ঠানে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং স্বকীয়া বা পরকীয়া স্ত্রীগ্রহণ করা হয়।

অবশ্য তন্ত্রে অধিকারভেদে তিনটি ভাবকে আশ্রয় করার কথা আছে। দিব্যভাব, বীরভাব, পশুভাব। দিব্যভাবের যাঁরা মানুষ তাঁরা উচ্চস্তরের লোক। তাঁদের পক্ষে মদ্য অর্থে সহস্রার ক্ষরিত সুধাধারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে ছেদন পূর্বক নির্বিষয়তালাভই মাংসগ্রহণ, অহংকার দম্ভ প্রভৃতিকে বশীভূত করাই মৎস্য ভক্ষণ, আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি অষ্টমুদ্রাকে দমন করাই মুদ্রা গ্রহণ এবং ইড়া-পিঙ্গলা-বাহিত বায়ুর সুষুম্নাতে সংযোগই স্ত্রী গ্রহণ। যাঁরা পশুভাবে স্থিত তাঁদের পক্ষে সম্বিদা, গুড়ার্দ্রক প্রভৃতি মদ্যের অনুকল্প, লবণার্দ্রক মাংসানুকল্প, লবণতৈলাক্ত দগ্ধকুষ্মাণ্ড মৎস্যানুকল্প, ঘৃতে ভর্জিত মুগ প্রভৃতি বীজ মুদ্রানুকল্প এবং রক্ত চন্দনানুলিপ্ত অপরাজিতা এবং করবী পুষ্পের সংযোগই পঞ্চম মকারানুকল্প।

বীরভাবে কিন্তু মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার আবশ্যিক এবং বামাচারীদের মতে কলিযুগে পশুভাব প্রতিষিদ্ধ। কাজেই যেহেতু দিব্যভাবের সাধক দুষ্প্রাপ্য সেইজন্য অধিকাংশ তান্ত্রিকেরই বীরভাবে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করেই সাধন করা উচিত—বামাচারীদের মতে। এই ভাবে বামাচার বাঙলার সমাজে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে।

বামাচার বা বীরভাবের সাধনের অবশ্য একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি আছে। যে সকল লোক সহজাত প্রবৃত্তির অবদমনহেতু মানসিক-অপচার সম্পন্ন (psycho-pathological) তাদের মানস গ্রন্থির মোচনের জন্য বা সংস্কারের উদ্গতির জন্য বীরভাবের সাধনা ফলদায়ক হতে পারে। ভোগের পথে মানুষের মনকে ধীরে ধীরে কি ভাবে ঈশ্বরাভি-মুখী করা যায় সেই অসাধ্য সাধনেই বীরভাবের প্রচেষ্টা। রূপরসমুগ্ধ অস্বাভাবিক মনোবিশিষ্ট মানুষকে সাহায্য করাই বীরভাবের উদ্দেশ্য। সুস্থ মনঃসম্পন্ন স্বাভাবিকবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের জন্য কিন্তু এ পথ নয়। এ পথ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়

'পায়খানার পথ'। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, "যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করে ফেলছে অবিলম্বে তা ত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান দেখ নি। দেশের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি দেখি আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করেছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলে বোধ হয়। এই বামাচার সম্প্রদায় আমাদের বাংলা দেশের সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে আর যারা রাত্রে বীভৎস ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে তারাই আবার দিনের বেলা উচ্চকণ্ঠে আচারের কথা বলে।"

সুতরাং এই বামাচার প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাপার সযত্নে পরিহার করে তন্ত্রের মধ্যে যা কিছু ভাল জিনিস আছে তা গ্রহণ করতে হবে।

তন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা মাতৃভাবে দেবীর উপাসনা এবং এই উপাসনা করতে হবে নির্ভয় হয়ে। অভয়প্রতিষ্ঠ সাধকই যথার্থ বীর সাধক। মদ্য-মাংসাদিসেবী তথাকথিত বীরভাবাবলম্বী বীরসাধক নয়। এই বীরসাধক ছিলেন বীরেশ্বর বিবেকানন্দ যিনি ভীষণকে ভীষণতার জন্যই পূজা করতে চেয়েছিলেন, যিনি উপদেশ করেছিলেন তাঁর শিষ্যকে যে, যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবে তখন 'মনে রেখো তিনি যেন তোমার প্রার্থনা শুনতে বাধ্য হন। মায়ের কাছে কোন আর্তভাব যেন প্রকাশ না পায়। স্মরণ রেখো।' এই তো যথার্থ বীরভাবের কথা।

আমাদের দেশের এই দারুণ দুর্দিনে আমরা তো বহুস্থানে দেবীর পূজা বহুভাবে করছি। কিন্তু ফল কোথায়? অঙ্গহীন হলে বা শ্রদ্ধার অভাব হলে পূজার ফললাভ হয় না—বিপরীত ফলও ঘটে। কাজেই পূজা ঠিক ভাবে করতে হলে অভয়প্রতিষ্ঠ হয়েই করতে হবে। তখনই মায়ের অমোঘ আশীর্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হবে।

স্বামী সারদানন্দের 'ভারতে শক্তিপূজা' থেকে এই বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি উপহার দিয়ে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি।

"অন্য দেশে মা শত হস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাতপীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক—কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞান সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে—আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ? উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে—আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? শাস্ত্র যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবীর ঐ ভাব যে তাঁহার ধ্যানমন্ত্রেই রহিয়াছে। ঐ শুন, ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

প্রতিকার্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখ ত্যাগে, আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর। তাঁহাকে প্রসন্না কর, দেখিবে শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি ফিরিয়া চাহিবেন! তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্মাতার নিত্য সহচরীদল—বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রভৃতি—আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া প্রতি কার্যে তোমার সহায়তা করিবেন।"

আরতি

কথা—ইন্দিরা দেবী　　　　　　সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায়

জয় জয় সুন্দর নন্দকিশোর!
জয় পরমেশ্বর, জয় যোগেশ্বর, জয় মধুসূদন, জয় চিতচোর!
জয় চিতনন্দন, জয় দুঃখভঞ্জন, জয় চিরসজ্জন, জয় সুখধাম!
জয় গিরিধারী, হৃদয়বিহারী, কৃষ্ণ মুরারি সুধাময়নাম!
জয় নারায়ণ, জয় কমলাসন, নিত্য নিরঞ্জন জয় ঘনশ্যাম!
জয় শিবশঙ্কর, উমা-মনোহর, সীতাবল্লভ, রঘুপতি রাম!
জয় নারায়ণি, জয় তারা, জয় জয় মা দুর্গা, জয় কালী!
জয় ভাগীরথি, জননী গঙ্গা, জয় রাধা, জয় বনমালী!
দেবদেব জয়, ভকতবছল জয়, সন্তনকী ভক্তনকী জয়!
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় হরি,
হরিচরণনকী জয়!
জয় গুরু নানক, মহাপ্রভো জয়, রামকৃষ্ণ অমরণকী জয়!
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় হরি,
হরিচরণনকী জয়!

শেষ স্তবকটি "জয়গুরু নানক……" গাওয়া হবে "দেবদেব জয়……" সুরে।

সা সা ়পা পা । জ্ঞা জ্ঞা রসা রা I সণ্ সা রা মা I পা র্সা -া -া I
জ য় জ য় সুন্ — দ র নন্ — দ কি শো — — র

সা রা সনা সা । ণধা ণা ধপা ধা I পমা পা মগা মা । জ্ঞরা জ্ঞা রসা রা I
জ য় প র মে — শ্ব র জ য় যো — গে — শ্ব র

ণ্ সা রা জ্ঞা । মা পা ধা ণা I র্সা র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্সা -া -া -া II
জ য় ম ধু সূ — দ ন জ য় চি ত চো — — র

না না না সা । নধা না ধপা ধা I গা পা ধা না । রা -া সা সা I
জ য় চি ত নন্ — দ ন জ য় দু খ ভ ন্ জ ন
জ য় না — রা — য় ণি জ য় তা — রা — জ য়

না সা রা জ্ঞা । রা জ্ঞা রা রা I সনা সা রা জ্ঞা । সা -া -া -া I
জ য় চি র স জ্ জ ন জ য় সু খ ধা — — ম
জ য় মা — দু র্ গা — জ য় কা — লী — — —

না রা রা সা । সা -া সরা সনা I না রা রা সা । সা -া সরা সনা I
জ য় গি রি ধা — রী — হৃ দ য় বি হা — রী —
জ য় ভা — গী — র থি জ ন নী — গ ং গা —

গা মা পা ধা । না না ধা পা I গা -া রা রা । সা -া -া -া I
কৃ ষ্ ণ মু রা — রি সু ধা — ম য় না — — ম
জ য় রা — ধা - জ য় ব ন মা — লী — — —

সা মা মা মা । রা পা পা পা I গা ধা ধা ধা । স্না না না না I
জ য় না — রা — য় ণ জ য় ক ম লা — স ন
দে — ব দে — ব জ য় ভ ক ত ব ছ ল জ য়

পা সা সা সা । ধা রা রা রা I না গা রা না । সা -া -া -া I
নি — ত্য নি র ন্ জ ন জ য় ঘ ন শ্যা — — ম
স ন্ ত ন কী — ভ ক ত ন কী — জ — — য়

গা রা সা না । ধা না পা ধা I রা সা না ধা । পা ধা গা পা I
জ য় শি ব শ ং ক র উ মা — ম নো — হ র
জ য় গু রু জ য় গু রু জ য় গু রু জ য় গু রু

সা রা গা মা । পা ধা না সা I রা গা মগা রগা । সা -া -া -া II
সী — তা — ব ল্ ল ভ র ঘু প তি রা — — ম
জ য় হ রি হ রি চ র ণ ন কী — জ — — য়

আমি ও আমার

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

"আজ আপনি এ অফিসের এমন বোলবোলাও দেখেছেন—" গণেশবাবু নিজের বুকে নিজে একটি থাবড়া বসিয়ে উদাত্তস্বরে বলেন, "এ আফিস দাঁড় করিয়েছে কে? এই আমি! বুঝলেন মশাই এই আমি। প্রথম যখন ঢুকেছি, কী ছিলো এদের? কিছু না! যে ক'টা কেরাণী ছিল মাথাগুনতি একটা চেয়ার ছিল না তাদের! বিশ্বাস করছেন না? হাসছেন? আমিইতো এসে দশদিন শুধু এর টেবিলে ওর টেবিলে উঁকি মেরে মেরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি! কাজ করতে বসেতো মশাই চক্ষু ছানাবড়া! চেয়ার নেই, টেবিল নেই, ঘড়ি নেই, কলিংবেল নেই, গরমে সেদ্ধ হও একখানা পাখা নেই, সে এক হরি ঘোষের গোয়াল। থাকার মধ্যে ছিলো খালি ফাইল! বুনো 'এক ইহুদী সাহেব হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সে ব্যাটা বুঝতো খালি কাজ, আর চিনতো শুধু ফাইল। কমপ্লেন করলে হাসতো, বলতো 'কাজ হচ্ছে কি না তাই বলো বাবু।' তবু দমিনি, ব্যাটার মাথায় পেরেক ঠুকে ঠুকে বুঝিয়ে ছেড়েছি—শুধু কাজ হলেই হয়না সাহেব, সাজও চাই। যুগটাই সাজের। যখন যে অফিসে অর্ডার প্লেস করতে গেছি, এসে তা'দের জাঁকজমকের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে সাহেবের মন ভিজিয়েছি। এখন আমাদের অফিসের কায়দা কানুন দেখুন? দেখে অপরে শিখছে।

সাহেব লোকটা ছিলো ভালো। মারা গেলো। এখন যে ব্যাটা এসেছে, সে একেবারে 'র'। বুঝলেন কি না? কাজের 'ক' জানে না। যা করি সব এই আমি। গণেশবাবু যদি একদিন রোগে পড়লো তো অফিস অন্ধকার! রাগ করে বলি গণেশবাবু কি অমর বর নিয়ে এসেছে? সত্যি মশাই ভাবি এক একদিন, আমি মরলে এদের কী হবে!"

কথার মাঝখানে বার পাঁচ ছয় বুকে থাবড়া বসিয়েছেন গণেশবাবু।

কিন্তু ভাবছি বুকে থাবড়া কি একা গণেশবাবুই মারেন? যেদিকে তাকাই, সেদিকেই তো ওই একই দৃশ্য। ওই বুকে থাবড়া। ওই আমি! সে 'আমি' কখনো আ য়ে আকার আ—মি, কখনো ময়ে দীর্ঘঈ আমী! আমিকে বিকশিত করবার জন্যে চেষ্টার আর অন্ত নেই। সঙ্কোচ কুণ্ঠার বালাই-ই কি আছে ছাই?

মাথায় টাক, কোলকুঁজো, 'খোনা' গলা কবরেজ মশাই, তিনিও তাঁর জরাজীর্ণ বুকের খাঁচা খানার উপরও থাবড়া মেরে বলেন,—"বুঝলে হে, সায়েব ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছিলো, কান্না-কাটি পড়ে গিছলো বাড়ীতে, সেই লোক এখন বিশ মাইল পথ হাঁটছে। মোমিনপুরের সাহা মশাইয়ের কথা বলছি। চিরকেলে রুগীর ঘর আমার; জরবিকারে পড়েছিলো। টাকার গরমে বুঝলে কিনা—'টাইফাড' হয়েছে বলে বিলেতফেরৎ ডাক্তার আনলো। শুনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলাম, বলি ডাক বাবা ডাক! পয়সা হয়েছে, ছড়া চারটি। নিদেনকালে তো এই হরিহর কবরেজের স্বর্ণ-সিন্দুর? হলোও তাই সাহা মহাশয়ের বড়ো মেয়ে গাড়ী চড়ে এসে কেঁদে পড়লো। আমিও বাবা তেমনি খোটেল, খোট ধরে বসে রইলাম। যাবো কেন রে বেটি যাবো কেন? বিলেতফেরৎকে ডাক? বলি এলোপাথি ডাক্তার এলোপাথাড়ি চিকিচ্ছে করে বুঝি সেরে ফেলেছে তোর বাপটাকে? মেয়েটা কেঁদে অস্থির! শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো।

গিয়ে দেখি রুগীর নাভিশ্বাস উঠেছে। সেই রুগীকে টেনে তুললাম বুঝলে হে? এই আমি! এই হরিহর কবরেজ! সে ব্যাটা এখন বিশ মাইল হাঁটছে—।"

নিবারণ উকিল বঙ্কিম হাস্যে বলেন,—"কতো বড়ো বড়ো জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘাল করে এলাম হে, এতো একটা ছোকরা ব্যারিষ্টার! 'কালাচাঁদ খুনে'র কেস্‌টা জানো তো? সাত বছর চলেছিলো! সে কেস্‌ জেতালো কে? এই আমি! কালাচাঁদের জ্ঞাতি কাকা তারাচাঁদের পক্ষে ছিলাম আমি। সাক্ষীসাবুদের জোরে প্রমাণ হয়ে গেছলো ভাইপোকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলো হতভাগা! ফাঁসি হয় হয়—নিদেন পক্ষে যাবজ্জীবন, খপ করে এমন একটি মোক্ষম্‌ প্যাচ কসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও পক্ষের কেস্‌ গেলো ভেস্তে। ব্যস্‌ ফাঁসির বদলে—একেবারে বেকসুর খালাস! বুক বাজিয়ে বলি ব্যাটা আমি তোর জীবনদাতা!"

ক্লাসে দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে দিতে প্রফেসর অমুক ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে কোমল হাসি হেসে বলেন,—"পড়ানোটা পছন্দ হচ্ছে তো? আমার ক্লাশে পিন পড়লে শব্দ পাওয়া যায়—এমনি একটা বদনাম তো আছে আমার। আর পছন্দর কথা! সে বলতে গেলে—হাসির ব্যাপার। এক এক সময় এমন হয়, হয়তো জুলিয়াস সীজার পড়াচ্ছি, কী হ্যামলেট! অন্য ক্লাস ভেঙে সমস্ত স্টুডেন্টরা এসে দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে!"

সাদা কাপড়ের তালি মারা শিক-বারকরা ছাতাটা বগলে চেপে ঘটক মশাই সদর্পে বলেন,—"কালো মেয়ে? ভাবনাটা কি? কালোকোলো কানা খোঁড়া, এই সব মালের জন্যেই তো কেশব ঘটক আছে। আমি এই কেশব ঘটক বুঝলেন মশাই, কালোকে সাদা, বেঁটেকে লম্বা, কানাকে পদ্মলোচন করে তুলতেপারি।"

মেয়ের বিয়ে চুকলে ভাগে ভুরু নাচিয়ে বলে, "আমি না থাকলে এতোবড়ো কাণ্ডটি মামা উদ্ধার করতো কি করে দেখতাম! বাজার করেছি আমি, স্যাকরা বাড়ী দরজী বাড়ী ছুটোছুটি করেছি আমি, ডেকরেটর জোগাড় করেছি আমি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ আগাগোড়া ম্যানেজমেণ্টের ভার নিয়েছি এই আ—মী ঈ—ঈ!

ঘরের গৃহিণী দিনান্তে দুশোবার শোনান, "আমি যাই মেয়ে তাই এখনো এ সংসার করছি। অন্য মেয়ে হলে কোন্‌কালে সংসার ফেলে ধেই ধেই করে বেরিয়ে যেতো! তোমার সংসার দেখছি আমি, তোমার ছেলেপুলে সামলাচ্ছি আমি, তোমার আত্মীয়-কুটুমের মানমর্যেদা দেখেছি আমি, যে দিকে জল পড়ছে, সেদিকে ছাতি ধরছি আমি।"

আট টাকা মাইনের ঠিকে ঝি, সেও মুখ ঘুরিয়ে বলে,—"আমি যাই তাই এই পোড়া কড়া ফরসা করে তুলনু মা! আর কেউ পারুক দিকি? আপনার বাড়ীর কাজ আমি ছাড়া আর কাউকে করতে হবেনি—হুঁ!"

বিপিন খুড়ো হাতের ইলিশটা নাকের সামনে দুলিয়ে বলেন,—"মাছ কিনলাম! আড়াই টাকা সের! পীওর গঙ্গার ইলিশ! পারবে আনতে আড়াই টাকায় গঙ্গার ইলিশ? হোল্‌ ক্যালকাটার সমস্ত মার্কেট ঘুরে এসো হে, পারবে না! আমি ভিন্ন সাধ্য নেই কারো।"

নীনা মাসীমা চোখ টেনে টেনে বলেন,—"আমি গিয়ে না পড়লে ওদের ফাংশন সেদিন মাথায় উঠতো! কী অব্যবস্থা, কী অব্যবস্থা! আমিই তখন নিজের বাড়ী থেকে কার্পেট নিয়ে যাই, পর্দা নিয়ে যাই। মেয়েদের সাজাবার জন্যে শাড়ী গহনা স্নো পাউডার। তারপর একে ধ'রে তাকে ধ'রে মাইক আনানো, ফুলের মালা আনানো! সত্যি, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কি যে হতো ওনাদের। অথচ আমি তো যাবো না ব'লেই ঠিক

করেছিলাম, নেহাৎ ওরা এসে ধরে পড়লো 'নীনা মাসি, তুমি না গেলে চলবে না।' তাই শেষ অবধি—সত্যি আমাকে যে কেন সব্বাই চায় !"

সবজ পিসিমা ঘুরন্ত পাখার নীচে ধপ করে বসে পড়ে বলেন,—"পাঁচজনের দলে মিশে হেঁটে কালী-ঘাট গিয়ে, হার্টফেল করতে করতে রয়ে গেছি। বাবা আমি পারি ওই দু মাইল রাস্তা হাঁটতে ? অন্য মাগীরা পারে, চরণে দণ্ডবৎ তাদের। বলে আপন সংসারে একসঙ্গে একসের ময়দা কখনো মাখতে পারলাম না। আমি বাবা, হাঁটতে, খাটতে মোটে পারিনে ! দু' পা যাই তো রিশ্‌কো চড়ি।"

ছোট বোন মুখ ঘুরিয়ে বলে,—"ফ্যাসানই বলো, আর যাই বলো, পাট ভাঙা লাট্ হয়ে যাওয়া শাড়ী পরে পথে বেরোতে 'আমি' পারবো না ! সস্তার সাবান, সস্তার স্নো, এসব যে ব্যবহার করে করুক, আমি করছি না।"

বড়ো বোন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেন,—"দিনরাত ফ্যাসান ! দিনরাত সাজগোজ ! মেম সাহেব নাকি। আমি বাবা সার বুঝি মোটা সেমিজ মোটা শাড়ী !"

এ সবের সঙ্গে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যানা, বিচার বিশ্লেষণ, অনেক কিছুই থাকে, যার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'আমি'।

শুধু যে সাবালকরাই অপরাধী, তাও নয়। নাবালক বালক শিশু, এদের জগতে উঁকি মেরে দেখুন ওই আমি।

"আবার আমার সঙ্গে খেলতে এসেছিস ? সে দিন কেমন গো হারান হারিয়ে দিয়েছিলাম ? ইচ্ছে করলে আমি তোকে দশবার গেম্ খাওয়াতে পারি বুঝলি ?"

"মাষ্টার ? মাষ্টার আমার করবে কি ? আমি এমন চালাকি খেলতে পারি যে, মাষ্টার 'থ' হয়ে যাবে।"

"কেমন হয়েছে ? বেশ হয়েছে ! বড়ো যে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিলি ? আমি ওসব মায়া দয়া বুঝি না এমন ল্যাং মেরে দেবো—যা এখন নাকে আইডিন লাগাগে যা !"

"দুয়ো ! দুয়ো ! কেটে গেলো, কেটে গেলো ! পচা সুতো নিয়ে প্যাঁচ লড়তে আসে ! আমার বাবা ডবল মাঞ্জা দেওয়া সুতো !"

"মাঞ্জা দিয়েছিস তো রাজা হয়েছিস ! এই পচা সুতোতেই ঘুড়িটাকে কি রকম তুলি দেখ ! উ—ই আকাশে চলে যাবে।"

বাগ্‌যুদ্ধে খাটো নয় কেউ।

আমিকে খাটো করতেও রাজী নয় কেউ।

ঘুড়ির মতো করেই 'আমি'কেও আকাশে তুলতে চায়, কথার লাটাই থেকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে।

শিশুদের সরল ভেবে নিশ্চিন্ত থাকা যায় ওদের রাজ্যে উঁকি মারলে দেখা যাবে, সেখানে মিথ্যা অহঙ্কারেরই বেসাতি। অর্থাৎ এ 'আমি' জন্মগত আমি, পৃথিবীর থেকে কুশিক্ষা পাওয়া জিনিস নয়।

এ এক প্রকার আমি।

বলা চলে অহং আমি।

আর একপ্রকার আমি আছে, তাকে 'মোহন আমি' আখ্যা দেওয়া চলে। এ আমির মধ্যে সত্যই অহংভাব নেই, আছে একটি নির্দোষ গলেপড়া ভাব।

যথা—

"মিষ্টি ? মিষ্টি খাবো আমি ? খেপেছো ? না ভাই না, আধখানি, সিকিখানি, কিছুনা ! ঝাল ঝাল কিছু দিতে বরং খেতাম, কিন্তু সন্দেশ ? অসম্ভব। আমাকে সন্দেশ খেতে বলা আর ফাঁসির হুকুম দেওয়া এক !"

অতঃপর হয়তো—কবে কখন এবং কোথায় উক্ত ভদ্রমহিলাকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন নিয়ে সাধ্য সাধনা করা হয়েছিল, এবং তিনি তা'র থেকে একটুকরোও দাঁতে কাটেননি, তারই ইতিবৃত্ত শুনতে হবে ঘণ্টাখানেক ধরে। তার সঙ্গে ফাউস্বরূপ

আরো শুনতে হবে তেতো দেখে তাঁর গায়ে ক-ডিগ্রী জ্বর আসে, আর ঝাল দেখলে কি পরিমাণে প্রসন্ন হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি ঠাণ্ডাজলে নাইতে ভালোবাসেন কি গরম জলে। শীতকালে তিনি পশমী পোষাক ব্যবহার না ক'রে রেশমী পোষাক ব্যবহার করেন কেন, ইত্যাদি।

আবার ধরুন—

"ধর্মপুস্তক? ও আমি পড়তে পারিনে বাবা! কী করে যে লোকে ওই সব নীরস জিনিস সহ্য করে! চোখবুজে বসে ধ্যান জপ, গীতা ভাগবত নিয়ে বসে থাকা ও সব দেখলেই আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

"গান শুনতে ভালোবাসি কি না জিজ্ঞেসা করছেন? ভীষণ ভালোবাসি, সাংঘাতিক ভালোবাসি। আমার মতেতো যে গান শুনতে ভালোবাসেনা, সে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু হলে হবে কি? শোনবার তো উপায় নেই। কেন নেই, তাই বলছেন? অসম্ভব মাথা ধরে যে! গান শুনলাম কি, মাথা ছিঁড়ে পড়তে থাকবে। নাঃ, গান শোনা আমার হয় না। অথচ কী ভালো যে বাসি!"

"ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা! ও আমাকে কাটলেও হবে না। ঘুমের জন্যে আমি বিখ্যাত। জীবনে একবার সূর্যোদয় দেখেছি, কবে জানো? যে দিন আমি পৃথিবীতে জন্মালাম। শুনেছি—ভোরবেলা ভূমিষ্ঠ হয়ে ছিলাম আমি।"

মোহন আমির স্বরূপ হচ্ছে—অপরকে ডেকে ডেকে শোনানো যেটা সবাই করে সেটাই আমি করিনা। যে আচরণটা সচরাচর শোভন নয়, সেইটাই আমি করে থাকি! সেইটাই আমার বৈশিষ্ট্য। অন্তত সেই পথেও তো আমিকে বিকশিত করা যাবে!...আমাকে নিয়ে সমালোচনা তো হবে!

এর প্রতিবাদ করতে যাওয়াও বিপদ! চুপকরে শোনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কারণ আপনিও জানেন, আমিও জানি; এ প্রসঙ্গের প্রতিবাদ তুললে ওনাদের সুবিধাই করে দেওয়া হয়। আরো বিশদ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উনি তখন বলতে শুরু করবেন—"তা কি করবো বাপু? আমি মোটেই—"

আমি! আমি! আমি!

ধারে কাছে, আশে পাশে, জলে স্থলে, আকাশে অন্তরীক্ষে, নর নারী শিশু বৃদ্ধ পণ্ডিত মূর্খ, উঁচুতলা নীচুতলা সর্বকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আমি! আমী! আ—মি!

আবার শুধু যে 'আমি'কে সহস্র বর্ণে বিকশিত করেই শান্তি আছে তাও নয়। যতোক্ষণ না আমার 'আমি'কে দিয়ে তাড়া দিয়ে তোমার 'আমি'কে ধূলিসাৎ করতে পারছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই।

কাজেই আপনি যখন বলেন, "ক'দিন খুব সর্দিকাসি? আমি তো ব্রঙ্কোনিমোনিয়া থেকে মরে বাঁচলাম! এখনো ডাক্তার সেনের ট্রীটমেণ্টে আছি—"

আপনি যদি বলেন, "সে দিন হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম—"আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করবো "সেবার এলাহাবাদ ষ্টেশনে আমার যা কাণ্ড হয়েছিলো—"

আপনার গিন্নী যেই মাত্র বলেন,—"আমার নাতনীটা যে কী দুষ্টু হয়েছে—" তদ্দণ্ডে আমার আমার গিন্নী বলে উঠবেন "আর বোলোনা ভাই আমার নাতীটার কথা যদি শোনো—"

অতঃপর আপনাদের শুনতেও হবে। অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত না হোক্ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। যতোক্ষণ না আপনার গিন্নী নিরস্ত হয়ে নীরব হবেন, ততোক্ষণ ধরে চালিয়ে যাবেন আমার ইনি!

প্রাধান্য চাই, এই হচ্ছে কথা!

আপনার বাড়ীর চাকর-বাকররা যদি চোর হয়, তো আমার বাড়ীর চাকর-বাকররা অবশ্যই

ডাকাত! আপনার বৌমাটি 'লক্ষ্মী' হলে, আমার বৌমাটি সাক্ষাৎ ভগবতী!

আপনার সংসারে চায়ের খরচা মাসে পঞ্চাশ টাকা?

কোথায় আছেন আপনি? আমার সংসারে পানসুপুরির খরচাই তো মাসে একশো।

আপনি রাত জেগে বই পড়েন?

হরেকেষ্ট! আমার তো অর্ধেক দিনই পড়তে পড়তে রাত কাবার হয়ে যায়।

আমার কণ্ঠ থেকে যদি হতাশ সুর ওঠে, "সংসার চালানোতো দায় হয়ে উঠলো মশাই—"সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাসিকা থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠবে "আমি তো মশাই আজ ছ'মাস ধরে ধারের ওপরেই আছি।"

উদাহরণের শেষ নেই, কিন্তু পুঁথির শেষ আছে। শেষ আছে পাঠকের ধৈর্যের। অতএব উদাহরণে ইতি। মোটকথা আমরা একে অপরকে কোনো কিছুতেই বাড়তে দিতে রাজী নই। আপনার ভালো না লাগলেও আমি আমার 'আমি'কে নিয়ে আপনার কানের কাছে অহরহ ঢাক পিটোবো। আর—তালে বে-তালে, চালে বে-চালে, বিপদে সম্পদে, স্বভাবে অভাবে, কোনো বিষয়েই আমার থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে উঠতে দেবোনা। বাড়তে না পারি চাড় দিয়ে তুলে ধরবো নিজেকে।

বাস্তবক্ষেত্রে অপরকে ছাড়িয়ে বাড়তে গেলে ঝামেলা ঢের। তা'তে অর্থের আবশ্যক, সমর্থের আবশ্যক, বুদ্ধির আবশ্যক, শক্তির আবশ্যক, বিশেষ কোনো গুণ থাকা আবশ্যক, বিশেষ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, হ্যানো ত্যানো অনেক ফিরিস্তি। কিন্তু দেখুন, বাক্যের ক্ষেত্রে বাড়তে, ওসবের বালাই মাত্র নেই। আবশ্যক শুধু কথার লাটাইতে ভালো মাঞ্জা দেওয়া, কিছু সুতোর টক্! সে সুতো তাক মাফিক ছাড়তে পারলেই হলো! অনায়াসে অমিকে আকাশে চড়িয়ে দেওয়া যাবে।

একে ওকে তাকে আর আপনাকে, খর্ব করতে পারলেই যদি আমাকে নিয়ে গর্ব করা চলে, তবে আর অন্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?

তাই সমগ্র জগতে 'আমি'র গতি অপ্রতিহত, 'আমার' স্রোত স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত।

মহাজনরা যে এই 'আমি' কে বিনষ্ট করতে বলেন, সেটা কি একটা বাস্তব কথা? সম্পূর্ণ অবাস্তব। ও হয় না! স্বয়ং ভগবানই যখন অহরহ বোঝাতে চাইছেন "দেখো আমি কতো সুন্দর, আমার সৃষ্টি কতো মনোহর!" তখন মানুষ তো কোন ছার!

বিচার ও বিশ্বাস

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কথামৃত পড়তে পড়তে দেখছি এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন:

'আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

কথামৃতের প্রথম ভাগে ঠাকুর শ্যামবসুকে বলছেন:

'কি তোমার সোনার বেনে বুদ্ধি!'

শ্যামবসু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

'মহাশয়! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'রেছেন, এ কি রকম কথা?'

সোনার বেণে বুদ্ধি অর্থাৎ merely logical intellect তো কোনখানে পৌঁছে দেবে না! কেন তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন—মগজের বুদ্ধির

আলোয় কোন কালেই তো এ সমস্যার সমাধান হবার নয়।

বুদ্ধির দ্বারা যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব না হয় তবে তাঁকে মান্‌তে যাবো কেন; মান্‌বো আনন্দের জন্যে। তাঁকে মেনে, তাঁকে ডেকে, তাঁর কাছে নিজেকে অবারিত ক'রে দিয়ে যদি শাশ্বত সুখের অধিকারী হওয়া যায় তবে ফিলজফী নিয়ে এত বিচার করবার দরকার কি? ঠাকুর বললেন:

'ফিলজফী লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?'

আমাদের প্রয়োজন ফল নিয়ে। শুধু দেখা দরকার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁর কাছে নিজেকে তুলে ধরলে আশায়, আনন্দে, শক্তিতে জীবন কূলেকূলে পূর্ণ হয়ে ওঠে কি না। আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের জীবনে দেখা গেছে: ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে ব্যক্তিত্ব ফলে ফুলে ভরে উঠেছে, চরিত্রে আশ্চর্য এবং আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে, দস্যু মহাকবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের দরকার মানব-জন্মকে সফল করা নিয়ে। ঠাকুর বলতেন:

'ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে! বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি?'

যাঁকে ডেকে, যাঁর কাছে প্রার্থনা করে সমস্ত জড়তা এবং অবসাদ ঘুচে গিয়ে জীবন নিমেষে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাঁকে সোনার বেণে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা গেল না ব'লেই কি তিনি মিথ্যা হ'য়ে গেলেন? প্রার্থনার শক্তিতে জীবনের রূপান্তর যদি মিথ্যা না হয় তবে প্রার্থনাই বা মিথ্যা হ'তে যাবে কেন?

ঠাকুর তাই বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় বলেই মনে করতেন। শুঁড়ির দোকানে মদের পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামানোকে তিনি শক্তির অপব্যয় বলেই ভাবতেন। তার দ্বারা তো কিছুতেই মাতাল হওয়া যাবে না। আম গাছের ডাল আর পাতা গুনতেই যদি সময় চলে যায় তবে পোদো আর আম খাবে কখন? মগজের বুদ্ধি কসরতকে নয়, হৃদয়ের ভক্তি এবং বিশ্বাসকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বালকের মতো হতে। বালকের অহঙ্কার থাকে না। বাইবেলে খ্রীষ্টও কি একই কথা বলেন নি? Verily I say unto you: Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of Heaven.

কিন্তু এর থেকে যেন মনে না করি ঠাকুর বিচারকে ঈশ্বরের শত্রু মনে করতেন। হৃদয়ের ভক্তি এবং বিশ্বাস যাঁর সৃষ্টি, বিচার করবার শক্তিও কি তাঁরই সৃষ্টি নয়? বিচার (Reason) এবং বিশ্বাস—এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করে গেছেন ঠাকুর। ঠাকুর এবং স্বামীজী তো আত্মার সমস্ত শক্তিকে মেলাইতেই এসেছিলেন; অতীতের এবং বর্তমানের সমস্ত ধর্মমতকে এক মিলনসূত্রে গাঁথবার জন্যই তাঁদের আবির্ভাব। রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ এইখানেই। যারা সাকারবাদী তাদের পৌত্তলিক বলে এঁরা নাক সিঁটকালেন না। ঠাকুর বললেন:

'যদি মাটীরই হয় সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয় মা সেইরূপ খাবার ব্যবস্থা করেন।'

পশ্চিম বলেছে প্রতিমা-পূজা পাপ—অতএব প্রতিমা-পূজা পাপ—এই দাসমনোভাব প্রথম ধাক্কা

পেলো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঐক্যের বাণী থেকে। এসিয়া আপন বৈশিষ্ট্যের উপরে দাঁড়িয়ে ইউরোপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

কিন্তু যে কথা বলতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে এতদূর চলে এসেছি। সমন্বয়ের কথা। আমাদের মধ্যে দুটো শক্তির সংগ্রাম চলছিল কোন্ আদিকাল থেকে। বিচারের এবং বিশ্বাসের শক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপন করলেন ঐক্যমন্ত্রের উদ্গাতা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি বললেন বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক, বললেন বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই, তিনিই আবার বললেন :—

'সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার ; বুঝেছ?'

জীবনে বিচারের যেমন প্রয়োজন আছে বিশ্বাসের এবং ভক্তিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। দু'য়ের ক্ষেত্র কেবল আলাদা অস্ত্রের কোন শক্তিকেই বর্জন করা মূঢ়তা। ঠাকুর সমস্ত শক্তিকেই স্বীকার করেছেন, সব শক্তিকেই কাজে লাগাবার কথা বলেছেন।

পরমপুরুষ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মন-মর্মর ধ্বনির ভিতরে জেগেছে প্রণবরূপ
ধ্যানের তুরীয় স্তরে।
তোমারে দেবতা করি অর্চনা জ্বালায়ে গন্ধধূপ
তব করুণার তরে।
পরম পুরুষ এসেছিলে হেথা পরা প্রকৃতিরে সঙ্গে লয়ে,
মহা জীবনের লীলা করে গেলে সকল রকমে
কাঙাল হয়ে।

মনন-মহিমা করেছ প্রকাশ বহুভাব সাধনায়,
মায়া হোলো মহামায়া।
কাতর হয়েছ লীলা-সুন্দর জগতের যাতনায়,
নিখিল বেদনা বুকে করে নিয়ে রেখে গেলে পদছায়া
তপ্ত আণব গেহে!
কত না বিভূতি বিকশিত হোলো তব পার্থিব দেহে!

তোমার পূজার পুণ্য মাধুরী বিশ্বভুবনময়,
স্পন্দিত প্রাণে প্রাণে।
দেখায়ে গিয়েছ সকলধর্ম-সাধন-সমন্বয়
সত্যের সন্ধানে।
মরু-অন্তর শ্যামল করিয়া রোপণ করেছ স্বর্ণলতা,
এবার তোমার নরলীলা শুধু পূর্ণ করিতে অপূর্ণতা।

কণ্ঠে তোমার প্রথম ধ্বনিত যতমত ততপথ,
ভেদাভেদ হোলো দূর।
তুমিতো সারথি, শিবশক্তির চালনা করিছ রথ।
নানা যন্ত্রের ঝঙ্কার লয়ে তুলিছ একটি সুর
সীমাহীন লোকে লোকে ;
তোমার আলোক পাথেয় আমার চির-বিচ্ছেদ
শোকে।

তোমারি মাঝারে মিশে আছে যত জীবন মাদার
মন্ত্ররূপ,
তোমারে প্রণাম পুরুষোত্তম! আধার আধেয়
তোমাতে সব।

আদ্যাশক্তি

স্বামী জীবানন্দ

কাল অনন্ত। দিন যায়, রাত্রি আসে। আলোকের পরে অন্ধকার। অন্তহীন কাল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারযুগে সীমায়িত। মানুষের চারযুগে দেবতাদের এক যুগ। একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর। ব্রহ্মার এক দিন হয় ১৪ মন্বন্তরে। ব্রহ্মার দিবা*-অবসানে প্রলয়। তারপর আবার সৃষ্টি আবার লয়। এই হল কালচক্র। দুর্বার এর গতি।

দেবী ভাগবতের বর্ণনা—

প্রলয় কাল। কল্পান্ত। চারিদিক জলে জলময়। দিগন্ত-প্রসারিত কারণ-সমুদ্র। লীলায়িত তরঙ্গ-ভঙ্গ নেই—আছে কেবল অনন্ত নিস্তব্ধতা। শান্তির পারাবার! এই একার্ণবে বটপত্রের উপরে ভগবান বিষ্ণু শুয়ে আছেন। ভাবতে লাগলেন, "কে আমাকে এই বৈচিত্র্যহীন নিস্তরঙ্গ মহাবারিধিবক্ষে ক্ষুদ্র শিশুরূপে সৃষ্টি করলেন? কি উদ্দেশ্যেই বা এই সৃজন? কোন্ উপাদানে এই দেহ নির্মিত হল? কিরূপে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে?" ইত্যাদি একটানা চিন্তাস্রোত চলেছে—হঠাৎ ঊর্ধ্বে অন্তরিক্ষে দৈববাণী হয়ে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তুলল: "কল্পের আরম্ভে যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয় এবং প্রলয়সময়ে যে সব অতি সূক্ষ্মবীজরূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত আমিই। আমিই একমাত্র চিরন্তন নিত্য—আমি ছাড়া সত্য, শাশ্বত, সনাতন দ্বিতীয় কিছু নেই। 'সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।' আমি ব্যতীত সংসারের যা কিছু সবই অস্থির—ক্ষণভঙ্গুর।"

'সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্'—এই অর্ধশ্লোকের উপদেশটি বিষ্ণুর হৃদয়ে গেঁথে গেল। আবার চিন্তা! "কে আমাকে এই অমৃতময়ী বাণী শোনালেন? তিনি পুরুষ না স্ত্রী?" বিষ্ণু শ্লোকার্ধটি চিন্তা করতে করতে তন্ময়ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন—তাঁর নয়নকমল দুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হল।

তখন সর্বমঙ্গলময়ী গুণাতীতা আদ্যাশক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা মহালক্ষ্মীরূপে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর পাশে আছেন রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা প্রভৃতি শক্তি-সকল দিব্য অলংকার ও অস্ত্রে ভূষিতা হয়ে।

কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণু চক্ষু উন্মীলন করলেন। দেখলেন সম্মুখে সহচরী-পরিবৃতা সালংকরা অপূর্ব দেবী-মূর্তি। তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা নেই। ভাবলেন—

"এই দেবী কে? ইনিই কি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া?"

মহালক্ষ্মী বললেন, "কেন তুমি বিস্মিত হচ্ছ? অনাদিকাল থেকে এই জগতের সৃষ্টি ও লয় কতবার যে হয়েছে তার ঠিকানা নেই। তখন তুমি যেমন যেমন আবির্ভূত হয়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তি মায়ার আবরণ-শক্তিতে তোমার স্মৃতি আচ্ছন্ন তাই আমায় চিনতে পারছ না। সেই পরাশক্তি চৈতন্যস্বরূপা, ত্রিগুণাতীতা। তুমি আমি উভয়েই সগুণ। আমিই বিশ্বসংসারে সত্ত্বগুণের আশ্রয়—বৈষ্ণবী শক্তি। তোমার নাভিকমল থেকে রজোগুণের অধিপতি প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হবে, তিনি কঠোর তপস্যায় রজঃশক্তিতে বিশ্বসৃষ্টি ক'রে স্রষ্টা আখ্যা

* চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।

—বিষ্ণুপুরাণ

লাভ করবেন। প্রথমে সৃষ্টি হবে পঞ্চ মহাভূতের। তারপরে উৎপাদন করবেন মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকলকে। প্রজাপতির সৃষ্ট অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমিই পালনকর্তা। ব্রহ্মা তাঁর মানস-পুত্রগণের আচরণে ক্রুদ্ধ হবেন। তখন হবে তাঁর ভ্রূ-মধ্য থেকে মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব। সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপস্যায় তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী সংহাররূপা মহাশক্তি কালীকে লাভ করবেন। কল্পান্তে সংহার-শক্তির বলেই রুদ্র সমস্ত জগৎকে ধ্বংস করেন। পরব্রহ্মরূপিণী চৈতন্যরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাতেই আমি এসেছি তোমার কাছে। আমি যে তোমার চিরসঙ্গিনী।”

বিষ্ণুর বিস্ময় কিন্তু দূর হল না। তিনি সতৃষ্ণনেত্রে, চেয়ে রইলেন—যেন আরও কিছু জানতে চান।

মহালক্ষ্মীর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। বললেন, “আকাশমার্গে অলক্ষ্যে থেকে যিনি দৈববাণী করেছেন তিনিই হলেন পরাশক্তি—আদ্যাশক্তি। তাঁর উচ্চারিত দুই চরণের শ্লোকটি সমস্ত বেদের সার, পরম পবিত্র, সর্বশাস্ত্রের বীজস্বরূপ। তুমি প্রতি কল্পে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন কর ব'লে তোমার উপর সদয় হয়ে এই উপদেশ দিয়েছেন। এটি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা কর। ত্রিলোকে এর চেয়ে জানার যোগ্য আর কিছুই নেই।” এই উক্তির পর মহালক্ষ্মী অন্তর্হিতা হলেন।

বিষ্ণুর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল। তিনি শ্লোকার্ধটিকে অনির্বচনীয় মহিমাপূর্ণ মন্ত্র ব'লে বুঝতে পারলেন, হৃদয়ে নিরন্তর ধ্যান করতে করতে যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিষ্ণু এখন নিষ্ক্রিয়, প্রলয়ে তাঁর সাত্ত্বিকী পালনী শক্তিও নিষ্ক্রিয়।

এইভাবে কিছুকাল কেটে গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে আবির্ভূত হলেন। প্রাদুর্ভূত হয়ে নিজের উৎপত্তির কারণ কে, তিনিই বা কে—যখন এইরূপ চিন্তারত তখন সহসা বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামে দৈত্যদ্বয় তাঁকে সংহারের উপক্রম করল। তাই দেখে তিনি ভয়ে ভীত ও বিব্রত হয়ে সেই বটপত্রে শয়ান ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হলেন। ব্রহ্মা বহুভাবে যোগনিদ্রার স্তব করলেন। বিষ্ণু যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে দুর্দান্ত মধু-কৈটভের সঙ্গে বহুকাল সংগ্রামের পর তাদের নিহত করে সেই শ্লোকার্ধ মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি সমস্ত লোকের ঈশ্বর হয়েও কি জপ করছেন?” এই বিশ্বে আপনার চেয়ে কেউ পূজ্যতম আছে কি? কিং ত্বং জপসি দেবেশ! ত্বত্তঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি বৈ?”

বিষ্ণু বললেন, “প্রজাপতি, তুমি তো নিজেই জ্ঞানবান্ তবে এই জিজ্ঞাসা কেন? তোমাতে এবং আমাতে কার্যকারণরূপা যে শক্তি বর্তমান তিনি কে? একবার স্থিরচিত্তে নিজের মনেই বিচার করে দেখ না কেন? আসল ব্যাপার এই—আমি যাঁকে জপ এবং ধ্যান করে আনন্দে বিভোর, তিনি ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি—নিত্য-চৈতন্যরূপিণী—অপরিমেয়া মহাশক্তি। যেখানে যত শক্তির বিকাশ, যত শক্তির খেলা সব তাঁরই। তিনি মহাসত্ত্ব, মহাপূজ্যা, মহারতি। সমস্ত আনন্দও তাঁরই। নামরূপাত্মক জগতের প্রসূতি পালয়িত্রী সংহর্ত্রী তিনিই, আমরা শুধু তাঁর হাতের যন্ত্রপুত্তলী মাত্র।

> ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারকলক্ষণা।
> বিচারয় মহাভাগ! যা সা ভগবতী শিবা॥

কল্পে কল্পে জগৎসৃষ্টি ও সংহার তাঁরই লীলা। অতুলনীয়া জগজ্জননীর মহিমার সীমা কোথায়?

> জগৎসর্জনে শক্তিস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী।
> সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রে চ তামসী পরিকীর্তিতা॥
> তয়া বিরহিতস্ত্বং ন তৎকর্মকরণে প্রভুঃ।
> নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহর্তুং নাপি শংকরঃ॥
>
> দেবী ভাগবত ১।১।৪৭,৪৮

(অবশিষ্টাংশ ৫৩৩ পৃষ্ঠায়)

চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু

পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

"বন্দ সেই গঙ্গাতট যেথা রাজে পঞ্চবট
জপ-তপ যাহার তলায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৫৬০

দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে

"তক্তাপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজের উপর কেহ মাদুরে, কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিতা।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১।৬।১

গঙ্গাতটে দাঁড়াইয়া
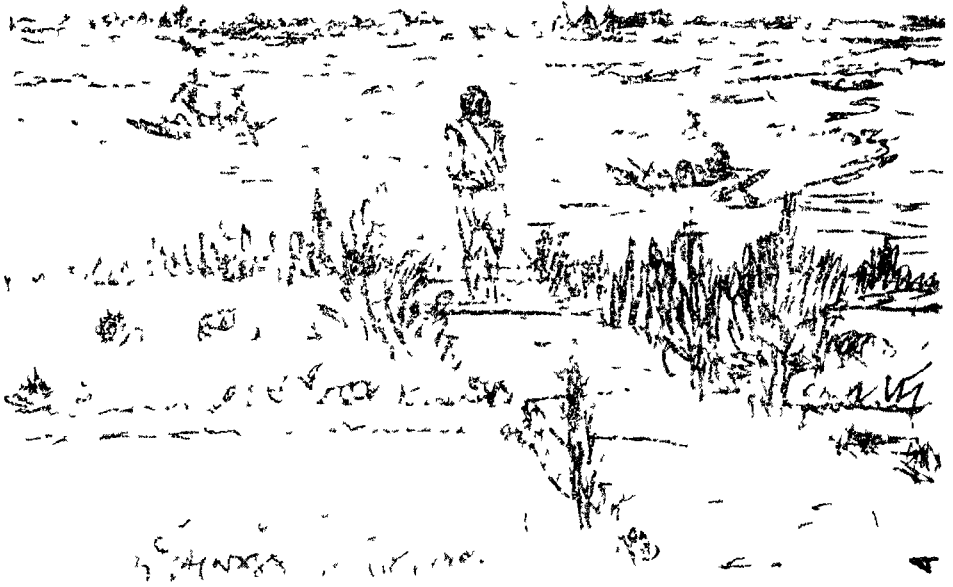
"আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন—নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, (সাধকভাব, ৪র্থ অধ্যায়)

ঘোড়ার গাড়ীতে কলিকাতার পথে
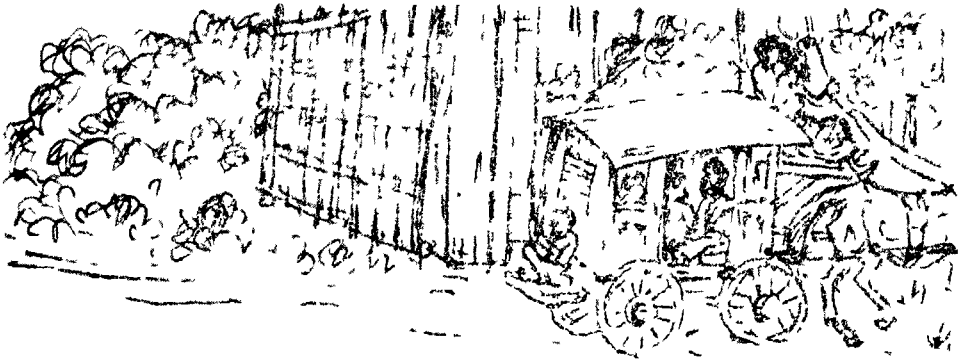
দিব্যভাবে নৃত্য

"ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যমিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। * * - প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত, তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড়-উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দ সাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, (দিব্যভাব, ১০ম অধ্যায়)

ঢেঁকিতে মন রেখে চিঁড়ে কোটা

"তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পাবে। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢেঁকি নিয়ে চিঁড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, একহাতে ছেলেকে মাই দ্যায়—আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে,—'তোমার কাছে দু আনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বারো আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।

বারো আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজকর্ম কর।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪।১৯।১

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী সারদা দেবীর দুটি চিত্র

"বাবা, আবার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে তুমি যদি সঙ্গে করে আমাকে পৌঁছিয়ে দাও · · · "

"মেয়েদের চারিজন তাঁহার আগে, চারিজন তাঁহার পিছনে হইয়া তাঁহাকে লইয়া হালদারপুকুরের ঘাটে চলিল। মা স্নান করিলেন, তাহারাও করিল। পরে আবার সেই ভাবে বাড়ি পর্যন্ত আসিল।"

—শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪১

বাৎসল্যভাবসিদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত 'গোপালের মা'

"অবাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেমন সাহস করিয়া স্বীয় বামহস্তে ঠাকুরের বামহস্তটি ধরিলেন অমনি সে মূর্তি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল, আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকার গোপাল। * * * বলিল, 'মা, ননী দাও।' ব্রাহ্মণী তো দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত। * * * চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব বাবা? সে অদ্ভুত গোপালের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই—সে খাইবেই।"

—**শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা**, (২য় ভাগ—'গোপালের মা')

গোপালকে বুকে লইয়া গোপালের মা

"তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘু'রে বেড়ায়। যেমন সকাল হলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চলল—কাঁধে মাথা রেখে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'লীলাপ্রসঙ্গ, (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ব্যথাহারী গোপাল ও গোপালের মা

৪ গোপালের মা।

"বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করচো !"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

গোপালের মা ও সুখদুঃখের সাথী গোপাল

"সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। * * * ব্রাহ্মণী এই অপূর্ব ভাবতরঙ্গে পড়িয়া অবধি বুঝিয়াছিলেন যে, উহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই খেলা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার 'নবীন-নীরদশ্যাম, নীলেন্দীবরলোচন গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ!'"

—**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**, (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

স্বামী সাধনানন্দের নিমন্ত্রণে এ বছর কাশীপুর উদ্যানবাটী ১লা জানুয়ারী (১৯৫৬) কল্পতরু উৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য হয়। পরমহংসদেবের জন্ম ১৮৩৬ সালে; ১৯৩৬এ গঙ্গা-বিধৌত বেলুড়ে তাঁর শতবার্ষিকীর প্রথম অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম; তাঁর এ বছর ১২০ বর্ষপূর্তি।

কাশীপুরের সঙ্গে তাঁর শেষ জন্মোৎসব ও তিরোধানের শেষস্মৃতি জড়িত। ৺নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের কাছে সে কাহিনী কিছু শুনেছি। তিনি কাশীপুর শ্মশানঘাট পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন, সে কথা তিনি লিপিবদ্ধও করে গেছেন। কিন্তু ১৮৮৫র গোড়া থেকে ১৬ই আগস্ট নির্বাণক্ষণ পর্যন্ত কত নরনারী তাঁর শেষ দর্শন করতে এসেছিল ভাল করে আমরা জানি না। নরেন্দ্র অগ্রণী হয়ে ১১জন ভক্ত শিষ্য যাঁরা পরমহংসদেবের সেবা করে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের ফটোও পাওয়া যায়। আর শুধু ইসারায় মেলে সারদাদেবীর সাবিত্রীর মতই যমের সঙ্গে নীরব সংগ্রামের করুণ কাহিনী। সেদিন কাশীপুরে বারবার এসব কথাই মনে এসেছিল, তাই অভিভাষণ ও অতিভাষণ ভুলে শুধু চুপ করে থাকতে ইচ্ছা হয়েছিল। অথচ প্রায় ৮।১০ হাজার নরনারী জমা হয়েছে সেই বিরাট কল্পতরু উৎসবে। তাই তাদের বলতে হল শুধু মন দিয়ে অনুভব করতে যে, এই কাশীপুর বাগানে ৭০ বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘাসের উপর পায়চারী করেছেন, শিষ্যদের সন্ন্যাস-বস্ত্র দিয়েছেন আরও কত দুঃখী আতুরদের শেষ সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছেন। "কথামৃতে" তার স্পষ্ট কিছু বিবরণ নেই, এমনকি সারদানন্দজী তাঁর "লীলাপ্রসঙ্গে"ও যেন ইচ্ছাপূর্বক তাঁদের এই বিষম বিচ্ছেদের অধ্যায় অলিখিত রেখে গেছেন।

ঘটনাক্রমে এবার আগস্টমাসের মাঝামাঝি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে কাশীতে যাই। ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের নির্বাণ আর ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধান। সেই দিনটি কাটাই কাশীর সুপ্রসিদ্ধ আর্তসেবায়তনে (R. K. Misson Home of Service)। সেখানে স্বামী ভাস্বরানন্দ আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। এখানকার কর্মীদের একনিষ্ঠ সেবা দেখে মুগ্ধ হয়েছি; তাঁরা প্রেরণা পান স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। তিনি ৩৯ বৎসর বয়সেই স্বর্গারোহণ করেন আর ১৯০২ সালে তাঁর শেষ তীর্থযাত্রা এই কাশী। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন যে আরোগ্যশালা গড়ে তুলেছেন সেটি সারা ভারতের গৌরব-স্থান। এইটিকে কেন্দ্র করেই নিখিল ভারতীয় "সেবা-মন্দির" গড়ে তোলা উচিত। "জীব-শিব" তত্ত্ব শুধু আলোচনার নয় জীবনে প্রয়োগ করার অপেক্ষা রাখে, একথা পরমহংসদেব বহু স্থানে ইঙ্গিত করে গেছেন, সে ইঙ্গিত পরে বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। ১৮৯৩-৯৭ এই চার বৎসর পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করে স্বামীজী দেশে ফিরেছেন আর ভারতে তখন প্রথম প্লেগ-মহামারী (plague) দেখা দিয়েছে তার ভয়ঙ্কর রূপে। জপতপ ফেলে স্বামীজী ঝাঁপিয়ে পড়েন প্লেগরোগীর সেবায়, তাঁর উপযুক্ত শিষ্যা নিবেদিতার কোলেও আশ্রয় নেয় প্লেগগ্রস্ত শিশু। মাত্র ৬০ বছর আগেকার এই উদার সেবাযজ্ঞের কাহিনীও আমরা ভুলতে বসেছি। কাশীতে এবার সেকথা বারবার মনে এসেছিল; খ্রীষ্টান মিশন ছাড়া এদেশের কেউ কেউ যে জীবন বিপন্ন করে রোগীর সেবা করে গেছেন তার তথ্যপূর্ণ বিবরণী কেন এখনও লেখা হল না?

মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫১—১৮২১)

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও "প্রিন্স" দ্বারকা-নাথ ঠাকুরের যুগ থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্র দত্ত ও মহেন্দ্র সরকার পর্যন্ত দুঃস্থদের সেবার উদার ইতিহাস রচনা করে গেছেন। রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) সমাজসেবায় একজন অগ্রণী ছিলেন; প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ১৮৫৭ সালে অর্থোপার্জনের আশা বর্জন করে কেশব সমাজ-সেবাব্রত গ্রহণ করেন এবং কত বিচিত্র সেবার কাহিনী তাঁর জীবনী অবলম্বনে পড়েছি।

আধুনিক কেশব সেন সড়কের (street) খুব কাছেই কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ঝামাপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও গোবিন্দ চট্টো-পাধ্যায়দের বাড়ীতে প্রথম গ্রাম থেকে এসে থাকেন (১৮৫২-৫৩); তাঁর বড় দাদা রামকুমার কিছু আগে গ্রাম থেকে এসে এখানেই টোল খুলেছিলেন। সেই স্মৃতিরক্ষার্থে আবার সেখানে ভক্তিশাস্ত্র পাঠের একটি টোল খোলা উচিত। এখানে থেকেই ১৮৫৫ সালে দুই ভাইয়ের প্রথম দক্ষিণেশ্বর যাত্রা, সেখানে রাণী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দিরে কিছুকাল পূজারীর কাজ করে রামকুমার দেহত্যাগ করেন। এবং রামকৃষ্ণ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৮৮৫ পর্যন্ত প্রধানতঃ দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। এই দীর্ঘ ৩০ বছরের ইতিহাস—শেষ দশ বছর (১৮৭৫-৮৫) ছাড়া—এখনও অস্পষ্ট। কলিকাতার মত শহরে সেকালের সব কথা কাগজে ছাপা না হলেও "জনশ্রুতি" যেটুকু মেলে, এখনি বিধিবদ্ধ ভাবে সংগ্রহ করা উচিত। ১৮৫২-৫৫ ঝামা-পুকুরে এবং ১৮৫৫ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর এই আদি-পর্বের কথা কিছুই কি মিলবে না? কারো কী এদিকে দৃষ্টি পড়েছে? উদ্বোধনের মারফতে এ প্রশ্ন তুলতে চাই।

১৮৫৫ দক্ষিণেশ্বরে রামমন্দির মন্দির-প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৬১ সালে রাসমণির দেহত্যাগ-কাল পর্যন্ত যে সব ঘটনা আলোচিত হয়েছে সেগুলি সম-সাময়িক পত্রিকাদির সাহায্যে যাচাই করাও দরকার। কারণ নাটক-সিনেমা চিত্তাকর্ষক হলেও নির্ভরযোগ্য নয়। ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ এই দশ বছরের অনেক কথা স্পষ্টতর হলেও প্রধান ঘটনা অষ্টাদশ-বর্ষীয়া সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন। কাহিনী ও মানব-সমাগম এখান থেকে ঘনীভূত হয়েছে কিন্তু মানুষের ও ঘটনাবলীর বিন্যাসে অনেক অস্পষ্টতা আছে, সেগুলি পরিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮৭৫ সালে কেশবচন্দ্র সর্বাঙ্গে যখন শ্রীরাম-কৃষ্ণকে আবিষ্কার করেন তখন থেকে শেষ দশ বৎসর বহু তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু কেশব অকালে দেহত্যাগ করেন ১৮৮৪তে আর রামকৃষ্ণদেব তার দুই বৎসর পরে (১৮৮৬)। ভক্ত রাম দত্ত, শ্রীম এবং বলরাম বোস প্রভৃতির জীবনী প্রকাশিত হলে হয়তো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে; কিন্তু সেই সংগ্রহাদির কাজে বেশী কর্মী তো দেখি না। কলিকাতার অনেক প্রাচীন ইমারত ও রাস্তা পর্যন্ত বিলুপ্ত হতে বসেছে! তাই অনুরোধ জানাই "শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতা" নামে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হোক্ আর তার সঙ্গে অধুনা দুষ্প্রাপ্য ছবি ফটো ইত্যাদিও ছাপা হোক্।

পরমহংসদেব সাধারণ নরনারীর গুরু, বন্ধু ও সাথী ছিলেন, একথা কল্পতরু উৎসবে জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে অনুরোধ জানাই যে কাশীপুর উদ্যান-সংলগ্ন জমিতে রামকৃষ্ণ গণ-বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করা হোক। তিনি যেমন তাঁর অমৃতভাষণে মানুষকে সুখে দুঃখে প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর কথামৃতের সেই ধারা অনুসরণ একটি জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় স্থায়ী স্মৃতিমন্দিররূপে গড়ে উঠুক। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী আগতপ্রায় (১৮৬৩-১৯৬৩)। তার পূর্বেই কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিমন্দির গঠিত হওয়া উচিত।

আদ্যাশক্তি

(৫২০ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বের সৃষ্টির জন্যে তোমাতে রাজসী শক্তি, পালনের জন্যে আমাতে সাত্ত্বিকী এবং সংহারের জন্যে রুদ্রে তামসী শক্তি বর্তমান। এই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। শক্তিবিহীন হলে তুমি, আমি বা রুদ্র কেহই স্বকার্য-সাধনে সমর্থ হই না। প্রলয়-কালে আমি সেই শক্তির অধীন হয়েই অনন্ত শয্যায় শয়ন করি এবং সৃষ্টিকালে কালধর্মবশে আবার সেই শক্তির অধীন হয়েই উত্থিত হই। আমি সর্বদাই শক্তির অধীন। আমি সেই আদ্যাশক্তির ইচ্ছাতেই যুগে যুগে মৎস্য কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ বামন-রাম-কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হই। মূল কথা চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর চিদ্রূপা পরাশক্তি দুই পদার্থ নয়। যেমন দাহিকাশক্তি আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সূর্যেরই নামান্তর মাত্র। আলো ছাড়া সূর্যকে চিন্তা করাই যায় না, উত্তাপ ছাড়া অগ্নিকে ভাবাও অসম্ভব। সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন।"

সৃষ্ট হল জীবজগৎ। দেব মনুষ্য তির্যক্ অসুর। চুরাশি লক্ষ জীব। নদনদী-পাহাড়পর্বত-সমুদ্র-বৃক্ষলতা-সমন্বিত সুন্দর ধরিত্রী। কত গ্রহ নক্ষত্র —কে ঠিকানা রাখে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। আর আদ্যাশক্তি হয়ে রইলেন সকলের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে। অণু পরমাণু থেকে অতি বৃহত্তের মধ্যেও। তাঁরই ছায়া—তাঁরই অংশ সব নারীমূর্তি। ঘরে ঘরে তিনিই গর্ভধারিণী স্নেহময়ীরূপে সন্তানকে সুখে-দুঃখে ব্যথা-বেদনায় বাৎসল্যরসের অজস্র ধারায় সিঞ্চিত করছেন। সমস্ত বিদ্যার আধার হয়ে ছড়িয়ে রয়েছেন তিনিই। যে একান্তভাবে তাঁর দর্শনপ্রয়াসী সেই তাঁর কৃপা পায়, তার মায়ামোহ দূর করে গুণাতীতা দেবী গুণময়ী হয়ে দর্শন দেন, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' যুগে যুগে তিনি অসুর সংহার করেছেন—মানুষের অন্তরে কাম-ক্রোধ-লোভরূপী যে সব অসুর রয়েছে তাদেরও তিনি নাশ করেন। দুঃখীর দুঃখ, আর্তের আর্তি, সন্তপ্তের সন্তাপ তাঁর কৃপাকটাক্ষে দূরীভূত হয়। সাধকদের অন্তরে জননী রয়েছেন চিন্ময়ীরূপে। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী, দশমহাবিদ্যা, নবদুর্গা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রূপ তিনি উপাসকের কাছে প্রকাশ করে থাকেন মৃন্ময়ী, প্রস্তরময়ী, দারুময়ী মূর্তিতেও চিন্ময়ীভাবে পূজিতা হয়ে। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিতা হয়েও কখনও কখনও মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি তেজ শক্তি বীর্যের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নদী কলতানে বয়ে যাচ্ছে—মনে হয় যেন তাঁরই বন্দনারত। ফুল ফুটছে যেন নিজেকে তাঁর চরণে নিবেদন করবে ব'লে। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষও জগজ্জননীর উপাসনা করছে—দিকে দিকে তাই উল্লাস, আনন্দমুখরতা—সার্বজনীন পূজার আড়ম্বর। কিন্তু বহির্মুখীনতা ও বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে তাঁর কৃপার উপলব্ধি হয় কি? আই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের অবসানের জন্যে চাই প্রাণের ঐকান্তিকতা, ভক্তি ও শরণাগতি।

"সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। * * * যদি পরমজ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাতৃ-আহ্বান

শ্রীহৃদয়রঞ্জন প্রামাণিক, কাব্যতীর্থ

একি মাগো মায়া মধুকৈটভ হয়নিতো আজও হত
লোভরূপে থাকি চিত্ত-বিধিরে বধিতে সে উদ্যত।
মহিষাসুরও মা অন্তরে রাজে ঘটায় যে অঘটন
ক্রোধ-মূর্তিতে হৃদি-অমরায় পেতেছে সিংহাসন।
শুম্ভ-নিশুম্ভ তারাও মরেনি কামবেশে প্রাণে স্থিতি
সংযম কোথা, জরাব্যাধি তাই গ্রাসিছে মোদের
নিতি।

মোহ-মদরূপে চণ্ড-মুণ্ড করে যে আস্ফালন
ত্যজিয়া স্বার্থ দেশকল্যাণে কেমনে দেব মা মন?

রক্তবীজেরও যায়নিকো বীজ হিংসারূপেতে ফিরে
দাবানল তাই জ্বলিছে নিত্য সুখের শান্তি নীড়ে।
ষড়রিপু এই অসুর নিবহে মোরা যে উৎপীড়িত
অশুভ বুদ্ধি আসি হিয়া মাঝে সদা করে
প্রলোভিত।

যুগে যুগে নাশ দেবসঙ্কট চণ্ডী পুরাণে জানি
'তথেতি' বলিয়া চেয়েছ দূরিতে মর্ত্যের ব্যথা গ্লানি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা হয়ে তবে বুদ্ধিরে কর পূত
ধৈর্য সাহস প্রেম জাগাইতে হও মা আবির্ভূত।

লীলাময়ী

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নয়নে তোমার কখনো বহ্নি জ্বলে
সৃষ্টিরে তব কর মাগো ছারখার,
মরে সন্তান শাণিত কৃপাণ-তলে
দিকে দিকে শুনি আর্তের হাহাকার।

এখানে বন্যা কোথাও অগ্নিদাহ,
মানবে মানবে দানবের হানাহানি,
নগরের বুকে শ্মশানের গান গাহ
তাথৈ নৃত্যে নাচো তুমি রুদ্রাণী,

কখনো বা হেরি সুন্দরী ধরণীরে—
পরশে তোমার মধুর মুরতি তার,
মানুষ মিলেছে মিলনতীর্থ-তীরে
বহে চারিদিকে আনন্দ-পারাবার।

কভু করে বর – কভু বা খড়্গপাণি
কভু অশান্তি, শান্তিরূপিণি অয়ি!
ভাবি তাই মনে নহ তুমি রুদ্রাণী
নহ কল্যাণী— তুমি শুধু লীলাময়ী।

শ্রীপতির "বিশেষাদ্বৈতবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

দশ-বেদান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত "বিশেষাদ্বৈত-বাদ"-প্রবর্তক শ্রীপতির জীবনী ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তেলেগু-ভাষাভাষী, কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলস্থ 'আরাধ্য ব্রাহ্মণ' ছিলেন। তিনি নিজেকে 'শ্রীপতি পাণ্ডিতাচার্য' বা 'শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবৎপাদাচার্য' নামে অভিহিত করেছেন তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের' প্রত্যেক পাদের শেষে। তা ছাড়া, তিনি নিজের

নামের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষণও ব্যবহার করেছেন —যেমন, তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের শেষে নিজের নামের পূর্বে 'যতিব্রজ-পরিবৃঢ়' এই কথা দুটি এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে 'নিরাভার-বীরশৈব' বলে নিজেকে বর্ণনা। এই থেকে তিনি যে একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছিলেন, তা' বোঝা যায়। তাঁর বীরশৈব মতও সর্বত্র প্রকটিত। সামান্য ও মিশ্রশৈবেরা শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই উপাসক। কিন্তু শুদ্ধ ও বীর-শৈবেরা কেবলমাত্র শিবেরই উপাসক। বীরশৈবেরা শরীরে, মাথায় বা গলায়, লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করেন, শুদ্ধ শৈবেরা নয়।

শ্রীপতির সময় সম্বন্ধেও নিশ্চয় কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে সব দার্শনিকদের মতবাদ স্বীয় ভাষ্যে খণ্ডন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভেদবাদী বৈদান্তিক, মধ্ব অন্যতম। মধ্ব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সেজন্য শ্রীপতি যে, সেই সময়ের পরবর্তী, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপতির প্রখ্যাততম গ্রন্থ তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। এই ভাষ্যের নাম 'শ্রীকরভাষ্য'। শ্রীপতি তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের শেষে এই নামের উল্লেখ করে বলেছেন—"ইতি শ্রীমদ্‌যতিব্রজ-পরিবৃঢ়-শ্রীপতি-পণ্ডিত-ভগবৎপাদাচার্য-ভেদ-ভেদাত্মক-বিশেষাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-ব্যবস্থাপক-বৈয়াসিকব্রহ্ম-মীমাংসা-সূত্রার্থ প্রকাশকে শ্রীকর-ভাষ্যে" ইত্যাদি। 'শ্রীকর' শব্দের অর্থ 'শিবকর' বা 'শিব'। গ্রন্থের প্রারম্ভেও শ্রীপতি স্বীয় ভাষ্যকে 'শিবংকর' বলেও উল্লেখ করে বলছেন—

"অগস্ত্যমুনিচন্দ্রেণ কৃতবৈয়াসিকাং শুভাম্।
সূত্রবৃত্তিং সমালোচ্য কৃতং ভাষ্যং শিবংকরম্॥" (১৬)

সেজন্য, শিবের পরব্রহ্মত্ব প্রচারকারী এই ভাষ্যকে যে শ্রীপতি শিবের নামেই নামকরণ করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। বীরশৈব-মতবাদের দুটি প্রধান স্তম্ভ 'অষ্টাবরণ' ও 'ষট্‌স্থলতত্ত্ব'। শ্রীপতি যে কেবল নিজেকে 'বীরশৈব' বলে বর্ণনা করেছেন, তা নয়—কিন্তু সেই সঙ্গে, বিশেষ করে ষট্‌স্থলবাদেরও বারংবার উল্লেখ করেছেন তাঁর ভাষ্যে, এবং ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ নিরূপণের সময়ে, এই তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সেজন্য 'শ্রীকরভাষ্য' যে বীরশৈব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক বেদান্তভাষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রীকররচিত অন্য কোনো গ্রন্থের বিষয় জানা যায় নি। তবে জনশ্রুতি অনুসারে, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকণ্ঠ দশোপনিষদ্-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন।

সাধারণতঃ, 'শ্রীকর-ভাষ্যের' ভাষা সহজ সরল, প্রাঞ্জল মধুর হলেও, স্থানে স্থানে তাঁর রচনা কাঠিন্য-দোষ দুষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়ানুগ তর্কপ্রণালী ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ভাষ্যে বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ ইতিহাস প্রমুখ থেকে অসংখ্য বাক্য উদ্ধৃত করে-ছেন; এবং বহু মনীষীদের নাম করে' উল্লেখ করে' তাঁদের মতবাদ গ্রহণ অথবা খণ্ডন করেছেন। এর থেকে, তাঁর অপূর্ব বিদ্যাবত্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

'শ্রীকর-ভাষ্যের' প্রারম্ভিক শ্লোকে শ্রীপতি এই ভাষ্যরচনার মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করে বলেছেন—

"বেদাগম-তত্ত্বজ্ঞ-শৈবানাং মোক্ষকাংক্ষিণাম্।
বৈদিকানাং বিশুদ্ধানামেতদ্ ভাষ্যং হি কল্পকম্॥
শ্রুতৈ কদেশপ্রামাণ্যং দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিষু।
দ্বৈতাদ্বৈতমতে শুদ্ধে বিশেষাদ্বৈতসংজ্ঞিকে॥
বীরশৈবকসিদ্ধান্তে সর্বশ্রুতিসমন্বয়ঃ।" ইত্যাদি
(১৩—১৪)

অর্থাৎ বেদজ্ঞ, মোক্ষকামী, বিশুদ্ধ, বৈদিক শৈবদের জন্য এই ভাষ্য রচিত হয়েছে। দ্বৈতাদ্বৈত-মতই প্রামাণিক; পুনরায়, সমস্ত দ্বৈতাদ্বৈত-মতের মধ্যে

একমাত্র 'বিশেষাদ্বৈত'-মতই শুদ্ধ বা যুক্তিসম্মত। একমাত্র বীরশৈব-সিদ্ধান্তই সর্বশাস্ত্রসম্মত।

এই প্রারম্ভিক শ্লোকাবলীতে শ্রীপতি স্বীয় ভাষ্যকে 'ভবহরম্' 'দুর্বাদিগর্বাপহম্' 'সর্বানর্থ-বিনাশকম্' 'বুধস্তুতম্' 'তত্ত্বার্থবোধাকরম্' 'অশেষো-পনিষৎসারম্' 'বিশেষাদ্বৈতমণ্ডনম্' 'শিবজ্ঞানপ্রদম্' প্রমুখ নানারূপ বিশেষণে বিভূষিত করেছেন।

শ্রীপতির প্রগাঢ় ন্যায়-জ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, আরেকটি জিনিস থেকে। সেটি হল যে, 'শ্রীকরভাষ্যে' তিনি বীজাঙ্কুর-ন্যায়, অরুন্ধতী-ন্যায়, অন্ধ-পরম্পরা-ন্যায়, গো-বলীবর্দ-ন্যায় প্রমুখ ৬৯টি ন্যায়ের উল্লেখ করেছেন, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং শঙ্করও করেছেন মাত্র ২৫টির।

শ্রীপতির মতে, পরম শিবই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রের প্রখ্যাত চতুঃসূত্রীতে তিনি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে, ১-১-১ সূত্রে 'শিবস্য পরব্রহ্মকথনম্' এই বলে আরম্ভ করে, তিনি নানাভাবে পূর্বপক্ষাদি খণ্ডন করে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, একমাত্র শিবই পরব্রহ্মপদবাচ্য হতে পারেন।

ব্রহ্ম বা শিব, সগুণ ও সবিশেষ, নির্গুণ বা নির্বিশেষ নন। এই প্রসঙ্গে, শ্রীপতি অদ্বৈতবেদান্ত-সম্মত নির্বিশেষবাদ ও নির্গুণবাদের বিস্তৃত সমালোচনা করে খণ্ডনের প্রচেষ্টা করেছেন। ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণমণ্ডিত ও সমস্ত হেয়গুণবর্জিত। পরব্রহ্ম শিবের দুটি রূপ : ভীষণ ও মধুর, ঘোরা ও অঘোরা। প্রথম রূপে তিনি 'রুদ্র', দ্বিতীয় রূপে তিনি 'সোম'।

শ্রুতিতে অবশ্য কোনো কোনো স্থলে ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ব্রহ্মের অমূর্তরূপের কথাই কেবল বলা হচ্ছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের দুই অবস্থা বা রূপ : অমূর্ত ও মূর্ত। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম অমূর্তরূপেই স্থিতি করেন, এই অবস্থাতেই তাঁকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬-২-১), 'কেবলো, নির্গুণো' (শ্বেতাশ্বতর ৬-১১) প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপরিণত, অনভিব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্ম সমগ্র জীবজগৎ, সমস্ত নানাত্ব, সমস্ত গুণ ও শক্তিকে সংহতরূপে স্বীয় সত্তায় ধারণ করে রাখেন; পরে সৃষ্টিকালে সে সব বিকশিত করেন,—এই হল তাঁর মূর্তরূপ। সেজন্য 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ 'গুণবিহীন' নয়। এর প্রকৃত অর্থ তিনটি : (১) প্রথমে কেবল ব্রহ্মই বর্তমান ছিলেন অমূর্তরূপে। সেজন্য সেই সময়ে তাঁর জগৎ কর্তৃত্বাদি গুণশক্তি প্রকটিত হয়নি। (২) ব্রহ্ম সত্ত্ব রজঃ-তমঃ প্রমুখ প্রাকৃতিক ত্রিগুণবিহীন— 'গুণশব্দপ্রয়োগাভাবেন সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভাবপরত্বাৎ' (১-১-১)। (৩) ব্রহ্ম সমস্ত হেয়গুণবর্জিত। সেজন্য, কোনো অবস্থাতেই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব হয় না—'ব্রহ্মধর্মাণাম্ অনিষিদ্ধত্বাৎ'। প্রকৃতরূপে, অমূর্ত, মূর্ত উভয়রূপেই ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। 'মূর্ত' অবস্থায় ত এসম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 'অমূর্ত' অবস্থায় হয়ত অনবধান ব্যক্তির নিকট ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সময়েও তিনি সর্বগুণশক্তি বিমণ্ডিতরূপেই স্থিতি করেন। যেমন, চুম্বকের লৌহাকর্ষণশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি নিত্য, ঈশ্বরের গুণ ও শক্তিও ঠিক তাই।

যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, সর্বাধিষ্ঠান, সর্বব্যাপক পরমেশ্বর কিরূপে মূর্ত ও অমূর্তরূপে অবস্থান করতে পারেন—তার উত্তর এই যে প্রকৃতি যেমন মহৎ (অনভিব্যক্ত) ও জগৎ (অভিব্যক্ত) উভয়রূপেই বর্তমান, ঠিক তেমনি সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম ও বায়ুপ্রমুখ মূর্ত ও দৃশ্যরূপে, পুনরায় সর্বব্যাপী অমূর্ত ও অদৃশ্যরূপেও স্থিতি করতে পারেন।

ব্রহ্মই জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ১-১-২ সূত্রে শ্রীপতি সমস্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে প্রমাণিত করছেন যে, জগতের জন্মাদি একমাত্র পরব্রহ্মেরই কার্য, অন্য কারো নয়। এস্থলে

শ্রীপতি একটি নূতন উপমাও দিয়েছেন : 'কুসুল-ধান্যবৎ' (১-১-২) ; অর্থাৎ একটি ধানের গোলায় যেমন অসংখ্য ধান প্রথম থেকেই সঞ্চিত থাকে, পরে তা' কেবল সময়ে সময়ে উল্টিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি ব্রহ্মে শাশ্বতকাল অসংখ্য জীব লীন হয়ে থাকে, সৃষ্টিকালে কারণরূপে ব্রহ্ম তা' প্রকাশিত করেন। 'জন্মাদি' শব্দের অর্থ, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোধান (বন্ধ) ও অনুগ্রহ (মুক্তি)।

সিদ্ধান্তস্তু সর্বাধিষ্ঠান—সচ্চিদানন্দ-ষট্‌স্থল-পরশিব ব্রহ্মণ এব জগজ্জন্মাদিকারণত্বং যুক্তম্।' (১-১-২) এরূপে ব্রহ্মের কৃত্যপঞ্চক, বা পাঁচটি কাজ জগতের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস, এবং কর্মানুসারে জীবের বন্ধ ও মুক্তিসাধন। সেজন্য, ব্রহ্ম সক্রিয়, অদ্বৈতবেদান্তমতানুযায়ী নিষ্ক্রিয় নন।

প্রলয়কালে সৃষ্টির পূর্বে জীবজগৎ ব্রহ্মেরই চিৎ ও অচিৎ শক্তিরূপে ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে থাকে, সৃষ্টিকালে স্থূল জগৎপ্রপঞ্চও জীবরূপে পরিণত হয়। সেজন্য জীবজগৎও ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য, এবং সৃষ্টির অর্থ, ঈশ্বরের অনভিব্যক্ত স্বরূপের অভিব্যক্তিই মাত্র। তন্তু ঊর্ণনাভের পরিণতি হলেও যেমন যে স্বয়ং অপরিণতই থাকে, তেমনি জীবজগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হলেও, স্বয়ং ব্রহ্ম অপরিণতই ও অপরিবর্তিতই থাকেন।

এই ভাবে, শ্রীপতি অন্যান্য একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকদের প্রণালী অনুসারেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণাবলী বিবৃত করেছেন। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বব্যাপী, স্বতন্ত্র জগল্লীন হয়েও জগদ্বহির্ভূত, সর্বান্তর্যামী, সর্বাত্মক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরম করুণাময়, ইত্যাদি।

১-১-২ সূত্রের অন্তে তিনি বলছেন : 'সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মাণাং শিবস্যৈব সম্ভবাৎ।'

এস্থলে কেবল সাম্প্রদায়িক বা বীরশৈব মতানুসারে, তিনি ব্রহ্ম বা শিবকে 'ষট্‌স্থল' এই বিশেষণে বারংবার বিভূষিত করেছেন। যেমন, আমরা দেখেছি যে, ১-১-২ সূত্র ভাষ্যে তিনি 'ষট্‌স্থল-পরমশিবকে' জন্মাদিকর্তা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য স্থলেও তিনি 'ষট্‌স্থল শিবের' উল্লেখ করেছেন।

ষট্‌স্থলবাদ যে বীরশৈব-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান তত্ত্ব, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বীরশৈব মতে, ব্রহ্ম বা পরমশিবের অপর নাম 'স্থল'। কারণ, শিব 'স্থ' বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ ; এবং 'ল' বা তার লয়েরও কারণ। শিবই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল বা মোক্ষস্থল, সেজন্যও তাঁর নাম 'স্থল'। অন্তর্নিহিত শক্তি বলে, এই 'স্থল' লিঙ্গস্থল বা উপাস্য শিব, এবং অঙ্গস্থল বা উপাসক জীবে বিভক্ত হয়। পুনরায়, লিঙ্গস্থল তিন ভাগে বিভক্ত হয়—ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ ও ইষ্টলিঙ্গ। প্রথমটি শিবের নিষ্কল, নিরংশ, দেশকালাতীত, চক্ষু ও মনের দ্বারা অপ্রাপ্য সৎরূপ ; দ্বিতীয়টি তাঁর সাংশ, সূক্ষ্ম, মনের দ্বারা প্রাপ্য চিৎরূপ ; তৃতীয়টি তাঁর সাংশ, স্থূল, চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য, আনন্দরূপ। প্রথমটি তাঁর মহত্তম কেবল রূপ, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মরূপ, তৃতীয়টি স্থূলরূপ। প্রয়োগ, মন্ত্র ও কর্মসমন্বিত এই তিনটি বিভাগের নামই কলা (চিৎ-কলা), নাদ, বিন্দু। প্রত্যেকটির দুটি বিভাগ, যথাক্রমে : মহালিঙ্গ ও প্রসাদলিঙ্গ ; চারলিঙ্গ ও শিবলিঙ্গ ; গুরুলিঙ্গ ও আচারলিঙ্গ। ছয়টি শক্তি সমন্বিত, এই ছয়টি লিঙ্গ হল 'ষট্‌স্থল' বা শিবের ছয়টি রূপ—

(১) মহালিঙ্গ—এটি শিবের চিৎশক্তি-সমন্বিত, নিত্য, জন্মমরণরহিত, পূর্ণতম, মহত্তম, এক ও অদ্বিতীয় রূপ, বা চৈতন্যরূপ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেম দ্বারাই এই রূপ লাভ হয়।

(২) প্রসাদলিঙ্গ—এটি শিবের পরাশক্তি-সমন্বিত, সদাখ্যরূপ। এটি বুদ্ধিগম্য।

(৩) চারলিঙ্গ—এটি শিবের আদিশক্তি-সমন্বিত, মনোগম্য, পুরুষরূপ।

(৪) শিবলিঙ্গ—এটি শিবের ইচ্ছাশক্তি-সমন্বিত, অহংকাররূপ।

(৫) গুরুলিঙ্গ—এটি শিবের জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত রূপ।

(৬) আচার লিঙ্গ—এটি শিবের ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত রূপ।

প্রথম রূপে, শিব বা ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চ-বহির্ভূত, শুদ্ধচিৎ। দ্বিতীয় রূপে, তিনি জগৎস্রষ্টা। তৃতীয় রূপে তিনি জড়প্রধান ভিন্ন পুরুষ। চতুর্থ রূপে তিনি অপার্থিব দেহধারী। পঞ্চম রূপে তিনি জীবের জ্ঞানগুরু। ষষ্ঠরূপে তিনি জীবের মুক্তিদাতা।

সাধারণভাবে এই 'ষট্স্থলবাদ' গ্রহণ করে, শ্রীপতি তাঁর ভাষ্যে সাধনতন্ত্রের দিক্ থেকেও, 'ষট্স্থল' তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করে, শ্রবণ, মনন, জ্ঞান, নিধি, ধ্যান এবং আসন—এই ষষ্ঠ সাধনানুসারে, আত্মলিঙ্গ, ভাবলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, উপাসনালিঙ্গ ও ধ্যানলিঙ্গের কথা যথাক্রমে বলেছেন।

পূর্ণিমা-শর্বরী

শ্রীরবি গুপ্ত

আজি পূর্ণিমা-শর্বরী সিন্ধু মাঝে
কোন বাঞ্ছিত স্বপ্নের স্বর্গে সাজে।
চির সম্মিলনে
আলো বিচ্ছুরণে
কার ঊর্মিল-ছন্দ আনন্দে বাজে,
আজি পূর্ণিমা-শর্বরী সিন্ধু মাঝে।

মোর ঈপ্সিত অমরার মর্মলোভা,—
জাগে জ্যোৎস্না-বিনন্দিত শঙ্খ-শোভা।
ছায়া-তন্দ্রাতলে
কায়া-চন্দ্র জলে,
নামে নির্মল নির্ঝর দীপ্ত-প্রভা,
মোর ঈপ্সিত অমরার মর্ম-লোভা।

মোর নিঃসীম নিস্তল রাত্রি কালো,
হয় কোন সে মায়ায় কার মন্ত্রে আলো।
কে গো স্বর্গময়ী
এলে স্বপ্নময়ী
ঢালো অমৃত-উল্লাস বহ্নি ঢালো,
জ্বলে নিঃসীম নিস্তল রাত্রি কালো।

আলো অম্বুধি-উল্লাস প্রান্তহারা,
সাথে মরতের অমলীন জীবন-ধারা।
তার মন্ত্র-ভাষা
আনে স্বপ্ন-আশা,
ভাঙে তরঙ্গ-সংঘাতে কালের কারা,
আলো অম্বুধি-উল্লাস প্রান্তহারা।

কবে প্রোল্লাস-বৈভবে পূর্ণ হিয়া,
লভে এ-ধূলির বন্ধন স্বর্গ-প্রিয়া
তারি রত্ন-রাগে
চির লগ্ন জাগে,
ওঠে শশাঙ্ক-সুধা-লোক উচ্ছলিয়া,
করে প্রোল্লাস-বৈভবে পূর্ণ হিয়া।

আজি পূর্ণিমা-শর্বরী চন্দ্রালোকে,—
চলে অনন্ত-অম্বুধি রঙ্গি' ও কে!
নাচে সিন্ধু নাচে
মোর বিন্দু মাঝে,
জাগে চির-স্বপনী কে স্বপ্ন চোখে,
আজি পূর্ণিমা-শর্বরী চন্দ্রালোকে।

হিমালয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী নিরাময়ানন্দ

১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিলে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের যে কয়েকজন যুবক ভক্ত সংসার ত্যাগের সংকল্প লইয়া বরাহনগরমঠে সমবেত হন গঙ্গাধর তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৯০ খ্রীঃ জুন মাসে হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যথাবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হয় স্বামী অখণ্ডানন্দ। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহার গঙ্গাধর নাম ব্যবহার করিব।

১৮৮৬ খ্রীঃ ডিসেম্বরে খ্রীষ্টমাসের রাত্রে হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে নরেন্দ্রনেতৃত্বে অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণের সহিত গঙ্গাধরও সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং ইহারই দেড় মাস মধ্যে (১৮৮৭ ফেব্রুআরি) কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বরানগর মঠ হইতে পরিব্রাজকের বেশে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী, অযোধ্যা নৈমিষারণ্য হইয়া বৈশাখের প্রথমেই তিনি হিমালয়ের প্রবেশদ্বার হরিদ্বারে উপনীত হইলেন।

পথিমধ্যে গয়ায় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নীচে তিনি বিখ্যাত যোগী গম্ভীরনাথকে দর্শন করেন। যোগী তাঁহাকে যোগ সাধনার উত্তম আধারজ্ঞানে নিজ গুহার নিকট একটি গুহায় থাকিয়া যোগসাধন করিতে পরামর্শ দেন। তদুত্তরে গঙ্গাধর বলেন, "আমার গুরুদেব বলতেন—হিমালয় বা সমুদ্র না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না, তাই হিমালয় দর্শনের জন্য আমার মন ব্যাকুল।"

কাশীতে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সাহচর্যে গঙ্গাধর অতি অল্পকাল মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ আয়ত্ত করেন এবং তাঁহার সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখিতে গেলে, তিনি এই বাল সন্ন্যাসীকে বেদ পড়াইতে চাহেন; কিন্তু গঙ্গাধর বলেন,— "যে দৃষ্টিশক্তি দ্বারা পুস্তক পড়ে জ্ঞানলাভ করব আপনি আমার সেই চাক্ষুষীবৃত্তি অন্তর্মুখীন করে দিন, যাতে আত্মারামের দর্শন লাভ করতে পারি।" বারাণসীতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকেও দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় জানকীবর শরণ নামক এক উচ্চাঙ্গের সাধক দর্শন করিয়া তিনি হরিদ্বার পৌঁছেন।

এখানেও তিনি চণ্ডী পাহাড়ে বিখ্যাত সিদ্ধ-মহাপুরুষ কামরাজকে দেখিতে যান। এই মাতৃগত প্রাণ বালকস্বভাব সাধু কিশোর পরিব্রাজককে দেখিয়া আকৃষ্ট হন ও জিজ্ঞাসা করেন, "জীবনে কি চাও?"

গঙ্গাধর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "গীতার সেই অনুভূতি—ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি।"

দেবীভক্ত কামরাজ কাতরভাবে বলেন, "তবে তুমি আমার অম্বাকে চাও না? আত্মজ্ঞান চাও?" জগজ্জননীর প্রতি তাঁহার এই মধুর মমত্ববোধ গঙ্গাধরের মর্মকেন্দ্র স্পর্শ করে; পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মুখে এই বিবরণ শুনিয়া সানন্দে বলেন, "কী সুন্দর কথা, আমার অম্বাকে চাও না?"

হৃষীকেশে 'বিরক্ত'দের ঝাড়ীতে কিছুদিন থাকিয়া গঙ্গাধর উত্তরাখণ্ডের তপঃপ্রভাব অনুভব করিতে থাকেন, এই সময় তিনি গভীর ধ্যানধারণায় মগ্ন থাকিতেন। ছত্রের ঘণ্টা অনুযায়ী তাঁহার ভিক্ষায় যাওয়া হইয়া উঠিত না। পবিত্র মাধুকরী দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। হৃষীকেশেই তিনি সাধু হীরাদাস, মায়ারাম অবধূত ও তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচারী স্বয়ংজ্যোতিকেও দর্শন করেন। বিখ্যাত মায়ারাম অবধূত চারবার চারি ধাম ঘুরিয়াছেন,

গঙ্গাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন্ পথ দিয়ে হিমালয় যাব?" তিনি সামনের হাঁটাপথ দেখাইয়া দিতে গঙ্গাধর বলেন, "আমি ত ভেবেছিলাম শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গে লাফিয়ে যাব।" মায়ারাম তাঁর সঙ্গের সাধুদের ডেকে বলেন, "আরে দেখো দেখো—বাঙ্গালী ক্যা বোল্‌তা। গুরু মেহেরবান ত চেলা পহলবান্।"

হৃষীকেশ হইতে সে বৎসর এক পাঞ্জাবী সাধু বহু অর্থ ও সেবক লইয়া বদরীনাথ যাইতেছিলেন; তিনি গঙ্গাধরকেও সাথী করিয়া লইতে চান, কিন্তু গঙ্গাধর তাঁহার নিঃসঙ্গ ভ্রমণ-বাসনা ব্যক্ত করিয়া পদব্রজে দেরাদুন যাত্রা করেন। মুসৌরীর পথে রাজপুরে নিঃসম্বল ভ্রমণের ব্রত গ্রহণ করিয়া আরও সংকল্প করিলেন অযাচিত পথের সাথী ভিন্ন একাকীই পথ চলিবেন।

লণ্ডৌরের শিবালয়ে একটি সাধু তাঁহার উত্তরাখণ্ড যাত্রার কথা শুনিয়া মুসৌরির এক শেঠের নিকট হইতে কম্বল ও টাকা সংগ্রহের পরামর্শ দিলেন; গঙ্গাধর তাঁহার দৃঢ় সংকল্পের কথা বলায় তিনি আবার বলেন, উত্তরাখণ্ড বড় কঠিন স্থান—উপযুক্ত শীতবস্ত্র একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গাধর কিছুই লইবেন না দেখিয়া তিনি তাঁহার পার্বত্য যষ্টিখানি তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন; গঙ্গাধরও তাঁহার সম্মান রক্ষার্থে উহা গ্রহণ করিলেন। মুসৌরি পাহাড় হইতে টিহরির পথে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখরশ্রেণী দর্শন করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ পরিব্রাজক বসিয়া পড়িলেন এবং রোমাঞ্চিত শরীরে হিমালয়ের গম্ভীর সৌন্দর্যরাশি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন—"এই কি সেই পুণ্যদর্শন হিমালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে যাহা দেখিতে বলিতেন!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি টিহরি পৌঁছিলেন, তথা হইতে গঙ্গোত্রীর পথে ধরাসু উপনীত হইয়া শীঘ্র যমুনোত্রী পৌঁছিবার জন্য সেখান হইতে পাকদণ্ডীর পথ ধরিলেন। এই পথ জনবিরল, হিংস্রজন্তুসমাকুল ও লোকালয়হীন; ভাগ্যক্রমে কয়েকজন পাহাড়ী সাথী জুটিয়া গেল, তাহাদের সহিত জামদগ্ন্যজী মোকাম পৌঁছিলে পর এক স্বতঃপ্রাপ্ত বৈষ্ণব ও এক নাগা সাধুর সহিত যমুনার তীরে তীরে,—মাত্র বনশাক ও তৃণধান্যসিদ্ধ দ্বারা উদর পূরণ করতঃ—তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন।

যমুনোত্রীর পথে শেষ গ্রাম খরসালী হইতে তাঁহারা পাণ্ডা লইয়া কঠিন পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলেন। যমুনোত্রীর উষ্ণগহ্বরে এক রাত্রি বাস করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গাধর একাকী উত্তরকাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানেই এক তিব্বতী ব্যবসায়ীর মুখে জানিতে পারিলেন, বদরীনারায়ণ দর্শনের পর নিতিপাস দিয়া তিব্বতে গেলে কৈলাস মানসসরোবর নিকট হইবে।

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রীর পথে ভটোয়ারী গ্রামের প্রান্তে একটি মরণোন্মুখ সন্ন্যাসীর সেবার জন্য গঙ্গাধর থামিয়া গেলেন। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নাগাদের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়া তিনি সাধুটির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সন্ন্যাসীটির শেষকৃত্য সারিয়া গঙ্গাধর গঙ্গোত্রীর পথে চলিলেন।

নির্জন এই দুর্গম পথে ভৈরবঝোলায় তিনি পথহারা হইয়া পড়েন, পরে ভাগীরথীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গঙ্গার সেই অপূর্ব অবতরণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গঙ্গাধর আত্মহারা হইয়া স্থির হইয়া গেলেন; শুদ্ধ মুগ্ধচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, মর্ত্যলোকের ঊর্ধ্বে আমি এ কোন্ দেবলোকে?

সন্ধ্যা সমাগত; এমন সময় এক সাধু ঐ স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে তন্ময় অবস্থায় দেখিয়া, ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া গঙ্গোত্রী লইয়া গেলেন। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র গঙ্গোত্রী দর্শন স্পর্শন করিয়া গঙ্গাধর বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন।

গঙ্গোত্রী হইতে অদূরে গোমুখীর পথে এক গুহায় গঙ্গাধর গায়ত্রী-পুরশ্চরণে রত এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। কিন্তু যেই জানিলেন তাঁহার খাদ্য প্রায় নিঃশেষিত, অমনি গঙ্গোত্রী ফিরিয়া এক যাত্রী শেঠের নিকট খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে অনশন হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার পুরশ্চারণ নির্বিঘ্ন করিলেন।

প্রায় সপ্তাহকাল নিভৃত গঙ্গোত্রীর দিব্যভূমিতে কাটাইয়া গঙ্গাধর উত্তরকাশীর পথ ধরিলেন। এবার সেখানে ফিরিয়া নিজেই ভীষণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। কাহাকেও বিব্রত না করিয়া গ্রামের কিছু দূরে নির্জনে ভাগীরথী তীরে একটি প্রশস্ত শিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নীরবে রোগভোগ করিতে লাগিলেন। দুইদিন ঐরূপে কাটিলে তৃতীয় দিনে কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিতেছেন—এমন সময় একটি সুন্দর পাহাড়ী যুবক তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সযত্নে নিজ কুটিরে লইয়া গেল, উপযুক্ত পথ্যদ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিল। গঙ্গাধর অতিকষ্টে ঐ সেবাপরায়ণ যুবকটির আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া উত্তরকাশী হইতে টিহরি পৌঁছিলেন। সেখানে আসিয়াই গঙ্গোত্রী হইতে আনীত একশিশি গঙ্গাজল তিনি ডাকযোগে বরাহনগর মঠে পাঠাইলেন। মঠের ভ্রাতৃবৃন্দ এতদিনে জানিতে পারিলেন গঙ্গাধর হিমালয়ে।

টিহরি হইতে 'চন্দ্রবদনী' পীঠস্থান দর্শন-মানসে গঙ্গাধর জনমানবশূন্য অরণ্যপথে চলিলেন। উচ্চ গিরিচূড়ায় দেবীর মন্দিরটি হিমালয়ের এক অপূর্ব সৌন্দর্যকেন্দ্র। এই দুরারোহ পর্বতে নির্জন গিরি-মন্দিরে আনন্দ উল্লাসে দুটি রাত্রি কাটাইয়া, মাতৃচরণে পুনরাগমন বাসনা জানাইয়া গঙ্গাধর নামিতে লাগিলেন, কিন্তু পথহারা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঊর্ধ্বে বা নিম্নে কোন দিকেই গতি অসম্ভব, গঙ্গাধর নির্ভীক নিশ্চিন্ত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন এই পর্বত দেবীস্থান, যেখানেই থাকি মায়ের কোলেই আছি।

কিছু পরে 'জয় মা' বলিয়া আপনমনে একদিকে নামিতে লাগিলেন, একরকম গড়াইতে গড়াইতে পর্বতের পাদদেশে নিরাপদ সমতলে পৌঁছিয়া দেখেন কৃষকেরা গম দগ্ধ করিয়া খাইতেছে, তাঁহাকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত ভাবে বলিল, "তুমি কোথা হইতে আসিলে? এ পথে কেহ কোন দিন আসে নাই। নিশ্চয়ই চন্দ্রবদনী মায়ী হাত ধরিয়া তোমাকে লইয়া আসিয়াছেন।"

কিছু দূর বনপথের পর সরকারী পথে চলিয়া সন্ধ্যা-সমাগমে গঙ্গধর শ্রীনগর পৌঁছিলেন, এবং অলকানন্দায় অবগাহন করিয়া কমলেশ্বর মঠ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া ৺কেদারের পথ ধরিলেন। আজ পর্যন্ত হিমালয়ে উচ্চঅনুভূতি-সম্পন্ন সাধু দর্শন হইল না,—একদিন এইরূপ ভাবিতেছেন,—সেইদিনই অগস্ত্যমুনির মন্দিরে একটি প্রসন্নবদন সাধু তাঁহাকে তাঁহার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে বলে; যাত্রাপথে উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। এই সাধুটি গুপ্ত কাশীতেই ৺কেদারনাথের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হন। একদিন ধ্যানকালে—তাঁহার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত দেখিয়া গঙ্গাধর মুগ্ধ হন; কিন্তু শীতে তাঁহার অনাবৃত শরীর দেখিয়া গঙ্গাধর নিজের একমাত্র কম্বলখানি তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া চলিয়া যান।

গুপ্তকাশীর নিকট ফাটাচটিতে একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী থাকিতেন, তিনি কৈলাস ও মানস-সরোবর গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি গুপ্তকাশীর অপর পারে ওখি মঠে আছেন শুনিয়া গঙ্গাধর কৈলাস ও তিব্বতের পথের সংবাদ জানিতে তাঁহার কাছে গেলেন, এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ওখিমঠের মোহন্তকে দেখিতে যান। মাত্র একটি আলখাল্লা সহায়ে উত্তর হিমালয়ে আর অগ্রসর হওয়া দুঃসাহসের কাজ বুঝিয়া মোহন্তকে

গদিভেট দিয়া তিনি একটি কম্বল সংগ্রহ করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই ৺কেদারের পথে পূর্ব-পরিচিত এক উদাসী সাধুর সহিত তাঁহার দর্শন হইয়া যায়। সাধুটিকে নিজের নূতন কম্বল দিয়া তাঁহার ছিন্ন কম্বলটি বদল করিয়া লন। প্রথমবার তিব্বত গমন পর্যন্ত এটি আর তাঁহার হাতছাড়া হয় নাই।

ত্রিযুগীনারায়ণের পর গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি স্থানমাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া পড়েন ; কিন্তু কেদারনাথ দর্শনব্যাকুলতায় সেখানে মাত্র একরাত্রি কাটাইয়া শিবপার্বতীর তপোভূমি কেদারশৈলের অনুপম মাধুর্য ও অদ্ভুত গাম্ভীর্য অনুভব করিতে করিতে তিনি তাঁহার বহুদিনের বাঞ্ছিত ধাম কেদারনাথের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দূর হইতে সূর্যকরোজ্জ্বল কেদারশৃঙ্গে তিনি রজতগিরি-নিভ ধ্যানমগ্ন মহাদেবমূর্তিই প্রত্যক্ষ করিয়া দিব্য-ভাবাবেশে বসিয়া পড়িলেন—অনুভব করিলেন, হিমালয় ভূমানন্দেরই স্থূলপ্রতিমা।

হিমালয়ের এই চিন্ময়রূপ দর্শন করিতে করিতে তিনি ৺কেদারনাথের পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়াই ৺কেদারনাথকে দর্শন করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, 'এই দেখাতেই আমার সকল দেখার অবসান হইল।' এইখানেই তিনি পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহরহ অন্তরে বাহিরে আরাধ্য দেবতাকে অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীকেদারনাথে কিছুদিন বাস করিয়া প্রশান্ত চিত্তে গঙ্গাধর পূর্বসংকল্পিত বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা করিলেন। নরনারায়ণের তপঃক্ষেত্র পুণ্য বদরীকাশ্রমে পৌঁছিয়া তপস্যার অনুকূল স্থান দেখিয়া সেইখানেই তপস্যায় কাল কাটাইবার জন্য তাঁহার অন্তরের বাসনা বলবতী হইল।

কিন্তু তিব্বত যাইবার সময় চলিয়া যাইতেছে বুঝিয়া বদরীর নিকটবর্তী মানা গ্রামে গিয়া তিনি ব্যবসায়ীদের সহিত তিব্বত প্রবেশ করিবার সহজ পথের সন্ধানে রহিলেন। কয়েকদিন পরেই এক দল ব্যবসায়ীর সহিত যাত্রা করিলেন, কিন্তু যাত্রার প্রথম দিনেই তাহাদের প্রমত্ত আচার-ব্যবহার বিশেষত কাঠের ভগ্ন সেতুর উপরেও তাহাদের অসংযত ভাবগতিকের দরুণ দু'একটি ভারবাহী পশুর উল্লম্ফন ও মৃত্যু দেখিয়া তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি মানাগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন—এবং পরদিন ঐ গ্রামের প্রধানের সহিত পুনরায় যাত্রা করিলেন। এবার প্রাকৃতিক পাষাণ-সেতুর উপর দিয়া প্রবল স্রোতস্বতী সরস্বতী পার হইয়া ধীর পদবিক্ষেপে উভয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিলেন—মাঝে মাঝে মেঘমণ্ডলের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের অদৃশ্য থাকিয়া শব্দমাত্র সহায়ে পথ নিরূপণ করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই পথেই পার্বতীর জন্মস্থান হিমালয়পুরী দেখিয়া তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন।

এইভাবে মানা-পাস দিয়া হিমালয়ের প্রথম তুষারশ্রেণী লংঘনপূর্বক গঙ্গাধর তিব্বতের তুষারাচ্ছন্ন মালভূমিতে প্রবেশ করিলেন। নগ্নপদে সামান্যমাত্র শীতবস্ত্র সহায়ে তুষারভূমি অতিক্রম করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যাগমে কোন আশ্রয় না পাইয়া তরুণ পরিব্রাজক আচ্ছন্নভাবে তুষারেরই উপর নিদ্রিত হইয়া পড়েন।

সৌভাগ্যক্রমে পরদিন সকলে নিকটবর্তী একটি বৌদ্ধমঠের সন্ন্যাসী জ্বালানি গুল্ম সংগ্রহে সেদিকে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া সযত্নে তুলিয়া মঠে লইয়া যান, এবং অগ্নিসেকাদি দ্বারা সুস্থ করেন। প্রায়নগ্ন গঙ্গাধরের শারীরিক লক্ষণ-সকল দেখিয়া মঠের লামারা তাঁহাকে অখণ্ড ব্রহ্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারেন, 'গেলাং' বলিয়া খুব সম্মান করেন এবং মঠে থাকিতে বলেন।

এইভাবে গঙ্গাধর থুলিং মঠে থাকিয়া পনের দিনের মধ্যেই তিব্বতী ভাষা শিখিয়া লন, এবং তিব্বতের ধর্ম ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান

সংগ্রহ করেন, এমন কি মঠে ধর্মালোচনায়ও অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন।

তিব্বতে যাহা কিছু সব মঠে ও মন্দিরে। মন্দিরগুলিতে নানা দেবতার বড় বড় মূর্তি : মঠগুলি লামায় পরিপূর্ণ, কোন কোন মঠে তিন হাজার চার হাজার, কোন মঠে সাত হাজার পর্যন্ত লামা থাকিয়া পূজা পাঠ জপ ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেছেন।

মঠের মধ্যস্থলে একটি চৈত্য—তাহাকে ঘিরিয়া লামাদের বাসস্থান, সাধনার আসন, দেওয়ালেরই গায়ে খোদাই-করা সিংহাসন বা চেয়ারের মত বসিবার স্থান। শীত নিবারণের জন্য অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—কোথাও বা তাহার উপর জল ফুটিতেছে ; প্রয়োজনমত কেহ তাহাতে বটিকা সাহায্যে চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেছেন, আবার ধ্যানে বসিতেছেন।

লামারা কেহ পূজায়, কেহ পাঠে রত ; কেহ জপ করিতেছেন—'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ', কাহারও বা ধ্যানের বিষয় 'সর্বশূন্য আমি', সকলেরই প্রথম মন্তব্য—'আমার ইষ্ট বুদ্ধ—আমার সব কিছু সর্বহিতের জন্য'। এই মহাভাব তিব্বতের সকল সাধনার সাধারণ ভিত্তিভূমি। 'আমার সব কিছু সকলের কল্যাণের জন্য'—এই ভাবটি গঙ্গাধরের তরুণ মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং কালক্রমে উহা তাঁহার জীবনাদর্শের অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত হয়।

মঠে চার পাঁচ শ্রেণীর লোক আছেন—তন্মধ্যে লামারাই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ ; বলিতে গেলে তাঁহারাই রাজকার্য চালান, তিব্বতের আয়-ব্যয় সকলই মঠের। বাহিরের কাজ ডাবা বা প্রবর্তকেরাই চালায়—এমন কি ব্যবসাবাণিজ্য পর্যন্ত ; তাই লামারা বহির্বিষয়ে নিশ্চিন্ত। তাঁহাদের কয়েকটি বৌদ্ধ-নিয়মের অধীনে চলিতে হয়, ব্যতিক্রম হইলেই মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। লামার সংখ্যা কম। ডাবাই অধিক—তাহারা লামা হইতে না পারিলে গৃহস্থ হইতে পারে।

মঠগুলি গ্রামবসতি হইতে দূরে, উচ্চ স্থানে অবস্থিত, গৃহস্থের সহিত সংস্রব নাই, বিশেষ আবশ্যক না হইলে স্ত্রীজাতির মঠে আসিবার অধিকার নাই।

প্রধান প্রধান বুদ্ধানুশাসনগুলি মঠে আছে, মঠের ভাল আচার-ব্যবহার, পবিত্র ভাব, সুন্দর নিয়ম গঙ্গাধরকে মুগ্ধ করিল, দেবদেবী শাস্ত্র সব ভারতীয়, পূজাবিধিও প্রাচীন কৌলতান্ত্রিক মতে। পরবর্তী-কালের তন্ত্রোক্ত ভয়ঙ্কর আচারগুলি মঠে অজ্ঞাত।

দেবীর পূজা বলিমাংসরহিত ; তবে ভস্মাসুরের পূজায় তিব্বতীসুরা-দান বিধেয়, কিন্তু পূজক বা মঠের লোকদের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। নৃত্যগীতও নিষেধ। গঙ্গাধর অনুভব করিলেন মঠগুলি পবিত্র-ভাবের আধার এবং আধ্যাত্মিকতার শক্তিকেন্দ্র, এখনও সেখানে জাতিস্মরের আবির্ভাব হয়—এমনই পুণ্যভূমি। একজন প্রধান লামা গঙ্গাধরের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এ ছবি কোথায় পেলে, এমন মুখ, চোখ, কান ত সাধারণ মানুষের নয়—এ ভগবান তথাগতের।" এই বলিয়া ছবিটি তাঁহারা বেদীর উপর রাখিয়া ধূপ দীপ দিয়া আরতি করেন।

তিব্বতের শান্ত সুন্দর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে গঙ্গাধর সাধনার অনুকূল স্থান দেখিয়া আনন্দিত হন, ধ্যানধারণার উপযুক্ত গুফা, পথে পথে ঢিবির মত পাথরে মন্ত্র লেখা, লামাদের হাতে হাতে ধাতুর ডিবাতে 'ওঁ' লেখা—সব কিছু মিলিয়া তিব্বতের আকাশে বাতাসে ধর্মের একটা ঘনীভূত ভাব তিনি অনুভব করিতেন।

তিব্বতীরা যথার্থ ধর্মান্বেষীকে প্রীতির চক্ষে দেখে ও সযত্নে সৎকার করে, তবে ইংরেজের সহিত মেলামেশা বলিয়া ভারতীয়দের প্রথমটা একটু সন্দেহ করে।

মঠ ও মন্দিরের বাহিরে অধিকাংশ লোক দরিদ্র,

কারণ দেশে শস্য উৎপাদন অতি কম, সাধারণ লোকেরা ছাগ-মেষ পালন করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় ছোট ছোট তাঁবুতে কাটায়।

তিব্বতের ভাষা জানা থাকায় একদিকে যেমন তাঁহার ঐ দেশের ধর্ম রীতি-নীতি জানিবার সুবিধা হইল, আর একদিকে আবার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া অভাব-অভিযোগ স্বকর্ণে শুনিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ভাবে সহানুভূতির উদয় হইত, এবং অনেক সময় তিনি উহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, লোকেরা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলে লামারা জানিতে পারিলে বিপদ হইবে।

কয়েকদিন পরে লামাদের কানে সব কথা উঠিল। তাঁহারা গঙ্গাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন, 'গাল বাড়াও'—অর্থাৎ গাল কাটিয়া দিব, তাহা হইলে কথা বলা বন্ধ হইয়া যাইবে। থুলিং মঠে খাপশুদ্ধ তরোয়াল তাঁহার কাঁধের উপর বসাইয়া তাহারা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল। গঙ্গাধর সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করেন। (ক্রমশঃ)

তুমি কি আমার

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তুমি কি আমার সেই ?
গোপনে স্বপনে বাজাও বাঁশরী,
ঘুমের ঘোরেতে থাকো দেহ ধরি,
গগন-নীলিমা মন্থন করি
লীলা কর নিমেষেই ?

তুমি কি রয়েছ গন্ধে ও রূপে,
ফুলের মাঝারে—বাসনায় চুপে,
তুমি কি রয়েছ ছিন্নসুতায়
ধরাইয়া দিতে খেই ?

তুমি কী ডাকিছ সবাকার মাঝে
আমারে—তোমার পথে সদা কাজে,
বিপদে আমায় ধরিয়া হস্তে
কহিছ—শঙ্কা নেই।
তুমি কি আমার সেই ?

তুমি কী সে-গুণী, যাহারে লভিতে
নানান ধর্ম, নানান কবিতে
গাহিতেছে জয় তব ভবময়
বিচ্ছেদ-মিলনেই ?
তুমি কি আমার সেই ?

জাতকের উপকরণ

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

জাতকের কাহিনীগুলি প্রধানত বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ও অনুশাসন প্রচারের জন্যই রচিত হয়। সেগুলির সাহিত্যিক ধর্মগত ও নৈতিক উপযোগিতা ছাড়া অন্য মূল্যও আছে। সুখপাঠ্য গল্প ও গাথার ছলে সে যুগের সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাস জাতক-কথাগুলিতে বিবৃত হইয়াছে। কাহিনীর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ এই-গুলিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

জাতকের পটভূমিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা

যায়, তাহাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, ঘর-সংসার, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি গল্পগুলিতে রূপলাভ করিয়াছে। গল্পগুলিতে বলা হইয়াছে, ভগবান বুদ্ধ বারবার জন্মগ্রহণ করিতেছেন ; প্রত্যেক জন্মে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবনের কোন উচ্চ-আদর্শ দেখাইতেছেন।

কেবল মানব-জন্ম নয়, পশুরূপে, পাখীরূপে, আরও কতরূপেই তিনি জন্মপরিগ্রহ করিতেছেন, ইতর জীবরূপেও সৎকর্ম ও সদাচারের দ্বারা ধর্ম-নীতির নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

জাতকের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তৎকালীন সমাজ ও পরিবারের নানা ঘটনাবলী হইতে। তাহা ছাড়া, তখনকার বহুলপ্রচারিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত প্রচলিত কাহিনীগুলি জাতকে নবরূপ পাইয়াছে। অবশ্য এমন অনেক গল্প আছে, যেগুলি নিছক গল্পই মাত্র, বোধিসত্ত্ব তাহাতে একটি চরিত্র মাত্র।

জাতককথার জনসমাদর এই রূপান্তর হইতেই অনুমান করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কবি কালিদাস যে কাহিনী লইয়া তাঁহার অমর নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' লিখিয়াছিলেন, সেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্প আছে মূল মহাভারতের আদি পর্বে। বৌদ্ধ জাতকের 'কট্ঠহারি জাতক' কাহিনীতে সে গল্পটি রূপায়িত হইয়াছে। মহাভারতের কাহিনীর হুবহু অনুসরণ অবশ্য জাতকে করা হয় নাই। 'কট্ঠহারি জাতক' গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল—

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার বনে মৃগয়া করিতে গিয়া বনবাসিনী এক অপরিচিতা রমণীকে গোপনে বিবাহ করেন। রমণী গর্ভবতী হইলে তিনি তাহাকে একটি অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব স্বয়ং রমণীর গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

বালক তাহার পিতৃপরিচয় জানিত না। সত্যকাম-জাবালির কাহিনীর ন্যায় বোধিসত্ত্ব লাঞ্ছিত হইলে রমণী তাঁহার সত্য পরিচয় দান করিয়া তাঁহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন।

রমণী অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করা সত্ত্বেও লোকলজ্জার ভয়ে রাজা তাঁহাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিতে চাহিলেন না। রমণী তখন সত্যক্রিয়া করিলেন, শিশুটিকে ঊর্ধ্বে বেগে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন —"এ যদি আপনার সন্তান না হয়, তবে এর পতনের ফলে মৃত্যু হ'ক!"

বালক আকাশে উঠিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"রাজা আমি আপনারই পুত্র, আমাকে সর্বজনসমক্ষে পুত্র ব'লে স্বীকার ক'রে আমার ও আমার মাতার মর্যাদা রাখুন।"

ব্রহ্মদত্ত বিস্মিত এবং সে সঙ্গে লজ্জিত হইয়া পুত্রকে কোলে লইলেন এবং সেই সঙ্গে রমণীকেও রাণীর মর্যাদা দান করিলেন।

মূল দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীর ন্যায় জাতকে নাটকীয়তা নাই। তবে উভয় কাহিনীর সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয় গল্পেই বর্ণিত রাজার মৃগয়া, অপরিচিতা কন্যার সঙ্গে পরিচয়, গান্ধর্ব বিবাহ, অঙ্গুরীয়-দান, রাজসভায় প্রত্যাখ্যান, শেষে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলন লক্ষণীয়।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ ও তাহার ফলে রাজার স্মৃতিভ্রংশ, অঙ্গুরীয়কের রোহিত মৎস্যের উদরে বাস প্রভৃতি যে ভাবে নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অনুকৃতি জাতকে নাই। রাজসভায় রমণীর পরীক্ষা-দান রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। কবি কালিদাসের পূর্বেই হয়ত জাতকটির সৃষ্টি হইয়াছিল।

মূল রামায়ণের কোন-কোন কাহিনীও জাতকে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'দশরথ জাতক' কাহিনী রামায়ণের সীতা-রামের গল্পেরই অভিনব রূপ। জাতক-রচকরা সে কালের সকল গল্পকেই আপনাদের মনোমত করিয়া বোধিসত্ত্বের কল্পিত গল্প

জীবনে আরোপ করিয়াছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই—

বারাণসীতে দশরথ নামক একরাজার পাট রাণীর গর্ভে রাম ও লক্ষ্মণ ও সীতার জন্ম হয়। পাটরাণীর মৃত্যুর পরে দশরথ বৃদ্ধবয়সে আর একটি পরমা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িলেন। সে রাণীর গর্ভে রাজার ভরত নামে একটি পুত্র জন্মিল।

দশরথ রাণীর অনুরোধে রাণীর সপত্নী-সন্তান রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে যৌবরাজ্য দিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বনে গেলে ভরত পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। দশরথ রামকে দ্বাদশ বৎসর পরে রাজ্যে ফিরিতে বলিয়াছিলেন, তখনও কাল পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি ভরতকে ফিরাইয়া দিলেন। ভরতও তাঁহার পাদুকা দুইটি সিংহাসনে রাখিয়া রামের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তারপর যথাসময়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাস হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে ভরত তাঁহার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন।

মূল রামায়ণের কেন্দ্রীয় ঘটনা 'সীতাহরণ ও রাবণবধ'কেই জাতক কথা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া জাতকে সীতা রামের সহোদরা, সহধর্মিণী নয়! রামের নাম জাতকে 'রামপণ্ডিত'—রামচন্দ্র নয়। রামায়ণের পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য রামের বনগমন এবং ভরতের ঐকান্তিক ভ্রাতৃবাৎসল্যই জাতককারকে অধিকতর প্রভাবান্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দশরথ-জাতক উক্ত দুইটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত।

রামায়ণ-মহাভারতের বহু উপাখ্যানই এইভাবে জাতকে রূপান্তর লাভ করিয়াছে—শিবি ও উশীনরের গল্প, অণিমাণ্ডব্যের উপাখ্যান প্রভৃতি সে প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের একটি গল্প আছে যে, মাণ্ডব্য নামক এক ঋষিকে চোর অপবাদে শূলে দেওয়া হয়—এই গল্পটি 'কন্‌হদ্বীপায়ন জাতকে' গৃহীত হইয়াছে।

গল্পটি হইল—মাণ্ডব্য ও দ্বৈপায়ন দুই ঋষি ছিলেন। একবার মাণ্ডব্য শ্মশানের প্রান্তে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে পশ্চাদ্‌ধাবিত এক চোর চুরির জিনিস তাঁহার কুটিরে ফেলিয়া পলাইল। নগর-রক্ষীরা মাণ্ডব্যকেই চোর ভাবিয়া রাজসমীপে লইয়া গেল, রাজা তাঁহার শূলদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু শূলবিদ্ধ হইলেও তাঁহার মৃত্যু হইল না, তিনি যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিলেন।

দ্বৈপায়ন খোঁজ করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিলেন। প্রশ্ন করিলে জাতিস্মর মাণ্ডব্য তাঁহার পূর্বজন্মের এক দুষ্কৃতির কথা বর্ণনা করিলেন, সেবার খেলার ছলে একটি মাছিকে তিনি অনুরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, সেই পাপে এ জন্মে তাঁহার এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে।

ভাগবতের মূলকাহিনীও জাতকের 'ঘটজাতক' আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। জাতকে কৃষ্ণ ও বলরাম সহোদর ভ্রাতা। কংস তাঁহার ভগিনী দেবগর্ভার গর্ভজাত সন্তানের হস্তে প্রাণ হারাইবেন জানিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন।

পরে কংস বাধ্য হইয়া দেবগর্ভার সঙ্গে উপসাগর নামক এক রাজকুমারের বিবাহ দিলেন। তাঁহাদের পুত্রসন্তান জন্মিবামাত্র দেবগর্ভা নন্দগোপা নামিকা একটি নারীর রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদের প্রেরণ করিতেন। দশটি পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হইলেন বাসুদেব, এবং নবম পুত্রের নাম হইল ঘটপণ্ডিত।

ঘটপণ্ডিতের সহায়তায় ক্রমে ক্রমে বাসুদেব কংসকে বধ করিয়া সারা পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিয়া অমিতপরাক্রমে রাজত্ব করিয়া জরা নামক এক ব্যাধের হাতে পরিণত বয়সে প্রাণ হারাইলেন। তার পূর্বেই নিজেদের পাপে তাঁহার বংশ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল।

ভাগবতের কাহিনীর চুম্বক এই জাতকে আছে। তবে নানা স্থানেই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়—বৌদ্ধজাতকে ঘটপণ্ডিত একটি বিশিষ্ট চরিত্র, ভাগবতে তাঁহার অনুরূপ কোন চরিত্রের উল্লেখ নাই। কংস এখানে অত্যাচারী রাজা মোটেই নন, পরন্তু বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতারাই দুর্জন বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

জাতকে বলদেব বাসুদেবের অনুজ, অগ্রজ নহেন; বৌদ্ধ জাতকে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অভিশাপেই যদুকুল ধ্বংস হইয়াছে, মহাভারতে দুর্বাসার। জাতকের বাসুদেব তাঁহার সহোদর ভ্রাতাদের সাহায্যে রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, মহাভারত ও ভাগবতের ন্যায় কেবলমাত্র নিজের বিক্রমেই নয়।

কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্রের বহু গল্পও জাতক-কথার রূপ ধরিয়াছে। অনুমান করা যায়, বৌদ্ধ জাতকের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশের বহু গল্প দূর দূর দেশে এককালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেশ-বিদেশের সঙ্গে তখন ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, বণিক পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অন্য বহু বস্তুই বিদেশে লইয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে এ দেশের গল্প-ভাণ্ডারও ছিল। সেইরূপ বিদেশ হইতেও বহু গল্প আসিয়া এ দেশে নবকলেবর লাভ করিয়াছে।

পশুপাখীর জবানীতে কথা বসাইয়া হিতোপদেশ দেওয়ার কথা সুপ্রাচীন, ঈসপের গল্পের মত জাতকেও সে প্রথার অনুবর্তন হইয়াছে।

ঈসপের The Tortoise and the Eagle ও পঞ্চতন্ত্রের 'হংস ও কূর্ম' গল্পের অভিনবরূপ দেখা যায় 'কচ্ছপ জাতকে'। এক কচ্ছপের সঙ্গে দুইটি হংসের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী হয়। 'কচ্ছপ জাতকে'র কচ্ছপের আকাশে উড়িবার সখ হইলে একটি দণ্ডের সাহায্যে তাহাকে লইয়া হংসযুগল ঊর্ধ্বে উঠে, পথে বাচালতার দোষে নিচে পড়িয়া মারা যায়।

এইভাবে জাতক নানাসূত্র হইতে গল্পের কাহিনী আহরণ করিয়াছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের রূপ

বেলা দে

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায়। শুধু বাংলা কেন এ কাব্যরস বিশ্বসাহিত্যেও একান্ত দুর্লভ, বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ হিসাবেই এই পদাবলী আমাদের মধ্যে জীবন্ত হয়ে রয়েছে! জগৎ ও জীবনের, স্রষ্টার ও সৃষ্টির বিচিত্র রহস্যের সন্ধান পাই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে—এই বিশ্বজগতের সর্বক্ষেত্রে রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে যে বিচিত্র শক্তির প্রাণ-প্রবাহের সমারোহ চলেছে, তারই আরতি করে গেছেন বৈষ্ণব কবিরা! কত কাল অতীত হয়ে গেছে, কত কাল চলে যাবে, কত শতাব্দীর পরিবর্তন হবে, তবুও বৈষ্ণব কবির পদাবলী চিরকাল মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবে, চিরসুন্দর হয়ে থাকবে প্রকৃতির মত, দেহের ভেতর আত্মার মত; তাই আজো এই যান্ত্রিকতার যুগেও বর্ষণমুখর রাত্রে মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির পদাবলী—

"এ ঘোর রজনী প্রেমের ঘটা
কেমনে আইল বাটে!
আঙিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

প্রেমময় কৃষ্ণ ও প্রেমময়ী রাধিকা বৈষ্ণব কবির নিজস্ব সৃষ্টি—শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ, তাঁর প্রেম ও আনন্দের পরিপূর্ণ বিষয় ও অবলম্বন হলো শ্রীরাধিকা। আর এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলী। এমন গতিবেগ, এমন উন্মাদনা, প্রাণের

এমন উচ্ছলপ্রবাহ বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, আবেগের গভীরতা ও প্রবলতায়, রূপসৃষ্টির স্বাধীনতায় বৈষ্ণব গীতি-কবিতা সাহিত্যের ক্ষেত্রের একটি নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করলো। পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল কবি বিদ্যাপতি থেকেই এই পদাবলীর ধারা আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয়—তার পদাবলী মধুচক্রের মত, এর কুহরে কুহরে মাধুর্য ! কবি ভাষার ভাণ্ডারে, ভাবলোকে, বিশ্বপ্রকৃতিতে, ধ্বনিজগতে যেখানে যত মাধুর্য পেয়েছেন, সমস্তই তাঁর রচনায় চাতুর্যের বন্ধনীতে একত্র করেছেন সৌন্দর্য-বর্ণনায়, উপমা-প্রয়োগে, শব্দ-সংযোজনায় ও চিত্র-অঙ্কনে বিদ্যাপতি অতুলনীয়! বিদ্যাপতির রচনা তাই আজও শুনতে ভালবাসি—

> "তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
> অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
> বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
> হরি বিনে দিন রাতিয়া।"

এ গান আজও অমর হয়ে আছে। এই পদটিকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই জীবন-ব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণসুরের বাঁশী বাজাচ্ছেন সেই 'হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া,' মনের সে উদাস ভাব থাকলে মানবাত্মা দেশে দেশে যুগে যুগে বসে পরম কাম্য ধনের সাক্ষাৎ বিনা কি করে জীবন ধারণ করবো, বিদ্যাপতির পদাবলী ঠিক সেই মনোভাব জাগায়।"

কবি চণ্ডীদাসও ছিলেন বিদ্যাপতির সম-সাময়িক! চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় মর্মস্পর্শী আবেগ, ভাবের বিহ্বলতা, প্রেমের উন্মাদনা প্রকাশ করে অমর হয়ে রয়েছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রেমের মর্যাদা যে ভাবে ফুটে উঠেছে তা সত্যিই অপূর্ব! প্রেমের আত্মবলিদানে প্রেমের সার্থকতা, প্রেমের প্রকাশ ও বিবৃতি হচ্ছে অন্তরের বেদনার মধ্যে দিয়ে। তাই চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছেন—তাঁর পায়ে আত্মনিবেদন করে ধন্য হয়েছেন—"বঁধু কি আর বলিব আমি

> মরণে জীবনে জনমে জনমে
> প্রাণনাথ হইও তুমি।"

ব্যাকুলহৃদয় এখানে বাঞ্ছিতের সন্ধান পেয়েছে, তাই কথা গেছে হারিয়ে। শ্রীরাধার মত কবিও চির-আকাঙ্ক্ষিতের পায়ে সর্বস্ব সমর্পণ করে আপনিও গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াতে চান। তাই তাঁর গানে শুনি—

> "কী কহবরে সখি আনন্দ ওর
> চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ ধর্মমূলক হইলেও 'কবির কলানৈপুণ্যে তা শ্রেষ্ঠ কাব্যরসের উৎস হয়ে রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিজের সঙ্গে দেহাতীতের ও রূপাতীতের সম্বন্ধ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছে তারই অপূর্ব ছাপ পড়লো জ্ঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে—

> "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর!
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
> হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
> পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।
> (জ্ঞানদাস)

এ যুগের কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাসের গীতি-কবিতা সঙ্গীতধর্মী। বিদ্যাপতি যেমন শব্দের সাহায্যে অনুকরণীয় সৌন্দর্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, গোবিন্দদাস তেমনি শব্দের সাহায্যে মনোরম মাধুর্যের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে শ্রীরাধিকাকে দেখতে পাবেন না। বর্ষাকাল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ময়ূর উতলা হয়ে নাচছে—বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নেই—

> "ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
> শূন্য মন্দির মোর।"

যমুনার তীরে তীরে রাধা নামের সাধা বাঁশী আর বাজে না, কৃষ্ণবিরহে সমস্ত বৃন্দাবন আজ শূন্য—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী।"

শ্রীরাধার এই বিরহ-বেদনাতে জগতের চিরন্তন বিরহদুঃখের কথা ফুটে উঠেছে। এখানে নেই কোনো অনুযোগ—শ্রীরাধা বলছেন—কানু তো আমার গুণনিধি, আমার দুঃখ আমার কপাল দোষে হয়েছে—

আমি "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"

এখানে প্রেমের মর্যাদা যে ভাবে ফুটেছে প্রেম-সাহিত্যে তা অপূর্ব! গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ধরনে, এবং জ্ঞানদাস বলরামদাস চণ্ডীদাসের প্রভাবে পদাবলী রচনা করেন। বৈষ্ণবগীতি-কবিতার ক্ষেত্রে এই তিনজনের দানই অতুলনীয়! জ্ঞানদাসের সেই "তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবি হউ তনু" পদটি ভাবের পূর্ণতায় যেন নিজেই একটি অনবদ্য কবিতা!

পদাবলী-সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রেমগীতি স্বর্গীয় প্রেমরাগিণীযোগে অপূর্ব আধ্যাত্মিক সুরে ভক্ত সাধকের চরম আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে, পৃথিবীর ফুলে স্বর্গের পারিজাতশোভা-সৌরভ বিকশিত হয়ে উঠেছে। সহজ সুন্দর মর্মস্পর্শী দিব্য প্রেম-মণ্ডিত এই সব কবিতা বা গানগুলি আজো সকলের প্রাণ স্পর্শ করে।

দান

শান্তশীল দাশ

দুঃখ দাও আরো তুমি—সুতীব্র দহনে
চিত্ত মোর দগ্ধ কর; আমার ভুবনে
আসুক দুর্যোগ-ঘন ভয়ার্ত রজনী,
শংকিত হব না আমি অসার্থক গণি
এ-জীবন; নৈরাশ্যের তীব্র বেদনায়
আপনারে মানি রিক্ত নিঃস্ব অসহায়,
মৃত্যুর দুয়ারে এসে নেব না আশ্রয়।

তোমার দুঃখের দান কী কল্যাণময়,
জানি আমি; সেই দুঃখ-দহনের মাঝে
তোমার নিবিড় স্পর্শ একান্তে বিরাজে।
সে-স্পর্শ দুঃখের বেশে আসে বারে বারে,
আসে ছদ্ম দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে।
তারই সাথে আস তুমি হে চিরসুন্দর,
তোমার দুঃখের দানে ভরুক অন্তর।

মাহেশের রথ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

মাহেশের রথের কথা বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন, বিশেষতঃ ইহা কলিকাতার সন্নিকট। ৺পুরীধামের পর মাহেশের খ্যাতি আছে। বাংলা ১২২৬ সালের সমাচার-দর্পণে মাহেশের রথযাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে,—

"অনেক অনেক স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাংক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকযাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে।" এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথ পর্যন্ত নয়দিন জগন্নাথদেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভদেবের ঘরে থাকেন; তাহার নাম গুঞ্জাবাড়ী— ঐ নয়দিনে মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্যন্ত নানাপ্রকার দোকান-পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর বিস্তর ক্রয় বিক্রয় হয়। এমত সমারোহ জগন্নাথ ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।"

ইহা প্রায় ১৩৭ বৎসর পূর্বের কথা।

বাংলা ১২২৬ সমাচার-দর্পণে মাহেশের স্নানযাত্রার মহাসমারোহের কথা এইরূপ বর্ণিত আছে—

পূর্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা সহর ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম হইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর আর নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য অন্য প্রকার সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আসেন—পরদিন দুইপ্রহরের মধ্যে জগন্নাথের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রায় এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না" ইহা ইংরেজী ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৩৭ বছরের পূর্বের সংবাদ।

মাহেশের রথ কতদিনের পুরাতন তাহা ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। প্রচলিত প্রবাদ এই—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া এইখানে স্নান করিয়া বিশ্রাম করিতেন। স্নানযাত্রার তিথিতে মাহেশে মহাসমারোহে যে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় উহা জগন্নাথদেবের গঙ্গাস্নানের স্মরণোৎসব।

হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে ওমালী সাহেব বলেন, মহেশের রথখানি সর্বপ্রথমে একজন স্থানীয় মোদক নির্মাণ করিয়া দেন। পুরাতন সরকারী কাগজপত্র দলিলে দেখা যায় যে, সেওড়াফুলির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মনোহর রায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য জগন্নাথপুর গ্রাম দান করেন। স্বর্গীয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'জাতীয় ইতিহাসের' তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে রাজা মনোহর রায়ই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে List of Ancient Monuments in Bengal নামক যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত তথ্য বিবৃত হইয়াছে :—

"It is said that the Jagannath of Mahesh is about the same date with the Radhaballalbh of Vallabhpur i. e. more than 350 years old." অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে চারিশত দশ বর্ষের পূর্বে। প্রচলিত কিম্বদন্তী এইরূপ যে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী স্বপ্নাদেশে গঙ্গাতীরে বালুকায় প্রোথিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীসুভদ্রা ও শ্রীশ্রীবলরামের নিম্বকাষ্ঠনির্মিত বিগ্রহ তিনটি উদ্ধার করেন এবং তিনিই শ্রীশ্রীজগন্নাথের আদেশমত মাহেশে প্রতিষ্ঠা করেন। হাণ্টার সাহেব হুগলী জেলার Statistical Account বইতে প্রমাণ করিয়াছেন মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল।

'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র মহাশয় এই সম্বন্ধে আনুপূর্বিক তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন। সেওড়াফুলির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মনোহর

রায় জগন্নাথ-পল্লী মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথ সেবার জন্য দান করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত আছে। হুগলী জেলার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে :—

"১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিবার সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়ে আক্রান্ত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরের সেবায়েত রাজীব অধিকারী নবাবকে আদর আপ্যায়ন করায় তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং সেবায়েতগণকে 'অধিকারী' উপাধি দেন।"

ইহা ছাড়া "নবাব বাহাদুর সপ্তগ্রামের শাসনকর্তাকে জগন্নাথপুরের রাজস্ব রহিত করিয়া উক্ত মহাল নিষ্কর দেবোত্তর করিয়া দিবার নির্দেশ দেন।" সুধীর বাবু তাঁহার হুগলী জেলার ইতিহাসে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত উক্ত প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—

"পুরীর জগন্নাথমন্দিরের অনুকরণে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই চরণ (মল্লিক) হুগলী জেলার মাহেশে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের উচ্চতা ৭০ ফিট। মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মন্দির ও সেবাইতদিগের বাসগৃহ লইয়া জমির পরিমাণ প্রায় তিন বিঘা। বিগ্রহের বেদীতে নিম্নলিখিত লেখা উৎকীর্ণ আছে—রামতনু মল্লিক ও শ্রীমতী পার্বতী দাসী।"

ঠাকুরের নিত্যভোগের জন্য সাড়ে বার সের চাউলের অন্ন দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন খিচুড়ী ভোগও হয়। নিত্যভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের দান বার্ষিক ১৯২৲ ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাষ্ট ফণ্ডের দান ১৫০৲ টাকা। খিচুড়ী ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের স্বতন্ত্র দান বার্ষিক ৪৩৬৲ টাকা। রামতনু ছিলেন নিমাই মল্লিকের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনিই স্বামীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে মন্দিরের সংস্কার করিয়া বেদীতে তাঁহার পরলোকগত স্বামী ও তাঁহার নাম উৎকীর্ণ করেন। শত বৎসর পূর্বে নিমাইচরণ যে বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন—তাহারই সংস্কার সাধন করেন রামতনু মল্লিকের পুণ্যবতী দানশীলা সহধর্মিণী। নিমাই মল্লিকের নির্মিত কলিকাতার জগন্নাথ ঘাট ও অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া এই পরদুঃখকাতরা মহিলা পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ১২৫৭ সালের "সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়" সংবাদ-পত্র পাঠ করিলে জানা যায়। অট্টালিকাটি মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রার রোগীদের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। রাজা মনোহর রায়ের নির্মিত জগন্নাথের মন্দির জীর্ণ পুরাতন ও ভগ্নদশায় পতিত হইলে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই মল্লিক পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহারও শতবর্ষ পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পার্বতী দাসী সংস্কার করিয়াছিলেন। 'প্রেমানন্দ-জীবনচরিত' নামক গ্রন্থে (স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দ প্রণীত) আছে—

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, মাহেশের বসতবাটী, কাষ্ঠনির্মিত রথ, মাহেশ হইতে বল্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা তাঁহারই (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণরাম বসু) অর্থে প্রস্তুত। কৃষ্ণরাম বাবুর প্রপৌত্র হরিবল্লভ বাবুর জীর্ণদশায় কাষ্ঠনির্মিত ঐ রথ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় হরিবল্লভ বাবু উহা নিজব্যয়ে লৌহনির্মিত করাইয়া বংশের কীর্তি রক্ষা করেন। তদবধি ঐ লৌহরথ মাহেশে এখনও চলিতেছে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে দেখিতে পাই—

"মাহেশ নামেতে গ্রাম গঙ্গাকূলে স্থিতি।
অনেক লোকের বাস নানাবিধ জাতি ॥
এই মহাভাগবত বসু বলরাম।
তাঁর পূর্ব পুরুষদিগের কীর্তিধাম ॥
সুন্দর মন্দিরে জগন্নাথের মুরতি।
ভোগরাগ সহ হয় সেবা নিতি নিতি ॥
বিশেষে আষাঢ়ে মহাসমারোহ হয়।
বৃহৎ কাঠের রথ উচ্চ অতিশয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বসুর বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণরাম বাবুর আমল হইতে মাহেশের জগন্নাথমন্দিরের সেবাপূজার প্রভৃতি বিষয়ে একটা সম্বন্ধ প্রচলিত আছে তাহা তাঁহাদের জ্ঞাতিবংশ স্বধর্মনিষ্ঠ ৺কৃষ্ণ বসু ও ৺শ্যামবাবুর নিকট শুনিয়াছি। তাঁহারা প্রতিবর্ষ মাহেশে রথের সময়

উপস্থিত থাকিতেন। ইহাও বিশেষ করিয়া জানি যে সেওড়াফুলির রাজবংশের অনুমতি ব্যতীত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান হয় না। শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্র 'হুগলী জেলার ইতিহাসে' ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে 'প্রভুর মাহেশের রথে আগমন' একটি অধ্যায় আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। রামকৃষ্ণ-পুঁথির বর্ণনায় বোঝা যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের রোগের তখন সূত্রপাত হইয়াছে। কথামৃতে ১৮৮৫, ১৪ই জুলাই রথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম মন্দিরে রথোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর দুইদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হরিপদবাবুর মুখে মাহেশে রথের সময় ঠাকুরের গমন ও তাঁহার দিব্যভাবের আনুপূর্বিক বর্ণনা শুনিয়াছি—পরে বীরভক্ত গিরিশবাবুর সম্মুখে হরিপদবাবু যে বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহাও শুনিয়াছি। সেই এক বর্ণনা—কোন গরমিল নাই। গিরিশবাবুর বাড়ীতে ৪।৫ দিন হরিপদবাবুর মুখে মাহেশের রথে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব ভাবের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গিরিশবাবুও অতি ভক্তি সহকারে শুনিতেন। আবার বহু পরে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে হরিপদবাবুর মুখে মাহেশে ঠাকুরের গমন ও তাঁর মহাভাবের কথা শুনিয়াছি। বর্ণনা ঠিক একরকম। গিরিশ বলিতেন, "হরিপদ যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য একটুও অতিরঞ্জিত করে নাই বা মিথ্যা বলে নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে হরিপদ যেরূপ খুঁটিনাটি বর্ণনা করে—সেরূপ আর কাহারও কাছে বড় শোনা যায় না। হরিপদ সত্যবাদী—ঠাকুর বা তাঁর অন্তরঙ্গদের কথা আমি তাহার নিকট অনেকবার শুনি। ভক্তির সঙ্গে বড় মধুরভাবে বলে। তার কথায় কখনও সংশয় এনো না। জান—ঠাকুরের সেবা করেছে কাছে থেকে—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম নিয়ে ও কত সেবা করেছে।" পুঁথিতে আছে—

মাহেশে চলিল ভক্ত কয়জন
কৃষ্ণবর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন॥
ফকির ব্রাহ্মণ এক পরম আচারী।
মূল নাম যজ্ঞেশ্বর নিষ্ঠাবান ভারি।
ভক্তিমতী "ভক্ত মা" গোলাপ ঠাকুরাণী।
আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি॥

কিন্তু মনের ধাঁধাঁ —১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই কথামৃতে বলরামমন্দিরে রথোৎসবের কথা আছে—তবে মাহেশের ঘটনা কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্তু "লীলাপ্রসঙ্গ" পাঠ করিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। "লীলাপ্রসঙ্গে" পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিতেছেন—"লেখকের এই আনন্দসম্ভোগ জীবনে একবার মাত্রই হইয়াছিল—ঐ বারেই গোপালের মাকে এই বাটীতে (অর্থাৎ বলরামমন্দিরে) ঠাকুরের কথায় আনিতে পাঠান হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উল্টা রথের কথাই আমরা এখানে বলিতেছি। ঠাকুর এই বৎসর দুইদিন দুইরাত থাকিয়া তৃতীয় দিনে বেলা আটটা নয়টার সময় নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।" এই বর্ণনাটি কথামৃতের ১৪ই জুলাই-এর রথোৎসবের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়।

হরিপদবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন: "রথের পূর্বে আমি দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন, 'মাহেশে রথে জগন্নাথদর্শনে যাব'। বলার সঙ্গে সঙ্গে তা করা চাই। নৌকা ঠিক করা হইলে আমরা কয়েকজন আর গোলাপ-মা ঠাকুরের সঙ্গে গেলাম। ভাবগম্ভীর অবস্থায় ঠাকুর ছিলেন। আমরা মাহেশের রথের মেলা নিয়ে কত কথা বলছি। ঠাকুরের মুখখানি হাসি হাসি কিন্তু কোন কথাবার্তা নেই। মাহেশে লোকের ভিড় দেখে তাঁকে দোতলায় রাখা হল। বাড়ীটি ত্রিতল; তেতলায় গোলাপ-মা খিচুরী রান্না করলেন। কিন্তু ঠাকুর

ভাবমুখে কিছুই খেতে পারলেন না। গলায় বেদনার সূত্রপাত হয়েছে আমরা সবাই মনে করলাম বুঝি তার জন্য খেতে পারছেন না। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি রথ দেখছেন। বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথ তিন ঠাকুর রথে উঠলেন—শাঁখ কাঁসর ঘণ্টা বাজনা সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগলো—চারিদিকে হরিধ্বনি। ঠাকুর একেবারে নীচে নেমে ফটকের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভিড় আগলাবার জন্য আমরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রথ টানবার জন্য গৌড়গয়লারা এসে রথের দড়ি ধরেছে—টান পড়বে—যাত্রীরাও দড়ি ধরেছে এমন সময় ঠাকুর আমাদের ঠেলে ছিটকে তীরের মত রথের দিকে ছুটে গেলেন। আমরা পেছনে ছুটে চললাম। এদিকে ঠাকুর একেবারে ভিতরে রথের চাকার কাছে জোড় হাতে জগন্নাথ দর্শন করে চোখের জলে ভাসছেন। আমরা কাছে গিয়েও ভিড় ঠেলে ভিতরে যেতে পারছি না। প্রায় জন পঞ্চাশ গৌড়গোয়ালারা যারা রথ টানে একেবারে ভিতরে ঠাকুরকে ঘিরে দাঁড়াল। রথটানা স্থগিত হল। আমরা নিকটেই দেখছি—ঠাকুর যুক্তকরে বলছেন 'তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি। জগবাহির নহি মুঞি ছার॥ প্রভু তুমি জগন্নাথ—জগতের নাথ, আমি কি জগৎ ছাড়া।' সে অপূর্ব ভাব! নিমেষ মধ্যে রটে গেল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস ঠাকুর এসেছেন। তাঁকে দর্শন করতে আবার লোকের ভিড় জমে গেল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ—একেবারে বাহ্যসংজ্ঞা নাই। আমরা তাঁর সঙ্গে এসেছি বলে জনতার ভিড় ঠেলে গয়লাদের কাছে বললাম। তারা ঠাকুরকে এমন করে ঘিরে রয়েছে যে একটি লোকও তাদের বেষ্টনী ভেজে যেতে পারে না। আমাদের পরিচয় শুনে অতি সন্তর্পণে যেতে দিলে তাঁকে নিয়ে যেতে। চারদিকে 'জয় জগন্নাথ'—'হরিবোল হরিবোল' তুমুল ধ্বনি উঠছে। কিন্তু ঠাকুরকে বাহিরে নিয়ে আসা কঠিন। একে মহাভাবে বাহ্যসংজ্ঞা শূন্য—মুখে আনন্দের হাসি, চক্ষুতে অশ্রুর প্রবাহ, কম্প রোমাঞ্চ আবার স্থাণুর মত স্থির। আবার তাঁকে দেখার জন্য লোকের ভিড়। গোয়ালাদের সাহায্যে কোন রকমে তাঁকে ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। চারিদিকে হরিধ্বনি, লোক জমায়েত হতে লাগলো—গৌড়দের সাহায্যে কোন রকমে বাড়ীতে আনা গেল। কিন্তু ঠাকুর দুপা যান টলে টলে চলেন আবার স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়ান। রথ চলতে আরম্ভ হল—চারিদিকে কাঁসর ঘণ্টা বাজনা বেজে উঠলো—জনতা রথের সঙ্গে চললো স্থানটি নীরব নিঝুম হল কিন্তু আশ্চর্য ঠাকুরের ভাব ভঙ্গ হয় না। সূর্য অস্ত গেলে প্রায় গোধূলির সময় ঠাকুর ধীরে ধীরে সহজ অবস্থায় এলেন। আমরা তাঁকে ধরে ধীরে ধীরে নৌকায় বসালাম। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসিতে রাত হয়েছিল।" মাহেশের রথে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব দিব্যভাব স্মরণ করিলে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথাই মনে উদয় হয়।

"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরানের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্মসকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেইটিকেই বাছিয়া লইতে পারেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জ্যোতির্গময়

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

এ যে দুর্গম শংকিল ঘন অরণ্য সুগহন,
এখানে বেঁধেছে হিংস্র শ্বাপদ বাসা—
তবুও তো করি শত সাধনায় জীবনের আবাহন,
পদে পদে লভি অসূয়া সর্বনাশা।
এলে পরমের শত সাধনার বোধন ক্ষণ,
বেদনার বিষধরের চুমায় ঘুমায় মন।

হিংস্র পশুর নখর-দর্পে দেবতা তোমারো ভয়?
উগারি গরল কুৎসিত তবে রবে?
কালো কলুষের কালীদহে আজো কালীয় লুকায়ে রয়—
বিষেরই বন্যা ডুবাবে কি আজ সবে?
যুগ-জঞ্জাল ভোলা মহাকাল নাচের তালে—
শূন্যে শূন্যে উড়াবেনা রচি ঘূর্ণজালে?

মহাপ্রলয়ের লগ্ন বিলয়ে দগ্ধ বসুন্ধরা—
শ্যামায়িত কর মরু-ভূ পুনর্বার।
শাণিত নখর দন্ত উপাড়ি—দ্বন্দ্ব-কলুষ ভরা
প্রেতপুরী মুছি আঁকো ছবি অমরার।
তমসা দূরিয়া—জ্যোতির্লোক হে জ্যোতির্ময়,
রচি দাও এই আঁধার গুহায়—হে নির্ভয়।

নমোনমঃ

আনোয়ার হোসেন

এসো প্রাণ-নাথ, এসো হে বিধাতঃ
মন-মন্দিরে মম,
জুড়াতে যাতনা পুরাতে বাসনা
এসো এসো, প্রিয়তম!
জীবন জাগায়ে এসো চিরসুন্দর,
হৃদয় রাঙায়ে এসো এসো মনোহর,
চিরভাস্বর রূপেতে তোমার
ঘুচাও মনের তমঃ!
ভুবনমোহন, হৃদিরঞ্জন,
নমোনমঃ নমোনমঃ!

* * *

তব প্রেম-রসে ওঠে ধরা কল্লোলি,
তব প্রেমালোকে ফোটে ফুল উচ্ছলি,
তব রূপরাগে চরাচর জাগে
জাগে প্রেম মনোরম!
জাগো জাগো মম চিত্তমাঝারে
জাগো ওহে নিরুপম!
তুমি হে অনাদি, অনন্ত, অব্যয়,
তুমি হে সত্য, তুমি শিব চিন্ময়;—
তোমার জ্যোতিতে অন্তর মম
ফুটাও কমলসম!
চিরবাঞ্ছিত, ওহে অনুপম,
নমোনমঃ নমোনমঃ!

সমর্পণ

অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ

সব যদি ব্রহ্ম তবে 'সমর্পণ' কথাটির অর্থ কি? 'এক' তিনিই অনন্ত 'বহু' হয়েছেন। তবে সর্বস্ব তাঁতে সমর্পণ করার উপদেশের সার্থকতা কোথায়? 'বাসুদেবঃ সর্বম্‌'······তবে কে আর কাকে সমর্পণ করবে? ···· সমর্পণ করবার পূর্বেই তো সব চির-সমর্পিত হয়েই আছে! এই বহুর খেলার সবটুকু তো তাঁর! নিজের ভালোতেও অহংকার করবার নেই, মন্দেতেও নিরাশ হবার কিছুই নেই (নৈরাশ্যও

একপ্রকার অহংকারই)······তথাকথিত ভাল ও মন্দ সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছারি খেলা, তিনিই অনন্ত ভাল-মন্দ রূপে মুহূর্তের খেলায় আত্মপ্রকাশ করছেন, তাঁরি রঙ্গমঞ্চে একা তাঁরি অনন্ত অভিনয়······ 'সদসচ্চাহং তৎপরং যৎ'······সৎ, অসৎ এবং দুয়ের অতীত সবই তিনি। 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'—এই এক কথাতেই ত তাঁর ইচ্ছার সর্বময় কর্তৃত্ব স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

সব যদি তিনিই করছেন, সব যদি তাঁরি আত্মপ্রকাশ তবে আর আমাকে সর্বস্ব সমর্পণ করার উপদেশ দেওয়ার অর্থ কি হতে পারে? 'সমর্পণ' কথাটিকে আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করি এ সমর্পণ সে অর্থে হতে পারে না, কারণ তাতে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব এবং স্থূল সূক্ষ্ম সব কিছুতে তাঁরি স্বপ্রকাশের যে তত্ত্ব তাহারি বিরোধিতা করা হয়।

তাই আমার মনে হয় সমর্পণ করার উপদেশের প্রকৃত বক্তব্য একমাত্র এই হতে পারে যে, সব কিছু যে তাঁরি এবং তিনিই, সবই যে তাঁর চরণে চিরসমর্পিত হয়েই আছে, এই সত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্মরণ রাখা, দেখা এবং এই সত্যের পূর্ণ স্বীকৃতিতে চলা,—মনে রাখা এই দেহ তাঁর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্ত, অস্মিতা, এই বিশ্ব সবই তাঁর এবং তিনিই—প্রতি ব্যষ্টি এবং সমষ্টি তাঁরই এবং পূর্ণভাবে তিনিই।

এই সত্যের স্মৃতিতে স্বতন্ত্র আমি বা আমার বলতে কিছুই নেই। এই দৃষ্টিতে কাম, ক্রোধ··· ··· ইত্যাদি কিছুই নেই, সব লয় পেয়ে যায়, কারণ এরা সব স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গেই জড়িত। যাকে কাম বলতাম তাতে যদি তাঁর ইচ্ছাকেই আন্তরিক ভাবে এবং পূর্ণ বিশ্বাসে দেখি, তবে আর কাম থাকে কোথায়, তাঁর ইচ্ছাই তো থাকে! যেটিকে 'সর্প' বলে ভ্রম করেছিলাম সেটিকেই যদি 'রজ্জু' বলে বুঝি, বিশ্বাস করি ও স্মরণ রাখি তবে আর সেটিকেই পুনরায় 'সর্প' বলার অর্থ হয় না। যা স্বতন্ত্র 'আমি'র কল্পিত তাই কাম-ক্রোধাদি রূপ ধারণ করতে পারে। অবিদ্যা-প্রসূত স্বতন্ত্র আমিই যেখানে নেই সেখানে আর কাম-ক্রোধাদি কোথায়? —সেখানে শুধু এক তাঁরি ইচ্ছা রয়েছে।

আমাদের প্রার্থনাও তাঁরি ইচ্ছা। যে অবিদ্যা বা মায়ায় স্বতন্ত্র 'আমি'র কল্পনা আসছে তাও তাঁরি ইচ্ছা। আবার এই অবিদ্যা দূর করে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা তাহাও তাঁরি ইচ্ছা, তিনিই যদি 'সব' তবে ঐ অবিদ্যারূপেও তিনি, আবার জ্ঞানরূপেও তিনিই।

তাই বলি 'সমর্পণ' অর্থ, আমার কিছু তাঁকে দেওয়া নয়; সমর্পণ অর্থ, সব যে তিনিই, সব যে তাঁরি ইচ্ছা, এই সত্যের অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্মরণ ও গ্রহণ। তাই সমর্পণ ও জ্ঞান একই কথা, যে জ্ঞানে সব ব্রহ্মময়!—

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।'

সত্যের এই অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আমরা কি করে জাগিয়ে রাখতে পারি? একমাত্র তাঁরি কৃপায়। 'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ'—তাঁর ইচ্ছাতেই স্মৃতি ও বিস্মৃতি। তাই মিথ্যা অহমিকা এই সত্যের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে পারে না—তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁর শরণাগতিই সত্যস্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখবার উপায়, আর এই সত্য-স্মৃতিই সমর্পণ

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'।

সমালোচনা

অহল্যা (উপন্যাস)—শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কথামৃত-ভবন, ১৩৷২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ২॥০

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন আগন্তুক নন। সাহিত্যিক-সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে এবং একদা ইনি 'অমৃত শর্মা'র ছদ্মবেশে অনেক অমৃত বিতরণ করেছেন। তবে 'অহল্যা' এঁর উপন্যাসের প্রথম নমুনা। কিন্তু এই প্রথম নমুনাটিই পাঠককে এই প্রশ্নে মুখর ক'রে তুলেছে, "এতোদিন ইনি উপন্যাসে হাত দেননি কেন ?" এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য স্বয়ং লেখকের কাছে ; তবে 'অহল্যা' লেখকের পরিণত চিন্তার ফসল। আর সেই ভরসাতেই বইটি হাতে পড়া মাত্রই পড়তে বসেছিলাম এবং এক নিশ্বাসেই প'ড়ে ফেলেছিলাম।

যে বই এই বয়সে একাসনে ব'সে প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলা যায় তার সম্বন্ধে এক কথায় বলা চলে "বইটি ভালো লাগলো" ; কিন্তু 'অহল্যা' সম্বন্ধে এক কথায় মন্তব্য প্রকাশ ক'রে লেখকের পাওনা শোধ ক'রে ফেলা যায় না। 'অহল্যা' এমন একখানি বই যে প'ড়ে "ভালো লাগা"টাই তা'র পক্ষে শেষ কথা নয়।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি ক্ষুদ্রকায় প্রণয়-কাহিনীমাত্র ; কিন্তু সেটি হচ্ছে আধার। এই কাহিনীর অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে লেখকের একটি গভীর বক্তব্য। সে বক্তব্য মেঘবিদ্যুতের লুকোচুরির মতো স্থানে স্থানে ঝলসে উঠেছে, পাত্রপাত্রীর তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে।

আসলে প্রায় সমগ্র গল্পটিই গ্রহণ করতে হচ্ছে পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে, কারণ এ গ্রন্থে লেখক আশ্চর্যভাবে নিজেকে রেখেছেন অনুপস্থিত। নিজেকে নেপথ্যে রেখে গল্পকে ব্যক্ত করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। তবে এই কারণেই 'অহল্যা'র জন্য চাই চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠক। কেবলমাত্র গল্প গলাধঃকরণে পটু সাধারণ পাঠক 'অহল্যা'র অন্তর্নিহিত উচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক জীবন-ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে ব'লে মনে হয় না। বোধ করি এই ব্যাখ্যা আর একটু বিস্তৃত হ'লে পাঠক সাধারণের সুবিধা হ'তো।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস এই কথাই ঘোষণা করছে, সহস্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ এগিয়েই চলেছে। মাটির মানুষ উঠছে মাটি ছাড়িয়ে। সে প্রতিনিয়ত ভুল করছে, বারে বারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে, তবু নিজেকে হারিয়ে ফেলছে না। সত্যের অনুসন্ধানে তার অনন্ত পরিক্রমা।

এই পরিক্রমার কক্ষপথে ক্ষণে ক্ষণে নতুন তথ্যের উদ্ঘাটন। গ্রহণ-বর্জনের অবিরাম সংঘর্ষে চেতনার ক্রমবিকাশ। 'অহল্যা'র একটি বিশিষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক বলেছেন, "মানুষের মধ্যে দেবতা এসেছেন, আসছেন, আসবেনও।"

লেখকের এই প্রত্যয় পাঠকের উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেওয়াই সাহিত্য-কর্ম! আমরা আশা করবো, অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর চিন্তাশীল মনের এই প্রত্যয় আর বলিষ্ঠ লেখনী নিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবিচল উপস্থিতি দান করবেন।

—আশাপূর্ণা দেবী

নিঃসঙ্গ—শ্রীসতীশচন্দ্র দে প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসলিলকুমার দে, ১৩ ডি, ফয়ডাইস লেন, কলিকাতা-১৪ ; পৃষ্ঠা—২৫৪ ; মূল্য ৩৲ টাকা।

একখানি ক্ষুদ্র আত্মচরিত-বর্ণনা। বইখানির ভাষা যেমন সহজ ও সরল তেমনি মধুর লালিত্যময় এবং স্বচ্ছন্দ এর গতি। "নিঃসঙ্গ" শব্দটির ভেতরেই এমন একটি ইঙ্গিত লুকোনো রয়েছে যা একমাত্র

"আত্মচরিত" শব্দের দ্বারা সুপ্রকাশিত হতে পারে না। এর ভেতরে রয়েছে বিশ্বকবির সেই অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনাময়ী বাণী,—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্ রে!"

বাংলার তথা সমগ্র ভারতের পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের ব্রতে মরণ-পণ করেছিলেন যে তরুণের দল, লেখক সতীশচন্দ্র তাঁদেরি অন্যতম। এঁরা জীবনপণে এগিয়ে এসেছিলেন মৃত্যু-আহবের পথযাত্রী সবাই একাকী,—সঙ্গীহীন হয়েই। কিন্তু যুদ্ধবন্দী শিবির ঐ ভয়াবহ নিঃসঙ্গ কারাক্ষেত্রে মিলন হয়েছিল, বাংলার ও বিভিন্ন ভারতীয় যুবক শহিদদের শত সহস্রে। সে দিনকার সেই সব নির্ভীক সর্বত্যাগী শহিদদের অশ্রুসিক্ত এবং মৃত্যুপূত কারাকক্ষগুলিই আজ হয়েছে স্বদেশপ্রেমিকের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত। এই সব শহিদের জীবনে, নিঃসঙ্গের ভাষায়, ফুটে উঠেছে যে বীরত্বপূর্ণ স্বদেশপ্রেম, যে অতুলনীয় আত্মত্যাগ, মৃত্যুমুখেও যে স্বদেশকল্যাণের দৃঢ়তা, যে অপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতা, আজ তাই সুস্পষ্টভাবে, দুর্গত বাংলার যুব-সমাজের সামনে তুলে ধরবার আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছে—অতি মাত্রায়। সেই হিসেবে "নিঃসঙ্গ" স্কুলের অতিরিক্ত পাঠ্য তালিকায় স্থান পাবার অধিকারী বলেই মনে হয়। নিঃসঙ্গ, একদিকে যেমন লেখকের ও সমসাময়িকদের জীবনালেখ্য, তেমনি ইতিহাসেরও একখানি সুস্পষ্ট প্রামাণ্য পুস্তিকা। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি পড়ে লেখককে যে অভিনন্দন জানিয়েছেন সেই চিঠিগুলি প্রারম্ভে সন্নিবদ্ধ হয়েছে।

—স্বামী পূর্ণানন্দ

আত্মদর্শননির্বৃতিঃ—*শ্রীআত্মানন্দ গুরু প্রণীত।* মালয়ল হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীরবিবর্মা তাম্পন্ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত। প্রকাশক—পি গোবিন্দন্ নায়ার, বেদান্ত পাবলিকেশন্স্, সস্ট-মঙ্গলম্, ত্রিবেন্দ্রাম। পৃষ্ঠা—৭৮; মূল্য—অনুল্লিখিত।

আলোচ্য গ্রন্থ 'আত্মদর্শন' এবং 'আত্ম-নির্বৃতি' নামক দুইখানা মালয়লম্ ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংস্কৃতে অনুবাদ। পূর্বে সংস্কৃতই ভারতীয় পণ্ডিতগণের দর্শনালোচনার ভাষা ছিল। বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা অবহেলিত। হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া ভারতীয় লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতা সংকীর্ণ বলিয়া মৌলিক বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধ ইংরেজীতেই লিখিত হয়, ইহার ফলে তাহা ভারতের সর্ব প্রদেশের এবং ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টিলাভে সক্ষম হয়। বর্তমান গ্রন্থ সহজ সংস্কৃতে রচিত। ইহাতে অবলম্বিত যুক্তিপ্রণালীও সুবোধ্য। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা সমাদর লাভ করিবার উপযুক্ত।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অদ্বৈত বেদান্ত। গ্রন্থের প্রথমেই আছে—"সমুদ্রে তরঙ্গসকল উৎপন্ন হয়, উৎক্ষিপ্ত হয়, পরস্পরের উপর পতিত হয়, পরিশেষে বিস্তীর্ণ হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জীবগণ তাদৃশ তরঙ্গদিগের সমানধর্মা!" "অভয়স্থানের অন্বেষণ করিতে করিতে তরঙ্গ যেমন তীর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, তেমনি জীবও বিভিন্ন মার্গে পরমাত্মার অন্বেষণ করে।" "বস্তুতঃ তরঙ্গ যেমন জলমাত্র, তরঙ্গবান্ সমুদ্রও যেমন জলের অতিরিক্ত কিছু নহে, তেমনি জীব ও ঈশ্বরও সচ্চিদানন্দ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে।" নানা ভাবে এই তত্ত্বই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, জগতের কারণের অন্বেষণ যুক্তিহীন। প্রপঞ্চের মধ্যে কারণত্ব এবং কার্যত্ব আছে, কিন্তু প্রপঞ্চের কারণ অন্বেষণ অযৌক্তিক। দেশ, কাল, কার্য-ও কারণ-ভাব জগতের মধ্যেই বর্তমান, তাহার বাহিরে নাই। কেবল জড়ের নহে,

চেতন জীবেরও কারণান্বেষণ যুক্তিহীন। জীবভাবের উৎপত্তি ও জীবোৎপত্তি একই। জীবভাবের অর্থ জ্ঞাতৃত্বাদিরূপ কর্তৃত্ব। জীবের কারণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা কর্তার স্বরূপ যে কর্তৃত্ব তাহার কারণ অর্থাৎ কর্তা কে তাহাই জানিতে ইচ্ছুক। "স্বয়ং স্ব-স্কন্ধারোহী পুরুষের অন্বেষণ"ও ইহা অপেক্ষা মূঢ়তর নহে।

জড় ও অজড়ের 'সমুদায়'ই জীব। জীবের যে অজড়াংশ আছে তাহা অদৃশ্য। কালাদি জড়পদার্থ সেই অজড়াংশের দৃশ্য। এই দৃশ্যতার অতিরিক্ত তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। বরং তাহাদের অস্তিত্বের (দৃশ্যতার অতিরিক্ত অস্তিত্বের) অভাবের প্রমাণ আছে। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"দ্রষ্টা চ দৃশ্যঞ্চ তথা চ দর্শনম্,
ভ্রমস্তু সর্বস্তব কল্পিতো হি সঃ।
দৃশেশ্চ ভিন্নং ন হি দৃশ্যমীক্ষতে
স্বপন্ প্রবোধেন তথা ন ভিদ্যতে॥"

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বিষয়োন্মুখী যে বোধ তাহাই মন এবং আত্মাভিমুখী বোধ শুদ্ধসত্ত্ব। দৃশ্য ও আত্মা একই "বোধ"বস্তু, এই অনুভূতিকে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বলে। বোধের সকল বিষয়ই বোধে উত্থিত হয়, তাহাদের তিরোভাবের পরে বোধ বর্তমান থাকে, শূন্য নহে। শব্দাদি বিষয় যৎ-কর্তৃক জ্ঞাত হয়, তিনিই সর্বব্যাপক নিশ্চল কেবলাত্মা। যখন আত্মবুদ্ধি দেহকে ছাড়িয়া আত্মায় স্থাপিত হয়, তখনই বন্ধমুক্তি, তখনই শান্তি-সুখ।

জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে "সত্তা" বস্তু বর্তমান। জড়পদার্থের স্বরূপ যে জাড্য, সত্তাই তাহার ভিত্তি। এই সত্তা অ-জড়। কার্যত্ব ও কারণত্বও "সত্তা"র উপর প্রতিষ্ঠিত। এই "সত্তা" স্বতঃসিদ্ধ। কারণের অপেক্ষা ইহার নাই। "তদপূর্বম্ অনপরম্" এই শ্রুতিতে উক্ত "তৎ" শব্দ ব্রহ্ম বুঝাইতে প্রযুক্ত। 'সত্তা' ব্রহ্মেরই নামান্তর। তাহার পূর্বভূত কোনও কারণ, অথবা পরভূত কার্য নাই। যোগবাশিষ্ঠও সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কারণত্বাদির নিষেধ করিয়াছেন। এই সত্তায় যে কারণত্বের অনুভব হয়, তাহা আগন্তুক, তাহা উপাধিমাত্র। তাহা সত্তায় স্বাভাবিক নহে। কারণত্বরহিত সত্তার মধ্যে যে কারণতার আবির্ভাব হয়, তাহাই কার্য-প্রপঞ্চের আবির্ভাব।

বোধের বিষয়সকল—বোধে যাহাদের প্রতীতি হয় তাহারা বোধ হইতে ভিন্ন নহে, এই তত্ত্ব যখন দৃঢ়মূল হয়, তখন নিদ্রা তাহার তত্ত্বাবরণরূপ বর্জন করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে পরিণত হয়। বিষয়-সকল বোধের অতিরিক্ত নহে, এই অনুভব দৃঢ় হইলে স্বরূপ-স্থিতিলাভ হয়। তাহাতে আর অবস্থা-ভেদ থাকে না।

বোধের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব যখন নাই, তখন বোধে ইহাদের উদ্ভব হয় কেন? তাহারা উপাধিমাত্র, কিন্তু এই উপাধি আসে কোথা হইতে? ইহা কি মায়া বা অবিদ্যা-জাত? গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, "যথাবিষয়ং প্রত্যয়াঃ উৎপদ্যন্তে" (বিষয়ের অনুরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়) ইহা সত্য নহে, "যথাপ্রত্যয়ং বিষয়াঃ উৎপদ্যন্তে" (প্রত্যয়ের অনুরূপ বিষয়সকল উৎপন্ন হয়) ইহাই সত্য। এই প্রত্যয়সকলের উৎপত্তি হয় কেন? গ্রন্থকার বলেন, আচার্য শঙ্করের মতে মায়া আত্মায় তত্ত্বরূপে অবস্থান করে না, তাহা আগন্তুক উপাধিমাত্র। এই প্রত্যয়সকলের উৎপত্তিই মায়া। বাহ্য প্রপঞ্চ কেবল প্রতীতিমাত্র। এই প্রতীতিই মায়া। ভেদ-বিহীন বোধস্বরূপ সত্তায় এই আগন্তুক মায়ার আবির্ভাবের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা গ্রন্থে নাই। ব্যাখ্যা হয়তো অসম্ভব, কেননা মায়া অনির্বচনীয়।

বিষয় সাকার, বোধ নিরাকার। নিরাকার বোধে বিষয়ের উৎপত্তিকালে উপাধিবশে বোধ সাকার প্রতীয়মান হয়। এতাদৃশ বোধ (গ্রন্থকার বলেন) ভ্রম। ভ্রমাতিরিক্ত সাকার-বোধের অস্তিত্ব

নাই। সাকার-বোধাতিরিক্ত কোনও ভ্রমও নাই। সকল বিষয়-দৃষ্টিই ভ্রম। নিরাকার বোধে যে সাকার দৃষ্ট হয়, তাহার অতিরিক্ত "দৃশ্য" অন্য কিছুই নাই।

গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-প্রণালী সুন্দর, বচন-বিন্যাস-প্রণালী সুন্দর। এই গ্রন্থ সুধীগণের সমাদর লাভ করিবে আশা করা যায়।

—শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বাত্যা,- বন্যা- ও ভূমিকম্প - সেবা—তমলুকের সুতাহাটা থানায় বাত্যা-পীড়িতগণের যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা মোট ১০৯/।৮ সের চাউল বিতরণান্তে ১৩ই আগস্ট শেষ হইয়াছে। মিশনের শিলচর শাখাকেন্দ্র বন্যার্তদের জন্য কাটলিচরা এলাকায় ৬১টি নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। করিমগঞ্জ শাখাকেন্দ্র 'টেস্ট-রিলিফ' চালাইয়া যাইতেছেন। দক্ষিণ ভারতে মিশন রামনাদ ও তাঞ্জোর জেলায় বাত্যা-পীড়িত-গণের জন্য যে সেবাকার্য ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে আরম্ভ করেন তাহা এখনও শেষ হয় নাই। গৃহ-হীনগণের পুনর্বসতির কাজ চলিতেছে। কচ্ছের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে গৃহহারাগণের জন্য অঞ্জার শহরে মিশন সেবাকার্য চালাইতেছেন। এ পর্যন্ত ৬০টি পরিবারকে নূতন গৃহ তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিশনের শিলং শাখাকেন্দ্র আসামের নওগাঁ জেলায় হোজাই এলাকায় বন্যাসেবা-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

কলম্বো শাখাকেন্দ্রে বুদ্ধজয়ন্তী—ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০তম জয়ন্তী কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২৩শে হইতে ২৭শে মে (১৯৫৬) সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী প্রথম দিন এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। পরবর্তী চারদিনের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সিংহল সুপ্রীম কোর্টের জনৈক ভূতপূর্ব বিচারপতি, সিংহলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সিংহলস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার এবং সিংহলের ব্রহ্মদেশীয় রাষ্ট্রদূত। দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ পাঁচ দিনই এই সম্মেলনগুলিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিংহল সরকার কর্তৃক স্থানীয় ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স্‌ হলে আয়োজিত একটি বৃহৎ সভাতেও মিশনের পক্ষ হইতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ভগবান তথাগতের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সর্বজনহৃদয়স্পর্শী একটি ভাষণ দান করিয়াছিলেন। এই সভায় সিংহলের প্রধান মন্ত্রী এবং বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্ট্‌স্‌ হোম—ঠিকানা: পোঃ বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা); ফোন—পানিহাটি, ২৪৪। এই প্রতিষ্ঠানের সপ্ত-ত্রিংশ বার্ষিক (১৯৫৫) কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কলেজের ছাত্রগণকে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বলাভের সহায়তা দিবার জন্য ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের সমস্ত খরচ আশ্রমই বহন করেন। আশ্রমের শিক্ষার সুযোগ লইতে ইচ্ছুক কতিপয় ছাত্র নিজের খরচ দিয়া থাকিতে পারে। আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৬৯টি বিদ্যার্থীর মধ্যে ৩৮ জন ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক; ১১ জন ছাত্র আংশিক খরচে এবং ২০ জন সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া ছিল। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সমবেত ছাত্রেরা আশ্রমের উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনা করে। সন্ন্যাসি-অভিভাবকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিয়মিত গীতা ও উপনিষদ্‌ পাঠ এবং ধর্মীয় ও সমাজ-নীতি-

বিষয়ক আলোচনা-ক্লাস নির্বাহ করেন। ছাত্রেরা আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর জন্মদিনও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করে। এতদ্ব্যতীত স্বাধীনতা- ও প্রজাতন্ত্র দিবস, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও সরস্বতীপূজাও মনোরম-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। নববর্ষ ও বিজয়া-সম্মেলনে বহু প্রাক্তন বিদ্যার্থীর সহিত আশ্রমবাসিগণের মিলন একটি আনন্দপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাতে বর্তমান বিদ্যার্থিগণ প্রাক্তনদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায়। ভানু দাশগুপ্ত স্মৃতি-তহবিল হইতে কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের ৩৫টি দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা-ফির সাহায্য হিসাবে ৪৮৫৲ টাকা এবং কৃষ্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড হইতে ৯০৲ টাকা তিনজন ইন্‌টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর ফি বাবদ দেওয়া হয়। আশ্রম-লাইব্রেরীর ১৮৫০ খানি সুনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে ছাত্রেরা ৪৪১ খানি পড়িবার জন্য লইয়াছিল এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া হয় ৫০৬ খানি গ্রন্থ।

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির জ্ঞান রাখার জন্য ৫টি প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা এবং ১৩টি সাময়িকী বিদ্যার্থিদিগকে নিয়মিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। খ্যাতনামা পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতিগণের মাসিক বক্তৃতাবলীও তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। আশ্রমে একটি ব্যায়ামাগার এবং দুইটি খেলাধূলার মাঠ আছে। একটি দীর্ঘ ঝিল, এবং বৃহৎ পুষ্করিণীতে বিদ্যার্থিগণ সন্তরণ অভ্যাস করে। আশ্রমে জাতিভেদের কোন প্রশ্নই নাই, অবৈতনিক ও বৈতনিক ছাত্রের মধ্যেও কোন ব্যবধান কেহ বুঝিতে পারে না। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যার্থিআশ্রমের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ফল যথা :—বি-এস্-সি পরীক্ষার্থী ৪ জনের মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীর ও ২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ ৪ জনই উত্তীর্ণ। বি-এ পরীক্ষার্থী ২ জনের ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়াছে। ১৫ জন আই-এস্-সি পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৩টি ছাত্র পাশ করে; ৯টি প্রথম বিভাগে (১টি সরকারী বৃত্তিসহ)। আই-এ পরীক্ষার্থী একজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

Thus Spake The Buddha—Compiled by Swami Suddhasatwananda, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-4. Pocket size ; pages—100 ; Price--Six annas. ভগবান বুদ্ধের সুনির্বাচিত বাণীসংগ্রহ। অগাধ বৌদ্ধ-শাস্ত্র হইতে তথাগতের নিজমুখ-কথিত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ উপদেশ বিভিন্ন বিষয় বিভাগ করিয়া এই পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। বুদ্ধ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উক্তিও একটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট। ভগবান বুদ্ধের প্রাণস্পর্শী বাণী এত সংক্ষেপে এবং এমন সুন্দরভাবে সাজাইয়া সঙ্কলয়িতা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মহাদৃষ্টি

স্বল্পেয়ং মঠিকা ব্রাহ্মী জগন্নাম্নী সুসঙ্কটা।
গজো বিল্ব ইব স্বাঙ্গে ন মাতি বিপুলং বপুঃ॥

বিরিঞ্চিভবনাৎ পারে তত্ত্বান্তেপ্যাহরৎ পদম্।
প্রসরত্যেব মে রূপমদ্যাপি ন নিবর্ততে॥

ক্বেয়ং কিল মহাদৃষ্টির্ভরিতা ব্রহ্মবৃংহিতা।
ক্ব সরীসৃপভীমাশা ভীমা রাজ্যবিভূতিভিঃ॥

অনন্তানন্দসম্ভোগা পরোপশমশালিনী।
শুদ্ধেয়ং চিন্ময়ী দৃষ্টির্জয়ত্যখিলদৃষ্টিষু॥

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশমপ্রকরণ, ৩৯।৬২-৬৩, ৬৭-৬৮

আত্মসত্তাকে যখন চিনি নাই তখন এই ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থানকে মনে হইত কী বৃহৎ! আজ নিজের চৈতন্যসত্তাকে আবিষ্কার করিয়া দেখিতেছি যে উহার তুলনায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একান্তই ক্ষুদ্র, চরাচর অখিল জগৎ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। একটি বিল্বফলের মধ্যে যেমন হস্তীর স্থান হয় না, তেমনই জগৎ নামক সীমাবদ্ধ আধারটি আমার সীমাহীন বিপুল স্বরূপকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

বিরিঞ্চি-নিকেতন বা ব্রহ্মলোকেরও পারে এবং সাংখ্য-বৈষ্ণবাদিতন্ত্রপ্রসিদ্ধ অথবা শৈব-পাশুপত প্রভৃতি আগমনির্দিষ্ট তত্ত্বসমূহকে অতিক্রম করিয়া আমার 'ভূমা' স্বরূপ প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে, অদ্যাপি তাহার প্রত্যাবর্তন ঘটে নাই। কে উহার ইয়ত্তা করিবে, কিসে উহার সীমা টানা যাইবে?

কোথায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত এই পরিপূর্ণ মহাদৃষ্টি, আর কোথায় সর্পের ন্যায় ক্রুর, দুরন্ত আশাসমূহে বেষ্টিত ভয়াবহ সংসার-বিভব!

জগৎ ও জীবনকে আত্মজ্ঞানহীন নরনারী কত দৃষ্টিতেই দেখে, কিন্তু কোন দৃষ্টিই নির্মল নয়, নির্ভয় নয়, পরমসুখাবহ নয়। আত্মোপলব্ধির উপর যে দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত সেই বিশুদ্ধা চিন্ময়ী মহাদৃষ্টিই মানুষকে অনন্ত আনন্দসম্ভোগের অধিকারী করে, পরাশান্তি দানে ধন্য করে। উহাই সকল দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতৈষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রতীকার কি?

কাশীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মনীষী ডক্টর শ্রীভগবান দাস 'প্রতীকার কি?'—এই নামে কলিকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন (চিঠির তারিখ—২২-৯-৫৬)। একটি আমেরিকান পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ লইয়া সম্প্রতি দেশের নানাস্থানে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও গোলমালের পরিচয় পাওয়া গেল উহার প্রতীকার কি—ইহাই তাঁহার প্রশ্ন। এই প্রবীণ চিন্তানায়কের মতে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে আরবদেশীয় মুসলমানগণের ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিন্ধুরাজ্যের রাজা দাহিরের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের সহায়তা লইয়া বর্তমান করাচীর চতুষ্পার্শ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই এই সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত। তাহার পর আজ ১২০০ বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক যুদ্ধ লাগিয়াই রহিয়াছে। সমাজ-দেহে এই বিদ্বেষ গভীর হইতে গভীরতর শিকড় গাড়িয়া চলিয়াছে। ব্রিটিশ আমলে শাসকবর্গের 'ভেদনীতি'র ফলে বিদ্বেষ-বিষ আরও বেশী করিয়া সংক্রামিত হয়। উহার চূড়ান্ত ফল ভারত-বিভাগ ও ভারতের দুই প্রান্তে দুটি পাকিস্তান-সৃষ্টি। আশা করা গিয়াছিল দেশ বিভাগের পর শান্তি আসিবে। কিন্তু কই, আদৌ তো তাহা হইল না। বিদ্বেষের কারণ যে রহিয়া গিয়াছে, কারণ দূরীভূত না হইলে কার্য তিরোহিত হইবে কিরূপে? দ্বাদশ শতাব্দীর কলহের ফলে পারস্পরিক অপ্রীতি, অবিশ্বাস, ভয় এবং ঘৃণা বন্যাকাররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের সকল মুসলমানের পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়, তাঁহাদের প্রায় চার কোটি হিন্দুস্থানে রহিয়া গিয়াছেন এবং হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করিতেছেন। কিন্তু মানসিক ব্যাধি অর্থাৎ পারস্পরিক বিদ্বেষের আগুন ধিকিধিকি করিয়া নীচে জ্বলিতেছেই, সামান্য সুযোগেই উহা যখন তখন উপরে লেলিহান শিখায় আত্মপ্রকাশ করে।

মনীষী ডক্টর ভগবান দাস প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই ব্যাধির স্থায়ী প্রতীকার কি? তাঁহার উত্তর—ব্যাধি অর্থাৎ পারস্পরিক বিদ্বেষ যখন মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) তখন প্রতীকারও মনস্তাত্ত্বিক হওয়া উচিত অর্থাৎ পারস্পরিক প্রীতি। অপ্রীতির স্থানে প্রীতি আসিবে কিরূপে? একটি মাত্র পথ আছে। মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ের কাছেই প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে যে উভয় ধর্মের মূল তত্ত্ব এক। মোল্লা এবং পণ্ডিতগণ অবশ্য কখনই এই কাজে রাজী হইবেন না বরং জোর গলায় এই ধরনের চেষ্টার নিন্দা করিতে থাকিবেন। কিন্তু ডক্টর ভগবানদাসের মতে, প্রজাকল্যাণকামী এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক গভর্ণমেণ্টের ইহা অবশ্যকর্তব্য। ভগবানদাসজী একটি সহজ উপায় নির্দেশ করিতেছেন: হিন্দী এবং উর্দু অনেকগুলি (ধর্মসংক্রান্ত) শব্দের প্রতিশব্দ রচনা করা হউক এবং ভারতের প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণের উহা আবশ্যিক শিক্ষার বিষয় করা হউক (স্কুলের নিম্নশ্রেণীয়গণের জন্য ৭৫ জোড়া শব্দ, উচ্চশ্রেণীয়-গণের জন্য ২০০ এবং কলেজের জন্য ৫০০ জোড়া এইরূপ শব্দ)। আমাদের রাষ্ট্র 'লৌকিক' বলিয়া ঘোষিত হইলেও এই বিষয়টির জ্ঞান তথ্যহিসাবে ছাত্রছাত্রীগণকে দিতে কোন বাধা নাই। শুধু 'জানিয়া রাখিতে' বলা হইবে, 'বিশ্বাস করিতে' নয়।

ডক্টর ভগবানদাস এইরূপ শব্দযুগলের কতকগুলি নমুনা দিয়াছেন।

হিন্দী	উর্দু	ইংরেজী
ওম্	আমিন	Amen
দেব, ঈশ্বর	আল্লা	God
মহা, পরম	আকবর	Greatest
পরম-ঈশ্বর, মহা-দেব	আল্লা হো আকবর	
ব্রহ্মা	আল্ বারি, আল্ খালিক্	Creator
বিষ্ণু	আল্ রাব্ আল্ মুহেমিন্	Preserver
রুদ্র	আল্ মুমিত.	God of Death, Destroyer
সরস্বতী	আল্ আলিম্	Goddess of Learning, Science, Wisdom
লক্ষী	আল্ মালিক	Goddess of Wealth and Splendour
গৌরী	আল্ জামিল্	Goddess of Beauty, 'Jamal'.
দুর্গা	আল্ কাহার	Goddess of Punishment
শক্তি	আল্ জালিল্	Goddess of Compelling Might and Majesty
অন্নপূর্ণা	আর্ রাজ্জাক্	Giver of food.
শিব	আর রহিম্	The Auspicious, Merciful, Benevolent God of 'rahm', mercy
শঙ্কর	আল্ মুজিল্	The actively Beneficent
শান্তি	সলম্	Peace
ঈশ্বরপ্রণিধান	ইস্লাম	Submission to God

ডক্টর ভগবানদাসের মতে এইরূপ শত শত শব্দের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন যে বালক-বালিকা এবং তরুণ-তরুণীগণের মনে এই সামর্থবোধক শব্দগুলির জ্ঞান বসাইয়া দিতে পারিলে তাহাদের উত্তরজীবনে ধর্মীয় বিবাদের নিবৃত্তির অনেকটা সহায়তা হইবে।

হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি যে পারস্পরিক একটা মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। ডক্টর ভগবানদাসের বাস্তব পথনির্দেশ সরকারের দৃষ্টিতে পড়া বাঞ্ছনীয়। তিনি তাঁহার চিঠির শেষে বলিয়াছেন—"ধর্মীয় ঘৃণা উপশমিত করিবার জন্য এই প্রতীকার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। * * কার্যকরী না হইলেও কোন ক্ষতি তো হইবার আশঙ্কা নাই।" খাঁটি কথা। তবে ডক্টর ভগবানদাস গত দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অতিরঞ্জিত মনে হইল। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে যে আদৌ কখনও বুঝে নাই এবং উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ কখনও স্থাপিত হয় নাই তাহা মোটেই বলা চলে না। মুসলমান রাজত্বের সময়, বিশেষতঃ মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে, হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক এখনকার অপেক্ষা যে অনেক ক্ষেত্রে বহুতর সদ্ভাব-পূর্ণ ছিল ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামে গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি সুখদুঃখের সাথী হইয়া আত্মীয়ের মতো বাস করিয়াছে। বাংলা দেশের কথা আমরা বিশেষ করিয়া জানি। বাংলার গ্রামে মুসলমানেরা হিন্দুর উৎসবে যোগ দিয়াছে, হিন্দুরা মুসলমানদের উৎসবে। বাংলার লোকসঙ্গীতে হিন্দু

মুসলমানের সম্প্রীতি, এমনকি ধর্মীয় সামঞ্জস্যেরও বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক উৎকট বিদ্বেষের ইতিহাস আমাদের বিচারে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক নয়—ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রগতির পর হইতে। রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সমস্যার সমাধানের নানা চেষ্টা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। কিন্তু এই পথে সমাধান হইবার নয়। হৃদয়ের মিলনের দিকেই বেশী চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ইহাও মনে হয় যে, মুসলমানসমাজের মধ্যে যাঁহারা উদার এবং ভারতীয় জাতির বৃহৎ কল্যাণে বিশ্বাসী তাঁহাদের এই দিকে একটি বিরাট দায়িত্ব আছে। হিন্দুদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক সমন্বয় খুব কঠিন কথা নয়, কেননা ধর্মসাধনার অসংখ্য পথ থাকিলেও লক্ষ্য যে সকলেরই এক এই বিশ্বাস হিন্দুর একটি সহজাত সংস্কার। মুসলমান জনগণকে পরধর্মসহিষ্ণুতা একটু কষ্ট করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। না দিলে তাঁহাদের নিজেদেরই কল্যাণ ব্যাহত হইবে, সন্দেহ নাই।

সুপ্ত বিবেক

জার্মান দার্শনিক মহামনীষী কাণ্ট বলিয়াছিলেন, মানুষের নৈতিক বিবেক একটি সার্বজনীন অবশ্যম্ভাবী স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন প্রাণী (যেমন মানুষ) ঐ সত্যকে নিজের অন্তঃকরণে 'ইহা তোমার কর্তব্য'—এই একটি অভ্রান্ত আদেশ (Categorical Imperative) রূপে অনুভব করিতে বাধ্য। ঐ আদেশ অপরিবর্তনীয়, অপ্রত্যাখ্যেয়, নিঃসন্দিগ্ধ। মানুষ যতদিন মানুষ ততদিন স্বকীয় বিবেকের স্বতঃস্ফূর্ত নির্দেশ তাহার কানে বাজিবেই। মানবপ্রকৃতির এই বিশ্বজনীন অনতিক্রমণীয় নৈতিকবোধের উপর অটল আস্থা রাখিয়া কাণ্ট তাঁহার আস্তিক্যদর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

কাণ্টের চিন্তাধারা ভারতীয় ধর্মদৃষ্টির পূর্ণ সমর্থন লাভ করে, যদিও নৈতিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিদের দিগ্‌দর্শন আরও ব্যাপক এবং গভীর। বেদান্ত বলেন, নৈতিকবোধের স্বতঃসিদ্ধতার পশ্চাতে রহিয়াছে মানুষের আত্মস্বরূপ। চিরশুদ্ধ, চিরবুদ্ধ, নিত্যানন্দ আত্মা আছেন বলিয়াই মানুষের অন্তঃকরণে শুভেচ্ছা (কাণ্টের good will) উঠে, ঐ শুভেচ্ছাকে সে কল্যাণকর কার্যে রূপায়িত করে।

সে যাহা হউক, ভারতীয় ঋষিরাই বলুন অথবা কাণ্টপ্রমুখ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণই বলুন, নৈতিক বিবেক আজ আর অপরিবর্তনীয় স্বতঃসিদ্ধ 'আদেশ' বলিয়া সম্মানিত নয়। আজ আর মানুষ সেই 'আদেশে'র অপেক্ষা রাখিয়া কাজ করিতে চায় না—কাজ করা নির্বুদ্ধিতা মনে করে। মানুষ আজ তাহার অন্তরে অহরহ অপর এক আদেশ (Imperative) শুনিতে পাইয়াছে, উহাই তাহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যাপৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ঐ 'আদেশ' হইল মানুষের স্বার্থবুদ্ধির আদেশ। বিবেক আজ লজ্জা পাইয়া ঘুমাইতেছে।

সুপ্ত বিবেকের উদাহরণ খুঁজিতে আজ আর অন্ধকারে আনাচে কানাচে টর্চ বাতি ফেলিয়া ঘুরিতে হয় না। প্রকাশ্য দিবালোকে—রাজপথে, হাটে বাজারে, আফিসে আদালতে, পবিত্র বিদ্যায়তনে, পবিত্রতর ধর্মাধিকরণে, গৃহে, পরিবারে, সমাজে—সর্বত্র আজ মানুষের বিবেক নিদ্রিত। বড় দুঃখে শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু রাখিয়া ঢাকিয়া দুটি উদাহরণ তাঁহার Decline of Decency নামক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (Free Lance পত্রিকায় প্রকাশিত) উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রখ্যাত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর'। বিপুল তাঁহার বৈদগ্ধ্য ও গবেষণাকীর্তি; বিদ্যার্থী-বিদ্যার্থিনী শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁহার নামে রোমাঞ্চ অনুভব করেন। ইনি—হাঁ ইনিই কিছু পার্থিব রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কাণ্টের অপার্থিব 'ইম্‌পারেটিভ'কে

বিক্রয় করিয়াছেন। যে দরিদ্র লেখকটি ডক্টরের নামে প্রকাশিত পুস্তকটি লিখিয়া দিয়াছেন তিনি বইএর সমগ্র শর্তের মূল্য হিসাবে পাইয়াছেন দুই শত টাকা। ডক্টর শুধু তাঁহার নামটি দিয়া প্রতি সংস্করণে প্রকাশকের নিকট এক হাজার টাকা পাইবেন। ডক্টর মহোদয়ের টাকার অভাব নাই, পোষ্যসংখ্যাও খুব কম। তবুও বিবেককে ঘুম না পাড়াইয়া তাঁহার চলিল না!

একটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, শিক্ষকগণের চেহারা ও বেশভূষাতেই তাঁহাদের স্বল্প-উপার্জনের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী একজন বিত্তবান ব্যক্তি। চমৎকার পরিচ্ছদ পরিয়া, আঙ্গুলে গোটাকয়েক আংটি পরিয়া অনুষ্ঠানের, তথা শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণের অভিভাবকতা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি :—

"আপনারা শিক্ষক, বলিতে গেলে—যীশুখ্রীষ্টের ভাষায় 'পৃথিবীর লবণ'। লবণ যদি খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে ভোজন এবং তজ্জনিত পুষ্টি হইবে কি করিয়া? আপনাদের আদর্শ যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে তাহা হইলে মানুষ গড়িয়া উঠিবে কোন্ শক্তিতে? আপনাদের কাজ অতি মহান্; আমার বলিতে ইচ্ছা হয়, উহা একটি ব্রত-বিশেষ। আমাদের বড় আদরের মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে শিক্ষাদান কাজে আপনারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। দেশের ভবিষ্যতের অনেকটা তো আপনাদের কাঁধেই ন্যস্ত। (এইখানে বক্তার গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ বিশেষ কোন পানীয়ের এক চুমুকের জন্য)। ত্যাগ, ত্যাগ—ত্যাগই হইল আপনাদের আদর্শ। বিলাসিতা এবং আরামও বর্জন করিয়া আপনারা ভারতের সনাতন 'সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা'র আদর্শে ছাত্রগণকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। আপনারা জাতির জনক আমাদের স্বর্গত অতিপ্রিয় বাপুজীর পদচিহ্ন ধরিয়া চলিতেছেন ..."

আরও কিছু এইরূপ বাগ্মী উদ্দীপনা পরিবেশন করিয়া সেক্রেটারী মহোদয় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে ক্ষমা চাহিলেন—তাঁহাকে স্যর অমুকচন্দ্র অমুকের আলয়ে একটি বিশেষ ভোজে যোগ দিতে যাইতে হইবে—আর থাকিতে পারেন না। যেরূপ আভিজাত্য ও আড়ম্বর সহ সভায় ঢুকিয়াছিলেন সেইরূপই ভঙ্গীতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রবন্ধলেখক অজিতবাবু অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, জীবনসংগ্রামে জর্জরিত দুঃস্থ দরিদ্র শিক্ষকগণের নিকট ঐদাম্ভিক ধনী যে ঐশ্বর্য-বিভব এবং ভণ্ডামি দেখাইয়া গেলেন বিবেকবুদ্ধি কতটা ঘুমাইয়া পড়িলে ঐরূপ নির্লজ্জতা সম্ভবপর!

সর্বজননিন্দিত অন্যায় ও পাপকার্য যাহারা করে তাহাদের বিবেক যে নিদ্রিত তাহা সকলেই জানে। সমাজ এক কথায় তাহাদের বিচার ঘোষণা করিতে পারে। তাহাদের নিন্দিত কার্য দ্বারা তাহারা নিজেরা কলঙ্কিত হয় এবং নিজের পরিবারবর্গকেও কমবেশী লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু এই পর্যন্তই। 'দাগী' বলিয়া তাহাদিগকে সজ্জনেরা পরিহার করিয়া চলেন। এই ব্যক্তিগণের সুপ্ত বিবেক বৃহৎ সমাজের ভারসাম্যকে আন্দোলিত করিতে পারে না। কিন্তু ঐ ডক্টরের এবং সেক্রেটারীর দল? পাণ্ডিত্য, যশ, আভিজাত্য এবং সমাজ-প্রতিপত্তির আবরণে তাঁহাদের বিবেক-নিদ্রা সমাজদেহে মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত করিতে বাধ্য। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও আজ খবরের কাগজে দেখিতে পায় কোন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী, অধ্যাপক বা নেতার বিবেক-বিগর্হিত অপকীর্তির তথ্যসম্বলিত বিবরণ—জাতীয় কাজে নির্দিষ্ট তহবিলের তছরূপ, উৎকোচ গ্রহণ করিয়া জাতীয় স্বার্থের বলিদান, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সত্য ও ন্যায়ের বিসর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাঁহাদের বিবেক-বোধের উপর শত সহস্র নরনারীর কল্যাণ নির্ভর করিতেছে তাঁহাদের বিবেকের এই ক্রমবর্ধমান সুপ্তি দেখিয়া বুড়া কাণ্ট আর এদেশের 'যতো ধর্মস্ততো জয়:'-বাণীর প্রণেতা ভারতের পুরাতন ঋষিরা পৃথিবীর পরপারে বসিয়া স্বরচিত গ্রন্থগুলির উপর আস্থা হারাইতেছেন কি?

ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ

আষাঢ় মাসের 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রিকায় শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ভুল ধারণা'—এই শিরোনামায় একটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে 'ব্রহ্ম' কোন জাতি বা সম্প্রদায় নহে। 'ব্রাহ্মত্ব' জন্মের ফলে লাভ করা যায় না, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা অর্জন করিতে হয়।

"ব্রাহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ব্রাহ্ম-পিতামাতার সন্তান, অথচ অব্রাহ্ম এরূপ ব্যক্তি বিরল নহেন। * * * ব্রাহ্মধর্ম জীবনে পালন না করিয়া 'আমি ব্রাহ্ম' মাত্র এই দাবীর দ্বারা কেহ ব্রাহ্ম হইতে পারে না।"

ক্ষেমেনবাবু বলিতেছেন, অসাম্প্রদায়িক সত্য-ধর্মেরই সংক্ষিপ্ত নাম হইল ব্রাহ্মধর্ম।

"এই ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দিবার জন্যই উপনিষদের উৎপত্তি, বাইবেলের উৎপত্তি, কোরাণের উৎপত্তি, যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। যুগে যুগে, দেশে দেশে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্মের যে সমস্ত বাণী পাওয়া যায়, যে সমস্ত সত্য আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ—উপনিষদ্ যাহাকে বলেন 'একাত্মপ্রত্যয়সারং' আত্মপ্রত্যয়ই প্রমাণ, সেই সমস্ত বাণী ও সত্যকে যে নামেতেই অভিহিত করা হউক না কেন, সেই সমস্তই হইল ব্রাহ্মধর্ম ও সেই সমস্তই হইল ব্রাহ্ম-ধর্মের বাণী ও সত্য। * * * ব্রাহ্মধর্মকে সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, সমস্ত ধর্মের মধ্যে যাহা সার, তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম বলে।"

লেখকের মতে ব্রাহ্মধর্ম অন্ধভাবে কোন একটি মতবাদ অনুসরণ করিতে বলে না, যুক্তিদ্বারা বিচার-পূর্বক সত্যকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দেয়। "অন্ধের মত গ্রহণ করিলে তাহা স্থায়ী হইবে না, ফুৎকার মাত্রই উড়িয়া যাইবে।" ব্রাহ্মধর্ম গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই ধর্ম। সংসারে থাকিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মপরায়ণ গৃহী কিভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন তাহার নির্ণায়করূপে ক্ষেমেন্দ্রবাবু দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(১) প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্

"প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত, আমি যাহা কিছু করি, হে জগজ্জননি, তাহা তোমারই পূজা।"

(২) তুলসী অ্যায়সা ধ্যান ধর্ জ্যায়সা বিয়ানকা গাই।
মুখে তৃণ চনা টুটে অওর চেৎ রাখয়ে বাছই॥

"হে তুলসী, নবপ্রসূতা গাভী যেমন সুখে ঘাস ও ছোলা খায় কিন্তু তাহার সমস্ত মন যেমন বাছুরের দিকে পড়িয়া থাকে সেইরূপ তোমার মন সংসারের সব কর্মের ভিতর যেন ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত থাকে।"

লেখক রাজর্ষি জনক এবং রাণী অহল্যাবাঈএর জীবনী হইতে দুটি শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান উদাহৃত করিয়াছেন। ইঁহারা সংসারে থাকিয়া যথার্থ ভগবদ্ভক্ত 'ব্রাহ্ম' ছিলেন। লেখকের মতে উপাস্যের নাম লইয়া কলহ করা ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ নয়।

"তুমি তোমার উপাস্যকে পরব্রহ্ম নাম দিতে পার, ভগবান নাম দিতে পার, বিষ্ণু নাম দিতে পার বা অন্য যে কোনও নাম তোমার হৃদয়গ্রাহী মনে হয় দিতে পার—তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের বিধানও নাই, নিষেধও নাই। নামের উপরে ব্রাহ্মধর্ম নির্ভর করে না, যেমন অন্য কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বরের উপরে ব্রাহ্মধর্ম নির্ভর করে না।"

ইহার প্রমাণস্বরূপ লেখক বেদের ব্রহ্মবাচক বিবিধ নামের উদাহরণ দিয়াছেন,—যেমন রুদ্র, বামন, বিষ্ণু, আকাশ, শিব, অগ্নি, মাতরিশ্বা ইত্যাদি।

লেখকের সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মত্বের কষ্টিপাথর হইল ইহা—আমি ব্রহ্মকে প্রকৃতই প্রীতি করিতেছি অথবা মুখে প্রীতি দেখাইতেছি। এই কষ্টিপাথরে যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনিই ব্রাহ্ম। অতএব যে কোনও সম্প্রদায়ের যে কোনও সাধু ব্যক্তিকেই ব্রাহ্ম বলা চলে। এইরূপ সাধু ব্যক্তিদের গঠিত সমাজকেই ব্রাহ্মসমাজ বলিতে হইবে।

"অতএব আমরা সমস্ত ধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়ের সর্বদেশীয় সাধকগণকে আহ্বানপূর্বক বলি যে, হে সাধক, তোমার ও আমার সাধনায় কোন ভেদ নাই। * * * যিনি তোমার

হৃদয়ের উপাস্য 'তিনি' আমারও উপাস্য। তোমার ও আমার হৃদয় একই তন্ত্রীতে বাঁধা। * * * দেখ, আজ শুধু ধর্মে ধর্মে নহে, দেশে দেশে নহে, এমন কি একই দেশের প্রদেশে প্রদেশে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ছেলেদের অনেকে প্রকৃত ধর্মশিক্ষার অভাবে কোথায় তলাইয়া যাইতেছে। এই সব ক্ষেত্রে কি আমাদের করণীয় কিছুই নাই? কেবল মতবাদের গহন অরণ্যের মধ্যে ঘুরিলেই কি ধর্মসমাজের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিবে? * * * এস সমস্ত ধর্মসমাজ সম্মিলিত হইয়া দেশকে, দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থলদিগকে, গৃহ পরিবারকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করি।"

লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গী সকলেরই অনুকরণীয়। তবে একটি বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধে বাদ পড়িয়াছে মনে হইল, জানিনা উহা লেখকের স্বেচ্ছাকৃত কিনা। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে লেখক একেবারেই নীরব রহিয়াছেন। মূর্তিপূজার মাধ্যমেও যে 'সত্যধর্ম'কে উপলব্ধি করা যায়, ভারতবর্ষে এবং অন্যদেশেও যে বহু নরনারী ঐ পন্থায় ঈশ্বরে পরানুরক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা উদারদৃষ্টিসম্পন্ন লেখকের মুখে শুনিলে আমরা আরও আনন্দিত হইতাম।

কামাখ্যা তীর্থপথে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মহান্ মনের মহাসন্ধানী পথ গেছে এঁকে বেঁকে
স্নিগ্ধ বাতাস মেখে।
অরণ্যছায়ে নুয়ে নুয়ে পড়ে সবুজ পাদপলতা,
শুনি চারিভিতে প্রাচীন দিনের তন্ত্রাচারের কথা।
শৈলশৃঙ্গে নগ্নচরণে করি আরোহণ ধীরে,
জীবনের নদী চায় ফিরে ফিরে—
ব্রহ্মপুত্র-তীরে।

নীল পর্বত কত যুগ আগে নব দিগন্তপানে
কি যেন মায়ার টানে
দেখেছে প্রথম রূপালি চাঁদেরে, ছায়া যার দুলে দুলে
পড়েছে লোহিত নদের বুকেতে
ঢেউ ওঠে ফুলে ফুলে—
কামরূপ ধরি কে এলো হেথায় শিখরের ছায়া মাঝে
দেখায়ে বিভূতি যেথা ভৈরব রাজে,
কালের ঘণ্টা বাজে!

হেথা একদিন হোলো তপস্যা পরশুরামেরো আগে,
প্রথম উষার রাগে।
হেথা বশিষ্ঠ আশ্রম শোভে কামাখ্যা-তীর্থবুকে
অশ্বাক্রান্তা হোলো কি সুপ্ত দুর্গম দরী-মুখে?

নরকাসুরের সাধনভূমিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের দেশে
রেখেছি প্রণাম বিমানে উড়িয়া এসে,
ভরা ভাদরের শেষে।

কোথা হোতে এক পার্বতী মেয়ে অরণ্যপথ বেয়ে
এসে মোর সনে চলে আর কেন
দেখে মোরে চেয়ে চেয়ে?
ভয় হয় অকারণে,
মোর স্বতন্ত্র মনে!

আর্য দ্রাবিড় অনার্য হেথা মিলেছে পূজার তরে
আশা নিয়ে অন্তরে।
এক হয়ে গেছে বেদ ও আগম ভুলি সব ভেদাভেদ
বহু উর্ধ্বেতে দেউলে আসিয়া রহিল না কোন খেদ।
অতল গুহায় দেবী-যোনিমুখে বহিতেছে বারিধারা
কোথা হ'তে আসি কোথা সে আপন হারা—
কহিবে আমারে কারা?
পঞ্চমুণ্ডী আসন হেরিয়া বসিনু পুলকে একা,
গুহা-দেউলের পাষাণের মাঝে
দিবে কি পাষাণী দেখা?

বন্যাসেবাকার্য

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার ভীষণ ধ্বংসলীলার কথা জনসাধারণ অবগত আছেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহাদের স্থায়ী কাজের গুরুভার ও অর্থের অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানা, হাওড়া জেলার ডোমজুর থানা, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা এবং বর্ধমান জেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সোনারপুরে ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত ১৪খানি গ্রামে ৯৯ মণ ২১½ সের চাউল, ২২ মণ ১৫ সের ডাল, ১০৫০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ১৫½ মণ চিড়া, ৬ মণ /৫ সের গুড়, আধ মণ মিশ্রী, ৪½ সের বার্লি, ২½ সের চিনি এবং আধ মণ সাগু বিতরণ করা হইয়াছে।

ডোমজুর থানায় ৫খানি গ্রামের ২২০টি পরিবারের মধ্যে সাময়িকভাবে ১১/ মণ চাউল এবং ৬০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ বিতরণ করার পর, সরকার হইতে সাহায্য দান আরম্ভ হওয়ায় উক্ত কেন্দ্রে সেবাকার্য বন্ধ করা হইয়াছে।

বেলডাঙ্গা থানার রামনগর ইউনিয়নে ১০খানি গ্রামে ৫৫০টি পরিবারের মধ্যে এক সপ্তাহে ১০০/০ মণ চাউল বিতরণ করার পর, সরকার হইতেই ব্যাপক সাহায্য করা হইবে, এস, ডি, ও, এইরূপ বলায় এই অঞ্চলে আমাদের সেবাকার্য বন্ধ করিতে হইল।

কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম, বিলেশ্বর ও নবগ্রাম ইউনিয়নের ১১টি গ্রামে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানায় সেবাকার্য চালাইবার জন্ম সেবক প্রেরণ করা হইয়াছে। *লোকমুখে সংবাদ পাওয়া গেল সেখানে প্রথম বিতরণ হইয়া গিয়াছে।*

কালনা-কাটোয়ার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল হইতে সংবাদ আদানপ্রদানে বিলম্বহেতু কার্যের বিশেষ বিবরণ এইসঙ্গে দেওয়া সম্ভব হইল না।

সেবাকার্যের জন্ম প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট মুক্তহস্তে সাহায্য করার জন্ত আবেদন জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাঁহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে :—

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
(২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা—৩
(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩

(স্বাঃ) **স্বামী মাধবানন্দ**
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ বহুজনশ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত (মহিম বাবু) গত ২৮শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৬) রবিবার রাত্রি ১২-৪০ মিনিটে কলিকাতা সিমলা পল্লীর ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীটস্থ তাঁহাদের পৈতৃক বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। পাঞ্চভৌতিক দেহ চিরদিন পৃথিবীতে থাকে না, অতএব অতি পরিণত বয়সে এই মনীষীর দৈহিক মৃত্যুর জন্ম শোকপ্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক—তথাপি এই ঋষিকল্প আপনভোলা জ্ঞানতপস্বীকে যাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা হৃদয়ের গভীরে একটি অপূরণীয় অভাব বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই।

চিরকুমার মহেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং লোককল্যাণ-কামনায় পরিপূর্ণ। বালককালে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের, স্বামীজীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের জীবন তাঁহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

পূজ্যপাদ গৃহী-সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত-সত্যে চিরবিশ্রাম লাভ করুক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ধর্ম

স্বামী বিরজানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ধর্মের পথ অতি দুর্গম, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, সাধারণ বুদ্ধির অতীত। "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা উহার তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। কঠোপনিষদের উক্তি—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

"অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উত্থান কর, জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্যগণের নিকট যাইয়া তত্ত্ব জ্ঞাত হও। ক্ষুরের শাণিত ধারা যেমন দুরতিক্রমণীয় তেমনি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন।" মানবের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে ধর্মের অনন্ত শাখা, অনন্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন্ পথে গমন করিলে আমরা পরম সত্যে উপনীত হইব, কোন্ পথে অগ্রসর হইলে আমাদের ভগবান লাভ হইবে, কোন্ পথ আমাদের সংসারের সুখদুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিবে, কোন্ সাধনে আমরা সিদ্ধিলাভ করিব, ইহা নির্ণয় করা এবং নির্ণয় করিয়াও নির্বিঘ্নে একাকী সেই পথে পরিভ্রমণ করিয়া চরমসীমায় উপনীত হওয়া অপেক্ষা কঠিন ও অসম্ভব কার্য আর কিছু নাই। কারণ ইহা আমাদের নিকট একটি সম্পূর্ণ নূতন ও অজ্ঞাত রাজ্য। পরমার্থপথে কত বাধাবিঘ্ন আছে, কত দস্যু আমাদিগকে সর্বস্বান্ত করিবার মানসে লুক্কায়িতভাবে বিচরণ করিতেছে, কত হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্য রহিয়াছে, কত বিপথ আছে যে-পথে গমন করিলে আর পথ পাইবার কোন ভরসা নাই, কোথাও বা ঘোর অন্ধকার, কোথাও শূন্য মরুভূমি! কখন মায়ামরীচিকা পথিককে বৃথা আশায় প্রলুব্ধ করিয়া কোথায় যে লইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? সাধকের নিজের জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষীণ আলোক সে অন্ধকার ভেদ করিতে পারে না। অনেকেই তাঁহাদের অসম্যক্ ভাবে পরিচালিত বৃথা চেষ্টার দ্বারা বিফলমনোরথ হইয়াছেন; পথপ্রদর্শক কেহ না থাকিলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অনেকে তাঁহাদের উদ্ধত মস্তিষ্কের উত্তেজনায় অহংমত্ত হইয়া ধাবিত হন কিন্তু শেষে দেখা যায় যে তাঁহারা নিজেদের চক্রের মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, ধর্মরাজ্যে একপদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

গুরুকরণ নাম শুনিলেই অনেকে আজকাল "কি ভয়ানক" বলিয়া কানে আঙুল দিয়া মুখ ফিরাইয়া লন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষা গুরুকরণ ব্যতীত পাইয়াছেন কি? সামান্য ক, খ শিক্ষাও তো তাঁহারা মাতৃগর্ভ হইতে আনয়ন করেন নাই, গুরুর কাছ হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা যে-সকল জ্ঞানার্জন করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির বীজ প্রথমাবস্থায় কি কাহারও আনুকূল্য ব্যতীত বর্ধিত হইয়াছে? কখনই নয়। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তেই যে আমাদের গুরুকরণ হইতেছে ইহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যাহার কাছ হইতে যাহা শিক্ষালাভ করা যায়, তিনিই সেই বিষয়ের গুরু। গুরুকরণের নামে যে অনেকে দুই পা হটিয়া দাঁড়ান তাহার কারণ হইল ধর্মরাজ্যে তথাকথিত গুরুগিরির অনুপ্রবেশ। গুরু বলিলে

এক বিকট চিত্র স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। নিজের জীবন গঠন না করিয়া, নিজে উন্নতির পথে বিশেষ অগ্রসর না হইয়া, নিজেকে মহাধার্মিকাভিমানী, পণ্ডিতাভিমানী ও জ্ঞানী ধারণা করিয়া যে ব্যক্তি পরের উপর আধিপত্য করিতে যায়, যে নিজের স্বার্থকামনা পূর্ণ করিবার আশায়, অন্যের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য কপটাচারেও ক্ষান্ত হয় না, যে অহংকারে বিমূঢ় হইয়া নিজেকে ধর্মরাজ্যের নেতা বলিয়া বিবেচনা করে, যাহার শুধু গুরু অভিমানই আছে তাহার নিজের পথই রুদ্ধ, তাহার নিজের পথেই কণ্টক, সে আবার অন্যের পথপ্রদর্শক হইবে কিরূপে ? শাস্ত্র আমাদের এইরূপ অসদ্‌গুরু হইতে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানা।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ, অন্ধেনৈব নীয়মানা
যথান্ধাঃ ॥

"যাহারা নিজে অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অন্যকে পথ দেখাইতে গিয়া দন্দ্রম্যমান অর্থাৎ অতিশয় কুটিলভাবে নানাপথে চালিত হইয়া অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।" এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া যেমন উভয়েই পতিত হয় সেইরূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তি অন্য জ্ঞানহীনকে জ্ঞানপথে আনয়ন করিতে গিয়া উভয়েই অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হয়। অসদ্‌গুরু হইতে শিষ্যের উপকার সাধিত না হইয়া বরং সমূহ অনিষ্ট সাধনই হইয়া থাকে, কারণ তাহাতে গুরুর অসৎ রোগসকল শিষ্যে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাই অত্যধিক। সদ্‌গুরু লাভ করা অনেক সুকৃতির ফল। বিবেকচূড়ামণি বলিতেছেন :—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥

এই তিনটি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দেবতাদিগের অনুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে—মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানবজন্ম লাভ করা, মুমুক্ষুত্ব—মানবজীবন লাভ করিয়া মুক্তির জন্য ইচ্ছা এবং মহাপুরুষসংশ্রয় অর্থাৎ মহাপুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া।" যিনি মহাপুরুষ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হন তাঁহার জীবনই ধন্য। উপদেশ তো বইতে অনেক আছে, তাহা পাঠ করিলেই তো চলে, তাহা শুনিবার জন্য মহাপুরুষের কাছে নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া ও অত্যধিক সময় নষ্ট করিয়া অবস্থান করিবার কি সার্থকতা ? সাধুর কাছে যদি কিছু বিশেষত্ব না থাকে তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ করিবার ফল কি ?

মহাপুরুষ হইতে শাস্ত্রের এই প্রভেদ যে তিনি শাস্ত্রীয় উপদেশসকল নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তিনি মুখে যাহা উপদেশ দেন কার্যেও তাহা করেন, তিনি সেইসকল উপদেশের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার পবিত্র আত্মাই অন্য আত্মাকে উন্নত করিতে পারে, তাঁহার উপদেশের জ্বলন্ত শিখা অন্যের উপর পতিত হইয়া তাহার কুপ্রবৃত্তিরাশি দগ্ধ করিয়া দেয়, তাঁহার অনুকম্পায় জীব মুহূর্তের মধ্যে পবিত্র ও কৃতকৃত্য হইয়া যায়, যেমন অগ্নিবর্ণ অয়ঃপিণ্ড সংস্পর্শে শীতল লৌহখণ্ডও তৎস্বরূপ কান্তি ধারণ করে। তাঁহার হৃদয়ে তো স্বার্থ নাই, তিনি যে নিজের অহং একেবারে বলি দিয়াছেন, তাঁহার জীবন যে পরেরই জন্য। কিসে জীবকে ধর্মপথে লইয়া যাইবেন, কিসে জীব যন্ত্রণাময় সুখদুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিসে সে পরমানন্দের অধিকারী হইবে, ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া জীবন অমৃতময় করিবে এই তাঁহার চেষ্টা, এই তাঁহার চিন্তা। শাস্ত্রে তাঁহাকে অহেতুক-দয়াসিন্ধু যে বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলা হইয়াছে। পরিবর্তে কিছু পাইবেন এ আশা করিয়া তো তিনি তত্ত্বজ্ঞান দান করেন না। যাঁহারা ভবিষ্যতে ফল পাইবার আশায় দান করেন, তাহা তাঁহাদের যথার্থ দান

নহে, তাহা ব্যবসায়মাত্র। সদ্‌গুরুর পবিত্র জীবনের নিঃস্বার্থ প্রেমই তাঁহাকে জীবহিতকর কার্যে দীক্ষিত করে। তিনি প্রেমের দ্বারা জীবগণকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করেন।

যেমন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন, শিষ্যেরও সেইরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, কারণ উর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হইলেই পর্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হয়। শিষ্যের দেখিতে হইবে তাহার হৃদয়ে ধর্মজীবন লাভ করিবার জন্য যথার্থ পিপাসা জন্মিয়াছে কি না। দেখিতে পাই—অনেক সময় মনের কোন উচ্ছ্বাসকে আমরা প্রকৃত সৎ পদার্থ বলিয়া মনে করি। দেখিতে পাই—কোন আত্মীয়-স্বজন বা পিতামাতা বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে সংসার অনিত্য বোধ হয়, মনে বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হয়, কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে? সেইজন্য মনে মনে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে আমরা যথার্থ ধর্ম চাহিতেছি কি না, দেখিতে হইবে আমরা ধর্মের জন্য একটা তীব্র অভাব হৃদয়ে অনুভব করিতেছি কি না, আমরা বাস্তবিক ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে কোন্ উপায় অবলম্বন করিব এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছি কি না? যখন মনে এইরূপ শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, যখন ভগবান লাভ না হইলে এই বৃথা জীবনে প্রয়োজন কি এইরূপ ভাব মনে ধারণা হয় তখন ভগবানই গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। গুরুর জন্য সাধকের ভাবনা করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, তিনি যখনই যে সাধন করিবার মনস্থ করিতেন তখনই কোথা হইতে সেই ধর্মের গুরু আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া যাইতেন। এইরূপ গুরুলাভ হইলে ধর্মপথ অতি সুগম হইয়া থাকে।

গুরুবাক্য অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া না চলিলে ধর্মরাজ্যে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না, গুরুবাক্যে বিশ্বাসই আমাদের পরম বস্তু লাভ করাইয়া দেয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছুদিন চেষ্টা করিয়া কিছু হইল না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ অপেক্ষা ধৃষ্টতা আর কিছু হইতে পারে না। ধর্মলাভ একদিনে হয় না; এক জীবনেই যে হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সমস্ত বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি অবিচলিত ধৈর্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হন তিনিই সিদ্ধমনোরথ হন।

কর্মসকল ক্রিয়া-বিশেষে পাপপুণ্য, সৎঅসৎ, ধর্ম অধর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই পাপপুণ্য সৎঅসৎ সমুদায়ই আপেক্ষিক। অবস্থাবিশেষে যাহা পাপ অবস্থান্তরে তাহা পুণ্য, আবার অবস্থা-বিশেষে যাহা পুণ্য অবস্থান্তরে তাহা পাপ; কেহ বলিতে পারিবেন না যে, কোন কার্য দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া পাপ বা পুণ্য। ফলভোগেই পাপপুণ্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কর্ম দ্বারাই মনুষ্য অভিজ্ঞতালাভ করে। কোন পাপকার্য সম্পাদন করিবার সময় যদি কাহারও বিবেকে আঘাত না লাগে বুঝিতে হইবে কর্মের দ্বারা তাহার তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় নাই; সুতরাং যে পর্যন্ত জ্ঞানলাভ না হইবে সে পর্যন্ত তাহার সেই কার্য হইতে নিবৃত্তি হইবে না। কর্মের ফলভোগ না হইলে জ্ঞানের উদয় হয় না। যে পর্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে উত্তাপ না লাগে সে পর্যন্ত অগ্নিতে তাহার কোনও ভয় থাকে না, কিন্তু যদি একবার সে অগ্নিতে দগ্ধাঙ্গুলি হয় তাহা হইলে পুনরায় সে আর অগ্নিস্পর্শ করিতে চাহিবে না। যে ব্যক্তির বর্তমান জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, সেই অবস্থায় যে কর্ম দ্বারা তাহার আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয় তাহাই তাহার পক্ষে পাপ বা অধর্ম এবং যাহা আত্মবিকাশের অনুকূল তাহাই পুণ্য বা ধর্ম। যাহার জ্ঞানের যে অবস্থা ঐ অবস্থা হইতে উর্ধ্বে আরোহণ করিতে হইলে যে কার্য করা আবশ্যক তাহাই পুণ্য বা ধর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থা হইতে যে কার্য দ্বারা নিম্নাভিমুখে

গতি হয় তাহাই পাপ বা অধর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিম্নতর স্তর হইতে উর্ধ্বতর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে জীব যখন সোপানের চরমসীমা অতিক্রম করিয়া সেই স্থানে পৌঁছিতে পারে যেখানে সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, সৎঅসৎ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসকল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখনই সে মুক্ত হইয়া যায়। এই মুক্তিই মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থানুসারে যে সমুদয় কার্যে তাহার মুক্তির অন্তরায় ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহাতে মুক্তির অনুকূলতা হয় তাহাই তাহার পক্ষে ধর্ম বলা যায়। যদি প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ অনুষ্ঠিত কর্মলব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ বিবেকের শাসনাধীন হইয়া ভবসাগরে স্বীয় জীবন-তরী পরিচালিত করে তাহা হইলে সে প্রতিকূল বায়ু ও স্রোত প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া স্বীয় গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবেই হইবে। জীবের গন্তব্যস্থান এক, যে যতটুকু অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে সেই স্থান হইতে ঐ গন্তব্যস্থান লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু সকল যাত্রীরই তিনটি ঘোর শত্রুর কথা সর্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে হইবে। এই তিনটি শত্রু : কাম, ক্রোধ, লোভ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

> ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

"জীবের অধোগতির কারণ কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ, সেই হেতু এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে।" ঐ শত্রুত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান শত্রুই কাম। বাসনাই মানবের পরম শত্রু; বাসনাই মানবকে বিপথে লইয়া গিয়া নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু যখন আমরা ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া জীবন পরিচালিত করি, তখনই বাসনা-বাগুরায় আবদ্ধ হই। আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য চিত্তে বাসনা হয় তখনই আমরা কাম বা বাসনারাজ্যের প্রকৃতিত্ব স্বীকার করি। এই ইন্দ্রিয়গণ সদাসর্বদাই বহির্বিষয়ে আসক্ত হইয়া ধাবিত হয় এবং অনিত্য পদার্থে কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয় কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বপিপাসু তাঁহারা তাহাদিগকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখী করিবেন।

> পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্
> পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

"স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহকে বহির্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জন্যই মনুষ্য সম্মুখ দিকে (অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্ত-চক্ষু এবং অমৃতত্ব লাভে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত) আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।" এই অন্তর্মুখী বৃত্তি যাহার নাই তাহার অন্তররাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়গণের মুখ ফিরাইতে পারিলে তাহাই ধ্যান ও জ্ঞান, আর সমস্ত পুস্তকের রাশিমাত্র। ইন্দ্রিয়গণের সম্যক্ নাশ করিতে কেহই সমর্থ হন না। কোন শক্তি বা কোন গতিরই আত্যন্তিক নাশ নাই। তবে শক্তির গতি ফিরাইতে পারা যায়। যে শক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ধাবমান হইতেছে সেই শক্তির গতি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্দিকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। মন বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে বিস্মৃত হয়, সেই মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যদি ভগবদভিমুখী করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারই মনন দ্বারা জীব কৃতার্থ হয়। মন অসৎ বিষয়ে ধাবিত হইতেছে, তাহাকে ফিরাইয়া

সৎপথে নিযুক্ত করিতে হইবে। যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদে উদাহরণ দ্বারা ইহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

"কর্মফল ভোক্তা জীবকে রথস্বামী জানিবে এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে, অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ জানিবে, কারণ এই শরীরের সম্বন্ধে বুদ্ধিই প্রধান নেত্রী আর সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে প্রগ্রহ (লাগাম)-স্থানীয় জানিবে, কারণ অশ্বগণ যেমন রজ্জুদ্বারা নিগৃহীত হইয়া স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণও তেমনি মনের দ্বারা গৃহীত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনীষিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্বস্থানীয় বলেন, কারণ অশ্ব যেমন রথকে আকর্ষণ করে তেমনি ইন্দ্রিয়গণই শরীরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ; রূপাদি-বিষয়ই এই ইন্দ্রিয়-অশ্বের পন্থা-স্থানীয়। অশ্ব যেমন পথে গমনশীল হয় তেমনি ইন্দ্রিয়গণও বিষয়পথে সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা শরীর ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধিরূপ সারথি যদি অনিপুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ে অবিবেকী হয় এবং প্রগ্রহস্থানীয় মন যদি সর্বদা অপ্রগৃহীত থাকে অর্থাৎ অসমাহিত থাকে, তবে সেই অকুশল বুদ্ধিসারথির ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশ্য হইয়া থাকে। যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ অর্থাৎ বিবেকী এবং প্রগ্রহস্থানীয় মন যাঁহার প্রগৃহীত অর্থাৎ সমাহিত, সেই কুশলবুদ্ধি সারথির ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে। যে আত্মরথীর বুদ্ধিরূপ সারথি অবিবেকী, মনরূপ প্রগ্রহ অগৃহীত অর্থাৎ অসমাহিত ও সর্বদাই অশুচি-ভাব সেই রথী অক্ষয় পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না, পরন্তু জন্মমৃত্যুসঙ্কুল এই সংসারেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যে আত্মরথী বিজ্ঞানবান্ বুদ্ধিরূপ সারথিসম্পন্ন এবং সমনস্ক অর্থাৎ প্রগৃহীতমনা ও সর্বদা শুচিভাবযুক্ত, সেই রথী অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে বিদ্বান ব্যক্তি তপস্যা ও বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিসারথি-যুক্ত এবং মন যাঁহার প্রগ্রহস্থানীয় অর্থাৎ যিনি সমাহিতমনা সেই ব্যক্তি সংসারগতির পরপারে গমন করিতে পারেন অর্থাৎ সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি পরিব্যাপক পরমাত্মা বাসুদেবের পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম ব্যতীত মুক্তিলাভের প্রত্যাশা সুদূর পরাহত। অন্তরেন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয়কেই প্রবর্তিত করে। অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারা যায়। এই মন স্বভাবতঃ চঞ্চল আবার তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্যন্ত সদাই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে। সে এমনই বলবান যে, কেহই তাহাকে সে দিক হইতে ফিরাইতে পারে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম

জন্মান্তরের সংস্কার-রাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাকে নিরোধ করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায় তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর মনে হয়—মহামতি অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইভাব ব্যক্ত করিলেন তখন ভগবান তদুত্তরে তাহাকে বলিলেন :—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

"হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহা নিগৃহীত হইয়া থাকে।" ভগবান দুর্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহুল সদুপায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবলমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মনরূপ মত্তমাতঙ্গ-শাসনের অঙ্কুশ-স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, কারণ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যথাযথ সাধন করিলেই সুকঠিন সকল সাধনের কার্যই হইয়া যায়। ভগবান পতঞ্জলিও তাঁহার যোগসূত্রে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই মনকে নিরোধ করিতে হয় বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। অভ্যাস কাহাকে বলে ?

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"

শুদ্ধ চিদাত্মাতে প্রশান্তভাবে চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য, মানসিক উৎসাহরূপ যত্নদৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। অসৎ সঙ্কল্প হৃদয়ে উদিত হইবামাত্র তাহার পরিত্যাগ ও প্রলোভনের পদার্থ সম্মুখীন হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিবার অবিশ্রান্ত চেষ্টার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয়-বাসনা বিচলিত বা অভিভূত করিতে পারে না। এই অভ্যাস প্রবল থাকিলে সিদ্ধির বিঘ্ন হইবার ভয় থাকে না।

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"

স্ত্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্যাদিজনিত দৃষ্ট বিষয়সুখ এবং শাস্ত্রমুখে বিস্তৃত স্বর্গাদি ভোগসুখ এই উভয়-প্রকার সুখে বিতৃষ্ণাকেই বশীকার নামক পরম বৈরাগ্য কহে। কাম্য প্রভৃতি বস্তুতে অনিত্যত্বাদি দোষের অনুসন্ধান এবং ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে পুনঃ পুনঃ নশ্বরত্বাদি দোষদর্শন দ্বারা তত্তৎসুখে বিতৃষ্ণার সঞ্চার হওয়াতে ত্রিগুণাত্মক কোন বিষয় ব্যবহারে চিত্তের তৃষ্ণা বা আসক্তির উদয় হয় না।

কিন্তু সকল অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ, সুখলভ্য ও সহজ উপায়, যাহা সকল সাধনের শেষ, যাহা আশ্রয় করিলে অন্য কঠোর ও দুষ্কর সাধনের আবশ্যক হয় না, সেই সাধন হইল অনাথশরণ পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ। যে সাধক ভগবচ্চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করেন তাঁহাকে বিঘ্নসকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। শরণাগতির লক্ষণ কি তাহা বলিতেছেন :—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিসর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা॥
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

"যে সকল বিষয় ঈশ্বরলাভ-পক্ষে অনুকূল সেই সকলের গ্রহণ এবং তৎপ্রতিকূল বিষয়সকলের পরিত্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থাতেই আমার সহায় থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ, তাঁহার কৃপা হইবার পক্ষে কালক্ষেপ করত আশায় আশ্রিত হইয়া থাকা এবং কামনাবিহীন হইয়া তাঁহার সাধনে আপনাকে নিক্ষেপ করা—এই ছয় প্রকার শরণাগত-লক্ষণ।"

ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্য-সহিত অবিদ্যা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। মনোনিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে। গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সম্যক্ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বশেষে ভগবানের শ্রীচরণে শরণগ্রহণ করিবার জন্য নিয়োগ করিতেছেন :—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

"হে ভারত, তুমি সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, তাঁহারই প্রসাদে পরাশান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।"

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"তুমি সমুদয় ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব।"

বর্ণ ও আশ্রমভেদে যত প্রকার ধর্ম আছে সকল ধর্মের অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান। তাই ভগবান বলিতেছেন,—সর্ব ধর্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকে সর্বধর্মস্বরূপ বলিয়া বিদিত হও এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া জানিয়া অনাত্মবিষয়চিন্তা-মাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও এবং অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর। "সর্বধর্মান্" পদদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আদির সর্বপ্রকার ধর্মই উপলক্ষিত হইয়াছে। "হে অর্জুন, তুমি পাপের জন্য আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইও না, আমি তোমাকে সর্বপাপ-বিমুক্ত করিব।" শ্রুতি বলিয়াছেন: "ধর্মেণ পাপমপনুদতি" ধর্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। ভগবান স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ভগবান পূর্বোক্ত শ্লোকে শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্ম-কর্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে তাহা বুঝাইলেন। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল।

ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইল। এই ধর্মের বল অপরিমেয়। বিশ্বে যত প্রকার শক্তি আছে, যত প্রকার শক্তির খেলা হইতেছে, যত প্রকার শক্তির বিকাশ হইতেছে, যত প্রকার শক্তির শক্তি আছে, সকল শক্তিই ধর্মের শক্তি—ধর্মের বলের কাছে শির অবনত করে। বিশ্বের সমস্ত তেজ, সমস্ত জ্যোতি ধর্মের পবিত্র নির্মল জ্যোতির সম্মুখে ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

"সেই পরমাত্মতত্ত্বভূত ব্রহ্মপদার্থকে সূর্য প্রকাশিত করিতে পারে না এবং চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে পারিবে? সেই আত্মা স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন বলিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়।" এই আত্মতেজ যাঁহার ভিতর হইতে যত উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনিই মানবজাতির মধ্যে তত পূজনীয় হইয়াছেন। এই তেজ, এই ধর্মের বল আর্যঋষিদের মধ্যে ছিল বলিয়া তাঁহারা একদিন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞানের জ্যোতিতে আজ জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, তাঁহাদের জ্বলন্ত পবিত্র জীবনের এক কণিকা যেখানে পতিত হইয়াছে সেই স্থানের আলোক কত শত হৃদয়ান্ধকার নাশ করিয়া ধর্মের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে। এই ধর্মই হিন্দুজাতির সম্বল, হিন্দু জাতির জীবন, হিন্দুজাতির জাতীয় আদর্শ। অন্য অন্য জাতির জাতীয় আদর্শ অন্য অন্য প্রকার। প্রত্যেক জাতির জীবনের একটি উচ্চ আদর্শ, একটি লক্ষ্য আছে যাহা তাহাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, তাহাদের মেরুদণ্ডস্বরূপ, যাহার দ্বারা তাহাদের জাতীয় জীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়,

যাহার উপর তাহাদের জাতীয় জীবন নির্ভর করে। কান কোন জাতির মধ্যে রাজনীতি, অপরের মধ্যে বা সমাজনীতি এবং কাহারও কাহারও বা মানসিক জ্ঞানার্জন প্রভৃতি জীবনের সর্বস্বস্থানীয় হয় এবং তাহার মূলে আঘাত করিতে পারিলে তাহাদের জাতীয় বৃক্ষ ভূমিশায়িত হয়। কিন্তু হিন্দুজাতির একমাত্র ধর্মই ভিত্তি, ধর্মই জীবন, ধর্মই বল, ধর্মই সর্বস্ব। (সমাপ্ত)

কবীর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কবে তব আবির্ভাব কবে তব হলো তিরোধান,
কোন খোঁজ নাহি রাখি, গণিতের অঙ্ক পরিমাণ
তোমারে বাঁধিতে নারে—কোন ইতিহাসের পাতায়
তব জাত-পত্রখানি নাহি মিলে কালের খাতায়।
তুমি চিরদিনকার, নহ তুমি কোন শতাব্দীর
গোষ্ঠীহারা কোষ্ঠীহারা গোত্রহীন হে সাধু কবীর।

কাল-সিন্ধু মাঝে তব জীবনের—নাহি পাই সীমা,
মহাসিন্ধুময় হ'য়ে আছে তার বিরাট মহিমা।
কেবা তব পিতামাতা তার মোরা পাইনি সন্ধান,
তুমি নারদের মত বিধাতার মানস-সন্তান।
সংসার সন্ন্যাস ভেদ যার মাঝে পাইল বিলয়,
গৃহী কি বৈরাগী তিনি কেমনে তা' হইবে নির্ণয়?

জানি না কি ছিলে তুমি ধর্মরাজো, সহজী, মরমী,
রামাৎবৈষ্ণব, সুফী, বৌদ্ধ, জৈন, কিংবা বর্ণাশ্রমী?
কতটা মোশ্লেম ছিলে কতটা বা হিন্দু নাহি বুঝি,
কুড়ানো ছেলের আর কোথা পাব পিতৃধর্ম খুঁজি?
কোন সম্প্রদায় তোমা, জাতিহারা, ভাবেনি আপন,
মহামানবের ছিলে তারি ধর্ম করেছ পালন।
জানি না জীবন-কথা,—কি কি ভাবে করিলে সাধনা,
জানি না করিলে কারে কি প্রথায় পূজা, আরাধনা,
গড়েছিলে সম্প্রদায় জানি নাক কি বিধি-বিধানে,
আহার, বিহার, বেশ, জীবযাত্রা কি ছিল কে জানে?

কোন্ শাস্ত্র পড়েছিলে, কোন্ মন্ত্র জপিতে ধীমান,
কত কত বার? কি আসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান?
তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয়
রাখেনিক করি যত্ন ইতিহাস অমর অক্ষয়।
সমস্ত জীবনখানি নিঙাড়িয়া দিয়াছ যে বাণী,
তার এক বর্ণ মোরা হারাইনি—এই শুধু জানি,
ব্যাপ্ত তাহা দিগ্বিদিকে তৈলবিন্দু সম খরস্রোতে,
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হ'তে,
ভারতের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে অনুস্যূত
তব ব্রত তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীভূত।
কলামূর্ত করি তারে পুরাবৃত্ত গম্বুজে মিনারে,
নমস্ত করিয়া রাখি আপনার দায়িত্ব না সারে।
তাহি তাহে কোন ক্ষোভ! এ ভারত বিরাট্ জীবনে
কোন সীমা-বেষ্টনীতে রুদ্ধ করি হেরে না নয়নে।
নাহি চাই বহিরঙ্গ, ভুলে যাই অনিত্য অসারে
জীবনের অঙ্গীভূত হয় না যা চাইনাক তারে।
ব্রত চাই, বাণী চাই—চাই অন্তরাত্মার সন্ধান,
আনরা মরাল-ধর্মা নীর ফেলি' ক্ষীর করি পান।

সাধক রামপ্রসাদ

সাহিত্য-শ্রী ঊষা বসু, এম্-এ, সাহিত্য--সরস্বতী

হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮-১৭৩৩ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। সাধককবি রামপ্রসাদ রামরাম সেনের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র। রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা কবির গুণ উপলব্ধি করে তাঁকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন ও "কবিরঞ্জন" উপাধিতে অলংকৃত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে রাজসভায় যেতে বহুবার অনুরোধ করেছেন, কিন্তু রাজসভার বিলাসিতা তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নাই। পল্লীজননীর শ্যামল কোলে অনাবিল সৌন্দর্যের মাঝে তিনি "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করতেন ও গান করতেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের মধুর সুরের ঝঙ্কার পল্লীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলতো।

কথিত আছে যে কবি এক ধনীর সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করতেন। কিন্তু তিনি যখন এই একঘেয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্তি অনুভব

করতেন, তিনি তখন শ্যামা-সংগীত রচনা করে ক্লান্তি দূর করতেন। একদিন জমিদার সেরেস্তা দর্শনের সময় হিসাবের খাতায় গান দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গানটি এইরূপ—"আমায় দেমা তবিলদারী। আমি নেমকহারাম নই শংকরী॥" এই রচনাটি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে ইহা রামপ্রসাদের রচনা। তিনি কবিকে মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে শ্যামা-সংগীত রচনা করতে আদেশ দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় শ্রীযুক্ত রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে রামপ্রসাদ "কালীকীর্তন" রচনা করেন। রামপ্রসাদের শ্যামা-সংগীত পল্লীতে পল্লীতে বিস্তৃত হয়ে ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তির প্লাবন প্রবাহিত করেছে। রামপ্রসাদের রচনায় কোন চেষ্টা বা কৃত্রিমতা নেই। এই সংগীতগুলি সরলতায় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হয়েও তিনি ছন্দের বৈচিত্র্যে ও অলংকারের প্রাচুর্যে তাঁর রচনা ভারাক্রান্ত করে তোলেন নাই। সোজা কথার মালা গেঁথে সরল ভাষায় মায়ের কাছে নিজের প্রাণের কথা নিবেদন করেছেন—

"চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র,
শ্যামা ম' তোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্মসূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তাহার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
* * *
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন
পাঁচ পোয়ারের তুমি জোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি
তোমায় করবে তোলাপাড়া॥"

রামপ্রসাদ সহজ ভাবে নিজের কথা বলেছেন। আড়ম্বর নেই—আতিশয্য নেই—শুধু সরল শিশুর মত "মা মা" রব। তিনি কোন সমস্যার সমাধান করেন নাই, কোন তর্ককেও অবহেলা করেন নাই শুধু তাঁর হৃদয়ের আরাধ্যা দেবীর কৃপায় এক রূপাতীত লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাইতো তাঁর সংগীতে প্রেম ও নির্ভরতার সন্ধান পাই। মায়ের উন্মাদিনী রূপকে তিনি অস্বীকার করেন নাই—পরন্তু এই রূপের মধ্যেই এক পূর্ণতর সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠে। এই করালী কালীমূর্তিই আবার ভক্তের কাছে আবির্ভূতা হন কল্যাণী মূর্তিতে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—"Kali appears to be a Symbol to him—a Symbol of divine punishment, of divine grace and divine motherhood." ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন যে এই দেবী মূর্তি "Is not an abstract Symbol but it becomes the means and end of a definite realisation."

মৃত্যুর পরে আমাদের অবস্থা বর্ণনা করে কবি গেয়ে উঠলেন—

"বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
* * *
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবিরে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥"

একদিন আমাদের দেশে বৃদ্ধ জনের কণ্ঠে এই

সমস্ত শ্যামা-সংগীত ধ্বনিত হতো। এই সংগীতের জন্য সুর লয় প্রভৃতির কষ্ট-সাধনা করতে হতো না। স্বতঃস্ফূর্ত প্রসাদী সুরের লহরী পল্লীর মাঠে ঘাটে রণিত হয়ে উঠতো; এই সংগীত শিক্ষিতের কণ্ঠে যেমন অশিক্ষিতের কণ্ঠেও তদ্রূপ উৎসারিত হতো। লোকে ভক্তিরসে আপ্লুত হ'তো। এই সংগীত এক সময়ে বাংলাদেশে লোকশিক্ষার অন্যতম পথ ছিল।

রামপ্রসাদ আগমনী গানেরও প্রথম কবি। উমা ও মেনকাকে নিয়ে তিনি যে বাৎসল্যরসের সৃষ্টি করেছেন তাহা সত্যই মাধুর্যে অনবদ্য। শারদীয়া পূজার পূর্বে আগমনী গানের করুণ সুর বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে—সেই করুণ অথচ মধুর সুরটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত।

রামপ্রসাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অথচ এই গানের ভিতরে সার্বজনীনতার সুর অপূর্ব ঝংকারে বেজে উঠছে। "তান্ত্রিক উপাসনায় ভয়ংকর ও সুন্দর দু'টি দিক আছে—রামপ্রসাদ ও অন্যান্য পদকর্তাদের রচনায় মানব-প্রকৃতির ভাবোন্মাদ ও মাধুর্য অপরূপ প্রকাশলাভ করেছে। এই নূতন ধারার প্রবর্তন বাংলার মানসলোকের ইতিহাসে একটা নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। এই মাতৃভাবের সাধনা বাংলার নিজস্ব।"

রামপ্রসাদ লিখেছেন—"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হব ব্যক্ত।" সত্যিই কালের প্রভাবে আমরা তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির কথা বিস্মৃত হয়েছি, কিন্তু তাঁর শ্যামা-সংগীত কোনদিনই আমরা ভুলতে পারবো না।

কালী-কীর্তনে রামপ্রসাদ কালীকে বৃন্দাবনের অনুরূপ করে অংকিত করেছেন। তিনি কালীকে দিয়ে গোষ্ঠ, রাস ও মিলনলীলা দেখিয়েছেন। সেই জন্য তাঁকে বিরুদ্ধপক্ষ আজু গোঁসাঞির বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে—"না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে ধেনু কি চরায়রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায়রে॥"

এই অনুকরণ তিনি সজ্ঞানতা অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ করেছেন। অজ্ঞানতা বশতঃ করা খুবই স্বাভাবিক। আর সজ্ঞানকৃত হ'লে মনে হয় সাধক রামপ্রসাদ শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচিত অনেক পদে কৃষ্ণ ও কালীর অভেদরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই ভক্ত কবি মিলনের গান গেয়েছেন।

সাধনা*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

কমলাকান্ত মা'র একজন ভক্ত সন্তান, সিদ্ধপুরুষ; এই গানটির মধ্যে তিনি সাধনার সব কথা বলেছেন। এর ভেতর কোনো লুকোচুরি নেই—সহজ ভক্তি।

এই গানটিতে আমরা তিনটি জিনিস পাই—(১) আদরিণী শ্যামা মা, (২) কমলাকান্ত, (৩) কমলাকান্তের মন। কমলাকান্ত মনকে বলছেন আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর। হৃদয়মন্দির শ্রেষ্ঠ মন্দির। দেহ-মন্দিরের দেবতাই শ্রেষ্ঠ দেবতা। তাই বলেছে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" অর্থাৎ রথে বামনকে দর্শন করলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এ

* কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমাধুর্যময় মিত্র কর্তৃক সঙ্কলিত।

কোন্ রথ? হৃদয়-রথ। হৃদয়-রথে তাঁকে দেখতে হবে। তাই কমলাকান্ত বলেছেন, "যতনে হৃদয়ে রেখো"; আহা! আবার কি বিশেষণ দিয়েছেন—আদরিণী শ্যামা মাকে!

ঐ তিনটি জিনিস, আমি, মন, ও শ্যামা—এই তিনটি জিনিসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। অন্য কোথাও যেতে হবে না, কোনো তীর্থে যেতে হবে না। কিন্তু এটা আমরা বুঝি কখন? সাধনা করে, ধ্যান জপ তীর্থ করে তারপর বুঝি।

ঠাকুর একটি ছোট্ট কথা বলতেন। মন্দির অপরিষ্কার থাকলে দেবতা আসবেন কেন? মন্দিরকে শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। আমরা মন্দিরকে ময়লা অপবিত্র করে রেখেছি। ঠাকুরের সেই উপদেশ স্মরণ কর। কোন গ্রামে পদ্মলোচন বলে একজন ছিল। সে হঠাৎ একদিন এক পোড়ো মন্দিরে শাঁখ বাজাতে লাগলো। গ্রামের লোকেরা ভাবলে মন্দিরে হয়তো বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। সকলে দৌড়ে এসে দেখে মন্দিরে বিগ্রহ নেই, চারিদিক অপরিষ্কার। চামচিকে ও চামচিকের বিষ্ঠায় মন্দির ভরতি। তখন গ্রামের লোকেরা বললে—

"মন্দিরে তোর নেইকো মাধব
শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল।"

মন্দিরে মাধব কৈ? তারপর চামচিকে এগার জনা সেখানে হানা দিচ্ছে। এই এগার জনা চামচিকে কারা? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। এই এগার জনা আবর্জনা আনছে। আমাদের বাহ্যানুষ্ঠান খুবই রয়েছে—আড়ম্বর শাঁখ ঘণ্টা রয়েছে কিন্তু মন্দিরে মাধব কই? মাধবকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তখন শুধু "মন তুই ছাখ, আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

"কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি"—কামনা, আসক্তি, বাসনা ওদেরকে ফাঁকি দিতে হবে। ওরই পেছনে জগৎ ছুটছে। ওর থেকে ক্রোধ প্রভৃতি সব আসছে। এই কামনা-বাসনাই মোক্ষমার্গের শত্রু। এরা আসক্তি আনে, বন্ধন করে রাখে। এদের কি করে ত্যাগ করা যাবে? ঠাকুর বলছেন সহজ উপায় আছে—মোড় ফিরিয়ে দাও। তাঁকে কামনা করো, তাঁকে চাও। "অকামো বিষ্ণুকামো বা"—তাঁকে কামনা কামনার মধ্যে নয় যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। তাই তাঁকে কামনা করো। তাঁকে পেলে কি হয়? সব কামনার তৃপ্তি হয়ে যায়। জাগতিক কামনাতে কি হয়? কিছুতেই তৃপ্তি হয় না—যত ভোগ করবে ততো বাসনা বাড়বে। ফলে অশান্তি জ্বালা যন্ত্রণা। যতো রাজা রাজরা, বাইরে থেকে দেখতে বেশ কিন্তু ভেতরে অতৃপ্তি। এর অন্ত নেই।

এই কামনা সম্বন্ধে ঠাকুর একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। ঠাকুর যা দেখতেন তাই দিয়ে উপমা দিতেন। একটা চিল ছোঁ মেরে মাছ ধরেছে। যত কাক তাকে তাড়া করেছে। চিল উড়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে, তবু কাক পিছু ছাড়ে না। শেষে চিলটা হয়রান হয়ে মাছটা ফেলে দিয়ে হাঁপ ছাড়তে লাগলো নিশ্চিন্ত হয়ে। কাকগুলো তখন ঐ মাছটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলে। কাকগুলো কামনা, মাছটা ভোগ। কি সুন্দর উপমা। এমনটি কোথাও পাওয়া যায় না। গীতা-শাস্ত্রাদি পাঠ করে যা পাওয়া যায়, তাই আছে এই ছোট্ট উপদেশে।

মাধবকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার অন্তরায় হ'ল কামনা-বাসনা। ইন্দ্রিয়গুলো সর্বদা এই সব নিয়ে ছুটোছুটি করছে। মানুষ ভাবে কামনার পূর্তি হলেই শান্তি পাবে কিন্তু তা হয় না। অশান্তি অতৃপ্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে তবু ইন্দ্রিয়গুলোর পেছনে ছুটে চলেছে, তারা নাকে দড়ি দিয়ে যেন মনকে ছোটাচ্ছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বার বার অর্জুনকে বলছেন—মনকে, ইন্দ্রিয়কে সংযত কর।

"তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

মাধব কি অমনি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন? ঠাকুর বলতেন,—আর্শিতে ময়লা পড়লে মুখ দেখা যায় না। মন যতো শুদ্ধ পবিত্র হবে ততো তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাবে। হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। একি কম কঠিন? এইই সাধনা। সাত্ত্বিক বুদ্ধি সর্বদা সজাগ থেকে মনকে ভেতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্তর্মুখী করছে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি খুব বিচারশীল। রাজসিক বুদ্ধি বহির্মুখ। বাইরের বিক্ষিপ্ত মনকে ভেতরে আনতে হলে সাধন চাই। তাই কমলাকান্ত বলছেন মনেতে মাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সাধনা করতে হবে। অর্থাৎ কামাদিকে ফাঁকি দিতে হবে। এই ভাবে হৃদয়ে মাকে প্রতিষ্ঠা করে মাকে ডাক। "কুরুচি কুমন্ত্রী যতো, নিকট হতে দিও নাকো" কুরুচি কুমন্ত্রীর কথা শুনো না। কুরুচি যেন তোমাকে আশ্রয় না করে।

বিবেককে মন্ত্রী করতে হবে, সাত্ত্বিক বুদ্ধির কথা শুনতে হবে। আপনাতে আপনি থাকাই আসল কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে সেই উপদেশই দিচ্ছেন, ভিতরে চল। ধর্ম জিনিসটাই ভেতরের, বাইরের নয়।

সাধনা করতে করতে, ডাকতে ডাকতে মন পরিষ্কার হয়। কোটি জন্মের অর্জিত আবর্জনা সংস্কার চলে যায়। ঐ চামচিকের ময়লা টয়লা চলে যাবে। জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রাখতে হবে যাতে আর যেন কেউ না ঢোকে। উপনিষদে বলেছেন,—সৃষ্টিকর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। এরা এই ভাবে সৃষ্ট তাই অন্তর্মুখ হতে চায় না। কিন্তু এসত্ত্বেও কোন শাস্ত ঋষি সেই আত্মাকে দর্শন করেন। চক্ষু আবৃত করে অন্তর্মুখী করে অমৃতত্ব লাভের অভিলাষী হয়ে সেই আত্মাকে দর্শন করেন।

ঠাকুর ঐ একটি মাত্র কামনা নিয়ে চলেছিলেন। সংসারে কত কামনা, কিন্তু ঠাকুরের ঐ একটি মাত্র কামনা—'মা দেখা দাও।' রামনামের প্রার্থনাতে এই কামনার প্রার্থনা আছে।

"নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবান্ অখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ।"

হে রঘুপতি! আমার বিষয়ের প্রতি কোন স্পৃহা নেই, বাসনা নেই। হৃদয়ের অন্তরতম স্থল থেকে বলছেন—সত্য করে মন মুখ এক করে বলছি আমার কোনও স্পৃহা নেই। আমাকে ভক্তি দাও—শুধু এই স্পৃহা এই কামনা আছে। আমায় শুদ্ধ অমলা নিষ্কাম ভক্তি দাও। আর দাও পূর্ণ নির্ভরতা যাতে তোমাকে আশ্রয় করে চলতে পারি। সাধনার শেষ আত্মসমর্পণ। ছোট ছেলে যেমন মাকে নির্ভর করে চলে, এ সেই নির্ভরতা। এখানে অন্য কোন স্পৃহা নেই শুধু একটি মাত্র স্পৃহা আছে। কামাদি-দোষেতে আমার মন দুষ্ট হয়েছে। আমাকে পবিত্র কর। নির্মল শুদ্ধা ভক্তি দাও। শ্রীশ্রীমা একটি সাদা বেল ফুল নিয়ে বলতেন,—"আমার মন এই ফুলের মতো শুভ্র পবিত্র কর।" বিষয়ের কামনা থাকবে না, শুধু থাকবে একটি কামনা—ভগবানকে চাই। সংসারের কামনা-বাসনার মূলে আছে তৃষ্ণা—এর থেকে আসে আসক্তি। এই সংসারের কামনার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। বিল্বমঙ্গল কি করলেন? কত ভোগের মধ্যে ছিলেন—একটা ধাক্কা খেয়ে মোড় ফিরিয়ে দিলেন। লালাবাবু একটা কথায় সব ছেড়ে দিলেন।

তিন রকম ভাবে শেখা যায়—দেখে শেখা, শুনে শেখা, ঠেকে শেখা। লালাবাবুর শুনে শেখা, কানে যেই গেল—"বেলা যায়" অমনি শিক্ষা হয়ে গেল। অতো ঐশ্বর্য সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে নাম জপ করতে লাগলেন। বুদ্ধদেবের কি হল? দেখে শিখলেন। রাজার ছেলে, যুবতী স্ত্রী, আবার

একটি ছেলে হয়েছে। বাবা তাঁকে বাইরে যেতে দিতেন না।

গৌতম বাইরে এসে জরা মৃত্যু ব্যাধি দেখে ভাবলেন এসব কি! আমারও জরা আসবে, মৃত্যু আসবে,—তাই দেখে শিক্ষা হল। এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় জগৎকে দিয়ে গেলেন।

নচিকেতা যমের কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন। একটি হ'ল, মানুষ মৃত্যুর পর থাকে কি থাকে না? যম আশ্চর্য হয়ে গেলেন প্রশ্ন শুনে। যম তাকে দীর্ঘ জীবন, ভোগের উপকরণ, রথ, অপ্সরী, বিস্তীর্ণ রাজ্য দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন। নচিকেতা বললেন—সবই দিচ্ছ কিন্তু তুমি (অর্থাৎ মৃত্যু) মাথার ওপরে রয়েছ। ভোগ করব' কি করে?

যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য-ধর্ম শেষ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে বিষয় ভাগ করে দিচ্ছেন। মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন—"এর ভেতর দিয়ে কি অমৃতত্ব লাভ হবে? তা যদি না হয় তবে এ বিষয়-সম্পদের কি প্রয়োজন?" এই হ'ল আমাদের হিন্দুধর্মের আদর্শের কথা। এই ত্যাগের উপরেই হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

ঠাকুর এসেছিলেন ঠিক ঠিক ত্যাগের ভাব দেবার জন্যে। ঠাকুর এক হাতে মাটি আর এক হাতে টাকা নিয়ে বিচার করছেন—এ দিয়ে ভগবান লাভ হয় না। ঠিক অতীতের মুনিঋষিদের ভাবটি বজায় রেখেছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে। ত্যাগ অবলম্বন করতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে—একটা গ্রহণ না করলে ত্যাগ হয় না। পূবের দিকে গেলে তবে তো পশ্চিম ত্যাগ হবে। কাকে গ্রহণ করতে হবে? নিবৃত্তি-মার্গ গ্রহণ করতে হবে। রামপ্রসাদের গানে আছে—

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি,
বিবেক নামে তার ব্যাটারে তত্ত্বকথা
তায় শুনাবি।"

প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নিবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। বিবেককে সারথি করে তাঁর দিকে এগুতে হবে। তাঁকে পেলে সব অভাব চলে যায়। তিনি এমনই জিনিস, তাঁকে পেলে সাধক পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

ভগবান লাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছু নেই। তাই ঠাকুর বলেছেন,—সংসারে থাকবে তাঁর ওপর মন ফেলে রেখে। থাকো ছুতোরনীর মতো। সে যখন চিঁড়ে কোটে তখন হাত দিয়ে ত্যাখে ঠিক হচ্ছে কি না, এদিকে মুষল পড়ে যাচ্ছে, ছেলেকেও মাই দিচ্ছে। খদ্দেরের সঙ্গে দরদস্তুর করছে, সংসারের দিকেও মন দিচ্ছে, কিন্তু বার আনা মন মুষলে ফেলে রেখেছে। চার আনা মন দিয়ে বাকী কাজগুলি করছে। আমাদেরও তাই করতে হবে। এর জন্যে অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসই হচ্ছে যোগ। এই অভ্যাস ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র করে তাঁর দিকে এগিয়ে দেবে। গঙ্গার দিকে যতো এগুবে ততো শীতল হাওয়া পাবে। সাধনভজন যতো করবে ক্রমশঃ ততো অনুভব হবে। তারপর গঙ্গায় স্নান করলে শরীর শীতল হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাবে। মাধবকে হৃদয়মন্দিরে বসাতে হবে। সাধন ভজন করতে হবে। গীতাতে ভগবান বলছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

অর্থাৎ, সেই সব ভক্তদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই যারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, এবং সেই শুভবুদ্ধিতে তারা আমাকে লাভ করে। মনে রাখতে হবে, এ যন্ত্রের মতো নিষ্প্রাণ ভজনা নয়, প্রীতিপূর্বক ভজনার কথা বলছেন। এত করুণা তাঁর! তিনি বলছেন, যারা আমার শরণাগত হয় তাদের অনুকম্পা করে তাদের অজ্ঞান-তমঃ নাশ করি; তাদের জ্ঞান দিই, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিই তাদের অন্তরে।

ঠাকুর বলছেন, হাজার বছরের অন্ধকার তিনি কৃপা করলে এক নিমেষে দূর করে দেন।

তিনি চান প্রীতি কিন্তু আমরা তা দিই না।

আমাদের অনুরাগ ভালবাসা নেই। তাই তিনি বলছেন, "বকলমা দে। ঠিক ঠিক রাজার বেটা হ। মাসোহারা নে।" তাঁর উপর নির্ভর করে এগিয়ে পড়, ডুব দাও। একবার একজন পণ্ডিত এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। বেদান্তের জ্ঞান জ্ঞেয় ইত্যাদি নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। তারপর ঠাকুর বললেন, "কিন্তু আমি কি জানি—মা আছেন আর আমি আছি।" ঘরের হাওয়া বদলে গেল।

বেদান্ত সবই সত্য। তবে অবতার-পূজারও একটা প্রয়োজন আছে। তাঁরা আসেন সকলকে কৃপা করে উদ্ধার করতে। তাই যীশুখ্রীষ্ট বলছেন, ' Come ye all to me, I will give you rest." দুই হাজার বছর আগে, যারা শ্রান্ত, ক্লান্ত, জীবনের ভার বহনে যারা অক্ষম, তাদের তিনি কৃপা করেছেন, বলেছেন "আমার কাছে এস, তোমরা শান্তি পাবে।" কত সাধক তাঁর উপাসনায় সিদ্ধ হলেন।

তারও আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমার শরণাগত হও। আমি তোমায় সর্ব পাপ থেকে, সকল কালিমা থেকে মুক্ত করব। ধুয়ে পুঁছে সাফ করে দেব।" কে করে দেবে? এখানে স্বয়ং ভগবান বলছেন, "আমি করে দেব।" তবু আমাদের বিশ্বাস কোথায়? বিশ্বাস কাকে বলে জান? একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। পথে তাঁর পিপাসা পেয়েছে। দেখেন একটি কূপে একজন জল তুলছে। তার কাছে জল চাইলেন। সে বললে, "বাবা, আমি জাতে মুচি।" ব্রাহ্মণ বললেন, "বল শিব।" সে বললে, "শিব"। ব্রাহ্মণ বললেন, "এবার জল দাও। এখন ত' তুমি শুদ্ধ।" এর নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আমাদের নেই—আমরা হারিয়েছি। এস না অশুচি হয়ে। তাঁর শরণাগত হও, তিনি শুচি করে নেবেন। এস না গু মুত মেখে। মা বলতেন, "আমার ছেলেরা যদি গু মুত মেখে আসে, নোংরা হয়ে আমার কাছে আসে, আমি তাদের ধুয়ে পুঁছে সাফ করে নেব।" এত করুণা!

এবার সবই একাধারে কৃপা। গিরিশবাবুকে কি করলেন। আমরা মেশামেশি করে শুনেছি। এখন সকলকে শোনাই। প্রথম দর্শনে আমাদের বললেন, "আয়, এসেছিস্। আমি কি ছিলুম, কি হয়েছি! একেবারে দেবতা করে দিয়েছে। ধমকে নয়—ভালবেসে।" গিরিশ বাবুর বিশ্বাস হ'ল—পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস। ঠাকুর যুগে যুগে ডাকছেন, "এস, ধুয়ে পুঁছে সাফ করে দেব।"

কি অহেতুকী কৃপা! জান কেশব বাবুর বাড়ী গিয়েছেন বিনা নিমন্ত্রণে। সেখানে তিনি ছিলেন না। গেলেন বেলঘরিয়া। তাঁকে পূর্ণ করে দিতেন কিন্তু কেশব বাবু নিতে পারলেন না।

এত চিন্তা নিয়ে কি হবে? কি চাই? ডুব দিতে হবে। লোকে শান্তি খোঁজে। অভাব গেলে শান্তি হয়। অভাবে অশান্তি। এই অভাব দূর হয় কিসে? দূর হয় তাঁকে পেলে। তিনি সকলের ভিতরেই আছেন। সাধনের ভেতর দিয়ে তাঁকে জানতে হবে।

হিন্দু বিশ্বাস করে গীতা অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে বলা। রামকৃষ্ণ কথামৃতও ঐ রকম। অর্জুনকে ভগবান নিজের থেকে সব কথা বললেন—সব উপদেশ দিলেন। এর নাম অহেতুকী ভালবাসা। গুহ্যতম তত্ত্বকথা ভগবান স্বয়ং তাঁকে বলছেন—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" সকলের হৃদয়ে ভগবান আছেন।

তাঁর শরণাগত হও। জপধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর শরণ প্রার্থনা কর। বেড়ালছানার মত হও। মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তবে হবে।

তাঁকে ধরতে পারলে—তাঁর শরণ নিতে পারলে—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব হয়। ঠাকুর এসেছেন আমাদের উদ্ধার করতে। "অবতার-বরিষ্ঠায়" কেন? সাধনা হয়ে গেছে। অপেক্ষা করছেন। ডাকছেন। শুধু ডাক নয়—কেঁদে কেঁদে ডাকছেন ব্যাকুল হয়ে—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্, ছুটে আয়।" যার শেষ জন্ম সে এসেছে। ভাবের ঘরে চুরি না করে চরণে পড়, যা চাইবে পাবে। কি চাই? ভিতরে আনন্দ শান্তি সব পাবে।

তিনি কেঁদে কেঁদে ডাকছেন, "তোরা আয়।" আমাদের কি উচিত নয় যে কেঁদে ছুটে যাই। এক পা গেলে তিনি একশ' পা এগিয়ে আসেন—এ অবতারের এই মজা।

তুমি লীলাময়

শ্রীকৃষ্ণধন দে

রামকৃষ্ণ, তব মাঝে ত্রেতা আর দ্বাপর মিলন,
তব আবির্ভাব লাগি' সমুৎসুক ছিল আর্তজন
আকুল প্রার্থনা বুকে। যখন ঘটিল ধর্মগ্লানি,
তোমার সহাস্য মুখে বাহিরিল বরাভয়বাণী
মানব-কল্যাণ তরে। গীতা-বেদ-বেদান্তের সার
তুমিই আখ্যানছলে প্রচারিলে মুখে আপনার
সংশয়ব্যাকুল বিশ্বে। চিনাইলে জগৎ-ধারিণী
ভক্তির প্রদীপ জ্বালি'। বাক্য তব সুধা-নিষ্যন্দিনী
দেখাল মুক্তির পথ। জীবনের যত তাপক্লেশ
তোমার প্রেমের মন্ত্রে হয়ে গেল নিমেষে নিঃশেষ।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, শুনেছিলে মানব-ক্রন্দন
তব জ্যোতির্ময় লোকে, তাই তুমি করিলে ধারণ
নশ্বর মানবদেহ। কে বলিবে তুমি নিরক্ষর?
—সর্বশাস্ত্রপারংগম দেব, লীলাময় পুরুষপ্রবর।

"অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন; কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।"

"এখন দেখছি, তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও ছলরূপে,—কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

পাঞ্চরাত্র আগমে শক্তিতত্ত্ব

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, এম্-এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

উপাস্য দেবতার নামভেদানুসারে আগম শাস্ত্র প্রধানতঃ বৈষ্ণবাগম, শৈবাগম ও শাক্তাগম—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিষ্ণু, শিব ও শক্তি যথাক্রমে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ আগমে ইষ্টদেবতারূপে প্রতিপাদিত ও উপাসিত। দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিভেদানুসারে আগমত্রয় দ্বৈতপ্রধান, অদ্বৈতপ্রধান বা দ্বৈতাদ্বৈতপ্রধান। আচার্য রামানুজের ব্যাখ্যানুযায়ী পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব আগম বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে, শৈবাগম ত্রিবিধ সিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদক, পরন্তু শাক্তাগম সর্বথা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

বৈষ্ণবাগম সাহিত্যের দুইটি শাখা—পাঞ্চরাত্র ও বৈখানস। বৈখানস আগমের গ্রন্থাদি খুব সামান্যই উপলব্ধ হয়। মরীচি-প্রোক্ত "বৈখানস আগম" অনন্তশয়ন সংস্কৃত গ্রন্থমালায় (নং ১২১) প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিস্তৃত গ্রন্থে ৭০টি পটল ; ইহার অনুশীলনের দ্বারা লুপ্তপ্রায় বৈখানস সম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহের সহিত পরিচয় লাভ করা যায়। পাঞ্চরাত্র আগমের বিশাল সাহিত্যের কিয়দংশ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কপিঞ্জল সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্র সংহিতার মোট সংখ্যা ২১৫।

পাঞ্চরাত্র মত সুপ্রাচীন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

সাংখ্যং যোগং পঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হি ॥

(৩৪৯।১)

মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৩৩৫—৩৪৬) পাঞ্চরাত্র আগমের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে।

'পাঞ্চরাত্র' নামের বিভিন্ন প্রকার নিরুক্তি দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সংহিতার মতে (অধ্যায় ২১) শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক ও ভারদ্বাজ—এই পঞ্চ ঋষি মিলিত হইয়া পাঁচ রাত্রিতে এই ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "পাঞ্চরাত্র"। পাদ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, এই মতের সমক্ষে অপর পঞ্চ শাস্ত্র রাত্রির মত মলিন হইয়া যায়, এই কারণে ইহা 'পাঞ্চরাত্র' নামে আখ্যাত (জ্ঞানপাদ—অধ্যায় ১)। নারদ পাঞ্চরাত্রের মতে, 'রাত্র' শব্দের অর্থ জ্ঞান। এই শাস্ত্রে পরমতত্ত্ব, মুক্তি, ভুক্তি, যোগ ও বিষয় (সংসার) এই পঞ্চ বিষয় নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "পাঞ্চরাত্র"।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।

(নারদ পাঞ্চরাত্র, ১।৪৪)

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতাতেও এই মত স্বীকৃত।

পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলিতে প্রধানতঃ চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়, যথা জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া এবং চর্যা। (১) জ্ঞান-পাদে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎতত্ত্বের রহস্য এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপণ ; (২) যোগপাদে মুক্তির সাধনভূত যোগ ও প্রক্রিয়াসমূহের বর্ণনা ; (৩) ক্রিয়া-পাদে দেবালয় নির্মাণ, মূর্তি স্থাপন ইত্যাদি বিবরণ এবং (৪) চর্যা-পাদে আহ্নিককৃত্য, মূর্তি ও যন্ত্রপূজার পদ্ধতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম, পর্ব ও উৎসবাদির বিধান আলোচিত হইয়াছে। চর্যা ও ক্রিয়ার ব্যবহারিক বিবেচনাই পাঞ্চরাত্র সংহিতার মুখ্য প্রয়োজন। প্রমেয়ের মীমাংসা গৌণ ও প্রাসঙ্গিক। তন্ত্রশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী ইহাতে সৃষ্টি ও অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা এক সঙ্গে মিশ্রিতরূপে পাওয়া যায়।

পাঞ্চরাত্র আগমে শক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক

মূল্যবান্ তথ্য নিহিত আছে। 'জয়াখ্যসংহিতা' (গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টেল সিরিজ, নং ৫৪) পাঞ্চরাত্র আগমের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে শক্তিতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতাতে (আদিয়ার লাইব্রেরী, মাদ্রাজ) শক্তিতত্ত্বের নানাদিক্ বিশদ ও গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জয়াখ্যসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে,—

শক্ত্যাত্মকঃ স ভগবান্ সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতঃ।

(৬।২২৩)

ভগবান্ শক্ত্যাত্মক একং সর্বশক্তিতে সমৃদ্ধ। ভগবান্ তাঁহার এই সর্বশক্তিমত্তা দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

জয়াখ্যসংহিতাতে ঈশ্বরের চতুর্বিধা শক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে যথা লক্ষ্মী, কীর্তি, জয়া এবং মায়া। ইঁহারা সতত তাঁহাতে আশ্রিতা।

লক্ষ্মীঃ কীর্তির্জয়া মায়া দেব্যস্তস্যাশ্রিতাঃ সদা।

(৬।৭৭)

ঈশ্বরের ঐশ্বর্যাদি ষাড়্গুণ্যের মধ্যে (জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য ও তেজ) লক্ষ্মী ঐশ্বর্য-স্বরূপিণী। ঈশ্বরের সহিত লক্ষ্মীর অবিনাভাব সম্বন্ধ যেমন সূর্যের সহিত রশ্মির, সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের।

সূর্যস্য রশ্ময়ো যদ্বদ্ ঊর্ময়শ্চাম্বুধেরিব ।

সর্বৈশ্বর্যপ্রভাবেণ কমলা শ্রীপতেস্তথা ॥ (৬।৭৮)

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।

শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা ॥

হরিই পরমাত্মা, আর তদীয় শক্তি শ্রী-নামে অভিহিতা। শ্রীদেবী প্রকৃতি এবং কেশব পুরুষ বলিয়া কথিত হন। শ্রীদেবী বিষ্ণুকে ছাড়া এবং বিষ্ণু শ্রীকে ছাড়া কখনও থাকিতে পারেন না।

পাঞ্চরাত্র আগমের অন্তর্ভুক্ত "অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা"তে শক্তিতত্ত্ব তথা শ্রীদেবীর স্বরূপ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'ইন্দুশেখরা পঞ্চকৃত্যকরী' হরির শক্তিকে বন্দনা করা হইয়াছে। সর্গ (সৃষ্টি), স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্য। হরির শক্তি শ্রীদেবী উক্ত পঞ্চকৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকেন (১।২)।

পরব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, দুঃখরহিত, নিঃসীম সুখানুভবস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্বভূতে নিবাসকারী, সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতিকারী, নিরবদ্য ও নির্বিকার। পরব্রহ্মের সমতার উপমা-স্থল নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সমুদ্র—"অবিক্ষিপ্তম্ অতরঙ্গার্ণ-বোপমম্" (২।২৩)। ইনি প্রাকৃত গুণস্পর্শহীন অথচ অপ্রাকৃত গুণরাশির আস্পদ; আকার, দেশ ও কাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়াতে পূর্ণ, নিত্য ও ব্যাপক। ইনি হেয় উপাদেয় বর্জিত এবং ইদন্তা (স্বরূপ), ঈদৃক্তা ও ইয়ত্তা (পরিমাণ) এই তিনের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন (অহি'সং' ২।২২-২৫)। পরব্রহ্ম ষাড়্গুণ্য যোগে "ভগবান্", সমস্ত ভূতবাসী হওয়াতে "বাসুদেব" এবং সকল আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে "পরমাত্মা" নামে কীর্তিত। এই প্রকারে গুণ-সমূহের বিশেষতার কারণে ইনি অব্যক্ত, প্রধান, অনন্ত, অপরিমিত, অচিন্ত্য, ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, শিব ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রখ্যাত। পাঞ্চরাত্র মতে পরব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ উভয় ভাবই স্বীকৃত। প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া ইনি নির্গুণ, আবার জগৎ ব্যাপার নির্বাহার্থ অপ্রাকৃত ষড়্গুণযুক্ত হওয়াতে সগুণ। উক্ত ষড়্গুণ যথা (১) জ্ঞান (২) শক্তি, (৩) ঐশ্বর্য, (৪) বল, (৫) বীর্য এবং (৬) তেজ। এতদ্দ্বারা ভগবানের অনন্ত ও বহুধা বিচিত্র শক্তিমত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ষাড়্গুণ্য পৃথক্ভাবে বর্ণিত হইলেও ইহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শক্তির বিভিন্ন দিক্ মাত্র। পরব্রহ্ম শক্তিযোগেই নিজকে বহুভাবে

প্রকাশিত করিয়া থাকেন "ষাড়্‌গুণ্যং তৎ পরং ব্রহ্ম স্বশক্তি-পরিবৃংহিতম্‌" (২।৩২)।

(১) জ্ঞান—অজড়, স্বাত্মসংবোধী (স্বপ্রকাশ) নিত্য সর্বাবগাহী গুণকে 'জ্ঞান' বলে। জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপও বটে, গুণও বটে। (২) শক্তি—এতদ্দ্বারা জগতের উপাদান-কারণত্ব বুঝায়। (৩) ঐশ্বর্য—ইহার অর্থ স্বাতন্ত্র্যমূলক জগৎকর্তৃত্ব। (৪) বল—জগৎ নির্মাণ ব্যাপারে ঈশ্বরের কিছুমাত্র শ্রম হয় না। এই শ্রমহানিই 'বল' নামে অভিহিত। (৫) বীর্য—জগতের উপাদান হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মের যে বিকাররাহিত্য ইহারই শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা 'বীর্য'। জগতের সমস্ত উপাদান-কারণসমূহ মধ্যে কার্যাবস্থায় বিবিধ বিকার দৃষ্টিগোচর হয়, পরন্তু নির্বিকার ভগবানে জগতের উপাদান-কারণ হওয়া সত্ত্বেও কোনও প্রকার বিকার উদিত হয় না; ইহারই নাম 'বীর্য'। (৬) তেজ—জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের যে অনপেক্ষতা তাহাকে 'তেজ' বলে। এই প্রকারে ব্রহ্মে জগতের উভয়বিধ কারণতা—উপাদান এবং নিমিত্ত কারণতা বর্তমান। ব্রহ্ম অন্য কাহারও সহায়তা ব্যতিরেকেই স্বতন্ত্রতা পূর্বক নিজ হইতেই এই সৃষ্টির উৎপাদক। 'সর্বকারণ-কারণ' বিশেষণ ব্রহ্মের এই সর্বশক্তিমত্তা ও স্বাতন্ত্র্যকেই প্রকাশিত করিতেছে। পূর্বোক্ত ষাড়্‌গুণ্যের মধ্যে "জ্ঞানই" পরব্রহ্মের উৎকৃষ্টরূপ, শক্ত্যাদি অন্য পাঁচটি গুণ জ্ঞানেরই গুণ হওয়াতে সর্বদা তৎসম্বদ্ধ থাকে।

এতে শক্ত্যাদয়ঃ পঞ্চগুণা জ্ঞানস্য কীর্তিতাঃ।
জ্ঞানমেব পরং রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥
(অহি সং, ২।৬১)

শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা বলেন,—

শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্‌স্থিতাঃ।
স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্যতস্তু তাঃ।
সূক্ষ্মাবস্থা হি সা তেষাং সর্বভাবানুগামিনী॥

সর্ববস্তুর শক্তি অচিন্তনীয় এবং তাহা বস্তু হইতে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত। শক্তির স্বরূপ কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কার্য দ্বারা আমরা তাহার অস্তিত্ব জানিয়া থাকি। শক্তি পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহা সর্বপদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে।

ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহারা অপৃথক্, শক্তি ব্রহ্মের আত্মভূতা।

এবং ভগবতস্তস্য পরস্য ব্রহ্মণো মুনে।
সর্বভাবানুগা শক্তির্জ্যোৎস্নেব হিম-দীধিতেঃ॥
(৩।৪)

ব্রহ্মের এই আত্মভূতা শক্তি নানা শাস্ত্রে নানা নামে অভিহিতা হইয়াছেন, যথা আনন্দা, স্বতন্ত্রা, নিত্যা, ব্যাপিনী, পূর্ণা, লক্ষ্মী, শ্রী, পদ্মা, কমলা, বৈষ্ণবী, কুণ্ডলিনী, অনাহতা, গায়ত্রী ইত্যাদি। এই সমস্ত নাম পরাশক্তির অনন্ত বিভব খ্যাপন করিতেছে।

নামধেয়ৈরিয়ং তৈস্তৈঃ নানাশাস্ত্রসমাশ্রয়ৈঃ।
অন্বর্থৈর্দর্শিতাশেষবিভবা বৈষ্ণবী পরা॥ (৩।২২)

পাঞ্চরাত্র আগমে ব্রহ্মের পরা শক্তি সাধারণতঃ "লক্ষ্মী" নামে অভিহিতা।

লক্ষ্মী শক্তি, ভগবান বিষ্ণু শক্তিমান্। ধর্ম ও ধর্মী, অহন্তা ও অহং, চন্দ্রিকা ও চন্দ্রমা, আতপ ও সূর্যের মতই শক্তি ও শক্তিমানে অবিনাভাব সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলেও বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মধ্যে অদ্বৈতভাব সত্ত্বেও একটা দ্বৈতভাব নিত্য বর্তমান। প্রলয়-কালেও তাঁহারা সর্বতোভাবে একীভূত হইয়া যান না, তাঁহারা যেন একটি তত্ত্বরূপে অবস্থান করেন মাত্র—"ব্যাপকাবত্তিসংশ্লেষাদেকং তত্ত্বমিব স্থিতৌ" (৪।৭৮)। অহির্বুধ্নসংহিতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অদ্বৈত ভাবের মধ্যেও একটা দ্বৈতভাব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন,—

দেবাচ্ছক্তিমতো ভিন্না ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
এষ চৈষা চ শাস্ত্রেষু ধর্ম-ধর্মিস্বভাবতঃ॥ (৩।২৫)

এই বিষ্ণুশক্তির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

উদধেরিব চ স্থৈর্যং মহত্ত্বেব বিহায়সঃ।
প্রভেব দিবসেশস্য জ্যোৎস্নেব হিমদীধিতেঃ ॥
বিষ্ণোঃ সর্বাঙ্গসম্ভূতা ভাবাভাবানুগামিনী।
শক্তির্নারায়ণী দিব্যা সর্বসিদ্ধান্তসম্মতা ॥

(৩।২৩-২৪)

বৈষ্ণবী শক্তির স্থৈর্য সমুদ্রের মত, মহত্ত্ব আকাশের মত, প্রভা সূর্যতুল্য এবং জ্যোৎস্না চন্দ্র-তুল্য। বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূতা এই দিব্যা নারায়ণী শক্তি সমস্ত ভাব ও অভাব পদার্থে অর্থাৎ জড় ও অজড়ে অনুপ্রবিষ্টা, ইনি সকল সিদ্ধান্ত কর্তৃক প্রতিপাদিতা।

প্রলয়াবস্থায় আদিকারণ পরব্রহ্ম নারায়ণই বর্তমান থাকেন। বিশ্বজগৎ বীজাকারে তাঁহাতে লীন থাকে। জ্ঞানাদি ষাড়্গুণ্য তখন স্তিমিত, বায়ুবিক্ষোভহীন নিথর নিষ্কম্প আকাশবৎ ব্রহ্ম অবস্থান করিয়া থাকেন।

প্রসুপ্তাখিলকার্যং যৎ সর্বতঃ সমতাং গতম্।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম সর্বাবাসম্ অনাহতম্ ॥
পূর্ণস্তিমিত-ষাড়্গুণ্যম্ অসমীরাম্বরোপমম্।

(৫।২-৩)

ব্রহ্মের এই যে স্তিমিতরূপ—এই মহাশূন্যতা—ইহা শক্তিরই অবস্থা-বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে "তস্য স্তৈমিত্যরূপা যা শক্তিঃ শূন্যত্বরূপিণী" (৫।৩)। প্রলয়কালে শক্তি ব্রহ্মের সহিত যেন একীভূতা হইয়া তাঁহাতে অব্যক্তভাবে অবস্থান করেন।

ভগবান্ বিষ্ণুর আত্মভূতা, স্বাতন্ত্র্যশক্তিরূপিণী লক্ষ্মী প্রলয়ান্তে কোনও অচিন্ত্যকারণে 'উন্মেষ' প্রাপ্ত হইয়া জগৎরচনা-ব্যাপারে প্রবৃত্তা হইয়া থাকেন।

স্বাতন্ত্র্যাদেব কস্মাচ্চিৎ কচিৎ সোন্মেষমৃচ্ছতি।
আত্মভূতা হি যা শক্তিঃ পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ ॥

(৫।৪)

পৌরুষী রাত্রির (Cosmic Night) অষ্টম বা শেষভাগে ভগবানের পরাশক্তি যেন তাঁহারই অভিপ্রায়মত জাগ্রতা হইয়া চক্ষু উন্মীলন করেন। লক্ষ্মীর এই যে উন্মেষ বা চক্ষুর উন্মীলন, ইহাকে অনন্ত বিস্তীর্ণ মহাকাশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে।

দেবী বিদ্যুদিব ব্যোম্নি কচিদ্যোততে তু সা।
শক্তিবিদ্যোতমানা সা শক্তিরিত্যুচ্যতেঽম্বরে ॥

(৫।৫)

পরাশক্তি লক্ষ্মী সৃষ্টিকালে "ক্রিয়াশক্তি" ও "ভূতিশক্তি"—এই দ্বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি "ভূতিশক্তি"রূপে জগৎ আকারে প্রকাশিতা হন এবং "ক্রিয়াশক্তি"রূপে জগৎকে প্রাণবন্ত করেন এবং ইহাকে পরিচালনা করিয়া থাকেন।

অভেদ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

বুদ্বুদ কহে সাগরে ডাকিয়া
"আমি কি তোমা বিহীন ?
তোমার বুকেতে জনম লভিয়া
তোমাতেই হই লীন।"

* * *

"তোমা বিনা আমি শুধু বায়ু বয়ে
ভেসে যাই সমীরণে,
কভু নীলাকাশে কভু প্রান্তরে
কভু বা গহন বনে।"

* * *

ভকত কহিল "ওগো ভগবান্
তুমি আমি ভিন নই,
তোমারই খেলার সাথী তবু সদা
মায়ার অধীনে রই।"

"তোমার আমার ভেদ ভেঙে দিয়ে
কর মোরে মহীয়ান্,
শরণ তোমার লই যেন প্রভু
যতদিন থাকে প্রাণ।"

* * *

অষ্ট্রিয়ার পথে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আবার গর্জন করে উঠলো আমাদের গাড়ি।

অনুমতি পেয়ে গেছি আমরা অষ্ট্রিয়ায় ঢোকবার।

আমরা অর্থে সবশুদ্ধ তেরো জন। ছ'জন পুরুষ, সাত জন স্ত্রীলোক।

পুরুষদের মধ্যে কয়েকজনের নাম—পি এস সাণ্টার, ই বেথেল, এ রবার্টসন, এফ জি মিচেল। আর মেয়েদের মধ্যে: মিস এম এ কটন, মিস বি সি জোন্স্, মিসেস জে আর জেবসন, মিসেস জে ক্যানাডি, মিসেস এ রবার্টসন ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই ইংরেজ। সকলেই লাল টকটকে। তার মধ্যে আমি শুধু এক ভারতীয়। এক কালো। আমাদের দলটির পরিচালনার ভার নিয়েছে যে কোম্পানী তার নাম সুপারওয়েস। (Superways). ৫।৬ সারউড্ ষ্ট্রীট, লণ্ডন।

যে তুলনায় বাসটা বড়, সে তুলনায় মানুষ খুবই কম। গদিমোড়া সুন্দর সুখাসন। হেসে-খেলে যে যেখানে ইচ্ছে বসতে পারে। আর এমন ভাবে এ দেশের বাসগুলো তৈরি যে চট্ করে ভিতরে ঠাণ্ডা আসে না। চারিধার বন্ধ কাঁচ দিয়ে। অথচ আলো আসায় বাধা নেই।

আমাদের দেশে বিধবা মেয়েরা যেমন একজনের নেতৃত্বে তীর্থযাত্রা করে, আমরাও ঠিক সেই ধরনের তীর্থযাত্রী। আলফ্রেড বার্স্‌টিন (Tour Manager and interpreter) হচ্ছেন আমাদের কর্ণধার, আমাদের নেতা। এ দেশে তীর্থযাত্রা হচ্ছে এইটেই। চলো জার্মানি, চলো নরওয়ে, চলো চেকোশ্লোভিয়া। একবার গরম কাল এলে আর রক্ষে নেই। তীর্থযাত্রার হিড়িক পড়ে যায়। আত্মার মোক্ষ এদের কাম্য নয়। চক্ষুর চরিতার্থতাই এদের বিলাস। কোথাও কোনো দেবতার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়া নয়। অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের পথে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার আত্মচেতনা। মিসেস জে ক্যানাডি যুবতী নয়। একটি বৃদ্ধা রমণী। নাক দিয়ে তার সময় সময় রক্ত পড়ে। অথচ তাকেও আসতে হয়েছে তীর্থদেবতার এই একান্ত এষণায়। দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

এই কদিনে ভ্রমণটা কি কম হল? বাস সেঁা সেঁা শব্দে এগিয়ে গেছে। আলফ্রেড বার্সটিন দাঁড়িয়ে উঠে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন। বেথেল সিগারেট বিতরণ করেছে। ক্যানাডি চকোলেট খেতে দিয়েছে। মিস কটন জলন্ত দুপুরে ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে খাইয়েছে। পাইনি কি? যা আমার আত্মীয় স্বজন করে থাকে, যা আমার বন্ধুবান্ধব করতে দ্বিধা করে না, এরা আমার জন্য তাই করেছে। একটা মধুর সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছে, সুস্পষ্ট হয়েছে এদের সঙ্গ পেয়ে। কে বলে আমি বিদেশী? দেশে-দেশে যে আমার ঘর আছে, আমার আত্মীয় আছে, তার সন্ধান যদি না রেখে থাকি—সেকি অপরের দোষ? কদিনে কী

কম জায়গা দেখা হল? লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশন থেকে শুরু করে—উঁচু-নিচু পথে দোল খেতে খেতে বাস এসে দাঁড়িয়েছে ডোভারে। তারপর ডোভার প্রণালী পার হতে হয় স্টীমারে। এল অস্টেণ্ড, ব্রুগেস, ঘেণ্ট, বেলজিয়াম।··

তারপর বেলজিয়াম ছাড়িয়ে জার্মানির পথ। এড্‌লফ হের হিটলারের দেশ···

কোলন, সেন, বপার্ড, রাইন, বিন্‌গেন্‌, মাইনৎস্‌ ডার্মস্টাট্‌, আসফেন্‌বুর্গ, ভুর্‌ৎসবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফার্ট, নুর্ণ্‌বার্গ, ম্যুনিক···

তবু ভরেনি ত চিত্ত!···

এখনো কতো দেশ সম্মুখে সুপ্রসারিত। কতো দেশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কতো দ্বীপ, কতো দুর্গ, কতো প্রান্তর···কতো পরিখা···

সুইটজারল্যাণ্ড, জুরিখ, জেনেভা, ফ্রান্স, ল্যাক্সেমবার্গ, লিচটেনস্টাইন···

একে একে সবগুলো ঘুরে তবে তো আবার লণ্ডন! শেষ কোথায়? এই তো শুরু···

কিন্তু যা বলছিলাম···

একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে বাস চলতে লাগলো। যতোক্ষণ না সুড়ঙ্গ শেষ হল, রুদ্ধ-নিশ্বাসে বসে থাকতে হল প্রাণটি হাতে করে। একটা ভারী, বিশমনি পাথরের চাঁই ধ্বসে পড়লেই নিশ্চিন্ত। এই সুড়ঙ্গটিকে বলা হয় ফার্ণপাশ (Fern pass)। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারিধার অন্ধকার। কানে শুধু অনুভব করছিলাম—বসে বসে গাড়ি চলার শব্দ। এই অন্ধকারে কি ইংরেজ, কি ভারতীয়—সবাই সমান। সকলকারই গায়ের রঙ তখন এক। সকলকারই মনের ভাষা তখন অভিন্ন।

সুড়ঙ্গ যখন পার হলাম, বাইরে এসে দেখি আকাশ অন্ধকার। আর চারপাশে কি পাহাড়ের সৃষ্টি।

যেখানে অধিক পাহাড়ের প্রাবল্য, সেখানে আলোর আশ্বাস নিরর্থক। গাছে বৃষ্টি পড়ছে, আগাছায় বৃষ্টি পড়ছে। অরণ্যে বৃষ্টি পড়ছে। ড্রাইভারের চোখের সামনে যে কাঁচের শার্শি—তার উপরও বৃষ্টি পড়ছে। আবছা হয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টিপথ। উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার (Windscreen wiper) চলতে লাগলো। ঘন ঘন মুছে দিতে লাগলো কাঁচের উপর থেকে জলবিন্দু। বড়-বড় ফোঁটা ফোঁটা পানবসন্তের গুটির মতো। রাস্তা ভিজে উঠলো বারিবর্ষণে।

গলফ্‌ ক্লাব পার হলাম।

পার্বত্য প্রদেশের কয়েকটি বাড়ি যেন হাত বাড়িয়ে ধরে নিতে চাইল। কোনো বাড়ির জানালা বন্ধ করছে কোনো গৃহিণী। কোনো স্ত্রীলোক হাতলওয়ালা বুরুস দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে।

ঝাউগাছের মতো একরকমের গাছ। বৃষ্টিতে তার পাতাগুলি কাঁপছে।···

আছাড় খেয়ে পড়ছে নবীন আঙুরলতার সবুজ শাখা-প্রশাখা।

এ পর্যন্ত বেশ সহ্য করা যাচ্ছিল; আর বোধ হয় পারা গেল না। ছিঁড়ে পড়তে চাইল শিরা-অনুশিরা ভয়ে, আশঙ্কায়।—নূতন পরিবেশ, নূতন পৃথিবীর ভীতিকর পার্শ্বপরিবর্তনে। মনে হল আজকের জন্যই বোধ হয় জীবনধারণ করেছিলাম। কাল আর থাকব না। শচীনদার কথা বার বার মনে আসছিল।—

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মাইতি আমার লণ্ডনের রুমমেট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টো সাবজেক্টে এম-এ পাশ করে তিনি এখন লণ্ডনে এসে রিসার্চ করছেন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে।···

সেদিন ৯ই আগষ্ট, ১৯৫৫ সন।

আমাকে সুপারওয়েসের বাসে তুলে দিতে এসে কতো প্রার্থনাই জানিয়ে গেছলেন শচীনদা। আমি আমার মা-বাবার একটি মাত্র ছেলে। বাবা বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন। কলকাতায়

বাসায় আজ আমার অসহায়, বিধবা মা বসে বসে দিন গুনছেন। কবে আমি সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আবার দেশে ফিরবো!...অকূল সমুদ্রে আমাদের জাহাজখানাকে দেখাবে মোচার খোলার মতো! আমার চাঁদমুখ (?) দেখে মায়ের দেহে প্রাণ ফিরে আসবে! কতো ঠাকুর দেবতার কাছে মা মানত করে রেখেছেন। আমি ফিরলে মা পুজো দেবেন! যেন আমি শিশু। একান্ত অসহায়। তাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী শচীনদা বলেছিলেন, ভগবানের নাম নিয়ে চলাফেরা কোরো। ঈশ্বরই তোমায় রক্ষে করবেন। আবার দেখা হবে।

বাস ছেড়ে দেবার সময় শচীনদার চোখদুটি ছলছল করে উঠেছিল।

শচীনদার অভয় বাণীতে কী ইঙ্গিত ছিল সেদিন, জানি না। কিন্তু ভয় পেতে লাগলাম বারবার। কোন্ এক অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে না জীবন শেষ হয়ে যায়!

আকাশে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। মুহুর্মুহু বজ্রপাতের শব্দ হতে লাগলো। পাহাড় ফাটানো বজ্রের শব্দ কী নিদারুণ। লণ্ডনে বজ্রকে চিনেছি। বাংলাদেশের বজ্র আর বিলেতের বজ্র— এক নয়। দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। বাংলা দেশের মানুষ—মাটি—সবই যেমন নরম, বজ্রও তেমনি নিস্তেজ। বাংলাদেশের কৃষক, মজুর বজ্রপাতের সময় মাঠে কাজ করে, জমিতে লাঙ্গল দেয়, চালে উঠে গোলপাতার ছাউনি বাঁধে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে যায়। পুকুরের আল বাঁধে। য়ুরোপের বজ্র কিন্তু মারাত্মক। তার মনের মধ্যে কোথাও কোমলতার লেশমাত্র নেই। সে দুর্ধর্ষ, সে দুরন্ত, সে উদ্ধত। কদিন আগেই তো একটা বিলাতি দৈনিকে দেখেছি, বজ্রপাতের ফলে অনেক লোক মারা গেছে। রেসকোর্সের মঠে বজ্র আর বিদ্যুতের ফলে বহুলোক জখম হয়েছে। এরকম একটা নয়—বহু ঘটনাই ঘটে। বিলেতের মতো বিরলপর্বত স্থানে যদি এই ঘটনা ঘটে, তবে না জানি এই ঘন পাহাড়ের এক্তিয়ারে— ঘন পাহাড়ের শাসনযুক্ত এলাকায় আমাদের কি হাল হবে! এই দুর্যোগ কী শুধু আমাদের জন্যই? এই দুর্যোগের মধ্য দিয়েই কী আজ পাহাড় এগিয়ে আসছে তার অতিথিদের বরণ করতে? তার অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করতে?

ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলাম।

বাসের ছাদের খানিকটা অংশ কাঁচের। অন্য সময় সেটা একটু আলগা থাকে হাওয়াবাতাস খেলবার জন্য। এখন সেটাকে ভালো করে এঁটে—চেপে বসিয়ে দেওয়া হল।

আকাশ যেন বন্দুক দাগতে লাগলো। বিকট শব্দ উঠতে লাগলো পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে। কড়াক · কড়াক...যেন কেউ গুলী ছুড়ছে একদল নিরীহ পক্ষিশাবকের উদ্দেশ্যে।

পাহাড়ের উপর শাদা ধোঁয়া। ধোঁয়া নয়। এটাকেই বলে তুষার। মেঘের সঙ্গে তুষার এক হয়ে যেতে লাগলো। আমার জীবনে এই প্রথম তুষার দেখলাম।

জার্মান-বর্ডার পার হলাম।

অষ্ট্রিয়াতে ঢুকবো। পাশপোর্ট বার করতে হল। গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। রাস্তার পাশ দিয়ে কুল-কুল করে তখন জল গড়িয়ে চলেছে। অন্য দু'একখানা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। তাদের—আমাদেরই মতো অবস্থা। ড্রাইভার নেমে গেল সেই বৃষ্টি ও বিদ্যুতের মধ্যই গায়ে বর্ষাতি জড়িয়ে। অষ্ট্রিয়াপুলিশ একবার আমাদের বাসের গা ঘেঁসে চলে গেল। সকলের গতিই ত্রস্ত। মোটর সাইকেলের গর্জন, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির শব্দ— সবগুলো মিলিয়ে একটা অপরূপ সংঘটন!

আবার গর্জন করে উঠলো আমাদের গাড়ি।

আমরা অনুমতি পেয়ে গেছি অষ্ট্রিয়ায় ঢোকবার। এদিকে আকাশের অবস্থা তো সাংঘাতিক।

কখন যে বৃষ্টি আর বজ্রপাতের ঘনঘটা থামবে, তারই অপেক্ষায় দুর্গানাম জপ করছিলাম।

দেখতে দেখতে বাস এগিয়ে চলল।

দু'পাশে বিজন বন। কোথাও পাহাড় থেকে ঢল নামছে ঝির ঝির শব্দে। একটা পোষ্টার দেখলাম। তাতে লেখা : NOCH 19/5. KLM.

আর একটা পোষ্টার। তাতে লেখা : GOLF HOTEL. GARMISCH.

মনে হল একটু এগোলেই পাহাড়। কিন্তু দূর ছিল।······

দু'পাশে দুসারি উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ।···

তার মধ্য দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম অস্থিরায়। আবার সেই অন্ধকার, বিজন মৃত্যুর মতো। আমরা মৃত্যু থেকে মহাজীবনের পানে এগিয়ে চললাম।

গিরিপথ যখন পার হলাম, দেখি, বরফে চারিধার কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

বিরাট দৈত্যের মতো পাহাড়। তারই সম্মুখীন হলাম। কোথায় যে এর শুরু, আর কোথায় যে এর শেষ, বোঝা কঠিন। শুনলাম, জার্মানির সব চেয়ে বড় পাহাড় বলতে যেটাকে বোঝায়, এই হচ্ছে সেই পাহাড়।" "Zngspitze"-এর দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত।

১৯৫১ সালে—দলপতি আলফ্রেড মাইক নিয়ে চীৎকার করে উঠলেন : ১৯৫১ সালে একজন ভারতীয় ছাত্র এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সক্ষম হয়।

এসেছিল ইংরেজ ছাত্র। জার্মান ছাত্র। আমেরিকান ছাত্র। কেউ পারলো না। কেউ না। সক্ষম হল একজন ভারতীয় ছাত্র!

সঙ্গে-সঙ্গে হাততালি! আমার সঙ্গীরা স্মিত মুখে আমার দিকে চাইল।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠলো। যেন ভারতবর্ষের সমস্ত ছাত্রের আমিই আজ একমাত্র প্রতিনিধি! তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব আমারই স্বপক্ষে সমুপস্থিত।

বজ্রপাত বন্ধ হল।

অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশের একটা দিকে আলো ফুটে উঠেছে। বৃষ্টি তখন ধরে গেছল। একরকমের গাছ দেখলাম যার ডালপালাগুলিকে ঊর্ধ্ববাহু বলা চলে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে সেই গাছের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। তাতে তখনো বৃষ্টির চুম্বন লেগে আছে।

নেমে একটা হোটেলে কফি খেলাম। বেলা তখন চারটে।

হোটেলের কর্ত্রী—দুটি মেয়ে। ঠোঁটে রঙ নেই। অথচ কী লাবণ্যময়ী। আর তেমনি সরল। ইংরেজি তেমন জানে না। জার্মান ভাষায় কথা বলে।

হোটেল থেকে বেরোবার সময় একটা কাগজ পেলাম। তাতে লেখা : HOTEL LOWEN. FELDKIRCH. VORARLBERG. 'O'STERREICH.

ফের গাড়িতে চড়লাম।

গাড়ি এগোতে লাগলো। এবার কিন্তু আমাদের যাত্রা আরো জটিলতার পথে।

গাড়ি উঠতে লাগল পাহাড়ের গগনস্পর্শী চূড়ার ওপর। এ সেই দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত নয়। তার একটি ছোট সংস্করণ। সেখানে আঁকা-বাঁকা, পেঁচানো-পেঁচানো পথ। পথের ধারে অসমতল মাঠ। সেই মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে রাখাল বাড়ি ফিরছে। আমাদের দেশের রাখালের মতো এ রাখাল রিক্ত-বেশ নয়। এ রাখালের সাজ সাহেবের মতোই। উপায় কি? যে দেশের যা সাজপোষাক। শীত প্রধান দেশের এই হচ্ছে উপযুক্ত পোষাক। রাখালের হাতে ছোট একটা লাঠি।

গাড়ি ধীরে ধীরে উঁচুতে এগোতে লাগল। আর

আমরা শঙ্কিত হৃদয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে পথ এত সঙ্কীর্ণ যে সেখান দিয়ে দুটো গাড়ি যেতে পারে না স্বচ্ছন্দে। একটাকে থামতে হয়। Keep to the right চলেছে গাড়ি। আর, একখানা পাস করলে তবে অপরটিকে চালানো সম্ভব। যখন মোড় ফেরে তখন খুব সতর্ক থাকতে হয় ড্রাইভারকে। একটু অন্যমনস্ক হলেই কোথায় গিয়ে যে গাড়ি গুঁড়িয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। আমাদের ড্রাইভার অদ্ভুত সুদক্ষ ব্যক্তি। কোথাও কারো সঙ্গে ধাক্কা না লাগিয়ে ঠিক টেনে তুলতে লাগলো গাড়িখানাকে। আলফ্রেড চেঁচিয়ে যেতে লাগলেন, এগারো শো ফুট উঁচুতে উঠলাম আমরা।

এবার পনেরো শো ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছি···

এবার দু'হাজার ফুট উঁচুতে···

আর আমরা দাঁড়িয়ে উঠে এক একবার নিচের দিকে চাইছি।

ভয়ে মাথা ঘুরে যায়। নিচের খাদ এত নিচে যে দেখলে অন্তরাত্মা শিউরে উঠে।

কোথাও দু' পাশে সুনীল সরোবর। কোথাও বা একেবারে নিচে নীল হ্রদ।

একটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি পথের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ রকম একটা নয়। একাধিক প্রতিমূর্তি দেখলাম পাহাড়ের উপর উঠতে গিয়ে। প্রথমে দেখলে চমকে উঠতে হয়। যেন সত্যিকারের মানুষ। শিল্পীর দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবার কোনো কারণই থাকে না।

উঠে চললাম একেবারে উঁচুতে।

আলফ্রেড বললেন, তিন হাজার পাঁচশো ফুট···

একেবারে মেঘের গায়ে গিয়ে ঠেকলাম। উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে আর কিছু থাকে না।

পাহাড়টাকে কুঁদে কুঁদে পথ করা হয়েছে। মানুষের অসাধ্য আর কী রইলো ?

এবার নামার পালা।

নিচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে লাগল বাস।

বহু কাঠের বাড়ী নজরে পড়লো। নজরে পড়লো কাঠগোলা।

হিন্দুরাই মন্দির করে দেখেছি। এবার দেখলাম ক্রীশ্চানদের মন্দির। অবিকল গ্রামের পঞ্চাননের মন্দিরের মতো। এক চিলতে। ছাদ ঢালু। দরজা নেই। সে ঘরে রয়েছে মেরী মার মূর্তি। পায়ের গোড়ায় চারটি ফুল।

পথের ধারে কেউ বা কারা তাঁবু ফেলেছে। এ তাঁবু ফেলার রেওয়াজ এখানে আকছার। তাঁবু ফেলে ছেলেমেয়েরা থাকে। গ্রামোফোন বাজায়। ছুটির দিনগুলোকে অপূর্ব মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত করে তোলে। অদূরে বনালয়ের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁসে একটা ট্রেন যাচ্ছে। ট্রেনের কামরার বাতিগুলো চিক্ চিক্ করে উঠছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ট্রেনটাকে মনে হচ্ছে যেন শুঁয়া পোকা। আর বাতিগুলোকে মনে হচ্ছে—চকমকির স্ফুলিঙ্গ।

ইনস্‌ব্রুকে তখনো আসিনি। আবার একটা মন্দির পড়লো পথের পাশে। অদূরেই জলের কল।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে জল খেতে নামলো।

এই অবসরে আমিও আর পারলাম না। নেমে পড়লাম।

জুতাটা খুলেই সহসা মন্দিরে ঢুকে পড়লাম। আর ঢুকে যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। যীশুখ্রীষ্ট বসে আছেন স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধরে। এক আকাশ থেকে এ যেন আর এক আকাশ। ঠিক ঠাকুরের মতোই তাঁর সৌম্য মূর্তি। মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল। চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ। এ কি দেখলাম ? পায়ের গোড়ায় শ্বেত করবীর মতো কয়েকটি ফুল ! দুটি জ্বলন্ত মোমবাতি। কে এই পটুয়া যিনি এই যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি তৈরি করেছেন ? তাঁর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন ? কাকে স্মরণ করবো ? কার ধ্যান করবো ?

ইতিপূর্বে কয়েকদিন গির্জায় গেছি। ইংলণ্ডের গির্জায় উপাসনা-সঙ্গীত শুনেছি।

''Show me the way O Lord,
And make it plain ;
I would obey Thy Word,
Speak yet again ;
I will not take one step untill I know
Which way it is that Thou wouldst have me go."

ভাবার্থ যার :

আমারে দেখাও তোমার পথ প্রভু,
যে পথ সোজা—নয়কো বন্ধুর।
তোমার কথা ঠেলিনি নাথ কভু,
আবার বলো—শুনি সে প্রিয়-সুর॥
একটি পা-ও ফেলবো না ক' বৃথা
যে পথে তুমি না ফেলাবে মিতা,
যে পথ মোর করোনি মঞ্জুর!

সঙ্গীতের রসগ্রহণ করে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সময় সময় মন হতাশায় মুষড়ে পড়েছে। মুষড়ে পড়েছে যখন (সব নয়) কয়েকটি মুষ্টিমেয় ধূর্ত ধর্মযাজক বোঝাতে চেয়েছে, ক্রীশ্চানের ঈশ্বর অন্য জাতের নয়। অন্য জাতের ঈশ্বরকে আমরা মানি না। অথচ আমরা হিন্দু তো ক্রীশ্চানের ঈশ্বরকেও মানি। ঈশ্বর আবার দুটো হয় নাকি? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও যেমন আমাদের উপাস্য, যীশুখ্রীষ্টও তেমনি যে আমাদের ঈশ্বরের অবতার!

হিন্দু হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালাম নতজানু অবস্থায়—সেই বিজন মন্দিরের মধ্যে!

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমতী বাসনা দেবী

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'······

পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিন্তু রেখে যায় অনুপম সৌরভ, যে সৌরভ বিমোহিত করে বিশ্ববাসীকে। এ সৌরভ কেবল পবনাশ্রিত নয়, বায়ুবেগে হিল্লোলিত নয় এর সত্তা—এ সুরভি পঞ্চভূতে তৈরী; কঠিন বাস্তবতার সাথে এর যোগ, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের দ্বারা ধূপ রূপান্বিত হয় সৌরভে। ঠিক এমনিভাবে ভারতভূমিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে তুমি হয়েছিলে 'নিবেদিতা।'

মাতৃগর্ভেই আত্মবলিদানের অদম্য সঙ্কল্প যেন জেগে উঠেছিল। মহাকালের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে জন্মালেন প্রতীচীতে। কিন্তু প্রাচ্যের সাথে যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ! তা কি এড়ানো যায়? মুকুলিকা অপেক্ষা করছিল শুভ অরুণোদয়ের। এলো সময়, দীর্ঘ বিভাবরীর ঘটলো অবসান। শরতের সন্ধ্যায় যখন মহাযোগীবরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলো তখন সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠলো। ভারতের মহতী শাশ্বতী বাণী হৃদয়ে তাঁর আনলো এক অভিনব হিল্লোল। যুগাচার্যের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান জাগালো প্রাণে এক অপূর্ব আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। কোন্ পরশমণির স্পর্শে সম্পূর্ণ জীবনধারায় এলো এক অলৌকিক পরিবর্তন। যে ব্রতে ব্রতী হলেন তার সঙ্গে আপনাকে মুছে ফেলে রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে মহিমময়ী কীর্তি।

যে পবিত্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন যুগাবতার, স্বয়ং যাকে প্রজ্বলিত করে রাখলেন যুগাবতার-সহধর্মিণী রামকৃষ্ণগতপ্রাণা সারদা, সে পবিত্র হোমাগ্নির আহুতির জন্য এগিয়ে এলেন সুদূর পাশ্চাত্য থেকে আইরিশ কন্যা শ্রীমতী নোবেল। প্রতীচীর সাথে যোগ সারা হোল। জানালেন

মাকে তাঁর অন্তরের অভিলাষ। প্রাচ্যের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য সঙ্গী হতে চাইলেন মহাপুরুষের। ভারতের মহান হতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধিব্যবস্থার সঙ্গে যিনি পরিচিত সেই স্বামীজী বোঝালেন কত ক্লেশ হবে তাঁর এই ব্রত সাধনে, কত দুঃখ বরণ করে নিতে হবে এই আদর্শগ্রহণে, কারণে অকারণে হতে হবে লাঞ্ছিত প্রাচ্যবাসীর কাছে। প্রস্তুত হলেন মহীয়সী তাপসী সকল বাধা বরণ করে নিতে। ভারতীয় রক্তই কি প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর ধমনীতে—ভারতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ কি কখনও প্রতীচীতে থাকতে পারে। গ্রহণ করতে পারে কি পাশ্চাত্যের ভোগলোলুপ জীবনাদর্শ? ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিতা নারী এলেন ভারতে। ভারতভূমিতে আপন সত্তা বিলিয়ে দিলেন চিরতরে, শত দুঃখ, শত গ্লানি, কত বাধা, কত বেদনা সে ব্রতে আনলো না কোন ছেদ, জাগালো না কোন বিদ্বেষ। 'ভারত' 'ভারত' মন্ত্র জপে কাটলো তাঁর অগণিত দিনগুলি। ভারতীয় আদর্শে সঞ্জীবিত জীবনের শতধারা মিশে গেল ভারতে, প্রস্ফুটিত শতদল ভারতমাতার পদতলে করলো আপনাকে উৎসর্গ।

অনাঘ্রাত, অনবদ্য জীবনকুসুম চয়ন করা হল ভারতমাতার আরাধনায়। চিত্তের মণিকোঠায় সোনার বীণাতে যে একটি তন্ত্রী অবাদিত ছিল সেই অবাদিত তন্ত্রীতে এলো সুরের রেশ। ভারতের অভিনব উদাত্ত মন্ত্রে সে হৃদয় তন্ত্রী বেজে উঠলো। যে ত্যাগের মন্ত্র প্রতীচীর কাছে চিরনূতন, সেই ত্যাগের ধ্বনি ভারতে নিত্য সনাতন এই পুণ্যভূমির চিত্তবীণায় যুগে যুগে ধ্বনিত হয়েছে সেই মহতী শাশ্বতী বেদবাণী "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

নূতন সুর জীবনে ধ্বনিত হলো, অতীত জীবনের সব বিসর্জন দিয়ে চলে এলেন নিবেদিতা; কঠোর ব্রত হাসিমুখে তুলে নিলেন আপন শিরে। অশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে জর্জরিত ভারতভূমি, বিশেষ করে ভারতীয় নারী আপন গৌরব বিস্মৃত হয়েছে, স্বমর্যাদা থেকে সে হয়েছে স্খলিত, মহিমময় ঐতিহ্য বহুকাল ধরে কেউ তুলে ধরেনি তাদের সামনে, কেউ জানায়নি তাদের আপন সংস্কৃতির রত্নপেটিকার সন্ধান।

যে ব্রত গ্রহণ করবেন তাপসী মহীয়সী, তার পূর্বে যে চাই ব্রত উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি—গুরুর বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—"ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক্ রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।" (ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত পত্র, আলমোড়া, ১৯।৭।১৮৯৭)।

গুরুর সতর্কবাণী ও আশিস অন্তরের অন্তস্তলে অতি সংগোপনে রক্ষা করে ব্রতী হলেন আপনার সাধনায়।

সাধনার পূর্বে চাই সাধনোপযোগী শিক্ষা ও দীক্ষা। কর্মকলরবে যে চিত্ত ক্লান্ত হবে তাকেই আগে দিতে হবে অনন্ত প্রশান্তির আহ্বান; এ নীরবতার ইঙ্গিত কোথা হতে আসবে? কে আনবে এ প্রশান্তির বাণী? 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন'—সেই ইহ-পরকালের সহায়সম্পদ গুরুই দেবেন তার সন্ধান। সরবতায় মধ্যে নীরবতার বাণী এনে দিলেন, তিনি—কর্মমুখর, কীর্তিবহুল জীবনেও যে অন্তরের আহ্বান ধ্বনিত হয়, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকা যায় তার পথ দেখিয়ে দিলেন।

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকূলে, পূতপ্রশান্ত প্রকৃতির মাঝে, কর্মকোলাহল হতে অতি দূরে নির্জন তপোবনে ভারতের আদর্শভূতা মহিমময়ী নারী ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিতা হলেন। গুরু শিষ্যার অপূর্ব মিলন সংঘটিত

হলো। এরই সাথে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের আর্যঋষির আশ্রমপ্রাঙ্গণের অতীত স্মৃতি—যেখানে সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো বেদের জয়গাথা—শিষ্য-শিষ্যা প্রবৃন্দ সব দিয়ে সব পাওয়ার মন্ত্র লাভ করতো। গুরুর কাছে ভগিনী লাভ করলেন সেই সব দিয়ে সব পাওয়ার মন্ত্র। বেদান্তরবির প্রভায় নিবেদিতা-কমলকলি শতদলরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। কমলের পেলব স্পর্শ অনুভূত হোলো কর্মবৈচিত্র্যে আর বেদান্ত-সূর্যের প্রভাব আপন প্রখরতার পরিচয় দিয়ে গেল অপূর্ব তেজস্বিতায়। গুরুর এই হলো অভিনব দান, অনুপম আশীর্বাণী ঐহিক সম্পদের সাথে নাহি তার যোগ, নাহি তার তুলনা, সে যে চিরন্তনী।

অতি বিচিত্র পুণ্যভূমি এ ভারতবর্ষ—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। অগণিত স্রোতস্বিনী বিধৌতা ভারতভূমি। অনাদিকাল থেকে কত বিচিত্রতা নিয়ে এ ভারত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যে মাতৃমূর্তি এ ভারতের বুকে আলিঙ্গিত রয়েছে, তারই গাম্ভীর্য অটুট রাখার জন্য দুই অনন্তস্বরূপ যেন বদ্ধপরিকর। দেবীদেহে পূতা এই ভারতমাতার চরণতল ধৌত করার জন্য বীচিবিক্ষুব্ধ অসীম জলধি অধীর আবেগে যুগযুগান্তর ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর যোগাসনে রত ধ্যানগম্ভীর শুভ্রতুষারাবৃত হিমগিরি কি এক মহান তত্ত্ববিকাশের জন্য চিরবিরাজিত।

"পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম।
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গনিবারে পারে।"

কবির ভাষা মুখরিত হয়ে উঠেছে এ মহান উদার সৃষ্টির অপরূপ বর্ণনায়। কত ছন্দে, কত বন্দে, কত নব ভঙ্গিমায় গেয়ে গেছে কত প্রেমিক কত ভাবুক এই অনন্তের জয়গান। একাধারে সৃজন নাশনের অপূর্ব লীলাময় মহাদেব যেন সতীদেহরূপ ভারতভূমিকে আপন ক্রোড়ে সযত্নে রক্ষা করছেন। প্রেমিকের কণ্ঠে লীলায়িত ছন্দে ধ্বনিত হয়—

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ
নমঃ শিবায়॥

এই অপূর্ব লীলাময় স্থানে আপন সত্তায় অনন্তের মহিমা যথাযথ অনুভব করবার জন্য এলেন নিবেদিতা। প্রশান্ত গম্ভীর হিমালয়ের পরিবেশে শ্রীগুরুর মুখে শুনলেন এ ভারতের পুণ্যগাথা, কত বিচিত্র ভাবরসে রঞ্জিত সে কথা। যে অনন্ত প্রতি জীবে বিরাজিত তারই স্ফুরণ হয় মহীয়ান বস্তুর সাহচর্যে কিন্তু এই স্ফুরণের কোন বাহ্যপ্রকাশ নেই, আছে আন্তর বিকাশ, তা রূপায়িত হয় অনির্বচনীয় আনন্দে। মহিমময়ী ভারতমাতার যথার্থ স্বরূপ অনুভব করলেন নিবেদিতা হিমগিরির তুহিন-স্পর্শে। বুঝলেন কেন স্বামীজী এনেছেন এখানে—কবির কণ্ঠ যেন প্রতিক্ষণে ধ্বনিত হলো।

'কর্মের কলরব ক্লান্ত,
কর তব অন্তর শান্ত'

এই অন্তর্মুখীনতাই ভারতের সম্পদ, অনন্তের সাথে অনন্তের মহামিলনই পরম পুরুষার্থ কিন্তু মিলন-সেতু কি? অন্তর্মুখীনতা।

নিবেদিতা জানতে পারলেন স্বামীজীর ইঙ্গিত—চিত্ত সমাহিত করলে তবেই কর্মে অধিকার। অন্তরের সাথে প্রকৃত যোগ আনয়নের অনুকূল স্থান যেখানে পুণ্যতোয়া তরঙ্গরাজিকল্লোলিতা জাহ্নবী এক অনন্তের উপর আপন হিল্লোল জাগিয়ে আর এক অনন্তের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অভিনব প্রয়াসে ব্যাপৃতা। কত যোগীন্দ্র, ঋষিমুনীন্দ্র এই অনুকূল পরিবেশে স্বস্বরূপের উপলব্ধি করে গেছেন। কত তপস্বী এখনও গিরিরাজের গহ্বরে অধিষ্ঠিত থেকে স্বানুভূতির চেষ্টায় রত রয়েছেন। নিবেদিতার মানস-চিত্রপটে সেই পবিত্র ধ্যানমূর্তিসকল উদিত হলো। মহীয়সী যে সাধনায় রতা হবেন তারই অনুকূল চিত্রদর্শনে আনতশিরে তাঁদেরই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন।

প্রকৃতির অপরূপ লীলাক্ষেত্র উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করে নিবেদিতা ফিরে এলেন—সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চিত্তসমাহিত করার অতুলনীয় সম্পদ—অন্তর্মুখীনতা, কর্মমুখর দিনগুলোর মাঝে এই অন্তর্মুখীনতাই দেবে চিত্তের প্রসাদ, আনবে অনির্বচনীয় প্রশান্তি।

জগতে অতি সামান্য বস্তুর মধ্যে বিরাট ও মহৎ কার্যের সম্ভাবনা আত্মগোপন করে থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে সেই সামান্যের বিচার করলে অনেক সময় অভ্রান্ত উত্তর পাওয়া যায় না। অতি দীনতম কার্যের শুরু যেখানে মহত্তমরূপে তারই সারা—অনাড়ম্বরতার মাঝে যার জন্ম তারই ঐশ্বর্যের আভায় জগৎ উদ্ভাসিত। এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীর মধ্যে ভগিনী নির্বাচন করলেন আপন কর্মক্ষেত্র। কলকাতার সুপ্রশস্ত রাজপথে সুরম্য অট্টালিকার অভাব তখন ছিল না। স্বীয় কর্মের অনুকূল বোধ করলে তাই বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু অনাড়ম্বরের মাঝেই যে প্রকৃত প্রাণস্পর্শ লুকিয়ে থাকে, ঐশ্বর্যের সুদীপ্ত ছটায় সে আন্তরিকতার সাবলীল গতি ব্যাহত হয়ে যায়। মাটির বাড়ীর বেল, জুঁই, মল্লিকা ফুলের স্নিগ্ধ পরিবেশ কি কখনও সমান হতে পারে ইঁট কাঠে ঘেরা প্রাসাদের সাথে? যে দেশে ভগিনী এসেছেন আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে, সে দেশ যে চিরকাল বহুমূল্য সম্পদও ছেঁড়া কাঁথায় জড়িয়ে রাখতে শিখেছে। অমূল্য রত্ন রক্ষা করার জন্য অমূল্য আধারও সংগ্রহ করতে হবে তার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ভগিনী নিবেদিতা এ রহস্য বুঝে নিয়েছিলেন। তাই তো অবহেলিত নরনারীর মাঝে খুঁজে পেলেন তাঁর উপাস্যকে। অজ্ঞতা, মূর্খতা, দীনতা, হীনতার মাঝে লুকিয়ে আছে সেই "শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত সংস্কারে সেই আনন্দময়ের সত্তা যেন লুপ্তপ্রায়, বিস্মৃতির অন্তরালে বিরাজিতা শক্তিকে জাগাবার প্রয়াস করলেন ভগিনী, তার জন্য উদ্ভাবন করলেন এক অভিনব পন্থা। ভারতের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস বলে যেতে লাগলেন মেয়েদের কাছে—ভারতীয় নারীর অপূর্ব তেজস্বিতার কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রোতার প্রাণ হিল্লোলিত হলো। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী পদ্মিনী, রাণী ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রার অপূর্ব পুণ্যগাথা যেন মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করলো। অন্তরের নিবিড় স্পর্শে সঞ্জীবিত কাহিনী বলতে বলতে নিবেদিতা বিভোর হয়ে যেতেন। হৃদয়ের সব অনুভূতি দিয়ে যে ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করেছেন সেই আদর্শের সম্মোহিনী শক্তি যে সব নারী-চরিত্রে অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে সে সকল শ্রবণে হতচেতন ভারতললনার অন্তরাত্মা যে জাগরিত হবে তা'তে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিদাঘের তপ্ত দ্বিপ্রহরে কোটি কোটি প্রাণ মুমূর্ষু—নিদাঘের শ্রেষ্ঠ অবদান ক্লান্তি ও অবসাদ। কিন্তু সাধনায় রত প্রাণ, তার না আছে শ্রান্তি না আছে কর্ম অবসান। অপ্রশস্ত পল্লীর মধ্যে আরামবিহীন নির্জন কক্ষে কর্মবহুল অগণিত দিনগুলো কেটে গেছে। যে বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন তার অর্থাভাব। অর্থভিক্ষা সহজ নয় কারণ তখন তথাকথিত শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় এ আদর্শে বিশ্বাসহীন। সামান্য অতি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের মধ্যে ভগিনী যে মহান পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখছেন তখনকার দেশবাসীর পক্ষে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সে চিন্তা করা সম্ভব নয়। প্রতীচীর ভাববন্যা তখন দেশকে প্লাবিত করেছে। বিদেশীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব তখন জয়যুক্ত হয়েছে। সুতরাং অর্থোপার্জনের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। গ্রন্থরচনায় অপূর্ব কৌশল জানা ছিল নিবেদিতার। ভাষার সাবলীল ভঙ্গিমায় ও ভাবের অনবদ্য বিকাশে অগণিত গ্রন্থ রচিত হলো। তার বেশীর ভাগই

ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় জীবনযাত্রা, ভারতের শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন। ভগিনীর শিল্পী মন অলৌকিক ভাবে প্রকাশিত হলো তাঁর রচনার মধ্যে। শিল্পকলায় ভারতের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। ভারতীয় শিল্পকলায় যে গূঢ় তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সুদূরপ্রসারী শিল্পী মনের কাছে তা যথাযথ ভাবে ধরা পড়লো। শিল্পের অতি সূক্ষ্ম রহস্যও সে সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে এড়ালো না।

এক অভিনব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হলো শিল্পী মনের কাছে। ধর্মই যে জাতির প্রাণ সে জাতির শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যে তারই ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হবে।

ভারতের প্রথিতযশা শিল্পিগণ এই শিল্পরসিকের কাছে যে কত অংশে ঋণী তার তুলনা নেই। বিদ্যালয়ের অর্থসঙ্কট দূর করবার জন্য গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হলেন কিন্তু অর্থসঙ্কট যেন গৌণ, মুখ্যরূপে প্রকাশ পেল, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য—শিক্ষা সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল তাতে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। জাতির মধ্যে নব প্রাণ সঞ্জীবিত করবার অভিনব প্রেরণা যোগালেন তাঁর রচনাশৈলীর মাধ্যমে।

নীরবতার শক্তিই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—চিন্তার নৈপুণ্যে ও ব্যাখ্যার বিচিত্রতায় তাঁর অতুলনীয় অবদান ভারতবাসী তখন বুঝতে পারেনি। দৈহিক মানসিক কত ক্লেশ সহ্য করে দিনের পর দিন ব্যাপৃতা রয়েছেন গ্রন্থরচনায়। যে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন ভারতবাসীকে সেই প্রাণস্পর্শ আবেগভরে ফুটে উঠেছে লেখনীর মূর্ছনায়। জীবনবীণায় যে সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে সে সুরঝঙ্কারে গ্রন্থরাশিও অলঙ্কৃত হয়েছে।

শতদলে প্রস্ফুটিতা নিবেদিতা-মুকুলিকা বেদান্ত-রবির অভীমন্ত্রে জাগরিতা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে প্রবৃত্ত নরনারীর সহায়তায় আপন সামর্থ্য প্রয়োগ করলেন। দাসত্বের বন্ধন যে দেশবাসীর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল—পরবশতার গ্লানি দূর করবার জন্য যখন দেশের তরুণবৃন্দের প্রাণে বৈপ্লবিক সুর বেজে উঠেছিল—ভগিনীর দেশাত্মবোধ তাদেরই সঙ্গে ঐক্যতান ধরেছিল। ভারতমাতৃকার বন্ধনমুক্তি যেন তাঁরই দেশমাতার অভিশাপ দূর করার জন্য আত্মাহুতি। সব ঝঞ্ঝা অবলীলাক্রমে সহ্য করে তরুণদের চিত্তে অসীম সাহস ও অভিনব উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন ভগিনী নিবেদিতা। বহু তরুণপ্রাণ আহুতি দিল দেশমাতার যজ্ঞবেদীমূলে। এদিকে ভগিনীর সুকুমার তনু ক্ষীণ হয়ে এলো। মহাকালের ইঙ্গিতে পঞ্চভূত ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান এলো। মনে হয় শৈলসুতার এ স্বস্বরূপের স্মৃতি না স্বস্বরূপে স্থিতি? গিরিরাজের দর্শনে যে তনয়ার স্বরূপ প্রবুদ্ধ হয়েছিল তাকে তো ফিরে যেতেই হবে গিরিরাজের ক্রোড়ে চিরবিশ্রান্তির প্রশান্ত নীড়ে।

তপঃক্লেশে ক্ষীণকায়া ভগিনী নিবেদিতা এলেন শৈলশিখরে। কর্মক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়াই ছিল আপাতদৃষ্টিতে তাঁর এ আগমনের উদ্দেশ্য, কিন্তু মহাকালের ইঙ্গিত ছিল অন্যরূপ। তপস্যা সাঙ্গ হয়েছে—শিবসাধনায় ব্রতী উমা সাধনার ফল অপূর্ব প্রেমানুভূতি লাভ করে ফিরে এসেছেন। আধিভৌতিক সম্বন্ধের এখানেই পূর্ণ বিরতি। অন্তরে অনন্ত প্রশান্তি নিয়ে শুভ্র তুষার-ক্রোড়ে বিলীন হলেন নিবেদিতা কিন্তু মানব স্মৃতিপটে হয়ে রইলেন চিরজাগরিতা।*

* আগামী ২৮শে অক্টোবর, '৫৬ (১১ই কার্তিক) ভগিনী নিবেদিতার উনননবতিতম জন্মদিন। উহার স্মরণে আমরা বর্তমান প্রবন্ধটি এবং পরবর্তী কবিতাটি ভগিনীর অমরস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ প্রকাশ করিলাম। —উঃ সঃ

নিবেদিতা

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

বাঙ্গালার দিগ্বিজয়ী বীরপুত্র বিবেকানন্দের
পুণ্য অভিযান-জিতা সেবা-লক্ষ্মী :—মহাভারতের
আত্মার আত্মীয় তুমি। পশ্চিমের রাজসাদ্রি-চূড়ে
জন্মিয়াও তুমি তাই ছুটে এলে এই এত দূরে
হিন্দুভারতের পূতসিন্ধু মাঝে আত্মসমর্পণ
করিতে, গঙ্গোত্রী-গুহা-নিঃসারিত গঙ্গার মতন
মহীয়সী ভগ্নী নিবেদিতা,
বাঙ্গালী ভ্রাতার প্রীতি শ্রদ্ধাঞ্জলি লহ সুচরিতা।

সাগরপারের জ্ঞাতি, শুভক্ষণে শ্রবণে তোমার
পশিল উদাত্তবাণী ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার।
আনন্দে বিস্ময়ে হলো বিকশিত চিত্তশতদল—
বিবেক-অরুণরাগে : ভোগসুখ-সম্ভোগ সকল
ধূলিসম ত্যাগ করি অকাতরে ছেড়ে পিতৃভূমি
আসিলে প্রাচীর বুকে, সুপবিত্র ত্যাগমূর্তি তুমি।
আত্মভোলা উপচিকীর্ষার
জীবন্ত প্রতিমাখানি—স্নেহ, দয়া, মমতা-আধার।

রুগ্নবিপন্নের বন্ধু, ক'রে নিলে পরকে আপন,
পরার্থে সঁপিলে নিজ চিত্ত, দেহ, জীবন, যৌবন।
দুঃসময়ে দুর্ভিক্ষে মারীতে
নগ্নপদে পথ চলি, পীড়িতের ব্যথা নিবারিতে
যোগালে ঔষধ পথ্য,—নিত্য আত্ম-ভাবনারহিতা,
মানব-মঙ্গলরতা হে মঙ্গলময়ী নিবেদিতা।

নারীত্বের পূজারিণী,—এদেশের নারীশক্তি যবে
অজ্ঞতার অন্ধকারে মুখ ঢেকে কাঁদিত নীরবে,
তোমারি দরদী চিত্ত সমদুঃখে সমবেদনায়
উঠিল অধীর হয়ে : হে বিদুষী, মায়ের মায়ায়
বসুপাড়া নিজালয়ে বিদ্যালয় করিয়া স্থাপন
মূকমুখে ভাষা দিয়া জ্ঞানালোক ঢালিয়া আপন
পরের নিরাশ প্রাণে করিলে গো আশার সঞ্চার,
"নারী বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি"—বুঝে নিলে সার।
"ধর্ম শুধু কথা নয়,—কাজ"
এ তত্ত্ব তোমারি মাঝে মূর্ত হয়ে করিত বিরাজ।
তত্ত্বজ্ঞানময়ী তুমি, ধার্মিকের তুমি শিরোমণি,
কল্যাণ কর্মীর সেরা, প্রেমসিদ্ধা আদর্শ জননী।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
সেবাধর্মরূপায়িত হলো তব পুণ্য জীবনের
প্রতিকর্মে : মর্মে মর্মে বুঝে নিলে বেদান্তের বাণী ;
"যত জীব তত শিব।"—গীতাপাঠে তুমিই কল্যাণি,
জানিতে পারিলে শুধু ত্যাগী আর ত্যাগের মহিমা,
ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মসাধনার কি যে মধুরিমা !
পরতরে মরিতে যে শিখে
মৃত্যু তারে দিয়ে যায় নিজহাতে জয়পত্র লিখে।
কালের কুটিল দৃষ্টি এড়াইয়া সে-ই হয়ে রয়
মহামৃত্যুঞ্জয় !

তুমিও মরোনি দেবি, বহুকাল চরণধূলার
পরশে সরস তব হয়নি এ কলিকাতা আর
হাওড়ার রাজপথ, তবু তুমি রয়েছ বাঁচিয়া
নিত্যকাল এদেশের জনগণ-চিত্ত আলোকিয়া
নিবেদিতা, হে ব্রহ্মবাদিনি ;
অমৃত-আস্বাদ-ধন্যা অমরাত্মা মৃত্যুবিজয়িনী।
তোমারে স্মরণ ক'রে আজো সারা ভারতবাসীর
অন্তর পবিত্র হয়, শ্রদ্ধাভরে নত হয় শির।

হিমালয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ

(আশ্বিনসংখ্যার পর)

স্বামী নিরাময়ানন্দ

এইরূপে তিন চার মাস তিব্বতের মাত্র একটি অঞ্চলে কাটাইয়া মঠমন্দির, তিব্বতীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া খ্রীঃ ১৮৮৭ অক্টোবরের শেষাশেষি গঙ্গাধর নিতিপাস দিয়া বদরী অঞ্চলে ফিরিয়া আসিলেন। পর বৎসর আবার তিব্বত গিয়া কৈলাস মানসসরোবর ও লাসা দর্শন করিবেন ভাবিয়া তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সঙ্গ ছাড়িলেন না।

শীতকালে হরিদ্বারে নামিয়া আসিয়া মাত্র ৩।৪ দিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় তিনি উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য তীর্থরাজি দর্শনমানসে উপরে উঠিতে লাগিলেন। মনোমত নির্জনস্থান পাইলে সেখানে ধ্যানধারণায় কিছুকাল কাটাইয়া হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর ভাবটি স্বীয় সত্তায় মিশাইয়া লইতেন। সর্বত্র ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা সর্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিত।

খ্রীঃ ১৮৮৮ সালের মে মাসে বদরীনাথের 'পট' খুলিতেই গঙ্গাধর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তপোভূমি হিমালয়ের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ প্রিয় বদরিকাশ্রম তাঁহাকে বার বার আকর্ষণ করিয়াছে। মানবকল্যাণ-কামনায় এইখানেই যে ভগবান স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন এবং প্রাণের ভক্তগণকে তপস্যার জন্য এইখানেই পাঠাইতেছেন। গঙ্গাধর দেখিলেন, নরনারায়ণ পর্বত রহিয়াছে, অলকানন্দাও রহিয়াছে—নাই সে বাদরায়ণি, নাই সে উদ্ধব! এই সুন্দর সুভিক্ষ পুণ্যক্ষেত্রে তিনটি মাস তপস্যায় কাটাইয়া কৈলাসদর্শনাকাঙ্ক্ষায় গঙ্গাধর এবার শিপছিলাম পাস দিয়া তিব্বতের দাবা জেলায় উপনীত হইলেন। সেখান হইতে প্রথমত তিনি পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত লাসা যাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু স্থানীয় পুলিশ তাঁহাকে বৃটিশের চর মনে করিয়া আটক করে, ব্যবসায়ী বন্ধুরা জামিন হইয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লয়। পুলিশ তাঁহাকে লাসা যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, তবে কৈলাস ও মানসসরোবর দর্শনের অনুমতি দেয়। ঐ পথেও বিপদ তাঁহাকে অনুসরণ করে, তিনি একদল ডাকাতের হাতে পড়েন, তবে বুদ্ধিপূর্বক তাহাদের গুড় ছোলা কোনও প্রকারে খাওয়াইয়া পরিত্রাণ পান।

কৈলাস ও মানসসরোবর তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে, তুষারাচ্ছন্ন মালভূমিতে অবস্থিত। কৈলাসপ্রদেশে বসতি অত্যন্ত কম। মাঝে মাঝে তুষার-ঝটিকায় শৈত্যের সীমা থাকে না। কিন্তু দেশ অত্যন্ত গম্ভীর! শান্ত নিস্তব্ধ—জনলোকের ঊর্ধ্বে এ যেন তপোলোক!

মানসসরোবর তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে তুষার গলা জলের একটি বৃহৎ স্বচ্ছ সুন্দর সরোবর, পরিধি প্রায় ৫০ মাইল, চারিপার্শ্বে ৮টি বৌদ্ধমঠ, মঠে লামাদের ও নানা দেবতার বড় বড় মূর্তি। শুভ্র তুষারমণ্ডিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গমূর্তি কৈলাস পর্বত, যেন সত্যলোকের প্রতিচ্ছবি মর্ত্যের বুকে! গঙ্গাধরের মন নিস্তব্ধ, নির্জন এই ঊর্ধ্বলোকে আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেল—এতদিন যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া এই দুর্গম গিরিপথে আসিয়াছেন আজ তাহার শেষ, আজ তাহার সার্থকতা।

কৈলাস পর্বতেরও চারিপার্শ্বে ৬টি মঠ। একটি মঠের সাধু গঙ্গাধরকে বুদ্ধের একটি আসন শিখাইয়া দেন, তাহা অতি চমৎকার। সেরূপ করিয়া বসিলে প্রথমেই শরীরে এত গরম বোধ হইবে যে গায়ে কোন আবরণ স হইবে না। গঙ্গাধর

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এরূপ আসনে বসিয়া কি করিব?' সেই সাধক উত্তর দেন, 'কিছু না, মন শূন্য কর'—যাই হোক ওই শীতপ্রধান দেশে ঐরূপ আসন শরীর রক্ষার জন্যও একান্ত প্রয়োজন।

এই দিব্যভূমিতে কিছুদিন সাধনতপস্যায় কাটাইবার জন্য এবার আর কোন মঠে না থাকিয়া কৈলাসের সন্নিকট ছেকরা নামক স্থানে তিনি লাসার এক ধনী খাম্বা (যাযাবর)-র আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এখানে একদিন তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি দেখিয়া ঐ খাম্বা বুদ্ধজ্ঞানে ভক্তিভরে উহা লইয়া যায় ও ভগবান তথাগতের সিংহাসনে রাখিয়া নিত্য পূজারতি করে।

ফিরিবার সময় গঙ্গাধর তাহাকে না বলিয়াই ছবিখানি লইয়া চলিয়া আসেন। এবারও নিতিপাস দিয়া নভেম্বরের প্রথমে তিনি আবার বদরী-নারায়ণ ফিরিলেন। পট বন্ধ হইলে এবার কুমায়ুন, আলমোড়া, রাণীখেত প্রভৃতি হইয়া কর্ণপ্রয়াগে আসিলেন এবং ঐ অঞ্চলেই শীতকাল কাটাইলেন। তুষারশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বারংবার হিমালয়ের এপার ওপার যাওয়ার দরুণ তিব্বতী ও পাহাড়ীদের মধ্যে তিনি বরফানী বাবা নামে পরিচিত হন।

এই দুই বৎসর হিমালয়ে বাসকালে বিভিন্ন সময় তিনি পঞ্চকেদার পঞ্চবদরীর যেগুলি সাধারণ যাত্রীপথের বাহিরে—সেগুলিও দর্শন করেন এবং হিমালয়ের নির্জন দুর্গম স্থানে তপস্যায় কাল কাটান। দশরথকী ডাণ্ডা নামক এইরূপ একস্থানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হন, চন্দ্রালোকিত রজনীতে একটি গান গাহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, হিমালয় পুরুষপ্রকৃতির আদিম অকৃত্রিম লীলাস্থান, শিবপার্বতীর চিরমিলনভূমি।

১৮৮৯ শীতকাল এই ভাবে কাটাইয়া দশহরায় দেবপ্রয়াগে মনমানসে গঙ্গাধর নামিতেছেন, এমন সময় (গড়োয়াল) শ্রীনগরের নীচে স্বামী শিবানন্দের সহিত তাঁহার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়। তিব্বতী পোষাকপরিহিত শীতে ঝলসানো-মুখ গঙ্গাধরকে দেখিয়া দূর হইতে তিনি প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। গঙ্গাধরই 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিতে, শিবানন্দ বলিয়া উঠেন, "গঙ্গা, গঙ্গা, তুই বেঁচে আছিস?—তোর জন্যে যে মঠে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।" তারপর দুই ভ্রাতা পরস্পরকে জড়াইয়া কাঁদিতে থাকেন। শিবানন্দ গঙ্গাধরকে নিজেদের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বলিয়া তাঁহাকেও তদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে মঠে ফিরিয়া সকলকে নিশ্চিন্ত করিতে বলিলেন।

শেষ পর্যন্ত উভয়ে কেদারের পথেই চলিলেন। কেদারের পর বদরীনাথ দর্শন করিয়া শিবানন্দ গঙ্গাধরকে আবার বরানগর মঠে ফিরিতে বলিলেন। গঙ্গাধর লাসাদর্শন জন্য পুনরায় তিব্বত গমনের কথা ব্যক্ত করিলে তিনি নিষেধ করিয়া আলমোড়া চলিয়া গেলেন, ও বরানগরে গঙ্গাধরের বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়া দিলেন।

বদরিকাশ্রমে দুই মাস তপস্যায় কাটাইয়া গঙ্গাধর নিতিপাস দিয়া পুনরায় তিব্বতে প্রবেশ করেন। এবার কিন্তু তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে চর মনে করিয়া সাহায্য করিতে নারাজ হয় এবং পূর্বের বন্ধুরাও শত্রুর মত আচরণ করিতে থাকে।

তিব্বতী পোষাক পরিলে এবং তিব্বতীয় ভাষায় কথা বলিলে তাঁহাকে তিব্বতী বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ নাসিকা দেখিয়া একদল ইরানী ব্যবসায়ীর দলপতি তাঁহাকে বলে, "ইরানী ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া যদি আমাদের দলের সঙ্গে যাও—তো আমরা তোমায় লাসা পৌঁছাইয়া দিব।" গঙ্গাধর বলিলেন "আমি ভারতীয় সাধু,—এই মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লাসা যাইতে চাহিনা।" এতবার লাসা যাইবার চেষ্টা করিয়া, বারংবার ব্যর্থ হইয়া—শেষ মুহূর্তে মিথ্যার প্রলোভনে সাফল্যের ছায়া দেখিয়াও গঙ্গাধর সত্যের প্রতি স্বাভাবিক নিষ্ঠাবশতঃ লাসা যাইবার দৃঢ় বাসনা মন হইতে

নির্মূল করিয়া কাশ্মীরের পথে লাদাকের অভিমুখে চলিলেন।

লাদাকে পৌঁছিয়া তিনি গভর্ণরের অতিথি হন; তখন তাঁহার টকটকে রং, লামার মত পোষাক, লামার মত চেহারা দেখিয়া গভর্ণর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, কিন্তু কমিশনারের গৃহশিক্ষক তাঁহাকে চর বলিয়া সন্দেহ করে এবং কমিশানরকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়। শেষ পর্যন্ত কমিশনার কাশ্মীর যাইবার ছাড়পত্র দিয়া তাঁহাকে শ্রীনগর থানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে বৃটিশ রেসিডেণ্ট তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে পাঁচদিন জেলে আটক রাখেন; এ কয়দিন তিনি জেলের খাবার কিছু খান নাই। নিজের সঙ্গে তিব্বতী চা ছিল, তাহা দিয়া দুগ্ধবিহীন চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন, আর জেলে রক্ষীর বালকপুত্র তাঁহাকে তাহার নিজের ভাগ হইতে আপেল দিয়া যাইত। তাঁহার পরিচয় শুনিয়া পুলিশ বরানগর মঠে পত্র লেখে ও বলে, "আপনি কে ঠিক ঠিক নির্ণীত হইলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিব।"

জেল হইতে মুক্তি দিয়াও তাঁহাকে কিছুদিন একটি পৃথক বাটীতে নজরবন্দী-রূপে রাখা হয় ও প্রশ্ন করা হয়, "কেন তিব্বত গিয়াছিলে?—কতদিন ছিলে? তিব্বতীভাষা কিরূপে শিখিলে? লামারা তোমায় এত শ্রদ্ধা করে কেন?" সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া শেষ প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গাধর বলেন, "সে কথা লামাদের জিজ্ঞাসা করিও।" জেলে থাকা কালে চাহিয়াও গঙ্গাধর কাগজ কলম পান নাই, বাহিরে আসিয়াই তিনি বরানগর মঠ, কলিকাতায় গিরিশবাবু ও কাশীর প্রমদাবাবুকে নিজ অবস্থিতির কথা জানাইয়া পত্র লিখেন।

যথাসময়ে সব উত্তর আসিতে লাগিল। পরিচয় নির্ণীত হইলে কাশ্মীর রাজার মন্ত্রী শ্রীআশুতোষ মিত্র ও জজ শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায় তাঁহার সত্বর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া মুক্তির প্রাক্কালে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে রাজদূতরূপে তিব্বতে পাঠাইতে চায়। গঙ্গাধর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারা তাঁহাকে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে। তাহাতে অসম্মত হইয়া গঙ্গাধর বলেন, "একটি নিরীহ নিরুপদ্রব স্বাধীন জাতির সর্বনাশ করিবার জন্য আমি লেখনী ধারণ করিব না।" অবশেষে তাহারা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিতে চায় এবং তাহারই কিছু অংশ তাহারা লিখিয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়।

কাশ্মীরে থাকাকালেই প্রমদাবাবু ও স্বামীজীকে লেখা অনেক পত্রের মধ্যেই তাঁহার হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণের নানা কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়।

১৮৯০ জানুআরির শেষভাগে মুক্ত হইয়াই গঙ্গাধরের মনে কারাকোরম পর্বত অতিক্রম করিয়া প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি মধ্যএসিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু মঠের প্রতি চিঠিতে ফিরিবার আহ্বান তাঁহার প্রাণে ধ্বনিত হইতে থাকে।

স্বামীজীর পত্রে জানিলেন, তিনি গাজীপুরে পওহারীবাবার দর্শনে আসিয়াছেন। কখন শাসনের সুরে, স্বামীজী তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে লিখিতেছেন, কখন অনুরোধের সুরে তাঁহাকে তাঁহার হিমালয় ভ্রমণের সাথী হইতে ডাকিতেছেন। অবশেষে গঙ্গাধর ফিরিবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে আর কখনও আসা হইবে কিনা ঠিক নাই, এই ভাবিয়া তিনি কাশ্মীরের তীর্থগুলি একে একে দেখিতে লাগিলেন, ক্ষীরভবানী, মার্তণ্ড, বেরিনাগ, অনন্তনাগ প্রভৃতি দর্শন করিলেন, কিন্তু অমরনাথদর্শনের সময় এখন নয় বলিয়া উহা আর হইল না। এপ্রিলের শেষভাগে রাওলপিণ্ডি ও লাহোর হইয়া তিনি বারাণসী পৌঁছিলেন।

বহুদিন পরে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে পরমানন্দে বিভোর হইলেন। প্রমদাবাবু শুনিলেন তাঁহার অপূর্ব হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী আর গঙ্গাধর শুনিলেন বরানগর মঠের ক্রমোন্নতির কথা।

স্বামীজীর দর্শনাশায় গাজীপুর গিয়া শুনিলেন তিনি সুরেশ মিত্র মহাশয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। যাই হোক সেখানে উপর্যুপরি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার সাধুজনোচিত ত্যাগ তপস্যা ও বিনয়নম্র ভাব দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া মুগ্ধ হন। শীতের দেশ হইতে সহসা গরমের মধ্যে আসিয়া এইখানে গঙ্গাধর সপ্তাহখানেক একজ্বরী হন। একটু সুস্থবোধ করিয়াই তিনি বরানগর মঠ অভিমুখে যাত্রা করেন।

গঙ্গাধর ভাবিয়াছিলেন বালিতে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া বরানগর যাইবেন। ট্রেন হইতে বালি ষ্টেশনে নামিবামাত্র পুলিশ আবার তাঁহার সঙ্গ লয় এবং হাওড়া লইয়া যায়। সেখানে তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর কিছু লিখিয়া লইয়া বরানগর মঠ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। জুনের মাঝামাঝি—প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অনুপস্থিতির পর অধিকাংশ কাল হিমালয় অঞ্চলে কাটাইয়া গঙ্গাধর বরানগর মঠে গুরুভ্রাতৃগণ মধ্যে উপস্থিত হইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

এই সময়েই বিরজাহোম করিয়া বরানগর মঠে তিনি যথাবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামীজী অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের জন্য লামা-প্রদত্ত গেলাং উপাধির কথা মনে করিয়া তাঁহাকে অখণ্ডানন্দ নামে অভিহিত করেন।

কিছুদিন তিব্বত ও হিমালয়ের ভ্রমণকথায় বরানগর মঠ মুখরিত করিয়া ১৮৯০ জুলাই মাসে স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ আবার হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

শোনাও সে অগ্নিমন্ত্র

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পতিত ভারতবর্ষে, নারায়ণ, তুমি এসো আজ
পাঞ্চজন্য-গরজনে দিকে দিকে তুলিয়া আওয়াজ।
মুক্ত করো, মুক্ত করো ক্লৈব্য হ'তে দুর্ভাগা জাতিরে;
মৃত্যু হ'তে, হে দেবতা, লও তারে অমৃতের তীরে;
ঢেকেছে আত্মারে তার অজ্ঞানের মেঘ-আবরণ!
জ্ঞানের আলোকতীর্থে হোক তার মহাজাগরণ।

তোমার এ ধরিত্রীরে করোনি তো কুসুম-পেলব
সুন্দরের লীলাভূমি! হেথা আছে রক্তাক্ত বিপ্লব
উৎসবের পাশাপাশি। হেথা স্নিগ্ধ কাকলি শিশুর
ঝড়ের গর্জন সাথে মিলাইছে আপনার সুর!
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প আর মহামারী
তারা আর পুষ্প নিয়ে এ বিচিত্র সংসার তোমারই!
জীবন নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর আহব।
হেথা শুধু বিনাশের পথে আসে সৃষ্টির গৌরব।
সংগ্রামের পথে আসে সফলতা সত্যোপলব্ধির
বোধিদ্রুমমূলে। হেথা ভূমানন্দ ভাবসমাধির
জয় ক'রে নিতে হয় বীর্য দিয়ে তীব্র তপস্যায়।
হেথা দুঃখজয়ী যারা যুগে যুগে তরণী ভাসায়
অজানা সিন্ধুর বক্ষে, অকম্পিত কণ্ঠে যারা বলে:
সমুদ্রে ডুবুক তরী, সব কিছু যাক রসাতলে,
তবু ফিরিব না তীরে, হয় জয়, নয় সর্বনাশ—
তারাই মরিয়া গড়ে মানব-সভ্যতার ইতিহাস
রক্ত আর ঘর্ম দিয়ে। জ্যোতির্ময় নবজীবনের
তারাই পতাকাবাহী। তাহাদের বলিষ্ঠ মনের

শক্তির প্রাচুর্য আনে অন্ধকারে প্লাবন জ্যোতির।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; দুর্বলেরা বোঝা ধরিত্রীর।
হীনবীর্য যে অভাগা—তার ধ্বংস কে ঠেকাতে পারে?
চরম দুর্গতি তার জীবনের এপারে ওপারে
সুনিশ্চিত। সংসারের চিরন্তন নিয়ম সংগ্রাম;
সমরে শৈথিল্য যার—অনিবার্য তার পরিণাম
অধোগতি আর মৃত্যু। নাহি পাপ দুর্বলতাসম;
বীর্যের আগুন নাই যে সাধুত্বে তার নাম তমঃ—
ভীরুর ভীরুত্ব-মাখা। নাই, নাই কোন মূল্য তার।
তার চেয়ে ঢের ভালো উগ্রমূর্তি রাজসিকতার
শক্তিতে গরিমাময়ী। নারায়ণ, পতিত ভারতে
শোনাও সে অগ্নিমন্ত্র যাহা তুমি কপিধ্বজ-রথে
শুনাইলে অর্জুনেরে। পাঞ্চজন্যে আবার বাজাও:
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, ধনঞ্জয়, যুদ্ধ ক'রে যাও
সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়াজয় করি সমজ্ঞান;
যুদ্ধ করো, সব্যসাচি, বর্জিয়া সমস্ত অভিমান
আপনারে যন্ত্র মানি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের করে।
মাভৈঃ গাণ্ডীবধন্বা; এ বিশ্বের কল্যাণ যে করে
দুর্গতি হয় না তার; আমি তার সহায় শাশ্বত।
অর্জুন, গাণ্ডীব ধরো—যুদ্ধ করে যাও অবিরত।

শিব ও শক্তি

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

(এক)

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।" হিমালয় পর্বতমালা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কত দেশ, কত তীর্থ, নদনদী, বন উপবন তার মধ্যে—একটি বিশাল রাজ্যবিশেষ। হিমালয়ের প্রাণপুরুষকে বলত গিরিরাজ। তাঁর রাণীর নাম ছিল মেনকা। কন্যা উমা স্নেহের দুলালী, বাপ-মার চোখের আড়াল হতে জানে না। শুনলেন তিনি শিবের কথা—রূপে গুণে অপরূপ, কৈলাস-বাসী যোগী। উমা মুগ্ধ হলেন। বাসনা হল তাঁকে স্বামীরূপে পাবার। বাপ-মাকে রাজী করে, বেরুলেন তপস্যায়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে ফিরবেন, মনে এই সঙ্কল্প।

কভু অর্ধাশনে, কভু অনশনে, কভু পর্ণকুটীরে, কভু বৃক্ষতলে, আবার কভু বা মুক্ত আকাশতলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, কভু গঙ্গা, কভু অলকানন্দা, কভু মন্দাকিনী-তটে—রাজকুমারী করেন তপস্যা। অহর্নিশি শিবনাম, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে। শিবধ্যান, শিবচিন্তা, হল সার। সোনার বরণ কালী হয়েছে, রুক্ষ কেশপাশ, শীর্ণকায়। শিববিরহে অপলক আঁখি বেয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরে পড়ছে। প্রবাহিনীর রূপ ধারণ করে সে অশ্রুধারার নাম হল "বিরহী গঙ্গা"।

তুষ্ট হলেন শিব, ভোলা মহেশ্বর উমার তপস্যায়। বর দিলেন, বিবাহ করবেন। সংবাদ গেল হিমালয়ে। গিরিরাজের কাছে নেমে এলেন মহেশ কৈলাস থেকে। বিবাহ হল, নারায়ণ হলেন সাক্ষী সে বিবাহে। তিন যুগ ধরে দিচ্ছেন তিনি সাক্ষী, সেখানে থেকে। তাই নাম সে শিববিবাহ-ক্ষেত্রের 'ত্রিযুগী নারায়ণ।' ক্ষেত্র হল তীর্থ, নারায়ণ দেবতা, বিবাহ-অগ্নি আজও প্রজ্বলিত। আজও সেই তীর্থ দর্শনে যায় অসংখ্য নরনারী 'কেদারে'র পথে, পূজা ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে।

বিবাহশেষে শিবের সাথে উমা গেলেন কৈলাস। স্বামিগৃহে গৌরীকুণ্ডের পথে কেদার হয়ে। বিশাল নিস্তব্ধ কৈলাসপুরী, চারিদিকে তুষারশৃঙ্গ, যতদূর চোখ যায়। সামনে দিগন্তপ্রসারী মানসসরোবর। ভূতপ্রেত, দানাদৈত্য নন্দী ভৃঙ্গী

যে যেখানে আছে শিবের সাহচর্যে শান্ত হয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছে। ধ্যানমগ্ন পর্বতমালা, ধ্যানমগ্ন সরোবর, ধ্যানমগ্ন আকাশ, ধ্যানমগ্ন চন্দ্রমা. নক্ষত্র তারকাবলী যা কিছু বর্তমান সে জগতে। দেখলেন উমা সেথায় শিব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, আর তিনি পরমেশ্বরী।

উমা আরও দেখলেন শিব জগতের দুঃখরূপ গরল পান করে নীলকণ্ঠ। আর তিনি স্নেহ করুণা কৃপা দান করে জগজ্জননী দুর্গা। তাই আজও তাঁকে পূজা করে 'মা দুর্গা' বলে জগতের লোক। শুধু তাই নয়, শিব হলেন যত পুরুষের আদর্শ, আর উমা যত নারীর আদর্শ। বিবাহের মন্ত্রেও এই কথাই বলে। পতি শিব, পত্নী দুর্গা। আবার শিব ভিখারী, দুর্গা অন্নপূর্ণা। শিব ভিক্ষা করছেন, অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দিচ্ছেন। স্নেহ, কৃপা, করুণা, অন্নবস্ত্রের তো কথাই নেই, সবই দেন অন্নপূর্ণা। সংসারে কিছুই নেই অদেয় তাঁর। শিবের সতী অন্নপূর্ণা। শিবের ভিখারীর ভাণ্ডার হলেও অন্নপূর্ণা নিজ ভাণ্ডার সদা পূর্ণ রাখেন। জগৎসংসারকে *এদৃশ্য দেখাচ্ছেন* ভাঙ্গড় বিভোলা মহেশ্বর।

এই হ'ল আদর্শ। স্বামীর সংসারে স্ত্রী স্নেহ-কৃপা-করুণা, অন্নবস্ত্র, আশ্রয় যা যা দরকার, অন্নপূর্ণার মত মুক্ত হস্তে দান করবেন। অভাব হ'লে মা অন্নপূর্ণা সে ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবেন। এই আদর্শ, শিবদুর্গার আদর্শ লাভ করার জন্য, জীবনকে সার্থক করার জন্য পুরুষ ও নারীর স্বামী-স্ত্রী-রূপে বিবাহ-বরণ। আর সে আদর্শ লাভ হলে গৃহ, সমাজ, দেশ স্নেহধারায় প্লাবিত হ'য়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। বিবাহের মন্ত্র যে শুধু এই আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেয় তা নয়, স্ত্রীর এই 'দুর্গা', 'অন্নপূর্ণা' 'জগন্মাতা'র ভাব মনে গেঁথে দেয়। 'মা দুর্গা'র ন্যায় আসনে বসিয়ে, যথাবিধি শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা, ষোড়শাদি উপচার দানে পূজা, ভোগ আরতি, স্তবস্তুতি ইত্যাদি সমন্বিত অনুষ্ঠান সহ পত্নীর পূজা করবার বিধান দিচ্ছে পতিকে তন্ত্রশাস্ত্র।

শিবকে স্বামীরূপে পেয়ে হিমালয়-কন্যা উমা হলেন জগন্মাতা দুর্গা। নিজ পরমেশ্বরস্বরূপ অনুভব করেন শিব, আবার উমার জগন্মাতার স্বরূপ জানিয়ে দেন সেই মহেশ্বর শিবই। পতিকে শিবরূপে দর্শন করার সঙ্গেসঙ্গেই অনুভব করেন পত্নী নিজেকে জগন্মাতার শক্তিরূপে।

শিব জগৎপিতা, দুর্গা জগন্মাতা। সন্তান জন্ম না হলেও পিতা ও মাতা, তাই সকলে বলে 'বাবা ভোলানাথ শিব' 'মা দয়াময়ী দুর্গা'। সারা জগতের জীব যে তাঁদের সন্তান তাই বলে 'বাবা', বলে 'মা'। তাঁদের ছেলেমেয়ে হয়ে তারা পেয়েছে দুজনের স্বরূপ। সব পুরুষই শিব, সব স্ত্রীই দুর্গা—দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যায় গাছপালা পর্যন্ত।

এই শিব-শক্তি সারা বিশ্বব্যাপী। কখন ভিন্ন শরীর কখন মিলিত শরীর। ভিন্ন শরীরে শিব আলাদা, শক্তি আলাদা। আবার মিলিত হন একই শরীরে। কিছুকাল পুরুষ, কিছুকাল নারীরূপে আবার করেন আত্মপ্রকাশ, বলছে বিজ্ঞান। শরীর ভূ-নিরপেক্ষ হয়েও থাকেন একীভূত—সারা বিশ্বময়। যেথায় শিব সেথায় শক্তি, যেথায় শক্তি সেথায় শিব। যিনি শিব তিনিই শক্তি। বলে দিচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞ, সমাধিবান্ পুরুষ নিজ অনুভূতির পর।

তাই শ্রুতি বলছেন, "ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" "হে পরমেশ্বর তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার ও কুমারী, তুমি বার্ধক্যে দণ্ডের সহায়তায় ভ্রমণ কর। হে সর্বব্যাপী, তুমিই সংসারে জন্মগ্রহণ কর।"

দেবতারাও তাই বলছেন, "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" "যে দেবী মাতৃরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা তাঁকে প্রণাম করি, তাঁকে প্রণাম করি, তাঁকে প্রণাম করি।

(দুই)

কিন্তু এ তো হল আদর্শ। শাস্ত্রের কথা, পুরাণের কথা সেই আদর্শকে বলে দিচ্ছে। কোন্ যুগের কথা সে সব। আজও কি খাটে? জানা নেই কোন যুগে মানুষ এ আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছে কিনা। যদিই বা করে থাকে এ যুগে, এ জড়বাদী সভ্যতার যুগে, যান্ত্রিক যুগে যে যুগে বিজ্ঞান বলছে, "আমিই সব, জীব ও জগৎ, ভাঙা গড়া, পরিচালনা করা সবই আমার হাতে", আর মানুষও তাই বিশ্বাস করছে—সে যুগে এ আদর্শ কারো জীবনে কি প্রত্যক্ষ হতে পারে?

পশ্চিম বাঙলার বাঁকুড়া জেলার ইঁদেশ বা ইন্দাশ গ্রাম, নানা কারণে, বিশেষ করে "খাজা" নামক একরকম মিষ্টান্নের জন্য, নানা স্থানে প্রসিদ্ধ। গ্রামটি বর্ধিষ্ণু, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস সেখানে। যজন-যাজনশীল বলে তাঁদের খ্যাতি। পাণ্ডিত্যও ছিল কয়েকজনের। একজনের আবার বিশেষ করে। নাম গৌরী পণ্ডিত। তন্ত্রশাস্ত্রে দখল যথেষ্ট। আবার সাধক লোক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পড়লেন দেবতাদের স্তব একদিন—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

চিন্তাশীল মন ভাবলে এখানে ত রয়েছে "হে দেবি, যত রকমের বিদ্যা আছে, সে সব তুমিই আর যত স্ত্রী মূর্তি রয়েছেন জগতে সে সবও তুমি।" কিন্তু সামনে দেখছেন জগৎ, যাকে বলে বাস্তব জগৎ। সেখানে কি? কতক স্বেচ্ছায়, কতক সমাজবন্ধনে, আবার কতক ভয়ে নারী ও পুরুষ খাটছে খুটছে, চলছে ফিরছে, উঠছে বসছে, আবার পশুর মত শরীরকে করে দিচ্ছে ভোগের সামগ্রী। কই সেখানে হুঁস—নারী ভগবতীর স্বরূপ? পশুত্ব ঢেকে দিয়েছে দৃষ্টি, জড় হয়েছে বুদ্ধি, নষ্ট করেছে জ্ঞান, নিবেছে হৃদয়ের আলো। মল-মূত্র ভরা রক্তমাংসের শরীরকে দেখছে ভোগের দৃষ্টিতে। বড়ই চিন্তিত গৌরী পণ্ডিত। এমন সময় মনে এল তন্ত্রশাস্ত্রের কথা। নারীকে এমনকি সহধর্মিণীকেও ভগবতীজ্ঞানে পূজা করার বিধি দিয়েছে সে শাস্ত্র।

সামনে শরৎকাল। ধানের ক্ষেতে, গাছের পাতায় নদীর জলে, পাখীর ডাকে, আকাশের মাঝে, চারিদিকে তার পরিচয়। গ্রামের মাঝে বাজছে ঢাক এক আধটা। কুমোর ব্যস্ত ঠাকুর গড়ার আয়োজনে। সকলেই চেয়ে আছে আগমনীর আগমনপথ। গৌরী সঙ্কল্প করলেন শাস্ত্রীয় বিধির অনুষ্ঠান করবেন আগামী শারদীয়া দুর্গাপূজায়। যোগাড় হল শুরু দ্রব্যসামগ্রীর, বিধিমত, যতরকম প্রয়োজন সে অনুষ্ঠানে। বিস্তারিত আয়োজন, এক দিনের নয়, তিন দিনের পূজার। শুধু বাকী প্রতিমা। কোন ব্যবস্থাই তার হয়নি কোথাও। বুঝলে না কেউ কিসের জন্য এত আয়োজন?

শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী। আগের দিন সাজান হয়েছে দ্রব্যসামগ্রী একটি ঝকঝকে তকতকে মেরামত করা ন্যাপাপোঁছা ঘরে। পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত ঘরের দ্বারে মাঙ্গলিক ঘট। গৌরীগৃহিণী স্বামীর ইচ্ছামত সুস্নাত, সুপরিষ্কৃত, সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কারে সুসজ্জিত। পায়ে আলতা, সীমন্তে সিন্দুর, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ধীর মন্থর পদবিক্ষেপে পতিচালিতা সীমন্তিনী চললেন পূজার ঘরে। আলপনা দেওয়া মেঝের উত্তর ভাগ, সে অংশে মাঝখানে পাতা একখানি পদ্ম আঁকা আলপনার পিঁড়ে। বসলেন তার ওপর দক্ষিণমুখী হয়ে। সামনে রাখা হল পূজার বাসন, ঘণ্টা পুষ্প ইত্যাদি।

উত্তর মুখ হয়ে বসলেন গৌরী পূজায়, সামনে জীবন্ত প্রতিমা। দ্রব্যশুদ্ধি ইত্যাদি করে আরম্ভ হল ন্যাস নিজ অঙ্গে, শেষে প্রতিমা অঙ্গে। ভুললেন গৌরী নিজ মানবদেহ, দেখলেন শিব বর্তমান সেথা। গৃহিণীরও চলে গেল মানবী শরীর দৃষ্টিপট থেকে, আবির্ভূতা দেবী মূর্তি। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী সে শরীরে। গৌরীরও হল অনুভব তাই। শিবের সামনে দুর্গা, অন্নপূর্ণা। গৌরী পণ্ডিত শিব, সহ-ধর্মিণী অন্নপূর্ণা, দুর্গা। পূজা হলো ভক্তিভরে যথারীতি, যথাশাস্ত্র। নিজের হাতে ধুইয়ে দিলেন পূজক মায়ের পা, পরিয়ে দিলেন সুগ্রথিত সুগন্ধি ফুলের মালা। খাইয়ে দিলেন ভক্তিশ্রদ্ধা ভরে নানা রকমের ফল মিষ্টি জল, স্বহস্তে। দিলেন আচমন, দিলেন পান। অন্তে অঞ্জলি দিলেন, ফুল বেলপাতা, দূর্বা চন্দন দিয়ে মায়ের পায়ে। একবার নয়, কয়েকবার। আরতি, ভোগ, স্তবস্তুতি, প্রণাম সবই হোল করা। শেষে বন্দনা। গৌরী সাক্ষাৎ ভগবতী দেখছেন সামনে, তাঁর কাছে করছেন প্রার্থনা। জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস যত কিছু আসছে মনে আবেগভরে। আসন থেকে উঠে হোল চরণামৃত পান, প্রসাদ-ধারণ ও অপরকে বিতরণ। মৃত্তিকা দ্বারা ধাতু দিয়ে গড়া প্রতিমায় যেমন হয় ভগবতীর দর্শন, জীবন্ত মানবী প্রতিমায়ও হয় আনন্দময়ীর সাক্ষাৎকার, করলেন বেশ স্পষ্ট অনুভব। বড়ই আনন্দ গৌরীর, বড়ই আনন্দ সতী-লক্ষ্মী সিমন্তিনীর। এইভাবে হোল পূজা তিন দিন, শারদীয়া মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী।

বদলে গেল জগৎ। এই যুগেও যত স্ত্রী মূর্তি হোলেন সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্তি। শুধু মূর্তি নয়, জগন্মাতার জগৎপালিনী আনন্দদায়িনী শক্তি সকলের মধ্যে বিশেষ ভাবে। যত পুরুষ মূর্তিতে সাক্ষাৎ শিবের প্রকাশ। হয়ে গেল কর্তব্য স্থির। পবিত্র স্ত্রী শরীর—পবিত্র পুরুষ শরীর। পূজা করতে হবে ভক্তি অর্ঘ্য দিয়ে স্ত্রীমূর্তিকে জগজ্জননী শক্তি দুর্গা উমা অন্নপূর্ণা ইত্যাদি জ্ঞানে। পুরুষমূর্তিকে সর্বংসহ, দুঃখহর, শান্ত, শান্তিদায়ক শিব ভোলানাথ মহেশ্বর জ্ঞানে। তন্ত্রের শিক্ষা ও সাধনা হোল সত্য। সাধক গৌরী ও তাঁর সাধ্বী গৃহিণীর কাছে দৈহিক সম্পর্ক, জড়ভাব সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি শেষ হল। এই স্মরণীয় দিনের, স্মরণীয় অনুষ্ঠান প্রতিফলিত কত শারদীয়া পূজার সময় প্রতি বছর। গৌরী করতেন পূজা সহধর্মিণীর এই ভাবে তিন দিন। যখন গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে আনন্দ করেছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের কত প্রশংসা উত্তরকালে ভক্তদের কাছে তিনি করতেন।

সায়াহ্নে

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

(Henry Francis Lyte রচিত 'Abide with me' নামক প্রসিদ্ধ গীতি-কবিতার অনুবাদ)

উতলা সন্ধ্যা আসিছে নামিয়া
রহিও প্রভু সাথে,
তিমির রজনী হতেছে গভীর
রহিও সাথে সাথে।
সখারা যখন ভুলিল আমারে
মিলাল সব সুখ,

সহায়হীনের সহায় তুমি যে
ঢেক না তব মুখ!
এ জীবন-স্রোত বহিছে দ্রুত
ঘনায়ে আসে বেলা,
হেথাকার সুখ মিলায়ে যায়
মিলায় সব খেলা।

সবারে ঘিরিয়া জরা ও মরণ
চপল নৃত্যে মাতে,
অজর অমর চিরদিন তুমি
রহিও প্রভু সাথে!
সত্তা তোমার প্রভু হে আমার
চাহি যে ক্ষণে ক্ষণে,
তব দয়া বিনা পাপ অরি তারে
নাশিবে কোন জনে!
গুরু তব সম নির্ভর মম
কে আছে মোর নাথ,
রবির কিরণে মেঘের আঁধারে
রহিও সাথে সাথ!
তুমি কাছে আছ এ কথা স্মরিলে
অরিরে নাহি ডরি,
রোগ শোক মোরে ব্যথিতে না পারে
সুধা সে অশ্রু-বারি!

মরণের ভয় কোথা আর রয়
মৃত্যুর কোথা জয়?
তুমি যদি মোর রহ সাথে সাথে
নাহি আর পরাজয়।
নয়ন আমার আসিছে মুদিয়া
দেখাও তব রূপ,
আঁধারের মাঝে দীপ্তি তোমার
ভাতিবে অপরূপ!
সুদূর গগনে নয়ন আমার
করিও প্রসার স্বামী,
ছায়া সম যত মিলাইবে সুখ
ভুলিব সকলি আমি।
হেরিব নবীন উষার উদয়
কিরণ ঝরিবে মাথে,
জীবনে মরণে হে প্রভু আমার
রহিও সাথে সাথে!

"নাচুক তাহাতে শ্যামা"*

স্বামী জীবানন্দ

ভাল লাগে প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ, অম্লান জ্যোৎস্নাভরা পৃথিবী, মলয় বাতাস, পাহাড়-পর্বত-নদনদীর প্রাকৃতিক শোভা, কলস্বনা ঝরনা, ভ্রমরের গুঞ্জরণ, পাখীর গান, আকাশে রঙের খেলা, নৃত্যগীত-কবিতা, হাসির ফোয়ারা—এক কথায় যা কিছু চিত্ত-সুখকর তাই-ই। ভাল তো লাগে না ঝরা ফুল, অমানিশার ঘন আঁধার, দুর্যোগময়ী রজনী, উদ্দাম ঝঞ্ঝাবাত, যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, মৃত্যুর নির্মম আঘাত—এক কথায় যা কিছু ভয়াবহ ও দুঃখকর সবই।

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত-বিহঙ্গম
সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল,
যাইতে দুঃখের পার॥"

মনের স্বাভাবিক গতিই এই।

কিন্তু জগতে অবিমিশ্র সুখও নেই, দুঃখও নেই। কারুর জীবনে কেবল সুখের আস্বাদ তা কেউ বলতে পারেন না বা শুধু যে একটানা দুঃখ তাও নয়। সুখের পশ্চাতে দুঃখ যেন আলো-আঁধারের লুকোচুরি!

মানুষের জীবনে সুখ থেকে দুঃখের ভাগই বরঞ্চ বেশি। স্বাস্থ্যহীনতার দুঃখ, মূর্খতার দুঃখ! অভাব অনটন রোগ শোক জরা মৃত্যু—জ্বালা যন্ত্রণা বিবাদ বিসম্বাদ—এ ছাড়া আর তো কিছুই যেন চোখে পড়ে না। যে দিকে তাকাই এই চিত্র। এই তো জীবন! জন্মগ্রহণে দুঃখ, জীবনধারণে দুঃখ, মরণেও দুঃখ। জীবন যেন দুঃখে গড়া!

জীবন দুঃখময় হ'লেও সবাই দুঃখকে এড়িয়ে

* স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা।

চলে, কেউ চায় না তাকে। যদিও জানে ভাল-ভাবেই যে সুখ শুধু মরীচিকার মত প্রলোভন দেখায় তথাপি সুখের পিছনেই মানুষ ছুটে চলেছে বিরাম-বিহীন গতিতে।

"সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর
দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু
নাহি ছাড়ে আশা॥"

শাস্ত্রকারেরা সমস্ত সুখদুঃখকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। নিজের শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে যে সুখদুঃখের অনুভূতি তা আধ্যাত্মিক। অপরের কাছ থেকে যে সুখদুঃখ আসে তা হ'ল আধিভৌতিক। আর যে সুখদুঃখ দৈবাধীন তা আধিদৈবিক। সুখের রয়েছে সম্মোহিনী শক্তি, সুখকে বরণ ক'রে তাই মুগ্ধ হয়ে পড়ি। দুঃখকে ভয় ক'রে দূরে সরে যাই। সুখ বাড়ায় ভোগস্পৃহা, কখনও দেয় শান্তি, কখনও বা আনে চিত্তচাঞ্চল্য, ভুলিয়ে দেয় স্বরূপকে। দুঃখকে বরণ করতে পারলে মানুষ নির্ভীক হয়—অভীত্বের আস্বাদলাভ করে। দুঃখরূপ কষ্টিপাথরে হয় মনুষ্যত্বের পরীক্ষা, দুঃখের হোমানলে জেগে ওঠে আত্মসম্বিৎ। মহত্ত্বের বীজ যেন দুঃখের মধ্যেই নিহিত!

হিমাচলের উত্তুঙ্গ শিখর আর অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্র—মনের তো কোন অগম্য স্থান নেই! কিন্তু যা কিছু নয়নরঞ্জন ও শ্রুতিসুখকর শুধু সেই দিকেই যে মন ছুটবে তার তো কিছু মানে নেই। যেখানে দুর্ধর্ষতা, বহ্নিজ্বালা, ব্যথাবেদনা সেখানেই বা মনের গতিরোধ ক'রবে কে? তবে কেবল সুখের কামনা—যা পাওয়া বাস্তব ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব তার জন্যে এ অন্তহীন প্রচেষ্টা কেন? সুখ তো শুধু আলেয়ার মতো দুঃখের আঁধারকে গভীরতর ক'রেই দেবে!

তবে দুঃখের প্রতীকার না ক'রে নিশ্চেষ্টতায় তাকে বরণ করাই কি ভাল? না তা নয়—দুঃখকে ভয় না ক'রে তার প্রতীকারের জন্যে যে সাহস যে বীর্যবত্তা প্রয়োজন তা সকল সময়েই কাম্য। যখন দুঃখকে দূর করবার প্রয়াস কৃতকার্যতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে তখন ঈপ্সিত সুখ আর দূরে থেকে তার ছলনাময়ী আশা দিয়ে ভোলায় না, কাছে এসে ধরা দেয়। তাই স্বামীজী দারিদ্র্য ও ব্যথায় অভিভূত চিত্তের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলতে বলছেন:

"আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান,
প্রাণপণ যাক্ কায়া॥"

কিন্তু আসল শান্তি তো সুখদুঃখের পারে। আত্মজ্ঞান লাভ না হলে সুখদুঃখের পারে যাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান বা অক্ষর ব্রহ্মের উপলব্ধি অতি দুর্লভ জিনিস। চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী অতি বিরল। তাই উপাসকদের ধ্যান-পূজাদির নিমিত্ত ব্রহ্ম নিজেই স্থূলরূপ গ্রহণ করেন।* ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি পুরুষ-দেবতার মূর্তিতে নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন গুণযুক্ত হন সেইরূপ নানা দেবী-মূর্তিতেও তিনি গুণময়ী হন। শ্যামা কালী[১] ব্রহ্মের একটি সগুণ দেবী-মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কোন কাজ করছেন না এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি।[২]"

অনন্ত রূপে ব্রহ্মের বিকাশ এবং বিভিন্ন মতে পরমার্থলাভের পন্থা নির্দিষ্ট হ'লেও শক্তির আরাধনা

* চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

১। কলয়তি (বিনাশয়তি) সর্বমেতৎ (জগৎ) ইতি কালী।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১।২।৩।৩৯

৭

আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম সহজ উপায়। অন্নগত-প্রাণ কলিযুগে শক্তির উপাসনায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গলাভ অল্প আয়াসেই হয়। কলিযুগে মাতৃভাবই সর্বসাধারণের উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠ ভাব।

শ্যামা মায়ের মূর্তিতে সারল্য ও কাঠিন্যের অপূর্ব সমাবেশ। মা বরাভয়করা, করুণাময়ী অথচ ভয়ঙ্করা। মায়ের ভীমা ভৈরবী মূর্তি—তাই রুদ্র ভাবটিই তো বেশী প্রকট। বাহিরে ভীষণা, ভিতরে কিন্তু অন্তঃসলিলা করুণার ফল্গুধারা! যে সাধক মায়ের রুদ্রমূর্তিকে ভয় না করে এগিয়ে যায় সেই-ই মায়ের আশীর্বাদ-লাভে ধন্য হয়। মায়ের বাহিরের রুদ্ররূপটি এইরূপ—

"বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥[৩]"

দেবী বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী ব্যাঘ্র-চর্মপরিহিতা শুষ্কমাংসময়দেহা অতিভীষণা বিশাল-বদনা লোলজিহ্বা কোটরগত-আরক্তচক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকটশব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণকারিণী। কী ভয়ঙ্কর এই মূর্তি!

আবার মায়ের কালো রূপ। কিন্তু সাধক গেয়েছেন—"মা কি আমার কালো রে!" সত্যই তো আমাদের মনে কালিমা রয়েছে ব'লেই আমরা মাকে কালো দেখি। চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, মনের মলিনতা দূর হ'লে সাধক অতি আছে পায় মাকে, মায়ের ভীষণ রূপকে ভয় না ক'রে মাকে একান্ত আপনার ব'লে ভেবে ঠিক ঠিক জানতে পারে তাঁকে—আর মায়ের রূপের আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ঠাকুর বলেছেন: "কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ছাখো কোন রং নেই! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো—রং নেই।"

৩। শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৭।৭,৮

সাধারণতঃ মায়ের কঠোর ভাবটি না নিয়ে শুধু কোমল ভাবটি গ্রহণ করা হয়, তাই কাপুরুষত্ব এসে যায়।

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস,
বলে মা দানবজয়ী॥"

সুখময় ভাব প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা—কাপুরুষতারই নামান্তর। সেখানে প্রেম নেই—সেখানে ভক্তি নেই। লোকে মায়ের মূর্তি ভীষণ ক'রে নির্মাণ করে, মুণ্ডমালা পরিয়ে দেয় কিন্তু তাঁকে দিগ্বসনা অট্টহাস্যময়ীরূপে ভাবতে পারে মনের এমন বল নেই, তাই বলে দয়াময়ী—ভয়ে ভয়ে বলে দানবজয়ী মা! যথার্থ প্রেম মানুষকে নির্ভীক করে। এ যেন শুধু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই পূজার আয়োজন!

"রে উন্মাদ, অপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও,
পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও, সুখ হবে ব'লে, ভক্তিপূজাছলে
স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥'

অভয়া মা তাঁর করুণাধারা তখনই বর্ষণ করেন যখন সন্তান নির্ভয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়। শক্তিময়ী তাঁর সন্তানের মধ্যেও শক্তির বিকাশ দেখতে ভালবাসেন। সন্তানের নির্ভীকতা দেখে মায়ের কী আনন্দ! বীরত্ব ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন কঠোর ভাবুকের হৃদয়েই শ্যামা মা নৃত্য করেন—সেখানেই যে তাঁর নিত্যবিলাস। তিনি রক্তবীজবধ করেছেন, কত অসুর বধ ক'রে থাকেন। আমাদের মনের মধ্যে যে আসুরিক প্রবৃত্তি রয়েছে, কাম-ক্রোধ-লোভরূপী যে মহাশত্রুগুলি আমাদের সদাই ধ্বংস করতে প্রস্তুত তিনি তাদেরও বিনাশ ক'রে আমাদের তাঁর দিকে টেনে নেন। দুর্বল

সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাঁর স্নেহশীতল হস্ত তার শিরে বুলিয়ে দেন। তিনি যে মা—জগজ্জননী পালয়িত্রী!

মা শ্মশানবাসিনী। শ্মশানই তাঁর প্রিয়। মনের কামনা-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হৃদয় শ্মশানে পরিণত হবে। বাসনাই যে সংসার! বাসনা গেলেই সংসার উড়ে যায়। শ্মশানে সংসার নেই। তাই সংসারনাশেই হৃদয় শ্মশানে পরিণত হয়। আমাদের অন্তরে যে বাসনা সে-ই তো রক্তবীজ! সে যেন অমর বর লাভ ক'রে বেড়েই চলেছে। এই বাসনারূপী রক্তবীজকে মারা মায়ের কৃপা দ্বারাই সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ সকলকে মাতৃকৃপা-লাভের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁর প্রাণস্পর্শী আকুল আহ্বানে—

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

প্রার্থনা

কাজি মোঃ হাশমৎউল্লাহ, এম-এ, বি-এল

(ছায়া : কোরাণ, ১ম পরিচ্ছেদ)

গুপ্ত প্রকট বিশ্বপালক
নামেতে তোমার শরণ লই,
স্তুতি-কীর্তন তোমার প্রাপ্য
কে পাইবে তা তোমা' বই?
অদৃশ্য-দৃশ্য সকল জগতে
পরম দয়াল, দয়াময়
তুমি ধর্মের মহাবিচারের অধিপতি
তুমি সদাশয়।

নিশ্চয় নাই উপাস্য কেহ
তোমা' বিনা আর আমাদের
নির্ভর করি তব সাহায্যে
আছে কেবা আর স্রষ্টদের!
চালায়ো মোদের সরল পথেতে
যে পথে আশিস্ অশেষ হে
যে পথে তোমার অভিশাপ আসে
সে পথে প্রভু হে, কভু নহে।

শ্রীশ্রীরাস*

শ্রীমতী সরোজবালা দেবী

জটিলার[১] জ্বালা, কুটিলার[২] কুটিল শাসন, আয়ানের[৩] কঠিন প্রতিপত্তি এবং সমাজ-বন্ধন[৪] ধ্বংস করিয়াও যখন শ্রীরাধার[৫] মন একমাত্র কদমতলার[৬] শ্রীকৃষ্ণের[৭] দিকে একান্ত ভাবে ছুটিয়া যাইতে চাহিল, তখনই আসিয়া জুটিল বৃন্দাদূতী,[৮] এবং বৃন্দার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিল একে একে বিশাখাদি অষ্টসখী[৯]।

সেই বৃন্দা সহ সখীদের সাহায্যে এবং বহুরূপ যোগাযোগের পর, বহুবার মিলন-বিচ্ছেদের পর

১। মায়া ২। মোহ ৩। অহং ৪। মায়ার বন্ধন ৫। মানবাত্মা ৬। 'বিষ্ণুর পরমধাম' বা মোক্ষাবস্থা ৭। ব্রহ্ম, পরমাত্মা

৮। চৈতন্য ৯। অষ্ট প্রকৃতি

শ্রীরাধা যখন পূর্ণ মিলন[১০] চাহিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার বিরহজ্বালা[১১] আরও শতগুণে বাড়িয়া চলিল। সেই সীমাহীন অনন্ত বিরহজ্বালায় জ্বলিয়া, কত আশানিরাশার মধ্য দিয়া বহুদিন বহুরকম সঙ্কেত পাইয়া, নানা প্রকারে খুঁজিয়া ও নানা রূপে বুঝিয়া একদিন ঘোর রাত্রে তিনি সেই প্রিয় কদমতলার পথের সন্ধান পাইলেন।

একে বনের পথ, তাহাতে ঘোর রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টির পরে পথ বড়ই পিচ্ছিল; কঙ্কর এবং কণ্টকই বা কত! চলা আর যায় না; আর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হইল না ভাবিয়া রাধা ও বৃন্দা-সহ সখীরা সকলেই "ত্রাহি মাং মধুসূদন! ভগবন্ নন্দনন্দন! আমাদের এই বাধা বিপদ হইতে উদ্ধার কর"—বলিয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিলেন। তাহার পরেই মোহন বাঁশীর[১২] সুর শুনিতে পাইলেন। শ্রীরাধা ও বৃন্দাদূতী সহ সকলেই একে একে সেই প্রিয়তমের বাঁশীর সুর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। কত কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, কতই না হোঁচট ও আছাড় খাইয়া শ্রীরাধার সহিত সকলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও আনন্দে উৎসাহে সখীদের বলিয়া উঠিলেন, "হে সখীগণ! এই ঘোর ভয়ঙ্কর রাত্রে কি জন্য আগমন হইয়াছে? আর কাহার জন্যই বা তোমরা আসিয়াছ বল, কি চাই তাহাও বল; আজ আমি তোমাদের সবই দিতে প্রস্তুত আছি।" সকলেই মৃদু হাসিলেন এবং বৃন্দাদূতী বলিয়া উঠিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার নিজের বলিতে তোমার কি আছে যে তুমি তাহা আমাদিগকে দান করিবে, বল? তোমার যাহা কিছু ছিল, সবই তো সকলে চাহিয়া চাহিয়া তোমাকে একেবারে নিঃস্ব[১৩] করিয়া দিয়াছে; তুমি তো কাঙ্গাল, ভক্তের কাঙ্গাল। এমনকি যে কেহ ডাকুক তুমি তাহার[১৪] কাছেই সর্বদা হাজির থাক; এতই পরাধীন তুমি।" পরে গর্বের সহিত তিনি বলিলেন, "তবে হাঁা, দিতে পারি কিছু আমরা; কারণ আমাদের কিছু[১৫] আছে; কিন্তু তোমার কি আছে যে দিবে, বল? হে কৃষ্ণ! আমরা কিছুই নিতে আসি নাই, আমরা আমাদের সব কিছু দিতেই আসিয়াছি।"

যাহা হউক সকলেই সমান সম্মান পাইলেন, কিন্তু সকলকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া সেই বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে[১৬] লুকাইয়া গেলেন। আর সকলে খুঁজিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও আর রাধা-কৃষ্ণের দেখা পাইতেছেন না। এদিকে শ্রীরাধার মনে কিন্তু ক্রমশ অহঙ্কার আসিয়া জুটিল; ধীরে ধীরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—"সব চাইতে আমিই বড়, তাহা না হইলে সকলকে ছাড়িয়া দিয়া একা আমাকে লইয়া বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে সানন্দে বিহার করিবেন কেন, কেনই বা আমার এত অনুগত হইবেন? আমি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, কৃষ্ণ আমারই অনুগত দাসানুদাস।" এই ভাবিয়া তিনি কতই না কৃষ্ণকে আদেশ করেন; "'ঐ ফুল লইব', 'এ ফল লইব' 'তুলিয়া দাও'"—এই রূপ বলিতে বলিতে শেষে বলিয়া ফেলিলেন, "আর চলিতে পারি না, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; তোমার যদি সঙ্গে লইতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কাঁধে করিয়া বহন কর।" কৃষ্ণ কাঁধ পাতিয়া দিয়া বলিলেন, 'আইস'। রাধা যেই কাঁধে চড়িতে যাইবেন, দেখেন কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায় কাহার মধ্যে লুকাইলেন,—রাধা তাহা ঘুনাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। চারিধার শূন্য দেখিয়া পুনরায় সেই বিরহজ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন সেই জ্বালায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া শ্রীরাধা আর্তনাদে কাঁদিয়া উঠিলেন; উঠিবার আর তাঁহার শক্তি নাই। ঠিক সেই সময় সখীরাও

১০। পরমাত্মায় লীন, ব্রহ্মময় হইতে চাওয়া ১১। সংসার যাতনা ১২। ব্রহ্মপ্রেম ১৩। নিরাকার, সর্বময় ১৪। সকলের মধ্যেই, সর্বময়

১৫। আমিত্ব ও অহঙ্কার ১৬। হৃদয়

কৃষ্ণকে খুঁজিতেছিলেন; তাঁহারা সেইখানে আসিয়া রাধার দুরবস্থা দেখিলেন। রাধাকে দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন ও রাধাকে ধরিয়া উঠাইলেন। রাধাসহ সকলে মিলিয়া আবার খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গম বন; ঘন অন্ধকার রাত্রে অবলা নারীসকলে কোনও ভয় করেন নাই, কোনও দ্বিধা বা চিন্তা করেন নাই। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—সেই রাধাবল্লভ, সেই গোপীবল্লভকে না পাইয়া সকলে কাতরস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, "নন্দনন্দন, কোথায় তুমি?" গোপীদের ব্যাকুল আহ্বানে পুরুষোত্তম নন্দনন্দন আবার আসিয়া দেখা দিলেন; সকলেই আবার মহানন্দে নাচিয়া উঠিলেন। কত মান-অভিমানের কথা চলিল, কত ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হইল; পরে বৃন্দাদূতী বলিয়া উঠিলেন,—"হে নন্দরাজনন্দন! বৃন্দাবনরাজ! রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ! আজ সত্যই বিচার করিয়া বল দেখি, কিরূপ লোক একজন অপরকে ভজনা করিলে সেও ভজনা করে? আর তাহার বিপরীতই বা কিরূপ লোক করে? আর কেহ কাহাকেও ভজনা করিলেও কোন্ জন ভজনা করে না,—তাহাও বল।"

বৃন্দাদূতীর প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সখি! পরস্পর স্বার্থ থাকিলেই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকে। ইহাতে ধর্ম বা সৌহার্দ্য থাকে না; স্বার্থই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহাদের এই ভজনাও দুই প্রকার;—যেমন পিতা মাতা; প্রথমতঃ দয়ালু, দ্বিতীয়তঃ স্নেহময়। উক্ত প্রথম দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিগণ নিষ্কৃতি ধর্মলাভ করেন, —স্নেহময় ব্যক্তিগণ সৌহার্দ্য পান। এই ভজনার ফলে আনন্দধর্ম ও সৌহার্দ্যধর্ম দুইই আছে। আর যাহারা আত্মারাম ও আত্মকাম এবং গুরুদ্রোহী, তাহারা কাহাকেও ভজনা করে না। তাহাদের কথা দূরে থাকুক। হে সখি! যাহারা সর্বদা ভজনা করিলেও ভজনা করে না, তাহার কথা বলি;—তাহাদের মধ্যে একজন আমি[১৭]। আমি ভজনা করিলেও ভজনা করি না। ইহার কারণ এই যে, সে আমার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইবে; আর অন্য কোন চিন্তাই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। যেমন তোমরা ধর্মাধর্ম, লোক, সমাজ, জাতি, স্বামী ও সন্তান—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছ। হে প্রিয়সখি! আমি লুকাইয়া[১৮] ছিলাম সত্য; কিন্তু তোমাদের ডাকে আর লুকাইয়াও থাকিতে পারিলাম না। আর তোমরা সেজন্য আমার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করিও না। আজ হইতে তোমাদের চারিধারে আমি ঘিরিয়া থাকিব; তোমরা যখনই যেধারে তাকাইবে সব দিক, সব কিছুই আমাময় দেখিবে। আর ইহাও আমি বলিতেছি যে, তোমরা যে সুদৃঢ় গৃহশৃঙ্খল[১৯] ভাঙ্গিয়া আজ আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, ইহাতে দোষ বা নিন্দার কিছুই নাই। আমি দেবতার পরমায়ু পাইলেও তোমাদের এই আগমনের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। আমি যুগে যুগে তোমাদের কাছে ঋণী হইয়া থাকিলাম। এ ঋণ আমার আর শোধ হইবার নয়।"

শ্রীনন্দনন্দনের ঐরূপ সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা-সহ সখীগণ বিরহজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকামা হইয়া রাসমঞ্চে[২০] দাঁড়াইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সাদর সাগ্রহে, অনন্ত অপরূপ আনন্দে অবর্ণনীয় রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক গোপিনীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ, বিরাট জ্যোতির্ময়, প্রেমময় মূর্তিতে দেখা দিলেন। "গোপ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছেই"—ইহাই গোপীনীরা দেখিতে লাগিলেন; রাসের উৎসব আরম্ভ হইল। সস্ত্রীক দেবগণে আকাশ পূর্ণ হইল, দুন্দুভি[২১] ডঙ্কা

১৭। একমাত্র পুরুষ ১৮। নিরাকার ১৯। বিষ্ণুমায়ার বন্ধন ২০। সংসারের ঊর্ধ্বে, পরমশান্তিময় ও আনন্দময় মিলনমঞ্চে ২১। সত্য

বাজিয়া উঠিল; পুষ্প[২২] বরষিত হইল; সস্ত্রীক গন্ধর্বগণ করযোড়ে যশোগান করিতে লাগিলেন। সখীদের কিঙ্কিনী, বলয় আর নূপুরে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দিত হইয়া সখীরা উঃচ্চৈস্বরে গান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সেই শ্যামনৃত্যে গোপিনীরা ক্লান্ত হইলেন। এজন্য তাঁহারা নিজের আভরণাদি[২৩] ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। ঘর্মবিন্দুতে[২৪] সকলের মুখ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল; সকলের কেশকলাপ[২৫] ও মালা[২৬] খুলিয়া পড়িল; উদ্দাম বিলাস-হাস্যাদি দ্বারা শ্রীনন্দনন্দনও সকলের সহিত ক্রীড়া করিলেন এবং আপন অধরচর্বিত তাম্বুল[২৭] শ্রীরাধার অধরে অর্পিত করিলেন। এই রাস দর্শন করিতে করিতে চন্দ্রমা[২৮]সহ তারকাপুঞ্জ[২৯] নিজের গতি ভুলিয়া গেলেন; তাহাতে রাত্রিও[৩০] বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলময় হস্তে রাসক্রীড়ায় ক্লান্ত[৩১] গোপিনীগণের বদন[৩২] মুছাইয়া দিয়া, কল্যাণময় শ্রীপাদপদ্ম সকলের বক্ষস্থলে[৩৩] স্থাপন করিলেন। সেই স্পর্শে গোপিনীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে লইয়া যমুনার জলে[৩৫] ক্রীড়া করিলেন। স্নানের[৩৬] পর সত্য-সঙ্কল্পা অনুরাগিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণেই আত্মাঞ্জলি দান করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ-কামা পবিত্র রমণীমণ্ডলীও[৩৭] সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণেই আত্মাঞ্জলি দান করিয়া পূজা করিলেন।

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,—চৈতন্য-পুরুষ, চৈতন্যেই স্থির[৩৮] থাকিয়া সকলকেই প্রেমমিলন যোগানন্দ[৩৯] দান করিলেন। সেই শুভমিলন চৈতন্য আনন্দ লাভ করিয়া শ্রীরাধাসহ সখী গোপিনীগণ প্রেম-সাধনায়[৪০] সিদ্ধির স্রোতে চিরতরে ভাসিয়া[৪১] গেলেন।

জটিলা, কুটিলা, আয়ান-গোপ বা অন্যান্য কোনও গোপগোপীরা কেহই সেই সত্যসঙ্কল্পা শ্রীরাধাসহ গোপিনীগণের তত্ত্ব পাইলেন না। সেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার তত্ত্ব একমাত্র শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জানিতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত বা কালীভক্ত বহু পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীরাধার ভক্ত একমাত্র শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

২২। ভক্তি ২৩। ধৈর্যাদি ২৪। ভগবৎভাবে ২৫। সংসার-বন্ধন ২৬। সংসার-মায়া ২৭। ব্রহ্মজ্ঞানকে স্মরণ করিয়া ২৮। ভগবৎশক্তিশালী মন ২৯। ক্ষয়কারী শরীর-ধর্মসকল ৩০। পরমায়ুও বৃদ্ধি পাইল ৩১। শুদ্ধ ৩২। অন্ধদৃষ্টি ৩৩। অন্তরস্থলে ৩৪। লাভে ৩৫। জ্ঞান-স্রোতে ৩৬। আত্মশুদ্ধির পর ৩৭। পবিত্র ইন্দ্রিয়মণ্ডলী ৩৮। পূর্ণ থাকিয়া ৩৯। ব্রহ্মজ্ঞান ৪০। আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন-সাধনায় ৪১। মুক্তি বা সিদ্ধি লাভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কনখল (হরিদ্বার) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৫ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে রোগিসংখ্যা ছিল মোট ১,৪৩৭, তন্মধ্যে নূতন ভরতি রোগীর সংখ্যা ১,৪১৭ (প্রাপ্ত বয়স্ক—১৩৭৬, শিশু—৪১)। গড়ে দৈনিক ৩২টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হন ৭৩,৮৪৪ জন (নূতন—২২,৯৬৩ এবং পুরাতন—৫০,৮৮১) তন্মধ্যে পুরুষ ৩১,৭৯৬, স্ত্রীলোক—১৭,৮৮৯, শিশু—২৪,১৫৯। বহির্বিভাগে দৈনিক উপস্থিতির হার ২০২। সাধারণভাবে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় ৬৪২ (বহির্বিভাগে—৫১১) জনের এবং বিশেষভাবে অস্ত্রচিকিৎসা প্রাপ্ত

হন ১৮ জন অন্তর্বিভাগে। ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হয় ৪,৮৬৭টি (বহির্ভিাগে—৩,৯৩৪)। পরীক্ষাগারে থুথুরক্তমলমূত্রাদির ২,৩৯৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগিগণ ভারতের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিকের বিভিন্ন প্রদেশের এবং ভারত-সংলগ্ন অঞ্চলগুলির হইলেও উত্তর প্রদেশ এবং নেপালের (যথাক্রমে ২৪,৫৫ ও ১১৬টি) রোগীই বেশি।

সেবাশ্রম লাইব্রেরীর (যাহা হইতে রোগীরা মানসিক স্বস্থতালাভের জন্ম পুস্তকপত্রিকাদি পাঠের সুযোগ পান) পুস্তক-সংখ্যা ৪,২৩৫ (নূতন ক্রীত ও প্রাপ্ত—৪৪)। গ্রন্থাগারে ১৮টি সাময়িকী ও ৮টি পত্রিকা নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে প্রায় ৩০০০ দরিদ্র নারায়ণের পরিতৃপ্তি সহকারে সেবা করা হয়। দুগ্ধ ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণের মাধ্যমে রিলিফ কার্যও সেবাশ্রমের অন্যতম কাজ। সর্বশ্রেণীর দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরিত দুগ্ধের পরিমাণ ৭,২৪৫ পাউণ্ড। সহৃদয় উত্তর প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের এবং সেবানুরাগী জনগণের সক্রিয় লক্ষ্য ও সহযোগিতা এই সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানটিকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতার পথে আগাইয়া দিতেছে।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—(২৬২, মারচেণ্ট ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন) ব্রহ্মদেশে ভারতীয়, বর্মী, পাকিস্থানী ও অন্যদেশীয় মানব-সাধারণের সেবাব্রত এই অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪-৫৫ সালের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। অন্তর্বিভাগে গতবৎসরের শয্যা-সংখ্যা বাড়াইয়া ১৪৮ (৪৮টি স্ত্রীলোকদিগের জন্ম সংরক্ষিত) করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কর্কট-রোগ (Cancer), চক্ষু ও যৌনরোগ চিকিৎসার জন্ম পৃথক পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্তর্বিভাগে মোট চিকিৎসালাভ করেন ৪,০৩২ জন (গত বৎসরের সংখ্যা ছিল ৩,৯৮০) তন্মধ্যে পুরুষ—২৪৫১, নারী—১২৫৮ এবং শিশু—৩২৩।

বিশেষ কর্মব্যাপৃতিপূর্ণ ছয়টি শাখা-সমন্বিত বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ২২,৩২৯৪ (পুরুষ—১০,৩৯৬০, স্ত্রীলোক ৭,৫০৫৪, শিশু ২২,৩২৯৪)। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত ফিজিওথে-রাপি বিভাগে বিভিন্ন প্রণালীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করা হয় ৬,১৬১ জনের। রেডিয়াম চিকিৎসা বিভাগে ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা লাভ করেন ১৮৮ জন রোগী। ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে থুথুরক্তাদির ১১,৩২৮টি নমুনা এবং এক্স-রে বিভাগে ১,৫২২টি রোগী পরীক্ষা হয়। Deep—X'Ray Therapy বিভাগে চিকিৎসিত হন ৩৫ জন। সেবাশ্রমে কম্পাউণ্ডিং ও সেবাকার্য (Nursing) শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে ৩৮ জনকে নারসিং শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মদেশে এই প্রতিষ্ঠানের আর্তসেবা-কার্য বহুখ্যাত ও সর্বজন সমাদৃত।

পরলোকে স্বামী বিকাশানন্দ—গভীর দুঃখের সহিত আমরা বেলুড় মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহার নাম স্বামী বিকাশানন্দ (গদাই মহারাজ নামে সুপরিচিত)। গত ১৭ই আশ্বিন (৩।১০।৫৬) আলমোড়া স্থানীয় আশ্রম 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে' ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি যকৃৎ ও পিত্তাশয়ের পীড়ায় পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। খ্রীঃ ১৯১৪ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, ভজনানুরাগ এবং সপ্রেম সেবা-পরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। উদ্বোধন কার্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি বহুদিন বাস করিয়া-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শাশ্বত পাদপদ্মে নির্মায়িক সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা চিরবিশ্রাম লাভ করুন ইহাই আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে 'ইয়াংহাসবেণ্ড হাউস'-এর উদ্বোধন—সার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসবেণ্ডের স্মৃতি-রক্ষার্থে লণ্ডনে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, এই কেন্দ্রে বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইতে পারিবেন। কেন্দ্রের নাম হইয়াছে 'ইয়াংহাসবেণ্ড হাউস', কেন্দ্রটি কেবল যে সভা অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার স্থল হইয়াও থাকিবে। এখানে লণ্ডনে উপস্থিত পণ্ডিতগণও সাময়িক ভাবে বসবাসের সুযোগ পাইতে পারিবেন। কেন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইল তাহার ৪,০০০-এর অধিক পুস্তক সম্বলিত একটি লাইব্রেরী, তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে যাঁহারা আগ্রহী তাঁহারা এখানে পাঠের সুযোগ পাইবেন। বিশ্ব-ধর্ম কংগ্রেসের সভাপতি লর্ড স্যামুয়েল সম্প্রতি ইহার উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান এবং ইহুদী সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। সার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসবেণ্ড ১৯৪২ সালে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন, তিনি বৃটিশ পর্যটক এবং সৈনিক হিসাবে খ্যাত।

(ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস হইতে)

কবিসম্বর্ধনা—গত ৩রা ভাদ্র (১৯।৮।৫৬) গোবরডাঙ্গা প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষ একটি বৃহৎ জনসভায় প্রখ্যাত আদর্শবাদী কবি শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং অপর দুইজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্যকে মানপত্রের দ্বারা সম্বর্ধনা করিয়াছেন। ইঁহাদের তিনজনেরই জন্মভূমি গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ছিলেন এই সম্মেলনের সভানেত্রী। পল্লীবাসীরা পল্লীর কৃতী-সন্তানগণকে তাঁহাদের মধ্যে ডাকিয়া এবং তাঁহাদিগকে নিকটে পাইয়া যে গৌরব ও আনন্দ-বোধ করিয়াছেন ইহা খুবই উৎসাহজনক।

রাণাঘাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—বিগত ১৩৬২ সালের বৈশাখ হইতে প্রতি রবিবার পূর্বাহ্ণে রাণাঘাট নাসরাপাড়ায় শ্রীশঙ্করনাথ মিত্রের বহির্বাটীস্থ প্রকোষ্ঠে রাণাঘাট, আমুলিয়া, নাসরা প্রভৃতি পল্লীর ভক্তগণকে লইয়া নিয়মিত ভাবে ধর্মালোচনা ও ভজনাদি চলিতেছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে' কথিত কলাইঘাট এখান হইতে প্রায় দু'মাইল পশ্চিম দক্ষিণে চূর্ণিনদীর অপর তীরে অবস্থিত। ইহা একদা ভাগ্যবতী রাণী রাসমণির জমিদারী-ভুক্ত ছিল। মথুরবাবু ঠাকুরকে কিছু দিনের জন্য এখানে লইয়া আসেন, ঠাকুরের আদেশে তিনি এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদিগকে একদিন পরিতোষপূর্বক ভোজন করান, এক মাথা করিয়া তৈল এবং একখানা করিয়া নূতন বস্ত্র দান করেন।

গত ১৩ই ফাল্গুন (১৩৬২) ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা কল্পে এই চূর্ণিতীরে অতীতের সাক্ষী বটবৃক্ষ-তলে সঙ্ঘের উদ্যোগে চারিধারের ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব করা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী শান্তিনাথানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাবের সহিত বর্তমান যুগের সম্বন্ধ বিষয়ে একটি সুন্দর ভাষণ দেন।

কলাইঘাটার অপর তীরে বিখ্যাত আমুলিয়া গ্রামের দক্ষিণাংশে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু বাস্তুহারা ভক্ত আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ এই বসতির নাম 'সারদা পল্লী' রাখা হইয়াছে। গত ২রা বৈশাখ শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২১তম জন্মোৎসব এই স্থানে শান্ত পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী দেবানন্দ ইহাতে যোগ দিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

গত ৩রা ভাদ্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীশঙ্করনাথ মিত্রের ভবনে সমস্ত ভক্ত যথানিয়মে সম্মিলিত হন। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবে সাধনা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন।

আশ্চর্য !

চিত্রমেষোঽস্মি লব্ধাত্মা জাতঃ কালেন কার্যবান।
এষ সোঽহমনন্তাত্মা নান্যোঽস্তি পরমাত্মনঃ॥
ব্রহ্মণীন্দ্রে যমে বায়ৌ সর্বভূতগণে তথা।
স এষ ভগবানাত্মা তন্তুর্মুক্তাস্বিব স্থিতঃ॥
অহো স্বহং প্রবুদ্ধোঽস্মি গতং দুর্দর্শনং মম।
দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমখিলং প্রাপ্তং প্রাপ্যমিদং ময়া॥
সর্বং কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং দৃশ্যতে যজ্জগদ্গতম্।
চিন্নিস্পন্দাংশমাত্রাংশান্নান্যৎ কিঞ্চন শাশ্বতম্॥

—যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, উপশম প্রঃ, ৫৯।১৮, ১৯, ৩১, ৩২

অহো কী আশ্চর্য! আমি এতকাল ধরিয়া যে যত্ন করিয়া আসিয়াছি উহার ফল আজ করতলগত। আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া আমি কৃতার্থ। পরম পুরুষার্থ আজ আমার সংসিদ্ধ। বুঝিয়াছি সেই অসীম আত্মাই আমি। পরমাত্মস্বরূপ আমার অন্ত কোথাও নাই। যেমন মুক্তামালার সূত্র প্রত্যেক মুক্তার সহিত সম্বদ্ধ সেইরূপ এই ভগবান আত্মাও কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি যম, কি পবন বা অপর ভূতবৃন্দ—সর্বত্রই অবস্থান করিতেছেন।

মোহনিদ্রা কাটিয়া গিয়াছে, আজ আমি প্রবুদ্ধ। সকল দুঃস্বপ্নের অবসান হইয়াছে। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আত্মাতেই সব দেখিতেছি, যাহা কিছু প্রাপ্তব্য আত্মার ভিতরই পাইয়াছি।

জগতে ইন্দ্রিয়বেদ্য সমস্ত পদার্থসমূহ অদ্বয়, চৈতন্যস্বরূপ, পরব্রহ্মে মায়ার স্পন্দন ব্যতীত আর কিছু নয়। চৈতন্যের যে নিস্পন্দ অর্থাৎ ভ্রান্তিতে জীবভাব—উহা হইতেই সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গদেহের ভ্রম। এই ভ্রম হইতে আসে বাহ্য ও অন্তঃকরণের ভেদ—অতঃপর উপস্থিত হয় জাগ্রৎস্বপ্নে অনুভূত অখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চ। কিন্তু সেই আদি চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই শাশ্বত নয়—শুধুই ভ্রান্তির পরম্পরা মাত্র। আশ্চর্য!

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রেয় ও প্রেয়

যাহা ভাল লাগে তাহা সব সময়ে আমার কল্যাণকর হয় না। ভাল লাগার পশ্চাতে আমার প্রচ্ছন্ন আসক্তি, লোভ, স্বার্থপরতা থাকিতে পারে। শুধু ভাল লাগাকেই যদি আমার কর্মের নিয়ামক করিয়া বসি, তাহা হইলে হয় তো কোন অসতর্ক মুহূর্তে আমি মোহের কবলে পড়িয়া যাইতে পারি। সেইজন্য বিবেকী ব্যক্তি প্রথমেই 'কেন ভাল লাগে' —ইহা বিচার করিয়া দেখেন। যখন বুঝেন কোন কিছুতে চিত্ত যে আকৃষ্ট হইয়াছে উহার ভিতর ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি নিহিত নাই তখনই তিনি সেই আকর্ষণকে বরণ করেন, তৎপূর্বে নয়। নির্বিচারে ভাল লাগিবার বিষয়ের নাম প্রেয়। উহার প্রেরণা ভোগ।

প্রেয়ের প্রতি টান জীব-জীবনের দুরতিক্রমণীয় প্রাথমিক বিধান। জন্মিয়া অবধি আমরা ভাল লাগার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া যাই। অবশ্য পশুত্বের স্তরে সে বন্ধন কিছু নিন্দনীয় নয়। আহার নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তিগুলি সারাজীবন ধরিয়া পশু চরিতার্থ করিয়া যায়; তাহার বিবেক নাই, এই চরিতার্থতার শুভাশুভ বিচারের তাই কোন প্রশ্নই উঠে না। মনুষ্যত্বের স্তরে কিন্তু ভাল লাগিলেও জৈবিক তৃষ্ণাগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কেননা মানুষের জীবন শুধু রক্তমাংসের দেহে সীমাবদ্ধ নয়; তাহার মন আছে, আত্মা আছে, পরিবার আছে, সমাজ, সভ্যতা আছে। অবাধ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি প্রিয় হইলেও তাই বরণীয় নয়, কেননা উহা তাহার বৃহত্তর জীবনের অর্থাৎ তাহার মানসিক, আত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিপোষক নাও হইতে পারে। বৃহত্তর জীবনের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের নাম শ্রেয়ঃপথ। উহার দ্বিতীয় সংজ্ঞা—ত্যাগ। শ্রেয় জীব-জীবনের স্বাভাবিক বিধান নয়, বহুসাধনলভ্য শক্তি। পশু এ শক্তি লাভ করিতে পারে না, মানুষই পারে, সকল মানুষ নয়—বিশ্বপ্রকৃতির আপাত রীতির উপর যাহার প্রাণে বিদ্রোহ জাগিয়াছে সেই মানুষ।

এই বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে—মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সামঞ্জস্য ও পরিপূর্ণতার জন্যই। জন্মাবধি যে শৃঙ্খল দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে বাঁধিয়াছেন তাহা অন্ধভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া জীবত্ব—কিন্তু মনুষ্যত্ব নয়। মানুষ প্রকৃতিকে বশ করিবে ইহাও যে সৃষ্টির এক উচ্চতর বিধান। অতএব জৈবপ্রকৃতিকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের স্বভাব—উন্নততর ধর্ম—তাহার আধ্যাত্মিক সত্তার অভিব্যক্তি। শ্রেয়ের পথ হাজারটি ব্যক্তির নিকট অত্যদ্ভুত ও নিষ্ফল লাগে বলিয়া উহার মূল্য কমিয়া যায় না। একজনও যদি ঐ পথে চলিতে সাহসী হয়, চলিয়া মহত্তর কল্যাণ লাভ করে, তাহা হইলেও শ্রেয়ের মহিমা প্রমাণিত হইয়া যায়। সুখের বিষয় মানুষের ইতিহাসের প্রথম হইতেই পৃথিবীতে শ্রেয়কামীর অভাব কখনও হয় নাই।

ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা যে ভাল লাগা—রজ ও তম গুণে আচ্ছন্ন মন দিয়া যে প্রিয়ত্ব-বোধ, উহা মানুষের উচ্চতর প্রকৃতিকে বিকশিত হইতে দেয় না। উহা মানুষকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, স্বার্থপর করে, পরিবার ও সমাজের কল্যাণের চিন্তা করিতে দেয় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'সখার প্রতি' কবিতায় লিখিয়াছেন—"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন।"

জীবনের পরম লক্ষ্য সত্য; —সুখও নয়, দুঃখও নয়। যে চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা সত্য-লাভের অনুকূল তাহাই শ্রেয়। শ্রেয়ের পটভূমি হইল ক্ষুদ্র আমিত্বের বিসর্জন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বলিদান। উহা কঠিন কথা সন্দেহ নাই কিন্তু

পরিপূর্ণতার স্বপ্ন যাঁহাকে পাগল করিয়াছে, সত্যের আহ্বান যিনি শুনিতে পাইয়াছেন তিনি ঐ কষ্টকে গ্রাহ্য করেন না। ঐ কষ্ট তাঁহার তপস্যা, তপস্যায় তাঁহার আনন্দ। বৃহত্তম লাভের জন্য আপাত-রমণীয়ের ত্যাগে তাঁহার শ্রেষ্ঠ মনীষার পরিচয়।

এই কষ্টও কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়, প্রেয়ের বিচ্ছেদ বরাবরের জন্য নয়। আন্তরিকতা থাকিলে তপস্যায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত। শ্রেয়ের পথে চলিয়া লক্ষ্যে যে পৌঁছানো যায়, সত্যকে যে লাভ করা যায় ইহা সুনিশ্চিত। তখন? তখন সুখ-দুঃখের পারে সর্বাবগাহী জ্ঞান ও আনন্দ জীবনে নামিয়া আসে, সমস্ত জীবনকে ছাইয়া থাকে, জীবনকে ছাপাইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে। অভূতপূর্ব কল্যাণ দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়—পরিবারে, সমাজে, সমগ্র মানবগোষ্ঠীতে। সে কল্যাণ বর্তমানেই ফুরাইয়া যায় না, ভবিষ্যতের জন্যও সঞ্চিত থাকে। প্রেয়ও ফিরিয়া আসে—সীমাবদ্ধ সাময়িক ক্ষয়িষ্ণু মূর্তিতে নয়, অসীম চিরন্তন অপরিবর্তনীয় রূপ লইয়া। 'প্রিয়' তখন সম্মুখে পশ্চাতে উর্ধ্বে নিম্নে ক্ষুদ্রে বৃহতে—সব কিছুতেই প্রিয়ের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিছুই বাদ পড়ে না, ভাল লাগার এলাকা তখন সারা বিশ্ব জুড়িয়া। প্রেয়-শ্রেয়ের পার্থক্য তখন মুছিয়া গিয়াছে।

আজিকার পৃথিবীতে শ্রেয়ের কথা বলিবার লোক কম, শুনিবার ও শ্রেয়োমার্গে চলিবার নরনারী আরও অল্প। তথাপি শ্রেয়োদৃষ্টি ব্যতীত বিশ্বের বিক্ষোভ ও অশান্তি দূর হইবার নয়। জৈবপ্রকৃতিকে বেড়িয়া যে সুখপিপাসা বর্তমান, উহার অবাধ বিলাসের জন্যই তো মানুষ আজ কাম, লোভ, হিংসা ও দম্ভে উন্মত্ত পিশাচ। বাহিরে তাহার সভ্যতার মুখোস, ভিতরে সে নির্লজ্জ বর্বর।

ফিরিয়া চল মানুষ জৈবস্বভাব হইতে আত্মিক স্বভাবে, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে, দেবত্বে। সুখ অপেক্ষা সত্যকে সম্মান করিতে শিখ, ভাল লাগাকে ছাড়িয়া কল্যাণকে বরণ করিতে প্রস্তুত হও, ভোগ হইতে ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। ইহা দ্বারাই তোমার স্বকীয় মহিমার অভিব্যক্তি—তোমার পরিপূর্ণতার রূপায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জাগরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ জাগিতেছেন না। জাগিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু জাগিবার ঠাঁই না পাইয়া অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সম্মানিত অতিথিকে আনিতে গেলে বৈঠকখানা পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়, অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘর দারিদ্র্যের লক্ষণ। কিন্তু আমরা যে গৃহ পরিষ্কার করি নাই, স্তূপাকার জঞ্জাল জমাইয়া রাখিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিবেন কেন, জাগিবেন কেন? আমাদের রামকৃষ্ণ-নাম, রামকৃষ্ণ-জয়ধ্বনি তাই রামকৃষ্ণের অপমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যথা মর্মে অনুভব না করিয়া তাঁহাকে চাওয়া যায় কি? তাঁহার দায় আমাদের নিজের দায় বলিয়া স্বীকার না করিয়া তাঁহার পূজা করা যায় কি? উদগ্র ধনলালসা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া রামকৃষ্ণকে কুর্নিশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে জাগানো যায় না। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের পেটিকাটি সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার জীবন্ত স্পর্শ পাওয়া যায় না। অথচ তিনি তো আসিয়াছিলেন আমাদের ঘুমন্ত চেতনার জাগৃতিরূপে প্রকাশ পাইতে, নিজেকে উজাড় করিয়া বিতরণ করিতে, আমাদের দারিদ্র্য ঘুচাইয়া আমাদিগকে সম্রাট করিতে। আমরা সেই প্রকাশ-সম্ভাবনায় ভয় পাইয়া গেলাম, তাঁহার বিত্ত চাহিলাম না। মূঢ়তা আমাদিগেরই। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় কুঠীর ছাদ হইতে নামিয়া পঞ্চবটীতে ধ্যানে বসিয়াছেন। কে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইবে?

হয় তো কেহ নাই, হয় তো বা কেহ কেহ আছে নাম-না-জানা সহস্রদের ভিড়ে আত্মগোপন করিয়া, গোপন থাকিয়াই হয় তো তাহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লইবে, কিন্তু রামকৃষ্ণের অর্ধমুদিত চক্ষের

দাক্ষিণ্যদৃষ্টি তাহারা নিশ্চিতই লাভ করিয়া যাইবে না কি? সেদিন দেখিয়াছিলাম একজনকে। অবসর-প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শুঁড়ার দরিদ্রপল্লীর এক সঙ্কীর্ণ গলিতে একটি জীর্ণ গৃহে বাস করেন। অনেক কষ্টে ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন, সম্প্রতি সে চাকরিতে ঢুকিয়াছে। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন,—ব্রজবল্লভ বাবু, এইবার ছেলের বিবাহ দিন, যৌতুকের দু'পাঁচহাজারে ভাঙ্গা বাড়ীটি ভাল করিয়া মেরামত করিয়ে নিন। বন্ধুদের পরামর্শ পর্যালোচনা করিতে করিতে ব্রজবল্লভ বাবু কখন শুইয়া পড়িয়াছিলেন মনে নাই। নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রিতে রামকৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়াছেন। ব্রজবল্লভ বাবু রোমাঞ্চিত। শয্যা ছাড়িয়া ঘরে উন্মত্তের মতো পায়চারি করিতে লাগিলেন। নিজে নিজে বলিতেছেন,—আমি রামকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি না দেখেছিলেন টাকা মাটি—মাটি টাকা? ছেলে বেচে টাকা আনবো আমি? না—না—না। কিছুদিন পরে অত্যন্ত দরিদ্র একটি উদ্বাস্তর সুশীলা কন্যাকে একেবারেই কিছু না লইয়া পুত্রবধূরূপে তিনি গৃহে আনিলেন। বন্ধুরা তাঁহাকে নির্বুদ্ধি বলিয়া ধিক্কার দিল—কিন্তু ব্রজবল্লভ বাবুর বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরূপে তাঁহার অন্যরূপ করিবার উপায় ছিল না।

কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরবঙ্গস্থিত একটি কারখানার প্রৌঢ় ম্যানেজারের কথা মনে পড়ে। পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে কারখানাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর একজন বড় কর্তাব্যক্তি কারখানা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। কার্যকর্ম দেখিয়া খুশী হইয়াছেন। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি যাহা করিয়াছ এবং করিতেছ তাহাতে এত অল্প মাহিনাতে কি করিয়া এতদিন সন্তুষ্ট রহিলে? আমি দিল্লীতে গিয়া শীঘ্রই তোমায় বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছি। ম্যানেজার শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। কহিলেন, না, আমার প্রয়োজন নাই। তবে আপনি ঐ টাকাটা যদি আমার অধস্তন স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিতে ভাগ করিয়া দেন তো বড়ই অনুগৃহীত হইব।

ডক্টর আম্বেদকরের ধর্মান্তর গ্রহণ

ডক্টর বি আর আম্বেদকর সস্ত্রীক গত ১৪ই অক্টোবর নাগপুরে প্রায় দুই লক্ষ তপশীলী সম্প্রদায়-ভুক্ত নরনারীর সহিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের প্রবীণতম বৌদ্ধসন্ন্যাসী কুশীনারের মহাথেরো চন্দ্রমণি ঐ দীক্ষাদানকার্য সম্পন্ন করেন। আম্বেদকর বলিয়াছেন,—"যে প্রাচীন ধর্মকে আমি ত্যাগ করিলাম উহা অসাম্য এবং অত্যাচারের প্রতীক। আজ আমি নবজন্ম লাভ করিয়াছি। অবতারবাদে আমি বিশ্বাস করি না। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা আমি অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। আমার ধারণা যে, সকল হিন্দুই একদিন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবে এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণেরও অধিকাংশ উহা অনুসরণ করিবে। ভারতবর্ষকে একদিন বৌদ্ধ দেশ হইতেই হইবে।"

ডক্টর আম্বেদকর স্বীকার করেন যে—যাহারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল তাহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ক্রমশঃ এই ধর্মান্তর গ্রহণের তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন।

পরদিন একটি জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডক্টর আম্বেদকর বলেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগের সঙ্কল্প তিনি ১৯৩৫ সাল হইতেই পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদিও তিনি হিন্দু হইয়া জন্মাইয়াছেন তবুও মৃত্যুর সময় তাঁহাকে যেন হিন্দু থাকিয়া না মরিতে হয়। তাড়াহুড়া করিয়া কোন কাজে তিনি বিশ্বাস করেন না বলিয়া ধর্মত্যাগের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে তাঁহার কুড়ি বৎসর লাগিয়াছে। তিনি বলেন,—"ধর্মের নামে অস্পৃশ্যরা অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছে। জাতিভেদ এবং সামাজিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম অচ্ছুতগণের উন্নতির জন্য কোন সুযোগই দেয় নাই। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ

হইতে মুক্ত এবং ন্যায় ও সাম্যের উপর গঠিত। অতএব অস্পৃশ্যগণের একমাত্র ভরসা বৌদ্ধধর্মই।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতারূপ জাতীয় কলঙ্কের জন্য ডক্টর আম্বেদকরের অপেক্ষা কম মর্মপীড়া ভোগ করেন নাই—কিন্তু তাঁহারা উহার প্রতীকারের জন্য ডক্টর আম্বেদকরের পন্থা অবলম্বনের কথা ভাবিতে পারেন নাই। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ সামাজিক ব্যাধি—হিন্দুধর্মকে উহার জন্য দায়ী করা সঙ্গত নয়। ডক্টর আম্বেদকরের ন্যায় একজন প্রতিভাশালী পণ্ডিত হিন্দুধর্মকে কি করিয়া "অসাম্য ও অত্যাচারের প্রতীক" বলিয়া ঘোষণা করিলেন ইহা আশ্চর্য। ডক্টর আম্বেদকর যে অধ্যবসায় ও সংগঠনীশক্তি লইয়া কুড়ি বৎসর ধরিয়া দুই লক্ষ অনুগামীকে স্বধর্মত্যাগে প্ররোচিত করিলেন উহা দ্বারা তিনি যদি স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই বিরাট জনসঙ্ঘকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুগণের শিক্ষাদীক্ষাদানে নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে তাহাদের অনেক বেশী কল্যাণ হইত। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বাধীন ভারত উত্তরোত্তরই সচেতন হইতেছে। এই সামাজিক কলঙ্ক ধীরে ধীরে যে কমিয়া আসিতেছে তাহা সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রকর্ণধারগণও ইহা লইয়া ভাবিতেছেন এবং এক এক করিয়া সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ডক্টর আম্বেদকরের চমকদার সাম্প্রতিক কাজটি সময়ের সহিত মোটেই খাপ খাইল না। বরং সন্দেহ বাড়িয়া গেল এই ধর্মান্তরগ্রহণ কি ধর্মভাবের প্রেরণা হইতে না রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্ররোচনা হইতে?

এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপাল দত্ত কৌশন লিখিয়াছেন (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৬)—

"মজার ব্যাপার এই যে, ডক্টর আম্বেদকর জাতিপ্রথা এবং তপশীলীসম্প্রদায়ত্বের অবাঞ্ছনীয় চিহ্নের সবগুলিই বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও বজায় রাখিতে চান, কেননা ধর্মান্তরিত অচ্ছুৎভ্রাতাদের জন্য যাবতীয় (রাষ্ট্রীয়) সুযোগসুবিধাগুলি তাঁহার চাই। * * * অস্পৃশ্যতার সমস্যা নূতন ধরণের তপশীলী সম্প্রদায় বা অচ্ছুৎ সৃষ্টি করিয়া মিটিবার নয়। অস্পৃশ্যতারীতির পশ্চাতে যে মনস্তত্ত্ব ও চিন্তাপ্রণালী রহিয়াছে উহার পরিবর্তন সাধন না করিলে তথাকথিত একজন অচ্ছুৎ হিন্দু বা বৌদ্ধ কিংবা অপর কোন ধর্মাবলম্বী হইল ইহাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য ঘটিবে না। * * * ভারতীয় সমাজের অস্পৃশ্যতারূপ দোষ—যাহা ইতিমধ্যে অপসৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—উহা নিঃশেষে দূর করিবার কোন নূতন সমাধান ডক্টর আম্বেদকর দিতে পারেন নাই। আজ কম হিন্দুই পাওয়া যাইবে যাহারা অস্পৃশ্যতা বজায় রাখিতে চায়। * * * হিন্দুধর্ম হইতে অস্পৃশ্যতা দূর হইতেছে, কিন্তু ডক্টর আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মে তপশীলী জাতি বা অচ্ছুৎ শব্দটি প্রচলিত রাখিতে চাহিতেছেন।"

ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পর ১৫ই অক্টোবর নাগপুরে একটি জনসভায় ডক্টর আম্বেদকর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "মানুষ শুধু ভাত রুটি খাইয়া বাঁচে না, তাহার মনের খোরাকও চাই। ধর্ম মানুষের মনে আশা উদ্বুদ্ধ এবং তাহাকে কর্মে প্ররোচিত করে। হিন্দুধর্ম নিপীড়িতগণের সকল আশা-উৎসাহ নষ্ট করিয়াছে; সেই জন্যই আমার ধর্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল, আমি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছি।" জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সহস্রশাখ হিন্দুধর্মের বিপুল শাস্ত্রসম্ভার ও অগণিত সাধুসন্তের জীবন্তবাণী হইতে মনের খোরাক যিনি খুঁজিয়া পাইলেন না, নবগৃহীত ধর্মের সত্য দেখিবার মত চোখের শক্তি তাঁহার আছে কি? বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ কি আশমান হইতে আসিয়াছিল, না সনাতন ধর্মের শিক্ষা ও ঐতিহ্যই তিনি তাঁহার জীবনে ও বাক্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন? আজ যে শাস্তার ২৫০০তম মহাপরিনির্বাণের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করিতেছে ইহার প্রেরণা কোথায়? তথাগতের জীবন ও উপদেশ হিন্দু-ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই বিশ্বাসই নয় কি?

ডক্টর আম্বেদকরের চিন্তাধারা আদৌ পরিচ্ছন্ন নয়, তাঁহার কর্মও সুসমঞ্জস নয়। অশিক্ষিত দুই লক্ষ (এই সংখ্যা সম্ভবত অতিরঞ্জিত) ভারতবাসীকে 'বৌদ্ধ' ছাপ মারিয়া তিনি তাহাদের কোন কল্যাণ করেন নাই, বরং তাহাদের মধ্যে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার বীজ উপ্ত করিয়া জাতীয় ঐক্যের মহৎ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন।

শ্রমের পরিবেশ

সুধীর বাবু তিনটি বাঙ্গালী যুবকের জবানবন্দী শুনিতেছেন। তিনজনই বেকার, লেখাপড়া যাহা জানে তাহা দ্বারা অফিসের চাকরি সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, বিশেষতঃ পাড়াগাঁ হইতে এই বিপুল কলিকাতা শহরে আসিয়া। রাজেশ্বর রায় বৈদ্যের ছেলে, যণ্ডামার্কা চেহারা, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ; অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সে রিকসা টানিতে গিয়াছিল। রিকসার বাঙ্গালী মালিক স্বজাতিপ্রীতিতে রাজেশ্বরকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। দশদিন যুবকটি আন্তরিকতার সহিত অচিন্তিতপূর্ব এই নূতন কর্মে লাগিয়াছিল, রোজগারও মন্দ করে নাই। বাঙ্গালীর ছেলেরা শ্রমসাধ্য কাজে আজকাল আর পূর্বের মত অপমান বোধ করে না, রাজেশ্বরও করে নাই। তথাপি রাজেশ্বরকে একাদশ দিনে এই কাজটি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

সুধীর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন? রাজেশ্বর বলিল, যদিও তাহার বাপ ঠাকুরদাদা স্বপ্নেও কখনো ভাবেন নাই তাঁহাদের বংশধরকে পেটের ভাত রাজধানীর পথে রিকসা টানিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে তবুও সে এই জীবিকা-পথ সানন্দে বরণ করিয়াছিল। পরিশ্রম হইলেও সে ঐ পরিশ্রমকে অস্বীকার করে নাই, কিন্তু বাধা হইল কাজের পরিবেশ। যাহারা বেশীর ভাগ রিকসা টানে তাহাদের দলের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ অপরিহার্য, কিন্তু তাহাদের কথাবার্তা, জীবনরীতি রাজেশ্বরের পক্ষে দুঃসহ। দশদিনে সে অনুভব করেছে তাহার ভিতরের মানুষটি অর্ধমৃত হইয়া গেছে।

নীলকমল মজুমদারের বিবৃতিও একই প্রকার। উনিশ বৎসর বয়সের কায়স্থ যুবক খবরের কাগজ ফিরি করিতে গিয়াছিল। বাঙ্গালী বাবুকে তাহাদের রুটীতে ভাগ বসাইতে আসিতে দেখিয়া ঐ কাজের অবাঙ্গালী ফিরিওয়ালারা জোট করিয়া নীলকমলের পক্ষে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল যে সাত-দিন পরেই তাহাকে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে।

ধনঞ্জয় প্রধান মেদিনীপুরের ছেলে। জোড়া-বাগানের ফুটপাথে সে একটি পুরী-তরকারী তেলে-ভাজার দোকান খুলিয়াছিল। বৃহৎ শ্রমিক বস্তি এই অঞ্চলে—শ্রমিকরাই খরিদ্দার। বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ জন খাবারওয়ালা ফুটপাথে ঐরূপ অস্থায়ী দোকান চালাইয়া দিনগুজরান করে। তাহারা অধিকাংশই অবাঙ্গালী। ধনঞ্জয় ভাবিয়াছিল বাংলা-দেশের রাজধানীতে বেকার বাঙ্গালী যুবকের, যে কোন জীবিকা-পন্থা অবলম্বনের দাবী নিশ্চিতই প্রথম-গ্রাহ্য। তাই বড় আশা লইয়া সে দোকান দিয়াছিল। ক্রেতাও জুটিতেছিল কিন্তু তথাপি তিনমাস তেরো দিন পরে তাহাকে দোকানটি বন্ধ করিতে হইয়াছে। পুলিশ এমন অবস্থা সৃষ্টি করিল যে তাহার উপায়ান্তর ছিল না। তাহাদের 'হল্লার' শিকার অন্নহীন অন্নসংস্থানকামী বেকার দুর্বল বাঙ্গালী যুবকরা। অপর যাহারা ফুটপাথে ভিয়ান বসায় তাহারা কলিকাতার সিপাহীদের স্বজাতি। সিপাহীদের স্বজাতিপ্রীতি অবশ্যই দূষণীয় নয়, কিন্তু সুধীর বাবু ভাবিতে লাগিলেন বাঙ্গালীর এমন স্বজাতি-প্রীতি কোন্ আশমান হইতে কবে নামিয়া আসিবে যাহাতে শত শত সহস্র সহস্র উৎসাহী বেকার বাঙ্গালী যুবককে শারীর শ্রম দ্বারা অন্নসংস্থান করিতে গিয়া শুধু পরিবেশের জঘন্যতা ও নিষ্ঠুরতার জন্যই কাজ বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে না হয়?

ভাবের ভুবন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভাব দিয়ে এই ভুবন গড়া।
ভেবে ভেবে তাই, খেই নাহি পাই,
কেন এ মৃত্যু জন্ম জরা?
কি ভাবে যে তিনি কোথায় থাকেন,
কি ভাবে কাহাকে কোথায় রাখেন,
ভাব-সাগরেতে জাল ফেলে দেখি—
বড়ই কঠিন এ মাছ-ধরা।

২

বস্তু তো দেখি যে দিকে চাহি,
এত রূপ, এত গন্ধ ও রস
ছেঁকে দেখি তার কিছুই নাহি।
ভাবের পিণ্ড খায় ঘুরপাক,
দেখো—ভাবো—থাকো হইয়া অবাক,
কিংবা কেবল ঝিলিমিলি হেরি—
চলে যাও তনু-তরণী বাহি।

৩

ভাবে ভাবে এই ভুবন গাঁথা—
ভাবগ্রাহীর ইচ্ছা ব্যতীত
গাছ থেকে ঝরে' পড়ে না পাতা।
সবেই জড়িত, সবে সমাসীন,
তবু তিনি যেন কত উদাসীন,
সৃষ্টি স্থিতি লয় কিছু নয়
এ উৎসবের সেই বিধাতা।

৪

কাছে থেকে সে যে সরেই রবে—
ভাব করে সাথে, ভেবে দিনে রাতে,
ভাব দিয়ে তাকে ধরিতে হবে।
কেঁদে কেঁদে হতে হবে বুঝি রাই,
ডেকে ডেকে উই-ঢিপি হওয়া চাই,
সদা পথ চাও, তবে যদি পাও
বহু-বল্লভ সে দুর্লভে।

পরলোকে সি রামানুজাচারী

দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনতম বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের কর্মসচিব, পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রী সি রামানুজাচারী গত ১৮ই কার্তিক (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৬) বেলা ১২-৫৫ মিনিটে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি পীড়িত ছিলেন।

শ্রীরামানুজাচারীর ন্যায় ভগবন্নিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মযোগী সংসারে বিরল। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর নন) রামস্বামী আয়াঙ্গার যৌবনের প্রারম্ভে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত উপরোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাঁহাদেরই প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফল। দুই ভ্রাতার নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা ও উন্নত চরিত্র তাঁহাদিগকে মাদ্রাজের আপামর জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করিয়া রাখিয়াছিল। 'রামু' ও 'রামানুজ' বলিয়া তাঁহারা সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। ১৩৩২ সালে 'রামু'র দেহত্যাগের পর 'রামানুজ' উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটির কর্মসচিব হন এবং তাঁহার অনলস উদ্যম ও প্রতিভা দ্বারা উহার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। শ্রীরামানুজাচারী মাদ্রাজ সরকারের আণ্ডার

সেক্রেটারী ছিলেন; ১৯৩২ সালে অবসর লইবার পর তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময় মিশনের উক্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্যই ব্যয়িত হইত। তিনি একজন কৃতী সঙ্গীতগুণী ও অভিনেতাও ছিলেন। 'সেক্রেটারিয়েট পার্টি' সংগঠন করিয়া নানাস্থানে গীতাভিনয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির জন্য ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'রামকৃষ্ণ-কৃপা অভিনেতৃ-সংসদ' তাঁহার গঠিত অপর একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার মাধ্যমেও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্ট্‌স্ হোমের জন্য এ পর্যন্ত ২½ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

সাংসারিক দায়িত্ব বহন করিয়াও নিঃস্বার্থ জনসেবার যে জলন্ত আদর্শ শ্রীরামানুজাচারী দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। তাঁহার সাধ্বী পত্নী কয়েক বৎসর পূর্বে পরলোকগতা হন। দুই কন্যা ও তিন পুত্র বর্তমান রহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কৃতী ভক্ত এবং স্বামীজীর একনিষ্ঠ অনুগামীর বিদেহ আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

হরি ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাসেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত বিভিন্ন জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য বিবরণী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত তিন সপ্তাহে ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থানার উখিলা-পাইকপাড়া কেন্দ্র হইতে ১৬ খানি গ্রামের ৩৪০টি পরিবারের মধ্যে ৮১ মণ ২১½ সের চাউল, ১৬ মণ ডাল এবং ২ মণ লবণ বিতরণ করা হইয়াছে।

হাওড়ার ডোমজুর থানার রাজাপুর কেন্দ্র হইতে ৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৫ খানি গ্রামের ৪১৯টি পরিবারের মধ্যে ২০ মণ ৪ সের চাউল ও ৩৫০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ বিতরণ করার পর উক্ত কেন্দ্র বন্ধ করা হইয়াছে।

বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম কেন্দ্র হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহে ১৩টি গ্রামের ৬৫৬টি পরিবারের মধ্যে ৩৫১ মণ ২৩ সের চাউল, ৩২ মণ ২০ সের ডাল, ১৪ মণ লবণ এবং ২০৪ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, বার্লি ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার নন্দনঘাট কেন্দ্র হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহে ১৩ খানি গ্রামের ২৯০টি পরিবারের মধ্যে ১৮৭ মণ ৩৬ সের চাউল এবং ৩৩ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। তৎপরে উক্ত কেন্দ্র বন্ধ করা হইয়াছে।

৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত আসানসোল কেন্দ্র হইতে বন্যাবিধ্বস্ত অংশের আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এবং পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্র হইতে বর্ধমান জেলার ৬ খানি ও বীরভূম জেলার ৯ খানি গ্রামে ২০ মণ ৩২½ সের চাউল, ১২০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ১০৩ খানা নূতন কম্বল, ১২০ খানা নূতন ধুতি ও শাড়ী, ৬০টি নূতন প্যান্ট, ফ্রক ইত্যাদি, ২০টি পুরাতন জামা এবং সামান্য টাকা নগদ বিতরণ করা হইয়াছে।

সেবাকার্যের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট উপযুক্ত সাহায্য ভিক্ষা জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে:

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩।

(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা-১৩।

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
৭।১১।৫৬

ঈশ্বর কেমন?

স্বামী নিখিলানন্দ

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির দেশ ভারতবর্ষে ভগবানের সত্যতা সম্বন্ধে কদাচিৎ কোন প্রশ্ন উঠে। ভগবানের বাস্তবতার জীবন্ত প্রতীক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দেখা মেলে ভারতের সর্বত্র। আজও ৺কাশীধামে শত শত লোককে অধ্যাত্ম সাধনায় জীবনের অন্তিমকাল ব্যয়িত করিতে দেখা যায়। হিন্দুর নিকট ধর্মই প্রকৃত বন্ধু, তাই সে কর্মজীবনের পর নিশ্চেষ্টভাবে সময় না কাটাইয়া ধর্মানুশীলনে আত্মনিয়োগ করে। মৃত্যুকালে সকলকেই পুত্র-কলত্র, জাগতিক সম্পদ ও সেই সঙ্গে এই জড়দেহকেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এই জীবন হইতে জীবনান্তরে যাইবার সময় একমাত্র ধর্মই প্রকৃত মিত্রের মত অনুগামী হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলে মানুষের উচিত পরিবারের জন্য নিজেকে, স্বদেশের জন্য পরিবারকে, বিশ্বের জন্য স্বদেশকে, এবং ভগবানের জন্য সব কিছুকে পরিত্যাগ করা।

ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানকেই হিন্দু ঈশ্বরাস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া জানে। ঈশ্বর আছেন কারণ বহু সন্ত মহাপুরুষ তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহারাই তো ঈশ্বরাস্তিত্বের অতি উদ্দীপক প্রমাণ। তাঁহাদের সমক্ষে কোন অকপট লোকের পক্ষে সংশয় পুষিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, এই সে দিনও কলিকাতার যে কোন লোক সন্দিগ্ধমনে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গিয়া তাহার সকল সন্দেহের নিরসন করিতে পারিত। এই সকল স্মৃতি আজও উজ্জ্বল ও অম্লান হইয়া আছে। কেহ যদি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটিতে বা যেখানে বসিয়া তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন সেই পঞ্চবটীমূলে গিয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হইয়া বসে তাহা হইলে অতিচেতন অনুভূতির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ থাকিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিত কালে বহু অজ্ঞেয়বাদী তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা হয়ত শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক তন্ময়তা বুঝিতেন না, কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি তাঁহাদের মনকে যে উর্ধ্বে উঠাইয়া রাখিয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করিতেন। মানুষের নিম্নপ্রকৃতিকে—লোভ ও লালসাকে দমন করা যায় ও এই জীবনেই যে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া সম্ভব, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই তাহার প্রমাণ। আর প্রতিটি মানুষই এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।

জগতের অশুভ ও দুঃখকষ্ট সময়ে সময়ে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আনিয়া দেয়। ভগবান যদি ন্যায়বান ও করুণাময় কেন তবে দ্বেষ হিংসা, অন্যায় ও যুদ্ধবিগ্রহ? মানুষের ব্যাপারে তিনি কি একেবারেই উদাসীন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—যিনি অনন্ত তাঁহার বাস্তবতাকে জগতে আমাদের এই দু'মিনিটের কার্যকলাপ দিয়া বিচার করা যায় না। ভগবান তো আর পৌরসভার ঝাড়ুদার নন যে তাঁহার মুখ্য কাজই হইবে দুঃখ দারিদ্র্য ও দৈহিক পীড়াদি দূর করা। গীতা বলেন, ভগবান মানুষের শুভাশুভের জন্য দায়ী নন, দায়ী মানুষ নিজে। মানুষের মায়া-ভ্রান্ত অবস্থায় এইগুলি উপস্থিত হয়। অন্তরাত্মা অজ্ঞানের আবরণে আবৃত হইলেই স্বার্থপরতা আসে আর মানুষ ভালবাসা ও ঘৃণা অনুভব করে। ইহাদের প্ররোচনাতেই সে ভালমন্দ কর্ম এবং সুখদুঃখ ভোগ করে। সাংসারিক জীবন কর্মনীতিতে চালিত। কিন্তু ঈশ্বর চুম্বকের মত সকলকে আকর্ষণ করেন। সৎকর্ম-ফলে স্বার্থপরতা দূর হইলে ও ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হইলে, মানুষ তাঁহার অদম্য আকর্ষণ

শক্তি অনুভব করে। ঠিক ঠিক ভগবৎপ্রেমিক দৈহিক যাতনায় পীড়িত হয় না। ক্যান্সারের অসহ্য যাতনা অনুভব করার কালেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই গাহিতেন—"দুঃখ জানে আর শরীর জানে। মন তুমি আনন্দে থেকো।" যেমন ব্যক্তিগত তেমন সমষ্টিগত কর্মও জাতির উন্নতি বা অবনতির জন্য দায়ী। জাতীয় স্বার্থপরতা, লোভ ও শক্তি-লাভের কামনা যুদ্ধ ডাকিয়া আনে। কিন্তু শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা সর্বকালেই ভগবদাকর্ষণ অনুভব করেন।

ঈশ্বরের স্বভাব কিরূপ? হিন্দু ঐতিহ্যানুযায়ী তিনি অনন্ত। হিন্দুর মতুয়ার বুদ্ধি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, আমরা যতটুকু জানিয়াছি ঈশ্বর ততটুকুই এবং উহা ব্যতীত আর কিছুই নন ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ঈশ্বরকে তিনি প্রায়ই পুষ্করিণীর সহিত তুলনা করিতেন। লোক বিভিন্ন আকারের পাত্র সহযোগে পুষ্করিণী হইতে জল ভর্তি করিয়া লয়। নিজের মাপানুযায়ী প্রতিটি পাত্র একই জল দ্বারা পূর্ণ হয়। ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত ভাব হইতে ভক্ত যাহা অনুভব করিতে পারিবে কেবল সেইটুকুই প্রকাশ করেন এবং তাহাকে সেই বিশেষ ভাবের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিও দিয়া থাকেন। উহাকে অবলম্বন করিয়াই সে চরমে সম্পূর্ণ ঈশ্বর-চেতনা লাভ করে। ঈশ্বরকে প্রায়ই দ্রষ্টার চিন্তা-প্রতিফলন-ক্ষম 'চিন্তামণি' নামক কাল্পনিক পাথরের সহিত তুলনা করা হয়; কারণ তাঁহাতে প্রতিটি চিন্তার প্রতিফলন হয়। হিন্দুধর্মে তাঁহাকে সাধারণত সৎ-চিৎ-আনন্দঘন বলা হয়; তিনি অমর, অভী ও 'অনন্ত সৎগুণের আধার; তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও রক্ষক।

হিন্দুদার্শনিকগণ ঈশ্বরের বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত—আপেক্ষিক ও তুরীয় এই দুইটি ভাবের কথা বলিয়া থাকেন। আপেক্ষিকটিকে আবার সর্বব্যাপী এবং 'ব্যক্তি' উভয়রূপেই ধারণা করা যায়। ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ও তুরীয়ভাব গভীর ও উচ্চতম। ইহার অনুধ্যানকালে মানুষ সংসার ও নিজের ব্যক্তিত্ব এই দু'য়ের কোনটিকেই দেখে না। উপনিষদ্ বলে, প্রিয়তম পত্নীকে আলিঙ্গনকালে মানুষের যেরূপ বাহির ও ভিতর বিশ্বের কোন জ্ঞান থাকে না সেইরূপ পরমেশ্বরে অভিনিবিষ্ট আত্মাও নিজেকে বা অপর কাহাকেও দেখিতে পায় না। সৌন্দর্য-ধ্যানেও এই প্রকার একত্বানুভূতির স্ফুরণ হয়। তুরীয় সত্তা নির্গুণ। উহা মন ও ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত। উপনিষদ্ এই বিশ্বাতীত সত্তাকে "পুরুষ" বা "স্ত্রী" না বলিয়া, সর্বনাম পদ "ইহা" দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। এই সত্তাকে জ্ঞাতা বলা যায় না কারণ ইহার পর জ্ঞাতব্য বলিয়া কিছু থাকে না। ইহাকে ভাবুকও বলা যায় না কারণ চিন্তার ইন্দ্রিয় মন সেখানে নাই। ইহাকে স্রষ্টাও বলা যায় না কারণ সাধারণতঃ যে সকল প্রেরণার বশে মানুষ কাজ করে, সেগুলির একটিও ইহার নাই। বেদান্তে যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় সেই বিশ্বাতীত সত্তাকে একও বলা যায় না কারণ উহা দু'য়েরই অনুবন্ধীরূপে ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য ব্রহ্ম বিষয়ে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" বা "নেতি", "নেতি" বলা হয়। বিশ্বাতীত সত্তার অনুভূতি অবর্ণনীয়। তুরীয় ব্রহ্মানুভূতির পর শ্রীরামকৃষ্ণকে ওঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবার পূর্বে যেন তিনটি স্তর নামিয়া আসিতে হইত। অহং ও সংসারের বিন্দুমাত্র সচেতনতা থাকিলে সাধকের এরূপ নির্বিকল্প অবস্থা লাভ হয় না।

বিশ্বাতীত বা তুরীয় ভাবের নিম্নে বিশ্বময় বা আপেক্ষিক ভাব। সর্বব্যাপী ঈশ্বর ব্যক্তি নন কিন্তু প্রেম, দয়া ও করুণা প্রভৃতি মানবসুলভ গুণ-সম্পন্ন। ইনি বিশ্বাত্মা, সকলের সারবস্তু। উপনিষদ্ বলে, জগতে থাকিয়াও ইনি জগদতীত এবং জগতের মধ্যে থাকিয়া উহাকে চালনা করেন। উপনিষদে আছে পা না থাকিলেও ইনি সর্বত্রগ, হাত না থাকিলেও ইনি সব কিছুকে ধরেন এবং কান না থাকিলেও সব শোনেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

ইহার প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। ইনি এক সঙ্গে সব কিছু দেখেন ও অনন্তের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রত্যেকটি জিনিসের ধারণা করেন। সেইজন্য ইনি সদসদতীত। আংশিক দৃষ্টি দিয়া বস্তুবিচার করা সৎ নহে। আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন যিনি, তাঁহার নিকট আত্মাভিব্যক্তির যাহা সহায়ক তাহাই সৎ, কিন্তু স্বার্থপরতাতেই পাপের চরম প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায়, বিশ্বমনে যাহাই প্রতিভাসিত হয় তাহার একটি বিশ্বাত্মক অর্থ আছে। বিশ্বপরিস্থিতি হইতে কোন ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে মানুষ দুঃখভোগ করে। ব্যক্তিত্ব এক-প্রকার ভ্রান্তিবিশেষ; উপযুক্ত বিচারশক্তি উহাকে দূর করে। আত্মবিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে বিশ্ব হইতে একেবারে ঠিক পৃথক কোন ব্যক্তিত্ব মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে না। পিঁয়াজের খোসা একটি একটি করিয়া ছাড়াইলে ভিতরে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের প্রতি মমত্বেই দুঃখকষ্টযাতনা-বোধ জাগে। বিশ্বের সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলিলে দুঃখকষ্ট থাকে না, এমনকি মৃত্যুও তুচ্ছ হইয়া যায়।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের এই সর্বব্যাপী বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য প্রিয়জনের আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় অর্জুন ব্যথিত হইলেন। যুদ্ধ করিলে তিনিই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইবেন এই চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। বিশ্বমনে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট এই তত্ত্ব প্রকাশিত করিলেন। তথায় সব কিছুর প্রথম উদ্ভব হয় ও মানবকে নিমিত্ত করিয়া দৃশ্য জগতে উহার সমাধান হয়। পৃথিবীতে ভগবদিচ্ছা-পূরণে তাঁহারই যন্ত্র হইয়া কাজ করিবার কথা অর্জুনকে বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, যুদ্ধার্থে সমবেত বিপক্ষের এই সব বিবদমান যোদ্ধারা তুমি না মারিলেও বাঁচিবে না। অতএব উঠ, যশ লাভ কর! শত্রু জয় কর ও ঐশ্বর্যশালী রাজ্য ভোগ কর।

দেহ-চেতনার সহিত জড়িত মানুষের পক্ষে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ ধ্যান করা অতীব দুঃসাধ্য। এককালে জন্ম-মৃত্যু, প্রেম ও ঘৃণা, যুদ্ধ ও শান্তি, সৃষ্টি ও লয় সবই সর্বত্র ঘটিতে দেখা বড় বেদনাময় অভিজ্ঞতা। সামান্য সাংসারিক চিন্তায় মানুষ প্রায়ই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাকে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া লওয়া কতই না কঠিন! আবার পৃথিবী তো বিশ্বের একটি কণা মাত্র—অনন্ত সৃষ্টি সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। পরমেশ্বরকে তিনি ব্যক্তিরূপে, তাঁহার প্রার্থিত দেবতা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীবিষ্ণুরূপে দেখিতে চাহিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডের দিক হইতে ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তা বাস্তবতার অন্যতম বিকাশ। বাস্তবতাকে ব্যক্তি-ঈশ্বরের মধ্য দিয়া দেখা ঠিক যেন মধ্যাহ্ন তপনকে রঞ্জিত কাঁচখণ্ডের মধ্য দিয়া দেখার মত; উগ্র সুগন্ধিকে বস্ত্রখণ্ডে ছিটাইয়া উপভোগ করার মত। মানুষ ব্যক্তি-ঈশ্বরের স্রষ্টা নয়। ভক্তের মঙ্গলার্থে ঈশ্বর স্বয়ং ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করেন। আরও অনেকভাবে তিনি ব্যক্তিরূপ ধরিয়া আসেন। আদিম বীজ হইতে বিশ্ব যখন বিবর্তিত হইতে থাকে তখন সেগুলির আবির্ভাব হয়। উহারা স্বর্গস্থ পিতা, জিহোভা, আল্লা, শিব, কালী, বিষ্ণু ইত্যাদি নামে পরিচিত এবং বিশ্ব যতখানি সত্য উহারাও ততখানি সত্য। এই ব্যক্তি-আকারই প্রথম স্তর। ইহার উপরই নির্ভর করিয়া আমরা নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি লাভ করিতে পারি। খ্রীষ্ট এই ব্যক্তি-ভগবানকে "স্বর্গস্থ-পিতা" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রুশ, অর্ধচন্দ্র, প্রতিমা বা শব্দ-প্রতীক উচ্চারণ করিয়া যাঁহার সহিত অন্তরের সংযোগ স্থাপন করি, তিনিই

আমাদের প্রার্থনা ও পূজার লক্ষ্য। মানুষ যে আকারেই ভগবদরাধনা করুক না কেন, ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন। অবিচলিত প্রেমের সহিত তাঁহার ধ্যান করা উচিত, কারণ এই প্রেমেই তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। তিনি ভক্তের প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করেন, উহা পত্র পুষ্প বা এক অঞ্জলি জল, যাহাই হউক না কেন। লক্ষ্য তিনি, নির্ভর তিনি; প্রভু, সাক্ষী, আশ্রয়, বন্ধু, ত্রাতা ও মুক্তিদাতা তিনিই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রতীক ভগবান নহে। হিন্দু প্রতিমাকে ঈশ্বররূপে পূজা না করিয়া প্রতিমার সাহায্যে পূজা করে। প্রতিমাকে ঈশ্বররূপে পূজা করা পৌত্তলিকতা, কিন্তু প্রতিমার সাহায্যে ঈশ্বরের পূজা করা এক সার্থক পূজাপদ্ধতি। অসীমের চক্রবালে প্রতীক গবাক্ষ-স্বরূপ। চন্দ্রকে দেখাইতে মানুষ অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিন্তু অঙ্গুলি চন্দ্র নহে। ব্যক্তি-ঈশ্বর শেষে বিশ্বাত্মায় লীন হইয়া গিয়া চরমে তুরীয় সত্তাপ্রাপ্ত হন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা আছে। প্রেমই মানুষের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাপক। যথার্থ পূজা, পূজক ও ইষ্টের মধ্যে এক নিবিড় সম্বন্ধ পাতাইতে চায়। মানবসুলভ গুণবিশিষ্ট ভগবানকে চিন্তা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের অবতারত্ব, ভগবানের নররূপ ধারণ স্বীকার করে। ঈশ্বর মানুষের ত্রাণকর্তা হইলে মানুষের সঙ্কটকালে তাঁহাকে আসিতে হয়। গীতা বলেন যে, ধর্মের নাশ ও পাপের প্রাধান্য কালে ধার্মিকদের রক্ষণার্থে ও পাপীদের শাসনার্থে ভগবান অবতীর্ণ হন। সসীম মন ভগবানের অবতারত্ব বুঝিতে অক্ষম। ঈশ্বর কেমন করিয়া একইকালে নরদেহধারণ, মানবোচিত বাধাবিপত্তিস্বীকার ও নিজস্ব দৈবী সত্তার সংরক্ষণ করেন, বিচারদ্বারা তাহা অনুধাবন করা কঠিন। আচার্য শংকর তাঁহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকায় বলিয়াছেন নিজের দৈবী-শক্তি সংবরণ করিয়া, মনুষ্যদেহে বাস, মানুষের মত চলাফেরা ও মানুষকে করুণা করিতে শ্রীভগবান যেন নরজন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের অবতারত্ব অধ্যাত্ম-জগতের এক বাস্তব ঘটনা। জনৈক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মরমী সাধক তো বলিয়াছেন,—"মানুষ ঈশ্বর হইতে পারিবে বলিয়া ঈশ্বর মানুষ হইয়া আসেন।" কিন্তু হিন্দুধর্ম, বিশেষ কোন কাল বা ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরাবতারত্বকে সীমায়িত করিয়া রাখে নাই। পৃথিবীতে জীবনবিবর্তনের নানা স্তরের সঙ্গে যুক্ত দশাবতারের কথা হিন্দুপুরাণে আছে। ভগবান কেবল মানুষের নহে সমগ্র জীবজগতের রক্ষক। বিবর্তনের বিভিন্ন কালে জীবন যখন বিপদাপন্ন হইয়াছিল তখন পৃথিবীতে ঈশ্বরাবতারের আবির্ভাবের কথা স্বীকার করা কঠিন নহে।

যীশুখ্রীষ্টও বলিয়াছেন, "কেবল সন্তানের মধ্য দিয়াই পিতাকে দেখা সম্ভব।" মানবীয় প্রতীকের সাহায্যেই মানুষ উচ্চতর অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহ ভালভাবে অধিগত করিতে পারে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা রামকৃষ্ণের মত মানবরাই ঈশ্বরকে স্পষ্ট ও বাস্তব করিয়া তোলেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যতই গভীর হউক না কেন অবতার ও মহাত্মার মধ্যে পার্থক্য এই যে অবতার আজন্ম অধ্যাত্মজ্ঞানী। জন্মকালে তাঁহার দেবত্ব যেন একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত থাকে কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনায় এই আবরণ দ্রুত অপসৃত হয়। এমনকি বাল্যকালেও অবতার তাঁহার দৈবীপ্রকৃতির আভাস পান, যেমন বাইবেলে মন্দিরস্থ পণ্ডিতদের সহিত যীশুর আলোচনার মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু মহাত্মাকে প্রবল প্রচেষ্টা সহকারে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অর্জন করিতে হয়; অবতারে ইহা প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত। মহাত্মা, সাধককে সাহায্য করিতে পারেন, তাহাকে মুক্তি দিতে পারেন না। অবতার মুক্তি দিতে পারেন। কোন প্রকারে সমুদ্র পার হইতে পারে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র তরণীর সহিত মহাত্মার তুলনা

হইতে পারে কিন্তু অবতার হইলেন যাত্রীদিগকে অনায়াসে পার করিতে সক্ষম বড় জাহাজের মত। মহাত্মা যেন এক বিন্দু মধুবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পুষ্প আর অবতার মৌচাক—তাঁহার সবই মধুর। মহাত্মাকে, কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের সহিত তুলনা করা যায়। তিনি প্রাচীন শহর খনন করিতে করিতে আবর্জনাবৃত ফোয়ারা আবিষ্কার করেন। আবর্জনা দূর হইলে, তত্রস্থ পূর্বাবস্থিত জলরাশি সবেগে বাহির হইয়া আসে। অবতার ইঞ্জিনিয়ারের মত, তিনি মরুভূমি হইতেও কূপ খনন করিয়া জল বাহির করিতে পারেন।

ঈশ্বরের বহু অবতারত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভক্ত তাহার রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন একটিকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাকেই নিজ ইষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারে। একনিষ্ঠ ভক্তি-সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত কিন্তু অপর সকলকেও অসীম শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সকল ধর্মই দেবতার নরত্ব-ভাব স্বীকার করেন। কোন হিন্দু বা খ্রীষ্টান কর্তৃক অবতার যে ভাবে পূজা পান, মহম্মদ, বুদ্ধ, মসীহ ও অন্যান্য অবতারগণও স্ব-স্ব অনুগামিগণ কর্তৃক সেইরূপ সমান ভক্তি সহকারে পূজিত হন।

সাধারণ মানবমনের অজ্ঞতাতেও ঈশ্বরের আরও অবভাস আছে। সৃষ্টি যেমন বিশাল, ঈশ্বরের রূপও তেমন অনন্ত। ধ্যানের গভীরতায় উহারা আত্ম-প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বিশেষ কোন আবির্ভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় বরং পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-নিমজ্জন না হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া উচিত।

হিন্দু ঐতিহ্য সকলপ্রকার পূজা-পদ্ধতি মানিয়া লয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষ অসত্য হইতে সত্যে যায় না বরং সত্য হইতেই সত্যে যায়। স্থূল কৃত্য ও উৎসবাদি বা নিঃস্বার্থ ভালবাসা বা দার্শনিক বিচার বা নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে ভক্ত ঈশ্বরের সহিত অন্তরের যোগ স্থাপন করিতে পারে। সব ধর্ম বিভিন্ন প্রকৃতির উপযোগী ও ঈশ্বর চেতনার উচ্চ শিখরে আরূঢ় করাইতে সমর্থ বলিয়া সত্য। নানা পথে নানা ধর্মের সাধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিলেন যে চরমে সবই সেই একই তত্ত্বে লইয়া গেল। ঈশ্বরের সেই চরম সত্যে কোন ভেদ নাই।

আত্মার প্রকাশ-ক্ষেত্রে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অজানা রহস্যপথে সীমা হোতে অসীমের স্তরে,
　অব্যক্ত এষণা তরে
অণু পরমাণু লয়ে বাহিরে ও ঘরে,
　চিরদিন খেলা মোর বহুরূপে আনন্দের সাথে।

এ সংসারে অনাবিল সত্য যাহা, তারে আমি দুঃখ বলে জানি,
　মায়াচ্ছন্ন মনোভূমে চৈত্যমাঝে চলে নিত্য লীলা মম।
প্রাণময় কামনায় ভ্রমিতেছি কেন উন্মাদের সম?
　মন ব্রহ্মে সমাহিত কবে হবে!—ভাবরসে স্তব্ধ হবে বাণী?

আত্মার প্রকাশ-ক্ষেত্রে ক্রমিক প্রগতি,
নব নব অভিজ্ঞতা ব্যষ্টিসত্তা লভিতেছে জন্ম আবর্তনে।
জীবন-বাসনাবীজ ছড়ায়েছি যুগে যুগে আশার স্পন্দনে,
বিচিত্র ফসল লয়ে কারে আজ জানাবো প্রণতি?

আত্মচৈতন্যের পরাজ্ঞানে ভূমাবোধ ক্ষণে ক্ষণে দেয় দোলা,
অতীন্দ্রিয় পরিশ্লেষে অনন্তের গূঢ় অভিপ্রায়ে;
অশ্রুত বাঁশরী যেন বেজে ওঠে হৃদয় প্রচ্ছায়ে
না-দেখা আলোকরশ্মি সুরে ঝরে' কেন মোরে করে আত্মভোলা?

মহাপ্রভুর নীলাচল

শ্রীমতী সুধা সেন, এম্‌-এ

দীর্ঘ আড়াই মাস মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পরে যেদিন ডাক্তারেরা হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইলেন, সেদিন বাড়ীতেও সকলের মুখে হাসি ফুটিল।

স্বামী আসিয়া বলিলেন,—"শীগ্‌গির সেরে ওঠ তো এবার—তারপর পুজোয় কোথায় যাবো আমরা বলতো?" রোগ-দুর্বল মস্তিষ্কে কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না—আমি সারিয়া উঠিব, আমি বাঁচিয়া উঠিব আবার?

স্বামী বলিলেন—"পুরী গো পুরী!"

বহুদিবসের আকাঙ্ক্ষা এবারে মিটিবে? আনন্দ-উজ্জ্বল স্মিতমুখে গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

বাস্তবিক ইহার পরে শয্যাত্যাগ করিতে আর বেশী দিন লাগে নাই।

পূজার সময় কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে কয়েক-দিন কাটাইলাম। পরমপূজ্য সহাধ্যক্ষ মহারাজের পায়ের কাছে বসিয়া একদিকে যেমন পরমানন্দে মন পূর্ণ হইয়া গেল—আর একদিকে তাঁহার সস্নেহ তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য সকলের যত্নে কয়দিনেই দেহও সুস্থ হইয়া উঠিল।

তারপরে একদিন আসিয়া দাঁড়াইলাম পুরীর সমুদ্রতীরে, স্বাস্থ্যকামীদের পরমতীর্থ—ভিক্টোরিয়া ক্লাব—সি-ভিউ হোটেল প্রভৃতির অনতিদূরেই—আমাদের বাড়ী—ছাপি ভিলা। সমুদ্রের কাছে, অথচ নির্জনে। বাড়ীতে পা দিয়াই যেন মন পুলকিত হইয়া উঠিল।

দেহের স্বাস্থ্য ভালো হইয়া উঠিল কয়েকদিনেই, এবারে মনকেও কিছু খোরাক দিতে হয় যে? যে জন্যে আসা!

যে পাড়ায় আছি—সে পাড়ার নাম 'গৌরবাড়-শাহী—' শ্রীগৌরাঙ্গের বাট (পথ) ও শাহী—। কাছেই যমেশ্বরতোটা শিবের মন্দির ও তোটা গোপীনাথ। এই তোটাতেই প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধর থাকিতেন—তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিবার জন্য প্রায়ই প্রভু এখানে আসিতেন।

কথিত আছে—একদিন প্রভু গদাধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গদাধর! আজ যদি তোমাকে আমি কিছু দিই, তুমি গ্রহণ করিবে কি?"

গদাধর বলিলেন,—"তোমার দান যে আমার মাথার ভূষণ প্রভু!"

প্রভু নখে মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন—দীর্ঘদেহ কালো পাথরের গোপীনাথের চূড়াগ্রভাগ দেখা দিল --মাটির নীচ হইতে উঠাইয়া গদাধর এখানেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিগ্রহের অঙ্গেই প্রভু লীন হইয়া যান বলিয়া একটি প্রবাদ আছে—

"কি করিব কোথা যাবো বাক্য নাহি সরে,
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।"

এই কথা মন্দিরের দরজায় লেখা।

একদিন এই তোটা গোপীনাথের নিকটবর্তী চটক-পর্বত দর্শনে গোবর্ধন ভ্রম হইল—সুনীল সমুদ্রকে ভাবিলেন যমুনা, প্রভু ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন —উঠিলেন বুঝি আঠারো ঘণ্টা পরে এক জেলের জালে চক্রতীর্থের কাছে।

এই তো বাড়ীর কাছেই সেই চটক-পর্বত, সেই সমুদ্র, বাড়ীর ধার ঘেঁষিয়া চলিয়াছে গৌর বাট —গৌর-পদধূলিলিপ্ত দীর্ঘ পথ—কিন্তু কোথায় সে দীর্ঘদেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নবীন সন্ন্যাসীর পদচিহ্ন ?

এই যমেশ্বর তোটার পথ বাহিয়াই প্রভু আসিতেছেন একদিন—পশ্চাতে গোবিন্দ। দূর হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি কানে আসিল। গুর্জরী রাগিণীতে গান করিতেছেন এক দেবদাসী। প্রভু উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন—সঙ্গীতকারীকে আলিঙ্গনের আশায়। পথে মনসিজের ঘন কাঁটার বেড়া—কিন্তু প্রেমের পথে কিসের বন্ধন ? কাঁটার আঘাতে সে সোনার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল —কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন গৌর চলিয়াছেন দ্রুত পদ-বিক্ষেপে। গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়াও নাগাল পাইতেছেন না—চীৎকার করিয়া বলিলেন—"প্রভু ! স্ত্রীলোকের গান।" বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল—প্রভু বলিলেন,—

"গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন,
স্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ।"

শ্রীজগন্নাথের মন্দির—বিরাট গৃহতল—বিরাট প্রাঙ্গণ —সহস্র ভক্তের মেলা। দাঁড়াই গিয়া সেই গরুড় স্তম্ভের কাছে—যেখানে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন দর্শন করিতেন—হস্ত-পদ-বিহীন দারু জগন্নাথকে নহে—বংশীধারী শ্যামসুন্দরকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। স্তম্ভের নীচের 'খাল'টি অশ্রুজলে ভরিয়া যাইত। যে পাথরটির উপরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল দর্শন করিয়াছেন—তাহাতে দীঘল চরণ দুইটির ছাপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণেই একটি ছোট মন্দিরে সেই চরণচিহ্ন নিত্য পূজিত হইতেছে।

প্রবেশ করিবার পথে—মন্দিরের সিংহদরজার পরেই 'বাইশ পাহাচ'—বাইশটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মন্দিরে পৌছিতে হয়। সেই বাইশ পাহাচের নীচেই আছে এক 'নিয়গাড়ে' তাহাতে পাদপ্রক্ষালন করিয়া প্রভু নিত্য ঈশ্বরদর্শনে যান। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই 'নিয়গাড়ে' আবিষ্কার করিলাম।

সিংহদরজার কাছেই অনেকগুলি তেলেঙ্গা গরু ঘোরাফিরা করে দেখা যায়। পাঁচশত বৎসর পূর্বেও এইখানেই তেলেঙ্গা গাভীগুলি থাকিত। অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-রসাস্বাদন করিবার পর বহু মিনতি করিয়া স্বরূপ প্রভুকে শয়ন করাইয়া আসিয়াছেন—তিন দ্বারে কপাট আর গম্ভীরার দরজায় শুইয়া গোবিন্দ ! স্বরূপের ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন প্রভু ! জানেন না স্বরূপ দরজায় কান পাতিয়া—কিন্তু কতক্ষণ ? বিরহিণী রাধিকার নিদ্রা কি ছিল ? করুণ কাতর কণ্ঠে প্রভু আস্তে আস্তে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। স্বরূপ আবার ভিতরে গেলেন —"প্রভু, তোমার না হয় নিদ্রা নাই, ক্লান্তি নাই, দেহবোধ নাই ! কিন্তু আমরা তো সাধারণ জীব ! আমরা যে আর পারি না প্রভু।"

লজ্জায় করুণায় অভিভূত হইয়া প্রভু বলিলেন,— "থাক্ স্বরূপ ক্ষমা দাও, এই যে নিদ্রা যাইতেছি।"

কিন্তু কোথায় নিদ্রা ? এমনি এক রজনীর গভীর যামে প্রভুকে শয়ন করাইয়া স্বরূপ রামানন্দ

ঘরে গিয়াছেন—তিন দ্বার রুদ্ধ, প্রভুর দরজায় প্রহরী গোবিন্দ আজ নিদ্রিত! প্রভু অনুচ্চকণ্ঠে ঘরের ভিতরে নাম জপ করিতেছেন। অনেকক্ষণ সাড়া না পাইয়া স্বরূপ উঠিলেন—গোবিন্দ উঠিলেন—গৃহ শূন্য—প্রভু নাই। গৃহ, গৃহপ্রাঙ্গণ সমস্ত খুঁজিয়াও যখন দেখা মিলিল না, দীপ জ্বালাইয়া গভীর নিশীথে তিন চার জনে 'প্রভু! প্রভু!' বলিয়া পথে বাহির হইলেন।

"ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা,
গাবীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা—
পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্মের আকার,
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার,
গাবীগণ চৌদিকে শুঙ্খে (ঘ্রাণ লয়) প্রভুর অঙ্গ,
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।"

প্রভুর অঙ্গের গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, গাভীগণ ছাড়াইলেও ছাড়িতে চাহে না—গৌর তাহাদেরও প্রভু যে!

সিংহদরজার সম্মুখ দিয়াই রাজপথ, রথযাত্রার পথ! কিছুদূরে সৌভাগ্যবান গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রসাদ। রাজা প্রতাপরুদ্র শুনিলেন—তাঁহার রাজ্যে এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বলিতেছেন। এমনকি অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা—ভারতবিখ্যাত অদ্বৈত বৈদান্তিক, পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমও নাকি তাঁহার চরণাশ্রিত হইয়া ভক্ত হইয়াছেন।

সার্বভৌমকে রাজা ডাকাইয়া আনিলেন—জিজ্ঞাসা করিয়া এবং দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন—সার্বভৌম একেবারে দ্রব হইয়াছেন। একাদিক্রমে সাতদিন ধরিয়া বেদান্ত পড়াইয়া যাঁহাকে জ্ঞানের আলোকে আনিবার আশায় সার্বভৌম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন—সাতদিনের মধ্যে একটি দিনও তো কই তাঁহার মুখের ভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না?

সার্বভৌম ভাবিলেন—বাতুল না মূর্খ? জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার এই অধ্যাপনা—তুমি বুঝ কি না বুঝ--কিছুই তো বল না তুমি? আমি কেমন করিয়া বুঝিব—তুমি কি বুঝিতেছ?"

তরুণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আপনার আদেশ শ্রবণ করা—তাই শ্রবণমাত্র করি—আপনার ব্যাখ্যা আমি কিছুই বুঝি না!"

"কি বলিলে?"—বৃদ্ধ নৈয়ায়িক শাস্ত্রজ্ঞ পরম পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—"আমার ব্যাখ্যা বুঝ না তুমি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ,
কল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন।"

বেদ পুরাণ উপনিষদ্ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রমথিত করিয়া সন্ন্যাসী অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব স্থাপিত করিলেন। ভক্তির জয় হইল। সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্তম্ভিত মুগ্ধ হইয়া পায়ে পড়িলেন—শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ধূলায় লুটাইল। ষড়্ভুজ দর্শন করিয়া অচৈতন্য হইলেন, যখন চেতনা পাইয়া উঠিলেন—তখন দুই চোখ ভরা অশ্রু লইয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলেন ভক্ত! শ্লোক লিখিয়া উৎসর্গ করিলেন প্রভুর পায়ে—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার (শ্রীচৈতন্যের) পদারবিন্দে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হোক্।

মহারাজা প্রতাপরুদ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্ত সার্বভৌম যখন প্রভুর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিলেন—তখন মহারাজ আকুল হইয়া কহিলেন,—"পণ্ডিত! তাঁহাকে আমায় একবার দর্শন করাও।" প্রভু তখন দক্ষিণে, তাই সার্বভৌম তাঁহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রাজাকে প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে দক্ষিণ যাত্রার পথে গোদাবরীতীরে বিশ্তানগরে প্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রস ও রসিকের, আস্বাদ্য ও আস্বাদকের সে মিলনে যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, যে অনাস্বাদিত-পূর্ব রসতত্ত্ব প্রকাশিত হইল তাহা আর বর্ণনা করিলাম না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে রাজ-প্রতিনিধি রায় গোপনে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন—গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে রসাস্বাদন।

শেষে একদিন রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু আমার চিত্তে এক সংশয় দেখা দিয়াছে—তোমারই সম্বন্ধে—তবুও তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি!"

"পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ,
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ!
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন পঞ্চালিকা
তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা!"

প্রভু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"রায় তুমি কৃষ্ণপ্রেমিক এবং ভক্ত—আর ভক্তের লক্ষণই এই—সর্বত্রই তাঁহার কৃষ্ণদর্শন হয়।"

"রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারি ভুরি
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি—"

প্রভু ধরা পড়িয়াছেন এবং যাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছেন তিনি ভক্তোত্তম রসিকশেখর সাড়ে তিনজন পাত্রের একজন—তাই—

"তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ,
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।"

সে অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন জগতে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব মহারাস-তত্ত্ব প্রকটিত হইল এবং সেই তত্ত্বের প্রথম দ্রষ্টা হইলেন রায় রামানন্দ।

বিষয়-ঐশ্বর্যে কোনও দিনই আসক্তি ছিল না, এখন একেবারেই তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রায় রাজা প্রতাপরুদ্রের শরণ লইলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের পরিবর্তনেই রাজার বিস্ময়ের ও ভক্তির সীমা ছিল না—এখন রায়ের গৌরপ্রেম দেখিয়া রাজা একেবারে অভিভূত হইয়া গেলেন—বলিলেন—"রায়! আমাকে একবার তাঁহার সহিত মিলন করাও।"

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। সার্বভৌম শ্রীনিত্যানন্দ ও সকল ভক্তের অনুরোধ ব্যর্থ হইল—প্রভু রাজদর্শনে সম্মত হইলেন না—অধিকন্তু পুরী ছাড়িয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন।

রাজা কাঁদিয়া উঠিলেন—"ভগবান কি এক প্রতাপরুদ্র ব্যতীত সকলকে কৃপা করিবেন এই পণ করিয়াছেন।" দর্শন বিনা রাজা প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রায় রামানন্দ নীলাচলে আসিলে রাজা তাঁহার সংকল্পের কথা জানাইলেন। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রায় এবার স্বয়ং দৌত্যের ভার লইলেন। ধীরে ধীরে প্রভুর মন দ্রব হইয়া আসিল।

রথযাত্রা! গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস—মুকুন্দ প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবকে অগ্রণী করিয়া প্রভু সাতটি কীর্তনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। সচল গৌরবর্ণ জগন্নাথকে অগ্রবর্তী করিয়া অচল নীল দারু জগন্নাথ রথে চলিয়াছেন!—প্রভু দ্রুতগতিতে সাত সম্প্রদায়েই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। অজস্র নয়নধারায় বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে, স্বেদ কম্প স্তম্ভ পুলকের উদ্দাম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বাহ্য হারাইতেছেন—তবুও সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন—

"সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ—
যাহাঁ লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ।"

রাজা দূর হইতে তৃষিত নয়নে চাহিয়া আছেন।

"নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর—
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর":—
"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ
তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ
কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"
(সাহিত্যদর্পণ)

রাধাভাব-ভাবিত গৌর শ্রীকৃষ্ণকে ইহাই যেন বলিতে চাহিতেছেন—"(কুরুক্ষেত্রে) সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম—কিন্তু তথাপি হে দয়িত! আমার মন বৃন্দাবনের সেই মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত—তুমি বৃন্দাবনে উদয় হইয়া আবার আমাকে লইয়া লীলা কর।" প্রভুর রসে রসিক স্বরূপ ভাবানুযায়ী পদ গাহিয়া প্রভুর সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নে নৃত্যক্লান্ত প্রভু পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছেন—সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তের উপদেশানুযায়ী রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশে নব অভি-সারিকার মতো ভীরু কম্পিত পদক্ষেপে প্রিয়তমের কাছে চলিলেন।

প্রভুর দুই চোখ বন্ধ—ভূমিতে অর্ধশয়ন করিয়া আছেন। রাজা ধীরে ধীরে পায়ে মাথা রাখিলেন—বক্ষ ভরিয়া উঠিল সুধারসে—নয়নে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল—আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ভাগবতের শ্লোক। প্রভু আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিলেন, "বলো, বলো!" রাজা শেষে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন :—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।"

প্রভু—"ভূরিদা, ভূরিদা, (হে বহুদাতা!)" বলিয়া চোখ বুজিয়াই রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন—"কে গো তুমি? কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে আমায়?"

রাজা চরণে পড়িয়া কহিলেন—"আমি যে তোমার দাসের দাস প্রভু!" প্রভু যেন না চিনিয়াই প্রতাপরুদ্রকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিলেন। কৃতকৃতার্থ, পূর্ণ হইয়া রাজা বাহির হইয়া আসিলেন—লুটাইয়া পড়িলেন ভক্তদের পায়ে!

এই সেই রাজার প্রাসাদ!

মন্দির হইয়া স্বর্গদ্বারের পথে ফিরিতেছি—শুনিলাম পাশেই ভক্তপ্রবর 'যবন' হরিদাসের কুটীর। মন্দির ও ভক্তগণের ছায়াও যেন তাঁহার পাদস্পর্শে মলিন না হয় সেই ভয়ে হরিদাস এই কুটীরেই তাঁহার পুরীবাসের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন। স্বয়ং প্রভুই প্রত্যহ একবার আসিয়া তাঁহার সহিত এখানে মিলিত হইতেন। শ্রীরূপের ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকেরও এইখানেই আরম্ভ। রোজ লক্ষ নামজপ সারা না হইলে হরিদাস খাদ্য স্পর্শ করিতেন না। বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন নামজপ সম্পূর্ণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে—জপও সারা হয় নাই আহার্যও স্পর্শ করেন নাই। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "হরিদাস আর কেন? সারা জীবন তো এই করিলে এবার সংখ্যা কমাও তাহা নহিলে পারিবে কেন?"

হরিদাস সে কথার জবাব স্পষ্ট না দিয়া বলিলেন,—"প্রভু! আমার একটি প্রার্থনা তোমাকে রাখিতে হইবে! বলো রাখিবে?"

"তোমাকে অদেয় আমার কি আছে হরিদাস?" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরিদাস বলিলেন,—"প্রভুগো! আমার মন বলে তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবে। আমাকে তোমার সেই নিষ্ঠুর লীলা দেখাইবার পূর্বে আমাকে বিদায় দাও। তোমার কমলচরণ আমার হৃদয়ে ধারণ করিয়া—নয়নে তোমার চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে আমার মৃত্যু হোক্—আমাকে তুমি এই বর দাও!"

প্রভু ব্যাকুল করুণ হাসি হাসিলেন—"তুমি তো কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, যাহা চাও কৃষ্ণ তোমাকে তাহাই দিবেন। কিন্তু হরিদাস! তুমি চলিয়া গেলে আমার রহিল কি?"

হরিদাস বলিলেন,—"প্রভু মায়া ছাড়! আমার মতো একটি পিপীলিকার অভাবে পৃথিবীর কিছুই হানি হইবে না।" পরদিন সকালে ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সেই কুটীরে আসিলেন। বলিলেন,—

"হরিদাস! কহ সমাচার?

হরিদাস কহে—প্রভু যে কৃপা তোমার।"

প্রভু ভক্তদের লইয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাস নিজের সম্মুখে প্রভুকে বসাইলেন। তাঁহার দুই নয়নভৃঙ্গ প্রভুর মুখপদ্মে স্থাপিত হইল, অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিতে লাগিল—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রভুর পদে হরিদাস প্রাণকে লীন করিয়া দিলেন।

কীর্তনান্তে সেই দেহ কাঁধে করিয়া স্বয়ং প্রভু ভক্তগণ সহ সমুদ্রতীরে আসিলেন। বালুকা-শয্যায় মহাবৈষ্ণবের সমাধি রচিত হইল। সেই সমাধি সমুদ্রতীরে কালই দেখিয়া আসিলাম।

আমাদের পুরীবাসের কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আজও কাশীমিশ্রের বাড়ীর খোঁজ পাইলাম না। আমাদের পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করি বারবার—তিনি যেন অবজ্ঞাভরে জবাবই দিতে চান না—বলেন—আগে 'আটিকা বন্ধন্ অ কর, জগন্নাথকর-শিঙার অ দরশন্ অ কর—কাশী মিশ্রের বাড়ী পরে দিবুঁ।' অন্য পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সদুত্তর পাই না।

একদিন শেষে নিজেই বাহির হইলাম। পথে পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে ঠিকানা মিলিল—গম্ভীরা বলিলেও চলে কিন্তু রাধাকান্ত মঠ বলিলেই সন্ধান ঠিক মিলিত।

এই তো সেই মঠ—এই সঙের পথ দিয়াই তো রোজ যাই অথচ জানি না যে এখানেই রহিয়াছে আকাঙ্ক্ষিত ধন। বাড়ীটি দেখিয়াই আনন্দে অস্থির পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকিলাম। সামনেই মন্দির আর সেই মন্দির আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন রাধাকান্তের বিগ্রহ—পাশে শ্রীরাধা ও ললিতা, বিশাখা—অনেক সখী! কাকী (?) হইতে আনা বিগ্রহ অপরূপ অঙ্গলাবণ্যে যেন জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পুরোহিত বলিলেন,—প্রভুর সময়েও এই বিগ্রহ ছিলেন এবং এইখানেই প্রভুর চোখে রাসলীলা প্রকট হইত। ঠিক জানি না—তবে এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে পাই নাই।

পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় ছিল প্রভুর ঘর এবং তাঁহার কোনও চিহ্ন আছে কি না? তিনি আরও ভিতরে একটি ঘরে পাঠাইলেন। আসিয়া দাঁড়াইলাম প্রভুর দরজায়। এই সেই ছোট্ট গৃহখানি—সেই গম্ভীরা দ্বাদশ বৎসরের লীলা নিকেতন! প্রভুর পূজারী আনিয়া সামনে ধরিলেন প্রভুর পাদুকা—কমণ্ডলু ও ব্যবহৃত কাঁথার এতটুকু এক খণ্ড! শ্রীচরণে নিত্য স্পর্শসুখ-প্রাপ্ত পাদুকা দুইটিতে মাথা ঠেকাইলাম। প্রতি দিবসের পদধূলি লিপ্ত দরজার চৌকাঠে মাথা পাতিয়া রহিলাম! আমার জীবনে তোমার প্রত্যক্ষ পরশ, এও কি সম্ভব?

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল সোনার লেখা পাঁচশ' বৎসর পূর্বের ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা! এইটুকুতো ছোট ঘর—ছোট তাহার দরজা—এই দরজাতেই একদিন মধ্যাহ্ন আহার গ্রহণ করিবার পর দীর্ঘদেহ প্রভু আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। সেবক গোবিন্দ—প্রতিদিন এই সময়ে প্রভুর শরীরের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তাঁহার শরীর সংবাহন করেন। প্রভু দরজা জুড়িয়া আছেন অথচ দরজার অপর দিকে যাইতে না পারিলে অঙ্গসেবার সুবিধা হয় না—তাই প্রভুকে একটু সরিবার জন্য গোবিন্দ মিনতি করিতে লাগিলেন। কতো যেন শ্রান্ত প্রভু বলিলেন—"না গোবিন্দ আমার নড়িবার সাধ্য নাই! তুমি যাহা খুশি কর।" প্রভু চোখ বন্ধ করিলেন।

বারবার বলিয়াও যখন ফল হইল না তখন গোবিন্দ আপন বহির্বাস দিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ

আচ্ছাদিত করিয়া মনে মনে প্রণাম করিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়াই ঐ দিকে গেলেন—মার্দন-সুখে প্রভু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ইচ্ছাকৃত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া প্রভু যেন বিস্মিত হইয়াই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি গোবিন্দ ? তুমি খাইতে যাও নাই ?" "আপনাকে লঙ্ঘন করিয়া কেমন করিয়া যাই ?"

"তবে আসিয়াছিলে কেমন করিয়া ?"

সে উত্তর গোবিন্দ প্রভুকে আর কি দিবেন ; কিন্তু তিনিতো জানেন প্রভুর সেবার জন্য কোটী নরকভোগও যে কাম্য !

এই একজন আর একজন পণ্ডিত জগদানন্দ। পুরুষরূপ ধরিয়া যেন অভিমানিনী সত্যভামা আসিয়া গৌরের সেবার ভার লইয়াছেন স্বহস্তে।

সারারাত্রি গম্ভীরার কঠিন ভিত্তিতলে প্রভু মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকেন—প্রেমের তীব্র দহনে মাথা ঠুকিতে থাকেন যখন জগদানন্দের অন্তর বিদীর্ণ হইতে থাকে। অতি সাহস করিয়া একটি তুলার বালিশ তৈরী করিয়া আনিয়াছেন—পাতিয়া পাতিয়া দিয়াছেন ছেঁড়া কাঁথাটির উপরে। দেখা মাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন "একি শুধু বালিশ কেন ? একটি পালঙ্ক আনো ; একজন মর্দনিয়া রাখো তেল মর্দন করিতে, তবেই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয় !" "জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে।" বালিশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

স্বরূপের কাছে খবর শুনিলেন জগদানন্দ—ওষ্ঠাধর দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া গেল—একটি কথা বলিলেন না। • •

আবার গৌড় হইতে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ এতখানি পথ কতকটা চন্দনের তেল লইয়া আসিয়াছেন বড় আশা করিয়া—বিনিদ্র রজনী জাগিয়া জাগিয়া প্রভুর মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠে—তাই এই ঠাণ্ডা তেলটি ব্যবহার করিলে প্রভুর একটু সুখ হয় ! স্বরূপ পণ্ডিতের ইচ্ছা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব ! 'সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়—' সুগন্ধি তেল মাখিয়া আমি পথে বাহির হইব আর লোকে আমার সন্ন্যাসের নিন্দা করিবে তাহা হইবে না। বরং পণ্ডিতকে বলিও, এ তেল মন্দিরে দিক্ আরতির সময়ে জ্বলিবে তাহাই ভালো হইবে।"

স্বরূপের মুখে একথাও জগদানন্দ শুনিলেন—দ্বিতীয় বার আর অনুরোধ করিলেন না। পরদিন প্রভু জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি বুঝি আমার জন্য চন্দনতেল আনিয়াছ ?" কথা শেষ হইতে পারিল না জগদানন্দ বলিয়া উঠিলেন—"কে বলিল তোমাকে, আমি তোমার জন্য তেল আনিয়াছি ? মিথ্যা কথা !" প্রচণ্ড গতিতে ঘর হইতে তেলের পাত্রটি আনিয়া প্রভুর সামনেই তাহা আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন পণ্ডিত। সমস্ত অঙ্গনে তেল ছড়াইয়া পড়িল, বাতাস ভরিয়া উঠিল সুগন্ধে—জগদানন্দ ঘরে দ্বার দিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিলেন। তিন দিন উপবাসেই রুদ্ধগৃহে কাটিয়া গেল—ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন—"জগদানন্দ! উঠ ! আমি আজ তোমার ঘরে ভিক্ষা করিব।"

চোখে জল, মুখে হাসি—জগদানন্দ ভিক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে আসিলেন প্রভু—বলিলেন, "এসো জগদানন্দ, আজ তোমাতে আমাতে একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাই।" আর কি অভিমান থাকে ? পণ্ডিত মিনতি করিয়া প্রভুকে বসাইলেন—"তুমি খাও প্রভু ! আমি কথা দিতেছি—আমি পরে প্রসাদ পাইব।"

অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রভু বলিয়া উঠিলেন—"আহা ক্রোধের রান্না বুঝি এমনই সুস্বাদু হয় !"

* * *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—ফিরিতে হইবে একলাই —প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আবার আসিয়া দাঁড়াইলাম—গম্ভীরার দরজায়—।

এক এক করিয়া শ্রোতা আসিতে লাগিলেন—বোধহয় প্রতিদিনকার নিয়মমতো শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ আরম্ভ হইল।

এই গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে যে বৃহৎ গম্ভীর লীলা একাদিক্রমে দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহারই এক অংশ আজ পড়া হইতেছে শুনিলাম—

"শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে,
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে।"

অশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, পুলক, স্বেদ—লোমকূপে রক্তোদ্গম—দন্ত হালিয়া পড়ে, হস্তপদের সন্ধিগুলি কখনও বিচ্ছিন্ন—কখনও ঐ সকল অঙ্গই আবার যেন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে—এই অবস্থায় রাধা-ভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দর মাত্র দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করিতেছেন—যেই জন্য তাঁহার অবতার!

কখনও স্বরূপের, কখনও রায় রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন—"সখিরে শুন মোর হত বিধিবল। আমার তনু মন চিত্ত কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল! আমার শ্রবণ, নয়ন, জিহ্বা সমস্তই অসার গো সখী! তাহারা তো কৃষ্ণকথা শোনেনা—কৃষ্ণরূপ দেখেনা—কৃষ্ণকথা তো বলেনা, ধিক্ ধিক্ এই জীবনে যৌবনে, কই কৃষ্ণ তো তাহা গ্রহণ করিলেন না।"

আবার বলিতেছেন,—"ওগো সখী, কৃষ্ণতো দর্শন দেনই না—তবুও যদিই কোনও শুভক্ষণে বা স্বপ্নে কৃষ্ণের দর্শন পাই—অমনি 'আনন্দ' আর 'মদন' এই দুই বৈরী আসিয়া উপস্থিত হয়—আমি নেত্র ভরিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইনা!"

"হায়রে হায়! আর কি কখনও কৃষ্ণ আমাকে দেখা দিবেন? কিন্তু আশা যে ছাড়িতেও পারি না":—

"পুনঃ যদি কোনওক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটি, ক্ষণ, পল
দিয়া মাল্যচন্দন নানারত্ন আভরণ
অলঙ্কৃত করিমু সকল।"

কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ যেন বিস্মৃত চেতনা ফিরিয়া আসিল সম্মুখে স্বরূপ ও রায়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? এতোক্ষণ স্বপ্নে যেন কি দেখিলাম, কি যেন প্রলাপ বকিলাম তোমরা কি কিছু শুনিয়াছ?" সেই স্বপ্নস্মৃতিই আবার জাগ্রত হইল আবার 'চৈতন্য' লুপ্ত হইতেছে—আবার 'হায়, হায়' করিয়া এক শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন—

"কই অবরহিঅং পেক্ষা, ণহি হোই মাহুসে লোত্র,
জই হোই কাংস বিরহো বিরহে হোন্ত
সিম কোজী অই॥"

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম—সে কি সখী! মানুষের হয়? জাম্বুনদ হেমসম সেই প্রেম একবার হইলে আর কি তাহার বিয়োগ হয়, না বিয়োগ হইলেই লোকে বাঁচে?"

আবার হাহাকার করিয়া বলিতেছেন,—"কোথায় আমার কৃষ্ণপ্রেম! কেবল মিথ্যা দম্ভ লইয়া মরিতেছি আমার এ ক্রন্দনও যে মিথ্যা; কৃষ্ণপ্রেম শুদ্ধ সুনির্মল তাহা বহু দূরে; 'তবে যে করি ক্রন্দন—স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিও নিশ্চয়।' এ শুধু নিজের সৌভাগ্য যেন মানুষকে দেখানো।"

"এই মত দিনে দিনে—স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত
বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন,
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।"

কৃষ্ণপ্রেম-বিষে তনুমন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—

কিন্তু ভিতরে অমৃত রসধারার প্লাবন! নানা ভাবের প্রাবল্য যেন মত্ত গজের ন্যায় প্রভুর দেহ ইক্ষুবন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে লাগিল, গম্ভীরার ভিত্তির কঠিন পাষাণতলে মুখ ঘষিয়া মাথা ঠুকিয়া প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন:—

"হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো,
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।"

হে দেব, হে দয়িত! হে ভুবনের বন্ধু! হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হা হা কবে তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে?'

গম্ভীরার অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছি—হে নাথ, হে নয়নাভিরাম! কবে তুমি নয়নের দৃষ্টিভূত হইবে প্রভু!

জীবন*

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

[কবি Anna Laetitia Barbauld এর Life শীর্ষক কবিতার অনুবাদ]

জীবন, কিবা যে তুমি জানিনাকো, জানি শুধু
ছাড়ি মোরে যাবে একদিন,
কবে কোথা কেমনে বা দেখা হ'ল দুজনায়,
মানি, সে ত রহস্যে বিলীন।
তুমি যবে ছেড়ে যাবে, এই শির এই দেহ
অবশেষে যা কিছু আমার,
যেখানেই যে রাখুক, ফিরে না চাহিবে কেহ,
ছায় সে ধূলির পুঞ্জ সার!
কোথা উড়ে যাবে, কোথা পথহীন গতি তব
নিয়ে যাবে অলক্ষ্যে তোমারে
অপরূপ এ বিচ্ছেদে মোরে কোথা খুঁজে পাব
মিশিয়া যে আছিল অন্তরে?
শ্রীহীন মলিন এই তনু আবরণ ছাড়ি
যাবে কি উড়িয়া তাঁর পানে
বিরাজেন যথা দীপ্তজ্যোতি মহাসিন্ধু, তুমি
যাঁর কণা এসেছ এখানে?

অথবা অদৃশ্য কোন ধ্যানমৌন সুর সম
বিস্মৃতির মহাশূন্যতায়
যুগ যুগ বাহি, কালে সমাধি টুটিলে পুনঃ
বিকশিবে নিজ মহিমায়?
কামনা-বেদনা-রিক্ত তবুত নহগো তুমি
কি তুমি বাখানি মোরে কও,
তুমি আর তুমি যাব নহ, তবে কিবা তুমি,
কাহার মন্তন তুমি হও?
জীবন, তোমার সাথে কাটানু অনেক দিন
মধুমাসে, ঘন বরষায়,
প্রিয় পরিজন হ'তে বিদায়—সে সুকঠিন
শ্বাস, অশ্রু বিনিময়ে, হায়!
তবে চুপে বহে যাও, কিছু না কহিও মোরে,
আপন সময় বেছে নিয়ো,
কোনো বা উজ্জ্বলতর লোকে আবাহন ক'রে
নিয়ো মোরে, বিদায় না দিয়ো।

অনাদিলিঙ্গ ৺কল্যাণেশ্বরের কাহিনী

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

ভারতের সর্বত্র শিবলিঙ্গের পূজা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্কন্দপুরাণে লিঙ্গশব্দের অর্থ এইরূপ আছে—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

আকাশকে লিঙ্গ বলা হয়, পৃথিবী তাহার আসন। সর্বদেবতার আলয় এবং লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ শব্দে অভিহিত করা হয়। বেদে নানা স্থানে পাওয়া যায়—"দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা॥" আকাশকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা বলা হইয়াছে। আকাশ সর্বব্যাপী এবং সূক্ষ্মতম মহাভূত। ইহাকে জগৎ-পিতার প্রতীক এবং পৃথিবীকে জগন্মাতার প্রতীক বলিয়া ভারতের উপাসকগণ বিশ্বব্যাপী লিঙ্গে বিশ্বের জনক ও জননীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। যজুর্বেদে আছে—"অশ্মা চ মে, মৃত্তিকা চ মে, গিরয়শ্চ মে, পর্বতাশ্চ মে, সিকতাশ্চ মে, বনস্পতয়শ্চ মে, হিরণ্যঞ্চ মে, অপশ্চ মে, শ্যামং চ মে, লোহঞ্চ মে, সীসঞ্চ মে, ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্।" প্রস্তর, মৃত্তিকা, গিরি, পর্বত ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার শরীর রচনা করা হউক—ইহা বেদমুখে পরমপুরুষের আদেশ। অথর্ববেদে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—"এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠাশ্মা ভবতু তে তনুঃ।" হে পরমেশ্বর! তুমি এই প্রস্তরে এস, এই পাষাণ তোমার শরীর হউক—এই বলিয়া ঋষি পরম পিতাকে প্রস্তরে আহ্বান করিয়াছেন।

প্রস্তরমূর্তিতে বা ধাতুমূর্তিতে শিবের আরাধনা করায় ঐ সকল শিবলিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পুণ্যসলিলা নর্মদার জলে যে সব বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায় তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রে বাণলিঙ্গ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"নর্মদাজলমধ্যস্থং বাণলিঙ্গমিতি স্মৃতম্।" কোন কোন শাস্ত্রে এমনও পাওয়া যায়—

"নর্মদা-দেবিকায়োশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি সম্মুখে॥"

নর্মদা, দেবিকা, গঙ্গা ও যমুনা—এই সব পুণ্যনদীতে বাণলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। সাধারণ প্রস্তর ও বাণলিঙ্গ ছাড়া ভারতের বহুস্থানে অনাদিলিঙ্গে শিবের উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। এই অনাদিলিঙ্গ কি? পরম পুরুষ কোন কোন পুণ্যস্থলে যে প্রস্তর-খণ্ডের কোন আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহাতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অলৌকিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া উপাসকগণকে তিনি কৃতার্থ করিয়া থাকেন এবং ঐ সব অনাদিলিঙ্গের পূজার প্রবর্তন তিনিই করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে বালি শহরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। সেখানে ৺কল্যাণেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ একটি অনাদিলিঙ্গ বহুকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শন ও অর্চনা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পার্ষদগণও ঐরূপ করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের অনতিদূরে এই মন্দির বহু সাধু ও ভক্তগণের নিকট সুপরিচিত। বিশ্বাসযোগ্য পুরাণকাহিনী যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্বে বর্তমান মন্দির যথায় অবস্থিত তথায় বেতগাছের বন ছিল। বেত-বনের সন্নিকটে একটি বাগ্‌দী বাস করিত। তাহার একটি গাভী ছিল। সেই গাভীটি অতি প্রত্যূষে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিত এবং বেতবনে ৺অনাদিলিঙ্গের উপর দুগ্ধ বর্ষণ করিত। বাগ্‌দী

দুগ্ধদোহনের সময় কয়েকদিন দুগ্ধ না পাওয়ায় একদিন প্রত্যুষে গাভীর অন্বেষণে বাহির হয়। সে লক্ষ্য করিল যে তাহার গাভী বেতবনে ঢুকিয়া লিঙ্গোপরি দুগ্ধক্ষরণ করিতেছে। সেই বাগ্‌দীকে ৺অনাদিলিঙ্গ স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, "তুমি তোমার গাভীকে বাঁধিয়া রাখিও না। সে আমাকে নিত্য দুগ্ধ দান করে। আমি এখানে বর্তমান, আমার নাম ৺কল্যাণেশ্বর।" ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর মাথায় একটি মণি জ্বলিত। একদা একজন নাগা সাধু ওখানে উপস্থিত হয় এবং ঐ মণিটির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে উহা লোভবশতঃ লইবার ইচ্ছা করে। ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর চারিদিকে ঘুঁটের পোর দিয়া ঐ মণিটি পৃথক্ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন সেই সাধুটি কুড়ুল দিয়া ৺বাবাকে যেমন আঘাত করে তেমন সময়ে মণিটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। এই কর্মের ফলে সাধু রক্তবমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

এই ঘটনার পর ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউ বালির ছয় আনি জমিদার রাজা ভগবতীপ্রসন্ন রায়কে স্বপ্নে বলেন, "তোমরা আমার মন্দির করিয়া দাও।" রাজার লোকেরা তখন বেতবন কাটিয়া স্থানটি পরিষ্কার করে এবং ৺অনাদিলিঙ্গের পরিমাণ জানিবার জন্ম খনন করিতে আরম্ভ করে। অনেক দূর ভূগর্ভে খনন করার পরে ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউ স্বপ্নে বলেন, "তোমরা খনন করিয়া আমার অন্ত পাইবে না। বৃথা শ্রম ত্যাগ কর।" ৺বাবার আদেশ পাইয়াও রাজা ভগবতীপ্রসন্ন মন্দির নির্মাণ করিবার কোন প্রয়াস পাইলেন না। মাহেশ অধিবাসী ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে মন্দির নির্মাণ করিবার জন্ম ৺বাবা স্বপ্ন দিলেন। বসুমহাশয় তদনুসারে ৺বাবার মন্দির নির্মাণ করিতে লাগিলেন। মন্দির নির্মিত হইবার পর রাজার কর্মচারীরা তাঁহাকে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে দিলেন না। এমনকি, লোক লাগাইয়া তাঁহাকে প্রহারের ভয় দেখাইলেন। তখন বসুমহাশয় উপায়ান্তর না দেখিয়া রাতারাতি মন্দিরের চূড়াতে বস্ত্র বাঁধিয়া ৺গঙ্গার পশ্চিমকূলে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠার পর রাজার প্রতিনিধিগণ ৺ঠাকুরদাস ঘোষালের হস্তে পূজার ভার অর্পণ করেন। রাজা ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর সেবার জন্ম ৪০০ বিঘা জমি দেবোত্তর করেন। ৺ঠাকুরদাস ঘোষালের বংশধরেরা প্রায় চারি পুরুষ এখন পর্যন্ত সেবার কাজ চালাইয়া আসিতেছেন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষাল মহাশয় প্রায় ৫৫ বৎসর একটানা সেবা করিয়া আসিতেছেন।

বালি শহরের নিকটবর্তী এবং দূরাগত নরনারীগণ এই মন্দিরে ৺বাবার দর্শন ও অর্চনা করিয়া শান্তিলাভ করিয়া আসিতেছেন। কল্যাণময় ৺বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর কৃপায় শত শত লোক কল্যাণ লাভ করিতেছেন।

"সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু সাহেবী-ভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন—সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহাভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকনাথ রায়

উপনিষদের যুগের পরে সমাজে ও ধর্মে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। বেদে জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইলেও (মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি) যজ্ঞে পশুবলি অনুমোদিত হইয়াছিল। অনেকের মতে যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল জীবহত্যার সঙ্কোচ সাধন। যজ্ঞে ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ায়, মাংসলোলুপদিগের মাংস খাইতে হইলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান অর্থশালী লোক ভিন্ন অন্যের অসাধ্য ছিল। ফলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই মাংসভোজন অসম্ভব হইয়াছিল, এবং জীবহত্যা সংকোচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যজ্ঞে পশুবলিও নিন্দিত হইয়াছিল। উপনিষদেই যাগযজ্ঞ নিকৃষ্ট উপাসনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল; এবং তাহার স্থলে ধ্যানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনার্যদিগকে সমাজে গ্রহণ করার ফলে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সাধারণ লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিল না। আবার যাগযজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া উপনিষদের তত্ত্ব-প্রচারের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। বৈদিক ও ঔপনিষদ্ যুগেও বেদবিরোধী লোকের অভাব ছিল না। যাহারা ইহলোককেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিত এবং পরলোকে বিশ্বাস করিত না তাহাদের প্রভাব হইতে সাধারণ লোকদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও ব্রাহ্মণরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধর্মের সারতত্ত্ব সমাজের সর্বস্তরে প্রচার এবং সমাজ-কল্যাণকর নীতির মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য উপনিষদের পরবর্তী যুগে দুইখানি মহাকাব্য দুই জন ঋষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই দুই মহাকাব্যের নাম রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণে সূর্যবংশীয় রাজাদিগের এবং মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং সাধারণ জনগণের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া দর্শন, আচরণনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহাভারত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রখ্যাত। এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বিবরণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত ইহাতে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচরণনীতি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কথা আছে, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"।

মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ। ইহার সকল ভাগ যে ব্যাসরচিত নহে, এ বিষয়ে বর্তমানে সকল পণ্ডিতই একমত। যুগে যুগে অনেক অজ্ঞাত কবি এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের রচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেক স্থলে একই ঘটনা বিভিন্নভাবে বর্ণিত দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে "প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনা-বাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।" উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, যে আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে—পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে বর্তমান মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের অন্তর্ভুক্ত অনুগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতার উল্লেখ নাই। সুতরাং এই দুই অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর বর্তমান মহাভারতে ১০৭৩৯০ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রত্যেক পর্বের যে শ্লোক সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাতে ৮৭,৮৩৬ শ্লোক হয়, একলক্ষ হয় না। কিন্তু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আছে যে

মহর্ষি মহাভারত রচনা করিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক "হরিবংশ"ও রচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে হরিবংশকে যদি মহাভারতের অংশ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলেও মহাভারতের মোট শ্লোক সংখ্যা হয় ৯৬,৮৩৬, লক্ষ শ্লোক হয় না। সুতরাং বর্তমান মহাভারতে যে ১০৭৩৯০ শ্লোক পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

পূর্বোক্ত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে ব্যাসদেব প্রথমতঃ উপাখ্যান-ভাগ ত্যাগ করিয়া ২৪০০০ শ্লোকে "ভারত-সংহিতা" রচনা করেন। ইহাই "ভারত" নামে আখ্যাত, এবং তিনি পুত্র শুককে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন ইহা শিক্ষা করেন। বৈশম্পায়ন যখন জনমেজয়ের সভায় এই মহাভারত পাঠ করিয়া ছিলেন তখন উগ্রশ্রবা তাহা শুনিয়াছিলেন, পরে উগ্রশ্রবাই নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণকে তাহা শুনাইয়াছিলেন। ইহাই মহাভারতে আছে। অনুক্রমণিকাতে আছে যে ২৪০০০ শ্লোকে ভারত-সংহিতা রচনার পর ব্যাসদেব ষষ্টিলক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্বলোকে এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত। কিন্তু এই অনৈসর্গিক ব্যাপার-ঘটিত কথাটাই যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।*

মহাভারতে আছে (আদিপর্ব ৬৩।৯৫ ৯৬) ব্যাসদেব বেদ ও মহাভারত পাঁচ জনকে শিখাইয়া ছিলেন—সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন। তাঁহারা পৃথক পৃথক ভারত-সংহিতা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, ও শুক প্রচারিত ভারত-সংহিতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈশম্পায়ন কথিত ভারত-সংহিতাই বর্তমানে মহাভারত নামে প্রচলিত আছে।

মহাভারতের রচনাকাল

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দে হইয়াছিল, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের মত। ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমকালিক। সুতরাং উক্ত যুদ্ধের পরের কয়েক বৎসরের মধ্যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে খ্রীঃ পূঃ ১১০০ অব্দে অথবা তাহার নিকটবর্তী কালে মহাভারত রচিত হয়, এবং বর্তমান মহাভারতের অধিকাংশই খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত একই আকারে প্রচলিত আছে। ম্যাকডনেলের মতে মহাভারতের মূল অংশ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পাণিনি-সূত্রে যুধিষ্ঠির, কুন্তী, বাসুদেব, অর্জুন, নকুল ও দ্রোণের নাম পাওয়া যায় এবং আশ্বলায়ন এবং সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্রে মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। এই সকল প্রমাণ হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অত্যল্প-কাল পরেই যে মহাভারতের মূল অংশ রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়।

মহাভারতে বর্ণিত বিষয়

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান বর্ণনার বিষয় হইলেও প্রাচীন অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এই গ্রন্থের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্বে ধর্ম, দর্শন, আচরণ নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। ভীষ্ম-পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া ভক্তিমূলক ঈশ্বরবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ত্রিমূর্তির কথা নাই। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপী একই ঈশ্বরের তিন মূর্তির ধারণা উপনিষদোত্তর যুগে প্রবর্তিত হয় এবং বাসুদেব কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সর্বত্র গৃহীত ও পূজিত হন। মহাভারত হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। মহাভারতে কোথাও

* বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, নবম পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণু, কোথাও শিব পরমদেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতি ও শূদ্রদিগের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। তাহাদিগের জন্য মহাভারত রচিত হইয়াছিল। মহাভারতে সকলেরই সমান অধিকার। লোকশিক্ষা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" গ্রন্থের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে।

মহাভারতে দার্শনিক তত্ত্ব

মহাভারতে বহু দার্শনিক মতের বর্ণনা আছে, কিন্তু ভগবদ্‌গীতা ভিন্ন অন্যত্র বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের চেষ্টা নাই। সনৎ-সুজাত অধ্যায়ে সনৎ-সুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন হয় তাহা হইলে অভেদে একত্ব সম্পাদন অসম্ভব। পরমাত্মা জলচন্দ্রের ন্যায় অজ্ঞানপ্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সংযোগে জীব বলিয়া খ্যাত হন। ঔপাধিক ভেদ দ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের হানি হয় না।" "সমগ্রবেদ ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই পরম ব্রহ্ম 'মৌন' বলিয়া অভিহিত। তিনি মৌনময়।" "এই বিশ্ব ব্রহ্মের উপাধি বিশেষ মাত্র।" "তপস্বী বেদ অনুসন্ধান না করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কিন্তু মন দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবে না 'আমিদাস' এইরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না, কারণ ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন।" "বিদেহাধিপতি জনক বলিয়াছিলেন, আমার ঐশ্বর্যের পরিসীমা নাই কিন্তু আমি যারপর নাই অকিঞ্চন। এই মিথিলা নগরী ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছু মাত্র দগ্ধ হয় না।"

পঞ্চশিখ-জনদেব সংবাদে, সাংখ্যযোগ কথন, জনক-পঞ্চশিখ-সংবাদ প্রভৃতি অধ্যায়ে সাংখ্য ও যোগদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চশিখ-জনদেব-সংবাদে নাস্তিক জড়বাদ ও সৌগত (বৌদ্ধ) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ (বৌদ্ধমতের উল্লেখ হইতে এই অধ্যায় যে প্রক্ষিপ্ত ইহা প্রমাণিত হয়) খণ্ডন করিয়া আত্মার দেহাতিরিক্ত অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। পরে "মোক্ষদশাতে, যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশ-হেতু যমনিয়মাদি সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়! তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, কিংবা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন্ ফলের নিমিত্ত লোকে মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চশিখ বলিতেছেন, "জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি মন প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশ-জনিত স্বরূপানন্দ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারেনা বিবেচনা করিয়া অহংকার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। মোক্ষলাভার্থীদিগের কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য। সুষুপ্তিসময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত থাকেনা। কিন্তু সে জন্য যে আত্মার নাশ হয়, তাহা নহে। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য। মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

"সাংখ্যযোগকথন" অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিতেছেন, "মোক্ষলাভ হইলে জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত স্মরণ হয় কিনা? কোন বেদে কহে মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে, কোন বেদে কহে থাকে না। ·· যদি জ্ঞান মাত্র না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনরায় বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব তো হইতে পারে।" উত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন, "জীবাত্মা যখন দ্বন্দ্ববিহীন নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহার পাপপুণ্য থাকে না, আর

তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক হইতে হয় না। জ্ঞানী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তখন দেহ-নিপাত পর্যন্ত তাহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া, তাঁহাকে জন্মান্তরীণ পাপপুণ্য ফল ভোগ করায়, কিন্তু সেই ফলভোগ-দ্বারা জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের গুণাবির্ভাব হয় না।" ইহা সাংখ্যমত বলিয়া কথিত হইলেও প্রচলিত সাংখ্যে পরমাত্মার কথা নাই। পরে ভীষ্ম বলিতেছেন, "পুরাকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজর্ষি করালকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—সমুদায় জগৎই 'ক্ষর', দেবযানে দ্বাদশ সহস্র বৎসরে যুগ, চারি যুগে এক কল্প, দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার একদিন ও একরাত্রি হয়; ব্রহ্মার দিনাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায়। রাত্রি প্রভাত হইলে ভগবান জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। এই নারায়ণই হিরণ্যগর্ভ। বেদে তিনি মহান্, বিরিঞ্চি ও অজনামে এবং সাংখ্যশাস্ত্রে বিচিত্ররূপ, এক ও অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ত্রৈলোক্য উহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উনি আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। পরে মহৎতত্ত্ব হইতে অহংকার, অহংকার হইতে সূক্ষ্ম ভূতগণ, সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল ভূতগণ, পরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব হয়। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত না হইলেও সকল তত্ত্বে অবস্থান করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশতত্ত্ব বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ঐ নিরাকার সর্বশক্তিমান মহাত্মা চেতনরূপে সর্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। নির্গুণ হইয়াও তিনি যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির মধ্যে একীভাব অবলম্বন করেন তখন তিনি শরীররূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচর ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। তখন তাঁহার দেহে আত্মাভিমান জন্মে। ইহার পরে আছে "জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পঞ্চবিংশতত্ত্বাতীত ষড়্বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করেন।" প্রচলিত সাংখ্যে ষড়্বিংশ তত্ত্বের কথা নাই।

'অনুগীতা পর্বাধ্যায়ে আছে "সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। 'মন প্রাণের গতির' অধীন; প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই জন্য মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। আত্মা দুই প্রকার ক্ষর ও অক্ষর। উপাধিযুক্ত আত্মা ক্ষর, উপাধিবিহীন আত্মা অক্ষর। লোকে মহৎ তত্ত্বকে 'মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়া থাকে।...ঐ মহৎতত্ত্বের হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ, সর্বত্র বিদ্যমান। উনি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।......যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহৎতত্ত্বের গতি সর্বশেষ অবগত হইতে পারেন...তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।" এই অধ্যায়ের অন্যত্র নানাবিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে। "কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্বে সংশয় করেন। কাহারও কাহারও ঐ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।...কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য বলেন। কেহ বলেন আত্মা ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ তাহাকে একমাত্র বস্তু বলেন। কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কেহ কেহ পুরুষকে প্রকৃতির সহিত মিলিত বলেন। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্তন করেন। কোন কোন ব্যক্তির মতে এই মত নিতান্ত হেয়।...কেহ কেহ কর্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্মত্যাগের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ সতত অহিংস, কেহ কেহ হিংসাপরায়ণ।..."

ভগবদ্গীতা অধ্যায়ে যে দর্শন বিবৃত হইয়াছে তাহা পরে আলোচিত হইবে।

মহাভারতে বৌদ্ধ ও দিগম্বর জৈনদিগের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের সর্বত্র বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত এবং নাস্তিক মত নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু দুই এক স্থলে বেদ সম্বন্ধে সংশয়ও প্রকাশিত হইয়াছে।

সমাজনীতি

এই যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ 'ব্রাহ্মণ' ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্রোধবর্জন, সত্যকথন, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পতিব্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের পোষণ—এই নয়টি সর্বধর্মের সাধারণ ধর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম ইন্দ্রিয় দমন ও বেদাধ্যয়ন। শান্তস্বভাব, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ অসৎকার্যের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া সৎপথে থাকিয়া যদি ধন লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে দার পরিগ্রহপূর্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান তাহার অবশ্য কর্তব্য। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই সাধু ব্যক্তির কর্তব্য। ব্রাহ্মণেরা বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগের নমস্য। কিন্তু অত্যাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্তব্য। অধর্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম হয় না। পাপাচারী ব্রাহ্মণকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবে।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম; যাচ্ঞা, যাজন ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরে পরাক্রম প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। রাজা অন্য কোনও কর্ম করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায়ে ধনসঞ্চয় এবং পুত্রনির্বিশেষে পশুপালন ক্ষত্রিয়ের নিত্যকর্ম। বৈশ্য যদি অন্যের ধেনুর রক্ষক হয়, তাহা হইলে ছয়টি ধেনুরক্ষার বিনিময়ে একটি ধেনুর দুগ্ধ, শত ধেনু রক্ষার জন্য বৎসরে একটি গো-মিথুন পাইবে। অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে লব্ধ ধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে উৎপন্ন শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে।

তিন বর্ণের পরিচর্যাই শূদ্রের কর্তব্য। রাজাদেশ ব্যতীত অর্থসঞ্চয় শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ। শূদ্রের ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎ-যুগল, চামর ও বস্ত্র প্রদান করা অন্যান্য বর্ণের অবশ্য কর্তব্য।

ব্রাহ্মণ হইতেই অন্য তিন বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতঃই যজ্ঞে অধিকার আছে। মানসযজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে, ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ। সকল বর্ণই সর্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলেন। যিনি ধর্মপথে থাকিয়া, ধন উৎপাদন করিয়া যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। যিনি গার্হস্থ্য সুখ বর্জন করিয়া মোক্ষ কামনায় বনে ভ্রমণ করত দেহত্যাগ করেন তিনি তামস সন্ন্যাসী। আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষায় পর্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য।

আচরণনীতি

মহাভারতে বহুস্থানে সদাচারের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। সদাচারের আদর্শ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, মুনিদিগের বিভিন্ন মত। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত; মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট পন্থা। সত্য সকল ধর্মের সার। সত্যই তপঃ, যাগযজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সকল প্রতিষ্ঠিত। মান-

দণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে সত্য আরোপিত হইলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হয়। কিন্তু যেখানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেখানে সত্য কথা না বলিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের জন্যই ধর্মের সৃষ্টি। অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই ধর্ম।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহারা পুরুষার্থ। ইহাদের মধ্যে ধর্ম মোক্ষলাভের উপায়। মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। ইহা ধর্ম দ্বারা লভ্য। মোক্ষ-লাভের উপায়স্বরূপ যে সকল নিয়ম উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই মোক্ষধর্ম।

সকলেই সুখ কামনা করে এবং দুঃখ পরিহারের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য। সুখদুঃখে সমতা, সুখে নিস্পৃহতা ও দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকা—ইহাই শান্তিলাভের উপায়।

অহিংসা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "অহিংসাই মানুষের পরম ধর্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য, পরম জ্ঞান। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসা-ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নাই। অতএব সমস্ত প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া কর্তব্য। মাংসভোজিগণ নরকে গমন করে এবং বার বার তির্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়। যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কার্য উপলক্ষ্যে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়। তবে মৃগয়াকালে মানুষের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদের সংহার করিব। এই জন্য মৃগয়া পাপজনক নহে।

সকলেই সুখ কামনা করে, কিন্তু সুখ পুরুষার্থ নহে। কামনার পরিতৃপ্তি দ্বারা কামনার শান্তি হয় না। যত পাওয়া যায়, তৃষ্ণা ততই বর্ধিত হয়। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্ধতে॥" কাম্য বস্তুর উপভোগে কাম শান্ত হয় না। আগুনে ঘৃত ঢলিলে যেমন অগ্নি বর্ধিত হয় উপভোগের ফলেও তেমনি কামনা বর্ধিত হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য ধর্মের প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মের ফল সুখ নহে। "যতো ধর্মস্ততো জয়:" মহাভারতে উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু কৌরবদিগের পরাজয়ে ধর্মের যে জয় ঘোষিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে জয় নহে। পুত্রগণ হত, বন্ধুগণ সমরক্ষেত্রে পতিত, সমগ্র ভারতে গৃহে গৃহে আর্তনাদ। এই অবস্থায় হয়ত রাজ্যলাভকে যুধিষ্ঠির জয় বলিয়া গণ্য করেন নাই এবং তাহাতে সুখবোধ করেন নাই। তবুও মহাভারতকার ধর্মকেই আশ্রয়ণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কেননা মানবসমাজ ধর্ম দ্বারাই বিধৃত।

বেদ ও উপনিষদের মতো মহাভারতেও কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই কর্মবাদের সহিত ইচ্ছার স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। মানুষের কর্ম দ্বারা পূর্ব-কৃত কর্ম রূপান্তরিত হয়। পূর্বজন্মে কৃত যে সকল কর্মের ফল বর্তমান জীবনে আরব্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রারব্ধ কর্ম এবং যে সকল কর্ম ভবিষ্যতে ফলদানের জন্য সঞ্চিত আছে, তাহারা সঞ্চিত কর্ম। বর্তমান জীবনের কর্ম আগামী কর্ম। প্রারব্ধ কর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই, কিন্তু সঞ্চিত ও আগামী কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা সম্ভবপর।

ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরই কর্মফলদাতা।

আনন্দ তীর্থে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আনন্দের তীর্থধামে উপনীত হইনু পথিক
ধূলা,—সেথা স্বর্ণ রেণু, শিলা,—সৌধে খচিত মাণিক
লতা সব সোমলতা, বৃক্ষশাখে ফুল্ল পারিজাত
সুস্বাদ মধুর ফলে তৃপ্ত তুষ্ট সবে দিনরাত
সেথাকার নরনারী।

ঘনচ্ছায় বসি বৃক্ষতলে
অবধূত দার্শনিক চোখে মুখে আনন্দ উথলে
ধর্মকথা নাহি কয়, নাহি করে মন্ত্র জপ তপ
নামে সে সহজানন্দ সুখে সহ্য করে শীতাতপ
সারল্যে শিশুর মত।

শুধাইলে মুক্তির বারতা
নিত্যসিদ্ধ মুক্তিবাদ কহে এক বিস্ময়ের কথা
মুক্তাঝরা হাসিরাশি সেই তার যুক্তির পসরা
যেথায় যখন থাকে সেথা ধন্য মানে যেন ধরা
আনন্দ বন্যায় তার।

বলে মুক্ত আমি, মুক্ত তুমি
বন্ধন ভুলিয়া গিয়া ধরিত্রীর স্বর্ণ ধূলা চুমি
গাহো এ মুক্তির গান ; অবগাহি সুগভীর সুরে
অন্তরের চিদানন্দ অন্তর বাহির যাবে ভ'রে।
সুপ্তি মুক্তি সুষুপ্তির অচেতনে ভূমার পরশ
জাগ্রতে লভিবে যবে পাবে তবে মধুব্রহ্মরস
প্রশ্নের উত্তর নাই, প্রাণ উত্তরায়ণের পথে
বিশ্বাস পাথের নিয়া অবাধে উত্তরে মনোরথে
আলোকিত শুক্ল পথে।

তার পরে শুক্ল কৃষ্ণ নাই
যাহা শুক্ল তাহা কালো উভয়তঃ আনন্দই পাই
দেখি কিংবা দেখি নাকো, শুনি কিংবা শুনি নাকো
কানে,
থাকা না-থাকার বুদ্ধি আমি-তুমি কি জানি কে
জানে
আনন্দ অমৃতরূপ মধুর মধুর মধু হতে
আত্যন্তিক সুখসিক্ত হয় চিত্ত পরতে পরতে।
বাঁধা আছে যে-বন্ধনে, সে-বন্ধন ইন্দ্রজাল বাঁধা,
পরমাণু পরিমাপ, তার লাগি মিথ্যা হাসা কাঁদা!
জানিনা আদিত্যবর্ণ, জানিনাকো তমসার পার,
স্বভাবসুলভ সিদ্ধ নিরন্তর আনন্দ তোমার
এ এক অচিন রাজ্য শিশুদের বেশী পরিচিত
অধরে মধুরী হাস্য, কলহে কুতর্কে হয় ভিত ;
মিষ্ট কি বুঝানো যায় ? রসনায় নিতে হয় রস,
অন্তরে আনন্দ ফুটে প্রভাতের ফুল্ল তামরস।
সুরাসুর নারীনর সে সুধার সতত ভিখারী
যদ্যপি অমূল্য সুধা, মূল্য নাই যে চায় সে তারি।
শুধু লৌল্য মূল্যে মিলে সে মুক্তির আনন্দের স্বাদ
সর্বজনে করে লাভ সার্বভৌম ভূমার আহ্লাদ।

'মতুয়ার বুদ্ধি'

ডাঃ এস্ আহাম্মদ্ চৌধুরী

পরমহংসদেব বলতেন, "আমার ধর্ম ঠিক, অপরের ধর্মমত মিথ্যা এই রকম ধারণা করার নাম "মতুয়ার বুদ্ধি।" এই সহজ সত্য কথাটিই জগতের যত বিভেদ, দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, মারামারি ও কাটাকাটির মূল কারণ। আমরা দেখতে পাই যে, শুধু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই এই বাদ-বিসম্বাদ সীমাবদ্ধ নহে, বিভিন্ন মতাবলম্বী নানা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আজ এইরূপ দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষে লিপ্ত। কখনও কখনও এইরূপ মতভেদের পরিণাম তর্কাতর্কি হ'তে আরম্ভ ক'রে হাতাহাতি এমনকি

নরহত্যার পর্যায়ে পৌঁছায়। ধর্মকে অবলম্বন ক'রে পাশবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পরস্পর নরহত্যা ও তজ্জনিত রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পরমহংসদেব তাই দুঃখ করে বলতেন, "মা, সবাই মনে করে তার আপন ঘড়িটি ঠিক চলছে। কিন্তু মা কারও ঘড়িইত ঠিক চলছে না।" ঘড়ি ঠিক চলছে কি না চল্‌ছে তাহা পরখ করে দেখতে হলে মাঝে মাঝে সূর্যঘড়ির সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ অন্তররূপ ঘড়ির মনরূপ কাঁটা, অহংজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি, ও মায়াময় সংসারের মিথ্যামোহ থেকে মুক্ত হয়ে কতটা ভগবানের দিকে চলছে, বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মান্বেষণ (Self Searching) দ্বারা বিচার করে তাই দেখে নিতে হবে। মন ঘড়িটির এই পরখ করার চেষ্টায় যতটা আমরা বহির্জগৎ ছেড়ে অন্তর্জগতের দিকে এগুতে পারব ঘড়ি ততটাই ঠিক চলতে থাকবে। আর ঘড়ি যত বেশী ঠিক চলতে থাকবে তত বেশী আমরা উদার ও পরমত-সহিষ্ণু হতে পারব। মতের ব্যবধান কমতে থাকবে আর পরকে বুকের কাছে টেনে এনে আপনার জন বলে গ্রহণ করতে পারব। পাত্র যত সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র হবে দ্রব্য তাতে ততটাই কম ধরবে। পাত্র যত বড় হবে, ধারণক্ষমতাও তার তত বেশী হবে। একসের ঘটিতে কি পাঁচসের দুধ ধরবে? কিন্তু পাঁচসের ঘটিতে একসের দুধ ধ'রে আরও জায়গা থাকবে। তাই মনকে সঙ্কীর্ণতামুক্ত করে যতটা উদারভাবাপন্ন করা যাবে অপরের মতকে ততটা নিজের অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে। তাতে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবটাও ক্রমে ক্রমে কেটে যাবে। মন নির্মল হবে, বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধির তরঙ্গ মনকে নাড়াচাড়া করে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, সেই স্বচ্ছসলিল অন্তরের আত্মার দিকে তাকালে যা দেখা যাবে তা প্রাণারাম—তা সচ্চিদানন্দ। কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ কাজটি তত সহজ নয়। পরমহংসদেব তাই বলতেন, "সংসারী লোকের মাঝে মাঝে দিন কতক নির্জনে সাধন ভজন দরকার"। তিনি বলতেন "যেমন করেই হোক একবার বাবুর সাথে দেখা হওয়া চাই, তা দারোয়ানের ঘাড় ধাক্কা খেয়েই হোক আর দেয়াল ডিঙ্গিয়েই হোক, বাবুর সাথে দেখা হলে পর তিনিই সব বুঝিয়ে দিবেন।" বাবুর বাড়ীর খোঁজটা যদি জানা না থাকে, তবে যারা বাবুর বাড়ী যাওয়া আসা করেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে দয়া করে তারা পথের কথাটা বলে দিবেন। যিনি পথ দেখিয়ে দিবেন তিনিই গুরু। সেই পথ ধরে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে চলে গেলেই হলো। বাবুর বাড়ী যাওয়ার কিন্তু একটি মাত্র রাস্তা নয়। অনেক রাস্তাই আছে। যিনি যে রাস্তা দিয়েই বাবুর বাড়ীতে গেছেন আর যে রাস্তা তাঁর ভাল লেগেছে তিনি সেই রাস্তার কথাই বলে দেবেন।

বিভিন্ন ধর্মমত ভগবানেরই সৃষ্টি, যেমন বাগানে হরেক রকম ফুল। বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সৌন্দর্য ও মাধুর্য। যার যে ফুলটি ভাল লাগে সে তা তুলে নেয়। যার যেমন অভিরুচি, অধিকারী ভেদে ও রুচিভেদে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি। যার যেটি পেটে সয়। মুড়িঘণ্ট, ভাজা, টক, মিষ্টি যার যেমন রুচি। যেমন ভাব তেমন লাভ। আমার কাছে যেটি ভাল লাগে অপরের কাছে সেটিই ভাল লাগতে হবে—এ শুধু হঠকারিতা—মহাপাপ। আমার শুধু দরকার গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও একাগ্র-চিত্তে সাধন। এই ব্যাকুলতা একবার জাগলেই বাবু নিজে এগিয়ে আসিবেন। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ বলতেন, "আল্লার দিকে তুমি হেঁটে চললে তিনি তোমার দিকে দৌড়ে আসেন।" পরম-হংসদেব বলতেন,—মায়ের দেওয়া মুখের চুষনী অসার জেনে ছেলে যখন চুষনী ফেলে দিয়ে চীৎকার করতে থাকে, মা তখন রান্নাবান্না ফেলে দৌড়ে এসে কোলে তুলে মাই দেন।" আসল কথা হ'ল তাঁকে ভালবাসা,—প্রাণঢালা ভালবাসা, তাঁকে

সবার চেয়ে আপন মনে করা, অন্তর দিয়ে তাকে ডাকা, তা সে যে ভাবেই হোক্, যে নামেই হোক্, যে প্রথায়ই হোক্ আর যে ধর্ম অবলম্বন করেই হোক্। ঠাকুর বলতেন বড় ছেলেরা বাবাকে "বাবা" বলে ডাকে। যে ছোট ছেলে "বাবা" বলতে পারে না সে হয়ত "বা" কিংবা "পা" বলে। তাই বলে কি বাবা তার উপর রাগ করেন। ঈশ্বর শুধু আমাদের মনের ভাবটি গ্রহণ করেন—বাহিরের লোক দেখানো ভাবটি নয়। তাই তো তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দন। পরমহংসদেব বলতেন, "পুকুর থেকে সবাই একই বস্তু নেয় কিন্তু নাম বিভিন্ন; কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি আর কেউ বা বলে ওয়াটার।" তিনি বলতেন, "ছাদে উঠা নিয়ে কথা, তা কাঠের সিঁড়ি, পাকা সিঁড়ি, বাঁশের মই অথবা দড়ি যাহা কিছু অবলম্বন করেই হোক্ ছাদে উঠলেই হলো।" যার যেটি ভাল লাগে সেটি ধরে উঠলেই চলবে। গন্তব্যস্থল এক, পথ বিভিন্ন। তাই পথ নিয়ে ঝগড়ার দরকার কি? ঠাকুর বলতেন, "যত মত, তত পথ।"

আমাদের তাই 'মতুয়ার বুদ্ধি' ছাড়তে হবে। নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে সকল মতবাদকে এখানে ঠাঁই দিতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতা যার নেই, বুঝতে হবে যে তার নিজের ধর্মের মর্মও উপলব্ধি হয়নি। সে অনেক পিছনে পড়ে আছে। কারণ কোন মহাপুরুষই অপর ধর্মকে হিংসা অথবা বিদ্বেষ করার নির্দেশ দেননি। ভেদাভেদ ও সঙ্কীর্ণতা মানুষের সৃষ্টি। ধর্মের নৈতিক বিধান সর্বত্রই এক। শুধু ভগবৎ আরাধনার প্রথা ও সামাজিক আচারপদ্ধতি বিভিন্ন। বৈচিত্র্যই ভগবানের সৃষ্টির বিধান। তাই বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন মতবাদ। সত্য সর্বত্রই সত্য। ঠাকুর বলতেন, "ঈশ্বরের কি ইতি করা যায়? তিনি সাকার, নিরাকার আরও কত কি হতে পারেন।" তিনি এত সহজ করে বুঝিয়েছেন যে ভাবলে প্রাণ শীতল হয়। এই আণবিক যুগের জগৎ যদি এই মহাপুরুষের কথায় আজ একটু কান দিত আর একটু তাঁর কথামত চলতে শিখতো তবে যুদ্ধের আতঙ্ক আর ধ্বংসের ভয় দূর হতো। পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি বিরাজ করতো।

শ্রীশ্রীমীনাক্ষী দেবী

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দাক্ষিণাত্যে তীর্থের অন্ত নাই। প্রতি গ্রামেই প্রায় একটা ক'রে মন্দির আছে। অধিকাংশ মন্দিরই চোল, পাণ্ড্য এবং বিজয়নগর রাজাদের সময়ে নির্মিত হ'লেও অনেকক্ষেত্রেই সে সব স্থানে দেবতার আবির্ভাব বহুপূর্বেই হয়েছিল। কোথায়ও এক হাজার, কোথায়ও দু'হাজার এবং কোথায়ও বা আরও বেশীদিন আগে দেবতাদের আবিষ্কার হয়েছিল। এই সব মন্দিরগুলি দাক্ষিণাত্যের কৃষ্টি, সভ্যতা, স্থাপত্য ও শিল্পের জলন্ত নিদর্শন। তখন রাজারা অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা ঐসব মন্দির নির্মাণে খরচ করেছেন। ইদানীং কোনও কোনও মন্দির মেরামতের জন্য দাক্ষিণাত্যের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় চেটিয়াররা বহুলক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কাঞ্চীপুরমে একাম্বরনাথের মন্দির মেরামত করতে একজন চেটিয়ার আঠারো লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে অনেক শহর এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। অসংখ্য মন্দির হ'লেও কয়েকটি মন্দির এবং সেই সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা খুবই সুপরিচিত ও বিখ্যাত এবং প্রত্যহ হাজার হাজার ভক্ত নরনারী সেই সব মন্দির দর্শনে যান এবং তথাকার দেবতাদর্শনে মনে অনির্বচনীয় শান্তি উপলব্ধি করেন। এই বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে কাঞ্চিপুরমে ৺কামাক্ষী, একাম্বরনাথ ও বরদারাজের মন্দির, চিদাম্বরমে ৺নটরাজের মন্দির, ত্রিচিনাপল্লীতে ৺শ্রীরঙ্গম ও জম্বুকেশ্বরের মন্দির, মদুরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, রামেশ্বরে ৺রামেশ্বরের মন্দির—মাদ্রাজরাজ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই প্রবন্ধে মাদ্রাজরাজ্যের প্রাচীনতম শহর মদুরার ৺মীনাক্ষী দেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

মীনাক্ষী দেবী সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে মদুরা শহর সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

মদুরা শহর

তামিলে দীর্ঘ বর্ণের যথা—ধ, ভ, থ প্রভৃতির প্রচলন নেই। 'ধ'-এর স্থলে সাধারণতঃ 'দ' উচ্চারিত হয়। 'মধুর' শব্দ হ'তে 'মদুর' এবং 'মদুরা' হয়েছে একথা অনেকে বলেন। ইহার অর্থ 'মিষ্ট'। কথিত আছে যে শহরের সুউচ্চ মনোহর সৌধগুলি দর্শনে শিব অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ইহার উপর সুধা (মধু) বর্ষণ করেন, এবং তদবধি ইহা মদুরা নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিকরা বলেন যুক্তপ্রদেশের মথুরানগরী হতে অসংখ্য হিন্দু এখানে আসিয়া বহুকাল পূর্বে বসতিস্থাপন করেন এবং ইহার নাম 'মথুরা' রাখেন, তদবধি ইহা 'মদুরা' নামে পরিচিত হয়। পূর্বেই বলেছি, মদুরা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনতম শহর। বিগত দু'হাজার বৎসর যাবৎ ইহা দ্রাবিড় কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে দাক্ষিণাত্যের 'এথেন্স' (গ্রীসের রাজধানী ও খুব প্রাচীন শহর) নামে অভিহিত করেন।

তামিল সাহিত্যের প্রধান পরিষদ 'তামিল সঙ্গম্' এই মদুরাতেই প্রথম স্থাপিত হয়। বিখ্যাত তামিল কবি তিরু আলোয়ার বলেছেন, "বর্তমান পাটনাতে এলে বুদ্ধও হয়ত নিজেকে অপরিচিত মনে করবেন কিন্তু মদুরা শহরে অদ্যাপি প্রাচীন কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।" যদি কোনও বিদেশী প্রাচীনকালের হিন্দুদের রীতিনীতি, আধ্যাত্মিক জীবন, কৃষ্টি, সভ্যতা যদি দেখতে চান তবে তাঁর পক্ষে মদুরা শহর এবং মীনাক্ষী মন্দির দর্শন অপরিহার্য। মদুরার ইতিহাসকে পৌরাণিক, মাধ্যমিক ও আধুনিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পাণ্ড্য রাজারা প্রাচীনকালে এখানে রাজত্ব করতেন এবং কথিত হয় যে লঙ্কাদ্বীপের প্রথম রাজা বিজয় (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দ) এই পাণ্ড্য রাজাদের জামাতা ছিলেন। মধ্যযুগে বিজয়নগরের নায়েকরা এখানে রাজত্ব করেন এবং মীনাক্ষীদেবী সুন্দরেশ্বরের (শিব) বর্তমান মন্দির এঁরাই নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর মুসলমান সম্রাট কর্তৃক মদুরা আক্রান্ত হ'লে বিজয়নগরের মহারাজা মুসলমানদের পরাস্ত করে ধীরে ধীরে এখানকার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। বিজয়নগরের শাসকদের মধ্যে বিশ্বনাথ নায়েক (১৫৫৯) ও তিরুমল নায়েক (১৬২৩) সমধিক প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজ হ'তে মদুরার দূরত্ব ৩০৫ মাইল এবং তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া ৯৷৵০ টাকা। প্রসিদ্ধ ভাগাই নদী এই শহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

মীনাক্ষীদেবীর মন্দির

দাক্ষিণাত্যের বৃহত্তম এই মীনাক্ষীদেবীর মন্দির মদুরা শহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। পূর্বোল্লিখিত বিশ্বনাথ নায়ক খ্রীষ্টীয় ১৫৬০ অব্দে এই মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত ও মন্দিরের নির্মাণ কার্য শুরু করেন। মন্দিরকে কেন্দ্র করে চারিধারে প্রধান রাস্তাগুলি মন্দিরের চতুর্দিকস্থ সীমা-দেওয়ালের সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। মন্দিরটির সর্বাপেক্ষা বহিঃস্থ দেওয়ালগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৮৪৭ ফিট ও ৭৯২ ফিট।

মুসলমান আক্রমণকারী মালিক কাফুর খ্রীষ্টীয় ১৩১০ সালে মথুরা আক্রমণ পূর্বক মীনাক্ষীদেবীর পুরাতন মন্দির ভূমিসাৎ করেন। বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণকার্যে তখনকার দিনে এক কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এবং নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়েছিল একশো কুড়ি বছরে। মন্দিরের চারদিকে চারটি বৃহৎ গোপুরম্ (প্রবেশদ্বার) আছে, সেগুলির উচ্চতা ১২০ হ'তে ১৫২ ফিট। বহুদূর হ'তে এই বিরাট গোপুরমের চূড়াগুলি দৃষ্ট হয়। গোপুরমের দরজায় দুপাশের পাথরগুলি ৬০ ফিট লম্বা এবং ঐগুলির প্রত্যেকটি একখানি পাথর (Single Stone)। গোপুরমের উপর বহুপ্রকারের অসংখ্য সুদৃশ্য মূর্তি এবং রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের বহু কাহিনী চিত্রিত। এই চারটি গোপুরম্ ছাড়াও মন্দিরাভ্যন্তরে আরও পাঁচটি প্রবেশ দ্বার আছে। উত্তর প্রবেশ-দ্বারের সন্নিকটে পাঁচটি আশ্চর্যজনক স্তম্ভ দেখা যায়—উহাদের সঙ্গীতস্তম্ভ বলা হয়। একটি অখণ্ড গ্রাণাইট পাথরের মধ্যে বাইশটি সরু সরু গোলাকার স্তম্ভ খোদিত হয়েছে এবং উহার প্রত্যেকটিকে আঘাত করিলে বিভিন্ন রকমের সুমিষ্ট সুর নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের মধ্যে সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ, কল্যাণমণ্ডপ প্রভৃতি অবস্থিত।

মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারের দুপাশে আটটি সুবৃহৎ স্তম্ভে দেবীর অষ্টশক্তির মূর্তি বিদ্যমান। উহার পরই মীনাক্ষীদেবীর মূল মন্দিরে যাওয়ার দীর্ঘ পথ—১৬০ ফিট লম্বা। মূল মন্দিরের পথে স্বর্ণপদ্ম পুষ্করিণী (Golden-lily tank) বর্তমান। উহাকে পরিক্রমা করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ হিন্দু এই পুষ্করিণীর জলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন। এই জলে স্নান করলে সর্বপাপ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। কথিত আছে ব্রহ্মহত্যার পাপ হ'তে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এই পুষ্করিণীতে স্নান করেছিলেন। পুষ্করিণীর উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়ালে নানারূপ চিত্র (Fresco painting) অদ্যাপি বর্তমান। চিত্রগুলিতে ইন্দ্রের ব্রাহ্মণহত্যা, তারপর ইন্দ্রের দরবার, রম্ভা ও উর্বশীর নৃত্য প্রভৃতি দেখানো হয়েছে। পুষ্করিণীর উত্তর দিক হ'তে মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সোনার চূড়া দেখা যায়। নিষ্ঠাবান যাত্রীরা মন্দিরের প্রবেশের পূর্বে এই পুষ্করিণীর জল স্পর্শ করেন। প্রবেশ-দ্বারের দুধারে দেবীর দুই পুত্র গণেশ ও সুব্রহ্মণ্যের (কার্তিক) দুটি ছোট মণ্ডপ। ধাতুনির্মিত সুবৃহৎ দুজন দ্বারপালক মন্দির পাহারায় নিযুক্ত। মন্দির এত বড় এবং এত বিভিন্ন রকমের কারুকার্য-শোভিত যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও অসাধ্য। একমাস যাবৎ প্রত্যহ মনোযোগ সহকারে কয়েক ঘণ্টা ক'রে দেখলে মন্দির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হ'তে পারে। প্রথম দিন পরিচালকের (guide) সাহায্য ব্যতীত মন্দিরে ঢুকলে বার হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। গোলক ধাঁধাঁর মত মনে হয়।

দুঃখের বিষয় মন্দিরের প্রধান প্রবেশমণ্ডপটি বাজারে পরিণত হয়েছে। ফুল ফল ছাড়াও অসংখ্য প্রকারের পণ্যদ্রব্যের দোকানে স্থানটি পরিপূর্ণ। আয়ের লোভে মন্দির কর্তৃপক্ষ এই সুপ্রাচীন বিরাট মন্দিরের ভাবগাম্ভীর্য অনেকটা নষ্ট ক'রে ফেলেছেন। মন্দিরের অর্থের কোনও অভাব নাই। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে—যাত্রীরাও বহু টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রত্যহ প্রণামীস্বরূপ দান করেন। কাজেই এই দোকানগুলি অবিলম্বে তুলে দেওয়া উচিত।

দেবীর মূল মন্দিরের প্রবেশপথে বিভিন্ন স্তম্ভ-গাত্রে নানারূপ মূর্তি অঙ্কিত আছে। ঐগুলিতে দেবীর জন্ম, শৈশব, শাসন প্রভৃতির বিবরণ অতি সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে।

মীনাক্ষী দেবী

মথুরা শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন মীনাক্ষী। মাছের মত চোখ ব'লে এঁর নাম নাম মীনাক্ষী।

এঁর জন্মবৃত্তান্ত ও আবির্ভাব কাহিনী অদ্ভুত। পাণ্ড্য বংশে মলয়ধ্বজ নামে একজন বিখ্যাত ধর্ম-পরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁর কোনও ছেলেপুলে না থাকায় তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞান্তে পুত্রের পরিবর্তে যজ্ঞকুণ্ড হ'তে তিনটিস্তন-বিশিষ্ট কুমারী কন্যা আবির্ভূতা হ'ন—এঁরই নাম মীনাক্ষী। রাজা মলয়ধ্বজ কন্যার এই অদ্ভুত আকৃতি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং এই ভেবে মন গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় যে, একটি মাত্র সন্তান, তাহারও অদ্ভুত রূপ। প্রার্থনার ফলে রাজা দৈববাণী শোনেন যে, যখনই এই কুমারী তাহার ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবে তখনই তাহার তৃতীয় স্তন অন্তর্হিত হবে। এই বাণী শুনে রাজা অনেকটা আশ্বস্ত হন। মলয়ধ্বজের মৃত্যুর পর মীনাক্ষীই পাণ্ড্যরাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর অপূর্ব কৌশল, তেজ ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে অনেক রাজ্য জয় করেন। যজ্ঞ হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন ব'লে দেবী বলেই তাঁকে সকলে পূজা করতে থাকে। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবধি ছিল না; কাজেই অচিরেই তিনি দ্রাবিড় জাতির হৃদয় জয় করেন। মাঝে মাঝে উত্তরাখণ্ড হ'তে আর্যরা আক্রমণ করতে আসতেন, কিন্তু কখনও তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারেন নি। অবশেষে একদিন যুদ্ধ করতে করতে তিনি সুন্দরেশ্বর নামে এক সুন্দর বীরপুরুষের সম্মুখীন হ'ন এবং এক অব্যক্ত লজ্জা তাঁকে সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তৃতীয় স্তন অন্তর্হিত হয়। এই সুন্দরেশ্বর আর কেহই নহেন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এবং মীনাক্ষী হচ্ছেন পার্বতী। রাজকীয় জাঁকজমকের সহিত সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীদেবীর উদ্বাহকার্য সম্পন্ন হয়। স্থূল শরীরান্তে এঁরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে দেবীর মন্দির এবং পরে সুন্দরেশ্বরের মন্দির নির্মিত হয়। সুন্দরেশ্বরের মন্দির আকারে দেবীমন্দিরের দ্বিগুণ হ'লেও যেহেতু মীনাক্ষী মদুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেহেতু তাঁর প্রাধান্য বিন্দুমাত্রও খর্ব করা হয় নি। তীর্থযাত্রী এবং পূজারী প্রত্যেকেই প্রথমে দেবীকে দর্শন করেন ও তাঁর পূজা করেন, পরে সুন্দরেশ্বরের মন্দির দর্শন করেন। বিরাট মন্দিরের তুলনায় দেবীর প্রস্তরমূর্তি ছোট হ'লেও, দেবী যেন সর্বৈশ্বর্য নিয়ে সেখানে বিরাজিতা। অতি সুন্দর ও সৌষ্ঠব মূর্তি। ভক্তিভরে একাগ্রচিত্তে দেবীকে দর্শন করলে সত্যই মায়ের উপস্থিতি যেন অনুভূত হয় এবং দর্শকের হৃদয় অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মীনাক্ষী দেবীর মূর্তিদর্শনে অচিরাৎ সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং বহুক্ষণ সে অবস্থায় ছিলেন। করুণাময়ী জননী অকাতরে করুণা বিলাচ্ছেন—সেখানে উচ্চনীচ ভেদ নাই, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্খের ভেদ নাই, ব্রাহ্মণশূদ্রের ভেদ নাই—সকলেই মায়ের সন্তান, মায়ের কাছে সকলেই এক। মায়ের দর্শনেই সন্তানের মন ভরপুর ও তৃপ্ত। যুগ যুগ ধরে মা এখানে অকাতরে কৃপা বিতরণ করছেন—তাঁর অবোধ সন্তানদের অবিশ্রান্ত স্নেহধারায় সিক্ত করছেন। জয় মা!!

'ক'রো বিশুদ্ধ মন'

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

আশা-প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে ব'লে ;
বেদনার জ্বালা রেখ না মর্মতলে।
যে দিয়াছে ব্যথা মর্মে তোমার—
রটাইয়া অপযশ ;
সময় থাকিতে ধর বুকে তারে
নাও ক'রে প্রেমে ব ।
শত্রুকে দাও উচ্চ আসন
অমানীরে দাও মান ;
বেলা নাই ভেবে, অনুরাগ-ফাগে
রাঙাইয়া নাও প্রাণ।
হৃদয়-দুয়ার রাখো রাখো খুলে, ভাই ;
সবে ভালোবেসে সবাকার জয় গাই।

মিথ্যা মায়ার কুহকেতে পড়ে তুমি,
দুখে ধূ-ধূ বুক করিয়াছ মরুভূমি।
কোরো নাক আর আপনারে ছোট
জীবনেরে ধিক্কারি ;
দুখ কোথা রবে ? ভেবে দেখ মনে
পরপারে দিলে পাড়ি ?
মিথ্যা যশের ধনের ভিখারী
সাজিয়া বয়েছ দুখ ;
সেই বেদনায় বিদীর্ণ করি'
জীর্ণ করেছ বুক।
আজি সব ভুলে তাঁহার শরণ নাও
প্রেম বুকে ধরে, প্রেমিকের চোখে চাও।

মিছে কেন দুখে করিবে গো প্রাণপাত ?
ধূলির ধরায় সব হ'বে ধূলিসাৎ।
দুঃসহ দুখ দারুণ বেদনা
যাও ভুলে হাসিমুখে ;
বিপদের দিনে দাঁড়াতে ভুলনা
শত্রু-মিত্র দুখে।
উদার পরাণে সযতনে বাঁধ
নিখিলে প্রেমের ডোরে ;
ধর্মের রাগে রাঙিয়া হিয়ায়
ক'রো কাজ সাঁঝে-ভোরে
হরি-গুণ-গানে ক'রো বিশুদ্ধ মন ;
কোরো নাক মিছে অসহায় ক্রন্দন।

কোটী তারকায় হয়েছে রাতের কালো ;
দেখ হাসে ধরা, পুলকে উজলি আলো।
লতায়-পাতায় প্রেমে জড়াজড়ি
বিহগ গাহিছে গান ;
মিলনের গীতি গাহিছে তটিনী
কুলু কুলু ধরি' তান
উদার আকাশ অনাহত সুরে
পুলকে আলোকে-ভরা ;
সঙ্গীতময় হইয়া হাসিছে
যেন গো নিখিল ধরা।
যে আসে আসুক্, হৃদি-দ্বার খুলে দাও ;
আপনার ভেবে, কাছে টেনে' সবে নাও।

নারী—ঘরে ও বাহিরে

শ্রীমতী শোভা হুই

মাতাপিতার আদরিণী কন্যা পতির হাত ধরে এলো শ্বশ্রূ-গৃহে। অর্ধ প্রস্ফুটিত কিশোরী চোখে স্বপ্নের ঘোর, হৃদয়ে প্রেমের তুফান। পৃথিবী তখন মধুময়, অন্তরে বাহিরে চারিধারে মধু মধু মধু। পতির সোহাগে, শাশুড়ীর যত্নে, দেবর-ননদের আদরে বধূর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ। দিনের পর দিন কাটে সুখের আবেশে।

অবশেষে উৎসব শেষ হয় একদিন। সামনে এসে দাঁড়ায় কঠিন বাস্তব। বধূর নিকট সংসারের সহস্র দাবি। আর সে শাশুড়ীর আদর কিংবা স্বামীর সোহাগে মগ্ন থাকতে পারে না। সে এখন পতিগৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবী—গৃহ-লক্ষ্মী। সমস্ত সংসার তার মুখাপেক্ষী। গৃহকে আনন্দময় করার দায়িত্ব তারই উপর।

এ দায়িত্বই নারীজীবনের চরম দায়িত্ব। একটি সংসার সুষ্ঠুভাবে চালানো একটি সাম্রাজ্য চালানোরই নামান্তর। সকলের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে, সকলকে ভালোবেসে, গুরুজনদের সেবা করে, নিজেকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া কম আনন্দের কথা নয়। স্বামী যদি পত্নীর প্রিয়তম হন, তাহলে সেই প্রিয়তম জীবনসঙ্গীর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী তাঁর প্রিয় হবে না কেন? হয়তো তাঁদের অনেক দোষ আছে, আছে অনেক নীচতা, অনেক স্বার্থপরতা, তবু তাঁরা স্বামীর আত্মজন। এঁদের কষ্ট দিলে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে স্বামীকেই কষ্ট দেওয়া হয়। অতএব তাঁদের সব কিছুই ক্ষমণীয়। এই ভাব মনে রাখলে আর কোন অশান্তি আসবে না।

সহিষ্ণুতা, প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতা এই তিনটি মহৎগুণ যদি প্রত্যেক নারীর মধ্যে থাকে তাহলে সংসার সুখের আগার হয়। নারীই সংসার-সম্রাজ্ঞী। অতএব তাঁর সেইরূপ গুণ থাকা উচিত। তিনি গুরুজনদের বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখাবেন। ছোটদের শাসনও করবেন আবার বুকেও টানবেন। সংসারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরই উপর নির্ভর করছে। কাজেই অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত তাঁর চলতে হবে। সংসারে যার যে প্রাপ্য, যার যে সম্মান, যার যে মর্যাদা তাকে তাই দিতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না। তিনি নিশ্চয়ই সহিষ্ণুশীলা হবেন। তাঁর অসীম ধৈর্য থাকবে। তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্না এবং সুবিবেচিকা হবেন। সকলের অনলস সেবা, সকলকে আন্তরিক ভালবাসা, সকলের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়ে যে নারী নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন তিনিই হন যথার্থ সংসারের কল্যাণদায়িনী গৃহলক্ষ্মী, সংসার-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

নারীর পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে। কঠিনতম কাজ সন্তানপালন, এখানেই নারীর চরম পরীক্ষা। একটি সন্তানকে যথার্থরূপে মানুষ করতে মাতার অনেক সংযম এবং অনেক ত্যাগের প্রয়োজন। মাতার কথাবার্তা, আচারব্যবহার, চলাফেরা অত্যন্ত সংযত হওয়া দরকার। সর্বদা মনে রাখতে হবে শিশু তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার এবং প্রত্যেক পদক্ষেপ অনুকরণ করবে। তাঁর সঙ্গেই শিশুর ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। তাঁর চরিত্রের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী পড়বে ওর উপর। অতএব অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত নিজের চরিত্রকে গঠন করা দরকার। মাতা সুশিক্ষিতা না হলে সন্তান সুশিক্ষা কি করে পাবে? অবশ্য কয়েকটি বই মুখস্থ করে কতকগুলি ডিগ্রী অর্জন করতে

পারলেই শিক্ষিতা হওয়া যায় না। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের চরিত্রকে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করে। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতায় ভূষিত করে। শিক্ষার কাজই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ, প্রকৃত শিক্ষিতা নারীর মধ্যেই দেখা যায় নারীর বিভিন্ন রূপ। কখনও সেবিকা কল্যাণী বধূ, কখনও প্রেমিকা পত্নী, কখনও মমতাময়ী গৃহিণী, কখনও মহীয়সী মাতা।

নারীর কি শুধু ঘরেই কাজ? রান্না, খাওয়া, গেরস্থালী, আর সন্তানপালন—? দিনের পর দিন একই কাজের পুনরাবৃত্তি? এইভাবে যাবে জীবন কেটে? তারা কি করবে না বাইরের কোন কাজ? কোন উপকার? সমাজের কোন সংস্কার? তারা পাবে না বাইরের আলো?

এইগুলি আধুনিক নারীর প্রশ্ন।

নারী সবসময় ঘরেই আবদ্ধ থাকবেন বাইরে আসবেন না, বিশেষতঃ এ যুগে হতেই পারে না। তবে পুরুষের কর্মক্ষেত্র যেমন বাইরে প্রসারিত নারীর তেমন অন্দরে। নিজের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে এবং দায়িত্ব পূর্ণরূপে বহন করে তবে বাইরের কাজ। আজকাল অর্থ-সঙ্কটের দিনে অনেক নারী অফিসে কিংবা স্কুলে চাকরি করেন, অনেকে সমাজসেবা কিংবা রাজনীতি করেন, এঁদের অধিকাংশ সময় বাইরেই কাটাতে হয়। দেশসেবা, সমাজসেবা, স্বাধীন উপার্জন খুবই ভালো কথা, কিন্তু এতে যদি ঘর-সংসারের বিশেষ ক'রে সন্তানের ক্ষতি করে তাহলে কি বাইরের কাজ করা উচিত? অনেক জায়গায় দেখা যায়—মা গেছেন অফিসে, কিংবা স্কুলে, কিংবা অন্য কোন কাজে। বাচ্চাগুলি ঝি-চাকরের কাছে। দিনের পর দিন তাদের থাকতে হয় ঝি কিংবা চাকরের কাছেই। তারা মাইনে করা অশিক্ষিত লোক। বাচ্চারা বিরক্ত করছে অতএব মেরে ধরে এক জায়গায় বসিয়ে রাখলে, ঠিকমত স্নান করালে না। ভালো করে খেতে দিলে না। বাচ্চাদের ভাগের দুধ-মাছ নিজেরাই খানিকটা খেয়ে ফেললে। এসব তো আছেই। তাছাড়া নোংরা হাতে, নোংরাভাবে খাওয়ান, আজে-বাজে কথা শেখানো, ভূত, পেত্নী, জুজুর ভয় দেখানো প্রত্যেক ঝি চাকর করবেই। এতে বাচ্চাগুলোর স্বাস্থ্য ও স্বভাব দুইই নষ্ট হয়, ভীতু হয়ে যায়। নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

কাজেই ঘর ও শিশু অবহেলা করে বাইরের দায়িত্বে জড়িয়ে পড়লে শিশুদের সমূহ ক্ষতি। শিশুদের ক্ষতি অর্থাৎ দেশেরই ক্ষতি। শিশুরাই দেশের মেরুদণ্ড, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, শিশুরাই দেশের সম্পদ। এই শিশুগুলিকে প্রকৃত মানুষ করতে পারলে দেশ ও সমাজের প্রভূত উপকার। ওদের অবহেলা করলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তবে এই অর্থসঙ্কটের দিনে অনেক মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত মা ভগিনীরা স্কুল, অফিসে চাকরি নিতে বাধ্য হন। হয়তো তাঁরা কচিছেলে-মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের তেমন সুব্যবস্থা করতে পারেন না, তা সত্বেও তাঁদের উপার্জনের জন্যে বাইরে বেরোতেই হয়; কারণ তাঁদের আয়েই সংসার চলে, কাজেই চাকরি না করে উপায় নেই। কিন্তু অনেক আধুনিক নারী আছেন যাঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল তথাপি তাঁরা স্বাধীন উপার্জনের মোহে সংসার এবং শিশুদের অবহেলা করেই চাকরি করেন। যাঁরা ঘরের কর্তব্য পালন করেও বাইরের কাজ করতে পারেন তাঁরা যথার্থই প্রশংসার যোগ্য।

এই যুগে নানা কারণে নারীর বাইরে বেরোনো অপরিহার্য। ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে, শিক্ষায়তনে, অফিসে, দেশসেবায়, সমাজ-সেবায় সবটাতেই নারী যাচ্ছেন পুরুষের পাশে সমান তালে পা ফেলে। এ অতিশয় আনন্দের কথা। নারীর জাগরণে দেশের জাগরণ, নারীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি। কিন্তু একটা বিষয় সব সময় মনে রাখা দরকার কোন অবস্থাতেই তাঁর নারীত্বের খর্ব যেন না হয়। তিনি যেন স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

আজকাল একদল উগ্র-আধুনিক নারী দেখা যায় যাঁরা নিজেদের আধুনিকত্ব জাহির করার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ এবং হাব-ভাব এমন করেন যে দেখলে লজ্জা হয়। তাঁদের উড়ন্ত-দোলানো-ফাঁপানো শ্যাম্পু চুল, সুরমালিপ্ত চক্ষু, অঙ্কিত ভ্রূ, রঞ্জিত ওষ্ঠ, পেণ্টেড মুখ, পরিধানে অতি সূক্ষ্ম শিফন কিংবা নাইলন, অর্ধখোলা ব্লাউস পুরুষদের বিভ্রান্ত করে তোলে। তাঁরা যাচ্ছেন হয়তো অফিসে কিংবা অধ্যয়নে অথবা অন্য কোন কাজে—কি দরকার এই মোহিনী বেশে? কি দরকার দেহ-সম্ভার অন্যের সামনে তুলে ধরবার? হয়তো তাঁদের মনে অত্যধিক আধুনিক হবার ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু ফল হয় অন্যরকম। এ বেশ দেখে যদি ছেলেদের মনে কামনার আগুন জ্বলে কিংবা তারা বাচালতা প্রকাশ করে অথবা তাঁদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে তাহলে কি ছেলেদের খুব দোষ দেওয়া যায়? এইসব নারীর পেছনেই ছেলেরা ঘোরা ফেরা করে। এঁরাই ছেলেদের দ্বারা প্রতারিত হন।

নারীর পোষাক হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং এবং ভব্যতাযুক্ত, এমন পোষাক তাঁরা করবেন যাতে তাঁদের মাতৃত্ব ফুটে ওঠে এবং মহিমান্বিত দেখায়। নারী হবেন লজ্জাশীলা। লজ্জাই নারীর ভূষণ, লজ্জাই নারীর সৌন্দর্য, লজ্জাই নারীর মহিমা। অবশ্য লজ্জা মানে এই নয় ঘোমটা টেনে বাড়ীতে বসে থাকা। অথবা বাইরের কোন লোক দেখলেই কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়া। নিজের শালীনতা ও মর্যাদা বজায় রেখে চলা ফেরা উচিত। নিজের গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলে সকলেই সম্মান করবে। নারীর তিনটি রূপ। কন্যা, ভগিনী ও মাতা। কন্যারূপে আসে স্নেহ, ভগিনীরূপে ভালোবাসা, আর মাতারূপে আসে শ্রদ্ধা, বয়সানুযায়ী এই তিনটি রূপ যদি তাঁদের পোষাকে এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে তাহলে কোন কুপ্রবৃত্তিই ছেলেদের মনে আসবে না। বরং শ্রদ্ধায় তারা মাথা নত করবে।

নারী ঘরে হবেন সেবিকা বধূ, প্রেমিকা পত্নী, কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণী এবং মমতাময়ী জননী, আর বাইরের কর্মযোগে তিনি কর্মকুশলা ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং সকলের স্নেহময়ী মা।

বিবেকানন্দের দিব্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্, সাহিত্যরত্ন

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "দাও এবং গ্রহণ কর—এটাই নীতি। ভারতবর্ষ যদি আবার উন্নত হতে চায়, তাকে অবশ্যই তার আধ্যাত্মিক রত্নরাজি পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রতিদানে অন্যান্য জাতির নিকট হতে যা-কিছু গ্রহণীয় তাও গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" পাশ্চাত্ত্যে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচার বিবেকানন্দের অন্যতম জীবনব্রত ছিল এবং এই কার্য তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম-অনুভূতি, দেব-দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতিতে বিশাল পাণ্ডিত্য অনেক পাশ্চাত্ত্য মনীষীর উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ স্বামীজীর দিব্য ব্যক্তিত্বে কিরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর কাহিনী। এখানে তিনটি প্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

• • •

প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌রূপে জার্মান মনীষী ম্যাক্স্ মূলারের

নাম সুবিদিত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রাচ্য বিদ্যার প্রথম অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে তদানীন্তন প্রায় সকল জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের পঠন-পাঠন চলিতে থাকে। সংস্কৃত শিক্ষায় এত অধিক বিদ্যার্থী আত্মনিয়োগ করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশে শিক্ষাদান-কার্যে আহূত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলারের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। মূলার ফরাসী মনীষী বারনুফের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থসাহায্যে ঋগ্বেদের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৪৮-১৮৭৫)। ১৮৫০ খৃঃ তিনি অক্সফোর্ডে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯০০ খৃঃ মৃত্যু পর্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সংস্করণ ব্যতীতও মূলার 'ভারতীয় ষড়্দর্শন', 'রামকৃষ্ণ—তাঁহার জীবনী ও উপদেশ', 'প্রাচ্যের ধর্মশাস্ত্রসমূহ (পঞ্চাশ খণ্ড)' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন মার্কিন দেশে বেদান্তপ্রচারে ব্রতী ছিলেন তখন অধ্যাপক তাঁহাকে অক্সফোর্ড-পরিদর্শনের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ মে মাসে অক্সফোর্ডে মূলারের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎকার হয়। 'নাইন্‌টিন্‌থ সেন্‌চুরি ম্যাগাজিনে' ম্যাক্সমূলার-লিখিত 'প্রকৃত মহাত্মা'-শীর্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি মনোরম প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বামীজী স্বনামধন্য অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্তব্য করিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া কেশব সেনের ধর্মীয় মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই বিষয়টি অধ্যাপকের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিল। তদবধি মূলার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন ঐগুলি পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া অধ্যাপক স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন যে প্রয়োজনীয় উপাদান পাইলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজী উপাদান দিতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পর মূলারের বিখ্যাত পুস্তক 'শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁহার জীবনী ও উপদেশ' প্রকাশিত হয়। পুস্তকের ভূমিকায় অধ্যাপক লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে রামকৃষ্ণের নাম সম্প্রতি এত অধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমার মনে হয় তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত ও উপদেশ-সম্বলিত একখানা গ্রন্থ কেবল ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার ও আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি অনুরাগীদের নিকটই নহে, পরন্তু ধর্ম ও দর্শনের অগ্রগতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বল্পসংখ্যক মনীষীর নিকটও সমাদৃত হইবে। এই ভারতীয় ঋষির জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য তাঁহার একনিষ্ঠ সাক্ষাৎ শিষ্যদের নিকট হইতে এবং ভারতের সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ও নানা পুস্তক হইতেও সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলীর মতো এত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে যে দেশ অনুপ্রাণিত, সে দেশ কখনও অজ্ঞ পৌত্তলিকের দেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মানবাত্মায় ও পরিদৃশ্যমান জগতে ঈশ্বরের যথার্থ অস্তিত্ব ভারতবর্ষে যেরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না; ঈশ্বরে পরমানুরাগ—কেবল তাহাই নহে, সম্পূর্ণ ভগবত্তন্ময়তা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যেমন স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না।"

অক্সফোর্ডে বিবেকানন্দ ও মূলারের মধ্যে অতি হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা হইয়াছিল :

বিবেকানন্দ— আজকাল সহস্র সহস্র লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করে।

মূলার— এই দেবমানব যদি পূজিত না হন, তবে আর কে পূজিত হবেন? জগতের লোক-দিগকে তাঁর কথা জানাবার জন্য তোমরা কি করছ?

বিবেকানন্দ— আমি অতি সামান্যভাবে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রচার করবার চেষ্টা করছি।

মূলার— তোমার প্রচারকার্যে আমি খুব উৎসাহ দিচ্ছি।

আহারান্তে মূলার স্বামীজীকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও বড্‌লিয়ন পুস্তকাগার দেখাইলেন। ভারতবর্ষ ও তাহার সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপকের জ্ঞানের প্রসার ও অনুরাগ দেখিয়া বিবেকানন্দ বিস্মিত হইলেন। স্বদেশপ্রেমিক আচার্য অধ্যাপক মূলারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন ভারত-দর্শনে যাবে? যিনি আমাদের পূর্বপুরুষগণের উচ্চ চিন্তারাশি এত অধিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করেছেন, তাঁকে ভারতের সকলেই সোল্লাসে অভিনন্দিত করবেন।" অধ্যাপকের মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "তা' হলে সম্ভবতঃ আমি আর ফিরে আসব না। আমার দেহ আরাধ্য ভূমি ভারতে সমাহিত হবে।" রাত্রিতে যখন স্বামীজী রেলষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ঝড়-বাদলের মধ্যেও স্বামীজীকে আন্তরিক বিদায়-সংবর্ধনা জানাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে এখানে না আস্‌লেই ভাল হতো।" অধ্যাপক সপ্রেম উত্তর দিলেন, "রামকৃষ্ণের একজন উপযুক্ত শিষ্যকে দর্শন করার সৌভাগ্য প্রতিদিন উপস্থিত হয় না।" এই দেখা-সাক্ষাতের ফলে অধ্যাপকের সহিত স্বামীজীর বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। উভয়েই পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপোষণ এবং রীতিমত পত্রালাপ করিতেন। বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমার বিশ্বাস স্বয়ং সায়ণ ম্যাক্সমূলাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। কি অদ্ভুত অধ্যবসায়, আর বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে কি অসাধারণ পারদর্শিতা! অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ ও তাঁহার পত্নীকে দেখিয়া আমার বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর বিদায়কালে বৃদ্ধের কি অশ্রুপাত!"

* * *

জার্মানীতে বহু পণ্ডিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় বরাবরই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তথায় উপনিষৎসমূহ ও ভগবদ্গীতার অনেক অনুবাদ হইয়াছে। এ বিষয়ে দার্শনিক পল ডয়সনের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। ডয়সন ১৮৮৯ খৃঃ হইতে ১৯১৯ খৃঃ পর্যন্ত কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মনীষী শোপেনহাওয়ারের শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া ডয়সন সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অদ্বৈত বেদান্তের একজন পরমোৎসাহী অনুবর্তী হন। শোপেনহাওয়ার-কৃত শাঙ্করভাষ্যসমেত বেদান্তসূত্রের জার্মান অনুবাদের সহিত ডয়সন ষাটখানা উপনিষদ্ ও মহাভারতের দার্শনিক অংশগুলির অনুবাদ সংযুক্ত করেন। ছয় খণ্ড দর্শনের ইতিহাসের প্রথম তিন খণ্ডে ভারতীয় দর্শন আলোচিত হইয়াছে। সমসাময়িক জার্মান দার্শনিকদের মধ্যে ডয়সনের মতো আর কেহই পাশ্চাত্যের জন্য বেদান্তের উপযোগিতা এত গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেন নাই।

বিবেকানন্দের সহিত ডয়সনের সাক্ষাৎকার বড়ই মনোমুগ্ধকর বৃত্তান্ত। স্বামীজী যখন ইউরোপের দেশগুলিতে ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ডয়সন তাঁহাকে জার্মানীতে কিয়েল-পরিদর্শনের জন্য সাদর আহ্বান জানান। ডয়সন-দম্পতি স্বামীজীকে তাঁহাদের কিয়েলস্থ আবাসে অতি সমাদরে সংবর্ধনা

করেন। স্বামীজীর প্রচারকার্য ও উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ডয়সন বেদ ও উপনিষদ্ বিষয়ে তাঁহার নিজ গ্রন্থ হইতে কতিপয় পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তির পর ডয়সন বলিলেন, "বেদান্তের এমনি চিত্তাকর্ষিণী শক্তি যে, মানুষ মুহূর্তে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যায় এবং উহার অধ্যয়ন তাহার মনকে অধ্যাত্মরাজ্যের সর্বোচ্চ ভূমিতে তুলিয়া দেয়। উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও শাঙ্কর ভাষ্য মানুষের সত্যানুসন্ধানের মহত্তম অভিব্যক্তি। বেদান্ত-অধ্যয়নই আমার একমাত্র নেশা।" ডয়সনের বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি গভীর অনুরাগ দেখিয়া বিবেকানন্দ অত্যন্ত প্রীত হন। বেদান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ডয়সন বলিলেন, "অতএব বেদান্ত অভ্রান্তরূপে বিশুদ্ধ চারিত্রিক নীতির দৃঢ়তম অবলম্বন এবং জীবন-মৃত্যুর তাপ ও ক্লেশে পরম সান্ত্বনা। ভারতীয়গণ, বেদান্তকে ধরিয়া থাক।"

স্বামীজী তাঁহার স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে কয়েকটি জটিল ও দুর্বোধ্য উপনিষদের শ্লোক বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। অধ্যাপক ইহাতে নূতন আলোক পাইলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বামীজী তাঁহার দিব্য ব্যক্তিত্ব ও বেদান্তের নবালোকসম্পাতকারী ব্যাখ্যা দ্বারা অধ্যাপক ডয়সনের হৃদয় জয় করেন। ডয়সনের গৃহে বিবেকানন্দ চারিশত পৃষ্ঠার একখানা কবিতা-পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি অর্ধঘণ্টায় আয়ত্ত এবং বিনাস্খলনে আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের অপরিমিত বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাসী ডয়সনকে সহাস্যে বলিলেন, "এত বড় একখানা গ্রন্থ অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করা একজন যোগীর পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রত্যেকেই ইহা করিতে পারে। তুমি জান আমি কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য-পালনের ফলে আমি এই আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী হইয়াছি। পাশ্চাত্য-বাসীদের অনেকেই ইহা বিশ্বাস না করিতে পারে, কিন্তু ভারতে ব্রহ্মচর্যের ফলে এরূপ দৃঢ় স্মৃতিশক্তির অধিকারীর অসদ্ভাব নাই।" ডয়সন স্বামীজীর উক্তির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

*　　*　　*

স্কটিশ অধ্যাপক প্যাট্রিক গেড্ডিসের নাম ভারতীয় মনীষিগণের নিকট অজ্ঞাত নয়। যে-সকল ভারতীয় স্বদেশে ও বিদেশে পণ্ডিত ও লেখক বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই মনীষীর নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহিত পরিচিত। গেড্ডিস্ দুইবার—একবার ১৯১৪ এবং আবার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে—ভারতে আসিয়া মোট দশ বৎসর বাস করেন। তিনি এ দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া যুবকদিগকে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক গবেষণায় প্রোৎসাহিত করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি, ভারতীয় ভাবধারার গভীর অবধারণা এবং সত্যনিষ্ঠা বহু উৎসাহী ছাত্র ও অধ্যাপককে তাঁহার সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিয়াছিল। যে ঘটনাপরম্পরা তাঁহাকে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল্যনির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করে, তৎসম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না। হিন্দুজীবনদর্শনের সহিত গেড্ডিসের প্রথম সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে আমেরিকায়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরেই ১৮৯৩ খৃঃ যুবক বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ের সাক্ষাৎকার সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করে। প্রাচ্য-দেশীয় দৈহিক ও মানসিক সংযম-শিক্ষা প্যাট্রিক ও তাঁহার পত্নী আন্নার উপর এরূপ শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের 'সরল রাজযোগ' নামক যোগ-শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকখানি অন্তঃপ্রকৃতিজয়ের জন্য তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ বসন্তকালে নিউইয়র্কের মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলিওড্ কলিকাতায় বিবেকানন্দের ইংরেজ-

শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার সহিত দেখা করেন। নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলিওড্কে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি প্যাট্রিক গেড্ডিসের নাম কখনও শুনিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার অনুসরণ কর। শিষ্য করিতে হইলে তাঁহার মতো লোককেই শিষ্য করিতে হয়।" প্যাট্রিক তখন নিউইয়র্কে বক্তৃতা দিতেছিলেন, সুতরাং বিবেকানন্দের অনুগতা শিষ্যা ম্যাক্লিওড প্যাট্রিকের সহিত তথায় সাক্ষাৎ করেন। এইরূপে স্কটিশ অধ্যাপক ও মার্কিন মহিলার মধ্যে দীর্ঘ সৌহার্দ্যের সূত্রপাত হইল।

১৯০০ খৃঃ প্যারিস প্রদর্শনীতে বিবেকানন্দের সহিত প্যাট্রিকের পুনঃ সাক্ষাৎ হয়। প্রদর্শনীতে বিবেকানন্দ ও আরও আগন্তুক অনেক খ্যাতনামা প্রতিনিধি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃঃ নিবেদিতাও প্যারিসে গিয়া অধ্যাপক গেড্ডিসের সমাজতত্ত্বের গবেষণা-প্রণালী ও দর্শন শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহিত কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। নিবেদিতার 'দি ওয়েব অব্ ইণ্ডিয়ান লাইফ্' নামক গ্রন্থখানি প্যাট্রিকের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। ১৯০০ খৃঃ গ্রীষ্মকালে প্যারিসে বিবেকানন্দের সহিত প্যাট্রিকের সাক্ষাতের ফলে ভারত ও উহার অন্তরাত্মার প্রতি অধ্যাপকের অনুরাগ বহুধা প্রবৃদ্ধ হইল। দশ বৎসর পর তিনি বিবেকানন্দের 'রাজযোগে'র ফরাসী সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন এবং ইহার চারি বৎসর পর ভারত-ভ্রমণে বাহির হন—ইহাতে তাঁহার জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। নিবেদিতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অধ্যাপক গেড্ডিস বলিয়াছেন, "নিবেদিতা ছেলেমেয়েদের সহিত গৃহের মেজেতে অগ্নিকুণ্ডের আলোকে বসিয়া তাঁহার 'Cradle-tales of Hinduism' (ক্র্যাড্ল্ টেইল্স্ অব হিণ্ডুইজম্) অর্থাৎ হিন্দুধর্মের শিশুকাহিনী বিবৃত করিতেন—ইহা তাঁহার লিখনশক্তি ও বর্ণন-মাধুর্যকেও হার মানাইত। এরূপ বিবৃতিকালে আগ্রহশীল কোন কোন ছেলে-মেয়ের মন প্রাচ্যদেশের মহোচ্চ আদর্শের দিকে স্বতঃই প্রধাবিত হইত।" তরুণচিত্তে নিবেদিতার প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক গেড্ডিস্ যাহা লিখিয়াছেন, নিজগুরু বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সংশ্রয় সম্পর্কেও তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। * * *

বিদেশে ভ্রমণকালে পাশ্চাত্ত্য সমাজের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে লব্ধকীর্তি নরনারীগণের সহিত বিবেকানন্দের পরিচয় হইয়াছিল—ইহার উল্লেখ আমরা বিবেকানন্দের জীবনচরিত, পত্রাবলী ও স্মৃতিকথায় পাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর ভাবধারা ও বেদান্ত-ব্যাখ্যানে গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার দিব্য ব্যক্তিত্বে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হন। অনেকে নূতন আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হন। কত শিল্পী, বিজ্ঞানী, মনীষী, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞান-বিৎ স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন; সারা বার্নার্ড ও মাদাম ক্যাল্ভে, টেস্লা ও মাক্সিম্, ম্যাক্সমূলার ও ডয়সন, গেড্ডিস্ ও উইলিয়ম জেমস্ এবং বহু ক্যাথলিক ধর্মযাজক ও গির্জা-ঐতিহাসিকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মনীষিগণের অনেকেই বিবেকানন্দের মধ্যে এমন কিছু অত্যদ্ভুত, জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার দুর্জয় প্রভাবে তাঁহারা মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষেই এ যুগে এক নূতন আধ্যাত্মিক বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যে। যে-কেহ এই ধর্মাচার্যের সংস্পর্শে একবার আসিয়াছেন তাঁহার জীবনই সার্থক হইয়া গিয়াছে। বিবেকানন্দের মতো লোকাতীত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ একটা যুগের চিন্তানায়ক; যে-দেশে ও যে-যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, সে-দেশ ও সে-যুগ ধন্য।

শ্রীভরত

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

লহ গো প্রণাম অয়ি শ্রীরামজননি!
আর্য-বনবাস-কথা আমি নাহি জানি।
রাজ্যতৃষা নাহি মাতঃ। নাহি অন্য আশ্—
শুধু জানি তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস।
মোর অভিলাষে যদি এই নির্বাসন—
পিতৃহত্যা পাপ তবে করুক স্পর্শন।
তার লাগি অভিশাপ: যার প্রেরণায়
অগ্রজের ভাগ্যলক্ষ্মী ম্লান বেদনায়
হউক উন্মাদ সেবা—ছিন্নবস্ত্রধারী!
বৃত্তি তার হ'ক ভিক্ষা। নারীবধকারী
যে-পাপে নিমগ্ন হয়—তার সেই পাপ।
যার লাগি অযোধ্যার এই দুঃখ তাপ—
রবির উদয় আর গমন সময়
শয্যাশ্রিত-মানবের যত পাপ হয়
হ'ক সেই অপরাধ! লভি' উপকার
যে-জন তাহার ঋণ না করে স্বীকার;
অপরের দেবতায় রহে যার দ্বেষ,
নাহি করে দূর যেবা অপরের ক্লেশ;
বারিদান নাহি করে যে তৃষ্ণার্ত-নরে;
পিতা ও মাতার সেবা যে-জন না করে—
এই সব পাপ মোরে করে যেন গ্রাস
আমার ইচ্ছায় যদি এই বনবাস।
রামের অযোধ্যা আর অযোধ্যার রাম—
সেই রাম-পদে আমি জানাই প্রণাম!

সতী জাসলবুন

স্বামী জপানন্দ

চারণী জাসলবুন পূর্ণযৌবনা। যেন ছাঁচে ঢালা সোনার কান্তি তার। যাকে বলে ঠিক্‌রে পড়ছে রূপ। মাথায় ঘড়ার উপর ঘড়া রেখে মন্থর গতিতে যাচ্ছিল কূয়া হ'তে জল আনতে। কূয়া গ্রামের বাহিরে এক নালার কাছে। গ্রামান্তরে যাবার পথও তার পাশ দিয়ে গিয়েছে। কূয়ার অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড বট গাছ, তার ছায়ায় পথিকরা শ্রান্তি দূর করে। হাজারো পক্ষীর কলগানে মুখরিত থাকে সেই বট। গ্রীষ্মের দিনে গৃহপালিত পশুর আশ্রয় আর রাখালদের ক্রীড়াভূমি সেই বটের নীচে সাধু-যোগীরাও ধুনি জালিয়ে বসেন, এবং সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন-নাটকও হয়। মেয়েদের মিটিংগ্ করবার কায়েমী স্থল হচ্ছে সর্বত্র ঐরূপ কূয়া আর বট অশ্বত্থের স্নিগ্ধ ছায়া। জল ভরতে ভরতে সংসারের যাবৎ সুখ-দুঃখের কথা, টীকা-টিপ্পনী এবং কখনও বা গৃহবিবাদের মীমাংসা সেইখানে মেয়েকোর্টে হয়ে থাকে। কলহও বাধে কখন-সখন, তবে শীঘ্রই শান্তি-সন্ধি অপরে করে দেয়। এসব যেমন অন্যত্র হয়ে থাকে। এখানেও হ'তো।

কিন্তু—আমরা যে দিনের কথা বলছি, সে দিন কূয়ার কাছে গ্রামের কেহই ছিল না: মাত্র ছিল অতুলনীয় রূপবান্ এক যুবক যোদ্ধা তেজস্বী এক অশ্বের উপর, বটতলায়। সে যেন কারো অপেক্ষা ক'রছিল। জাসলবুনকে দেখে সে ঘোড়া নিয়ে কূয়ার ধারে এসে বল্লে,—"বুন, বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল দাও!···এই ঘোড়াটাকে আগে একটু দাও। (চুমকী মেয়ে

ঘোড়ার গলায় থাপ্পড় মেরে আদর করলে)। জলপান করে তৃপ্ত হয়ে বল্লে,—"বুন, অমি সেবা নেওয়া অনুচিত মনে করি, বিশেষ করে চারণীর কাছ থেকে; কিছু গ্রহণ করলে আমি আপ্যায়িত হব।" এই ব'লে একটি টাকা দিতে গেল।

"না, ভাই, এ সেবা তো মানুষ মাত্রেরই করা উচিত। এ সেবার বদলে পয়সা নিলে আমি যে ধর্মচ্যুত হব।"—বল্লে চারণী—

"আচ্ছা, তোমার এক ভাই তোমায় দিচ্ছে, এই ভেবে নাও!"

"যদি ভাই-ই হলে, তবে বুনের (বোন, ভগ্নি) বাড়ী না-খেয়ে যাওয়া শোভা পায় না। তুমি যদি খেতে রাজী হও তো আমিও নিতে রাজী হতে পারি।* এই আগ্রহ সেই যুবক ঠেলতে পারলে না। গেল জাসলের বাড়ী তার সঙ্গে। চারণী তাকে বসবার আসন দিলে। কিন্তু বাড়ীতে আর কেহ নাই দেখে মের যুবক একটু চঞ্চল হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল—"বুন, চারণ বাড়ীতে নাই।"

"না, ভাই, সে রোজগারে গ্রামান্তরে গেছে।"

"তবে আমি যাই, বুন; অন্য একদিন এসে তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব এখন!"

"তা'ও কী হয়, ভাই, রুটি তৈরী আছে। খেয়ে তবে যাও। অবেলায় আবার কোথা গিয়ে খাবে!···আর তুমি এসেছ তোমার বুনের বাড়ী। তা'তে দোষ ত কিছুই নাই, ভাই!"

"পবিত্র তুমি, দুনিয়ার কূট মলিন গতি জান না। অপবাদ রটাবে লোকেরা।"···

(সে দেখছিল আসেপাশের বাড়ীর মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছে।)

"ঈশ্বর তো অন্ধ নহে ভাই, সে দেখছে!" বল্লে জাসল।

* গুজরাতী ভাষায়—"তমে"—তুমি বলে, "আপ"—আপনি গ্রামদেশে বলা প্রচলিত নাই। এটি মুসলমানদের দেওয়া।

বড় বড় দুটি বাজরার রুটি ও একবাটী দই এবং একটা গুড়ের ড্যালা ও লঙ্কার আচার এনে অতি প্রীতির সাথে তাকে খেতে দিলে। ঐ পবিত্র ধর্ম-ভগ্নির হাতের রান্না অমৃতোপম লাগলো! আর কা'রই বা তা না লাগে?—অ হারান্তে গন্তব্য স্থানে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বল্লে—"বুন, এই তোমার ভাইয়ের বাড়ী কবে আসছ? তোমার বৌদি তোমায় দেখলে খুব খুশী হবে!"

"ঈশ্বরেচ্ছায় সুযোগ পেলেই একবার আসবো, ভাই! তবে একটা কথা বলে রাখি। আমার কোন ভাই নাই, তুমিই আজ হ'তে ভাই হ'লে! আমার আপদবিপদে ভায়ের কর্তব্য করতে যেন ভুল না।"

"তোমার ভাই কর্তব্যভ্রষ্ট হবে না, বুন। ঈশ্বর সাক্ষী।" এই বলে সে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

(২)

জাসলবুনেরও শত্রুর অভাব ছিল না। পার্শ্বের বাড়ীতেই যে গৃহস্থ থাকতো—তার গৃহিণীর সঙ্গে জাসলের মনের মিল ছিল না। প্রায়ই একটু আধটু বচসা হয়ে যেত। তার কারণ ছিল ছোট-খাট অনেক, তবে বড় কারণ ছিল ঐ গৃহিণীর একটু বেচাল কথাবার্তা তার পতির সঙ্গে। তার-পক্ষে এমন অবসর ছাড়া অসম্ভব! জাসলকে টিট্ করবার মত এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে! তাই, ঐ যুবককে দেখবামাত্র বিদ্যুৎবেগে এ বাড়ী সে বাড়ী গিয়ে সে বয়োজ্যেষ্ঠা গৃহিণীদের খবর দিয়ে ডেকে আনলো এবং তার বাড়ীর ভিতর হ'তে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখাতে লাগলো জাসলের অপকর্ম, অপরিচিত সুন্দর যুবাপুরুষের সঙ্গে তার অবাধ উঠাবসা, কথাবার্তা এবং উভয়ের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আর হাস্যমধুর মুখমণ্ডল!—"স্বামী ঘরে নাই, আর ঐ পরপুরুষকে ঘরে ঢুকিয়েছে! চারণের মুখে কালি দিলে কুলটা।"—এরূপ টিপ্পনী সহযোগে

জাসলের অসচ্চরিত্রতা ও নিজের সতীপনার ছাপ দিতে লাগলো।

"ওরা বাড়ীতে না থাকলে, আমার বা ওদের কোন আত্মীয় এলেও কথা কই না। পরপুরুষ ত দূরের কথা! কুলবধূর কী এ আচরণ সাজে?—"

মের যুবক চলে যেতেই মেয়েদের দল এসে জাসলকে ঘিরে ফেল্লে।—"কে ও পুরুষ? কেন এসেছিল? কতদিনের আলাপ? কোথায় থাকে? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নের ঝড় বহিতে লাগলো। তাদের এই সব প্রশ্নের পিছনে যে কী ভাব ছিল, তা জাসলের বুঝ্‌তে আর বিলম্ব হ'ল না। সে মাত্র বল্লে,—"ও আমার ধর্মভাই, লাভুজা মের।" পাশের বাড়ীর গৃহিণী এগিয়ে গিয়ে বল্লে,—"শোন কথা! মের হলো ওর ধর্মভাই! কবে থেকে লা?" "আজ থেকেই, দিদি!"—দৃঢ়স্বরে জবাব দিলে জাসল। "বটে! অত হাসাহাসি! অত পরিচয় আজকেরই সব? সত্য গোপন থাকবে না লা। সত্য গোপন থাকবে না। সতীমা সত্য প্রকট ক'রবেনই ক'রবেন।"—ব'লে উক্ত প্রতিবেশিনী দু-চার বার মাথা নাড়া দিয়ে সতীদেবীর আবির্ভাবের হুমকী দিলে।

"হাঁ, দিদি, সত্য গোপন থাকবে না!" ব'লে জাসল ভিতরে চলে গেল।

"তেজ দেখেছ! মাগী ছিনালী করে গ্রামের মুখে কালি দিলে, আবার সবাইকে চোখ রাঙাচ্ছে। সতীমা!..."

অতঃপর সকলে নানাপ্রকার জল্পনা—কল্পনা, ইঙ্গিত-ইসারা করতে করতে যে যার গৃহে প্রত্যাগমন ক'রল। এই ঘটনার চর্চা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে। মোড়লেরা ব্যস্ত হয়ে কিংকর্তব্য স্থির করবার জন্য গ্রামের সার্বজনিক মণ্ডপে একত্রিত হলেন। জাসলের স্বামী, যে গ্রামান্তরে কার্যোপলক্ষে গিয়েছিল, ফিরে আসতেই মোড়লেরা তাকে ডেকে তার স্ত্রীর কীর্তি—যা তাঁরা গৃহিণীদের নিকট শুনেছিলেন, গুরুগম্ভীর স্বরে শুনিয়ে বল্লেন,—"এই সব প্রত্যক্ষদর্শিনীদের কথায় অবিশ্বাস করবার মত কিছুই নাই। আমাদের গ্রামে এরূপ পাপ ছিল না।" "চারণজাতির মুখে কালি পড়লো," বল্লে একজন। "মেয়েটার স্বভাব আগে থেকেই চঞ্চল ছিল" বল্লে কোন বৃদ্ধ। "আমার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু ঐ জন্ম আমি রাজী হই নাই।"—বল্লে তৃতীয় কেহ। "সে যাহা হউক, এর একটা সুবিচার হওয়া দরকার, যাতে অন্য মেয়েরা না শিখে!" বল্লেন এক বয়োবৃদ্ধ।......

জাসল ছিল গড়বীর (চারণকে গড়বী বলে) প্রাণ, তার সম্বন্ধে এই ভীষণ অপবাদ তাকে পাগল করে দিলে। রাগে ক্ষোভে সে মূঢ়প্রায় হয়ে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান-শূন্য হয়ে গেল এবং জাসলকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার দেখল না। গ্রাম-বৃদ্ধেরা যা বলেছেন তা সত্যই হবে, অতএব জিজ্ঞাস্য আর কী থাকতে পারে?—মণ্ডপ হ'তে সে সোজা বাড়ী এসেই রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা জাসলের মাথায় সজোরে মারল লাঠির বাড়ি!—জাসল অজ্ঞান অচেতন হ'য়ে সেই খানেই ঢলে পড়ল। রক্তের প্রবাহ ঘর ভাসিয়ে দিলে,—"কালমুখী, আমার কুলে কালি দিলি"—এই ব'লে চারণ করলে পুনঃ পদাঘাত।

(৩)

লোকে এসে চারণকে ধরে বাহিরে নিয়ে গেল। দু' একটি সদয়া বৃদ্ধা জাসলের মাথায় মুখে জল দিয়ে তার চেতনা-সম্পাদনের ক্ষীণ প্রচেষ্টা করতে লাগলো। যখন তার জ্ঞান হ'লো সে উঠে বসে করজোড়ে বল্লে,—"জগদম্বে! মা, সতের মুখ রাখ!"

* সতীদেবী হ'চ্ছেন চারণদের কুলদেবী। সতীমা সতীমেয়ের শরীরে আবির্ভূতা হন—সতের অপমান হলে। ভর হলে—দেহ কাঁপে, মাথার চালনা বেশী হয়। হুঙ্কার দেয়। অভিশাপ দেয়—ইত্যাদি।"

—থরথর থরথর কাঁপতে লাগলো তার দেহ এবং মুখমণ্ডল এক অপূর্ব তেজোদীপ্ত হয়ে উঠলো! তার সেই তেজোদ্দীপ্ত মুখাকৃতি দেখে সবাই বুঝলে—সতীমা আবির্ভূতা হয়েছেন। তখন মেয়েরা ধূপ-ধুনা এনে তার সম্মুখে রাখলে এবং 'ক্ষমা কর অপরাধ, *ক্ষমা কর!' বলে বার বার ক্ষমা চাইতে* লাগলো। গড়বী চারণ তখন বুঝতে পারলে যে, সে ভয়ঙ্কর ভুল করেছে। তার উচিত ছিল আসলকে একবার জিজ্ঞাসা করা। তা না করেই নিরপরাধিনী আসলকে মেরে সে অত্যন্ত অপরাধ করেছে। সে ভয়ে ভয়ে আসলের সামে গিয়ে মাথার পাগড়ী খুলে রাখলে এবং কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে। তখন আসল বল্লে,—"তোমরা কেহ শীঘ্র গিয়ে আমার ভাইকে খবর দাও। বোলো তাকে—তার বুন আর এ সংসারে বেশীক্ষণ নাই। আর বোলো—সতী হবার সব সামগ্রী নিয়ে আসতে। মাত্র তার অপেক্ষায় আছি এ দেহে!...ওরে ভাই, তোর বুন হবে সতে প্রতিষ্ঠিত, আর শীঘ্র আয়!" —এই বলে সে ধ্যানস্থ হলো।

একজন অশ্বারোহী তীর বেগে ঘোড়া দৌড় করে গেল লাভুভা মেরের গ্রামে এবং তাকে *আসলের সংবাদ জানালে। লাভুভা তা শোনবামাত্র* হায় হায় করে বজ্রাহতের মত আছাড় খেয়ে পড়লো। অতঃপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বুনের আদেশ অনুসারে সতী হবার সব সামগ্রী নিয়ে গেল আসলের বাড়ী।

গ্রামের বাহিরে সেই বটবৃক্ষের নীচেই হয়েছে চিতা সাজান। লোকে লোকারণ্য। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই জয় ঘোষণা করছে,—"জয় সতীমা, জয় সতী আসল।" আর কুলবধূরা মঙ্গলগীতি গাইছে। সতী আসল বুনকে সঙ্গে নিয়ে তার ধর্ম-ভাই লাভুভা মের 'সামগ্রী' হাতে নিয়ে বটতলায় আসছে। রাস্তায় আগে আগে মেয়েরা সিঁদুর ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে আসছে। মাঝে মাঝে *জয় ঘোষণায় দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।*...সতী আসল ধরেছে এক অপূর্ব রূপ, পবিত্র তেজ তার অঙ্গ হ'তে বাহির হচ্ছে। অবাক্ হয়ে দেখছে সবাই! তার নামে অকারণ বদনাম রটিয়েছিল যারা, ভয়ে তারা কাঁপছে, আর 'ক্ষমা কর সতীমা, অপরাধ ক্ষমা কর!' বলছে।...লাভুভা মের কাঁদতে কাঁদতে বল্লে,—"বুন, এইখানে তোর সঙ্গে প্রথম দেখা। এইখানেই আবার শেষ দেখা দিলি!... আমার জন্যই তো তোর এ দুর্ভোগ...আমার জন্যই..." বলে সে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

"ছিঃ ছিঃ ও কি ব'লছো ভাই আমার। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায়,—তোমাকে 'ভাই' করতে পারাতেই ত আজ আমার এই সৌভাগ্য হলো! আমি সতী হ'তে পারলাম। ভাই, তুমি এই সতী বুনের আশীর্বাদে চিরদিন সতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে!" —সান্ত্বনা দিলে আসল।

ভাই লাভুভা তখন বুনের হাত ধরে চিতায় উঠতে সাহায্য করলে। আসলবুন চিতার উপর আসন করে বসলে—প্রথমে লাভুভা, পরে অন্য সকলে যথাবিধি তার পূজা করলে। তারপর—তারপর অগ্নির লেলিহান জ্বালা দেখতে দেখতে সতী আসলবুনের পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করে ফেল্লে ...'জয় সতীমায়ের জয়' রবে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো,—জয় সতী আসলের জয়!"

দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি-কথা

অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী, এম্-এ

বুদ্ধি নিয়ে মানুষ জন্মেছে। তাই মানুষের স্বভাবই এই যে—সে চিন্তা করে। কোন না কোন বিষয়ে চিন্তা না করে মানুষ থাকতেই পারে না। জীবনধারণের সহজ উপায় নিয়ে যেমন মানুষ চিন্তা করে, ঠিক তেমনি আবার জগৎ ও জীবনের জটিল প্রশ্ন নিয়েও সে চিন্তা করে! 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কলুষিত করতে পারে না। জীবনধারণের অতিরিক্ত নানা জটিলতার মধ্যেও তার চিন্তা পথ করে নেয়। জীবনের পথে চলতে চলতে যে সব চিন্তা মানুষের মনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, তারই মধ্য থেকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপ নিয়ে দার্শনিক চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক চিন্তা থেকেই এই দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি। কিন্তু সর্বদেশে ও সর্বকালে একই রকম ভাবে এর উৎপত্তি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশ ও জাতির বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'য়েছে। আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি, তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির বিভিন্নতা দেখে সত্যি আশ্চর্য হই। এখানে আমরা সংক্ষেপে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর আলোচনা করবো।

(ক) বিস্ময় থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে বিস্ময় থেকেই দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হ'য়েছে। মানুষ যখন প্রথম এই জগৎ দেখলো তখন তার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সুউচ্চ পর্বত, তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর, গহন অরণ্য, আকাশের অগণ্য নক্ষত্র, দিনের সূর্য ও রাত্রের চন্দ্র মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বার বার মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—এই বিচিত্র জগৎ কিভাবে সম্ভব হ'ল? শুধু তাই নয়। মানুষের জন্ম আবার তার মৃত্যু—এও কি কম বিস্ময়? মৃত্যুতেই কি জীবনের শেষ—না মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে? —এ প্রশ্নও মানুষের মনে জেগেছে। এই পৃথিবীতে যা কিছু গভীর ও গহন, বিরাট ও মহান্—তার পেছনে কোন বিরাট শক্তি কাজ করছে কি-না কে জানে! এই জাতীয় নানা প্রশ্নই মানুষের মনে এসেছে। মানুষ চিন্তা করেছে—প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করেছে। কখনও হয়ত সে উত্তর হ'য়েছে ভীত মানুষের আত্ম-দুর্বলতার স্বীকারোক্তিমাত্র, আবার কখনও বা নানা উদ্ভট কল্পনা-জালে জড়িত। কখনও কখনও কিন্তু এই সব উত্তরের মধ্যে মানুষের চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রাচীন গ্রীসে এইভাবেই ত দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি হয়েছিল।

(খ) সংশয় থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখি—বেকন থেকে শুরু করে অনেক আধুনিক দার্শনিকের চিন্তা-ধারাই সংশয় থেকে শুরু হ'য়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে—রেনেসাঁর পর যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা পশ্চিমে হ'য়েছে—সবই আধুনিক দর্শনের আওতায় পড়ে। এই বিচারে বেকন একজন আধুনিক দার্শনিক। বেকনের জন্মের আগে মধ্যযুগে য়ুরোপে যে সমস্ত দর্শন হ'য়েছে, তার কোন একটাও বাইবেল আর চার্চের প্রভাব এড়াতে পারেনি। তখনকার দিনে

পাদ্রীদের দাপট ছিল প্রচণ্ড। সমস্ত দার্শনিক চিন্তা তাঁরাই নিয়ন্ত্রিত করতেন। তার ফলে যে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তা যেন বাইবেলের নব ভাষ্য। বাইবেলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার দুঃসাহস তখন কোন দার্শনিকেরই ছিল না। সেজন্য স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ মধ্যযুগীয় কোন দর্শনেই বিশেষ পাওয়া যায় না। বেকন এসে এই জাতীয় চিন্তা-ধারায় সংশয় প্রকাশ করলেন। বাইবেলে যা আছে, তা-ই অভ্রান্ত সত্য—এমন কথা মানতে তিনি রাজী নন। অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে যা সত্য বলে নির্ণীত হবে—তা-ই সত্যিকারের সত্য। নির্মোহ মন নিয়ে দার্শনিককে তারই গলায় জয়মালা পরিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করলেন বেকন। বিশ্বাসের স্থানে অভিজ্ঞতা দার্শনিক চিন্তায় স্থান পেল। অভিজ্ঞতায় যাকে সত্য বলে জানবো তাকেই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে হবে—এই হল বেকনের মূলমন্ত্র।

পরবর্তী কালে ডেকার্টের চিন্তায় এই সংশয় আরও গভীর হ'য়ে দেখা দিল। যা কিছু সংশয় করা যায় তিনি তাই সংশয় করে বসে আছেন। সংশয় করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে তিনি দাঁড়ালেন—যেখানে সংশয় আর সম্ভব নয়। সংশয়-শেষে প্রাপ্ত সেই তত্ত্বের নাম দিলেন তিনি নিঃসংশয় সত্তা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সমস্ত বস্তুকে তিনি সংশয় করলেন। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্প দেখি তেমনি প্রত্যক্ষলব্ধ এই জগৎ ভ্রান্ত হ'তে পারে। স্মৃতি ত অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মে। অভিজ্ঞতা-লব্ধ বস্তুর অনুপস্থিতিতে অভিজ্ঞতার পুনঃপ্রাপ্তির নামই ত স্মৃতি। অভিজ্ঞতা যদি ভ্রান্ত হয়, স্মৃতিও নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হবে। কল্পনা-লব্ধ বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে সহজেই সংশয় পোষণ করা যায়। সুতরাং ডেকার্ট তাকেও সংশয় করলেন। এমন করে ডেকার্ট একে একে অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও কল্পনালব্ধ সমস্ত বস্তুকেই সংশয় করেছেন। অঙ্ক-শাস্ত্রে আমরা যে জ্ঞান পাই তাও সংশয় করা যেতে পারে। কোন দুষ্টা সরস্বতীর প্রভাবে পরে যে অঙ্কশাস্ত্র আমরা গ্রহণ করিনি—তার কি প্রমাণ আছে? সুতরাং অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানও গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বশেষে ডেকার্ট বললেন—সব কিছু সংশয় করলেও সংশয়াত্মাকে ত আর সংশয় করা যায় না। সংশয়াত্মাকেই যদি সংশয় করা হয়, তবে সংশয় করবে কে? সুতরাং সংশয়াত্মাকে নিঃসংশয় সত্তা বলে স্বীকার করতেই হবে। ডেকার্টের সমস্ত দার্শনিক চিন্তা এই নিঃসংশয় সত্তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

কাণ্ট তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা সংশয় করেই নিজের স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লক্, হিউম্ প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে—আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে আসে। কাণ্ট এই মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। অঙ্কশাস্ত্রে আমরা যে সমস্ত সাধারণ প্রতিজ্ঞার (universal proposition) জ্ঞান পেয়ে থাকি, তা'ত কখনই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না। আর অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান জ্ঞানই নয়—এমন কথাও ত বলা চলবে না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে ধারণা থেকেই জ্ঞান পাওয়া যায়। কিন্তু কাণ্ট প্রশ্ন করলেন—শুধু ধারণা বলে কি কিছু আছে? সমস্ত ধারণাই ত কোন না কোন বিশেষ বস্তুর ধারণা। সুতরাং শুধু ধারণা আমাদের কোন জ্ঞানই দিতে পারে না। ধারণা আর বস্তুর মিলন হ'লেই আমাদের জ্ঞান হয়। অভিজ্ঞতা থেকে পাই আমরা বস্তু আর বুদ্ধি থেকে পাই ধারণা। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি—এই দু'ই মিলেই আমাদের জ্ঞান সৃষ্টি করে থাকে। কাণ্টের এই মত অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতবাদের সংশয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।

(গ) উপযোগিতা-বোধ থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিককালে একজাতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা উপযোগিতা-বোধ থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে। যেমন, ডিউই ও সীলার এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে—এমন চিন্তাই করা উচিত জীবনে যার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে। কোন্ বস্তু জীবনের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করে—এই বিচারেই বস্তুর সত্যতা নিরূপণ সম্ভব। দার্শনিক চিন্তা মানুষকে জীবন-পথে চলতে সাহায্য করে; নানা বিপদে সত্যপথ প্রদর্শন করে। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা এই উপযোগিতা-বোধ থেকেই শুরু হবে।

(ঘ) জ্ঞান-প্রীতি থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

পশ্চিমদেশে দর্শনের প্রতিশব্দ 'ফিলসফি'। 'ফিলস্' ও 'সফিয়া'—এই দুটো গ্রীক শব্দ থেকে 'ফিলসফি' শব্দের উৎপত্তি হ'য়েছে। 'ফিলস্' শব্দের মানে হচ্ছে প্রেম বা প্রীতি। আর 'সফিয়া' মানে জ্ঞান। সুতরাং ফিলসফি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান-প্রীতি। প্রাচীন গ্রীসে 'সফিস্টস্' নামে একদল লোক ছিল। তারা সবার কাছেই নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়াত। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস নিজেকে এদের থেকে আলাদা করবার জন্য নিজের পরিচয় দিতেন জ্ঞান-প্রেমিক রূপে। সেই থেকেই দার্শনিক জ্ঞান-প্রেমিক আর দর্শন জ্ঞান-প্রেম বা প্রীতি বলে পরিচিত হ'য়ে আসছে।

মানুষ বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে। তাই বিশ্বের সমস্ত রহস্য জানবার আগ্রহ তার পক্ষে একান্তভাবেই স্বাভাবিক। জ্ঞান লাভ করবার এই আগ্রহশীলতাই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মানুষের মহত্ত্ব, গাম্ভীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই আগ্রহশীলতার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে। পশু যে জগতে জন্মেছে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তার নাই। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন মানুষের মনে সর্বদাই জাগছে। কেন এত জাগে?—এর একমাত্র উত্তর জিজ্ঞাসাই মানুষের স্বভাব। যেদিন জিজ্ঞাসা থামবে—সেদিন মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকেই হ'য়েছে। প্রত্যেকেই নিজেকে ভালবাসে। নিজের স্বভাব প্রত্যেকেরই ভাল লাগে। জিজ্ঞাসা যেহেতু মানুষের স্বভাব, সুতরাং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার প্রেমিক হ'য়ে উঠে। জিজ্ঞাসা করে মানুষ আনন্দ পায়। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা মানুষের অন্তরের আনন্দের ব্যাপার। যাকে আমি ভালবাসি, যাতে আমার আনন্দ হয়, তা জীবনের কোন্ ক্ষুদ্র প্রয়োজনে আসবে—তা কখনও ভাবি না। দার্শনিক চিন্তাও জীবনের কোন কাজে আসবে—তা ভাববার অবকাশও আমাদের নাই। চিন্তায় আনন্দ আছে। চিন্তা না করলে ভাল লাগে না—এই ত মজাই। . এই যে কানন-কুন্তলা সুন্দরী ধরণী আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এর উৎপত্তির ইতিহাস কি? ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত এই নবজাত শিশুটির জন্ম হ'ল কেন? পাশের বাড়ীর সুগঠিত দেহ তরুণটির অকালমৃত্যুরই বা কারণ কি? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ—না মৃত্যুর পরেও আর একটা জীবন আছে? আকাশের এত তারা, গাছের এত ফুল ও ফল, দিনের ঐ সূর্য আর রাত্রির নিদ্রাহীন চন্দ্রকে সৃষ্টি করলো কে? এ জাতীয় কত প্রশ্নই মনে আসে। স্মরণাতীত-কাল থেকে মানুষ এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু চরম উত্তর আজও মেলেনি। মানুষ তাতে একটুও দুঃখিত নয়। এ সব প্রশ্ন সে বরাবরই করে—আর নিজের মত করে উত্তর দিয়ে আনন্দ পায়। বহু পুরাতন প্রশ্নের নূতন নূতন উত্তর বের করার মধ্যেই মহা আনন্দ।

আনন্দ মানুষকে প্রেরণা দেয়। তাই আনন্দ পায় বলেই মানুষ দার্শনিক চিন্তা করে।

(ঙ) জাগতিক দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি

ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা প্রধানতঃ বিস্ময়, সংশয় বা উপযোগিতাবোধ থেকে জন্ম লাভ করেনি। এখানকার দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তির ইতিহাস একটু নূতন ধরনের। ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা উপলব্ধি করেছেন—

'বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দারিদ্র্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।'

এ সংসার এক মরুভূমি বিশেষ। এখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি জীবনের সমস্ত আনন্দ-রস নিয়ত শুষে নিচ্ছে। 'এ যে কান্নাভরা, ঘেন্নাধরা পৃথিবী।' এখানে অসাম্য, অসন্তোষ, আশাভঙ্গ, অত্যাচার, অবিচার মানুষের জীবনকে নিয়ত বিষিয়ে তুলছে। এই দুঃখের সাগর পার হওয়ার উপায় খুঁজতে হবে। বুঝ্‌তে হবে—কেন এত দুঃখ। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তাই হবে আমাদের একমাত্র চিন্তা। তাই ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা দুঃখের কারণ আর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের করতে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করেছেন। ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা জাগতিক দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দার্শনিকেরা বলেছেন—সত্য-দৃষ্টির অভাবই দুঃখের জন্য দায়ী আর সত্যদৃষ্টি-লাভ মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই নিত্যকালের ভারতীয় দার্শনিকের প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে নাও আলোতে, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃত-লোকে উত্তীর্ণ করে দাও। এই প্রার্থনার মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণী মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে।

মহামিলন

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

সব কিছু হয় তাঁরি ইচ্ছায়
তাঁহারি শকতি দিয়ে
মাঝখানে শুধু জটলা পাকাই
আমরা 'আমা'রে নিয়ে।

তাঁর ইচ্ছায় বিদ্যুৎ-ছটা
বুদ্ধির দর্পণে
আমারে যখন ফুটাইয়া তোলে,
আমি ভাবি বসে মনে
এ বুঝি আমারি জ্ঞানের আলোক,
আমারি চিন্তা, বল,
আমি বুঝি মোর চেতনাবিভায়
করিতেছি ঝলমল।

এইটুকু বোধ সবাকারে দিয়ে
সবার হৃদয়-কোণে
নিজেরে লুকায়ে মেলা দেখিতেছ
জীবনের সবখানে
কতদিনে তুমি ভাঙিবে এ ভুল
কোন মিলনের ক্ষণে
নিঃশেষে মোর সব কিছু লয়ে
মিশিব তোমার সনে ?

উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি

শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

ব্যক্তির জীবনের মতো জাতির জীবনেও শান্তির চাইতে সংঘাতের মূল্য কম নয়। নানা সংঘাতের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। তার জন্যে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ প্রভাবেরই প্রয়োজন। এই দ্বৈতশক্তির মধ্য দিয়ে যাত্রা করে মানুষ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়। সেই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতাসাধনেই তার সার্থকতা। জাতির জীবনেও অন্তর ও বাহিরের সংঘাতের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের অন্তরের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে গীতার বাণী প্রচারিত হয়েছিল। আবার বহির্জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রয়োজনে গ্রীক সভ্যতা, ইসলাম সভ্যতা এবং ইংরেজ-মারফৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে এসেছে। এই তিনটি সভ্যতাকেই ভারতীয় চেতনা ধীরে ধীরে আত্মগত করে যুগোপযোগী রূপান্তরকে স্বীকার করে নিয়েছে। বহির্জগৎ থেকে এই তিনটি সভ্যতার বাণী ভারতের অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ভারতসংস্কৃতির উদার গ্রহণশীলতা এদের মধ্যে মিলনের ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করে নিয়ে আরো বিস্তৃত, আরো উদার হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের ইতিহাস ভারতের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিবর্তনের ইতিহাস। এবং সে ইতিহাসের পুরোধা ছিল বাংলার মনীষা। তাই আজকাল উনিশ শতকের বাংলাদেশ সম্বন্ধে মনীষীমহলে বিশেষ চর্চার আয়োজন দেখা দিয়েছে। আধুনিক বাঙালী তথা আধুনিক ভারতীয় সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগরণের উত্তরাধিকারী। এ জাগরণ নিশ্চিতভাবেই ইংরেজের সংস্পর্শে এবং সঙ্ঘর্ষে (অন্তরে বাহিরে) দেখা দিয়েছিল, আর এ আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল নবগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজ। জাতির গণজীবনের সঙ্গে এ সমাজের যোগ ছিল কম। তাই কালক্রমে মধ্যবিত্তসমাজের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের প্রভাবও স্তিমিত হয়ে এলো। আজ বিশ শতকের মধ্যভাগে এসেও গণজীবনের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, মধ্যবিত্তসমাজেরও মূল্যবোধ বিপর্যস্ত। এমন যুগসন্ধির মুহূর্তে দ্বিখণ্ডিত বাংলার বেদনাহত চিত্ত যে স্বীয় প্রাণশক্তির উৎস সন্ধান করছে তার মধ্য দিয়েই জাতির জীবনীশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার 'উনবিংশ শতাব্দীর পথিক'* বইটিতে ভারতপথিক রামমোহন, বাংলা সমাজ-বিপ্লবে বিদ্যাসাগর, বিলাতে কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ, উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমি—এই প্রবন্ধপঞ্চকের মধ্য দিয়ে মোটামুটি-ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই আলোচনার সঙ্গে তাঁর 'বঙ্কিম-মানস' বইটি যোগ করলে উনিশ শতকের মানস-পটভূমি আর একটু সম্পূর্ণ হয়। অবশ্য ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া উনিশ শতকের পটভূমি কখনই সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া, যে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় অনেকখানি উনিশ শতকের ফসল তাঁর সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবশ্য করণীয়। সে যাই হোক, লেখক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতকের মনীষীদের যে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন, তা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কারণ, এ শুধু তাঁর একার মতামত নয়। বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ উনিশ শতকের নবজাগরণকে কোন্ দৃষ্টিতে

* 'উনবিংশ শতাব্দীর পথিক' ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার; পরিবেশক—ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; পৃষ্ঠা—১০০; মূল্য—তিন টাকা।

দেশে থাকেন, তার পরিচয় এ বইটিতে পাওয়া যাবে।

রামমোহন প্রসঙ্গের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"...বৃটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এই নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী এবং ইংরেজ বণিকের দক্ষিণহস্ত ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তের দলই ভারতের নতুন জীবন ও সংস্কৃতির অগ্রদূত ও নির্মাতা। সুতরাং একদিক থেকে, এদের জীবন-ইতিহাস বৃটিশ ভারতের জীবন ও সংস্কৃতিরও ইতিহাস।" এই মধ্যবিত্ত সমাজ নেতাহিসাবে স্বদেশীয়দের মধ্যে রামমোহন রায়কেই সর্বপ্রথম লাভ করেছিল। লেখক 'ভারতপথিক রামমোহন' প্রবন্ধটিতে রামমোহনের যুগধর্মকে আত্মসাৎ করবার যে অসাধারণ শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন সেকথা অবশ্য স্বীকার্য। ইংরেজ-আগমনের ফলে যে পার্থিব কল্যাণের দ্বার ভারতবাসীর সামনে উন্মুক্ত হতে চলেছিল সে কথা রামমোহন যতখানি দূরদৃষ্টি নিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, সে যুগের ভারতীয় বা অভারতীয় অন্য কেউ অতখানি বুঝতে পারে নি। তাই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতবাসীকে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান কোন ধর্মমতের ধারাকেই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। নানা শাস্ত্র মন্থন করে যে একেশ্বরবাদের যুক্তি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তারই নিকষে এই ধর্মমতগুলির তিনি বিচার করেছেন এবং বেদান্তের পুনরালোচনার দ্বারা হিন্দুধর্মের সারভাগকে জগৎ-সমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মূর্তিপূজাই যে হিন্দুধর্মের একমাত্র পরিচয় নয়, একথাটা সেদিন বিশ্ববাসীকে জানাবার প্রয়োজন ছিল, বেদান্ত যে আমাদের ধর্মচেতনার ভিত্তি একথা জানানোর প্রয়োজন ছিল স্বদেশবাসীকে। তাই মুণ্ডকোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"An attentive perusal of this (Mundakopanishad) as well as the remaining books of the Vedanta will, I trust, convince every unprejudiced mind, that they, with great consistency, inculcate the unity of God; instructing men, at the same time, in the pure mode of adoring him in spirit. It will also appear evident that the Vedas, although they tolerate idolatry for those who are totally incapable of raising their minds to the contemplation of the invisible God of nature, yet repeatedly urge the relinquishment of the rites of idol worship, and the adaption of a pure system of religion, on the express ground that the observance of idolatrous rites can never be productive of eternal beautitude." এ মন্তব্যের শেষভাগের কথাগুলি আমাদের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে অপ্রমাণিত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহনের অধ্যাত্মবিষয়ক বিতর্ক ও আলোচনা বুদ্ধিবাদী চেতনার ফল, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত নয়।

রামমোহনের একেশ্বরবাদ-মূলক সিদ্ধান্তের কারণ সম্বন্ধে লেখক বলছেন—"রাজা যে ধর্মমতে উপনীত হয়েছিলেন তা যে সেকালের সামাজিক পরিবেশে ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা নিঃসন্দেহ। ...... মানুষের মানস-প্রকরণের বৈশিষ্ট্য এই, যতোই সে তার আপন সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করে, বহু জাতের বহু মানুষের সাহচর্যের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের মধ্যে ক্রিয়াকর্ম, স্নেহ, মমতা, অনুভূতি ও হৃদয়বৃত্তির ঐক্য ও মিল অনুভব করে, ততোই সে বিরোধ উত্তীর্ণ হয়, ততোই সমগ্র মানবজাতির ও তাদের সৃষ্টিকর্তার

একত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। সমগ্র মানুষ যখন এক, তখন তাদের সৃষ্টিকর্তাও এক; অথবা সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন্ বলেই সমগ্র মানুষ এক—এমনি ধরনের চিন্তার উদ্ভব হয়।" রামমোহনের সময়ে বহু জাতির মিলন আবার নতুন করে অনুভব করা যাচ্ছিল—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদের ঋষিবৃন্দ অধ্যাত্মসাধনার ফলস্বরূপ এই ঐক্যচিন্তা লাভ করেছিলেন। সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শনকে তাঁরা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বিষয় বলে মনে করতেন। রামমোহনের মধ্যে তেমন কোন উপলব্ধি জাগে নি। তবে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত অভিনিবেশ-সহকারে পর্যালোচনা করে তিনি যে ঐক্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, তার পিছনে হিন্দু, ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টধর্মের পথিকদের মিলনচেতনাও কাজ করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাত্ম-প্রশ্নের এই মৌলিক দিকটির সুসম্পূর্ণ উত্তর আমরা আমরা পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার মধ্য দিয়ে লাভ করি। এই দিক থেকে রাজা রামমোহনে যে চিন্তার সূত্রপাত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে সে চিন্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসঞ্জাত পূর্ণতা।

রামমোহন সম্বন্ধে লেখকের এই যথার্থ মন্তব্যটি স্মরণীয়—"…জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক, যুগের অন্তর-প্রেরণাকে কে কতো বেশি আয়ত্ত করেছেন এবং কার কর্ম, চিন্তা ও আদর্শের মধ্য দিয়ে ইতিহাস আপনাকে সৃষ্টি করেছে," এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, "সেখানে রামমোহন সর্বাগ্রচারী।" রামমোহনের মধ্য দিয়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসভ্যতার মিলনের সূচনা।

"বাংলা সমাজ-বিপ্লবে বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধটিতে অরবিন্দবাবু সুন্দরভাবে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশে বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উনিশ শতকের অপরাপর মনীষীদের সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রায় সব মুনিরই একমত। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে কারু সংশয় নেই। কারণ, তাঁর সব কাজই মানুষকে অবলম্বন করে। আর উনিশ শতকের মূল সুরও ঐ মানবতাবাদ। বিদ্যাসাগরের জীবন-সাধনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলছেন: "জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা কি, এর পরিণতি বা স্বরূপ কি, এসব সমস্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনা তিনি কখনও করেন নি এবং করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন নি। নিজস্ব কর্ম ও মনোভাবের গভীর সামাজিক মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কি না বলা কঠিন। তবে, তাঁর কর্ম যেমন নিঃসঙ্কোচ, দ্বিধাহীন, ও পৌরুষদৃপ্ত তাতে মনে হয়, বাস্তব মানুষের জীবনতীর্থে উপনীত হওয়াই যেন তাঁর আদর্শ। …… এ এক অপূর্ব জীবনবেদ, অবশ্যই ইউরোপের আশীর্বাদ-পাওয়া।"

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এ দৃষ্টিভঙ্গীর যাথার্থ্য স্বীকার করে নিয়েই দু'একটি কথা বলা চলে। বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনধারার ঐতিহ্যকে একদিকে বরাবর আঁকড়ে ধরেছিলেন—তা হলো জীবনযাত্রার সরলতা এবং সুপবিত্র অথচ সুকঠোর একনিষ্ঠা। এ দু'টিই ব্রাহ্মণ্যচেতনার দান। কর্মোদ্যমের ক্ষেত্রে তিনি যে য়ুরোপীয়দের তুল্য উদ্যম প্রকাশ করে গেছেন তার পিছনেও কি এই পুরুষপরম্পরাগত সত্যাশ্রয়ী দৃঢ়তা ছিল না? ("চারিত্রপূজা" বইটিতে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে এই দিকটি আলোচনা করেছেন।) বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁর ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের "বিদ্যাসাগর-জীবন্‌চরিত" বইটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ বইটি পড়লে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিকভাবে মনে আসে যে, বিদ্যাসাগর তখনকার দিনের কোন ধর্মান্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। নাস্তিক ছিলেন না। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের নিজের বক্তব্য এই—"এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি,

তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। বাঙালীর জীবনে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড়ো দান—তাঁর সমবেদনা-ভরা বিরাট হৃদয়, আর সেই হৃদয়ানুভবকে প্রত্যক্ষ কর্মে রূপান্তরিত করবার শক্তি।

"বিলাতে কেশবচন্দ্র" প্রবন্ধটিতে লেখক কেশবচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ অংশের উপর জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে বিলাতে বাসকালে কেশবচন্দ্র ইংরেজের শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা রেখেও কেমন নিশ্চিত অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ইংরেজ-শাসনের ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্রের সমকালীন বাঙালী তথা ভারতীয়-মানসে স্বাধিকার-বোধের চেতনার কতখানি বিকাশ ঘটেছে, সেকথা সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পথিক হিসেবে কেশবচন্দ্রের এ পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বোম্বাইতে ধর্মসম্মেলন—বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এই বৎসর ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত নানাবিধ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ ব্যতীত ১৩ই অক্টোবর সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি ধর্মসম্মেলনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলী ও শ্রোতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিলে বোম্বাই রাজ্যপাল ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাব একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বোম্বাই-এর ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি জি খের ছিলেন সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং প্রদেশ-কংগ্রেসের নায়ক শ্রী এস কে পাটিল প্রধান অতিথি। বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন রেভারেণ্ড ডক্টর এইচ সি মাস্কারহেন্‌হাস (খ্রীষ্টধর্ম), দস্তুরজী কুটার (জরথুষ্ট্র ধর্ম), মৌলানা এম্ এম্ কে শিহাব (ইসলাম), অধ্যাপক মাধবাচার্য (বৌদ্ধধর্ম), ডক্টর অমৃতলাল এস্ গোপানি (জৈনধর্ম) এবং অধ্যাপক নলিন এম্ ভট্ট (হিন্দুধর্ম)

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র—লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের (ঠিকানা—68, Dukes Avenue, Muswell Hill, London, No. 10) ১৯৫৫ সালের সপ্তমবার্ষিকী কার্যবিবরণী আমরা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রের কর্মব্যাপৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে কিংস্‌ওয়ে হলে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং রবিবারে কেন্দ্রস্থ উপাসনাকক্ষে ধ্যান-শিক্ষাদান ও উপনিষদ্ আলোচনা করিয়াছেন। স্যর জন স্টুয়ার্ট ওয়ালেস্, মিঃ কেনেথ ওয়াকার, মিঃ নরম্যান মার্লো, শ্রী পি ডি মেহ্‌তা এবং শ্রী এস্ সামন্ত বক্তৃতা এবং ধর্মালোচনা পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন। কয়েকটি তরুণদলের জন্য এবং য়িহুদী (Jewish) ও মেথডিস্ট (Methodist) সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই কেন্দ্রের 'Vedanta for East and West' নামক ইংরেজী দ্বৈমাসিক পত্রিকাটি বহুল প্রচারিত হইয়া গত সেপ্টেম্বরে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। 'Women Saints of East and West'—(প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীসাধিকামালা) শিরোনামায় শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জন্মজয়ন্তীর স্মারক হিসাবে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, খ্রীষ্টের জন্ম ও পুনরুত্থান দিবস এবং বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়।

শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীস্তুতিঃ

ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমলচৌধুরী-বিরচিতা

ভুবনবিমোহনে সারদামণে সারং দেহি জগদ্ধাত্রি ।
বেলুড়স্থানে পুণ্যপ্রধানে চরণরেণুধনদাত্রি ॥১

গদাধরধর্ম- স্থনিগূঢ়মর্ম পতিপূজনগ্রহীত্রী
লজ্জাবরণে প্রচ্ছন্নধনে পাপতাপশোকহর্ত্রি ॥২

কামারপুকুর- পূর্ণলীলাধর- চিরসাধনসঙ্গিনী ।
ত্রেতাদ্বাপর- পূর্ণাবতার- "রাম" "কৃষ্ণ"-প্রপালিনী ॥৩

কামিনীকাঞ্চন- ত্যাগবরণ- সর্বশক্তি-প্রদায়িনী ।
তেলোভেলোবন- দস্যুপ্রধান- দুহিতৃপদপ্রার্থিনী ॥৪

সারদানন্দ- বিবেকানন্দ- "আমজাদ" সমদর্শিনী ।
ধর্মমধ্যমণি- নিখিলপাবনী ত্রিভুবনজননী জননী ॥৫

ভারতমখিলং মাতৃপদবলং ত্বং হি মাতৃশিরোমণিঃ ।
জগদম্বিকা জয়রামবাটিকা- দীন-গৃহ-প্রকাশিনী ॥৬

"গণয় স্বীয়ং বিশ্বং সর্বং" শেষবচঃপ্রচারিণী ।
"প্রসূতিঃ সতাং তথা চাসতাং" সর্বসুতসংরক্ষিণী ॥৭

বরমাতৃপদে সুখদে বরদে যতের্নতিকোটী জননি !
বিশ্ববরেণ্যে স্মরণসুপুণ্যে জগদম্ব নারায়ণি ॥৮

মাতর্দিশি দিশি তবাশীরাশি বিতরতু ক্ষেমং বিধাত্রি !
যতীন্দ্রবিমলে তাপবিহ্বলে কৃপাং বর্ষয় বিশ্বধাত্রি !
যতীন্দ্রবিমলে মাতৃধনবলে পদং নিধেহি বিশ্বধাত্রি ॥৯

বঙ্গানুবাদ : ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী কৃত

বিশ্বমনোরঞ্জিনী সারদামণি, তুমিই সকলকে সার-পদার্থ, অথবা সত্যজ্ঞান দান কর, জগদ্ধাত্রি ! তুমিই মহাপুণ্যময় বেলুড়মঠে চরণ-ধূলি-দান ক'রে, সেই স্থানকে অপূর্ব সম্পদে বিভূষিত করেছিলে ।১॥

তুমিই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের মূলীভূত অর্থ, অথবা তত্ত্ব ; তুমিই পতির পূজা গ্রহণ করেছ ।[1] কিন্তু লজ্জাপটাবৃতা হয়ে তুমি তোমার এই অনুপম আধ্যাত্মিক সম্পদকে গোপন করে রেখেছিলে । তুমিই

১ ফলহারিণী কালী পূজার রাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে আত্মাশক্তিরূপে পূজা নিবেদন করেন এবং তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে জপমালা সহ তাঁর সমস্ত সাধন-ভজন বিসর্জন দেন । এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই ।

আমাদের পাপ, তাপ ও শোক হরণ কর।২॥ তুমিই কামারপুকুরের পূর্ণলীলাময় দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিরকালের সাধন-সঙ্গিনী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্রেতাযুগের অবতার রাম এবং দ্বাপরযুগের অবতার কৃষ্ণের এক অপূর্ব সমন্বয়। তুমিই এই সমন্বিত পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পালয়িত্রী।৩॥ তুমিই তাঁকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে সর্বশক্তি দান করেছিলে। তুমিই তেলোভেলো-বনের প্রধান দস্যুর কন্যা হতে চেয়েছিলে।৪॥

তুমিই শ্রীমৎস্বামী সারদানন্দ, শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ ও আমজাদকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছিলে।[২] তুমিই ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপা, তুমিই বিশ্বের পবিত্রতাদায়িনী, তুমিই ত্রিভুবনজননী, তুমিই জননীস্বরূপা।৫॥

ভারতবর্ষ চিরকালই মাতার বলেই বলীয়ান। কিন্তু তুমিই সকল মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা মাতা। এইভাবে জগতের মাতা হয়েও, তুমি লীলাচ্ছলে জয়রামবাটিকায় এক দীন-দরিদ্র গৃহে আবির্ভূতা হয়েছিলে।৬॥ "জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ ; কেউ পর নয়,—জগৎ তোমার"—এই তোমার শেষ বাণী। তুমিই বলেছিলে "আমি সতেরও মা, আমি অসতেরও মা"—তুমিই সকল সন্তানকে রক্ষা কর।৭॥

সুখদায়িনি বরদায়িনি জননি। তোমারই বরেণ্য শ্রীপাদপদ্মে যতীন্দ্রের কোটি কোটি প্রণতি। তুমিই বিশ্ববরেণ্যা, তোমার স্মরণমাত্রই মহাপুণ্য ; তুমিই বিশ্বজননী নারায়ণি।৮॥

মাতঃ! তোমারই অজস্র আশীর্বাদ দিকে দিকে কল্যাণ বিতরণ করুক। তাপক্লিষ্ট যতীন্দ্রবিমলে কৃপাবারি বর্ষণ কর, বিশ্বধাত্রি। মাতৃসর্বস্ব যতীন্দ্রবিমলে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন কর, বিশ্বধাত্রি।৯॥

২ মুসলমান রাজমিস্ত্রী আমজাদের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর উক্তি—"শরৎ (সারদানন্দ) আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার ঠিক তেমনই ছেলে।"

শ্যামা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এক হাতে খড়্গ তব অন্যহাতে ধরি আছ তুমি,
বরাভয়, তুমি শ্যামা তুমি বঙ্গভূমি।
বাঙ্গালী তোমারে পূজিয়াছে
তোমারি মাঝারে তারা যুগে যুগে শক্তি খুঁজিয়াছে।
তুমি রামপ্রসাদের মাতা
বাঙ্গালীর বক্ষে বক্ষে তোমার আসন আছে পাতা।
তোমারে কমলাকান্ত করিয়াছে পূজা,
মামুলী পূজার মাঝে বৃথা তোমা খুঁজা।
ভক্তি বিনা হয়না মা শক্তি আরাধনা
শক্তি বিনা বৃথা সর্ব জাতীয় সাধনা।
ভক্তি যদি নাহি থাকে বৃথা তবে উৎসবের ঘটা,
বৃথা তবে বাদ্যভাণ্ড আলোকের ছটা।
রামপ্রসাদের মত মায়েরে আহ্বান যদি করো,
তার চেয়ে পূজা নাই বড়।

কথাপ্রসঙ্গে

বর্ষশেষ

খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৬ সাল শেষ হইতেছে, পৌষ-অন্তে উদ্বোধনেরও আর একটি বৎসর—এই পত্রিকার ৫৮তম বর্ষ আমরা পিছনে ফেলিয়া যাইতেছি। বর্ষশেষে সারা বৎসরের হিসাব-নিকাশের কথা মনে পড়ে, আগামী বৎসরের জন্য নূতন সঙ্কল্প, নূতন আশা জাগ্রত হয়, নূতন শক্তি সঞ্চিত হয়।

মানব-প্রগতির পথ সরলরেখায় প্রসারিত নয়, উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া, সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হইতে হইতে চলে। ভ্রমপ্রমাদ এ পথের বাধা নয়, অগ্রগতির বলিষ্ঠ অবলম্বন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে মানবাত্মার অভিযান। অতএব বিগত বৎসরে আমাদের ভুলত্রুটির জন্য আমরা আত্মধিক্কার দিব না, যে অন্ধকার দেখিয়াছি তাহাতে নিরুৎসাহ হইব না। মানবাত্মার চিরভাস্বর মহিমা মনে রাখিয়া উহার বিকাশের জন্য আমরা অধিকতর যত্নশীল হইব। আমাদের সাধনা এখনকার সাধনা, এখানকার সাধনা। কবে কোন্ সুদূর আশমান হইতে কাহার ইচ্ছায় কোন্ স্বর্ণযুগ নামিয়া আসিবে সেই অলস আশা আমাদের নয়। শ্রীভগবান আমাদের শুনাইয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" (গীতা—৬।৫)। আমরা নিজেরাই নিজদিগকে উদ্ধার করিব, কোন বিপর্যয় কোন দ্বন্দ্বসংঘাতেই অবসন্ন হইব না। জানি—যদি আমাদের আগ্রহের মধ্যে কোন ফাঁকি না থাকে তাহা হইলে আমাদের অন্তরশায়ী ভগবান আমাদিগকে শক্তি দিবেন, আমাদিগের লক্ষ্যে পৌঁছিবার বাধা একে একে দূর করিয়া দিবেন।

আমাদের ব্যাপৃতি প্রধানতঃ মানুষকে লইয়া। পরিবার বল, সমাজ বল, রাষ্ট্র বল আখেরে মানুষই তো সব কিছুর মূলে। মানুষ যদি খাঁটি হয়, সবল হয় তাহা হইলে ঐগুলিও স্বচ্ছ থাকে, শক্তিশালী থাকে। অতএব আমরা ডাক দিতে চাই মানুষকে। অবাস্তব অসম্ভব কল্প লোকের দাবি তাহার উপর আমরা চাপাইব না। শুধু বলিব—মানুষ তুমি পবিত্র হও, ঈশ্বরবিশ্বাসী হও, মানুষকে ভালবাসিতে শিখ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া বৃহৎ মানবসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কর। ইহারই নাম তো ধর্ম। মানুষ তুমি ধার্মিক হও।

শ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবীর ১০৪তম পুণ্য জন্মতিথি—অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী এই বৎসর পড়িয়াছে ৮ই পৌষ, রবিবারে (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬)। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এবং অন্যান্য শাখাকেন্দ্রে উহা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। যুগপৎ যিনি ছিলেন মানবী ও দেবতা, যাঁহার শুদ্ধ দেহমনের আধারে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মহামাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আবার শ্রীরামকৃষ্ণের যুগব্রত সাধনে যিনি তাঁহাকে দিব্যপ্রেরণা দিয়া গৌরবান্বিতা—সেই মহিমময়ীর উদ্দেশ্যে আমাদের সহস্র প্রণাম। তাঁহার নিষ্কলুষ চরিত্রসুষমা এই সুখদুঃখ-স্বার্থ-সংঘাতময় পৃথিবীতে আমাদের জীবনে লইয়া আসুক স্নিগ্ধ পবিত্রতা, অটুট ধৈর্য ও ক্ষমা, নির্ভীকতা, সহানুভূতি এবং সর্বোপরি শ্রীভগবানে অনন্ত বিশ্বাস ও ভালবাসা। জয় মহামায়ীকী জয়!

মহাপুরুষ-স্মরণে

এই পৌষে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দুই জন মহাপুরুষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা তাঁহাদের জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেম-সেবাময় জীবনের অনুধ্যান করিয়া ধন্য হইব। ১২ই পৌষ, বৃহস্পতিবার (২৭।১২।৫৬) এবং ২৩শে পৌষ, সোমবার (৭।১।৫৭) যথাক্রমে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) এবং স্বামী সারদানন্দজীর

(শরৎ মহারাজ) শুভ জন্মতিথি। মহাপুরুষ মহারাজ খ্রীঃ ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সংখ্যায় আমরা তাঁহার দুইটি স্বলিখিত পত্র প্রকাশিত করিলাম। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর (১৯০১-১৯২৭) সঙ্ঘের সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের অনবদ্য চরিত্র আমাদিগের নিকট আধ্যাত্মিক সাধনা ও নিষ্কাম কর্মে বিপুল প্রেরণা উপস্থাপিত করে।

স্বাগত

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতে এক বৎসর ধরিয়া যে উৎসবাদি চলিতেছে তাহার অন্তিম অনুষ্ঠানসমূহ আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ তথাগতের জন্মভূমি সন্দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এই সকল বৌদ্ধ ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে—বিশেষতঃ, তিব্বতের মহামান্য অতিথিদ্বয়—দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামাকে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

খেলাঘর

অনিরুদ্ধ

ভাঙে ঘর ভাঙে খেলাঘর
ভরে দিক ধুলায় ধুলায় ;
মূক ব্যথা জমে হৃদি 'পর
ধুলা ! তবু নয়ন ভুলায়।

জানি—আর পিছে চাওয়া নয়
গেছে মিটে হিসাব-নিকাশ ;
জানি—বৃথা স্মৃতির সঞ্চয়
তবু কেন নিভৃত নিশ্বাস ?

মিছা যদি ক্রীড়ার অঙ্গন
কায়া যদি শুধুইরে ছায়া—
কাল যদি অখিল-হরণ
সব শেষে কেন তবে মায়া ?

নাই নাই ওরে শেষ নাই
ভাঙা শুধু মনের বিভ্রম ;
যাহা খেলা রয়েছে তাহাই
চিরসত্য কামনা পরম।

সে কামনা অতীতেরে টানে
রাখে ধরি' অসীমের বুকে ;
সুখ দুখ এক বলি মানে
লাভক্ষতি এককণে চুকে।

রচিল সে কী বিপুল গেহ !
খেলিছে যে সনাতন খেলা ;
খেলাঘর লাগি তাই স্নেহ
ফুরায় না খেলিবার বেলা।

মায়ের প্রকাশ

শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী

'লজ্জাপটাবৃতা' চিরঅবগুণ্ঠনবতী মা— তোমার মানবদেহধারণের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসবমুখে তোমার ঘোম্‌টা খুলিয়াছ। স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তুমি। আবার স্বয়ং ব্রহ্মকর্তৃক সমপূজিতা—মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিতা তুমি,—তোমার স্থূলদেহে আবির্ভাব এবং বিদ্যমান থাকাকালীন বিরল ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমার ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর তেমন কেহ শ্রীমুখারবিন্দ দর্শনের এবং তোমার রাতুল চরণযুগল দর্শন-স্পর্শনের সুযোগ লাভ করে নাই। কিন্তু আজ ? দেখিতেছি দিকে দিকে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—যদিও ব্রহ্মশক্তির নর-নারীদেহে আবির্ভূত-আবির্ভূতা হইবার সময় হইতেই এই জাগরণের পালা আরম্ভ। স্বয়ং ঠাকুরের নর-দেহাবলম্বনে প্রকটিত 'ভাবৈশ্বর্য' অদ্যাধিক প্রকাশিত

হইলেও তুমি স্বয়ং মহাশক্তি 'সুগুপ্তা' না থাকিলেও, 'গুপ্তা' ছিলে, আজ, মা তুমি 'ব্যক্তা'—সুব্যক্তা হইয়া চলিয়াছ।

সর্ব চেতনার সারভূতা সর্বচেতনাসমাহৃতা তুমি —"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" আজ "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—চৌদ্দ পোয়া দেহাবলম্বনে প্রকটিতা তুমি বিশ্বব্যাপ্তা হইয়া চলিয়াছ—তোমার কৃপাবলে জীবের নূতনদৃষ্টি ভঙ্গীতে। 'বুদ্ধিরূপেণ', 'শান্তিরূপেণ' প্রভৃতি শতরূপে তো তুমি আছই, এখন 'মাতৃরূপেণ' যুগপ্রয়োজনে তুমি আসিয়াছ—বিশেষ ভাবে। জীবের রুদ্ধদৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। বিকৃতদৃষ্টি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ হইতে অপসারিত হইতেছে। মানুষ দিব্য দৃষ্টি, খাঁটি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে। যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতেছে। যাহা ভুল দেখিত তাহা ঠিক দেখিতেছে।

ধূলার ধরণীতে তুমি আসিয়াছ এবং আছ, থাকিবেও আরো বহুকাল। তুমি যাহাকে যেমন দেখিবার শক্তি দিয়াছ সে তেমন দেখিতেছে—আর প্রচারের ধুম লাগিয়াছে। কেহ দেখিতেছে—ঠাকুর ও তুমি অভিন্ন! বহির্দৃষ্টিতে খোলসে মাত্র তফাৎ! পৃথক করিয়া ঠাকুরকে কেহ বলিতেছে পরমপুরুষ, তোমাকে বলিতেছে—পরমা প্রকৃতি। কেহ দেখিতেছে তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা, আদ্যাশক্তি। কেহ দেখিতেছে একান্ত গ্রাম্য বলিয়া গ্রাম্য কুলবধূ—আকারে-প্রকারে চাল-চলনে। যে যাহা দেখিতেছে —ঠিকই দেখিতেছে, তবে তারও ঊর্ধ্বে আরও দেখিবার কত কি! "কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

কেহ বা আফশোষ করিতেছে তুমি শ্রীচৈতন্য-লীলায় উপেক্ষিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া! তদীয় পার্ষদগণ, ভক্তগণ, ভাবধারাপ্রচারকগণ প্রিয়াজীর প্রতি নাকি অবিচার করিয়া গিয়াছেন। তবে এই সারদা-জীবনালোকে যদি আমরা প্রিয়াজীকে দেখি—আফশোষের কি আছে? সতী-সীতা, রাধা, প্রিয়াজী ইঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিবার আলোক আজ পাওয়া গিয়াছে। যুগনায়ক ও যুগনায়িকারা কি বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবনালোকে তাহা আমরা দেখিতেছি। তখন যাহা হয় নাই, এখন হইতেছে। "যখন যেমন তখন তেমন।" যুগ-প্রয়োজন মূল কথা।

তবে ইহাও দেখিতেছি, মা, তোমাকে নিয়া যেন একটা আড়ম্বরও চলিতেছে। এখনই! পরের কথা সহজেই অনুমেয়। প্রচারের আবরণে প্রসার-প্রতিপত্তির ব্যবসাও চলিতেছে। চিত্র-জগতেও তোমরা দুজন পৃথক বা একত্র পার্ষদগণ সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ে প্রকটিত প্রকটিতা হইতেছ। কতকিছু লেখা দেখা যাইতেছে, কোথাও কোথাও 'এক গোয়াল গরু' না হইয়া 'এক গোয়াল ঘোড়া'ও হইতেছে! মনে রাখা উচিত স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ পর্যন্ত মায়ের সম্বন্ধে লিখিতে, বলিতে ভীত সন্ত্রস্ত হইতেন। "মহাশক্তি! মহাশক্তি" বলিতে বলিতে তাঁহারা নীরব হইতেন।

তবে কি—আজিকার এসকল ধৃষ্টতা হইতেছে? জিজ্ঞাসা সমীচীন। না—ধৃষ্টতা হইবে কেন? বলিয়াছি তো—"মা, তুমি ঘোমটা খুলিয়াছ।" আর আমাদের সান্ত্বনা—এও তাঁরই ইচ্ছা। অনেকের অবিশুদ্ধ দেহমন শুচি শুদ্ধ পবিত্র হইয়া উঠিতে পারে এ সকল অভিনয় বা রূপকের সহায়েও। অতিরঞ্জন ও সত্যগোপন প্রচেষ্টাদির মধ্যেও দুইদশজন লেখক-পাঠক-বক্তা-শ্রোতার খাঁটি বস্তুর স্পর্শ লাভ হইতে পারে। শক্তিপূত ভাব ও ভাববাহক নাম তো পৌঁছিতেছে—শত সহস্রের কানে, কোনও কোনও ভাগ্যবান ভাগ্যবতীর প্রাণেও পৌঁছিবে, জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। অবশ্য 'নাচিয়া গাহিয়া' অনেকে 'রতন' হয়, আর অনেকে 'রৌরবে' যায়—যার যেমন ভাগ্য।

আর আমাদের কথা—অত শত দেখা বুঝা

ভাবা চিন্তার প্রয়োজনই বা কি? আমরা জানি, বুঝি :—

"মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই ?
দুখের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই।"

উপসংহারে আর একটি কথা। অভিনয়ের কথার আভাস দিয়াছি। অভিনয় ত অভিনয়, সকলেই জানে কিন্তু স্বয়ং ঠাকুর ও মায়ের নূতন সংস্করণের আবির্ভাবও আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে একটুখানি হুঁশিয়ার থাকা আমাদের কল্যাণপ্রদ। খাঁটি অবতার আর মেকী অবতার।

"Beware of false prophets!" (Christ)

"সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।" (শ্রীচৈতন্যভাগবত) ইত্যাদি সতর্ক বাণী আমাদের জন্য রহিয়াছে।

'কপালমোচন'—এ আর যখন তখন যত্র তত্র হয় না। এবার জীবের বহুভাগ্যে 'কপালমোচন' অবতরণ করিয়াছেন। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক দেশলাই কাঠিতে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্ন দিবালোকে জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া চলিয়াছে। চক্ষুষ্মান দেখিতেছে, লণ্ঠন নিয়া খোঁজাখুঁজির দুর্ভাগ্য কি তবুও আমাদের যাইবে না ?

দেবতা

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

দেবতা খুঁজি না মঠে মন্দিরে ধেয়ানে তপস্যায়,
পেয়েছি তাহারে মোর কুঁড়েঘরে ধরণীর এ' ধুলায়।
মোর পরিবারে পরিজন হ'য়ে সেই যে গো সেবা মাগে,
রোগে দুখে অনাহারে জাগরণে মোর লাগি' নিতি
জাগে।

ভিখারীর বেশে মোর ঘরে এসে সেই চেয়ে যায় ভিখ,
রূপ দেখাইতে বধূ হ'য়ে পরে কপালে সিঁদুর-টিপ।
ষড়ৈশ্বর্যে ভরে দিয়ে গেলো এই চারু সংসার,
প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালবাসা দিল কত রূপে অনিবার।
বিরহ বিষাদ ঈর্ষা দ্বন্দ্ব তাহারই আশীর্বাদে—
ঝরে অবিরাম এ' জীবন ঘিরি' কত বিচিত্র ছাঁদে।

প্রলোভন-ত্রুটি পতনচ্যুতিতে ভরি' সৃজনের পথ,
সেই তো দেখালো কোথায় রয়েছে সংযম মনোরথ।
তনয় জায়ায় অনুজে জনকে জননীর সাজে রাজি'
অনুদিন সে যে মোর পাশে ফিরে চাহিয়া
অর্ঘ্যসাজি।

দৈন্য দুঃখ অপমান ঘৃণা তপশ্চর্যা বরি'
পরিবার প্রতিপালনেতে পূজা প্রতিক্ষণ আমি করি।
জাগ্রত দেবে অবহেলা করি' পাষাণ-প্রতিমা-মূলে,
বিশ্বপ্রাণীর বেদী হ'তে দূরে শূন্য আঁধার কূলে—
অলস মৃতের বন্ধ নয়নে ওঠে যেই কালো ছায়া,
সে নহে ঠাকুর—মিথ্যা স্বপন, সে যে ময়ণের মায়া।

মহাপুরুষ মহারাজের পত্র

(জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত)

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

"Aspect Lodge",
Spring field P. O.
Nilgiris (Madras) 17. 5. 24

শ্রীমান—

তোমার পত্র মাদ্রাজ হইয়া এখানে আসিয়াছে। * * * আমি —র জন্য খুব চিন্তিত রহিয়াছি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর মঙ্গলের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁর রোগের যন্ত্রণা তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া কষ্টবোধ হয়, অবশ্য শরীর-ধারণ যিনিই করিয়াছেন তাঁহাকেই কম আর বেশী কষ্ট পাইতে হয়। প্রভুর স্মরণ মনন তিনি যতটুকু পারেন করুন। তোমরা যথাসম্ভব তাঁর সেবা করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। * * * প্রভু তাঁর মঙ্গলই করিবেন। সু—র জন্য বড়ই দুঃখ হয়, বেচারা একে চক্ষু নিয়ে নিজেই ব্যতিব্যস্ত

তাঁর উপর আবার এই বিপদ। প্রভু দীনদয়াল ভক্তরক্ষক ভক্তপ্রতিপালক, তিনি উঁহাদের নিশ্চয় মঙ্গল করিবেন। সু—অতি ভাল ছেলে, প্রভু তার মঙ্গল করুন—সতত প্রার্থনা করি। * * * আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। * * * এই নীলগিরি পর্বত অতি রমণীয় এবং শীতল, স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। হাওয়া খুব চমৎকার। ২।১ মাইল দু'বেলাই একটু একটু বেড়াচ্ছি। প্রভুর কৃপায় ভাল আছি। জুন মাস পর্যন্ত এখানে থাকিবার ইচ্ছা, পরে Bangalore যাওয়ার কল্পনা, এখন প্রভু যা করেন। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ—তোমরা নিঃস্বার্থ মহা উচ্চকর্ম করিতেছ, প্রভু তোমাদের বিশ্বাসভক্তি অচল অটল করিয়া দিন, তোমরা ধর্মজীবনে উন্নত হও।

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Godavari House
Ootacamund, S. India
26. 8 56

শ্রীমান—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার মার পীড়া ক্রমেই বাড়িতেছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। মার কঠিন পীড়িতাবস্থায় ছেলের তাঁকে দেখিতে যাওয়া সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা ছেলের হৃদয় বুঝিতে পারে, তাহা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি তোমার তাঁর সেবাশুশ্রূষা করিবার একান্ত দরকার হয় অর্থাৎ আর যদি কেহ তাঁর সেবা করিবার সে রকম লোক না থাকে এবং সেবার অভাবে তাঁর শরীর শীঘ্র ত্যাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে পুত্রের একান্ত কর্তব্য তাহা করা। তোমার অন্য ভাইবোন তো আছে? তা নইলে শুধু শুধু বাড়ী গিয়ে 'আহা মার বড় অসুখ, কি হবে' ইত্যাদি করতে যাওয়ায় লাভ কি? তুমি ডাক্তার নও যে রোগের কোনরূপ উপশম করতে পারবে।

ঠাকুর ভক্তের প্রাণের প্রার্থনা নিশ্চয় শুনেন ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। প্রার্থনার বিশেষ ফল এই যে ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে আছেন এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়, ক্রমে ক্রমে তাঁর Existence (অস্তিত্ব) হৃদয়ে feel (অনুভব) করা যায় স্পষ্টরূপে—ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে? সুতরাং প্রার্থনা খুব করিবে। ব্যাকুলতা তাঁর কৃপায় অধিক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যে তোমার তাহা নাই তা নয়, তবে যা আছে তুমি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক চাও, তা হবে তাঁর কৃপায়। তিনি অহেতুক দয়াল ঠাকুর, দয়া করবার জন্যই তাঁর নররূপ ধরে ভূতলে আসা—এবং জীবকে এইসব বিশ্বাসের কথা বলবার জন্যই এখনও আমাদের জগতে রেখেছেন তাই তোমাকে এসব বলছি। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি ঠাকুর ছাড়া যেন জীবনে আর কিছু না চাও, না জান। তুমি, সু—, শৈ— প্রভৃতি সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। * * *

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কাশী হইতে জনৈক ভক্ত কলিকাতা আসিলে পূজনীয় লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কাশীর বেগুন ও পেয়ারা দিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন, "আমার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা।" মা একটু মুচকি হাসিয়াছিলেন। মা একবার নিজমুখে বলিয়াছিলেন, একমাত্র লাটু

ছাড়া আমার কাছে আসিবার আর কারও আদেশ ছিল না। লাটু কি কম গা? লাটুর সেবা কর। তার কাছে তুমি থাক, তোমার কল্যাণ হবে।

অনেকের ধারণা পূজনীয় লাটু মহারাজ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন। ইহা ঠিক নয়। তিনি ভক্তিমতী স্ত্রীলোকদের সেবা লইতেন কিন্তু কাহাকেও প্রায়ই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। স্ত্রীলোকদের বলিতেন, কাশীতে বেশী ঘোরাঘুরি করিও না। স্বামীকে প্রাণভরে সেবা করবে। স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা। স্বামীকে ভগবৎজ্ঞানে প্রাণভরে সেবা করলে কল্যাণ হবে।

পূজনীয় লাটু মহারাজ গুরুভক্তির উপর বড় জোর দিতেন। ভগিনী নিবেদিতার গুরুভক্তির কথা খুব বলিতেন। কাশ্মীর যাওয়াকালীন স্বামীজী ঘোড়া থেকে নাবছেন আর নিবেদিতা জুতার ফিতা খুলে দিচ্ছেন। লাটু মহারাজ প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন—"গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।" বলিতেন,—গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, গুরুর সঙ্গ না করলে গুরুর মহিমা বুঝা যায় না। তবে ইহাও বলিতেন যে, সব সময়ে গুরু শিষ্যে একসঙ্গে থাকা ঠিক নয় কারণ, গুরু রাগ করিতেছেন, সাধারণ লোকের ন্যায় দেহযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন এই সব দেখিয়া সংশয় আসিতে পারে। গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিতে নাই। ভগবান মনে করিতে হইবে।

কাশীতে রোজ শিবদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিতে বলিতেন। বলিতেন, আমার খুব ইচ্ছা হয় রোজ দর্শন করি কিন্তু শরীরের জন্য পারি না। তোমরা আমার নকল করিও না। বৈশাখ মাসে মহারাজ রোজ গঙ্গাস্নান, বেলপাতায় রামনাম লিখিয়া ফল মিষ্টি লইয়া বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেন। অন্নপূর্ণা বাড়ীতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ জপ করিতেন।

গয়ায় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের কথায় খুব জোর দিতেন। স্বামীজীর শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী গয়ায় পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। তাঁকে চিঠি লিখে ভক্তদের শ্রাদ্ধাদি করাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন। ইহাও লিখিতেন,—ভক্তটিকে যত্ন করিবে, ইহাতে তোমার কল্যাণ হবে।

সাধুদের নির্ভরতা সম্বন্ধে খুব জোর দিতেন। বলিতেন,—নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব না হলে তাঁহার উপর নির্ভর করা যায় না। তাঁর উপর নির্ভর করলে তিনি সব সুবিধা করে দেন। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। সাধুরা ভাবে, কোথায় থাকব, কোথায় খাব। এই সব দুর্বলতা। সাধুদের নির্জন স্থান দেখে তপস্যায় লাগা উচিত বলিতেন।

যে কোন সম্প্রদায়ের সাধু শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের নিকট মাঝে মাঝে ভিক্ষার জন্য আসিতেন, তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। জনৈক দণ্ডী সন্ন্যাসী (নাম স্বামী মাধবানন্দ) লাটু মহারাজের কাছে আসিতেন ও ভিক্ষা করিতেন। হঠাৎ একদিন সাধুটি ভিক্ষার জন্য দেরিতে আসায় লাটু মহারাজের সেবক তাঁহাকে বলিল যে, রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন আর ভিক্ষা হবে না। লাটু মহারাজ শুনিয়া তখনই বলিলেন,—সেকি! আবার ভাত রান্না কর। সাধুজীকে বলিয়া দিলেন, যে দিন ভিক্ষা করিবে সে দিন সকালে আসিয়া বলিয়া যাইবে তাহা হইলে আর কোন গোল হইবে না। মহারাজ উভয়কেই সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন যাহাতে কাহারই কোন অসুবিধা না হয়। ঐ দণ্ডী সাধুটির লাটু মহারাজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ছিল।

জনৈক ভক্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন শুধু গঙ্গাস্নান করে কি হবে, ভিখারীকে কিছু দিতে হয়। রোজ পয়সা না দিতে পার, এক মুঠো করে চাল দিও। ভক্ত মহিলাটি মহারাজের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

পূজনীয় লাটু মহারাজ আশ্রিতবৎসল ছিলেন, যাহাকে আশ্রয় দিতেন কোন অন্যায় কাজ করিলেও তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেন না। জনৈক ব্রহ্মচারী অদ্বৈত আশ্রমে ছিল, কোন কারণে মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। তখন শীতকাল। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সে লাটু মহারাজের শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল। মহারাজ তাহাকে আশ্রয় দিলেন।

মায়ের স্মৃতি

(এক)

শ্রীসুশীলকুমার সরকার

আজ মনে পড়িতেছে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালনের কথা। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতে কাজ করি ই, আই, রেলওয়ের হেড্ অফিসে। ১৯০৫ সালের বাসন্তী অষ্টমীর দিন মায়ের কৃপালাভ করিয়াছিলাম। মা তখন কলিকাতার বাগবাজার ষ্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়ীতে থাকিতেন। কলিকাতায় তাঁহার সহিত বিশেষ কথাবার্তা বলার সুবিধা হইত না। মনে বড় কষ্টবোধ করিতাম। গুরুভ্রাতাদের ও বন্ধু-সন্ন্যাসীদের কাহাকেও কাহাকেও মনের এই আক্ষেপের বিষয় জানাইলাম। তাঁহারা বলিলেন, মা যখন জয়রামবাটীতে থাকিবেন সেখানে জো সো করিয়া একবার যাইবেন, সেখানে গিয়া দেখিবেন, তিনি যেন অন্য এক মা অর্থাৎ মা কলিকাতায় যেন শ্বশুরবাড়ীতে আসার মত থাকিতেন—বধূর মত, আর জয়রামবাটীতে তাঁহার বাপ-মার বাড়ীতে যখন থাকিতেন, তখন ঠিক ঘরের মেয়ের মত। সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

১৯০৭ সালে বড়দিনের পূর্বে মা জয়রামবাটীতেই আছেন; আমিও বড়দিনের সময় ৮।৯ দিনের জন্য অফিসে ছুটি পাইব। সংকল্প করিলাম এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। কয়েকজন বন্ধুর নিকট প্রস্তাব করায় তাঁহারাও আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে সময় প্রায় প্রত্যহই অফিসের পর মাষ্টারমহাশয়ের (শ্রীম) নিকট যাইতাম। মাষ্টার-মহাশয়ের নিকট এই শুভসংকল্প জানাইতে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া নিরতিশয় উৎসাহ প্রদান করিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজও শুনিয়া খুব উৎসাহ দিলেন। রওনা হইবার পূর্বে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে বলিলেন। আরও বলিলেন, তোমরা জয়রামবাটীতে এবার মায়ের জন্মতিথি পালন করবে। শুনিয়া আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম, কেননা এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। পূজনীয় মাষ্টার-মহাশয়কে জানাইতে তিনি বলিলেন,—ও সব আপনাদের ভাবতে হবে না, মা-ই সব করিয়ে নেবেন।

২৪শে সকালের গাড়ীতে আমাদের যাত্রা করিবার দিন। ২৩শে অফিসের পর পূজনীয় শরৎ মহারাজের সহিত দেখা করিলাম। তিনি ফল, ময়দা, মিষ্টি, কপি ও একখানা কাপড় গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন ও দশটি টাকাও দিলেন। মেসে ফিরিয়া দেখি পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনিও উৎসবের ব্যয়ের জন্য দশ টাকা আমার হাতে দিলেন। আমি ও তিন বন্ধু (প্রবোধচন্দ্র দে, মণীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মিত্র; মণীন্দ্রবাবুর বাড়ী আরামবাগ) ২৪শে সকালে হাওড়া স্টেশন হইতে তারকেশ্বরের গাড়ী লইলাম। কয়েকঘণ্টার মধ্যে তারকেশ্বর পৌঁছিলাম এবং বাবা তারকনাথকে দর্শনাদি করিয়া পদব্রজে রওনা হইলাম। পথে নৌকাযোগে একটি নদী পার হইতে হইল। মায়ের জীবনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত বিখ্যাত তেলোভেলোর মাঠ পার হইয়া আমরা যখন আরামবাগে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আমরা জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা হইলাম। কামারপুকুর পৌঁছিলাম বেলা প্রায় নয়টায়। ঠাকুরের বাড়ীতে প্রণামাদি করিয়া জয়রামবাটী পৌঁছিতে সাড়ে দশটা বাজিল। জয়রামবাটী গ্রামে প্রবেশ করিতেই প্রবোধবাবু গান ধরিলেন—

"কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে নে কোলে তুলে,
কত কাদা মেখেছি গায়, কত কাঁটা ফুটেছে যে পায়
কত পড়ে গেছি, গেছে চলে যে ছিল যেথায়।"
ইত্যাদি—

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এখানে মা আমাদের অবগুণ্ঠনাবৃতা নন। সস্নেহে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

যে সব জিনিসপত্র আনিয়াছিলাম সব তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম,—মা, পরশু আপনার জন্মতিথি, তাই শরৎ মহারাজ এই সব জিনিসপত্র ও টাকা পাঠিয়েছেন। আমাদের বলে দিয়েছেন আপনার জন্মতিথি পালন করতে। আর মাষ্টার মহাশয়ও ঐ জন্য এই টাকা দিয়েছেন।

আমরা যৎসামান্য কিছু কিছু প্রণামী মায়ের চরণপ্রান্তে রাখিতেই মা একেবারে ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—তোমরা কোথায় পাবে, তোমাদের এসব কেন? বাস্তবিকই আমাদের তখন সামান্য চাকরি ছিল। পরে মা আমাদের বাহিরে বিশ্রাম করিতে বলিলেন ও একটু পরেই মুড়ি ও মিষ্টি জলখাবার পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের স্নান হইয়া গেলে মা আমাদিগকে আহারের জন্য ডাকিলেন। আমরা মায়ের প্রসাদ না পাইয়া আহার করিতে অস্বীকার করায় বলিলেন,—তোমরা কাল থেকে এত কষ্ট করে এসেছ, এখন খেতে বস, আমি প্রসাদ পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মা কিছু পরে একটি বাটিতে করিয়া দুধমাখা ভাত পাঠাইয়া দিলেন।

তিথিপূজার দিন কাজকর্মের সাধারণ ব্যবস্থা হইয়া যাইবার পর মা আমাদিগকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন ও একেএকে তাঁহার শোবার ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। প্রথমে ডাক পড়িল আমার। যাইয়া দেখি মা তক্তাপোশের উপর বসিয়া নীচে পা ঝুলাইয়া আছেন—শরৎ মহারাজ যে কাপড়খানা পাঠাইয়াছিলেন উহা পরিয়া। আমি প্রণাম করিতেই মা ফুল দেখাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম এবং আনন্দে বিভোর হইয়া যেন এক নেশার ঘোরে বাহিরে আসিলাম। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে বিভোরাবস্থা যে যায় নাই তা বেশ মনে পড়ে। ক্রমে ক্রমে বন্ধুবর্গের প্রণাম ও পূজাদি হইয়া গেল। গ্রামের লোকেরা আসিতে লাগিল। কুটনো কোটা, জল আনা, রন্ধনাদি চলিতেছে। সব দিকে মায়ের প্রখর দৃষ্টি।

রাত্রি প্রায় সাড়ে ৬টায় রন্ধনকার্য শেষ হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের আসন হইল এবং পরে অন্য সবার। সকলে প্রসাদ পাইবার সময় মায়ের যে কি আনন্দ তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি অনুভব করিতে পারিবেন না।

মায়ের সঙ্গে একলা বসিয়া একটু কথা বলি এই আকাঙ্ক্ষা আমার বহুদিন হইতেই ছিল কিন্তু কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় নাই এবং এজন্য বড় বেদনা অনুভব করিতাম। এমনকি মনে মনে কখনও কখনও অভিমান হইত। আমরা গরীব সন্তান আমরা সর্বদা যাওয়া আসার সুযোগও পাই না, তবে কি কলের পুতুলের মত দীক্ষা নিলাম, প্রণাম করিলাম, প্রসাদ পাইলাম—ব্যস্। এর উদ্দেশ্যই বা কি? পরিণামই বা কি?—ইত্যাদি নানারূপ তরঙ্গ মনকে আলোড়িত করিত। উক্ত তিথিপূজার একদিন পর আমার সর্দি লাগিয়াছে মা খবর পাইয়া আমাকে স্নান করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। আমার বন্ধুরা স্নান করিতে চলিয়া গেলে একটু পরেই মা আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকাইলেন। আমাকে নীচে বসিতে বলিয়া তিনি তক্তাপোশের উপর বসিলেন এবং বলিলেন,—কি বাবা, তোমার কথাটা কি বল দেখি! আমি তো অবাক! হঠাৎ মনে হইল, তাহা হইলে মা সত্যই অন্তর্যামিণী। তিনি তো আমার মনের কথা সবই জানেন দেখিতেছি। চোখে জল আসিল। মাকে বলিয়া ফেলিলাম,

"মা, কলকাতায় থাকতে আপনাকে প্রণাম করতে যাই আর কত আশা করি যদি একটি কথা বলেন। তা কচিৎ একটা কথা বলেন কিনা, দর্শনের আনন্দ ও একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাহির হয়ে আসি। আর ভাবি, তাহলে আমি কি মার অপদার্থ ছেলে, আমার কথা কি মার মনে আছে? তাঁর কত ধনী, জ্ঞানী, মানী, গুণী, ত্যাগী ছেলে! এই সব সাত পাঁচ কত কী চিন্তা আসে।" সব শুনিয়া মা আমাকে এমন একটি কথা বলিলেন যাহাতে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ হইয়া গেলাম ও কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, আমি এক নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া মার চরণে মস্তক রাখিয়া এক ভাবরাজ্যে চলিয়া গেলাম এবং কিছুক্ষণ পরে এক নূতন উন্মাদনা লইয়া বাহিরে আসিলাম।

এইরূপে বাহিরের ঘরে একাকী কতক্ষণ বসিয়া আছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, পাড়ার কোনও মহিলার সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে মা বলিতেছেন, "দেখ, আমার মা দুঃখ ক'রে বলতেন, সারদার আমার একটিও ছেলে হ'ল না। আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি দেখে কত খুশী হতেন। আজ আমার কত ছেলে! তারপর এক জনের যদি পাঁচটি ছেলে হয় তাহলে পাঁচটি পাঁচ রকমের হয়, আর আমার ছেলেরা সব নিখুঁত—সব সোনার চাঁদ।" মার এই উক্তিটি আমি মঠের অনেক সাধু ও গুরুভ্রাতার সামনে বলিয়াছি।

এইবার আমাদের ফিরিয়া আসার পর্যায়। এই কয়দিন সকালে সন্ধ্যায় মার সঙ্গে মন খুলিয়া নানারূপ কথাবার্তায় মহানন্দে কাটিয়া গেল। স্থির হইল আমরা ৩০শে ডিসেম্বর সকালে পুনরায় ঐ পথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিব। মা বলিয়া দিলেন আমরা ঐ দিন যেন কামারপুকুরে রাত্রিবাস করিয়া যাই। উক্ত ৩০শে সকালে আমরা অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ৯।৯½ টার সময় মার পদধূলি ও আশীর্বাদ লইয়া কামারপুকুর রওনা হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া সামনের দিকে যেন আর পা যায় না। মাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চায় না। এ কী হইল! ১½ বৎসর বয়সে পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গর্ভধারিণীর স্নেহে লালিতপালিত, দুনিয়ায় তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানিতাম না। কিন্তু এ কী হইল! এ মা যেন তাঁহাকেও ছাড়াইয়া যাইতেছেন! একবার মনে হইল, বন্ধুদের চলিয়া যাইতে বলি, আমি কিছুদিন পরে যাইব। কিন্তু office, কর্তব্য মনে পড়িল। এক রকম জোর করিয়া মন বাঁধিলাম। ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। মা কিন্তু দরজার সামনে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়াই আছেন—যতদূর দেখা যায় মা আমাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াই আছেন। আমরা দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত মা একই-ভাবে আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। আমিও যন্ত্রচালিতের মত অগ্রসর হইলাম। সেই স্বর্গীয় আনন্দের স্মৃতি ও দৃশ্য বর্ণনা করা আমার সাধ্য নাই। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। মা, ধন্য তোমার করুণা! ধন্য আমার কুল, ধন্য আমার জনকজননী যাঁদের পুণ্যফলে আজ এই অসীম করুণাময়ী জগজ্জননীর সন্তানপদবাচ্য হইয়াছি।

আমরা কামারপুকুরে আসিয়া রাত্রিবাস করিয়া পরদিন আরামবাগ ও তারকেশ্বর হইয়া সন্ধ্যায় কলিকাতা পৌঁছিলাম। পরদিন সকালে উদ্বোধনে গিয়া মার প্রদত্ত প্রসাদ পূজনীয় শরৎ মহারাজকে দিয়া মার তিথিপূজা-সংক্রান্ত সমুদায় বর্ণনা করিলাম। তিনি সব শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীমার প্রসাদ দিলাম ও ঘটনাবলী বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "ধন্য আপনারা!"

(দুই)

শ্রীআশুতোষ সেনগুপ্ত

খ্রীঃ ১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দজীর (খোকা মহারাজ) শুভ পদার্পণে বরিশালের ভক্তগণ আনন্দে ভরপুর। আমি তখন বি-এম কলেজের ছাত্র, স্থানীয় মিশনে যাতায়াত করি। পূজনীয় খোকা মহারাজের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল, তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। পরবর্তী বৎসর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের উৎসবে বেলুড় মঠে যাই। ইহাই আমার কলিকাতা অঞ্চলে প্রথম যাওয়া। মঠে পূজনীয় খোকা মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন,—সাধারণ উৎসবের পরে যাবে। (সে সময় স্বামীজীর তিথিপূজার দিন তাঁহার তিথি-উৎসব এবং পরবর্তী রবিবারে তাঁহার 'সাধারণ উৎসব' সম্পন্ন হইত।) তদনুযায়ী আমি কয়েকদিন মঠেই রহিয়া গেলাম। পূজনীয় খোকা মহারাজের খাটের পার্শ্বেই একটি চৌকিতে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

একজন সন্ন্যাসীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে কথা হইল। রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দজী) তখন ব্রহ্মচারী, মঠেই থাকেন। তাঁহার সহিত একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী গিয়া তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম ও মনে মনে পাঠ করিলাম—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

জনৈক সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার কথা ও এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। মন্ত্রট আমার পূর্ব হইতেই মুখস্থ ছিল। প্রণামকালে করুণাময়ী শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে আসনে উপবিষ্টা ছিলেন —মনে হইল যেন যোগযুক্তা।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া ঠাকুরঘরেই একপাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। মা তাঁহার খাটের উপর শ্রীপদ ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। রাসবিহারী মহারাজ তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া আস্তে আস্তে কি যেন বলিলেন। "খোকা মহারাজ ব'লে দিলেন" —এই কথাটি আমার কানে পৌঁছিলে মনে করিলাম যে আমার কথাই হইতেছে। পরে শুনিলাম করুণাময়ী বলিলেন, কালকে হবে। কিছুক্ষণ পরে রাসবিহারী মহারাজের সাথে নীচে নামিয়া আসিলাম। রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেই প্রসাদ গ্রহণ ও থাকা হইয়াছিল।

পরদিন যথারীতি গঙ্গাস্নান করিয়া প্রস্তুত রহিলাম। একজন সাধু আমাকে সময় মত ডাকিয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলাম করুণাময়ী পূজার আসনে উপবিষ্টা, নিকটে একখানা আসন পাতা। আদিষ্ট হইয়া আমি ঐ আসনে বসিলাম। করুণাময়ী আমার হাতে একটু জল দিয়া বলিলেন,—আচমন কর। আমার বিলম্ব দেখিয়া ঐ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া নিজের হাতে একটু জল লইয়া প্রতিবারে শ্রীবিষ্ণু বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তিনবার ঐ জল নিজের মুখের মধ্যে ছিটাইয়া দিয়া আমাকে ঐরূপ করিতে আদেশ করিলেন। আমি যথাযথ আদেশ পালন করিলে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করাইলেন—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।

মন্ত্রটি আমার পূর্বে জানা ছিল না। যাহা হউক একবার শুনিয়াই মুখস্থ হইয়া গেল। অতঃপর মা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। * * * মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলাম। * * *

অতঃপর করুণাময়ী বলিলেন,—ঠাকুরের কাছে বল, 'ঠাকুর, আমার ইহপরকালের পাপ তুমি গ্রহণ কর।' তাঁহার আদেশমত এবার মুক্তকণ্ঠেই বলিলাম,—ঠাকুর, আমার ইহপরকালের পাপ তুমি গ্রহণ কর। একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলে

শ্রীশ্রীমা উহা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। প্রণাম করিয়া মায়ের পবিত্র চরণকমল ললাটে ও বক্ষে ধারণকালে মা বলিলেন, ব্যথা, ব্যথা! মূঢ় আমি ঐ কথায় তখন কর্ণপাত করি নাই, যদিও আমার জানা ছিল যে মায়ের পায়ে বাত। করুণাময়ী তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন। শুনিলাম, গোলাপ-মা আস্তে আস্তে বলিতেছেন, গুরুর পা রুমাল দিয়ে মুছে নিতে হয়। আমি মূঢ়, তাই ইহ ও পরকালের পাপগ্রহণ, ব্যথা, কোন কথাই তখন বুঝি নাই। তাই আজ সতত হৃদয়ে বাজে, "ব্যথা, ব্যথা!" মার ব্যথার প্রতিদানে করুণাময়ী আমার মাথায় পদ্মহস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন,—ভক্তিলাভ হোক্।

*　　　*　　　*

দীর্ঘদিন কাটিয়া গেল। সংসারে প্রবেশ করিয়াছি। বিবাহের দুই বৎসর পর গর্ভধারিণী জননীকে হারাইলাম। পিতৃবিয়োগ হয় কৈশোরে। নানারূপ সাংসারিক অশান্তি চরমে উঠিয়াছে। বরিশাল জেলার একটি গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা করি। স্ত্রীর হিষ্টিরিয়া রোগ। বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে তাহার পিতা লইয়া যান। পূজার বন্ধে স্ত্রীকে দেখিতে যাইয়া শুনিলাম স্ত্রী কোন দেবতার কবচ পাইয়াছে ও মন্ত্র লওয়ার জন্য কোন দেবতা নির্দেশ দিয়াছেন। সকল ব্যাপারই তাহার মূর্ছাকালীন হইয়াছিল। আমি নিজেও অনুরূপ কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিলাম। পূজার বন্ধের পরে কর্মস্থল হইতে রাসবিহারী মহারাজের কাছে সব কথা জানাইলাম। তাঁহার উপদেশমত পত্রে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাকে লিখিলাম যাহাতে স্ত্রী তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারে। অহেতুক করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা অনুমতি দিলেন। পত্র পাইয়া উল্লসিত প্রাণে বড়দিনের ছুটির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং যথাসময়ে স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা আসিয়া বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র বাসায় উঠিলাম। বৈকালে রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি আমাকে করুণাময়ীর চরণসমীপে লইয়া গেলেন। প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইলে শুনিলাম রাসবিহারী মহারাজের কথার উত্তরে করুণাময়ী বলিলেন,—কালকে হবে। পরদিন যথারীতি গঙ্গাস্নানের পর স্ত্রীকে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র চরণ-সমীপে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া নীচে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নির্বিঘ্নে স্ত্রীর দীক্ষা হইয়া গেল। দেখিলাম তাহার খুব পরিতৃপ্তি লাভ হইয়াছে। তাহাকে শ্রীশ্রীমা মা বলিয়াছিলেন,—তোমার স্বামীকে যাহা দিয়াছি তোমাকেও তাহাই দিই। করুণাময়ী কতগুলি নির্মাল্য স্ত্রীর কাছে দিয়া বলিয়াছিলেন,—ইহা তোমার স্বামীকে দিও। একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার স্ত্রীর তখন স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা (অসুখ খুব বেশীই হইয়াছিল ও প্রায়শই মূর্ছা হইত) ছিল তাহাতে তাহার পক্ষে কোন কাজকর্ম করিতে পারা তো দূরের কথা তাহাকে কলিকাতা নিয়া আসাও সমস্যাপূর্ণ ছিল। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ কোন কথাই তখন মনে হয় নাই এবং স্ত্রীরও পথে বা কলিকাতা থাকাকালে রোগের কোন আক্রমণ হয় নাই। ক্রমে তাহার অসুখ সারিয়া গিয়াছিল।

পরবর্তী দিন বরিশাল এক্‌স্‌প্রেসে দেশে যাওয়া স্থির হইল। গঙ্গাস্নান করার পরে আমি একাই করুণাময়ীর চরণদর্শনে যাই। উপরে গিয়া দেখিলাম, রাজরাজেশ্বরী স্বীয় পালঙ্কে উপবিষ্টা—চরণযুগল ভূমিসংলগ্ন। দৃষ্টির মধ্যেও কেহ কোথাও নাই। রাজরাজেশ্বরী বরদা মূর্তিতে অবস্থিতা। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকালীন মনে মনে বলিলাম,—মা, তোমার কাছে কি চাইতে হবে ব'লে দাও। (মনে মনে সব সময়ই করুণাময়ীর সঙ্গে তুমি করিয়া কথা বলি) প্রণামের পরে নতজানু

হইয়া যুক্তকরে প্রাণ ভরিয়া সম্বোধন করিলাম,—মা! স্নেহ-বিগলিতকণ্ঠে করুণাময়ী উত্তর দিলেন,—কি?

* * *

মা।—ওঁর (ঠাকুরের) নামেই সব হবে।

বাংলা ১৩২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা আসিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমাকে চিকিৎসার্থ জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আনানো হইয়াছে। শরীর বিশেষ অসুস্থ, সেই বৎসরই শ্রাবণ মাসে মহামায়া লীলাসংবরণ করেন। জননীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকলের মনেই বিষাদ। মায়ের শরীর বিশেষ অসুস্থ হইলেও শ্রীচরণদর্শনে বঞ্চিত হইলাম না। সকালের দিকে একটু বেশী বেলায় করুণাময়ীর পুণ্য-দর্শন মিলিল। এবারে দ্বিতলে অন্য প্রকোষ্ঠে দেখিয়াছি। পূর্বপূর্ব বারে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরেই দেখিয়াছি। এইবারে প্রথমতঃ দেখিলাম মা অবগুণ্ঠনাবৃতা। গোলাপ-মা তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—ছেলেমানুষ গো, মা, ছেলেমানুষ। তৎক্ষণাৎ দেখিলাম পূর্বপূর্ব বারের ন্যায় সীমন্ত পর্যন্ত কাপড়, হস্তদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশও অনাবৃত। খাটের উপরে পা ছড়াইয়া একটি শিশুকে কোলে লইয়া বামহাতের তলায় শিশুটির মস্তক ও তাহার বক্ষদেশে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া দুলাইয়া দুলাইয়া করুণাময়ী শিশুটিকে আদর করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তর নতজানু হইয়া যুক্তকরে বসিলে স্নেহসিক্তস্বরে জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভালো আছো?—হাঁ, বলিয়া উত্তর দিতেই করুণাময়ীর সঙ্গিনীগণ আমি যাহাতে আর বিলম্ব না করি তদ্রূপ নির্দেশ দিলেন। বুঝিলাম জননীর শারীরিক অসুস্থতার জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছিল। সুতরাং আর বিলম্ব করা সম্ভব হইল না। আমার দিকে পরিষ্কারভাবে তাকাইয়াই কুশলপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিলাম শ্রীবদনে কোন অসুস্থতার চিহ্ন তো নাইই, অধিকন্তু সেই অলৌকিক মুখশ্রী ও নয়নযুগলের অভিনব ভাব বর্ণনা করিতে আমার লেখনী অক্ষম, ভাষা মূক।

"সত্যিকারের মা"

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

আঁধারে যখন ঢাকিল ধরণী, নীরবে চরণ ফেলে
নব প্রভাতের সূচনা লইয়ে জননী তুমি গো এলে।
জড় নিদ্রায় মগ্ন চিত্ত তন্দ্রাজড়িত চোখে
তব আগমন-পদধ্বনিতে চাহিল জ্যোতির্লোকে।
সহসা দেখিল জননী তোমায়, স্নিগ্ধ মাতৃরূপে,
অভয় করেতে করুণাপাত্র অঞ্চলে ঢাকি চুপে—
সিঞ্চিয়া দিতে এসেছ নামিয়া অমরার গৃহ ছেড়ে
সবাকার ব্যথা, দুঃখের জ্বালা, জননী-হৃদয়ে হেরে।
শুভ্রশুচিতাস্পর্শে নাশিছ কলুষ কালিমা যত,
অসুর-দম্ভ চরণের তলে সভয়ে রয়েছে নত।
সকল মহিমা আবরণে ঢাকি, সাজি সাধারণ মেয়ে
দীনের কুটীরে এসেছ জননী, দীনের তনয়া হয়ে॥
অন্যায় দেখি দীপ্ত আঁখিতে মৃদু ভর্ৎসনা করি,
পরক্ষণেতে আবার ক্ষমিয়া, সাদরেতে কর ধরি,
কত আশ্বাসে, অভয় জানায়ে, স্নিগ্ধ কোমল স্বরে
বলেছ, "মা আমি সত্যিকারের, তোদের ভাবনা কিরে?"
দিবস-যামিনী সন্তান লাগি ব্যাকুল চিন্তাধারা,
তোমারে ঘেরিয়া রহিয়া রহিয়া করেছে আপনা হারা।
ঘুচাইতে ব্যথা, সকলি ত্যজিয়া, শুধু সবাকার তরে,
কত ভাবে তুমি করিয়াছ সেবা কল্যাণ ছুটি করে।
দেশ জাতিভেদ কিছু নাহি রাখি স্থানকাল নাহি বাছি
অকাতরে তব অহেতুক কৃপা সবারে দিয়াছ সেঁচি।
সত্যিকারের ওগো মা আমার কল্যাণময়ী অয়ি!
জননী সারদা! জ্ঞানপ্রদায়িনী শ্রীরামকৃষ্ণময়ী!

জননী জগদ্ধাত্রী

স্বামী ক্ষমানন্দ

আশ্বিনের সুমঙ্গল মহানবমীর নবীন উষায় শ্রীশ্রীদুর্গার শুভ আবির্ভাবে আমরা যে দিব্য আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলাম উহাতে পুনঃ পুনঃ সুস্নাত হইবার জন্য কোজাগরী পূর্ণিমা ও দীপান্বিতা অমানিশায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই পরাশক্তির আরাধনার আয়োজন। এই নিত্য অস্তিত্বকে পুনরায় নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার জন্যই ঠিক এক মাসের ব্যবধানে, কার্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে পুনরায় তাঁহার আগমন-গীতি দশদিক ভরিয়া তুলিল। পশুশক্তির পরাভবে মূর্তিমতী ব্রহ্মবিত্তা সিংহপৃষ্ঠে আবির্ভূতা হইলেন চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রীরূপে।

ধাত্রী মাতা সমাখ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে।
ব্রহ্মাণাঞ্চৈব লোকানাং নাম ত্রৈলোক্যধাত্রিকা ॥
যস্মাদ্ধারয়তে লোকান্ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ।
ডু ধাঞ্ ধারণে ধাতুর্জগদ্ধাত্রী মতা বুধৈঃ ॥
(দেবীপুরাণম্)

ধাত্রী সন্তানবৎসলা জননী। সাদরে সকলকে বক্ষে ধারণ—স্বীয় পীযূষদানে পরিপালন করেন বলিয়াই তিনি জগন্মাতা। ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। নিখিল বিশ্ব ধারণ করিয়া সকলকে জীবিকাদানে পরিপোষণ করিতেছেন বলিয়া সুধীবৃন্দ তাঁহাকে জগদ্ধাত্রী বলিয়া থাকেন। শ্রীচণ্ডীতে (১।৭০) ইনিই স্থিতিসংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার অশুভনাশিনী—ভীষণ মূর্তির অন্তরালেই যে সেই জগৎপাবনী মাতৃমহিমা বিকাশ পায় এমন নয়, অধিকন্তু উহার মাধুর্য ফুটিয়া উঠে—আমাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও অজ্ঞানতা দূরীকরণে। ইহাই বেদান্তবেদ্য অজ্ঞাননিরোধক আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি বা সস্বরূপানন্দে অবস্থিতি। এই যুগ্মলীলা-কাহিনী বেদ, তন্ত্র ও পুরাণাদিতে বহুধা সমর্থিত।

ইন্দ্রাদি দেবতারা কল্পান্তস্থায়ী। পদাধিকার বলে তাঁহারা সৃষ্টির শৃঙ্খলা-বিধানে নিযুক্ত হন। এমনই কোন এক কার্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে নবীন উষার আহ্বানে ত্রেতাযুগের প্রথম অরুণোদয় হইল। ইহার প্রারম্ভিক উৎসবে নিজ নিজ কর্তব্য কার্যে অধিষ্ঠিত দেববৃন্দের মুখমণ্ডলে কর্তৃত্বের পরিতৃপ্তি। তাঁহাদের সমগ্র সত্তা বিজয়গৌরবে আচ্ছন্ন এবং নিজেরাই ঈশ্বর-পদবাচ্য এই চিন্তায় অহংকৃত। ঠিক এমনই সময়ে তাঁহাদিগকে বিমূঢ় করিয়া অদূরে আবির্ভূত হইল পর্বতোপম এক তেজঃপুঞ্জ। অসংখ্য সূর্যের কিরণমণ্ডিত হইলেও উহা চন্দ্রকোটি-সুশীতল। দুর্নিরীক্ষ্য বটে কিন্তু অসহনীয় নয়। ভীত চকিত দেবমণ্ডলীর মধ্যে বায়ু বয়োজ্যেষ্ঠ,—মহাকাশ হইতে তাঁহারই প্রথম অভ্যুদয়।[১] তিনি উহার স্বরূপ জানিবার জন্য আসিতেই জ্যোতির মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল—কে তুমি? আমি মাতরিশ্বা। তাঁহার বিধিসম্মত কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করিবার সাহস কাহার থাকিতে পারে এই চিন্তা তাঁহার মনে আসামাত্রেই পুনর্জিজ্ঞাসা—কি তোমার—বীর্যবত্তা ও কর্মকুশলতা? প্রভঞ্জন-রূপ দেখাইয়া বায়ু তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমনই সময়ে একটু তৃণখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইল তাঁহার সম্মুখে। উহাকে স্থানচ্যুত করিতে পার? সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিয়াও ব্যর্থকাম বায়ু ফিরিয়া আসিলেন অবনতমস্তকে। অগ্নিরও অনুরূপ দশা হইল। এবার ইন্দ্রের পালা। সকলে ব্যর্থকাম হইলেও—তিনি নিশ্চয়ই উহার ইতিবৃত্ত জানিতে পারিবেন—এই বিশ্বাস ও ভরসা তাঁহার ছিল।

১ কাত্যায়নী-তন্ত্রে এই মত সমর্থিত, কিন্তু কেনোপনিষৎ ও দেবীভাগবতে অগ্নিই পুরোবর্তী হইয়া উহা জানিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্রেই উহা অন্তর্হিত হইল। দেবরাজ বলিয়া তাঁহার এই অভিমান থাকা স্বাভাবিক, প্রথমেই তাহা ব্যাহত হইল। পূর্বানুগদের ন্যায় তিনি না ফিরিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই পূজাস্পদের স্বরূপ জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি আকাশমার্গে আবির্ভূতা হইলেন বহুশোভমানা হৈমবতী উমা—ধৃতবিগ্রহবতী ব্রহ্মবিদ্যা; তাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধি প্রসূত আত্মজ্ঞান। ইন্দ্রের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা প্রাদুর্ভূতা হইলেন সুবর্ণভূষণে বিভূষিতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্তা হিমাচলসুতা ভগবতীরূপে। আচার্য সায়নের ভাষ্যেও ইহারই অনুরূপ প্রতিধ্বনি, আরও দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট ভাষায়—হিমালয় কন্যা গৌরীই উমা এবং ইহার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে কোন্ বিশেষ মূর্তি যে তিনি ধারণ করিয়াছিলেন উহার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা উক্ত গ্রন্থাদিতে পাই না। সেটির সন্ধান পাওয়া যায় বেদোত্তর কাত্যায়নী তন্ত্রে—

> তেজস্যান্তর্হিতে তস্মিন্ চমৎকারকলেবরে।
> মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্বালঙ্কারভূষিতা ॥
> চতুর্ভুজা মহাদেবী রক্তাম্বরধরা শুভা।
> বালার্কসদৃশী দেহা নাগযজ্ঞোপবিতিনী ॥
> ত্রিনেত্রা কোটিচন্দ্রাভা দেবর্ষিমুনিসেবিতা।
> দর্শয়ামাস দেবানামেবং রূপং জগন্ময়ী।
> ততস্তাং তুষ্টুবুর্দেবা জগদ্ধাত্রীং জগন্ময়ী ॥

সেই তেজোরাশিকে স্তিমিত করিয়া কোটি-চন্দ্রপ্রভাময়ী ও রক্তিমাভ অনিন্দ্য মূর্তি ধারণ করিয়া ত্রিনয়না চতুর্ভুজা মঙ্গলময়ী মহাদেবী, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মুনিদের দ্বারা অভিনন্দিতা হইয়া সহাস্যবদনে আবির্ভূতা হইলেন। পরিধানে তাঁহার রক্তবস্ত্র, সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য, গলদেশে সর্পের উপবীত এবং তিনি সিংহপৃষ্ঠে সমাসীনা। এই পরমকল্যাণদাত্রী দেবী জগদ্ধাত্রীকে জগতের মূলাধার বলিয়া জানিতে পারিয়া দেববৃন্দ প্রণত হইলেন, তখনই তাঁহাদের অহমিকার বিলুপ্তি ও নিঃশ্রেয়স আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল। তাঁহাদিগকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মহামায়ার এই সকল প্রচেষ্টা, আর উহা না হইলে লোকপাল বা গণনেতাদের জীবনে উদার দৃষ্টি বা ব্যবহারে নিরপেক্ষ চিন্তাধারা আসিতে পারে না, ফলে তাঁহাদের উপযোগিতাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও দেবীপ্রতিমায় সিংহনিপীড়িত হস্তী দৃষ্ট হয়। উহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (১৷৬৷৩) উক্ত হইয়াছে: 'জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, জগৎ নষ্ট হ'য়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। * * * মন মত্ত করী, সিংহবাহিনীর সিংহ তাই জব্দ করছে।'

ইহার সমর্থনে একটি কিংবদন্তী শুনা যায়। হিমালয় হইতে অবতরণকালে গঙ্গা পর্বতের গুহায় আবদ্ধ হইলেন। তিনি ভগীরথকে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার ঐরাবতের সাহায্যে নির্গমনের পথ করিয়া দিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। স্বীয় ক্ষমতায় সমধিক সচেতন ঐরাবত পথিমধ্যে এক অত্যন্ত অশোভন প্রস্তাব করিল। ইহা জানিয়াও সকলের কল্যাণের জন্য দেবী এই অমর্যাদা অঙ্গীকার করিলেন কেবলমাত্র একটি শর্তে। তাঁহার জলকল্লোলের তিনটি প্রবাহপাতে সে অবিচলিত থাকিতে পারিলে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কোন অন্তরায় থাকিবে না। অবতরণ-পথ সুগম হইল। সেই জলস্রোত সব কিছুকে প্লাবিত করিয়া দুর্বার বেগে বহিয়া চলিল। নিমজ্জনোন্মুখ ঐরাবত সেই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে এবং স্মৃতি-বিলুপ্তির পূর্বমুহূর্তে মাতৃচরণে ঐকান্তিক আত্মনিবেদন করিল। মাতৃনামের আমিষশক্তি। সঙ্গে সঙ্গে

সেই কালস্রোতকে প্রশমিত করিয়া অনুপম এক মাতৃমূর্তি তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে কিন্তু এই মাতৃত্বের অবমাননাকারীর দেবরাজ্যে স্থান হইল না। ইন্দ্রের শাপে সে তথা হইতে নির্বাসিত হইল এবং পৃথিবীতে আসুরিক বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। পুনরায় ফিরিয়া যাইবার উপায় কোথায়,—দেবীবাহন সিংহের নখরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া সে পুনরায় পূর্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইবে। অশান্ত মনকরীকে যখন আমাদের বিবেকসিংহ সংযত করিতে সমর্থ হয় তখনই আমাদের অন্তরে চৈতন্যময়ী জগদ্ধাত্রীর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়। ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক এ এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। এই মূর্তিতে এ ভাব স্বতঃস্ফূর্ত ও অনায়াসলব্ধ, অনুস্থানে এই সব ভাবের আরোপ করিতে হয়।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জয়লাভের জন্য অর্জুনকে দুর্গাস্তব করিতে উপদেশ দিলেন। সর্বপ্রকারে স্তুতি করিয়াও তাঁহার আশা মিটিল না। তাই বলিলেন, ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাম্, বেদিত শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহের মধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা। দেবী প্রসন্ন হইয়া অর্জুনকে এই মহিমময়ী মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সেইজন্যই মনে হয় গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে "গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্" এই উক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্করত্ন তাঁহার গীতার দেবীভাষ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। "গীতায় জগদ্ধাত্রী মন্ত্র আরাধনা করিতেই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উপদেশ, সুতরাং জগদ্ধাত্রী মাতাই দুর্গা ও ব্রহ্মবিদ্যা। গীতাতেও যে জগদ্ধাত্রী-মন্ত্রের উপদেশ আছে তাহা গুপ্তভাবে আছে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে জগদ্ধাত্র্যা একাক্ষরী বিদ্যা লব্ধা" দেবী জগদ্ধাত্রীর একাক্ষর মন্ত্র পাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

দ দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে।
বিশ্বমাতা নাদরূপা কুর্বর্থো বিন্দুরূপকঃ॥

দ কার, উকার এবং বিন্দু এই তিনের মিলনেই এই 'দুঁ' মহামন্ত্র। সংক্ষিপ্তাকারে দ অক্ষরটি দুর্গাপদের বাচক। উ অর্থে রক্ষণ ওঁকারে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মের অব্যক্তরূপ প্রকাশ করিবার জন্য নাদের প্রতীকরূপে বিন্দুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এখানে উহা একই অর্থে প্রযুক্ত। অধিকন্তু ইহার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাত্মক সমুদয় কার্যের মূলীভূত কারণ হিসাবে ক্রিয়াবাচক 'কুরু' এই অর্থই প্রকাশ করে। ইহাদের দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, জগন্মাতা নাদময়ী অব্যক্তরূপিণী ব্রহ্মময়ী দুর্গা (তুমি আমাদের এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে) রক্ষা কর। অর্জুন যে সেই সময়ে এই মন্ত্র লাভ করিয়া জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই পূজার বিধান থাকিলেও কার্তিকের পূজা সমধিক প্রচলিত। সূর্য চন্দ্র ও ইন্দ্রাদি দেবতারা ইঁহার আরাধনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন এবং রাবণাত্মজ মেঘনাদেরও কার্তিকী পূজার প্রভাবে ইন্দ্রজিৎ হইবার কাহিনী তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পূজা সূর্যোদয় হইতে অস্তকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজায় তিন দিন ধরিয়া যে পূজার বিধান ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত ক্রম, এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার বিধান এখানে সূর্যোদয় হইতে তিন তিন প্রহরে বিভক্ত এবং আদ্য (প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন), মধ্য (অপরাহ্ণ পর্যন্ত) এবং অন্ত (সায়ংকাল অবধি) পূজা বলিয়া কথিত। শারদীয়া পূজার ক্রম এখানে অনেকাংশে অনুবর্তন করা হয়। দেবীর ধ্যানমন্ত্রে ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে নারদাদৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্—দেবর্ষি নারদ প্রমুখ মুনিগণ ত্রৈলোক্যবন্দিতা দেবীকে আরাধনা করিতেছেন কারণ তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করেন, এবং দেবী উহারই পরা বিগ্রহ বলিয়া তাঁহাদের ইষ্টস্থানীয়। এ জন্যই

সম্ভবতঃ এই পূজার যমি পংক্তির (জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু, গৌতম, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, শিব, নন্দীশ্বর, কহমিক ও স্থণ্ডিক) প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে হয়। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আমরাও এই দুর্লভ আত্মজ্ঞানের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—

"আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে॥"

আধার ও আধেয়রূপিণী, মেধা বা ধারণাশক্তিদায়িনী, সমূহকর্মফলবিধাত্রী, শাশ্বতপদগম্যা, স্থিরস্বভাবা, আত্মজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী, সনাতনী দেবী জগদ্ধাত্রীকে প্রণিপাত করি।

বৃন্দাবনের পথে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর পথ ঘুরে গেছে আজ পতন-অভ্যুদয়ে
ইতিহাস হোতে মুছে গেছে প্রিয় প্রাচীন দিনের লেখা।
ঘুমায়ে পড়েছে কি যেন কাহিনী অদূরে কালীয় দহে,
মনের পাতায় ফুটে আছে কার মসীকজ্জল রেখা!
বৌদ্ধ পাঠান তুর্কী মোগল এ পথে দিল কি হানা?
কালের জটায়ু-বিহগের কবে হেথায় ভেঙেছে ডানা!

পুরানো যুগের পুরাণের বাণী পাণ্ডার মুখে মুখে
ছায়াভরা বাটে কান পেতে শুনি, ধীরে ধীরে পথ চলি।
প্রেমের বন্যা বয়ে গেছে যেথা যমুনার কালো বুকে,
সেথায় নাহিক একটু নমুনা?—আছে শুধু কথাকলি!
কত না জীবন-নাট্যের হেথা যবনিকা পাত হোলো,
জীর্ণপুঁথির ছিন্ন পাতাটি সাবধানে আজ খোলো।

সঙ্গীহারানো পাখী গেছে উড়ে, নীড়ও হারালো জানি,
মৃত হয়ে গেছে মহা আকাশের হাজার হাজার তারা।
ভূগোলের সাথে ইতিবৃত্তের তবু শুনি কানাকানি,
রূপের মাঝারে অরূপের খেলা ধরায় বহিছে ধারা।
আমারে ডাকিছে বৃন্দাবনের তৃণ আর কিশলয়,
ওদের নাড়ীতে জড়ানো আমার পার্থিব পরিচয়।

মহাজীবনের স্মৃতিকাগারের পাষাণসমাধি-তলে
মসজিদ আর ভগ্ন প্রাসাদে স্মরণ-দ্বন্দ্ব আনে।
দুঃস্বপনের গহন তিমিরে কৌস্তুভমণি জ্বলে,
হাজার হাজার বছরের আগে কি ছিল কে-ই বা জানে!
আদিমথুরার আয়তন হোতে যমুনা গিয়েছে দূরে,
আদিগন্তের পটভূমিকায় কে গায় করুণ সুরে!

রাধাঋণ শোধ করিতে যে জন এসেছিল নদীয়ায়,
তারি খেলাঘর লীলাস্থলী যে ব্রজমণ্ডলে শোভে;
সেইতো দেখায়ে গেল অরণ্যে কোথা গোপীগণ গায়,
কোথা প্রেম বহে প্রভাতের সম প্রিয় আর প্রেয় লোভে;
মাঠের ভিতরে শুধায় আমারে মায়ার গোবর্ধন,—
রাধা-কুণ্ডেতে দেখেছ কি কারো মধুর আলিঙ্গন!

রাধাপ্রেমে সুর বংশীবটেতে উঠেছে একদা বুঝি?
নিকুঞ্জবনে তারি ঢেউ আজো দেয় কিগো দোল রাতে?
ভাবের পাগল হরিদাস স্বামী নিধুবনে যারে খুঁজি
সে কি গো গানের মালাখানি গাঁথে একা বসে
নিরালাতে?

হেথায় মীরার নয়নের বারি তুলেছে প্রাণের ঢেউ,
সেই সব দিন ফিরায়ে আবার—বলো, আনিবে
কি কেউ?

সন্ন্যাস ও কর্মযোগ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"কৃষ্ণ, তুমি একবার কর্মত্যাগের কথা আর একবার কর্ম করিয়া যাইবার কথা বলিতেছ। ঠিক করিয়া বল ইহাদের কোনটি শ্রেয়ঃ।"[১]

উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতার সময় পর্যন্ত সন্ন্যাস শব্দটির অর্থের ক্রমবিকাশ হইয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য কি? ইহা কি শুধু সন্ন্যাসীর চিহ্ন-ধারণ? এই তাৎপর্য যথাযথ না বুঝিবার দরুন অনেক বাদপ্রতিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের সময়েও সন্ন্যাস এবং কর্মের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার চলিতেছে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্ম এবং সন্ন্যাসের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদিত যে এই দুইটির মূলে একই প্রেরণা, অভিব্যক্তি শুধু আলাদা। শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন প্রণালী-গুলির সবই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে একটি নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়া সবগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। আজিকার দিনেও আমাদের বহু বিষয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তবে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন মহাপুরুষের প্রত্যক্ষানুভূতি, যদি এই ব্যাখ্যাগুলির পশ্চাতে থাকে তবেই উহা সকলের আকর্ষণীয় ও গ্রাহ্য হয় এবং সকলকে শক্তি দেয়, অন্যথা উহা তো শুধু বাক্যবিলাস।

মোগল-সাম্রাজ্যের যখন পতন হইল তখন বাদশাহী মোহরগুলিকে গলাইয়া আর্থিক লেন-দেনের জন্য নূতন ছাপ দিয়া চালু করিতে হইল। সেইরূপ প্রাচীন ভাবগুলিকে আজ নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সোনা অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা তো ঠিকই আছে।

এই নূতন দৃষ্টি দিতে পারেন কে? যিনি তত্ত্বকে জীবনে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের দেশে ঋষি হলেন নির্দেশদাতা। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধিৎসা নাই, অনাসক্তি এবং নিঃস্বার্থ লোকহিতই তাঁহার উপদেশের প্রেরণা। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন তিনি মন মুখ এক করিয়াছেন। এইরূপ লোককেই আমরা বিশ্বাস করি। নৈর্ব্যক্তিক এবং বিচার্য সত্য যখন এমন এক ব্যক্তিতে মূর্ত হইয়া উঠে যিনি ঐ সত্যের জন্যই বাঁচিয়া থাকেন এবং উহার জন্য মরিতেও প্রস্তুত তখনই বুঝিতে হইবে আমরা একজন যথার্থ পথপ্রদর্শক পাইয়াছি। সাম্প্রতিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি যাহা শিক্ষা দিতেন তাঁহার জীবন ছিল উহাদের মূর্ত বিগ্রহ। আর তিনি যে উপদেশ দিতেন উহা যে ব্যক্তিকে বলিতেছেন ঠিক তাহার উপযোগী হইত। লোককে নির্দেশ দিবার আগে তিনি তাহাদের প্রকৃতি এবং শক্তি পরীক্ষা করিয়া লইতেন। সকলের জন্যই একই আদর্শ তিনি কখনও উপস্থিত করিতেন না।

অধিকাংশ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম লইয়া ব্যাকুল। মুক্তি সকলের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইলেও কম লোকই উহার অনুসন্ধান করিতে পারে। এই বাস্তব জগৎকেই অহরহ আমাদের দেখিতে হয়। গীতা কি পন্থা নির্দেশ করেন? গীতার শিক্ষার লক্ষ্য দুইটি—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স। সামাজিক পটভূমিতে ব্যষ্টিগত সুখ যাহাতে হয় তাহাই অভ্যুদয়। আর নিঃশ্রেয়স এমন একটি অভাবের পরিপূর্তি যাহা সমাজের অতীত—যাহা মিটিলে মানুষ পূর্ণতা বা

১ সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।
(গীতা—৫।১)

মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 'ধর্ম'কে অবলম্বন করিয়া 'অর্থ' এবং 'কামে'র নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অভ্যুদয় আসে। 'ধর্ম' হইল একটি সমষ্টিগত চেষ্টা। সমাজকে বাদ দিয়া ব্যক্তির পক্ষে ইহা নিরর্থক। অতএব ধর্মের ধারণার মধ্যে জনগণের সুখ ও মঙ্গল অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু ইহাই মানবপ্রগতির শেষ কথা নয়। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দল বাঁধিয়া চলি কিন্তু আমাদের যাত্রাপথের অন্তিম ধাপে আমাদিগকে একাই চলিতে হয়। পথ যেন তখন সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই বা তিনজনে চলা সম্ভবপর নয়। একটি উত্তুঙ্গ শিখরদেশে আরোহণের কথা ধরুন। প্রথমে আমরা অনেকে একসঙ্গে উঠিযা চলি কিন্তু যত উপরে যাই তত দল পাতলা হইয়া আসে। সর্বোচ্চ শিখরে একজনের পিছনে আর একজনকে উঠিতে হয়, দল বাঁধিয়া আর অগ্রসর হওয়া চলে না। এখানে আর বন্ধুত্ব নাই। চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ যেন এই সর্বোচ্চ শিখর। এখানে সকলকে একক হইতে হইবে। এই একাকিত্ব বুঝিতে পারিলে এবং উহাতে ভয় না পাইলে আমরা জীবনের পরিপূর্ণতা কি বস্তু হৃদয়ঙ্গম করি। সমাজ শেষ কথা নয়, উহা অনন্ত-পথযাত্রী মানুষের চলিবার একটি ধাপমাত্র। সামাজিক জীবনের কোলাহল এবং দ্বন্দ্ব আমাদের মানসিক শান্তির ব্যাঘাত জন্মায়। সামাজিক জীবন আমাদের প্রকৃত জীবনের উপরের দিক্ মাত্র, জীবনের গভীরে উহা স্পর্শ করে না। সেই গভীরে রহিয়াছে আত্মার অক্ষোভ্য প্রশান্তি—উহাই মানুষের স্বরূপ—তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু সকলেই কি সেই লক্ষ্য পৌঁছিতে পারে, না পৌঁছিবার ক্ষমতা রাখে? সর্বোচ্চ পর্বতশিখরে আরোহণ কি সকলের জন্য? সেখানকার বায়ুমণ্ডল এত পাতলা যে অনেকেরই—শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। অতএব তাহাদের জন্য সামাজিক পরিবেশ 'অভ্যুদয়ের' ব্যবস্থা।

যাহা সর্বোচ্চ তাহা সর্বদাই নির্জন—যেমন গৌরীশৃঙ্গ। যাঁহারা জীবনের পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়াছেন—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ তাঁহারা নিঃসঙ্গ। তাঁহাদের পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্রের সহায়তার প্রয়োজন নাই। স্বকীয় মহিমায় তাঁহারা উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকেন। মানুষ তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের নিকট হইতে সান্ত্বনা ও সাহস পায়। হিমালয়ের হাওয়া যেমন সমতলভূমিতে নামিয়া আসে সেইরূপ এই সকল মহাপুরুষগণের অনুপ্রেরণা সমগ্র সমাজ-দেহে নূতন প্রাণের সঞ্চার করে। মোক্ষ সকলে লাভ করিতে পারে না বটে কিন্তু যিনি মোক্ষলাভ করিয়াছেন তিনি সমাজে বিপুল শক্তি সংক্রামিত করিয়া যান। এই জন্য সমাজনীতি অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে মোক্ষের আদর্শটি স্বীকৃত।

সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যিনি উঠিতে পারিয়াছেন তিনি জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন—তিনিই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখিবার অধিকারী। অতএব অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন শ্রেষ্ঠপন্থা কিনা, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস উভয়েই মানুষকে লইয়া যায় মোক্ষরূপ এই লক্ষ্যে। জীবনের সহস্র প্রকার বিক্ষেপের মাঝখানে সাম্য বজায় রাখিবার চেষ্টার নাম কর্মযোগ। আর সন্ন্যাস হইল আত্মারূপ দুর্গে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ। অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগই পন্থা। যিনি শক্তিমান তাঁহার পক্ষেই ব্যতিক্রম সম্ভবপর। তাঁহার পক্ষে নিয়মকানুন দরকার হয় না। বিধিনিষেধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্যই। তোমার যদি উচ্চ পর্বতশিখরে উঠিয়া একা দাঁড়াইবার এবং স্বচ্ছন্দভাবে শ্বাসগ্রহণ করিবার শক্তি থাকে তো উত্তম কথা। একলাফে সমুদ্র-উল্লঙ্ঘনকারী হনুমানের মত যদি তুমি মহাবীর হইতে পার তো অতি চমৎকার। কিন্তু সকলে যদি উহা না পারে তাহা হইলে তাহাদিগকে হীন

ভাবা উচিত নয়। পক্ষান্তরে যাহারা উহা পারিবেনা তাহারাও যেন ঐ মহাবীরত্বকে কটাক্ষ না করে।

কেহ কেহ বলেন (যেমন লোকমান্য তিলক) প্রত্যেককেই বিনা ব্যতিক্রমে সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া অবশ্যই বরাবর কর্মে নিরত থাকিতে হইবে। কিন্তু যাঁহার পক্ষে 'বেদা অবেদা' :— বেদ অবেদ হইয়া যায় তাঁহার কি কর্মে প্রয়োজন আছে? তাঁহাকে বিধিনিষেধের এলাকায় কিরূপে আনা যাইবে? তাঁহাদের জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করিতে পারি না, করিবার সার্থকতাও নাই। কাহাকেও কিছু দিতে হইলে যাহার অভাব এবং আকাঙ্ক্ষা আছে তাহাকেই দেওয়া উচিত। যিনি নির্বাসনা এবং মুক্ত তিনি নিয়মের পারে। তাঁহাদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

কিন্তু আমরা একটি ভুলও করিয়া বসিয়াছিলাম। মোক্ষের এই সর্বোচ্চ আদর্শ অধিকারি-নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। ইহার ফলে সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ যেমন ব্যাহত হইয়াছিল তেমনি অতীন্দ্রিয় দিকের শ্রেষ্ঠতাও লোপ পাইয়াছিল। গীতা এইরূপ 'একদর' প্রণালীর ব্যবস্থা দেন নাই। গীতার বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে, প্রকৃতি-অনুযায়ী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনায়। অতএব আমাদের সকলের জন্যই গীতায় পথনির্দেশ পাওয়া যাইবে। এই ভাবেই গীতা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

গৌরীশৃঙ্গঅভিযানের সঙ্কল্প লইবার আগে প্রথমে আমাদিগকে ছোট ছোট পাহাড়গুলিতে উঠিতে হইবে। ব্যাপকতম অর্থে আমরা প্রত্যেকেই সাধক। ইহাকে স্মরণপথে রাখিয়া অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির জনক। ইহাদের মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই বিশেষভাবে অবলম্বনীয়।"[২]

"যিনি বাস্তবিকই ত্যাগকে অবলম্বন করিয়াছেন তিনি সন্ন্যাসীর বাহিরের চিহ্ন ধারণ না করিলেও নিত্যসন্ন্যাসী। রাগ-দ্বেষ দ্বারা যিনি বিক্ষুব্ধ হন না, পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবরাশি হইতে যিনি মুক্ত তিনি সহজেই সংসারবন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।"[৩]

অতএব প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী ও কর্মযোগী— ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য নাই। "বালক-বুদ্ধিরাই সাংখ্য বা সন্ন্যাস এবং যোগ বা কর্মযোগের মধ্যে ভেদ করিয়া থাকে, জ্ঞানীরা নয়। যিনি একটিকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিতে পারেন তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন।"[৪]

"সাংখ্য (সন্ন্যাস) দ্বারা যাহা লাভ হইবে যোগ (কর্মযোগ) দ্বারাও তাহা পাওয়া যাইতে পারে। সাংখ্য ও যোগকে যিনি এক করিয়া দেন তিনিই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা।"[৫]

এই ছয়টি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস ও কর্মযোগের মর্ম বুঝাইয়াছেন। মৌলিক এবং নির্ভীক তাঁহার বাণী। মানবপ্রকৃতির গূঢ় বিশ্লেষণ করিয়া তিনি মানবজীবনের একটি সম্পূর্ণ দর্শন দিয়াছেন।

২ সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥
(গীতা—৫।২)

৩ জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
(গীতা—৫।৩)

৪ সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
(ঐ—৫।৪)

৫ যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
(ঐ—৫।৫)

সাধনা ও সেবা

শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী রায়

জন্মজন্মান্তরের কত পুণ্যফলে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করা যায়। ইহার সার্থকতা একমাত্র সাধনায়। সাধনার অর্থ ভগবানকে একান্তভাবে লাভ করিবার প্রচেষ্টা। সে চেষ্টা যুগযুগান্তর ধরিয়া কেবলমাত্র মানুষের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। সাধারণ মানুষের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়া যখন জ্ঞান-আঁখি খুলিয়া গিয়াছে তখনই তাহার সন্ধান আরম্ভ হইয়াছে সেই নিরাকার, নিরাধার, নির্বিকল্প পরব্রহ্মের।

তাই সংসারাসক্ত ভ্রান্তজীব একদিন সর্বত্যাগী হইয়া যোগীঋষি আখ্যা পাইয়াছেন, এবং আজীবন কঠোর সাধনার দ্বারা মুক্তির পথ-আবিষ্কারে চলিয়াছেন। কেহ পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন কেহ বিফল হইয়াছেন। তথাপি বিরত হন নাই। কিন্তু যোগীঋষিগণ ধ্যানে যাঁহার দর্শন পান নাই, আমরা বিষয়মদে মত্ত কীটানুকীট জীব কিরূপে ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিব? উপায় অবশ্যই আছে। চাই উদ্দাম আশা ও স্থিরপ্রজ্ঞ হইয়া প্রতীক্ষা। এইজন্যই আশাবাদী মানবের সাধনা অফুরন্ত, অসীমের সন্ধানও অনন্ত।

কবি গাহিয়াছেন—

> "যতই না পাব তত পেতে চাব
> ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।"

সাধনমার্গ অতীব কঠিন। পূর্বজন্মের সুকৃতি এবং আন্তরিক ব্যাকুলতা উভয়ের মিলনের ফলে কাহারও কাহারও অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন তিনি সেই পরব্রহ্মের দর্শনলাভ করিতে সক্ষম হন। সর্বাগ্রে চাই শ্রীভগবানের কৃপা। কৃপাময় কৃপা তো করিয়াই আছেন। তিনি যে ভক্তের একান্ত আপনজন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মময়ী রামপ্রসাদের আকুল ডাকে কন্যারূপে দেখা দিয়া বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তের ডাকে তিনি নামিয়া আসেন। ভক্তকে না হইলে তাঁহার চলে না। তাই বিশ্বকবি গাহিলেন :—

> "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর—
> তুমি তাই এসেছ নীচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
> তোমার প্রেম যে হ'ত মিছে।"

সংসারে আমরা কি দেখিনা মাতা গৃহকর্মে ব্যাপৃতা, কিন্তু তাঁহার মনটি পড়িয়া থাকে সন্তানের প্রতি, কর্ণ উৎগ্রীব। শিশুসন্তানটি খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়া একবার 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেই মাতা শতকাজ ফেলিয়া যেখানে থাকুন না কেন সেই কাতর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লন এবং বেদনার স্থানটি কোমল স্নেহস্পর্শ দ্বারা সুশীতল করিয়া দেন। পার্থিব মাতার এই দৃষ্টান্ত হইতে হৃদয়ঙ্গম হয় বিশ্বজননীর অনিমেষ আঁখি সততই আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। যে স্নেহদৃষ্টি সৃষ্টি ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহা অতুলনীয়। মোহান্ধ আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। ব্যাকুলভাবে সচেতন হইলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

মাতার নিঃস্বার্থ বিমল স্নেহ লাভ করিতে হইলে কেবল তাঁহাকে একা প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিলে চলিবে না। সহোদর সহোদরা ভ্রাতাভগিনীদিগকে স্নেহপাশে বাঁধিতে হইবে। মাতার যে, সকল সন্তানের প্রতি সমদৃষ্টি, সমান স্নেহ। সুতরাং মাতা সুখী হন যদি প্রত্যেক ভাইভগিনী একে অপরকে নিঃস্বার্থ-ভাবে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে এবং পরস্পর পরস্পরের জন্য প্রাণ ত্যাগ স্বীকার করে।

বিশ্বের জননী জগদ্ধাত্রী এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন তিনি মাতা জগৎব্যাসী তাঁহার সন্তান। এই বিশ্ব তাঁহারই একটি সুবিশাল প্রেম-পরিবার। সুতরাং তাঁহাকে ভালবাসিতে চাহিলে

সর্বাগ্রে বিশ্ববাসীকে প্রীত করিতে হইবে। জগৎ-সংসারে কেহ কাহারও শত্রু নহে, সকলেই মিত্র, সকলেই আত্মীয়, আপনজন। সুতরাং প্রীতি দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিতে হইবে। যাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ, যাহারা প্রিয় তাহাদের ভাল সকলেই বাসিতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বের এককোণে পড়িয়া আছে কত দুঃস্থ, ঘৃণিত পাপী তাপী তাহাদের প্রেমালিঙ্গন কয়জনে দিতে পারে? যে পারে সেই ধন্য! তাহার সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা। বিশ্বপ্রেম দ্বারা চিত্ত কোমল ও শুদ্ধ হয়। কোমলতা ও শুচিতা হইতে ক্ষমার উৎপত্তি। তখন কাহারও দুর্ব্যবহার আমায় পীড়া দিতে পারে না। সহজেই তাহাকে ক্ষমা করতে সক্ষম হই। কারণ তাহাকে যে আমি ভালবাসি। তাহা হইলে এই যে ক্ষমা করিবার শক্তি প্রীতির উৎস। ক্ষমার মূর্ত প্রতীক যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও শত্রুদিগের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"পিতঃ ইহাদের ক্ষমা কর, ইহারা জানে না ইহারা কি করিতেছে।" এইরূপ ক্ষমা দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

সাধনার অপর ইঙ্গিত সেবা। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ সহজ নহে। সুতরাং তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ কোথায়? তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেকটি জীবই মূর্তশিব। শিবজ্ঞানে তাহাদের সেবা করিলে বিশ্বনাথেরই সেবা করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সাধনা ছিল দরিদ্রনারায়ণের সেবা—তিনি বলিয়াছেন :—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

মানবের সেবা প্রকৃত ভগবানেরই সেবা।

এই যুগেই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি মহামানব মহাত্মা গান্ধী সাক্ষাৎ ভগবানের সেবাজ্ঞানে আজীবন দুঃস্থ, পীড়িত, অভাবগ্রস্ত হরিজনদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। অহিংসা ও প্রেমই ছিল তাঁহার সাধনার মূল।

আমার প্রতিবেশী রোগযন্ত্রণায় কাতর, দুঃসহ শোকে মুহ্যমান, দারিদ্র্যের কশাঘাতে ক্লিষ্ট নিপীড়িত। আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা তাহার সেবা, সান্ত্বনা, প্রতিকার না করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ-ধ্যানে কাটাইলে ভগবানের সাধনা হয় না। ভগবান তাহাতে প্রীত হন না।

এক বিশিষ্ট ভক্তিভাজন সাধকের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছিলাম রুগ্ন, ভগ্ন, সংসারতাপে তাপিত, শোকে জর্জরিত, দুঃস্থ অসহায় গৃহহারা যাহারা তাহাদের অর্থ সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিতে না পারিলে তাহাদের কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রতিদিন ভগবানের চরণে আকুল হইয়া প্রার্থনা করিলে ভগবানকেই প্রীত করা হয়। ইহা সাধনার অপর অঙ্গ। ঐ ভক্তের জীবনে এই সাধনার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি।

ভগবানের প্রিয়কার্য সাধন অন্যতম সাধনা। তাঁহার প্রিয়কার্য কি? মানবসেবা। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সফল করিয়া তুলিতে হইবে আর্তের সেবা, সৎকার্যে ব্যয়, পরোপকারে নিয়োগ দ্বারা। মনে রাখিতে হইবে কামনা রহিত হইয়া, কারণ কর্মের একটা নেশা আছে, নিষ্কাম কর্ম সুকঠিন। এই কর্মই একদিন মানুষকে মোহগ্রস্ত করে; সুতরাং এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। কর্মের ফলাফলের আশঙ্কা না করিয়া, আমিত্ব বিসর্জন দিয়া সরলপ্রাণে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর" প্রকৃত উপাসনা সাধনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীজমন্ত্রের মধ্যে অন্যতম মন্ত্র ছিল "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তিনি যখন হিমালয়ে একান্তে বসিয়া সাধনা করিতেছিলেন তখন তিনি পরমেশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন, "এই পর্বতবাহিনী নীচগামী নদীর ন্যায় তুমিও নামিয়া গিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছ তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর।"

মাতার অনাবিল অফুরন্ত স্নেহ যেমন একা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি হয় না, সকল ভাইভগিনীর মধ্যে বণ্টন করিয়া প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে, সেইরূপ ভগবৎকৃপা একা লাভ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না, সেই অমৃত বিশ্ববাসীকে আস্বাদন করাইবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

তাই ঋষি সুরলোকবাসী সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

জীবন

"ভাস্কর"

মহাকালসিন্ধুনীরে তরঙ্গহিল্লোলে
রূপরসছন্দময় শীর্ষে তার দোলে
কোটি কোটি প্রাণময় বুদ্বুদের রাশি,
ছড়ায় দিগন্তকোলে স্বচ্ছ সূক্ষ্ম হাসি
ক্ষণিকের তরে ; শুধু ক্ষণিকের খেলা,
ক্ষণিকের রূপ-রাগ অঞ্জনের মেলা।
নাহি কোন অর্থ তার ? শুধু মরীচিকা ?
শুধুই নির্বাণ লভে স্ফুলিঙ্গের শিখা ?

বিশ্বাস করিতে হবে, কোন অর্থ নাই
এই তুচ্ছ জীবনের নাহি কোন ঠাঁই
অনন্ত বিশ্বের তানে ? প্রতি অণু তার
বিধাতার হাতে গড়া সুরের ঝংকার,
উদাত্ত মহিমাময় জ্বলন্ত নিঃশ্বাস,
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রেমময় আত্মার বিকাশ।
জীবন সাধনাধন তুচ্ছ আত্মভোলা
অনন্তের মণিকোঠা-মাঝে রবে তোলা।

পরাশরীয় উপপুরাণ

অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ,

সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে বোধহয় ভগবান ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। মহাভারত প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও বহুসংখ্যক উপপুরাণ এমনকি অনেক স্মৃতিগ্রন্থও—যেমন পরাশর-সংহিতা প্রভৃতি তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই ব্যাসদেব কে ছিলেন, এতগুলি গ্রন্থের রচয়িতা সত্যই তিনি কিনা—এই সব ঐতিহাসিক আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত একটি উপপুরাণের কথাই এ স্থলে আলোচিত হইবে।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ কি কি ইহা লইয়া বিশেষ মতভেদ নাই। বিশেষ কথাটি বলিবার তাৎপর্য এই যে বায়ু বা শিবপুরাণ লইয়া কিছু গোলমাল। কোন কোন পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকার মধ্যে হয় বায়ু, না হয় শিব, অথবা দুইটিই উল্লিখিত

আছে। কিন্তু উপপুরাণ লইয়া মতভেদের আর শষ নাই। অনেকের মতে প্রথমে মহাপুরাণের ন্যায় উপপুরাণও ছিল অষ্টাদশ কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা প্রায় অসংখ্যের পর্যায়ে পৌছিয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে আমরা যে সমস্ত উপপুরাণের নাম পাই তাহাদের সবগুলিই যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা নহে, অনেক উপপুরাণের নামটুকুই মাত্র অবগত আছি কিন্তু তাহাদের পরিধি, প্রকার ও আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নানাকারণে তাহারা অধুনা অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি লুপ্ত উপপুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (Asiatic Societyর Journal এ তাঁহার 'Some Lost Upapuranas শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান প্রবন্ধকার কিছু প্রচীন পুঁথিপত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে 'পরাশরীয় উপপুরাণ' সম্পর্কে কিছু তথ্য অবগত হন। এই পরাশরীয় উপপুরাণ বর্তমান সময়ে অপ্রাপ্য ; ইহার পুঁথিও প্রায় দুর্লভ। ইহা লইয়া ইতিপূর্বে কেহ আলোচনাও করেন নাই। কাজেই এই প্রসঙ্গে কিছু বলিবার অবকাশ আছে বলিয়া বোধ হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সকল পুরাণগুলিই ব্যাসদেবের লিখিত বলা হইয়া থাকে। আলোচ্যমান পরাশরীয় উপপুরাণটিও ইহার ব্যতিক্রম নহে, ইহার নামটিই সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'বেদসারসহস্রনামটীকা' (বা শিবসহস্রনামটীকা ৯০নং জি-৮৩০১) নামক পুঁথি আছে। 'পরাশরীয়' উপপুরাণ হইতে এই পুঁথিতে কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই উদ্ধৃতিসমূহের উপর নির্ভর করিয়াই পরাশরীয় উপপুরাণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছি।

পরাশরীয় উপপুরাণ যে মূলতঃ শৈব উপপুরাণ ছিল সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'জন্মনাং লক্ষজাতীনামাপ্রধানাং তথৈব চ। প্রাধান্যেন মহাদেবঃ পূজ্যো নান্যোঽস্তি সিদ্ধয়ে'। ('বেদসার-সহস্রনাম-টীকা' পুঁথি পৃষ্ঠা ১৯ ক) এই পঙ্‌ক্তিটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দেবাদিদেব মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহই আর মনুষ্যকে মুক্তি দিতে সক্ষম নন, আর এক স্থলে বলা আছে যে, সকল মনুষ্যজাতি অপেক্ষা জম্বুদ্বীপনিবাসী মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাইবার অধিকারী ব্রাহ্মণ। বস্তুতঃ বিপ্রেরা পৃথিবীর দেবতা বিশেষ (বিপ্রাদ্ বরিষ্ঠো নাস্তি কশ্চনঃ। বিপ্রঃ সমস্তমর্ত্যানাং দেবতা হি ন সংশয়ঃ'॥ ঐ পৃষ্ঠা ৬৯খ)। কিন্তু এই পার্থিব দেবতা অপেক্ষা স্বর্গস্থ দেববৃন্দ অধিকতর বরেণ্য। সমস্ত দেবতার মধ্যে ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু লোকপালক মহাবিষ্ণুর স্থান ব্রহ্মা হইতেও উচ্চে। ('বিপ্রাদপি ভূদেবাদ্ বরিষ্ঠা দেবতা স্মৃতাঃ। দেবতাভ্যঃ সমস্তাভ্য শ্রেষ্ঠা (স্রষ্টা?) ব্রহ্মাবরঃ স্মৃতঃ। ব্রহ্মণশ্চ মহাবিষ্ণুর্বরিষ্ঠঃ সর্বপালকঃ॥' ঐ, ঐ) কিন্তু ইহা বলিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হন নাই। মহাদেবের স্থান সমস্ত দেবকুল অপেক্ষাও উচ্চে। এমনকি তিনি ব্রহ্মা বা মহাবিষ্ণুরও পূজার্হ। তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ('বিষ্ণোরপি বরস্সাক্ষাৎ রুদ্রঃ সংহারকারকঃ। সর্বেষামপি দেবানাং বরিষ্ঠঃ পরমেশ্বরঃ'॥ ঐ, ঐ) প্রলয়ের দেবতা মহাদেবকে 'রাজাধিরাজ' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতা সেই ত্রিপুরারি মহাদেবেরই আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। ('রাজাধিরাজঃ সর্বেষাং ত্র্যম্বকস্ত্রিপুরান্তকঃ। তস্যৈবানুচরাঃ সর্বে ব্রহ্মবিষ্ণবাদয়ঃ সুরাঃ॥' ঐ, ৯৪ খ)

এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে শৈবধ্বজাধারী এই উপপুরাণ মাধ্যমে স্বদেবমাহাত্ম্যবর্ণনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে। এমনকি এ কথাও বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে সর্ববেদবেদান্ত-সকলপুরাণ-মহাভারত এমনকি বেদাবিরোধী স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ সর্বত্রই সেই একই কথা মহেশ্বরের আরাধনা

ভিন্ন গতি নাই। তাঁহার তৃপ্তি হইলেই সমগ্র জগৎ তৃপ্ত,—তাঁহার পূজাতেই বিশ্বদেবতার পূজা (সদা চ সর্ববেদান্তৈঃ সাদরং প্রতিপাদ্যতে। বেদানুসারিস্মৃতিভিঃ পুরাণৈর্ভারতাদিভিঃ॥ শ্রৌত-স্মার্ত সমাচারৈঃ স এবারাধ্যতে দ্বিজৈঃ। তচ্ছেষত্বেন চারাধ্যাস্তদন্যা সকলা অপি॥ ঐ, ১৩ খ)। শিব-পুরাণে শিব-রহস্য হইতে 'অর্চয়ধ্বং মহাদেবং, ভজধ্বং মহাদেবং প্রভৃতি প্রকাণ্ড পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া শিবপূজা-মাহাত্ম্য ও অনুষ্ঠানের প্রকার প্রণয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ শৈবদর্শনের মূলীভূত কথাই এখানে বলা হইয়াছে। শিব এস্থলে অপ্রমেয়, শান্ত, স্বপ্রকাশ, সর্বসাক্ষী ও মুক্তিদাতা। ('অপ্রমেয়ায় শান্তায় স্বপ্রকাশায় সাক্ষিণে। স্বস্বরূপৈকনিষ্ঠানাং মুক্তিদায় নমো নমঃ' ॥ ঐ, ১১ খ) তিনি সর্বজগতের কারণ, স্বয়ম্ভু, ও সত্যাদিলক্ষণযুক্ত: (সর্বকারণমীশানঃ স্বাম্ভবঃ সত্যাদিলক্ষণঃ—ঐ ১৩ খ) (মহাপাপবতাং নৃণাং শিবঃ সত্যাদিলক্ষণঃ ঐ ৯৪ ক) মহাকাল-স্বরূপ শিব সমগ্র তত্ত্বজ্ঞানের আধার। এই তত্ত্বজ্ঞানই হইল সকল শাস্ত্রের সারবস্তু। সর্বজ্ঞ দেবাদিদেবের কারুণ্য ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান প্রকটিত হয় না। ('যৎ সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তো যৎ সর্বহৃদয়ানুগম্। যৎ সর্বজ্ঞং বস্তু যৎ গুহ্যং তদমৌহিতঃ' ॥—ঐ ১২০ ক)। তিনি স্বয়ং যোগমার্গ-শিখরে বিরাজমান—পরাশক্তিযুক্ত। (স্বাত্মভূতপরানন্দপরাশক্তিসমন্বিতম্। পরাহতানু-সন্ধানপরম্ ক্রীড়য়ান্বিতম্॥ ঐ—১০৫ খ) শ্রৌতমার্গ-অনুবর্তিগণের বা নৈষ্ঠিকস্মার্তদিগের শিবভক্তিই পরা বা শ্রেষ্ঠ ভক্তি। ('অনেক-জন্মসিদ্ধানাং শ্রৌতস্মার্তানুবর্তনাম্। পরতত্ত্বতয়া সাম্ব শিবো [চ] ভক্তিঃ সনাতনঃ' ঐ, ৯৪ ক)

পরাশরীয় উপপুরাণের ভাষা সহজবোধ্য ও সরল। মাঝে মাঝে লেখক উপমাদির মাধ্যমে আপনার বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অনুধাবনযোগ্য : –

'শিবদৃষ্টিস্তু সর্বত্র কর্তব্যা সর্বজন্তুভিঃ,।
রাজদৃষ্টিঃ যথামাত্যে ক্রিয়তে সর্বজন্তুভিঃ ॥'

(বেদসারসহস্রনামটীকা, পৃষ্ঠা—৯৪ খ)। কাজেই দেখা যায় যে লেখকের কবিত্বশক্তিও নিতান্ত তুচ্ছ করিবার বস্তু নহে।

বেদসারসহস্রনামটীকা হইতে পরাশরীয় উপপুরাণ সম্পর্কে যাহা কিছু জানিতে পারা যায় তাহা লইয়া আলোচনা করা গেল। উপপুরাণটির বেশী পঙ্‌ক্তি টীকাতে উদ্ধৃত হয় নাই। কাজেই আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতে পারিল না। তবে বিশ্বাস করি আলোচিত বহু পুঁথিপত্রে অনুসন্ধান করিলে পরাশরীয় উপপুরাণ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। এ বিষয়ে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে প্রবন্ধকারের শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

"নির্জনে সাধন খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা হবে, তখন কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি মনের সমস্ত ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।"

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

অবতার

৺যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-সি-এস্, রায়বাহাদুর

[পরলোকগত লেখক বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একজন শক্তিশালী সমালোচক ও দার্শনিক বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। পূর্বে অপ্রকাশিত তাঁহার বর্তমান প্রবন্ধটি (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একটি অধিবেশনে পঠিত) অবতারবাদ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলির একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। অবতারবাদ হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "ঋষিরা রামচন্দ্রকে বললেন, 'হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই।' * * * যার যেমন রুচি। আবার যার পেটে যা সয়। * * * ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য। * * * রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বার জন ঋষি কেবল জানত।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।২।৩)

এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি সুধীগণের অনুধাবনযোগ্য।—ডঃ স.]

হিন্দুশাস্ত্রে পরমেশ্বরের দশ অবতারের উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে দশমটি কলির শেষভাগে আসিবেন। হিন্দুর কোন কোন সম্প্রদায় পৌরাণিক এই দশ অবতার ছাড়া আরও অবতার স্বীকার করেন, যথা বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে আজকাল সকল বিষয়েই লোকের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে। বিনা যুক্তিতে লোকে শাস্ত্রের কথাই বা শুনিবে কেন?

বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার প্রমাণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য। মনুষ্যজীবনে যতদূর উৎকর্ষ আশা করা যাইতে পারে শ্রীকৃষ্ণে তাহা হইয়াছিল। কিন্তু মনুষ্য বিদ্যাবুদ্ধি-সভ্যতায় যতই উন্নত হইতেছে আদর্শ ততই উপরে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্বে যাহা আদর্শ ছিল সেই আদর্শে উপনীত মানুষ দেখিতে পায় যে চরম উন্নতি এখনও বহু দূরে। বেলুন ঊর্ধ্বে উঠিলে যেমন বোধ হয় যে আকাশ ভূপৃষ্ঠ হইতে তখন যতদূর ছিল এখনও ততদূর। ইহাও সেইরূপ। যেমন পরিদৃশ্যমান আকাশ অথবা চক্রবাল চক্ষের একটা ভেল্কি মাত্র, কোন বিষয়ের আদর্শও সেইরূপ মানসিক কল্পনা মাত্র। যেমন আদর্শ নদী, আদর্শ পর্বত, আদর্শ বৃক্ষ প্রভৃতির অস্তিত্ব নাই ও থাকিতে পারে না সেইরূপ আদর্শ মনুষ্যেরও অস্তিত্ব নাই ও থাকিতে পারে না।

মানবপ্রবৃত্তিগুলি চরম উৎকর্ষে নীত হইলে এবং তাহার সমস্ত গুহ্য শক্তির বিকাশ হইলে মানুষ যে মানুষই থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? আমরা গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতিকে যে চক্ষে দেখি, চরম-উৎকর্ষতা-প্রাপ্ত মানব অর্থাৎ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠতম জীব আমাদের মত মানুষকে যে সেই চক্ষে দেখিবে না তাহার প্রমাণ কি? আদর্শ চিরকালই আপেক্ষিক এবং চিরকালই কাল্পনিক। সশরীরে বর্তমান পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ—যাহা চিরকালই অপরিবর্তিতরূপে আদর্শ থাকিবে এইরূপ আদর্শের অস্তিত্ব অসম্ভব।

তবে সমসাময়িক অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা সমধিক শক্তিশালী এবং সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ দুই এক জন মহাপুরুষ সময়ে সময়ে কোন কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কার্লাইল তাঁহাদিগকে 'হিরো' (Hero) বলিয়াছেন। যে দেশের লোক ভাবুকতা-প্রবণ, সে দেশে ঐরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইলে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা ঈশ্বরত্বে উন্নীত হইয়া থাকেন এবং লোকে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতে থাকে।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা

এই কথার উত্তরে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন যে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ার আশঙ্কা নাই কারণ অবতার অস্বীকার করিলে যীশু টেকেন না। যীশুর অবতারত্ব টিকিল কি না টিকিল, তাহাতে অবতারবাদ প্রমাণের কি আসে যায়? খ্রীষ্টানও অবতারবাদী—হিন্দুও অবতারবাদী। খ্রীষ্টানের অবতারবাদ সঙ্কীর্ণ, হিন্দুর অবতারবাদ বরং উদার। কিন্তু হিন্দু খ্রীষ্টান উভয়েই তো অবতারবাদী, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অবতারবাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মতদ্বৈধের কোনই আশঙ্কা নাই। মতদ্বৈধের আশঙ্কা কেবল অবতারবাদী এবং অবতারবাদ-বিরোধীদের মধ্যে। সে মতদ্বৈধের মীমাংসা হয় নাই।

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ কথাটা শৈশবাবধি শুনিতে শুনিতে আমাদের সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ স্তম্ভিত হইতে হয়। ঈশ্বর কি পৃথিবী ছাড়া কোন উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন যে, তিনি তথা হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া আসিবেন? তিনি কি অবতার হওয়ার সময় ভিন্ন সৃষ্টির সকল স্থানেই থাকেন, কেবল পৃথিবীতেই থাকেন না? যে হিন্দু বলেন যে, প্রতি পরমাণুতে ঈশ্বর ওতপ্রোতভাবে বর্তমান; সর্বত্র প্রবিষ্ট বলিয়া যে হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের অপর নাম বিষ্ণু; যে জাতির শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন যে, মালায় মণিগণ যেমন একই সূত্রে নিবদ্ধ, এই জগতের প্রত্যেক অংশ সেইরূপ আমাতে নিবদ্ধ; সেই হিন্দুর মুখে যখন শুনি যে ঈশ্বর পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হন, অর্থাৎ কোন স্থান হইতে নামিয়া আসেন, তখন তাহা বুঝিতে পারি না। এ কথা শয়তানবাদীদের মুখে শোভা পায়, কিন্তু হিন্দুর মুখে শোভা পায় না।

যাঁহারা মঙ্গলময় ঈশ্বর এবং অমঙ্গল ও পাপের জনক ঈশ্বর অর্থাৎ শয়তান, এই দুই ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদের অবতার না মানিয়া উদ্ধার নাই। কারণ, তাঁহাদের মতে শয়তানই পৃথিবীটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে—পৃথিবীর সর্বত্রই শয়তানের রাজ্য। পূর্বে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু বলবত্তর শয়তান তাহা কাড়িয়া লইয়াছে। অশাসিত এবং বিপক্ষ কর্তৃক আংশিকরূপে (অথবা সর্বতোভাবে) আয়ত্তীকৃত জমিদারীতে যদি জমিদার স্বয়ং অথবা উপযুক্ত কর্মক্ষম পুত্র মধ্যে মধ্যে দু'একবার পদার্পণ করেন, তবে যে দু'একজন প্রজা জমিদারের বাধ্য আছে, তাহারা কর-কবুলিয়ৎ দিয়া একরূপ বশীভূত থাকে, আর বিপক্ষের দলে যায় না। সেইরূপ দুই চারি জন সাধুলোক, যাঁহারা ঈশ্বরের দলে আছেন, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এবং বলবত্তর বিপক্ষ শয়তানের ভাঙ্গিবার জন্য স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের অথবা তদীয় একমাত্র পুত্রের পৃথিবীরূপ মফঃস্বলে আসার আবশ্যকতা আছে। শয়তানবাদী ঈশ্বর সর্বদা পৃথিবীতে থাকেন না। তিনি দেশকালে আবদ্ধ। আবশ্যকমত হয় তাহার পুত্র, না হয় তাঁহার বন্ধুকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন। শয়তানবাদীর অবতার স্বীকার না করিয়া উদ্ধার নাই। অবতার স্বীকার না করিলে তাহার শয়তানবাদ ছাড়িতে হয়।

হিন্দুর শয়তানবাদ নাই। হিন্দুর দেবাসুর-যুদ্ধ আছে বটে, কিন্তু দেবাসুরের যুদ্ধ এবং ঈশ্বর ও শয়তানের বিরোধ এক বিষয় নহে। দেবাসুরের যুদ্ধকাহিনীর মধ্যে অনেক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মোটামুটি এই পর্যন্ত বলিলেই এক্ষণে চলিবে যে, যদি দেবাসুর-যুদ্ধকাহিনী দেবপূজক এবং দেবরক্ষিত হিন্দু এবং অসুরপূজক (অসুরো মহান্ বা অহুরমজ্দাপূজক) প্রাচীন পারসিকদের গৃহবিচ্ছেদ এবং বৈরিতার কাব্যাকার ইতিহাস হয়, তবে এক কথায়ই গোল মিটে। আর যদি দেবাসুরের যুদ্ধকাহিনী মানবহৃদয়ে সাধুপ্রবৃত্তি এবং অসাধুপ্রবৃত্তির অবিরাম যুদ্ধের রূপক হয়, তাহা হইলে হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে, শয়তানবাদীর শয়তান ও ঈশ্বরের চিরবিরোধ যাহা, হিন্দুর দেবাসুরের যুদ্ধও তাহাই।

কিন্তু এ দুইটি এক জিনিস নহে। কোন অসুরই শয়তানের মত ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করে নাই। তাহারা যুদ্ধ করিত ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে এবং তাহাদের লক্ষ্য ছিল ইন্দ্রত্বপদ। ইন্দ্রাদি দেবগণও যেমন ঈশ্বরের সৃষ্ট, অসুরগণও সেইরূপ ঈশ্বরেরই সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের বরপ্রভাবে বলদর্পিত। শয়তান-বাদীদের শয়তানকে, তাঁহাদের মতে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই। ঈশ্বর শয়তানের সাধুতাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু শয়তান তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজের সৃষ্ট অসাধুতা দ্বারাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। শয়তানের শয়তানত্ব ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে, তাহা তাহার নিজের। সে ঈশ্বরপ্রদত্ত বরে বলীয়ান নহে, তাহা তাহার নিজের। শয়তান নিজেই আর একজন ঈশ্বর -- যদিও পাপের ঈশ্বর। শয়তানবাদীর ঈশ্বরের সমস্পর্ধী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, সুতরাং তাহাতে ঐশ্বর্যের অভাব। শয়তানবাদীর ঈশ্বর রজোগুণময়। তাঁহাতে এবং দণ্ডপুরস্কারের বিধাতা মনুষ্য-রাজাতে প্রভেদ অতি অল্প। হিন্দু মনে করেন যে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, রোগ-স্বাস্থ্য, বিষ-অমৃত সকলই এক পরমেশ্বর হইতে। ভগবানের মায়া হইতেই এই রজোগুণময় সৃষ্টি। যতক্ষণ আত্মা মায়াপাশে আবদ্ধ—ততক্ষণ আত্মারূপ স্ফটিক দর্পণে মায়াময় সংসারের রূপরসাদি বিষয়াসক্তিরূপ জবাকুসুমের ছায়া পতিত হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণই পাপপুণ্যে ভেদ, ধর্মাধর্মে ভেদ, জ্ঞান-অজ্ঞানে ভেদ। মায়াপাশ ছিন্ন হইলে—বিষয়াসক্তিরূপ জবাকুসুম অন্তর্হিত হইলে, আত্মা স্বকীয় স্বচ্ছরূপে অবস্থিতি করে, ইন্দ্রিয়গণ তখন আর স্বীয় স্বীয় বিষয়াভিমুখী থাকে না। তখনও আত্মার মুক্তি হইল না, কারণ তখনও তাহাতে সত্ত্বগুণ রহিয়াছে। যখন এই সত্ত্বগুণের পাশ ছিন্ন হয়, তখনই আত্মা মুক্ত হইল, ব্রহ্মে লীন হইল—নির্বাণ লাভ করিল। ব্রহ্ম সত্ত্বগুণেরও অতীত। যখন সত্ত্বগুণের উদয়, তখনও পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের কোন কথা নাই। রজোগুণাবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই—অর্থাৎ আমি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ এবং জগতের অন্যান্য সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক—এই আমিত্ব-জ্ঞানের বা অহংকারের সঙ্গেসঙ্গেই পাপ-পুণ্যাদির আবির্ভাব। জগতে কোটি কোটি "আমি" আছে। প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যত্নবান। প্রত্যেকেই রজোগুণে আবৃত, কারণ স্বতন্ত্র বিদ্যমানতার জ্ঞান (Individualityর জ্ঞান) রজোগুণের প্রধান লক্ষণ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট রজোগুণময় জগতে সৃষ্টিরক্ষার উপযোগী, সর্বভূতের হিতকর, সুতরাং সৃষ্টিবিকাশের সহায় যে সকল কার্য অথবা কার্যের জননী মানসিক প্রবৃত্তি, তাহাই পুণ্য এবং তদ্বিপরীত কার্য বা প্রবৃত্তি পাপ। রজোগুণের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই পাপ-পুণ্যাদির আবির্ভাব। সাত্ত্বিক অবস্থায় পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সেই অবস্থায় সুখদুঃখাদির বোধ নাই, সুতরাং সুখ দুঃখ কিছুই নাই। সে চিন্ময় আনন্দের অবস্থা। শয়তান-বাদীর ঈশ্বর রজোগুণাত্মক। শয়তানবাদীর ব্রহ্ম-জ্ঞান রজোগুণের উপরে উঠে নাই। আধুনিক ইওরোপীয় দার্শনিকগণের লৌকিক ধর্মে যদিও শয়তানবাদ রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান অনেক উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান শয়তানবাদীদের ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপরে। হিন্দু জানেন যে, রজোগুণ ঈশ্বরেরই সৃষ্ট। পাপ-পুণ্য-ভেদ রজোগুণের একটি কার্যমাত্র। সুতরাং যে পরমেশ্বর হইতে পুণ্য, সেই পরমেশ্বর হইতেই পাপ। কথাটা শুনিতে চমক লাগে বটে, কিন্তু কথাটা বড়ই ঠিক। (ক্রমশঃ)

"কলিতে সত্য চিন্তা হলে তার উত্তম ফল হয়।"

—শ্রীশ্রীমা

উৎসব-তীর্থে

শান্তশীল দাশ

জীবনের রুক্ষ পথে অবসর আসে ক্ষণে ক্ষণে,—
সে-ক্ষণ মধুর বড়ো; মুছে দিয়ে যায় প্রত্যহের
গ্লানিময় অবসাদ; নৈরাশ্যের দ্বিধা-খিন্ন মনে
জাগে কী প্রসন্ন দীপ্তি—আশীর্বাদ উর্ধ্ব আলোকের।

সে-আলোকে চেয়ে দেখি: চারিদিক আনন্দ-উজ্জ্বল;
উদাত্ত সংগীতধ্বনি ভেসে আসে; সুরের বন্যায়
প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষুব্ধ কোলাহল
সে কোমল স্নেহস্পর্শে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়।

সংকীর্ণ বন্ধন-জাল ছিন্ন হয়, উন্মুক্ত উদার
প্রাঙ্গণে একত্রে এসে মিলনের বাজে ঐকতান;
অসংখ্য সরিৎ-স্রোত মিলে মিশে সব একাকার
সাগরের বক্ষে এসে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের গান।

বিরোধ-বিভেদ-দ্বন্দ্ব মিথ্যা সব প্রবঞ্চনাময়,
অনিত্যের জাল বুকে নিত্য শুধু ঘটায় প্রমাদ;
জীবন-মাধুর্য-রস শুষে নিয়ে জাগায় সংশয়—
চলার পথের বুকে বেদনার ক্লান্ত অবসাদ।

সেই মিথ্যা স্তব্ধ হয় উৎসবের আনন্দ-সংগীতে;
অশুচি, অসত্য যত নিত্যসঙ্গী প্রতি দিবসের,
নির্বাসিত সসংকোচে সুমঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে;
জীবন সার্থক হয় স্পর্শ লভি চিরসুন্দরের।

তোমারে প্রণাম করি হে সুন্দর, হে কল্যাণময়,
জীবনের পথে পথে তোমার করুণা-প্রস্রবণ
অজস্র ধারায় ঝরে, চলি তাই একান্ত নির্ভয়;
তুমি আছ আত্মসঙ্গী সর্বত্র তোমার বিচরণ।

তোমার কল্যাণরূপ দেখি সর্বজনের মাঝারে,
তোমার প্রেমের মন্ত্র শুনি বাজে কণ্ঠে সবাকার;
তোমার নিবিড় স্পর্শ আলিঙ্গনে প্রতি মানুষের,
তোমারে সবার মাঝে বারে বারে করি নমস্কার।

ত্রিপিটকের সুত্তপিটক*

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এম্-এ

'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স'

ত্রিপিটক একখানি থেরবাদীয় মূল বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে কপিলবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন।

গয়াধামে ৬ বৎসর উগ্র তপস্যায় পর বোধিবৃক্ষতলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করে ভারতে বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হন এবং বারাণসীতে প্রথম ধর্মদেশনা দেন। তারপর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স থেকে আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি আর্যাবর্তের নগর, রাজধানী, জনপদ ঘুরে তাঁর অহিংস ধর্ম প্রচার করেন। যেখানেই তিনি

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে।

যেতেন, সেই প্রদেশের প্রাকৃত ভাষায় ধর্মের উপদেশ দিতেন। তখন চলাচলের সুবিধা না থাকলেও, অসুবিধা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি রাস্তা উত্তর ভারতের রাজগৃহ থেকে বৈশালী, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, কৌসাম্বী, সাঁচি, উজ্জয়িনী, মাহিষ্মতী, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে আধুনিক অজন্তা এলোরার নিকটে প্রতিষ্ঠান নগরে গিয়ে শেষ হত।

এই রাস্তাটির বিশেষত্ব এই যে এটি প্রায় সবগুলি প্রাকৃতভাষা-কথনশীল প্রদেশের উপর দিয়েই যেত, যেমন মাগধী, পৈশাচী, সৌরসেনী, মারাঠী ইত্যাদি। মনে হয় এইজন্য সকল প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় করে একটা সাধারণ কথ্যভাষা উঠেছিল, যে ভাষাতে তাঁর শিষ্যেরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এই কথ্যভাষা গ্রহণ করেন নাই। যেখানে গেছেন সেই স্থানের প্রাদেশিক ভাষা ও আচারব্যবহার গ্রহণ করেছেন।

সাধারণতঃ তিনি রাজগৃহের বেণুবন ও শ্রাবস্তীর জেত-বন বিহারেই বেশীর ভাগ উপদেশ দেন। কিন্তু প্রয়োজন হলেই দূরে বা নিকটে যেতেন। সাধারণের বিশ্বাস যে গৃহীদের জন্য তিনি কিছু বলেন নি। ত্রিপিটক শুধু ভিক্ষুদের জন্য। কিন্তু তা নয়, তিনি যখন যেখানে যেতেন সাধারণের উদ্দেশেই উপদেশ দিতেন আর যা বলতেন তা গৃহীদেরই বলতেন, কেননা তারাই তাঁর জন্য সভার আয়োজনাদি করত। ত্রিপিটকেই দেখতে পাব এই সব সভায় তিনি প্রথমেই উপদেশ দিতেন জাতকের গল্প, দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের দুর্গতি, সংযমে স্বর্গ, সত্য দয়া দাক্ষিণ্যের উপকারিতা এবং পরে যখন দেখতেন কেহ কেহ পরাজ্ঞানের অধিকারী বা মোক্ষলাভের প্রয়াসী তখন তিনি বোধিবৃক্ষতলে উপলব্ধ মধ্যপথ উপদেশ দিতেন, মধ্যপথ কি না চতুরার্য সত্য—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের অন্তকরণ, দুঃখের অন্তকারী মার্গ, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাচা, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক আজীব, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি এবং ত্রিলক্ষণ: অনাত্মং, অনিত্যং ও দুঃখং।

তাঁর প্রচারিত সত্যের নাম দিলেন ধর্ম-বিনয়। ধর্মের প্রধান অঙ্গ হল: আটটি ধ্যান ও বিদ্যাভ্যাস: প্রথম ধ্যানে চারিদিকে মঙ্গল ইচ্ছা ছড়িয়ে দিতে হবে—মা যেমন একটিমাত্র ছেলেকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেন এরূপ সকলের প্রতি ভালবাসা ভাবতে হবে। দ্বিতীয় ধ্যানে আনন্দবোধ হবে। তৃতীয় ধ্যানে করুণার উদয় হবে, চতুর্থ ধ্যানে হবে জগতের প্রতি উপেক্ষাপূর্ণদৃষ্টি। আরও উপরে চারটি ধ্যান। এই আটটি ধ্যান বা সমাপত্তি। আর বিনয় হল দশটি শীল: প্রাণীহত্যা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না, ব্যভিচার করবে না, ফুলমালা ধারণ করবে না ইত্যাদি। বিহারের আচার-ব্যবহারের নিয়ম পালন করবে, উপোসথ করবে, নিস্‌সয় নেবে, দৈনিক ভিক্ষায় যাবে। ক্রমে ভিক্ষুদের প্রধান কার্য দাঁড়াল লোকসেবা ও বিদ্যা-দান। বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম বিনয় নানা আকারে ও প্রকারে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে প্রচার করলেন আর তাঁর সংঘ বিহারে বিহারে লোকসেবা ও বিদ্যাদান করতে লাগলেন।

বুদ্ধ ছড়িয়ে দিলেন তাঁর ব্রহ্মবিহার দিকে দিকে। মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, উপেক্ষার ভাবে জগৎ স্পন্দিত হল; সর্বলোকে একাত্মক ভাব ফিরে এল। এই পুণ্যক্ষেত্রে আবার প্রতিভাত হল প্রাচীন সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

এইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় প্রদত্ত উক্তি-গুলি সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হল। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যেরা মহাধর্ম সম্মেলন করেন, রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় তার রাজগৃহের উপকণ্ঠে বেভার পর্বতের পাশে সপ্তপর্ণী গুহায়।

এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় প্রদত্ত তাঁর উপদেশগুলিকে একত্র করে ও তাদের সাহিত্যিক রূপ দিয়ে আগম-পিটক নামে একটি পিটক সম্পাদিত হয়। গৃহীদের জন্য নয়, ভিক্ষুদের জন্য। এতে কৃতিত্ব দেখান আনন্দ এবং উপালি। আনন্দ 'ধর্ম' এবং উপালি 'বিনয়' সংকলন করেন, দুজনাই শাক্য-বংশীয়।

পিটক অর্থে পেটিকা বুঝায় (পেঁড়া বা পেঁটরা) যার মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখা হয় এবং সহজে যাকে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। শত বৎসর পরে আর একটি ধর্মমহাসভা আহূত হয়, বৈশালীতে। বিনয়-সম্পর্কে কিছু মতভেদ ও গণ্ডগোল হওয়ায় আগম-পিটকটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে 'ধম্ম' ও 'বিনয়' দুটি পৃথক পিটকের সৃষ্ট হয়। ক্রমে ধর্মের মধ্যে নানা বিরোধ উপস্থিত হলে মহারাজ অশোকের নেতৃত্বে তৃতীয় ধর্মমহাসভা পাটলিপুত্র নগরে আহূত হয় এবং একখানি দর্শন নিয়ে ধর্মের সুগভীর আলোচনাপূর্ণ অভিধর্ম-পিটক সৃষ্টি হয়। এই ধর্মবিনয় অভিধর্ম-যোগে ত্রিপিটকে নিবদ্ধ হল থেরবাদীয় সমগ্র বুদ্ধদেবের ধর্ম। তখন লেখার প্রথা হয় নাই।

এক একটি পিটক মুখস্থ করে থের ভিক্ষুগণ আচার্য হলেন। কেহ ধর্মাচার্য, কেহ বিনয়াচার্য, কেহ অভিধর্মাচার্য ও তাদের বিষয়গুলিকে পেটিকার মত বয়ে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে লাগলেন। ভারতে এই পিটকগুলির পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

কিন্তু সুখের বিষয় যে ত্রিপিটক হওয়ার পরই মহারাজ অশোক সিংহলে সদ্ধর্ম প্রচার করার জন্য তাঁর পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্রের নেতৃত্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর একটি দল পাঠান আর তাঁরা সেখানে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে ত্রিপিটক আজ পর্যন্ত সঠিক ও সচল রেখেছেন, তবে এখন মুখস্থ রেখে নয় পুঁথিতে লিখে; যেটা প্রথম আরম্ভ হয় সেটা সিংহলের রাজা ভটগামিনীর সময়ে প্রথম শতাব্দীতে।

ধর্ম-পিটকের আর একটি নাম সুত্তপিটক। এই পিটকে বুদ্ধদেবের প্রত্যেকটি ভাষণ 'এবং মে সুতং' এই কথাটি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে তারই জন্য। 'আমি ইহা শুনেছি' বলছেন আনন্দ। এটি পাঁচ-ভাগে বা নিকায়ে বিভক্ত: দীঘ, মজ্ঝিম, অঙ্গুত্তর, সংযুক্ত ও খুদ্দক। দীঘ-নিকায়ে সুত্ত থেকে বড় করা দীর্ঘ দীর্ঘ সুত্তন্ত আছে, যেমন বেদ থেকে বেদান্ত। মজ্ঝিম-নিকায়ে মধ্যম আকারের সুত্ত দেওয়া হয়েছে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ে একটি অঙ্কবৃদ্ধি করে পর পর বুদ্ধদেবের ছোট ছোট বাণী ও জীবনী সাজানো হয়েছে। সংযুক্ত নিকায়ে আছে এক একটি অধ্যায় এক একটি বিষয় নিয়ে, যেগুলিকে অন্য কোথাও দেবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। আর খুদ্দক-নিকায় কতকগুলি প্রাচীন ও পরবর্তীকালের উক্তি-সংকলিত ছোট ছোট পুস্তকের সমাবেশে নিষ্পন্ন।

তখন সমস্ত ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করতে হত। এই বিভাগগুলি হয়েছে স্মরণশক্তিকে সাহায্য করার জন্য এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু শুধু বাহ্যিক কারণে নয়। এই পাঁচটি বিভাগের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে, সেগুলি এক নয় কিন্তু একসঙ্গেই হয়েছিল। 'পঞ্চ নেকায়িক পাঁচটি নিকায় জানেন' এই কথাটি গোড়া থেকেই শীলা-লেখতে পাওয়া যায়।

১। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে দীঘ-নিকায়ে ধর্মের উদার ও শ্রেষ্ঠ সত্যগুলির তত্ত্ব দেওয়া আছে। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র 'অপ্রমাদ' শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ এখানে যেমনটি আছে আর কোথাও সেরকম নেই। পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলে অঙ্গীকার এই দীঘ-নিকায়ে পাওয়া যাবে:— নির্বাণের স্বরূপ, ধর্মের নানারূপ বিভাগ ইত্যাদি। কেবট্ট সুত্তন্তে নির্বাণের বর্ণনা:—বিঞ্ঞাণং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহং—নির্বাণ অনিদর্শন অনন্ত সর্বদিকসঞ্চারী বিজ্ঞান, যেখানে আসাযাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, ছোটবড় সব নিবৃত্তি পায়।

মহাপরিনির্বাণের মূল মন্ত্র 'বয়ধম্মা সংসারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ'—জগতে সমস্ত বস্তু অনিত্য, আত্মশক্তিতে পরম উদ্দেশ্য বোধি উপলব্ধি কর।

আবার গৃহীদের জন্য উপদেশ—তাও আছে। সীগালোবাদ সুত্তন্তটিকে অনেকে 'গৃহীবিনয়' বলেন।

মজ্ঝিম-নিকায়ে শিক্ষা দীক্ষা সাধন প্রভৃতির কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। অধিচিত্ত, অধিশীল অধিপ্রজ্ঞার বিশদ বর্ণনা এবং বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ভালবাসার ফল স্বর্গ, এ কথাও আছে। বুদ্ধদেবের পূর্বাচার্যদ্বয় আড়ার কালাম ও রুদ্রকরামপুত্রের কাহিনী ও তাদের কঠোর তপস্যা ও সাধনার বর্ণনাও আছে। মন সকলের শ্রেষ্ঠ। সেজন্য সাধনার প্রয়োজন। মনে ময়লা থাকলে দুর্গতি ও মন বিশুদ্ধ থাকলে সুগতি হয়। আবার বুদ্ধ বলছেন, যাঁরা কেবল আমাকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন তাঁরাও বিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে যাবেন।

যেসং মযি সদ্ধামত্তং পেমমত্তং সব্বেতে সগ্গ-পরায়ণা। এই সমস্ত মজ্ঝিম-নিকায়ের বিশেষত্ব।

৩। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধের ও তাঁর পূর্ববর্তী কুমার-সিদ্ধার্থ-জীবনের ছোট ছোট কথা পাই। খুব প্রাচীন ভাব ও পরবর্তী বোধিসত্ত্ববাদের সূচনা এতে বিদ্যমান। নির্বাণ অতি অল্প কথায় বুঝান হয়েছে।

যতো যো অয়ং ব্রাহ্মণ অনব সেসং রাগক্খয়ং, দোসক্খয়ং, মোহক্খয়ং, পটিসংবেদেতি এবং ব্রাহ্মণ সন্দিট্‌ঠিকো নিব্বাণং হোতি—হে ব্রাহ্মণ যেখানে দেখবে নিরবশেষ মোহক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, রাগক্ষয় সেইখানেই জানবে ইহজগতে নির্বাণ বর্তমান।

ব্রত আচার, 'শীলব্রত পরামস' নামে বৌদ্ধধর্মে চিরকাল বর্জনীয়, কিন্তু আনন্দ বল্লেন, যে শীলব্রত অনুষ্ঠান করলে পাপ বাড়ে ও পুণ্য কমে সে শীলব্রত বর্জনীয়, আর যে শীলব্রত পালন করলে কল্যাণ হয় সে শীলব্রত করণীয়। এই কথায় ভগবান বুদ্ধ বলেন, আনন্দ যদিও এখন শিক্ষাধীন তবুও ওর মত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আর নেই। পরবর্তী যুগের মহাযানীয় ভাব এতে পড়েছে।

৪। সংযুক্ত-নিকায়ের সমস্তটি পুরাতন তত্ত্বে ভরা। দেবতা এসে যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি কিরূপ সংগ্রাম করে সংসার-সাগর অতিক্রম করেছেন' বুদ্ধদেব উত্তর করলেন 'অপ্পতিট্‌ঠাহং আবুসো অনায়ূহং ওঘং ওতরিং—পদক্ষেপ না করেই বা কোন সংগ্রাম না করেই আমি ভবসাগর পার হয়েছি।' বুদ্ধদেব ভগবানের আসন নিয়েছেন।

রাহুকে বলছেন—রাহু, সূর্যকে গিলো না, ছেড়ে দাও, ও আমার প্রজা, 'মা গিলি রাহু পজং মম পমুঞ্চ সুরিয়ং।' মহাকাল বিরাট রাক্ষসের মত সমস্ত গ্রাস করতে আসছে এজন্য বুদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ হও। ভক্তি শ্রদ্ধার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। উপদেশগুলি প্রায় সব-গুলিই গৃহীদের উদ্দেশ্যে।

৫। খুদ্দক-নিকায়ে মৌলিক উক্তি ও পরবর্তী কালের রচনার সমাবেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের আবির্ভাব। যেমন খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, জাতক ইত্যাদি। খুদ্দক-পাঠে প্রাচীন ভাব। বুদ্ধদেব 'বরো বরঞ্‌ঞূ বরদো বরাহরো—যিনি শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, শ্রেষ্ঠ জানেন, শ্রেষ্ঠ আনেন ও প্রদান করেন তাঁর ধর্ম খয়ং বিরাগং অমতং পনীতং—পাপক্ষয়কর বৈরাগ্যজনক, অতি শ্রেষ্ঠ অমৃত তত্ত্ব। পরবর্তী কালের রচনা—যেমন বুদ্ধ-বংশ, চর্য্যা-পিটক, নিদ্দেশ ইত্যাদি। এতে বোধিসত্ত্ববাদ 'যদা অহং কপি আসিং নদীকূলে দরিসয়ে', চর্যাপিটক—বলছেন আমি বাঁদর হোয়ে নদীকূলে পড়ে থাকতাম। উদান নামে খুদ্দক-পিটকের প্রাচীন গ্রন্থে আছে—অত্থি ভিক্খবে অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং যদি ভিক্খবে অজাতং অভূতং অসংখতং ন অভবিস্‌স ইতো নিস্‌সরণং ন পঞ্‌ঞায়েথ'—হে ভিক্ষুগণ, অজাত অকৃত

অসংস্কৃত এক স্থান আছে, যদি তা না থাকত এই নশ্বর পৃথিবী থেকে মুক্তি সম্ভবপর হত না। যথ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি—ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু যেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

নতথ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাসতি
নতথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি।

এই সুত্তপিটক পালি টেক্‌স্ট্ সোসাইটীর ২০ খানি গ্রন্থে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি

শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

কেশবচন্দ্রের পরে "স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ" প্রবন্ধটিতে লেখক* স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তারাশির বিশ্লেষণ করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর ধ্যান-ধারণাকে যাচাই করতে চেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন ভাবপরিমণ্ডল সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যে ইংরেজ-সাহচর্য এদেশবাসীর "সর্বপ্রকার বৈষয়িক ও ব্যবহারিক সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়" ছিল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে "সেই ইংরেজ-সাহচর্যই তখন ক্রমাগত ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও দুর্গতির বাহন হয়ে পড়েছে।" লেখকের ধারণা, সেই কারণেই তখনকার দিনের চিন্তানায়কেরা, যাঁরা রামমোহন রায়ের মানস-বংশধর তাঁরা, "··· পুরাতন শ্রুতি-স্মৃতি-বিশ্বাস আর মোহের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যর্থ ও অস্বীকৃত বর্তমানের ক্ষতিপূরণ করছেন।" অর্থাৎ যেহেতু ব্যবহারিক জীবনে আর ইংরেজের সাহচর্যে উন্নতি হচ্ছে না, সেহেতু এদেশবাসীর মন ফিরে গেল ধর্মাচরণের দিকে। যদি তাই হয়, তাহলে রামমোহনের বেদান্ত-প্রচারের কারণ কি? দেবেন্দ্রনাথ কেন ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে বেদান্ত-চিন্তাকে নূতন রূপ দিতে চাইলেন? অন্ততঃ এ দুজনের সময়ে তো ইংরেজ-সাহচর্য উন্নতির কারণ ছিল! রামমোহনের সাধনাই ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সাধনা। ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করতে রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি কেউ চান নি। আসল কথা এই, পাশ্চাত্যসভ্যতার আলোকে ভারতবর্ষে যে যুগে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, সেই নবজাগরণ তখনই সার্থক হ'লো যখন জাতীয় ঐতিহ্যে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লাম। আমরা যে কেবলমাত্র গ্রহীতা, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সমস্ত দখলটাই যে পাশ্চাত্যের হাতে, এমন ধারণা থেকে মুক্তি না পেলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনই ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই উনিশ শতকে আমরা যেমন একদিকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছি, আর একদিকে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত জ্ঞান)—সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছি। সেই সঙ্গে স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জেগেছে। এই নবযুগের বাণীই ছিল—"Give and take"—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে।" রামমোহনের রচনাবলীতে, বিদ্যাসাগরের জীবনে, বিবেকানন্দের সাধনায় ভারতবাসী নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি অতিশয় যথার্থ—"If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative."

* ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার—'উনবিংশ শতাব্দীর পথিক' (ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; মূল্য—৩৲ টাকা)।

ভারতীয় ঐতিহ্যের অধ্যাত্মচেতনার দিকটিকে লেখক একেবারে এড়িয়ে যেতে চান ব'লে স্বামীজীর বাল্য-পরিবেশে নাস্তিকতার প্রভাবটাই বেশী করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তার প্রমাণস্বরূপ লেখক স্বামীজীর বাবার কথা উল্লেখ করেবলেছেন—"পিতার স্নেহ-সান্নিধ্য এবং পঠনপাঠনে উৎসাহ অগোচরে নরেন্দ্রনাথের মনে প্রত্যক্ষবাদ, বুদ্ধিবাদী মনন এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার সূত্রপাত করে থাকবে।" এর পরেই ফুটনোটে লেখক জানাচ্ছেন—"নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানা বাইবেল হাতে নিয়ে তাঁকে বলেছিলেন,—জগতে যদি ধর্ম কোথায়ও থেকে থাকে তো এখানে।" এর দ্বারা লেখক কী বুঝতে চেয়েছেন? বাইবেল কি কোন প্রত্যক্ষবাদীর মনঃপূত গ্রন্থ? বাইবেলকে যিনি শ্রদ্ধা করেন, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন? হয়তো বহির্জীবনে তিনি কোন আচরণের ভক্ত হ'ন নি—এইটুকুই বলা চলে! তাছাড়া বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরীর ধর্মানুরক্তি, তাঁর পিতামহের সন্ন্যাস-গ্রহণ—এসব কিছুরও যে প্রভাব আছে এ কথা লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

স্বামীজীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন-প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য—"নরেন্দ্রনাথ যখন এমনি সঙ্কটের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরের ঐ 'পাগল' ঠাকুরের খ্যাতি কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে; ঐ একটিমাত্র মানুষ স্থির বিশ্বাসে পরম আত্মনির্ভরতায় সঙ্গে ঘোষণা করতে পারছেন, তিনি জেনেছেন, দেখেছেন (তাঁর ঐ আত্মবিশ্বাস এবং উক্তির সামাজিক এবং দার্শনিক মূল্য যতো অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন।)"

রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র অবধি ধর্মান্দোলনের নেতারা যে পরমসত্যকে নিয়ে কেবল মুখে ও লেখনীতে চর্চা করে গেছেন, সেই সত্যকে যিনি জীবনে উপলব্ধি করে দেখালেন, তাঁর বিশ্বাস বা উক্তির সামাজিক বা দার্শনিক মূল্য লেখকের কাছে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই একটি উক্তির উপরে নির্ভর করেই উনিশ শতকের ধর্মান্দোলন নিজের সত্যকে উপলব্ধি করেছে। এই উক্তির উপরেই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং এর সামাজিক বা দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। ইতিহাস তার সাক্ষী।

লেখকের মতে যেহেতু রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথ "পাশ্চাত্ত্য প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী" থাকলেন না সেহেতু "মৃত্যু হলো তার।" অথচ একথা তিনি স্বীকার করেন, "রামকৃষ্ণই নরেন্দ্রনাথের মনে দরিদ্র জনসাধারণের সেবার আদর্শ ও কার্যক্রম উদ্দীপিত রাখছেন শেষ পর্যন্ত।" সুতরাং "যিনি মারলেন, এমনিভাবে তিনিই বাঁচিয়েও রাখলেন।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মানবকল্যাণের কোন বিরোধ ছিল না। স্বামীজীর মানবতাবোধও পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার ফসল নয়। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনারই ফসল। অন্নময়, প্রাণময়, বোধময় চেতনায় মানব চৈতন্যের উন্নতির স্তরপরম্পরা উপলব্ধি করেই ভারতের মনীষা আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী পরম ঐক্যের বাণী উচ্চারণ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই জানতেন "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" কিন্তু এই সঙ্গে একথাও স্মরণীয়, উদরপূরণই একমাত্র ধর্ম নয়—ওটা জীবন ধর্মের প্রথম ধাপমাত্র। যথার্থ ধর্ম সর্বজীবে ব্রহ্মোপলব্ধি করে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমনিভাবেই নির্বিকল্পসমাধিকামী নরেন্দ্রনাথের মনে স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হবার বীজ বপন করে যান।

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা তাই পরমসত্যলাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞানলাভের চেষ্টাও দেখি। ভারতপরিক্রমার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের

ব্যবহারিক জীবনের অতল দুর্দশা এবং পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনন্ত শ্রেষ্ঠতা—এ দুইই তাঁর চোখে পড়েছিল। বিশ্বসভায় হিন্দুধর্মের চিরন্তন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ভারতবাসীর মনে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে দিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর ঐহিক জীবনের উন্নতির জন্য নানা চিন্তায় বিভোর হলেন। কিন্তু সে ঐহিকতা ভারতের শ্রেষ্ঠ সত্যকে ভুলে গিয়ে নয়। বরং সেই সত্যকে আবার উপলব্ধি করবার জন্যে তিনি প্রথম ধাপ হিসাবে ভারতবাসীর ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি চেয়েছিলেন। স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার সঙ্গে তৎকালীন ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনগুলিরও পরোক্ষ যোগ রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন—"সামাজিক-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার-লাভের এবং জাতীয় ধ্যানধারণা আচার-আচরণ মনোভঙ্গি ইত্যাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার যে আন্দোলন ভারতে দানা বেঁধে উঠেছে, আদর্শ ও লক্ষ্য, ভাব ও অনুপ্রাণনার দিক থেকে বিবেকানন্দের আমেরিকা অভিযান তাঁর সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা, এক। তার সমগ্র রূপের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের বিশ্ব-অভিযানের প্রকৃত পরিচয়।" স্বামীজীর আমেরিকা-অভিযানকে কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের অভিযান বললে তার সীমাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হয়। এ অভিযানের যথার্থ পরিচয় এর উদার মানবতাবোধ। ভারতের সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই আমেরিকাবাসীকে Sisters and Brothers of America বলে আহ্বান ক'রে স্বামীজী সেই মানবমৈত্রীরই পরিচয় দিয়ে-ছিলেন। তাই জাতীয়তাবাদে যার শুরু মানবতাবাদে তার বিশাল বিস্তার। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই সত্যটি ছিল বলেই তিনি আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে অধ্যাত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে পরম শান্তির পথ সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন—সেই প্রেরণাকেই স্বামীজী অন্য ভাষায় বলছেন "Conquest of England, Europe and America—this should be our one supreme mantra at present, in it lies the well-being of the country." সুতরাং স্বামীজীর বিশ্ববিজয় ভাবের দিক থেকে গ্রহণীয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাত্মবিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হয়েই তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"Up, India, and conquer the world with your spirituality…"। এ বিশ্ববিজয়ের প্রয়োজন কি? "The world wants it; without it the world will be destroyed. The whole of the Western world is on a volcano which may burst tomorrow, go to pieces tomorrow." পাশ্চাত্যের এই নিদারুণ অবস্থার কারণ কি? "Materialism and all its miseries can never be conquered by materialism. Armies when they attempt to multiply armies only multiply and make brute of humanity." পাশ্চাত্য বস্তুবাদের বর্তমান পরিণতি একদিকে আমেরিকা ও রাশিয়ার মারণাস্ত্র-লীলায় এবং আর একদিকে চিন্তাজগতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কোন পরিণতির ইঙ্গিত করছে সে কথা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে এই পাশ্চাত্যজাতির সভ্যতা-সংকটে সত্যিই কিছু দিতে পারে এমন কথা বলা চলে। অরবিন্দবাবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করছেন, "ভারতবর্ষ 'পুণ্যভূমি'—অতএব এর যা কিছু তাই মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ; এই ধরণের অভিমানে তিনি বিক্ষুব্ধ।" কিন্তু একটু পরেই তিনি বলছেন, "ভারতবর্ষকে তিনি যখন

এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্থাপন করে বিচার করছেন, তখন তার আভ্যন্তরীণ জীবনের কলুষ, মানুষে মানুষে সম্পর্কের হৃদয়হীনতা ও অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে চিত্ত তাঁর বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু যখনই জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের বিচার করছেন, তখন ভারতের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই জাগে নি তাঁর মনে।" তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বামীজী ভারতের যা কিছু তাই মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন জাগতিক সম্পর্কে ভারতবর্ষকে বিচার করার সময়। আগেই বলেছি, জগৎসভায় অধ্যাত্মসাধনার পটভূমিতেই স্বামীজী ভারতবর্ষকে উপস্থাপিত করেছিলেন। সেদিক থেকে ভারতবর্ষের অনন্ত শ্রেষ্ঠতা অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু গ্রহণ করতে হবে এ কথা তিনি বহুবার বলেছেন। সেদিক থেকে 'ভারতের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে তিনি মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলধারা হিসাবে অধ্যাত্মবাদকে গ্রহণ করলেও ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার দোষ ও গুণ সম্বন্ধে স্বামীজী সমান সজাগ ছিলেন। ধর্মের নামে অন্ধকুসংস্কারকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি যখন ভারতবর্ষের উদ্দেশে বলেছেন—"Thou blessed land of the Aryans, thou wast never degraded"—তখন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার কথাই বলছিলেন, সমাজের জীর্ণতাকে তিনি অমরত্বের মালা পরাতে চান নি। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক কলহ একেবারে হয় নি তা নয়, তার কারণ ধর্ম নয়, ধর্মের নামে গোঁড়ামি। কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন সব ধর্মমতকেই ভগবান লাভের পথ বলে স্বীকার করে নিয়েছে ("রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"), এমনটি আর কোনো দেশের ধর্মচেতনার ইতিহাসে এত সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে মতবাদের পার্থক্য মাঝে মাঝে সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করেছে সত্য, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। যুগ যুগ ধরে ভগবান বুদ্ধকে যে হিন্দুরা অবতার ব'লে পূজা করে এসেছে সেইটেই বৃহত্তর সত্য। কিন্তু অরবিন্দবাবু একমাত্র বৌদ্ধ-বিহারের উপর হিন্দুদের আক্রমণের উল্লেখ করেই হিন্দুধর্মের সহনশীলতার "ঐতিহাসিক সত্যতা" অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলেছি। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধটি স্মরণীয়। সে প্রবন্ধে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্য দান করা সম্ভব।" ভারতবর্ষে একদা সমাজ-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এই চেষ্টাই করা হয়েছিল। যদিচ, পরবর্তীকালে নানা অন্যায়ের দ্বারা সে ব্যবস্থা অত্যাচারে পরিণত হয়েছে, তবু তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সে যাই হোক, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার মূলকথাটি যে উদারতা ও সহনশীলতা, তার প্রমাণ হিন্দু বৌদ্ধদের এককালের সংঘাত থেকে অপ্রমাণিত হয় না। ঐ সংঘাত ধর্মমতের জন্য হয় নি, হয়েছিল ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির স্পর্শ থাকায়। পরবর্তীকালের হিন্দু-মুসলমান সংঘাতও সেই এক কারণেই ঘটেছে।

(ক্রমশঃ)

হৈম-বিজয়া

স্বামী পূর্ণানন্দ

এসেছে পত্র,
কয়েক ছত্র,
অরুণ রাগের—
রক্তাক্ষরে লেখা। ১

হৈম তুষার
শুভ্র শিখরে,—
যেন সে ঊষার
প্রথম চরণরেখা॥ ২

কলরবহীন—
পার্বতী ভাষা,
ভাবঘন অতি,
প্রশান্ত গম্ভীর। ৩

ক্ষণ ইঙ্গিতে
মর্মের বাণী,—
কহে যেন মোরে—
শতেক শতাব্দীর!! ৪

এসেছে পত্র,—
শুভ্র বক্ষে,
সে মহাকালের
চির রহস্যচিত্র! ৫

ধেয়ান-মৌন,
সমাধি-মগ্ন,
বজ্র সমান—
প্রোজ্জ্বল সুপবিত্র॥ ৬

তুষার-ঝঞ্ঝা
ছাড়ে হুঙ্কার।
গহন শূন্যে—
অনাদি সে ওঁকার;—৭

উদাস কঠোর—
হিমেল বাতাসে,
তোলে যেন কোন্
অতীতের ঝঙ্কার!! ৮

নিরালা শূন্য—
শৈলশিখরে,—
তীব্র মরমী সুরে,—
একক ঈগল হাঁকে। ৯

হৃদয় নিভৃতে
চির বৈরাগী,—
উদাসীন সুরে—
বারে বারে মোরে ডাকে॥ ১০

কহে যেন, ওই—
হের হিমালয়,
চির মনোহর,
শান্ত সাধন-ক্ষেত্র। ১১

নাহি ইতিহাস—
কত কাল ধরি,—
গৌরী ও হর—
মুদিয়া পদ্ম-নেত্র;—১২

রয়েছে দুজন,
দোঁহাকার লাগি;
কি গভীর ওই—
অবিচল তপোমগ্ন! ১৩

মকর কেতন
যেথা পরাজিত;
কাম-ধনু যেথা—
হোলো চিরতরে ভগ্ন!! ১৪

বিষয়ের বিষ,
ধনের গর্ব,
তোলে নাক' যেথা—
কাল-ভুজঙ্গ শির। ১৫

পশে নাক' যেথা
স্বার্থমথিত—
কোলাহল শত,
জলমান পৃথ্বীর!! ১৬

যেথা ধরণীর—
যশ-মান-ধূলি,
বিলীন—মৃত্যু-
তুষারশিলার তলে। ১৭

সর্ব বাসনা—
নিঃশেষ চিতে,—
শিবরূপ যেথা—
ফোটে প্রেমাশ্রু জলে॥ ১৮

দূরাগত ধ্বনি,—
কহে যেন শুনি,—
দেখ—দেখ—চাহি,—
নাচে ওই মহাকাল! ১৯

পৃথিবীর মায়া,—
চির মরু-তৃষা।
ছিঁড়ে ফেলে এসো,—
জনম-মৃত্যু-জাল॥ ২০

জ্যোতির্বেদের দুই একটি কথা

শ্রীঅনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়

মূকের যেমন আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশের মুখদর্পণ ও হাতের নানারূপ ভঙ্গি ভিন্ন অপর পন্থা নাই, তেমনি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ভিন্ন যেন আর কোনরূপ ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশের উপায় না পাইয়া বেদ উক্ত শব্দ দুটির প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সামবেদে "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ" ইত্যাদি দ্বারা ক্রমসঙ্কোচের পর ক্রমবিকাশের যেন একটা ইঙ্গিত দিতেছেন। মহাপ্রলয়-কালে ঋত ও সত্য স্বরূপ কেবলমাত্র পরব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। ইহা ব্যতীত সবই অন্ধকারময় ছিল। বস্তুবিজ্ঞানের একটি উপমা লওয়া যাক। বৈদ্যুতিক আলোকের প্রকাশের পশ্চাতে দুটি শক্তি বিদ্যমান থাকে—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি (Positive & Negative forces)। উহাদের পরস্পর আলিঙ্গনের ফলেই আলোর বিকাশ। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাকালে অন্ধকারময় অবস্থার উদ্ভব হয়। উপরোক্ত রূপে দুটি শক্তি নিজ নিজ কক্ষে সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকাকালে তমসাচ্ছন্ন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?—ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, অব্যয় সাক্ষি-স্বরূপ ইহার পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। বালক যেমন বিজলিবাতির সুইচ টিপিয়া কখনো আলো জ্বালায়, কখনো বা বন্ধ করিয়া অন্ধকারময় করিয়া আনন্দ লাভ করে এবং তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে উত্তর দেয় "আমার ইচ্ছা", 'কেন'র উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়, সেইরূপ সৃষ্টির সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও বালকের ঐরূপ উক্তি ভিন্ন অপর উত্তর পাইবার আশা নাই।

ইহার পরে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে বীজাকারে অবস্থিত জীবকুলের প্রাক্তন কর্মহেতু বৃত্তিস্ফুরণ হইতে জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। এখানে সমুদ্র বলিতে পরোক্ষ শক্তিরূপ সমুদ্র সংজ্ঞাটি দেওয়া যাইতে পারে। সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। "Like things repel, unlike things attract" (সদৃশ বস্তু সদৃশ হইতে দূরে যায়, অসদৃশ বস্তু পরস্পরকে আকৃষ্ট করে) এই বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করার মাধ্যমে যে শক্তিটুকু পরস্পরকে ত্যাগ করিতে হয় তৎফলেই এক একটি সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যায় বিশ্বসৃষ্টির সময় এরূপ ভাবের একটা শক্তির লীলা প্রকটিত হওয়ার ফলেই সেই সময় জলময় সমুদ্র হইতে প্রকাশমান জগতের ধাতা প্রভু উৎপন্ন হইল। পরপর সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সাতটি গ্রহের সৃষ্টি হইল। স্বর্গাদি লোকের ও অনন্ত নক্ষত্র-পুঞ্জের সৃষ্টি হইল। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলে কিভাবে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ চলিতে লাগিল তদ্‌বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ইঙ্গিত দিতে লাগিলেন। সূর্য হইতে সৃষ্টির শক্তি চন্দ্র গ্রহণ করিলেন বীজকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য। উক্ত শক্তিদ্বয় মিলনসময়ে পরস্পর যে শক্তিটুকু পরিত্যাগ করিলেন তৎফলেই প্রথমে আকাশ, পরে বায়ু, তৎপরে অগ্নি এবং জল, সর্বশেষে পৃথ্বীর উদ্ভব হইল। এই পাঁচটিই সৃষ্টির মৌলিক উপাদান। আকাশকে মৌলিক পদার্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে বৈজ্ঞানিকগণ নারাজ। কিন্তু আর্যঋষিগণ আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ ছিলেন। কারণ ঐ ভূমিতে আরোহণ করিয়াই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকগণও উহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রোটন্ ইলেক্‌ট্রন্ গঠিত অতি সূক্ষ্মতম অণুপরমাণুর সন্ধান নিয়া পরোক্ষ শক্তির সহায়ে বাস্তব জগতে বহু কিছু

করিতেছেন, যাহার ক্রিয়া আমরা খোলা চোখে দেখিতে পাই এবং ইহার পিছনে অতি বড় শক্তি রহিয়াছে তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কী—সেইটি বলতে পারেন না। আর্যগণ দেহাত্মিকা বুদ্ধিকে ধ্বংস করিয়া "অবাঙ্-মনসগোচরম্"কে সন্ধান করিতে যাইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া বোবার আনন্দপ্রকাশের মত আকারে ইঙ্গিতে জীবগণের নিকট অনেক কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া পরব্রহ্ম আখ্যা পর্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। দর্শনাদি শাস্ত্রে উহা প্রকাশের যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

এখানে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহায়তা লইয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে একটু আভাস দিতে হইল। জ্যোতিবিদের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। শাস্ত্রে আছে রবিই সৃষ্টি-কর্তা। সমস্ত শক্তির উৎস উক্ত গ্রহে। আধেয় থাকিলেই আধারের প্রয়োজন। এই শক্তিকে ধারণ করিবার মত উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চন্দ্রকেই একমাত্র শক্তিমান্ পাত্র দেখিতে পাই। এই শক্তি ধারণ করার ফলেই চন্দ্র স্ত্রীপদবাচ্য। প্রকৃত পক্ষে চন্দ্র পুরুষ, ইহার পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, ইহাকে পরোক্ষশক্তি বলার দরুণ স্ত্রীগ্রহ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্যবহারিক জগতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদাভেদ এই কারণেই হওয়া সম্ভব। এইটুকু বলিলেই চন্দ্র সম্বন্ধে সব বলা হইল না। মাতৃবক্ষে চন্দ্রামৃত পান করিয়াই জীবগণ জীবনধারণ করিয়া থাকে। এ জন্যই উনি ক্ষীর-সমুদ্রের মালিক। পূর্ববর্ণিত পরস্পর শক্তি ত্যাগের ফলে যে সব ভূমি রচিত হইয়াছে তৎফলেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। এখন ইহাদের ব্যবহার কি ভাবে হইয়া থাকে তাহা বলা দরকার; রূপের জন্য চক্ষু, শব্দের জন্য কর্ণ, গন্ধের জন্য নাসিকা, রসের জন্য জিহ্বা, স্পর্শের জন্য ত্বক্। সাজাইবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় প্রথমে চক্ষু, পরে কর্ণ, তৎপরে নাসিকা তার পিছনে জিহ্বা, সর্বশেষ ত্বক্ এই ভাবেই বুঝি লোকে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে! শাস্ত্র কিন্তু পূর্বোক্তভাবে লক্ষ্য করেন নাই, প্রথমে আকাশ সৃষ্টি দেখিতে পাইলেন, পরে যথা-ক্রমে বায়ুর, রূপের, রসের, গন্ধের সন্ধান পাইলেন। এরূপ ভাবে রচনার তাৎপর্য বোধহয় ক্রমবিকাশের একটা আভাস। যেরূপ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শক্তির সহায়ে এক একটি সৃষ্টি করার পরে পরেই তাহাদের শক্তির হ্রাস হইতে থাকে, পরে যেটুকু থাকে তাহাকে পৃথ্বী আখ্যা দিলে পর ভুল হইবে না। উপরোক্ত বিন্যাসের সহিত গ্রহদের সম্পর্ক কি?—এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। তদুত্তরে বলা যায় আকাশ তত্ত্বের মালিক বৃহস্পতি, বায়ু তত্ত্বের শনি, তেজ তত্ত্বের মঙ্গল, জল তত্ত্বের শুক্র, পৃথ্বী তত্ত্বের বুধ। শেষোক্ত গ্রহটির সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। বীজাকারে অবস্থিত জীবকুলের প্রাক্তন কর্মহেতু বৃত্তি স্ফুরণ হইতে জলময় সমুদ্রের উৎপত্তি; পূর্বে উহা উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও কিভাবে জীবকুলের বীজ উক্ত সমুদ্রে যাইয়া পৌঁছায় তাহা বলা হয় নাই। কাজেই ইহার তাৎপর্যার্থ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়। পৃথ্বীতত্ত্বের মালিক বুধ চন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র। ভাগবতে ইহার জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পিতার ধাতু—প্রকৃতি পুত্রে পাইয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে কারণের উৎপত্তি, পরে কার্য, তৎপরে পরিণতি। জন্মিবার কারণ পিতা, প্রকাশ সে স্বয়ং, পরিণতি তাহার পুত্র। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নবম ও পঞ্চম পর্যায়ে পড়িয়া যায়। ক্রমবিকাশের পঞ্চম পর্যায়ে বুধের স্থান। শাস্ত্রেও পঞ্চম স্থানকেই পুত্রস্থান বলিয়া অভিহিত করিলেন। কাজেই বুধকে পুত্র বলা যাইতে পারে। কৃষক যেমন ক্ষেত্র হইতে

ধান্য আনিয়া উৎকৃষ্ট শস্যটি বীজ রাখিয়া বাকী গুলি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, সেইরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় সৃষ্টির স্থূল অংশগুলি বিভিন্ন ভাবে জীবগণ এখানে ভোগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মতম অংশগুলি মনে হয় বীজাকারে চন্দ্রে যাইয়া অবস্থান করে। উল্লিখিত পদ্ধতিতেই জীবমাত্রের বারংবার আসাযাওয়ার একমাত্র হেতু। এখন মানব-দেহে কিভাবে গ্রহগণ অবস্থান করিয়া নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান তাহার কি হদিশ দিতে পারেন তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জন্মকালীন গ্রহ সংস্থান যাহাই থাকুক—মানব-দেহে গ্রহবিন্যাসের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে কিনা এবং ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচের ধারাই বা কি? গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি উর্ধ্বে বুধগ্রহের অবস্থান; ওখানে পৃথ্বী তত্ত্বের উদ্ভব। তৎপর মেঢ্রূ দেশ হইতে লিঙ্গের বা রসের উৎপত্তি, ঐ স্থানের মালিকানা স্বত্ব শুক্রের। নাভিমূলে অগ্নির উদ্ভব, মঙ্গলের স্থান; হৃদয়দেশ কল্পনার স্থান, শনি উহার স্বত্বাধিকারী। কণ্ঠে শব্দের উৎপত্তি, বৃহস্পতির স্থান; ভ্রূদেশ-সংযোগ সূত্রের স্থান, চন্দ্র উহার কর্তা; মস্তকোপরি রবির স্থান, ওখানে সমস্ত শক্তির উৎসের উৎপত্তি। এখানে দেখিতে পাওয়া যায় সর্বশুদ্ধ ভূমি সাতটি, নিম্ন পাঁচটি ভূমির স্রষ্টা রবি ও চন্দ্র। চন্দ্র একাই সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। রবি আত্মার, চন্দ্র মনের নির্দেশক। উভয়ই সত্ত্বগুণের আধার। উহাদের প্রকৃতিগত গুণানুসারে মানবমাত্রেই সত্ত্বগুণী হওয়া শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু হায়! উহাদের প্রেরণায় মানবগণ হাবুডুবু খাইতেছে। তাইত শাস্ত্রকার রবিকে পাপ-গ্রহ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কেন করা হইয়াছে? —মানবমনে ইনিই এই কর্তৃত্বাভিমানটি প্রকৃষ্ট-রূপে বপন করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কাজেই প্রত্যেক মানব মদগর্বে গর্বিত হইয়া সৃষ্টির সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করিতে যাইয়া এত দুঃখ, এত কষ্ট, তদুপরি বার বার যাতায়াতের যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এখানেই শুধু পাপগ্রহ বলা হয়। উল্লিখিত অহঙ্কারটির বসবাস করিবার স্থান কোথায়?—মনো-জগতে। উহার মালিকানা চন্দ্রে। শাস্ত্র ইঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সত্ত্বগুণী, অজাতশত্রু, অতিশুভ্র গ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ক্ষেত্রে কোন্‌টি সৎ কোন্‌টি অসৎ তাহা প্রথমে বাত্‌লাইয়া থাকেন, এজন্যই তিনি পাপ-সংজ্ঞায় অভিহিত হন নাই। মনের দুটি স্তর আছে,—একটি জাগ্রত মনের স্তর, তাহার কাজ বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলা। অপরটি সুষুপ্ত মন, তিনি সংযোগ রক্ষা করেন পরমাত্মার সঙ্গে। যিনি উক্ত মনের সন্ধান পাইয়াছেন তিনিই সর্বপ্রকারে এই অহঙ্কারটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তখনই রবির সত্ত্বগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্র সম্বন্ধে বলিবার যথেষ্ট রহিয়াছে। ইনি সকলের সহিত সহযোগিতা করিতে উন্মুখ। দেহের মধ্যে ইনি জাগ্রত মনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া নিম্ন ভূমিতে —নাভি, লিঙ্গ, গুহ্যমূলে বসবাস করেন। তখন যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্যই যেন প্রস্তুত। মঙ্গল অগ্নিরও যন্ত্রের উপর কার্য করিয়া থাকেন, উঁহার প্রকৃতি বড়ই উগ্র, সর্বদাই যেন 'যুদ্ধং দেহি' ভাব, শারীরিক ও মানসিক শক্তির পোষক ও ধারক, কাজেই যুদ্ধই যেন ইঁহার পেশা। এহেন গ্রহের সহিত চন্দ্র যখন হাত মিলান তখন সমাজ-বিশৃঙ্খলা, পররাজ্য-জয় প্রভৃতি বহু প্রকারের অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন। কিন্তু যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংগ্রাম বাধাইবার প্রেরণা দিয়া তাহাকে বিজয়ের মাল্য প্রদান করেন তখনি বলা চলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় ওখানেই।

শুক্রের একটু ইতিবৃত্ত জানা থাকিলে সুবিধা হয়। ইঁহার কর্তৃত্ব লিঙ্গমূলে, অতি স্থূল বস্তুর রস হইতে শুরু করিয়া অতি সূক্ষ্মতম অংশে পৌঁছিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। কাজেই তিনি যে জগৎতত্ত্বের মালিক, অতএব রস-উদ্ভাবক এবং যাবতীয় ভাবে রসোপভোক্তা—কদর্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কদর্য সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ রহিয়াছে, নাই শুধু ব্রহ্মানন্দ-রস-নিষ্কাসনে। জ্ঞানীকে তাঁর সাধনাগারে বসাইয়া এটা নয়, ওটা নয় ইত্যাদিতে সূক্ষ্ম মন প্রেরণা দিয়াই চলিয়াছেন, যতক্ষণ না তিনি অমৃতত্বের সন্ধান পান। বৈজ্ঞানিককে সন্ধান দিবার ভঙ্গি কিন্তু অনুরূপ। গবেষণাগারে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শক্তির অন্বেষণ বিশ্লেষণের অঙ্ক কষিয়াই যাইতেছেন, যে পর্যন্ত না তিনি শক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারিতেছেন। বুধগ্রহ পৃথ্বীতত্ত্বের মালিক। তিনি উজ্জ্বল কিরণ জালকেও তাঁহার নিজ শক্তিপ্রভাবে আবরিত করিয়া অন্ধকারে পরিণত করেন। অমন যে প্রখর সূর্য, চন্দ্রের রশ্মিজাল তাহাকেও মলিন করিতে কুণ্ঠিত নয়। ঋষিরা বলিতেছেন, বুধ—বুদ্ধিদাতা, যুক্তিবাদী, ভেদস্রষ্টা। সুতরাং জীবকে যখন ব্যক্তিত্ববোধের যুক্তি ও বুদ্ধি জোগান তখন তিনি পৃথ্বীতত্ত্বের মালিকানাস্বত্বে স্বত্ববান। বন্ধনের অতি পাঙ্কল হ্রদে নিক্ষেপ করিয়া বন্ধনরজ্জু হাতে রাখিয়া দেন মজা দেখিবার জন্য। এস্থলে বলা চলে,—হে বুধ, সত্যই তুমি প্রত্যক্ষপ্রমাণের মূর্ত বিগ্রহ! যখনই তুমি দার্শনিকের নেতি নেতি বিচারের যুক্তি প্রদর্শন করাইয়া বিচারের পথ দেখাও এবং নির্বাণ অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিয়া অনুমানকে প্রত্যক্ষের মত গোচরীভূত করাও তখনই বুঝি তোমার রাহুমুক্ত অবস্থা? বৈজ্ঞানিকগণকে কি তুমি অবগত করাও যে, তুমি কি বস্তু? যাহার ফলে তোমারই বুকে সৃষ্টিধ্বংসের নমুনা প্রতিনিয়ত পরীক্ষিত হইতে চলিয়াছে। ধন্য তোমার পরোক্ষ শক্তির বিকাশ! দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে তোমার মহিমা কীর্তন করিয়া পিতা ও পুত্র যে একই বস্তু (চন্দ্র ও বুধ) তাহা প্রমাণ করিয়া থাকেন।

চন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে। এখন ইনি যে অর্বব উপাধিটি গ্রহণ করিয়াছেন, উহার প্রমাণ কোথায়?—তাপমান যন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় পারাটি নীচুতেই পড়িয়া থাকে। উহাকে ঊর্ধ্বমুখী করিতে হইলে উত্তাপের প্রয়োজন। উপরোক্ত গ্রহটি যে মনের ও জলের অধিপতি তাহা সর্ববাদিসম্মত। জলের শৈত্যগুণ আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় মনের স্বভাবই হইয়াছে নিম্ন ভূমিতে থাকা। সৃষ্টি-কর্তা যেন অঙ্গুলিনির্দেশে জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন, নাভিমূলে তাকাও—সেখানে দেখিতে পাইবে অগ্নি (Electricty) পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। উহার সহায়তায় মনকে বাষ্পাকারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লও, তখন তুমি দেখিতে পাইবে তোমার নিম্নভূমির বিকাশই সব নয়। জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার চোখের গড়ন এমনি ভাবে ন্যস্ত যে উপরের দিকে তাকাইবার শক্তিই তোমার নাই। বাহিরে কতটুকু দৃষ্টি তুমি দিতে পার?—তাহাও তো সীমাবদ্ধ। তুমি তো জান স্থূল অগ্নির মালিক কে—তিনি যে যোদ্ধা তাহাও তুমি জান। তোমার যুদ্ধের আয়োজন দেখিলে পর তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহার আগ্নেয় শক্তির প্রভাবে তোমার মনকে উপরে তুলিয়া দিবেন। তখন তুমি দেখিতে পাইবে তোমার উপরের স্তরে কোন্ কোন্ শক্তি বিরাজ করিতেছে। সেই অনুযায়ী তুমি জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত যেটি তোমার অভিরুচি—সেইভাবে ও পথে জীবনকে পরিচালিত করিতে পারিবে। নিম্নভূমির কাজ তো প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছ—আহার নিদ্রা, মৈথুন। উহা সম্পাদন করিতে যতটুকু শক্তি ও কর্ম-

প্রেরণা দেওয়া দরকার তাহা তো তিনি প্রদান করিয়াই যাইতেছেন।

বৈজ্ঞানিকগণ মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য অনেক তোড়জোড় করিতেছেন, হয়ত বা যাইতেও পারেন। ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই! ইহা দ্বারা পৃথিবীর উপর মঙ্গলের প্রভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না। ঋষিকুমারগণ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া উক্ত সব লোকে গমনাগমন করিতেন বলিয়া পুস্তকাদিতে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উহাতে বস্তু-বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই বিশ্বাস করিতে মন সহজে রাজী হইতে চায় না। অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার মত সুযুক্তিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধরুন, কোন শিশুর শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলে কুমার অবস্থায় তাহার পিতা ছিল কিনা প্রশ্ন করিলে, সে তাহার পিতার চেহারা ও প্রকৃতির বিষয় বর্ণনা না দিতে পারিলেও—'ছিল না' একথা বলিবার তাহার শক্তি নাই, কেননা তাহার জন্মিবার কারণ তাহার পিতা এবং প্রকাশ সে স্বয়ং—এ অবস্থায় অস্বীকার করিবার যুক্তি কোথায়? বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ নিজেরা উক্ত গ্রহে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর লোকও সেই সুযোগ গ্রহণ করিবে। পুরাকালে কিন্তু সে সুবিধা ছিল না। যে বালক ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গুরুর উপদেশমত প্রাণায়াম দ্বারা নিজকে উপযুক্ত করিতেন, তিনিই শুধু ঐ সব লোকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন। বর্তমানে উহা প্রবাদবাক্যে পরিণত। শাস্ত্রে ঐরূপ ভ্রমণের সঙ্কেত দেওয়া আছে। সূর্যলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি সাতটি লোকের কথাও উল্লেখ আছে। উহাদের প্রকাশ বাহিরেও যেরূপ দেহমধ্যেও তদ্রূপ। ঐ রকম লোকে যাইতে হইলে চন্দ্রই এক মাত্র কাণ্ডারী, যেহেতু মনের নির্দেশক উক্ত গ্রহ। তিনি যখন সূক্ষ্মাকারে মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করেন তখন বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া গবেষণা করেন—দার্শনিক ও সাধক অন্যভাবে উহা উপলব্ধি করেন। ক্রমবিকাশের যে ধারা নির্দিষ্ট আছে সেই অনুযায়ী দেখা যায় নাভিমূলে প্রাণময় কোষের অধিষ্ঠান। ইনিই নিজ শক্তি দ্বারা মনকে বায়বীয় অবস্থায় উপরের দিকে বায়ু তত্ত্বের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। উক্ত স্থান হইতে মনোময় বিজ্ঞানময় কোষের কার্যারম্ভ হয়। তৎপরেই আকাশতত্ত্ব বিরাজমান, সেখানে শুধু স্বরের উৎপত্তি। শাস্ত্রকার বলিতেছেন এখানে পৌঁছিলে মৃত্যু। একথা বলিবার তাৎপর্য কি? এখানে কাহার নাশ দেখিতে পান? অন্নময় কোষের বা দেহাত্মিকা বুদ্ধির কি? ইহাই কি শাস্ত্রের মর্মার্থ? তাহা না হইলে বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর হিসাব মিলাইবার পক্ষে সুযোগ ঘটে না। জ্ঞানী ও যোগীর তত্ত্বানুসন্ধান সফল হয় না। স্তব-স্তুতির মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা কি এইটিই প্রমাণিত হয় যে, তেজ হইতেই সব দেবদেবীর আবির্ভাব? তেজ ভিন্ন তো রূপদান করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। তমোগুণী মঙ্গল মানবের ও দানবের রূপ দান করিতে পারে। সত্ত্বগুণী সূর্যেরই দেবতার রূপ দান করিবার ক্ষমতা। চন্দ্র বা জল তো অরূপ। কিন্তু দুয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই শুদ্ধসত্ত্ব অবয়ব সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধক আকাশমার্গে পৌঁছিলেই সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মায়ের রূপ দর্শন, তাঁর কথা শ্রবণ, তাঁর সান্নিধ্যে স্পর্শানুভব, তাঁর চরণকমলের আঘ্রাণ, আনন্দরসে আপ্লুত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয় ওখানেই সাধিত হয়। ক্রমসঙ্কোচের পরিণতি ওখানেই দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

প্রভু, তুমি কি আমার জীবনের আশা
তুমি কি আমার মরমের ভাষা
তুমি কি আমার প্রেম-ভালবাসা
স্বরগের পরিমল ?

ওগো, তুমি কি আমার হৃদিরঞ্জন
তুমি কি আমার প্রিয়-বন্ধন
তুমি কি আমার দুঃখখণ্ডন
করো মোরে উজ্জ্বল ?

প্রভু, তুমি কি আমার জনম-মরণ
তুমি কি আমার জীবন ধারণ
তুমি কি আমার সকল-কারণ
জনম জনম ধরি ?

ওগো, তুমি কি আমার যশ-সৌরভ
তুমি কি আমার জয়-গৌরব
তুমি কি আনিছ সুখ-বৈভব
জীবন পূর্ণ করি ?

প্রভু, তুমি কি আমার নয়নের বারি
তুমিই কি মোর সন্তাপহারী
তুমি কি আমার সবশুভকারী
রয়েছ সতত জাগি ?

ওগো, তুমি কি আমার আঁধারের আলো
তুমি কি আমার জীবনের ভালো
তুমি কি দগ্ধ হৃদয়েতে ঢালো
অমৃত—শান্তি লাগি ?

প্রভু, তুমি কি আমার ধ্যানের মুরতি
তুমি কি আমার শক্তি-ভকতি
তুমি কি আমার একান্ত গতি
সংসার-নির্বাণ ?

ওগো, তুমিই কি তাই জীবনে মরণে
সাথে সাথে থাকো সকল স্মরণে
চিরদিন তব কমল-চরণে
রহিবে আমার প্রাণ ?

পুণ্যক্ষণ

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু

বাসনার বনে আগুন লাগিবে ভস্ম হইবে যেই সে ক্ষণে—
ভক্তিডালায় ফুল-চন্দন রবে প্রাণ-মন সে শুভদিনে।
প্রেমের প্রদীপ জ্বলিবে সেদিন কত যে তাহার ঠিকানা নাই,
পাপেরে হানিবে প্রবল আঘাত পাপীরে আপন করিবে তাই।
দেহের লালসা আত্মার লাগি লজ্জায় সব নিলে বিদায়,—
হৃদয় কাঁদিবে তোমারি লাগিয়া, কোথায় তোমার দীপ্তি হায়!
সারা জগতের প্রকৃতির মাঝে যবে এই প্রাণ চাবে মিলন,
সুদূর দরীর নির্জনতায় সত্যের মাঝে খুঁজিবে ক্ষণ।
যেদিন যেক্ষণে আঁধারে ফেলিয়া পৌঁছিবে ঐ দূর সীমায়,
জীবন মরণ সুখদুঃখ সব এক হ'য়ে যাবে ও রাঙা পায়।

ফ্রান্সে জননী সারদাদেবীর জন্মোৎসব

স্বামী জীবানন্দ

প্যারিস শহর হইতে ২২ মাইল দূরে গ্রেজ (Gretz) নামক স্থানে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র (Centre Vedantique Ramakrishna)। এই কেন্দ্রের সূত্রপাত করিয়াছিলেন স্বামী যতীশ্বরানন্দজী (বর্তমানে ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ), ১৯৩৬ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সময়। ঐ কাযের স্থায়ী রূপ দিবার জন্য স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। তিনি ধীরে ধীরে কাজটি গড়িয়া তুলিতেছিলেন, এমন সময় ইওরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগিয়া যায়। যুদ্ধের কয়েক বৎসর নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ফ্রান্সেই রহিয়া যান এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে বক্তৃতা ও ক্লাস প্রভৃতি চালাইতে থাকেন। যুদ্ধ শেষ হইলে ১৯৪৬ সাল হইতে তিনি অধ্যাপক রেনোঁ (Prof. Renou) কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে উপনিষদ্-সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন এবং একটি দার্শনিক-গবেষক সমিতির উদ্যোগে সরবঁ (Sorbonne) নামক স্থানে সর্বসাধারণের জন্য নিয়মিত বক্তৃতাদিও দিতে থাকেন। এই বক্তৃতাগুলির প্রভূত সমাদর হয়।

১৯৪৮ সালে জনৈক ভক্তের বদান্যতায় গ্রেজে বেদান্তকেন্দ্রের বর্তমান স্থায়ী জমি ও বাড়ী কেনা হয়। তদবধি কেন্দ্রের ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বহুমুখী কর্মধারা এখান হইতেই নির্বাহ হইয়া আসিতেছে। গত বৎসর এই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের ১০৩তম জন্মোৎসবের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ মূল ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়া শ্রী পি শেষাদ্রি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে (আগস্ট, ১৯৫৬) প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহা অবলম্বনে ঐ উৎসবটির একটি পরিচিতি উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

১০৩তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে ৪ঠা জানুআরি, '৫৬ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বলেন যে জননী সারদাদেবীর দৃষ্টিভঙ্গী একটি নিশ্চিত আধ্যাত্মিক আদর্শের সন্ধান দেয়। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে 'শাশ্বত নারী-প্রকৃতি'টির (Eternal Feminine) স্বরূপ হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ।

'মায়ের কথা' হইতে কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ মিঃ জি পিটোএফ্ পাঠ করেন। এইগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের দেবী-ভাবটি পরিস্ফুট ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বলেন :

"চিরন্তনী নারী-প্রকৃতি (Eternal Feminine) সম্বন্ধে ধারণার সহিত পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টান জগৎ সুপরিচিত। কুমারী সাধ্বী মাতা অনুতপ্ত জীবাত্মা ও ত্রাণকর্তার মিলন-সেতুস্বরূপ, তিনি ঈশ্বরকৃপা-লাভের পথ দেখাইয়া দেন। ভারতবর্ষে বৈষ্ণবেরা লক্ষ্মীদেবীর কৃপার উপরে বিশেষ জোর দিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতে লক্ষ্মীর প্রসাদেই মুক্তি অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্তক বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের মতে সাধকের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মলাভে লক্ষ্মীমন্ত্রই প্রধান সহায়ক। হিন্দুধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়েও (শৈব এবং শাক্ত মতে) শাশ্বত নারী-সত্তা সম্বন্ধে ধারণা দেখিতে পাই, ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তি মায়া হইতেই জগৎ উদ্ভূত। মায়ার প্রসন্নতা ব্যতীত মোক্ষ বা মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।"

অতঃপর সিদ্ধেশ্বরানন্দজী তাঁহার উক্তির দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভাবার্থ পরিস্ফুট করেন :

"আমাদের ইচ্ছাশক্তি আংশিক-দর্শনদুষ্ট। বাহ্যিক

বা আভ্যন্তরিক সর্বপ্রকার পরিমাণশূন্য সত্তাকে 'পরিমিত' করিবার আমাদের অন্তহীন প্রয়াস। মূলতঃ দ্বৈতদর্শনেই পাপের উদ্ভব। হাজার হাজার রকমের জিনিস আমরা দেখিতেছি! এই দোষ দূর করা যাইতে পারে একমাত্র চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই। ..... 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সার্বভৌম সত্য 'আমি কর্তা নই; ঈশ্বরই সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা' এই বোধ হইতেই আসে। কেবল একটি মাত্র ইচ্ছা আছে, ইহা হইল ঐশ্বরিক ইচ্ছা। এইরূপে অজ্ঞানের আবরণ সরাইয়া আমরা জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিতে আরোহণ করিতে পারি। যিনি ঠিক ঠিক শরণাগত তিনিই নিজেকে অকর্তারূপে জানিতে পারেন; শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিনি নিজেকে 'ঝড়ের এঁটো পাতার মতো' দেখেন। এই যে শরণাগতির অবস্থা যখন ঈশ্বরেচ্ছার উপর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে তখনই চিরন্তনী নারী-প্রকৃতির উপলব্ধি হয়। স্ত্রী প্রকৃতির লক্ষণ কি? আবিষ্ট সত্তা। যেহেতু পরমপুরুষ আমাদিগকে উদ্ধারের জন্য আসেন সেইজন্য আমাদের উচিত আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিত্বগুলিকে তাঁহারই ইচ্ছার উপর সমর্পণ করিয়া কর্মে ব্রতী হওয়া। জার্মান মরমিয়া সাধক একদা বলিয়াছেন,—আত্মাকে 'নারী' শব্দে প্রকাশের চেয়ে অনুপম ভাষা আর কি আছে? ..... আত্মা নারীসত্তাবিষ্ট হইয়া নূতনরূপে প্রকাশোন্মুখ হয়—এইভাবেই ঈশ্বরের পিতৃসমুচিত হৃদয়ে খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে।

"যে ব্যক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থাটির উপলব্ধি হইয়াছে তিনিই ঐশ্বরিক ও আপেক্ষিক সত্তার মধ্যে— পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মহামিলনের মধ্যস্থতা করিতে পারেন।

"শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্পূর্ণ ত্যাগ অর্থাৎ আত্ম-বিলুপ্তির জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনদর্শন আমাদের চলার পথের আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বানুযায়ী তাঁহাকে সাধ্বী মাতা (Blessed Virgin) বলা যাইতে পারে; সাধ্বী মাতারই মত তিনি ছিলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্তিনী ও মিলনকারিণী। জনৈক কার্থুসিয়্যান্ মঠাধ্যক্ষ (Carthusian Friar) লিখিয়াছেন, 'সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়— তিনি মেরী যিনি আমাদিগকে পবিত্র করেন অর্থাৎ সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া প্রিয়তমের সহিত মিলনযোগ্য করিয়া দেন।'

"আবার যেমন বাইবেলে আছে, 'প্রভু' 'প্রভু' করিয়া ডাকিলেই মুক্তিলাভ হয় না, সেইরূপ শ্রীশ্রীমাকে চিন্তা করা ও মাতৃনাম বার বার উচ্চারণই যথেষ্ট নয়। আমরা বরং তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করিব। তাঁহার আদর্শ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। আমরা যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীমা চিরন্তনী মাতৃসত্তার মূর্তিমতী বিগ্রহস্বরূপিণী। গুরু— যাঁহার মধ্য দিয়া আমরা ঈশ্বরের কৃপালাভ করি, যিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ, শ্রীমা ছিলেন সেই গুরুশক্তির প্রতীক।

"শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-স্মরণে আমাদের এই প্রার্থনাই হউক যেন আর আমরা দৈনন্দিন কর্তব্যকর্মে নিজেদের কর্তারূপে না ভাবি—তাঁর ইচ্ছাতেই সমুদয় নিয়ন্ত্রিত এই চিন্তাই যেন আমাদের মনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত থাকে। যখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' এই অবস্থায় আমরা উপনীত হইব তখনই পাইব মুক্তির পরম আস্বাদ।"

মিস্টার জর্জ পিটোয়েফ (Mr. Georges Pitoeff) শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "শ্রীশ্রীসারদাদেবী সেই অদৃশ্য শক্তি—যে শক্তি সমস্ত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উৎসাহদাত্রী ও পরিচালিকা। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কাজ 'তাঁরই কাজ' ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্ম করিবার এই পথনির্দেশ ছিল অধ্যাত্ম জীবন

গড়িবার জন্য তাঁর প্রধানতম উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার ত্যাগী ভক্ত সন্তানগণের জন্য শ্রীমা সর্বদা প্রার্থনা করিতেন তাহারা যেন 'ঘুরেবেড়ানো সাধু না হইয়া একটি আদর্শ সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে পারে। মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাদের যেন থাকিবার আশ্রম ও মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব না হয়, যাহাতে তাহারা নিশ্চিন্তে ঠাকুরের উপদেশ পালন ও ধ্যানভজনাদি করিতে পারে আর জগতের ত্রিতাপদগ্ধ নরনারী তাহাদের নিকট আসিয়া শান্তি ও সত্যের সন্ধান-লাভের সুযোগ পায়।

"শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভগবানের অবতাররূপে দেখিতে এবং তাঁহাকে আরাধনা করিতে। শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য ছিল এক বিস্ময়কর শক্তির উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার আশীর্বাদ লাভ না করিয়া আমেরিকা-যাত্রা করেন নাই। মায়ের অতি সামান্য কথায়, অতি ক্ষুদ্র কর্মের মধ্যেও অসীম শক্তি লুকাইয়া থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ও আমার শক্তি।' স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জনৈক গুরুভাইকে লিখিয়াছিলেন,—মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, ক্রমে পারবে। আমাদের মধ্যে কেউই তাঁর মহিমা বুঝিনি। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার সম্ভব হবে না। মা-ঠাকরুন ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন।..."

"শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অফুরন্ত মাতৃস্নেহরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—যে স্নেহ নিজের অস্তিত্বকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিয়া সর্বোপরি বর্তমান থাকিত; যাহারা তাঁহার নিকট আসিত তাহাদিগকে খাওয়ানো, আদর-আপ্যায়ন, সেবা-শুশ্রূষা ও আধ্যাত্মিক উপদেশ-দানের মধ্য দিয়া ইহা অজস্রধারায় প্রকাশ পাইত। শ্রীমায়ের জীবনচরিতকার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: 'যতদিন স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যে কুলাইয়াছে ততদিন পর্যন্ত ভক্তসেবা অপেক্ষা কিছুতেই তাঁহার বেশী আনন্দ ছিল না। তিনি রান্না করিতেন এবং সহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন ও বাসনপত্র ধুইতেন। জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিবেশে সকলে তাঁহার স্নেহলাভ করিয়াছিল। যদি কেহ তাঁহার সেবা লইতে আপত্তি করিত তিনি গভীর স্নেহস্পর্শে সমস্ত আপত্তি ঠেলিয়া ফেলিতেন—বলিতেন, বাবা, কী আর তোমার জন্য করেছি? আমি কি তোমার মা নই? একি মায়ের কাজ নয় যে, সকল রকমে সন্তানদের সেবা করা—নিজের হাতে তাদের এঁটোও পরিষ্কার করা?

"শ্রীমায়ের পূতসঙ্গলাভের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যেরা তাঁহার অভাবনীয় যত্ন ও স্নেহ-ভালবাসার কথাই বলিয়া থাকেন। একজন বলেন, 'মায়ের শুধুমাত্র অবস্থিতিই শিষ্যের সমক্ষে সত্য উদ্ঘাটন করিয়া দিত। নীরবে তাঁহার শ্রীচরণতলে উপবেশন করিলেই যাহাকে সাধারণতঃ আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা মুহূর্তমধ্যে স্বপ্নের মত উড়িয়া যাইত; আর শাস্ত্রে যাহাকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করা হয়—সেই সত্যের আলোক সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।'

"ভারতীয় ঐতিহ্যে সমস্ত দানের মধ্যে পারমার্থিক দানকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্ম সম্পদ্ শ্রীশ্রীমা সহস্র সহস্র তৃষিত • নরনারীর উপর এমনকি অনধিকারী হইলেও অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রসার এইরূপ গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছেন, 'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি।' বস্তুতঃ শ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, 'দীক্ষা দিলে গুরুকে শিষ্যের

সমস্ত পাপ ও দুঃখকষ্টের বোঝা বইতে হয়। আমার কাছে যারা আসে তাদের মধ্যে অনেকে দুষ্কার্য করতেও ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু তারা মা ব'লে আসে, দুঃখ জানায়। তাদের ফিরিয়ে দিতে পারি না, যতটুকু পাবার তারা যোগ্য তার থেকেও বেশি তাদের দিই।"

জন্মদিন

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, এম্‌-এস্‌সি, বি-এল

জন্মদিন। জন্মদিনে ভগবৎস্মরণ কর্তব্য। কেন? জন্মসমস্যাটি শাশ্বত, চিরন্তন। যুগের পর যুগ মানুষ জন্মিয়াই চলিয়াছে, মানুষ ভাবে। সুতরাং জন্মসমস্যা মানুষকে সদাই এটা জানিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ইহা জানা দরকার। যে জানিতে পারে, সে পারে। ইহা অপরে অপরকে ঠিকমত বুঝাইতে পারে না। ইহা জানিবার পথটি ধরা যাক্‌, দুর্গম অরণ্য প্রদেশে। সেখানে যান-বাহনের অভাবে সমস্ত পথটুকু নিজের পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে হয়। যাঁহারা সেই পথে চলাচলে অভ্যস্ত তাঁহাদের কাছে তাঁহাদের দয়ায় নিজ সামর্থ্যানুসারে কিছু কিছু নির্দেশ পাওয়া যায়। যে পথে চলিয়া এই সমস্যার মর্মোচ্ছেদ করা যায় সেই পথের কথা সর্বদাই তাচ্ছল্যের বা অবিশ্বাসের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং কাহারও বোধগম্য হয় না। 'হয় না' কেন সে সমস্যা এখন তুলিব না। ঘটনাটি সত্য—'হয়—না'। তবে উপায়। উপায় ভগবৎস্মরণ। ভগবৎস্মরণের পর ভগবৎশরণ।

'জন্ম' কথাটি যেইমাত্র উঠে, তখনই শরীরের কথাটা আসিয়া পড়া অনিবার্য। সঙ্গে সঙ্গে দেহাভিমানী 'আমি'র পিছনের আত্মার কথাটা আসিয়া পড়ে। শরীরকে স্বাভাবিক আমরা ভোগায়তন বলিয়াই জানি। ইহা যোগায়তনও বটে। বহির্মুখীনতায় ভোগ; অন্তর্মুখীন অনুসন্ধানে যোগ। অনুসন্ধান কার? আমার নিজের, অর্থাৎ আত্মার। আত্মাই খাঁটি। এই শরীর সেই আত্মোপলব্ধির দ্বার। সুতরাং ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। কেননা আত্মাই ব্রহ্ম। সে কথা পরে আসিতেছে।

কোন একটা অনির্বচনীয়া শক্তির প্রভাবে আমাদের মুখ্য শুদ্ধচৈতন্য আবৃত আছে। জাগ্রৎ-চৈতন্য নিদ্রায় যেমন আবৃত থাকে মুখ্যচৈতন্যও আমাদের জাগ্রদবস্থায়, (শুধু জাগ্রদবস্থায় কেন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অর্থাৎ আমাদের পরিচিত তিন অবস্থায়) সেইরূপ আবৃত রহিয়াছে। শুধু যদি আবৃতই থাকিত হয়ত কোনো সময় আবরণ উন্মোচিত হইতে পারিত। আবরণশক্তির সহিত আর একটা শক্তি রহিয়াছে যাহাকে বিক্ষেপশক্তি বলা যায়। বিক্ষেপের জন্য বহির্মুখীনতা, বিপরীত গতি। বিক্ষেপশক্তির কারণে আমাদের চৈতন্য-প্রতিবিম্ব ভুলপথে অগ্রসর হয়। বিক্ষেপশক্তির প্রভাবের সময়েও আবরণশক্তি রহিয়াছে। আবরণ-শক্তির প্রভাবে তত্ত্বের 'অগ্রহণ' এবং বিক্ষেপ-শক্তির ফলে 'অন্যথাগ্রহণ' হয়। অর্থাৎ 'জানিতে পারিতেছি না' এই বোধটার নাম ধরা যাক্‌ 'অগ্রহণ' এবং "ইহা ত এইরূপই' এমন যে ভুলজ্ঞান তাহার নাম অন্যথাগ্রহণ। দৃষ্টান্ত জাগরণ ও নিদ্রা। (এখানে অবশ্য স্বপ্ন জাগরণের অন্তর্ভুক্ত।) সুষুপ্তি আবরণ অবস্থা, সেখানে শুধু অগ্রহণ। আমি নামক মুখ্যবস্তু, যাহার কখনও অপলাপ করা যায় না তাহাও অগৃহীত থাকে। জাগরণে সেই অগ্রহণ

ত রহিয়াই গেল; বাস্তবিক আমি কি, কে, কোথায়, কেন ইত্যাদি প্রশ্ন অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। তদুপরি এই ত আমি মনুষ্য, অমুক তারিখে এইরূপভাবে আমার জন্ম, আমি বুদ্ধিমান, আমি স্বামী, পুত্র, বিত্ত, গৃহাদিবান চেতনপুরুষ ইত্যাদি বহু উপাধিতে আমাকে গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহার দ্বারা মুখ্য বস্তুর অন্যথাগ্রহণ হইয়া যায়। বিক্ষেপ-জাত অন্যথাগ্রহণে আবরণশক্তির প্রভাব আরও বাড়ে। 'ভুল'—জানি কেমন করিয়া? আমার ঐ বিক্ষেপ সহভুব জাগ্রদ্‌বোধই ত ঠিক হইতে পারে। চার্বাকপন্থীর বা জড়বাদীর এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে 'ইহা যে ভুল' তাহা জানি, কেননা ঐ অনুভবে অনাবিল চিত্তপ্রসাদ আসে না! অজ্ঞাত জিনিস জানিলে আনন্দ অনিবার্য। জ্ঞান ও আনন্দ অবিচ্ছেদ্য। উহারা পৃথক সত্তা নহে। একই জিনিসের দ্বিবিধ ভাবের যুগপৎ এক উপস্থিতি। আর এক কথা- অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য, অর্থাৎ জ্ঞান উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হইতে বাধ্য। অজ্ঞানের নাশ হইলে অজ্ঞান পুনরাক্রমণ করিতে পারে না। ভ্রমবশে রজ্জুকে সর্প মনে করিতে করিতে যদি সর্পরূপ অজ্ঞান রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা নাশিত হয়, পুনরায় সেই রজ্জুখণ্ডে আর সর্পভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। আমার জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক আমি আমাকে সেইরূপে পুনরাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করে না। আমার শাশ্বত প্রশ্ন পুনরুত্থিত হয়। সুতরাং জন্ম, আত্মা, বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিবৃত্তি হয় না।

ভৃগু নামক প্রসিদ্ধ বরুণপুত্র, পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" পিতা তাহাকে বলিলেন, "শরীর প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্—ইহারাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। অনন্তর আরও বলিলেন,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।" [যাহা হইতে এই অখিলভূতবর্গ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে যাহাতে গমন করে ও যাহাতে বিলীন হয় তাহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হও। তিনি ব্রহ্ম]। ভৃগু একাগ্রতা অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া—'অন্নই ব্রহ্ম' ইহা জানিলেন। কারণ পিতৃ-প্রদত্ত সঙ্কেত মিলাইয়া দেখিলেন যে অন্ন হইতেই ভূতবর্গ জাত হয়, জন্মিয়া অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং বিনাশকালে অন্নাভিমুখে প্রতিগমন করে ও অন্নে বিলীন হয়। উহা জানিয়া পিতার সকাশে উপস্থিত হইলে পিতা বুঝিলেন ভৃগু স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরকে বুঝিতেছে। লক্ষ্য করে নাই অন্নের উৎপত্তি বিনাশ আছে। মুখে বলিলেন "একাগ্রতা সহায়ে ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করো; একাগ্র তপস্যাই ব্রহ্ম।" ভৃগু পুনরায় তপশ্চর্যা করিয়া অনুধাবন করিলেন—সর্বানুস্যূত একটি মহাপ্রাণ-প্রবাহ রহিয়াছে। সুতরাং সেই 'প্রাণই ব্রহ্ম' ইহা জানিলেন। [ইহার সহিত জড়বাদের Cosmic Force বা Cosmic Lifeএর কিছু সামঞ্জস্য থাকিতে পারে।] পিতৃপ্রদত্ত formula আলোচনা করিয়া মিলাইলেন—প্রাণ হইতেই এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া প্রাণের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে প্রাণাভিমুখে গমন করিয়া প্রাণে বিলীন হয়। পিতা দেখিলেন ইন্দ্রিয়াদি-বেষ্টিত প্রাণশক্তিকে ভৃগু চেতন বলিয়া ধারণা করিয়াছে। বোঝে নাই যে প্রাণ অচেতন, অতএব উহা ব্রহ্ম নহে। তিনি জানেন স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অনুভূতি লাভ করা যায় না। ভৃগু আরও অনুসন্ধান করুক। সুতরাং পূর্বোক্ত সেই এক কথারই পুনরুক্তি করিলেন—"আরো তপস্যা করো, তপস্যাই ব্রহ্ম।" ভৃগু নিজেই বুঝিতে পারিলেন যে অচেতন বস্তু (প্রাণ) ব্রহ্ম হইতে পারে না। তাঁহার মনে হইল "মনই ব্রহ্ম।" Formula বা সঙ্কেত ত বেশ খাটে। মন হইতেই

এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া মনের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে মনেরই অভিমুখে প্রতিগমন করে ও মনেই বিলীন হয়। উহা জানিয়া ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি এবারেও স্বীকৃত না হইয়া আবার তপস্যা বিধান করিলেন। তখন ভৃগুর খেয়াল হইল মনও অচেতন। (চেতন আত্মার অতি সান্নিধ্য হেতু মনকে আমরা চেতন বলিয়া ভুল করি)। ভৃগুর আরও খেয়াল হইল মন অনিশ্চয়াত্মক, সংকল্প-বিকল্পাত্মক। অতিসূক্ষ্ম হইলেও মন শরীরধর্মী, অর্থাৎ ক্ষণপরিণামী, নাশ্য। দৃশ্য পদার্থবর্গের অন্ততম।

এবার বুঝিলেন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (বিজ্ঞান) ই ব্রহ্ম। এইরূপে সমষ্টি জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট আদি পুরুষ পর্যন্ত পৌছিবার পরেও পিতা তপস্যার নির্দেশ দেওয়ায়, বিচারে ভৃগু দেখিলেন, বুদ্ধিতেও সুখদুঃখের অনুভূতি থাকে, কিন্তু মুখ্যব্রহ্মে ত সুখদুঃখ নাই। চিন্তা করিয়া ভৃগু—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি"—জানিলেন পূর্ণানন্দই ব্রহ্ম।

লৌকিক বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-জনিত আনন্দ—খণ্ডানন্দও নহে। ইহা আনন্দের আভাসমাত্র। এই আনন্দাভাস ভয়শূন্য নহে। যেখানে ভয় সেখানে আনন্দ নাই! রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে ইহার কাব্যরূপ এই প্রকার—

আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি ত আনন্দ।
ভিত ভেঙে যেই এলে ঘরে ঘুচলো আমার বন্ধ
সুখের খেলা আর রোচেনা, পেয়েছি আনন্দ॥
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচলো আমার দ্বন্দ্ব
দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ॥

ভৃগুর উপাখ্যানটি রূপক নহে। পুরাকালে তত্ত্বদর্শী পিতা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দিতেন। তবে উপাখ্যানটিকে যুক্তিপরম্পরা ধরিয়া ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে হয়। অবশ্য অতি স্থূলত্বেও ইহার অনুরূপ ভাব একটু চিন্তা করিলেই পাওয়া যায়। অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়-সমন্বিত পঞ্চকোষবিশিষ্ট শারীর পুরুষ উপলক্ষ্য মাত্র।

যাহা হউক এই ভৃগুসম্বন্ধী (ভার্গবী) বিদ্যা হইতে জানা যায় যে, জন্মবৃত্তান্তের সম্যক আলোচনার ফলে ধাপে ধাপে মুখ্য বস্তুতে পৌছান যায়। এবং ইহাও জানা যায় যে সাধারণতঃ আমরা আমি বলিতে যে স্থূল বস্তুটিকে বুঝিয়া বসি, উহা ঐ সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। এবং উহা আদৌ ঠিক কথা নহে। কিন্তু উহা ঠিক পথ ধরাইয়া দিতে পারে। সেই হিসাবে দেহতত্ত্বানুষ্ঠান যোগানুষ্ঠান।

দেখা গেল আমরা পঞ্চকোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া প্রত্যেকটিকেই আমার "আমি" বস্তু বলিয়া ভুল করিতেছি। পঞ্চকোষ গণনায় পঞ্চম কোষ আমাদের শরীরসম্বন্ধী বলিয়া মুখ্য আনন্দ নহে। উহার ওপারে মুখ্য আনন্দ। দার্শনিকেরা তাহা এই ভাবে বুঝাইয়া থাকেন।—আমাদের শরীর তিনটি, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণশরীর। অন্নময় কোষে স্থূল শরীর। পশুপক্ষী সরীসৃপ কীটাদি নির্বিশেষে সর্বভূত সাধারণ। আসিল, থাকিল, বাড়িল, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, পরিণমিত হইল, শেষে নষ্ট হইল, অর্থাৎ ইহা ষড়্‌-বিধ ভাববিকারী। 'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, অপক্ষীয়তে, পরিণমতে, নশ্যতি।' স্থূল-শরীরে যখন আমরা ব্যবহার করি তখন আমাদের জাগ্রদবস্থা। [অবশ্য দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহাও নাকি একরূপ স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রান্তর্ভুক্ত, সে কথা এখন থাক্, পরে যদি অন্য প্রসঙ্গে উঠে দেখা যাইবে।] তখন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর পিণ্ডিতভাবে অপৃথক বিজড়িত থাকে। সেই জন্যই এই অন্নময় স্থূল শরীর হইতে আমাদের ছুটি কম। এবং ইহারই সাহায্যে

আমাদিগকে পার হইতে হইবে। সেই জন্যই বরুণ বলিয়াছেন শরীর ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার।

ঠিক এতদাকৃতি বিশিষ্ট আমাদের—সূক্ষ্ম শরীর। প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এই তিন কোষের একত্রীভূত সূক্ষ্মপদার্থ। আমাদের স্থূল শরীরের প্রথম অনুপস্থিতি বোঝা যায় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি। সেখানে শুধু সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবহার। তৈজস (=তেজোময়) শরীর। নিজেই গড়ে, নিজেই দেখে। নিজেই উপাদানকারণ, নিজেই নিমিত্তকারণ, নিজেই দ্রষ্টা। আমাদের সেই এই সূক্ষ্ম শরীরটি বর্তমান জন্মে সৃষ্ট হয় নাই বটে, তবে ইহা পূর্ববর্তী অন্যান্য জন্মের সূক্ষ্ম শরীরের সহিত তুলনীয় নহে। আমাদের এই জন্মের এই শরীরের যেমন শৈশব কৌমার যৌবনাদি পরিবর্তন হয়, সূক্ষ্মশরীরেও তেমনি প্রতি জন্মে এবং প্রতিজন্মের মধ্যেও নিয়ত বাসনাজনিত সংস্কারের হ্রাসবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিছু কিছু বোঝা কমিয়া কিছু কিছু বাড়িয়া ক্রমান্বয়ে অভিনবত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। জন্মে জন্মে ইহার এই আচরণ। আদিম সৃষ্টিতে ইহার উৎপত্তি। সেই দৃষ্টিতে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। কেন এই উৎপত্তি কেহ জানে না। যখন অজ্ঞাত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তখনই জানে। শুধু স্থূল শরীর হইতে অব্যাহতি পাইলেই বা লইলেই কোনো লাভ নাই। লাভ নাই, অলাভ থাকিতে পারে। জোঁক যেমন এক তৃণখণ্ড ছাড়িয়া অন্য তৃণ আশ্রয় করে, দূরের যাত্রী যেমন আবশ্যকমত নৌকা, গোশকট, বাষ্পযানাদি ত্যাগ এবং গ্রহণ করে, সূক্ষ্মশরীর সেইরূপ অন্য একটি আলম্বন গ্রহণ করে। এই জন্যই ধীর ব্যক্তিরা দেহান্তরকে যৌবন-বার্ধক্যাদি পরিবর্তনের অন্যতম বলিয়াই গ্রহণ করেন। শোকগ্রস্ত হন না।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

অনেক সময় ভালই মনে করেন। ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরার মতো, বলেন। পুরাতন আকারের গহনা ভাঙিয়া নূতন গহনা পরার মতো বলেন। সুতরাং এই সূক্ষ্ম শরীরকে ঠিক পথে চালিত করিয়া ইহার ভার বোঝা কিছু কমাইয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত। স্বপ্নের মারফতে স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব জানা যায় বলিয়া স্বপ্নকে আমাদের শিক্ষক বলা যাইতে পারে। স্বপ্ন আমাদিগকে বোঝায় যে প্রতীতিকালে সত্য হইলেও তাহা মিথ্যা হইবার বাধা নাই। জাগ্রৎ প্রতীতিকেও বরং দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মিথ্যা সাব্যস্ত করাই সঙ্গত। যে আমাকে একবার মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকায় তাহাকে যেমন আমরা আর বিশ্বাস করিতে পারি না তেমনি আমাদের প্রতীতিকে আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি? সূক্ষ্ম শরীর আমাদের স্বপ্নের আধার। এমনও ত হইতে পারে যে আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্রিত জাগ্রত শরীরটা, 'ভিন্ন আর এক-রকম' স্বপ্নের আধার। যদিও বা তাহা না হয়, দেখা যাইতেছে যে সূক্ষ্ম শরীর থাকিলে প্রবাহক্রমে শরীররূপ স্বপ্নের পর স্বপ্ন চলিতে থাকিবে। বোঝা ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু হালকা না করিলে স্বপ্ন-পরম্পরা চলিতেই থাকিবে। স্বপ্নভঙ্গেই আনন্দ। আনন্দে ছুটি।

এই সূক্ষ্মশরীরেরও অভ্যন্তরে আমাদের আনন্দময় কোষ। যখন স্থূলসূক্ষ্মমিশ্রিত বা শুধু সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবহার করি অর্থাৎ জাগ্রৎক্রীড়াদি করি বা স্বপ্ন দেখি তখনও আনন্দময় কোষ তাহাতে ব্যাপ্ত থাকে। যখন সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান যেগুলি, সেই উপদ্রবকারী ইন্দ্রিয়গণ এবং কামনা বাসনা আদি অনর্থরাশি কারণে সাময়িক লীন হইয়া অনুপস্থিত থাকে তখন আমরা শুধু আনন্দময় কোষ ব্যবহার করি। ইহাতে শুধু আনন্দানুভূতি। ইহাই আমাদের দৈনন্দিন নিদ্রা। স্বপ্নহীন সুষুপ্তি। এই খানেই আমরা সর্ব-উপদ্রবরহিত, নিশ্চিন্ত, অভয়। কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিয়া আমাদের কর্মফল আবার

আমাদিগকে ঠেলিয়া কার্য ব্যবহারে প্রণোদিত করে। ঠিক যেমন যেমন গচ্ছিত রাখিয়াছিল, ঠিক তেমনই ফেরত দেয়। বদল হইবার উপায় নাই। এই-জন্যই ইহাকে কারণ শরীর বলা হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবহারাদি (অব্যক্ত অব্যাকৃত) কারণ শরীরে লীন থাকে মাত্র।

উপদ্রবরহিত বলিয়া এই সুষুপ্তি আমরা অপছন্দ করি না। তবু কর্মজগতে আমাদের মনে হইতে থাকে যে ইহা কতকটা আমাদের বিনাশস্বরূপ। ঘুম ভাঙ্গিলে আমরা বলি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম। (অর্থাৎ শুধু আনন্দময় কোষে ছিলাম।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো বলি—"কিছুই জানিতে পারি নাই।" আমাদের সেকথার উদ্দেশ্য আমরা যাহা জানিতে চাই, তাহা জানিতে পারি নাই। মহাভ্রমবশতঃ গতিবেগে ইন্দ্রিয়মারফত যে বিষয়াদি আমরা ভুল করিয়া জানিতে চাই তাহা জানিতে পারি নাই। সেইটাই আফ্‌শোষের বিষয় হয়। কিন্তু ইহার তাত্ত্বিক ইঙ্গিত এই যে মুখ্যতঃ যাহা আমাদের একমাত্র জ্ঞাতব্য তাহা জানা হয় নাই। অজ্ঞানাবৃত সুষুপ্তিতে কি লাভ হইল? বস্তু ত অগৃহীত রহিল, আগে বলিয়া আসিয়াছি।

তাহা হইলে কি চাই? গ্রহণ কিসে হইবে? চাই সচেতন সুষুপ্তি। ইহাকে সমাধি বলা যায়। যোগসমাধি যোগলভ্য বটে, কিন্তু সমাধি বিচার-লভ্যও বটে। পদার্থ একই। উভয়ই ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ। সেইজন্য চাই জাগরবিক্ষেপ হইতে জাগ্রদ্বিরতি। ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অবিরত বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগ আকাঙ্ক্ষা ও তৎসাধনে লিপ্ত থাকি। তাই সময় সময় ছুটি নিতে হয়। ছুটিটা উৎসবের দিন। উৎসব আনন্দের জন্য, আনন্দসাপেক্ষ। আনন্দই ত ভগবান। তাই জন্মদিনে ভগবৎস্মরণ দ্বারা বিরতিলাভ এবং আনন্দোৎসব।

আপত্তি তোলা যায়—কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না—পঞ্চকোষ ত্রিবিধ শরীর, জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থা, জন্মমৃত্যুপ্রবাহ ইত্যাদি কথা হইতেছিল সেখানে ভগবান আসিয়া উপস্থিত হইলেন কি করিয়া। তাহার উত্তর এই যে, ভগবানের স্বভাবই এই—সর্বদাই উপস্থিত। নিজেকে অব্যাহত রাখিয়া অতিবিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে যুগপৎ সম্যক উপস্থিতি। অত্যাশ্চর্য স্বভাব। ভগবান ত আসিয়া পড়িবেনই, ডাকিলেও আসিবেন, না ডাকিলেও আসিবেন। জানিলে ত আসিয়াছেনই, না জানিলেও আসিয়াছেন। তাঁহার যাওয়া নাই, সেইজন্য আসাও নাই। আসা-যাওয়াই নাই, সদৈকরসম্। বুদ্ধি অহঙ্কারাদি সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত পঞ্চকোষাতীত আমিও ত মনে হইতে পারে সদৈকরসম্। যাক্ আমি থাকি, না থাকি তিনি সর্বদাই আছেন। তিনি নাই তাহা যখন অসম্ভব তখন আমি যতক্ষণ আছি, সেই ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং সুহৃদং সর্বভূতানাং অনাহূত অতিথিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সম্যক্ সম্বর্ধনা করা যাক্। ফল কি? যুক্তিতে বোঝা যায় না। ঋষিদের অভিজ্ঞতাই গ্রাহ্য। ভগবান নিজ মুখেই ত বলিয়াছেন—

> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
>
> গীতা ১০।১০

> তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
> নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥
>
> গীতা ১০।১১

> অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
> তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
>
> গীতা ৯।২২

সুতরাং জন্মদিনে উৎসব করো, আনন্দ করো; প্রার্থনা করো জন্ম সার্থক হউক। এই উপলক্ষ্যে পরম ঋষিদেরও নমস্কার করি—

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

আমি

ওমর আলী

বিস্মৃতির অতল কুয়াসা
মরে ব্যর্থ আশা
অন্ধকার জিজ্ঞাসায় যবনিকা টানি'।
আলোকের দীপ্ত বাণী
মুহূর্তে মিলায়ে যায়, পারনিক' ভাষা।

কালের করাল আঘাতে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে,
নেমে আসে কোন ফাঁকে তারকার দূত
কিংবা ঘন সুদীপ্ত বিদ্যুৎ
ভাষাহীন মেলেনি উত্তর।
ভেসে আসে অতীতের তীব্র আর্তস্বর।

পঞ্চভূতে সৃষ্টি এই মানবের কায়া
মোরা বলি মায়া
বহুত্বের কেন্দ্রপথে 'আমি' ডুবে যায়
তীক্ষ্ণ হতাশায়।
'আমি' কেবা মেলেনি উত্তর
আবর্তিত শূন্যপথে আজো তার
সুকরুণ স্বর॥

সমালোচনা

ভারতের সাধক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শঙ্করনাথ রায়-প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীসুধীর মুখার্জি, রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩; প্রথম খণ্ডে ৩০৯ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৩২ পৃষ্ঠা; মূল্য—প্রতিখণ্ড পাঁচ টাকা।

ঐতিহাসিক লেখকদের সব কিছু মনে রাখিবার প্রয়োজন নাই; যাঁহারা চরিতকথা লিখিতে প্রবৃত্ত তাঁহাদের পক্ষে অনেকটা বিস্মৃতির অভ্যাসও দরকার। যতটুকু মনে পড়িতেছে এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন কোন এক বিশিষ্ট ইংরেজ চরিতকার। বাংলা জীবনীসাহিত্য অনুপেক্ষণীয় সম্ভাব্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে; কোন কোন জীবনী যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদাও লাভ করিয়াছে, কিন্তু সাধক ও লোকগুরু ধর্মবীরদের জীবনীরচনা বহুক্ষেত্রেই শিল্পপদবী পায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সবকিছু লিপিবদ্ধ করিবার এক প্রবল আগ্রহ লেখকের শিল্পচেতনাকে অভিভূত করিয়া রাখে। এক অবাস্তব কুহেলিকা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। ভক্তির উচ্ছ্বাসই এই সকল গ্রন্থের প্রধান সম্বল হইয়া দাঁড়ায়।

সুদৃশ্য এই 'ভারতের সাধক' পড়িয়া মনে হইল লেখক একজন কুশল চরিতশিল্পী। আতিশয্যের ঘূর্ণাবর্তে তিনি পড়েন নাই; সুস্থির বস্তুনিষ্ঠায় 'অপাস্য ফল্গু' যাহা কিছু সার, যাহা কিছু গ্রাহ্য তাহাই প্রশংসনীয় বিন্যাসকৌশলে আমাদের উপহার দিয়াছেন। এই সুপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতাকে অভিনন্দিত করি।

প্রথম খণ্ডে আটজন সাধক মহাপুরুষের কথা আলোচিত। ইঁহারা শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীগম্ভীরনাথজী, স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা, বামা ক্ষেপা, শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী ও স্বামী নিগমানন্দ। দ্বিতীয় খণ্ডে আচার্য রামানুজ, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, ভক্ত দাদূ, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস বাবাজী, শ্রীভোলানন্দগিরি, প্রভু জগদ্বন্ধু ও শ্রীসন্তদাস বাবাজীর জীবনীর আলোচনা। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অত্যন্ত

সুলিখিত। লিখিয়াছেন মরমী চরিতশিল্পী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। "এই দুখণ্ড বইতে সব সাধক মহাপুরুষের জীবন অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, লেখকের উদ্দেশ্যও তা নয়। ভারতের সাধনার বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে লেখক সেই সব মহাপুরুষের জীবনীই গ্রহণ করেছেন, যাঁদের সাধনার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।" পারিশেষ্য-ক্রমে আশা করা যায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যবান্ আরও কয়েকজন মহাপুরুষের লোকপাবন চরিত্র তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হইবে। বিভিন্ন সাধকদের জীবনের ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করিলে ভাল হইত। অবদানং মহৎ কর্ম—সত্যই এই দুই খণ্ড অবদান, লেখকের শ্রদ্ধাবদান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (অধ্যাপক)

পথের সন্ধানে (উপন্যাস)—লেখক : শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস্ ; ৫৭নং ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৭ ; পৃষ্ঠা—৩৮৩ ; মূল্য—পাঁচ টাকা।

আলোচ্য বইখানি স্বনামখ্যাত স্বদেশকর্মী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত একখানি সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাসখানির পাত্রপাত্রীর চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনাগুলির বিন্যাসে গ্রন্থকারের আদর্শবাদী ও বিপ্লবী মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। নায়ক সঞ্জীব, উপনায়ক রহিম, সমাজ-সেবিকা সাবিত্রী দেবী, পূতাত্মা মৌলবী সাহেব, ভক্ত নীলাম্বর ঠাকুর, মহাপ্রাণ জমিদার গোবর্ধন দাস—সকলেই আদর্শ মানুষ,—সকলেই ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা, ভগবদ্ভক্তি, দেশ-প্রেম, মানবিকতা প্রভৃতি সদ্গুণ-রাশিতে ভূষিত। যে কয়টি বিপরীতধর্মী চরিত্র দেখানো হয়েছে—যথা ঈর্ষ্যাপরায়ণ উচ্চ চাকুরে বনমালী, কুটচক্রী গঙ্গাধর ঠাকুর, স্বার্থান্ধ আহেদ, তুলনায় অত্যন্ত ম্লান, অত্যন্ত মেরুদণ্ডহীন। মন-স্তত্ত্বের বিশ্লেষণের দিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয়—এদিক থেকে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় কম। কারণ, কোনও চরিত্রেই মানবোচিত বিপরীত গুণের সমাবেশ হয়নি এবং সেগুলির সজ্ঘাতে সজ্ঘাতে চরিত্রগুলি পরিণতি লাভ করে নি। ঘটনাগুলিও ঠিক ঠিক দৃঢ়সংবদ্ধ নয়,—মনে হয় যেন কতকগুলি টুক্‌রো টুকরো অসম্বদ্ধ ঘটনা একটু ঢিলেভাবে সাজানো। ফলে ঘটনাগুলির মাধ্যমেও কাহিনীর ক্রমপরিণতি সুস্পষ্ট নয়।

কিন্তু এদিক থেকে উপন্যাসখানির সাহিত্যধর্ম হতে যা কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে তা লেখক পুষিয়ে দিয়েছেন আখ্যানভাগে তাঁর বর্ণনাকুশলতার দ্বারা ও দরদী মনের পরিচয়ে। এবং এই জন্যই বইখানি শেষ পর্যন্ত রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য ভূমি-হীন কৃষক, দিনমজুর, ধোপা, কারিগর প্রভৃতি সাধারণ মেহনতী মানুষের অপূর্ব অধিকারবোধ, অতুলনীয় সংহতি, অক্লান্ত ও দুর্জয় অস্তিত্ব-সংগ্রামের আশ্চর্য কাহিনী আমাদের মনকে গভীর ভাবে আলোড়িত করে।

কিন্তু বোধ হয় লেখকের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় তাঁর চরিত্রগুলির বিন্যাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। অতিমাত্রায় আদর্শধর্মী হয়েও চরিত্রগুলি আশ্চর্যরকম ভাবে সজীব। এবং সেইজন্য মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাবিহীন হলেও, চরিত্রগুলিকে অলীক বলে বোধ হয় না। এখানে লেখককে সহায়তা করেছে তাঁর বহুদর্শী জীবনের গভীর জীবন-উপলব্ধি। নায়ক সঞ্জীবের আদর্শ জীবনের মধ্যে গভীর জীবনানুরাগ তার মধ্যে বাস্তবতা এনে দিয়েছে। মৌলবী সাহেবের আশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক আচরণ তাঁর চরিত্রের অপূর্ব সাধুতার সঙ্গে সুন্দর খাপ খেয়ে গিয়েছে, যেমন গ্রাম্য পুরোহিত নীলাম্বর ঠাকুরের সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠবার পেছনে তাঁর অপূর্ব ভগবদ্ ভক্তি থাকায় তাঁকে অবাস্তব করে তোলেনি। নলিনীর চরিত্রের আত্মহারা বীরপূজা তার স্বাভাবিক ত্যাগপরায়ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে

তারী সুন্দর সাম্য ও সুষমায় সৃষ্টি করেছে। আমাদের সর্বপেক্ষা মুগ্ধ করে রেবার দুর্জয় আত্মপ্রত্যয় ও জীবন-প্রীতি। নবীন জীবনের সুখ-স্বপ্নে বিভোর রহিমার ব্যর্থতার কাহিনী অত্যন্ত বেদনাদায়ক বাস্তবধর্মী কাহিনী। রহিমের আদর্শের জন্ম অবলীলাক্রমে জীবনদানের মধ্যে আমাদেরই অতিপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় সৈনিকদের দেখতে পাওয়া যায় বাস্তবধর্মী।

যে যুগে লেখকেরা যে পরিমাণে সমাজ-সচেতন সেই পরিমাণে জীবন-সচেতন নন—যে যুগে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ভাঙ্গনের কাহিনী এবং মনস্তত্ত্ব ও সমাজজীবনের ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক মনোভাব ও ছকে ফেলা থিয়োরীর প্রভাব সুস্পষ্ট, —সেই যুগে বর্তমান লেখকের জীবন-চেতনা ও অভিজ্ঞতা এবং আত্মোপলব্ধির ভিত্তিতে সাহিত্য রচনার প্রয়াস প্রশংসনীয়।

সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বস্তু লেখকের দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ আদর্শবাদ। তিনি ধর্মকে সকল সংস্কার ও সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, নরনারীর প্রেমকে আবিলতা মুক্ত করে হৃদয়ের পরম মাধুর্যের উপলব্ধিতে বিশ্বপ্রেমে উন্নীত করতে চান; ত্যাগ ও নিষ্ঠা, বীর্য ও আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন—বিশেষ করে ঈশ্বরভক্তি মানুষের সহজাতগুণ বলে স্বীকৃতি চান। তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের সমাধান ও পরিণতি দেখেছেন প্রেমের পথে, সমন্বয়ের মধ্যেই দেখেছেন সাম্যকে এবং মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন বিশ্ব-মানবের মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দেবার মধ্যে। এত গভীর প্রত্যয় তাঁর প্রকাশ-শৈলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে না মানলেও তাঁর আদর্শবাদ চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

এ ছাড়া ড্রইং-রুম ও কাফে-রেঁস্তোরাঁর পরিবেশের বাইরে দুর্দান্ত কীর্তিনাশা নদীর তীরে পল্লীবাংলার উদার পটভূমিকা ও নিত্যপরিচিত সাধারণ মানুষদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অনবদ্য কাহিনী পাঠকের চিত্তে বেশ স্নিগ্ধতার সৃষ্টি করে।

পরিণত বয়সে এইরূপ সার্থক সৃষ্টি লেখকের কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। বইখানি নিঃসন্দেহে রস-পিপাসু মননশীল পাঠকদের পরিতৃপ্তি সাধন করবে।

শ্রীসান্ত্বনা দাশগুপ্ত (অধ্যাপিকা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নয়া দিল্লী শাখাকেন্দ্রে লাইব্রেরী ও বক্তৃতাগৃহের উদ্বোধন—গত ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর, ১৯৫৬) অপরাহ্ণ ৫॥টায় দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে নবনির্মিত বৃহৎ লাইব্রেরী ও বক্তৃতা গৃহের উদ্বোধন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে আশ্রমের বন্ধুবর্গ এবং দিল্লীর বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। নূতন বাড়ীটি দ্বিতল। এক তলায় লাইব্রেরী। এখানে ২৫,০০০ পুস্তক রাখিবার এবং ১২০ জন পাঠকের এক সঙ্গে বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে পুস্তকসংখ্যা ৮,৪০০। পাঠাগারে ১০০ খানি সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাদি আসে। সভ্য হইতে কোন চাঁদা লাগে না। সভ্যসংখ্যা এখন ৫৮০। ১৯৫৫ সালে মোট ৬০৩৯ খানি পুস্তক বাহিরে দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতলে বক্তৃতা-হলটিতে ৭৩০টি চেয়ার বসানো আছে, প্রয়োজনমত আরও ১০০টি মোড়া চেয়ার রাখা চলিবে। শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—"স্বামী বিবেকানন্দ জাতি ও জাতির বুদ্ধিমত্তার রূপ দিয়াছেন। তাঁহার জাতীয়তা-বাদ ভূয়া জাতীয়তাবাদ নয়। তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন দেশের মাটির সঙ্গে তাহার যোগ রহিয়াছে।"

নিবেদিতা বক্তৃতা—খ্রীঃ ১৯৫২ সালে

অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের (৫নং নিবেদিতা লেনে, বাগবাজার, কলিকাতা) সুবর্ণ জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগী দেশবাসীর নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, 'নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী পরিষদ' কর্তৃক তাহা হইতে ৫০০০৲ টাকার জি, পি, নোট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিবেদিতা বক্তৃতা'র ব্যবস্থার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট জমা করা হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় এবং বক্তানির্বাচনের দায়িত্ব সিণ্ডিকেটের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসর প্রথম এই বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ১২ই হইতে ১৪ই অগ্রহায়ণ (২৮শে হইতে ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে অপরাহ্ণ ৩টার সময় এই বৎসরকার বক্তৃতা দিয়াছেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও কীর্তি।'

তিনদিনই এই বক্তৃতা শুনিতে দ্বারভাঙ্গা হলে বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। তিনদিনকার সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং কলিকাতা নগরীর মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীগোপাল হালদার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

উদ্বোধনের নূতন সম্পাদক—আগামী ৫৯ বর্ষ হইতে (মাঘ, ১৩৬৩) উদ্বোধনের সম্পাদনার ভার স্বামী নিরাময়ানন্দের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বিদায়ী সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির কর্মিরূপে মার্চের শেষে আমেরিকায় চলিয়া যাইবেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ—ঢাকার বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ লেখক ও পণ্ডিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ গত ২০শে আশ্বিন পরিণতবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া উদ্বোধনে নিয়মিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই অমায়িক উদার শিক্ষাব্রতী হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগার—"এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক"—সম্প্রতি দিল্লীতে উনেস্কোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে এশিয়ার গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে যে সকল আলাপ আলোচনা হয় এবং গ্রন্থাগারসমূহের উন্নতির জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয় গত ৩১শে অক্টোবর লণ্ডনে এইচ, এম, স্টেশনারী অফিস কর্তৃক প্রকাশিত 'এশিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার' নামক পুস্তিকায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। * * * আলোচ্য পুস্তিকায় দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগারটিকে "এশিয়ার সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত ও সর্বাপেক্ষা আধুনিক" পাঠাগার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থাগার প্রথম চার বৎসরে ১,০০০,০০০ পুস্তক 'ইস্যু' করে এবং মাসে প্রায় ১০,০০০ পাঠককে নিয়মিতভাবে পুস্তক সরবরাহ করে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে ভারতের একজন লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির তুলনায় ব্রিটেনের একজন লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি অন্ততপক্ষে সাতগুণ বেশী পড়ে। (ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস)।

চট্টগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—চট্টগ্রাম বহরপুরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি যুগাবতারের ১২১ তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, কথামৃত পাঠ ও আলোচনা এবং একটি ধর্মসভা উৎসবের অন্যতম কর্মসূচী ছিল। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহু নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রদাস চৌধুরী।